# সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন

———::०::———

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

——:०:——


কলিকাতা,

২।১, রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

৭[illegible], বলরাম দের ষ্ট্রীট, মেটকাফ প্রেসে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

# বর্ণানুক্রমিক সূচী।

# লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

# সচিত্র-সূচী

# সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন

———::o::———

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

——:o:——

কলিকাতা,

২।১, রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

৭।১, বলরাম দের ষ্ট্রীট, মেটকাফ প্রেসে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

# বর্ণানুক্রমিক সূচী।

# লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী

# চচিত্র-সূচী

# নববর্ষ।

এই সনাতন সৃষ্টিচাতুর্য্যে নূতন কিছু আছে কি? সবই ত পুরাতন—অনন্ত, অসীম, অপরিমেয়। কালের অনন্ত ধারা, আপন বৈচিত্র্যে আপনি মজিয়া, অহরহ কল্ কল্ ছল্ ছল্ করিয়া চলিতেছে। সে বিরাট স্রোতস্বিনীর বক্ষে কত বুদ্‌বুদ্ ফুটিয়া উঠিতেছে, কত বীচিবল্লরী-বিতান ও উর্ম্মিপরম্পরা রবিকরস্পর্শে নানাবর্ণে প্রফুল্ল হইয়া, অনুরাগরক্তিমার শোভা ছড়াইয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। সেই একই ভঙ্গী, একই পরম্পরা সর্ব্বকালে সমভাবে পরিস্ফুট। অখণ্ডদণ্ডায়মান কাল—অবিনশ্বর ও অব্যভিচারী; ব্যভিচার দেখিতে পাই কেবল গতিতে, কেবল বিকাশে ও বিন্যাসে, কেবল উন্মেষে ও উল্লাসে। আমি দেখি—আমার নয়ন দেখে; কিন্তু যাহাতে দেখি, তাহাতে সত্যই এমন ব্যভিচার আছে কি না, তাহা ত ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। এই ব্যভিচার-বোধ হইতেই নবীনতার উদ্ভব। গত কল্য যেমন গিয়াছে, আজও তেমনই যাইতেছে, আগামী কল্যও তেমনই যাইবে। সেই সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত, সেই বিহগকলকূজন, সেই মন্থরপবনান্দোলিত-কিশলয় কম্পন—অহোরাত্রের পরিবর্ত্তন-প্রবাহ সেই একই রকমে চলিতেছে। কিন্তু এই প্রবাহ-বক্ষের উপর আমিও যে ভাসিয়া যাইতেছি! আমার আমিত্বের গতি ও পরিণতি আছে কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু এই একটানা প্লাবন-তরঙ্গে পড়িয়া আমি যে একটু ব্যভিচার না পাইলে তৃপ্তি বোধ করি না। তাই ব্যভিচার খুঁজিয়া বাহির করি, অথবা সৃষ্টি করি। যে কুটা ধরিয়া আমি ভাসিয়া চলিয়াছি, সেই কুটার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, বা কালতরঙ্গে তাহাতে কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, আমি এই একটানার মধ্যে এক একটা নবীনতার পর্ব্ব সৃষ্টি করিয়া রাখি। শোকে—দুঃখে—পরাজয়ে, এবং উল্লাসে—সুখোন্মাদনায়—বিজয়ে এই নবীনতার ভাব পরিস্ফুট হয়। আমার সুখ দুঃখ, শোক অশোক, জয় পরাজয় আমার আমিত্বের ব্যভিচারমাত্র; তাই উহারা নবীনতার দ্যোতক। আমার নববর্ষ আমার আমিত্বের প্রশ্বাস-মুহূর্ত্ত;—একটু জিরাইবার অবসর—নিমেষের তরে পশ্চাদবলোকনের অবকাশমাত্র। আমার নববর্ষ আমার অনন্ত অতীতের স্মারক, জাতির ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত আমিত্বের বিশ্রাম-ক্ষণমাত্র। আমার নববর্ষ আমার আমিত্বের ব্যভিচার-দ্যোতক।

নবীন আবরণে ঢাকিতে সাধ যায়; তাই একটানা দুঃখের স্রোতেও এক একটা শোকের তীর্থ গড়িয়া উহাকে নূতন করিয়া লইতে ইচ্ছা করে। আমি চাই নূতন—নূতন দুঃখ, নূতন সুখ;—নব সাধ, নবীন মুখ—নূতন সাজ, নব আশা, নবীন সমাজ, নূতন বাসা। তাই মাঝে মাঝে পুরাতনকে নূতন করিয়া লই—সনাতনে নবীনতার অসংখ্য পর্ব্ব গড়িয়া লই। ইহাই নববর্ষ।

কথা এই যে, এবম্প্রকারের নবীনতা নিতুই আমাতে বিদ্যমান, তাই আমি আমার চিরপুরাতনকে রোচক করিবার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে উহাকে নূতন করিয়া লই। আমার এই নবীনতার পিপাসা মিটাইবার জন্য প্রকৃতিও যেন মধ্যে মধ্যে আনুকূল্য করে। জাতির উত্থান-পতন-জনিত মহাসমর ও জয় পরাজয় আমার নবীনতার স্পৃহাকে নানা ভাবে সন্তৃপ্ত করে। ধরাসুন্দরীর বক্ষের অঞ্চলস্বরূপ এই দেশ বিদেশ—এই জল-স্থলের বিস্তার, ভূগর্ভস্থ উত্তাপের সাহায্যে বারে বারে কত নূতন আকার ধারণ করে, এক একটা খণ্ডপ্রলয়ে মেদিনী কেমন মোদিনী ভূষায় বিভূষিত হইয়া বিরাজ করে; সঙ্গে সঙ্গে আমার নবীনতার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। আমার জন্ম মরণ, যৌবন জরা, ভাব অভাব পর্ব্বে পর্ব্বে আমাকে নূতনতার আস্বাদনে বিভোর করিয়া রাখে। আমি আত্মহারা হইয়া কেবল নূতনতার সমুদ্রে হাবুডুবু খাই। প্রেম প্রীতি, স্নেহ ভালবাসা, ঘর সংসার—সবই নবীনতার বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রেম পুরাতন হইবার উপক্রম করিলে, উহা পুত্রবাৎসল্যে নূতন করিয়া ফুটিয়া উঠে। পুত্র কন্যার নবীনতা ক্ষীণ হইয়া পড়িলে উহা পৌত্রে ও দৌহিত্রে প্রবল ভাবে নবীন হইয়া দাঁড়ায়। এই নবীনতার আদান-প্রদানেই মনুষ্য-জীবন—মনুষ্য-সংসার। এই নবীনতার জন্যই নববর্ষ।

এস নববর্ষ! অতি পুরাতন, অতি সনাতন আমি,—আমাকে নবীনতার মোহমন্ত্রে সঞ্জীবিত করিবার জন্য তুমি এস। সাধক যেমন একে একে পদ্মবীজমালার এক একটি বীজ ধরিয়া মন্ত্রের আবৃত্তি করে, এবং জপে সিদ্ধ হয়, আমরাও তেমনই কালের এই অনন্ত পদ্মবীজমালার এক একটি বীজ বা এক একটি বর্ষ ধরিয়া জীবন-মন্ত্রের আবৃত্তি করিতেছি, আর অপচয়-উপচয়-ধর্ম্মী জীবদেহের অবসান ঘটাইতেছি—পুরাতনকে নূতন ভাবিয়া নবীনতার আস্বাদে মুগ্ধ হইতেছি। সাধকের ইষ্টমন্ত্র প্রতি বীজের উপর ধৃত থাকে, আমার জীবনের ইষ্টমন্ত্র—আমার আমিত্ব কালের পর্ব্বে পর্ব্বে—বর্ষে বর্ষে ফুটিয়া উঠে; পরি-

এই উদয় অস্তের লীলাই নবীনতার পরিচায়ক। অস্তই পুরাতন বা সনাতনের সহিত সম্মিলন। এস নববর্ষ! তুমি অভ্যুদয়, তাই তুমি নবীন। আশার অভ্যুদয়, সম্ভাবিত সুখের অভ্যুদয়, হয় ত বা নিরাশ নিরাকাঙ্ক্ষের বেদনার অভ্যুদয়, তাই তুমি আমাদের নববর্ষ। এস তুমি! ধর্ম্মে কর্ম্মে, সাহিত্যে সমাজে আসিয়া সমুদিত হও। আমরা তোমার কৃপায় যেন অরুণোদয়ের মতন তোমাকে ও আমাদের জীবনকে অনুরাগরক্তিম নবভাবপ্রফুল্ল দেখিতে পারি।

১৩২০ সাল! অনন্তের একটি পদ্মবীজ তুমি, আমার দুঃখসুখদগ্ধ হৃদয়ের এক একটি শান্তির শ্বাস তুমি—এস, এস, আমার চিরপুরাতন হৃদয়কে একটু নবীনতার স্নেহসেচনে স্নিগ্ধ করিয়া দাও। তুমি কতটুকু, তোমার সমবায়ও কতটুকু! আমার দেশ নাই, জাতি নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই,—আমার আছে কাল, কোটীকল্প পরিমাণের কাল। আমি কাল গণিয়া আমার আমিত্বের ধারা কতকটা বজায় রাখিয়াছি, কল্পকল্পান্তরের কথা মনে রাখিয়া আমিত্বের পুষ্টি করিয়াছি। আমার জীবন মরণের পরিচ্ছেদ নাই, তাই আমার দেবতাকে কেবল আমিই প্রার্থনার স্বরে বলিয়া থাকি,—

গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি, ত্রাহি মাং মধুসূদন।

আমি অনবরত যাতায়াত করিতেছি, চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেছি, শ্রান্তি বোধ হইতেছে বটে, তথাপি আমার বিরাম নাই। তাই তোমার শক শকাব্দা, সাল সন প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া এক একবার হাসি পায়। কিন্তু তথাপি বলি, তুমি কাল, তোমার প্রহর, দণ্ড, পল, নিমেষ, ক্ষণ প্রভৃতি আছে বলিয়াই আমার শ্রান্তি দূর করিবার অবসর হয়—একটু হাঁপ ছাড়িবার অবকাশ পাই। জানি বটে, তোমার আসা যাওয়া নাই, সৃষ্টির অপচয়-উপচয়ে তোমার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়। এই অপচয় উপচয় জন্যই ত সংসারে সুখদুঃখ, আর এই সুখদুঃখ লইয়াই জীবন-প্রবাহ। ১৩২০ সাল, তুমি এই সুখদুঃখ-পরম্পরার মধ্যে একটি ছেদ—একটা বিরাম—তোমার আগমনই সেই বিরাম বা ছেদের পরিচায়ক। সেই বিরাম বা ছেদের অবসর পাইয়া জীব একবার অতীত ও অনাগতের ভাবনা ভাবিয়া লয়। যাহা গেল, তাহা কেন গেল, কোথায় গেল? যাহা আসিতেছে, তাহা কেন আসিতেছে, কেমন রূপে আসিতেছে?

আমার সাহিত্য এই গতাগতির অভিব্যক্তিমাত্র। আমার সাহিত্য কেবল

দিকে তাকাইয়া বাঙ্গালী সাহিত্যচর্চ্চা করে। বাঙ্গালার সাহিত্য ধর্ম্মে, অধর্ম্মে, ইহ-পর-কালে সমভাবে বিন্যস্ত। এই নিরবধি কালপ্রবাহ বর্ষে বর্ষে অগ্রসর হইতেছে, আমাকে জীবন মরণের ভাবনায় ভাবিত করিতেছে,— মরণের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে বটে; কিন্তু চিরকালব্যাপী আমি, আমার মরণ ত হয় না।

মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব—
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাবো।

আজ পর্য্যন্ত দিবার লোক পাইলাম না বলিয়াই আমার মরণ হইল না। জীর্ণ-বস্ত্র-ত্যাগের মতন কত দেহ বদলাইয়াছি, কত সাজ সাজিয়াছি, এখনও কত রূপ ধরিতেছি, কত ভাবে বিভোর হইতেছি। কিন্তু ঐ এক ভাবনা—কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব! এই ভাবনাতে মরণ হইতেছে না, এই ভাবনাতে অতীতকে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছি না। জগন্নাথের রথের দড়ির টানের মত কে যেন আমাকে আমার অনন্ত অতীতের যামুন প্রবাহে ডুবাইয়া দিতেছে। কাল ও কালিন্দী ভাই ও ভগিনী। কালিন্দীর এক একটি বীচি তাহার তরল প্রবাহের এক একটি পরিচ্ছেদস্বরূপ। কালের এক একটি বর্ষ তাহার অজ্ঞেয় প্রবাহের এক একটি তরঙ্গ। যম সহোদরা যমুনার ঢেউ গণিয়া উঠা যায় না; কেন না ঐ দূরে বংশীবটমূলে কানুর বেণুর রব হইতেছে, মন যে ঠিক থাকে না। স্বয়ং যম—কালের ঢেউ এই বর্ষবিন্যাস গণিয়া শেষ করা যায় না। কি জানি কাহার আহ্বানে মাঝে মাঝে মনে পড়ে,—

কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব;—

তখন আত্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া একটা অঘটন ঘটাইয়া বসি। আর সেই অঘটন-ঘটনা হইতে আবার নূতন করিয়া বর্ষ গণনা করি। ১৩১৯ সংবৎসর একই ভাবে কাটিয়া গিয়াছে, কুড়ি সাল সেই ভস্মস্তূপে আসিয়া মিশিতেছে। গত ১৩১৯ সংবৎসর যে ভাবে দর্প দম্ভ, গর্ব্ব স্পর্দ্ধা, লজ্জা সরম, দুঃখ ক্লেশের ভস্মস্তূপ উচ্চ করিয়া শ্মশানদৃশ্যের ভীষণতা প্রকটিত করিয়াছে, হে নববর্ষ, তুমিও কি তাহাই করিবে? যদি তাহাই হয়, তবে মরণের পথে অগ্রসর হইতেছি, বলিতে হইবে। দুঃখের পদ্মবীজমালা গণিতে গণিতে মেধার অবসাদ ঘটিয়াছে, করাঙ্গুলী জড়তা লাভ করিয়াছে—আর যে পারি না। যখনই পারি না বলিয়া স্থবিরতা আইসে, তখনই মরণের আকাঙ্ক্ষা হয়। মরিতে চাই—মরণের প্রার্থনা করি, কিন্তু—

আমার শত-চাঁদ-নিঙ্গড়ান সুধামাখান শ্যামসুন্দর, আমার কোটী জন্মের আরাধনার ধন কৃষ্ণ নটবর,—যাঁহার তনুদীপ্তি নীল আকাশে, পত্রপল্লবে, নবীন কিশলয়ে, নবদূর্ব্বাদলে, নীলাম্বুতে, নীলনয়নে সর্ব্বস্বে ও সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত—সেই কানুকে কারে দিয়ে যাব? আমার কানু ছাড়া গীত নাই; কানু বিনা রস নাই; আমার শ্যামা জন্মভূমি কখনই তুষার-আস্তরণে শ্বেতাম্বর ধারণ করেন না—জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত আমার সবই কালো—মরিলে তবে আমি শাদা হই—সেই কালোকে আমি কারে দিয়ে যাব? দিবার মতন যোগ্য ব্যক্তি আজও খুঁজিয়া পাইলাম না বলিয়াই এত কাল কেবল ঢেউ গণিয়া কাল কাটাইয়াছি—জানি না, এমনই ভাবে আরও কত কাল কাটিবে।

কাজেই যখন মরণ হয় না—মরিতে পারি না, বিস্মৃতি-সাগরে চিরদিনের জন্য ডুবিয়া থাকিতে পারি না, তখন "আমারে বাঁধিয়ে রেখ তমালেরই ডালে।" ঘনকৃষ্ণ পত্রবিন্যাসে যে নিত্য শ্যাম, সেই তমাল-শাখে আমার আমিত্বকে বাঁধিয়া রাখিও। মৃতদেহ বুঝিয়া কত শকুনি গৃধিনী আসিবে, কত উৎপাত উপদ্রব করিবে, তাহার প্রতি নিমেষের তরেও দৃষ্টিপাত করিও না—আমারে বাঁধিয়া রেখো তমালেরই ডালে। সেই তমাল-ডালেই এতকাল বাঁধা আছি বটে, পরন্তু মাঝে মাঝে দানবগ্রস্ত হইয়া সে বন্ধন ছিঁড়িতে ইচ্ছা করে। সে ব্যর্থ চেষ্টার ফলে যখন যাতনায় অধীর হইয়া উঠি, তখনই অতীতের দিকে তাকাইয়া বর্ষ গণনা করিতে থাকি। তখন একে একে মনে পড়ে ১৩১৯ বর্ষের কথা—মনে পড়ে সুখ-দুঃখ, মনে পড়ে শ্লাঘা-লজ্জা, মনে পড়ে সাজ-সজ্জা। যখন অতীত অরুণোদয়ের নবানুরাগ রক্তিম হইয়া মানস-পটে সজীব হইয়া উঠে, তখন আবেগে বলিয়া উঠি,—

"ননদী, ব'লো গিয়ে নাগরে,
ডুবেছে রাই, রাজনন্দিনী,
কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে।"

সত্যই কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে ডুবিয়া আছি। সে কলঙ্ক শ্লাঘার—দর্পের—দম্ভের কলঙ্ক; সে কলঙ্ক সুখের—স্নেহের—প্রেমের কলঙ্ক; আমার—তোমার—সকলের কলঙ্ক; সে কলঙ্ক জন্মজন্মান্তরের, পিতৃপিতামহের, পুরুষ-পরম্পরার কলঙ্ক। তোমরা দশ জনে গৌরবের—মনুষ্যত্বের—বীরত্বের—জগজ্জয়ের শ্লাঘা করিয়া থাক, আমরা ফুকারিয়া কলঙ্কের গৌরব বাখানি। আমার নববর্ষ এই কৃষ্ণ-

অনপনেয় লেখায় তোমার সর্ব্বাঙ্গে সংলিপ্ত থাকিবে। সে সুখ কেমন, যে কলঙ্ক-গৌরবে বিভোর, সেই জানে! সে যে মূকাস্বাদনবৎ! কেমন করিয়া বুঝাইব, সে কেমন! বুঝান যায় না বলিয়াই এত কথা কহিতে হয়, বুঝান যায় না বলিয়াই কাঁদিতে হয়; কাঁদিতে কাঁদিতে বুক-ফাটান স্বরে গান করিতে হয়,—

"মনে পড়িল রে—
আমার সেই ব্রজভূমি।"

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

## বস্ত্র।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যেরূপ বস্ত্রালঙ্কার প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে সুবিখ্যাত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটি প্রবন্ধের রচনা করিয়া, তথ্যানুসন্ধানের পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্ব্বরতা অতিক্রম করিয়া সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিবার প্রথম উপক্রম হইতেই বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, এবং দেশভেদে ও অবস্থাভেদে বস্ত্রের উপাদান ও ব্যবহারপ্রণালী ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ইহার পরিচয় প্রদান করিবার জন্য ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

বস্ত্রের ব্যবহার মানব-সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। যে সকল আধুনিক সভ্য জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, তাঁহারা ইতিহাসের প্রমাণেই জানিতে পারেন যে, এক সময়ে তাঁহারা অশাসিত অবস্থায়, নগ্নপদে, অনাবৃতগাত্রে, আমমাংস ভক্ষণ করিয়া, বন্য পশুর মত বিচরণ করিতেন। তাঁহারা আত্ম-তুলনায় পরের উপরেও এই অবস্থার সমারোপ করিয়া, আদিম অবস্থার মানুষ-মাত্রকেই দিগম্বর বিশেষণে ভূষিত করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে সভ্যতার উন্মেষকালেই বস্ত্র-শিল্পের আবির্ভাব হইয়াছিল। সূত্রগ্রন্থসমূহ ভারত-বর্ষের আর্য্য সভ্যতার প্রধান সাক্ষী। গোভিল প্রভৃতির গৃহ্যসূত্রে সমাজের যে অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ সভ্যজাতির কার্য্যকলাপেরই পরিচয় প্রদান করে। তাহা দেখিয়া বোধ হয়, মানুষ যেন সর্ব্বতোভাবে সভ্য-ভূমিকায় সাজিয়াই সংসার-নাটকের অভিনেতৃরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং সূত্রগ্রন্থে নগ্নাবস্থার কোনরূপ নিদর্শনই পাওয়া যায় না। প্রত্যুত সেই সুপ্রাচীন

গৃহ্যসূত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় চারি প্রকার বস্ত্রব্যবহারের উপদেশ আছে। ঐ সকল বস্ত্রের নাম (১) ক্ষৌম, (২) শাণ, (৩) কার্পাস, এবং (৪) ঔর্ণ। (১)

ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষৌম অথবা শাণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কার্পাস, এবং বৈশ্যের আবিক বা ঔর্ণ। (২) অর্ব্বাচীন সাহিত্যেও চারি শ্রেণীর বস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন ;—

ক্ষৌম-কার্পাস-কৌশেয়-রাঙ্কবাদিবিভেদতঃ।

তাঁহার মতে,—ত্বক্, ফল, কৃমি ও রোম, এই চারি প্রকার উপাদান হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়াই বস্ত্র চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

ত্বক্-ফল-কৃমি-রোমভ্যঃ সম্ভবত্বাচ্চতুর্ব্বিধম্।

অতসী প্রভৃতি গুল্ম-জাতীয় গাছের ছাল হইতে সূতা সংগ্রহ করিয়া যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহার নাম "ক্ষৌম"। সম্ভবতঃ এই বস্ত্র পূর্ব্বকালে কেবল "ক্ষুমা" বা অতসী হইতেই উৎপন্ন হইত বলিয়া "ক্ষৌম" নাম লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে পাট ও শোণ প্রভৃতি হইতে যে কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহাও এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। এই ক্ষৌম বস্ত্র যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় "অংশুপট্ট" নামে অভিহিত হইয়াছে। (৩) এই "অংশুপট্ট" শব্দের অর্থ কি, তাহা মিতাক্ষরায় কথিত হইয়াছে। (৪) ক্ষৌম বস্ত্রের অপর নাম "দুকূল", বা "দুগূল"। (৫) শণ-সূতার কাপড়ও ত্বক্ হইতে সমুৎপন্ন। কিন্তু গোভিলের সময়ে তাহা স্বতন্ত্র নামেই পরিচিত ছিল ; "অংশুপট্ট" বা "ক্ষৌম" সংজ্ঞা লাভ করে নাই।

মহর্ষি মনুও গোভিলের অনুসরণ করিয়াছেন। যথা,—

শাণ-ক্ষৌমাবিকানি চ।—মনু ; ১০।৮৭

কৌশেয় বা কৌশিক বস্ত্র, ( রেশমের কাপড় ) "পট্টবস্ত্র" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন,—

কৌশিকং কোশ-প্রভবং তসরীপট্টাদি।

(১) ক্ষৌম-শাণ-কার্পাসৌর্ণান্যেষাং বসনানি ॥—২ প্র। ১০ খ। ৮ সূ।

(২) ক্ষৌমং শাণং বা বসনং ব্রাহ্মণস্য কার্পাসং ক্ষত্রিয়স্য আবিকং বৈশ্যস্য ॥ ২।১০।১৩

(৩) স শ্রীফলৈরংশুপট্টম্ ॥ ১।১১।৬

(৪) অংশুপটং বল্কল-তন্তুকৃতম্ ॥

দেবল ঋষির মতে, বস্ত্রের ছয় প্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মতে, যেন পট্ট ও কৌশেয় স্বতন্ত্র পদার্থ। যথা,—

ঊর্ণা-কৌশেয়-কুতপ-পট্ট-ক্ষৌম-দুকূলজাঃ।

মেষের লোম হইতে প্রস্তুত বস্ত্রের নাম "ঔর্ণ" বা "আবিক"। কাপাসের তুলা হইতে প্রস্তুত বস্ত্রের নাম "কার্পাস" বা "বাদর"।

স্যাৎ কার্পাসস্তু বাদরম্।—হেমচন্দ্র।

শণ সূতার বস্ত্রকে ক্ষৌমের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইলে, কার্পাস, ক্ষৌম, কৌশেয়, আবিক ও রাঙ্কব (মৃগরোম-জাত), মোটামুটি এই পাঁচ প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার বস্ত্র "কুতপ" নাম অভিহিত হইত। বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন,—

কুতপঃ পার্ব্বতীয়চ্ছাগ-রোম-নির্ম্মিতঃ কম্বলঃ।

রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্ত মহোদয়দিগের মতে, নেপালদেশীয় কম্বলের নামই "কুতপ"। এক সময়ে নেপাল দেশ কম্বলের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল; অন্যান্য প্রদেশের লোক নেপালে গেলেই, দুই একখানা কম্বল লইয়া আসিত; সেই কম্বল দেখিয়া, কম্বল-ধারীকে নেপাল হইতে নবাগত বলিয়া অনুমান করা হইত। গৌতম-সূত্রের বাৎস্যায়ন-ভাষ্যে এই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। বিতণ্ডা-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে;—

নেপালাদাগতোঽয়ং নবকম্বলত্বাৎ।

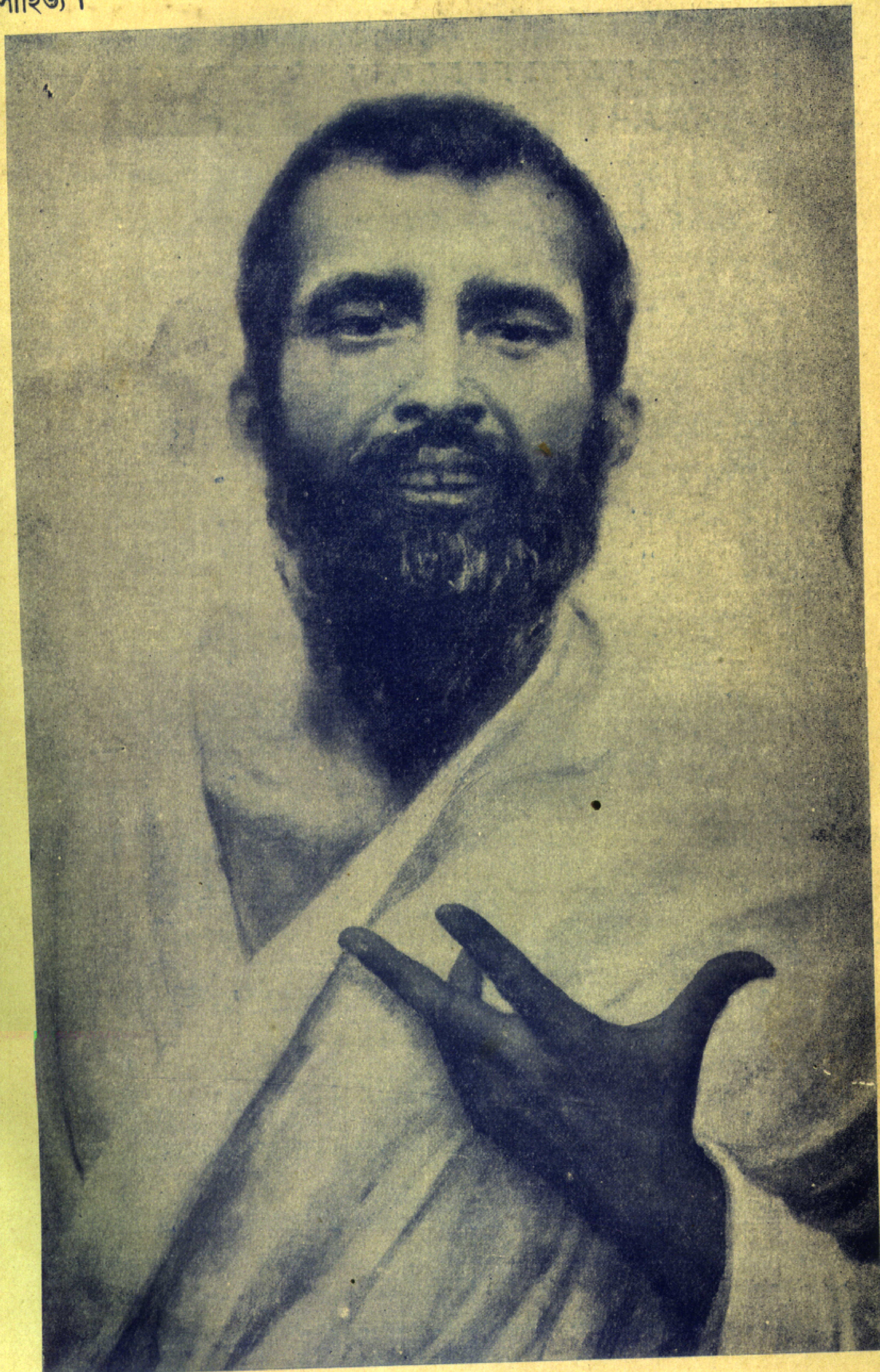
যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা প্রভৃতি বিবিধ স্মৃতিগ্রন্থেই "কুতপে"র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

অতি পূর্ব্বকালে ক্ষৌম ও কৌশেয় বস্ত্র ভদ্রসমাজে বিশেষরূপে সমাদৃত হইত। রামায়ণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কৌশল্যা প্রভৃতি রাজ্ঞী ও অন্যান্য রাজমহিলাগণ ক্ষৌম বস্ত্রে সুসজ্জিতা হইয়া, নবোঢ়া সীতা প্রভৃতি বধূবর্গকে মঙ্গলালাপে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। (৬)

রামচন্দ্রের অনুসন্ধানে ভরত ইঙ্গুদী-পাদপ-মূলে উপস্থিত হইয়া, বৃক্ষশাখালগ্ন কৌশেয়-তন্তু-দর্শনে সীতাদেবীর উত্তরীয় বসনের অনুমান করিয়াছিলেন। (৭)

(৬) কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ সুমধ্যমা।
কুশধ্বজসুতে চোভে জগৃহুর্নৃপযোষিতঃ।
মঙ্গলালাপনৈর্হোমৈঃ শোভিতাঃ ক্ষৌম-বাসসঃ॥—বালকাণ্ড। ৭৭।১০

(৭) উত্তরীয়মিহাসক্তং সুব্যক্তং সীতয়া তদা।



শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণ

Mohila Press, Cal.



শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণ।

Mohila Press, Cal.

ব্যাসদেবের লেখনীও ভদ্রমহিলার ক্ষৌমবস্ত্র-বর্ণনে উদাসীন নহে।

কৃষ্ণা চ ক্ষৌম-সংবীতা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।

মধ্যযুগের সাহিত্যেও ক্ষৌম-বসনের অপ্রতিহত গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস তপোবন-লালিতা শকুন্তলার জন্য বৃক্ষ হইতে মহর্ষির তপঃপ্রভাবসম্ভূত মাঙ্গল্য ক্ষৌম-বসনের আমদানী করিয়া গিয়াছেন।

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডুতরুণামাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতম্।

অর্ব্বাচীন সাহিত্যে পট্টবস্ত্রের প্রতি সমাদরের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে এই বিষয়ে কয়টি উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে।

(১) পাটের সাড়ী কর্য্যাছ পরিধান চলিতে নূপুর বাজে।

(২) নৈবেদ্য বিবিধরূপ, গন্ধপুষ্প দীপ ধূপ, পট্টবস্ত্র নানা অলঙ্কার।

(৩) পাট-নেত বাস পর, গলে রত্নমালা।

থানের মত কাপড়ে স্বতন্ত্র পাইড় লাগাইয়া "নেতের শাড়ী" প্রস্তুত হইত। এই "নেতের শাড়ী" এক সময়ে বাঙ্গালায় বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি কাব্যই এই বিষয়ে প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য।

পাইয়া ইমামবাড়ী, বুনে নেত পাট শাড়ী।

কি পুরাতন যুগে, কি মধ্য যুগে, সর্ব্বত্রই সাহিত্যে বস্ত্রশিল্পের সূক্ষ্মতার সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুসংহিতায় বর্ণিত পৃথিবীর পরিহিত বসনে "সুসূক্ষ্ম" বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।

সুসূক্ষ্ম-শুক্লবসনাং রত্নোত্তমবিভূষণাম্।

আর্য্যদিগের পরিধেয় এক প্রকার বস্ত্র "আহত" নামে পরিচিত ও পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। সংস্কারতত্ত্ব-ধৃত মৎস্যপুরাণে এই "আহত" বস্ত্রেও সূক্ষ্ম বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

ঈষদ্ধৌতং নবং শুভ্রং সদশং যন্নধারিতম্।
আহতং তদ্বিজানীয়াৎ সর্ব্বকর্ম্মসু পাবনম্॥

এই স্থলে রঘুনন্দন "ঈষৎ" শব্দের "সূক্ষ্ম" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পাণিনির কাশিকা বৃত্তিতে "কুশাগ্রীয়ং বস্ত্রম্" এইরূপ সূক্ষ্মতাজ্ঞাপক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কাদম্বরীতে রাজার পরিহিত সূক্ষ্মতম বস্ত্রদ্বয় সর্পকঞ্চুকের সহিত তুলিত হইয়াছে। যথা,—

এবঞ্চ ক্রমেণ নির্ব্বর্ত্তিতাভিষেকো বিষধরনির্ম্মোকপরিলঘুনী ধবলে পরিধায় বাসসী।

শিশুপালবধে বর্ণিত মহিলাবৃন্দের পরিহিত বস্ত্র সূক্ষ্মতার মাত্রা অতিক্রম

করিয়া, কুরুচির পরিচয়প্রদর্শনপূর্ব্বক, একেবারে আকাশের সাম্য ধারণ করিয়াছে। যথা,—

"ছন্নেষ্বপি স্পষ্টতরেষু যত্র স্বচ্ছাণি নারীকুচমণ্ডলেষু।
আকাশ-সাম্যং দধুরম্বরানি ন নামতঃ কেবলমর্থতোঽপি॥

এই মধ্যযুগের সাহিত্যেই "চীনাংশুকে"র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, ঐ সময়ে চীনদেশ বস্ত্র-শিল্পের নৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল; এবং ভারতবর্ষে সেই চীনাংশুক সুপরিচিত ও সমাদৃত হইয়াছিল। (৮)

তন্ত্র-সাহিত্যেও "চীনাংশুকে"র পরিচয় পাওয়া যায়। বীরভাবাপন্ন ও দিব্য-ভাবাপন্ন সাধকগণ যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তুর উপভোগের অধিকারী, পশুগণ তাহাতে সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত। সুতরাং "চীনাংশুক" পশ্বাচারী সাধকের পক্ষে অপরিধেয়। (৯)

বর্ত্তমান যুগে যেমন পুরুষমহলে শুক্লবস্ত্রের একাধিপত্য, পূর্ব্বকালে তেমন ছিল না। স্ব স্ব রুচি অনুসারে পুরুষগণও নানা রঙ্গের কাপড় পরিধান করিতেন। মহাভারতে এই বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। অর্জ্জুনের সম্মোহনবাণে দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ সংজ্ঞা-বিহীন হইয়া যে সময়ে কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিত হইয়াছিলেন, তখন উত্তরার বাক্য স্মরণ করিয়া, অর্জ্জুন দ্রুপদপুত্রকে আদেশ করিয়াছিলেন—"হে নরপ্রবীর! তুমি আচার্য্য ও শারদ্বতের শুক্লবর্ণ, কর্ণের পীতবর্ণ, অশ্বত্থামা ও রাজার নীলবর্ণ বস্ত্র গ্রহণ কর।" (১০)

কাপড়ের এই সমস্ত রঙ্গ বিবিধ পুষ্প ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা সম্পাদিত হইত। (১১) উপাদানগত পার্থক্য অনুসারে রং-করা কাপড়ের শুদ্ধিবিধানের তারতম্য দেখা যায়।

দেবলের মতে,—তুলিকা, বালিশ ও "পুষ্পরক্ত" বস্ত্র সূর্য্যাতপে কিঞ্চিৎ

---

(৮) বিমল-চীনাংশুকান্তরিতামিব॥—কাদম্বরী।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

(৯) গন্ধমাল্যানি বস্ত্রানি চীনানি প্রত্যজেন্ন হি।—কামাখ্যাতন্ত্র; ৫ পটল।

(১০) বিরাট পর্ব্ব। ৬৬।১৩।

(১১) তেন রক্তাং রাগাৎ।
কষায়েণ রক্তং বস্ত্রং কাষায়ম্। মাঞ্জিষ্ঠম্। ৪।২।১।

শুষ্ক করিয়া, হস্তের দ্বারা পুনঃপুনঃ মর্দ্দন করিলেই শুদ্ধ হয়। (১২) বিজ্ঞানেশ্বর "পুষ্পরক্ত" শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—

পুষ্পরক্তানি কুঙ্কুম-কুসুম্ভাদি-রক্তানি।

কেহ কেহ নিয়ত এক রঙ্গের কাপড় পরিধান করিতেন বলিয়া, তত্তৎ রঙ্গের নামানুসারে তাঁহাদিগের নাম প্রসিদ্ধ হইত। ইহার উদাহরণস্থলে নীলাম্বর ও পীতাম্বর নামে সুপরিচিত রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে পরিধানে ও প্রাবরণে শুক্লবস্ত্রই প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। শুক্লবস্ত্রের অভাবে পট্টবস্ত্রের ব্যবস্থা। (১৩) যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মতেও ধৌতবস্ত্রের অভাবে শাণ, ক্ষৌম ও আবিক বস্ত্র পরিধেয়। (১৪) কবিকঙ্কণের সময়ে তসরের আদর বাড়িয়াছিল। গুজরাটের সমৃদ্ধিবর্ণনে তিনি তসর-পরিধান জাঁকজমকের লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

চন্দনে চর্চ্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু,
তসর বসন পরিধান।

বর্ত্তমান যুগেও তসর গরদের পরিধান পবিত্রতা-মিশ্রিত গৌরবের পরিচায়ক বলিয়া সমাজে বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, ধৌত কার্পাস বস্ত্র থাকিতে "তসর"-পরিধান পরিত্যাজ্য; কেবল প্রাবরণে ( উড়নী রূপে ব্যবহারে ) প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। আশ্বলায়নের সময়ে এই শব্দের ত-কারে র-ফলা ছিল। বোধ হয়, ক্রমে ক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইয়া "তসর" হইয়াছে। এই তসরের-ব্যবহারে বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচার দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই পবিত্র মনে করিয়া তসর পরিয়া আহার করিয়া থাকেন, এবং সেই পরিহিত "তসর" অধৌত অবস্থায় সময়ান্তরেও ব্যবহার করেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধান ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। শাস্ত্রানুসারে "তসর" পরিধান করিয়া ভোজন অথবা মলত্যাগ করিলে, সেই তসর ধৌত করিয়া শুদ্ধ করিতে হয়। (১৫) সাধারণতঃ পরিধেয় বস্ত্র "দশাযুক্ত" অর্থাৎ অগ্রভাগে "ছিলা"-সংযুক্ত

(১২) তুলিকামুপধানং চ পুষ্পরক্তাম্বরানি চ।
শোষয়িত্বাতপে কিঞ্চিৎ করৈঃ সম্মার্জয়েন্মুহুঃ॥—মিতাক্ষরা।

(১৩) পরিধানে সিতং শস্তং বাসঃ প্রাবরণে তথা।
পট্টকূলং তথালাভে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে॥—লঘ্বাশ্বলায়ন-স্মৃতি। ২৮

(১৪) অভাবে ধৌতবস্ত্রানাং শাণ-ক্ষৌমাবিকানি চ।

(১৫) আবিকং ত্রসরঞ্চৈব পরিধানে পরিত্যজেৎ।
শস্তং প্রাবরণে প্রোক্তং স্পর্শদোষো ন বিদ্যতে।
ভোজনঞ্চ মলোৎসর্গং কুর্ব্বতে ত্রসরাবৃতাঃ

হইত; দশা-রহিত অর্থাৎ থান কাপড় আর্য্যদিগের অপরিধেয় বলিয়া গণ্য হইত। দশাযুক্ত বস্ত্রের অভাবে, অগত্যা থানের কাপড় ব্যবহৃত হইত। পুরাণে ও স্মৃতিতে এই বিষয়ের প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। (১৬) বর্ত্তমান সময়ে কাপড়ের পাইড়ে গান বা কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাস বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সুরসুন্দরীদিগের কল্পলতা-প্রসূত বস্ত্রে দুষ্মন্তের চরিত্র গীতাকারে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। (১৭)

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

---

# এপ্রেল-'ফুল'।

১

রামহরি বসু সহধর্ম্মিণীর অকালমৃত্যুশোকে অধীর হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় অনুভব করিতে লাগিলেন। পুত্রকলত্রবিহীন সংসারে সকলেই ঘোর নিরানন্দে পূর্ণ। ঐশ্বর্য্য কণ্টকের ন্যায় বিঁধিল। আহার বিষবৎ বোধ হইল। আত্মীয় স্বজনের আশ্বাসবাণী শেলসম পীড়াদায়ক হইয়া পড়িল।

বিশেষ দুঃখের কথা এই যে, বসুজা প্রণয়-বীজ-বপনের কল্পনামাত্র করিতেছিলেন, এই দুর্ঘটনা। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ হয়। দুই বৎসর স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তখন সে নিতান্ত বালিকা। শেষ তিন বৎসর, বিষয় আশয়ের গোলমালে ও মামলা মোকদ্দমার জঞ্জালে প্রণয়-সঞ্চারের সুযোগ হয় নাই। ইহাই ভয়ানক আক্ষেপের বিষয়; কারণ, আশা পরিপূর্ণ হইবার সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত, অথচ সকলই মরীচিকাবৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অনেক পাত্রী বাছিয়া সেই সাধের বিবাহ! অনেক টাকা খরচ করিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া সেই কন্যার অনুসন্ধান! এখন সে ভব-নদীর পার।

জাগ্রতে, স্বপ্নে, রামহরি তাহাই ভাবিতেন। তাহার আর দেখা পাইবার যো নাই। যদি মরিলেও তাহার দেখা পাইতেন, তবে মরিতেন। কিন্তু এ

---

(১৬) মলাক্তঞ্চ দশাহীনং বর্জ্জয়েদম্বরং বুধঃ।—নরসিংহ পুরাণ।
দশাহীনেন বস্ত্রেণ কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যভাবতঃ।—আচাররত্নে উশনা।

(১৭) বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ সুরসুন্দরীণাং বর্ণৈরমী কল্পলতাংশুকেষু।
সঞ্চিন্ত্য গীতিক্ষমমর্থবন্ধং দিবৌকসস্তচ্চরিতং লিখন্তি॥—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

সম্বন্ধে সঠিক প্রমাণ কেহ দিতে পারিল না। বিনা প্রমাণে রামহরি বসু কোনও কথা বিশ্বাস করিবার লোক নহেন। জগতে তাঁহার ন্যায় সন্দিগ্ধচিত্ত লোক অতি বিরল।

কারণ, স্ত্রী-বিয়োগের সময় রামহরি বাবু তিন জন বিজ্ঞ ডাক্তারকে ডাকিয়া নাড়ী পরীক্ষা করাইয়াছিলেন। অবশেষে মৃত্যু নিশ্চিত ধার্য্য হইলে পর, তাঁহার হৃদয়ে শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছিল।

অন্য একটি মহাদুঃখের কথা। স্ত্রীর 'ফটো' ছিল না। সমগ্র মুখমণ্ডল স্মৃতিপটে উদয় হওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িল। সেই অপ্সরার মত সুন্দর মুখশ্রী, যাহা দেখিলে সংসার স্বর্গ বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে মুখশ্রী বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইয়া গেল, ইহা কি সামান্য ক্ষোভের বিষয়?

অতএব উপায়বিহীন রামহরি বেয়াকুফের ন্যায় বৈঠকখানায় বসিয়া গোঁফে তা দিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে—

'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
(তাহা) অনলে পুড়িয়া গেল'—

গানটি গুন্ গুন্ স্বরে অরুণোদয়ে গাহিতে শুনিয়াছিল। এমন কি, মধ্যে হঠাৎ মৎস্যমাংস ছাড়িয়া গেরুয়া বসন পরিধান করিবেন, এমন প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু পাছে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে আদালতে উপস্থিত হইয়া বাকী খাজ্‌নার মাম্‌লা প্রভৃতির তদ্বির করিতে অশক্ত হন, সেই সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে প্রস্তাবটি এক বৎসর মুলতুবী রাখিয়াছিলেন।

পাড়ার যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় রামহরির প্রিয়পাত্র। যদুর বয়স প্রায় ত্রিশ, এবং রামহরি অপেক্ষা সে দুই বৎসরের বড়। যদুর বৃহৎ পরিবার, এবং কেরাণী-গিরি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়; সুতরাং রামহরি বাবুর মন যোগাইয়া সে নানাবিধ উপায়ে দুই পয়সা রোজগার করিত। রামহরির স্ত্রীর জন্য গহনা গড়াইয়া, জ্যাকেট কিনিয়া, খেলনা-সামগ্রী আনিয়া, সস্তা দরের উপন্যাস কিনিয়া, এমন কি, সুযোগ পাইলে ঘটি ও বাটিটা চুরি করিয়া তাহার যাহা লাভ হইত, তাহাতেই সংসার চলিয়া যাইত। হঠাৎ আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়া যাওয়াতে তাহার পরিবারবর্গ মহাদুঃখিতচিত্তে প্রতিবাসী ও আত্মীয়বর্গের সহিত মন্ত্রণার্থ সমবেত হইল।

সকলেরই মত হইল, রামহরির অন্য একটি বিবাহ না দিলে তাহাদিগের দিন

( ২ )

কিন্তু কথা উত্থাপন করে কাহার সাধ্য? সুচতুর যদু চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, 'সে ভার আমার।'

রামহরি প্রভাতবায়ু সেবন করিতেছেন, এমন সময় যদু তাঁহার নিকট উপস্থিত। যদুর চোখে জল আসিল, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। রামহরি ভাবিলেন, 'যা হো'ক একটা লোক আমার দুঃখে দুঃখী।'

রামহরি। যদু, শোক নিষ্ফল। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা হইয়াছে। এখন মরণের অপেক্ষা করিতেছি। তোমার কোনও আশঙ্কা নাই। উইলে তোমার পরিবারবর্গের জন্য যথেষ্ট রাখিয়া যাইব।

যদুর শোক এবার ধ্বনি আশ্রয় করিয়া মুখ দিয়া বাহির হইল। সে রকম কান্না কেহ পুত্রশোকেও কাঁদে না। বিশেষতঃ, গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্মপ্রযুক্ত শরীরের জলভাগ চর্ম্ম দিয়া বাহির হইয়া গেলে চক্ষুর দিকে ভয়ানক অভাব হয়। তাহা সত্ত্বেও যদু কি করিয়া কাঁদিল, তাহা বিজ্ঞানও বলিতে অসমর্থ। এটা যে সহৃদয়তার মস্ত প্রমাণ, তাহা রামহরি বুঝিলেন, এবং লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 'থাম, থাম।'

রামহরি। পাড়ার নূতন খবর কি?

যদু। তাহা তোমার শুনিয়া কাজ নাই।

রামহরি নিশ্চয় বুঝিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধেই কথা। কাজেই তাঁহার সন্দেহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। ক্রমে যদুর ঘোর মৌনাবলম্বন আহুতিস্বরূপ সেই সন্দেহাগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল।

'যদু! তুমি ত আমার নিকট কোনও কথা কখনও লুকাও না; কিন্তু এবার এ প্রকার ভাব কেন? কেহ আমার কোনও প্রকার কুৎসা করে নাই ত?'

যদু। দেখ রাম! তোমার কুৎসা করিলে আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম, কিন্তু এ ভয়ানক কুৎসা, বীভৎস হৃদয়বিদারক কুৎসা! সতীর নিন্দা, দেবীর নিন্দা। যে স্বর্গস্থা, যাহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া, যাহার লক্ষ্মীশ্রীর অন্তরালে অবস্থিত হইয়া আমরা সংসার ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সেই রমণীরত্নের কুৎসা।

রামহরি অতিশয় ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বল ত?'

তখন যদু সুযোগ পাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, একদিন তাহার স্ত্রী রামহরির স্ত্রীকে নরেনের দিকে তাকাইয়া হাসিতে দেখিয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক সেটা দোষের কথা নয়; কারণ, নরেন কাণা, তাহার এক চক্ষু নাই। তথাপি কেহ

কেহ বলে, অন্য এক দিন নরেনও হাসিয়াছিল, এবং তাহা দেখিয়া রামহরির স্ত্রীও হাসিয়াছিল। রামহরির পদতলের নিম্নে বসুন্ধরা চক্রবৎ ঘুরিতে লাগিল। কি লজ্জার কথা, কি ক্ষোভের কথা, কি দুঃখের কথা!

'আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছিলাম,—বৈশ্বাসং নব কর্ত্তব্যম্। যদু! পুরুষদিগের কর্ত্তব্য স্ত্রীদিগের চরিত্র-সংশোধন, এবং তজ্জন্য আজন্ম প্রাণ-পণে চেষ্টা। আমার এই মহাকর্ত্তব্য জীবনে পালন করা হইল না, ইহাই দুঃখ।'

যদু। যখন তোমার ব্রতই এই, তখন আর একটা বিবাহ করিয়া কর্ত্তব্য পালন কর না কেন? তোমার ন্যায় সুপুরুষ, বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক সমাজে বিরল, এটা বোধ হয় তোষামোদের কথা নয়। আমাদের জীবনের বারবেলা উপস্থিত, তোমার প্রভাত এখনও সম্মুখে।

রাম। কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু আমি প্রবন্ধাদি লিখিয়া ও ধর্ম্মগ্রন্থাদির টীকা করিয়া কালযাপন করিব, মনে করিয়াছিলাম। আপাততঃ দর্শন শাস্ত্রগুলি পাঠ করিতেছি।

যদু। উপদেশ, বিশেষতঃ লিখিত উপদেশ, কার্য্যকর হয় না। কর্ম্মস্থলে কর্ম্মই ধর্ম্ম ও নীতিরক্ষার প্রধান উপায়। তোমার বয়ঃক্রম মোটে বিশ পঁচিশ মাত্র। সংসারধর্ম্ম পালন করিবার এই সময়।

যদুর উপদেশ রাম গ্রহণ করিলেন। রামহরি বসু মহাসম্ভ্রান্ত ধনী কায়স্থ। দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারে মনোনিবেশ করিলেন।

৩

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হেমলতা গৃহে স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিতা হইলে পর একদিন রামহরি মনের কথা বলিতে বসিল।

'দেখ, হেমলতা! তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, অনেক ভাল বহি ও মন্দ বহি পড়িয়াছ, প্রণয় কি তাহা জান। সেই প্রণয় আমি এখনও আস্বাদন করিতে পারি নাই, এবং তাহার আকাঙ্ক্ষাও করি না। তবে তুমি সুচরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া গৃহলক্ষ্মীরূপে সংসার আলোকিত করিবে, ইহাই সকলের ইচ্ছা।'

হেমলতা। তুমি দুইবার বিবাহ করিয়া যে প্রেমের আস্বাদ পাও নাই, আমি বহি পড়িয়া তাহার কি বুঝিব? শুনিয়াছি, স্বামী ভালবাসিলেই স্ত্রী ভালবাসিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের। প্রথমতঃ স্ত্রী ভালবাসিবে, এবং তাহার সঠিক প্রমাণ পাইলে স্বামী তাহার প্রতিদান করিবে। আইন ইহার সাক্ষী। বাদীকে প্রথমে প্রমাণ দিতে হয়। স্ত্রী বাদিনী, স্বামী প্রতিবাদী। তবে তুমি যে আমাকে ফাঁকি দাও নাই, সে জন্য আমি খুসী। তুমি যদি বলিতে,—নাথ, আমি তোমাকে ভালবাসি, তবে আমি তাহা বিশ্বাস করিতাম না।

হেমলতা। ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েছেলে আজকাল অমন কথা মুখে আনে না। উহা উপন্যাসের কথা। তবে আমিও খুসী ; কারণ, তুমি ভালবাসার ভান কর নাই। পৃথিবীর মধ্যে যদি কোনও ঘৃণাজনক ব্যাপার থাকে, তবে ভালবাসার ভান তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। দায়ের সম্বন্ধে আমি ইহা স্বীকার করি না যে, স্ত্রীলোকেরই ভালবাসার সূত্রপাত করা কর্ত্তব্য ; কারণ, পুরুষেরাই যত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপারের মূল। কিন্তু এ কথা লইয়া বিবাদ করিবার দরকার নাই। তোমার বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিও। আর একটা কথা, তোমার আত্মীয়বর্গকে বাড়ীতে স্থান দাও না কেন ?

রামহরি। তাহারা কলহের মূল। চুরী করে।

হেমলতা। হয় ত তোমার পরমবন্ধুই চুরী করে। তজ্জন্য একটা সৃষ্টিছাড়া নির্জ্জনতা ঘরে ব্যাপ্ত করা বুদ্ধির কাজ নয়। আমি চারি বৎসর ধরিয়া কেবল দিন রাত্রি পুঁথি লইয়া খাটিয়াছি। শরীরে বল নাই। এখন কিঞ্চিৎ বিশ্রাম আবশ্যক। আমি এবার ইণ্টারমিডিয়েট বিজ্ঞান পরীক্ষা দিতাম, কিন্তু শরীর ভাল নহে বলিয়াই বিবাহ করিয়াছি। মরণের ইচ্ছা নহিলে কেহ বিবাহ করে না, তাহা বোধ হয় জান।

রামহরি কিঞ্চিৎ ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, 'ঠিক তাই। এখন কাহাকে লইয়া আসি ?'

হেমলতা। আমার ছোট বোন প্রমীলাকে আন। সে থার্ড ক্লাসে পড়ে। আমি তাহার পড়া দেখিব। তোমার রাঙ্গা মাসীমাকে লইয়া আইস। তিনি প্রবীণা বিধবা। সুন্দর রাঁধিতে পারে না। আমি তাঁহার নিকট রন্ধন শিখিব। আমার জীবনে দুইটিমাত্র সাধ। প্রথমতঃ, বিধবাদিগের একটি মহামণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা, এবং বিলাতী ও স্বদেশী রন্ধনের একটা সামঞ্জস্য-বিধান।

রামহরি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, দুইটি উদ্দেশ্যই মহান্। বাস্তবিক, বিধবাগণের জীবনব্যাপী দুঃখ, এবং স্বদেশী অন্ন ব্যঞ্জনের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অভাব, উভয়ই দারুণ দুশ্চিন্তার বিষয়।

হেমলতা বুঝাইয়া বলিলেন, 'যে প্রকার দুঃসময় উপস্থিত, হতভাগিনী রমণীগণের বৈধব্যের সম্ভাবনাই অধিক ; এবং পুরুষবর্গের মুখরোচক আহার না জুটিলে তাহারা শীঘ্রই জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে। কি উপন্যাসে, কি কবিতায়, কি কথোপকথনে, আমাদের দেশে খানিকটা বিদেশের সঞ্জীবনী শক্তি সকলেই লইতেছে। তুমি গোরা পড়িয়াছ ?'

রামহরি। না।

হেমলতা। পড়িও। অমন বই এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। ভবিষ্যতে আমাদের দেশে কি রকম মানুষ হইবে, তাহার আভাস ঐ পুস্তকে বেশ পাওয়া যায়।

রামহরি। সকলেই বিধবা হইবে ?

হেমলতা। ঈশ্বর তাহা না করুন, কিন্তু যদি হয়, তাহার একটা উপায় এখন হইতে করা উচিত। বিজ্ঞানের মতে, কোনও ব্যাধির প্রতীকার করিতে হইলে তাহার "টীকা" লইতে হয়। যেমন গোবীজ বসন্তের "টীকা"। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া "বৈধব্যের টীকা" আবিষ্কার করিয়াছি।

৪

হেমলতার অসীম বিজ্ঞানব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে রামহরির কোনও সন্দেহ রহিল না। তিনি সাহ্লাদে কহিলেন, 'যদু ! এমন স্ত্রী কপালে জুটিয়া উঠা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির উপর নির্ভর করে। সে অন্তরের সহিত আমাকে ভালবাসে, নচেৎ "বৈধব্যের টীকা" লইবার জন্য এত ব্যগ্রতা কেন ?'

যদু। নিশ্চয়। কেবল নরেনকে সাবধান। নরেন এক জন প্রবঞ্চক, কোনও প্রকারে ভুলাইয়া প্রতিবাসিনী রমণীদের নিকট হইতে পয়সা কড়ি সংগ্রহ করে। তাহার স্ত্রী বিধবা, সুতরাং খুব সম্ভবতঃ এই মহামণ্ডলীতে যোগদান করিবে।

রামহরি। ( বিস্মিতভাবে ) নরেন বাঁচিয়া থাকিতেও তাহার স্ত্রী বিধবা ?

যদু। অর্থাৎ, নরেনের স্ত্রী পূর্ব্বে বিধবা ছিল, এবং এখন সধবা। তাহার ন্যায় সুন্দরী এ পাড়ায় কেন, কোনও দেশে আছে কি না সন্দেহ। নরেন উপন্যাস লেখে, এবং সে কবিতা লেখে। মাথামুণ্ড লিখিয়া উভয়ে খুব পসার করিয়াছে ; মাসে শত শত টাকা সঞ্চয় করিতেছে।

রামহরি যদুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া হেমলতার নিকটে গেলেন।

লোক আছে, সে কবিতা লেখে। লোকটা বদ্‌, এবং স্ত্রীলোক দেখিলেই হাসে। সাবধান।'

হেমলতা। তবে তাহার স্ত্রী বোধ হয় পুরুষ দেখিলেই কাঁদে। তোমার উচিত, পূর্ব্বে তাহার তদন্ত করা। কোনও পুরুষ দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া যদি বিধবা ঘরে আনে, তবে তাহার হাসাই স্বাভাবিক। এবং বিধবা স্ত্রী যদি পুনরায় বিবাহ করে, তবে তাহার কাঁদাই স্বাভাবিক। এটা বিজ্ঞানসম্মত। বোধ হয়, তুমি পূর্ব্বে জানিতে না।

রামহরি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে কথাটা নূতন। তিনি বলিলেন, 'না।'

কোথা হইতে রামহরির মনের মধ্যে একটা ব্যথা লাগিল। নরেনের যদি তাহাই স্বভাব হয়, তবে হয় ত সে-ই হাসি দেখিয়া হাসিয়াছিল। 'সে' কে? পূর্ব্বপক্ষের স্ত্রী। হয় ত নরেনের হাসির অর্থ,—তোমার স্বামী একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার। কিন্তু তাহাও কি একটা চরিত্রগত দোষ নহে, এবং তাহার জন্য কি উভয়েই দোষী নহে?

সেদিন প্রমীলা (তাঁহার শ্যালিকা) আসিল; রাঙ্গা মাসীমা বৃন্দাবনী নামাবলী ধারণ করিয়া আসিলেন। হেমলতার যশ পাড়ায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। অনেক স্ত্রীলোক আসিল। নরেনের স্ত্রী নলিনী আসিল। নলিনী সুন্দর কট্‌লেট ভাজিতে পারে, পুডিং তৈয়ারী করিতে পারে, এবং পার্শী, মাদ্রাজী, বোম্বাই ও কাশ্মিরী, নানাদেশীয় খাদ্যাদি রন্ধন করিতে পারে। মাসীমা লাউঘণ্ট, ধোঁকার ডালনা, মোলায়েম রুটী লুচী ও বত্রিশপ্রকার ব্যঞ্জনাদি (চাঁদ সওদাগরের ইতিহাসে উক্ত) রাঁধিতে সুপটু। বসুজার গৃহ একটা বিরাট রন্ধনশালায় পরিণত হইল। অগাধ ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যয় আরম্ভ হইল। সারি সারি সুন্দর জলখাবার, নানাবিধ সরস ও অদ্ভুত খাদ্য, রাশি রাশি প্রস্তুত হইয়া পুরাতন নির্জ্জন গৃহের শোভাসংবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

বিধবাগণ এক দিকে নিরামিষ, এবং সধবাগণ অন্য দিকে আমিষাদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত। বাহবাধ্বনি অবিরত নিনাদিত। নরেনের স্ত্রী বস্ত্রাবৃত রেকাবীগুলি নানাবিধ খাদ্যে পরিপূর্ণ করিয়া ক্রমান্বয়ে গৃহের দিকে (খিড়কীর দ্বার পার করিয়া) সরাইতে লাগিল।

হেমলতা গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজিতা। বিধবা সধবাগণের আশীর্ব্বাদে প্রদীপ্তা। এক মাস ধরিয়া বসুজা মহাশয়ের বাড়ীতে পাড়ার লোকের একবেলার

কেবলমাত্র যদু ও তাহার স্ত্রীর নিরানন্দ। কারণ, হেমলতার সহিত তাহাদের চালাকী চলিত না। বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের ভার নরেনের স্ত্রীর উপর। রামহরি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাবপত্রের ফর্দ্দ পরীক্ষা করিয়া এবং বাজার দর যাচিয়া তাহার কোনও দোষ ধরিতে পারিলেন না।

যদুর স্ত্রী ক্ষেমঙ্করী ইহাতে জ্বলিয়া উঠিল।

'আমার বোধ হয় নরেনের স্ত্রী রামহরিকে গুণ করিয়াছে।'

যদু। কিংবা নরেন আমার উপর টেক্কা দিয়াছে! আচ্ছা, ইহার প্রতিশোধ লইব।

৫

নরেনের স্ত্রী নলিনী এখন হেমলতার 'সই'। 'বিধবা-মহামণ্ডলী' নামক সভার সেক্রেটারী নলিনী, এবং প্রেসিডেণ্ট রাঙ্গা মাসীমা। তাহারই ব্রাঞ্চ (শাখা) 'বৈধব্য-টীকা ইনস্‌টিউট্' নামক সমিতির সেক্রেটরী হেমলতা।

এই বিরাট সম্মিলনীর উদ্দেশ্য পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এখন ইহার সম্বন্ধে হেমলতার নোট এই ;—'বিংশশতাব্দীর মৃত্যুসংখ্যার আলেচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পূর্ব্বে অধিকাংশ স্বামীরই জীবদ্দশা শেষ হয়। ইহার কারণ ত্রিবিধ ;—প্রথমতঃ, সাংসারিক জঞ্জাল। যথা, আয় ব্যয়ের হিসাব, পুত্রকন্যাদায়, সামাজিক ও রাজনীতিক মীমাংসায় মস্তিষ্ক-সঞ্চালন ও তজ্জনিত দুর্ভাবনা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগের স্ত্রপাত। দ্বিতীয়তঃ, নৈতিক অবনতি। যথা, চরিত্রগত দোষ, স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ, পরস্ত্রীর রূপ লাবণ্য প্রভৃতির আলোচনা, অভিনয়াদি-দর্শন, এবং অশ্লীল কাব্য ও উপন্যাসাদি পাঠ। তৃতীয়তঃ, আধ্যাত্মিক অবনতি। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির হ্রাস, মানবের প্রতি স্নেহশূন্যতা ও স্বার্থপরতা। অতএব, সহধর্ম্মিণী-গণের সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রতীকার কর্ত্তব্য। স্বামীর শ্রমলাঘবের চেষ্টা সকলেরই করা উচিত। আয়ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি তাঁহার হস্ত হইতে হস্তান্তরিত করা প্রথম সোপান। প্রাণপণে সেই চেষ্টা কর্ত্তব্য। চরিত্র-গত দোষ বিদূরিত করিতে হইলে যে উপায় অবলম্বনীয়, তাহা গুপ্তভাবে আলোচ্য। চরিত্র সংশোধিত হইলে আধ্যাত্মিক পথ নিষ্কণ্টক হইবে। ফলে যাহাতে পুরুষবর্গ স্ব স্ব দোষগুলি বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন, তদনুরূপ অনুষ্ঠান বিশেষ আবশ্যক।

'স্ত্রীলোকের মনের বল নাই। শিক্ষা বিহনে ও প্রাকৃতিক সংগঠনের

গুণে তাহারা আদর্শ স্বামী দেখিতে না পাইয়া হিষ্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার প্রধান ঔষধ, আহার। লজ্জার বশবর্ত্তিনী হইয়া আহার কমাইয়া দেওয়া জ্ঞানহীনা নারীর কার্য্য। শ্রমবৃদ্ধির সহিত ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে দস্তুরমত আট দশবার আহার কর্ত্তব্য। স্বামীকে লুকাইয়া আহার করা অত্যন্ত জঘন্য প্রথা। সম্মুখে খাইবে; পাত হইতে কাড়িয়া লইবে; ক্রমাগত নূতন নূতন খাদ্যের আবিষ্কার করিবে। ইহাতে স্বামীরও ক্ষুধা বাড়িবে। প্রীতিও বাড়িতে থাকিবে।

'এইরূপে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। সর্ব্বদা সুরুচিমিশ্রিত হাস্যরস ও সুখদুঃখবিমিশ্রিত গাম্ভীর্য্যরসের অবতারণাও আবশ্যক। আমরা যে বৈধব্যের টীকা লইতে বসিয়াছি, তাহা মানসিক টীকা। অর্থাৎ, স্বামীর অভাবে স্বামিহীনা বিধবার যে জীবনব্যাপী সুদীর্ঘ মর্ম্মান্তিক ক্লেশ, তাহা কল্পনা করিয়া নিশাকালে শয্যাশায়িনী হইবে। আমি যাহাকে চাহি, সে থাকিয়াও নাই। আমার হাত ধরিয়া যে পরলোকের গহন অন্ধকারময় পথে লইয়া যাইবে, সে হাত অন্বেষণ করিয়াও পাইতেছি না। বহু 'জনমে'র যে সাধ অপরিপূর্ণ, তাহা সে পুরাইতে চাহে না। জীবনের পদে পদে যে ভুল ও ভ্রম হয়, সে মিটাইতে চাহে না। সে নাই। সে ছিল, কিন্তু নাই। ইহাই দুঃখ। ইহাই নীরব নিশীথিনীর অশ্রুকণা। শিয়রের আলুলায়িত অশ্রুধারাসিক্ত কেশ-গুচ্ছ প্রভাত-সূর্য্যের কিরণে শুষ্ক করিয়া সংসারের নশ্বরতা স্মরণ করিবে। দিবসে কর্ম্মস্থলে সম্পূর্ণভাবে বিচরণ করিবে। *

'এই যে বসন্তকাল, যখন চঞ্চল জীবন শিরায় শিরায় ও শোণিতকণায় লুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় (কিংবা বৎসহীনা গাভীর ন্যায়?) জীবন-দেবতাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, বিশ্বের সৌন্দর্য্য মানস-গগন ছাইয়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল জীবকে আত্মহারা করিয়া তুলে, তখন বিশেষরূপ সাবধান। এই সময় তিক্ত ও কটুরস আহার্য্য। নিম্ব বৃক্ষের সুকোমল কিশলয় ঘৃতে ভাজিয়া মধ্যে মধ্যে ভোজন করিবে। যাহার রসকস্ বিরক্তিজনক, এহেন কাব্য ও উপন্যাস, কিংবা অভাবে ভীষণরসপূর্ণ রাজস্থান, কিংবা সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসাদি পাঠ করিবে। অত্যন্ত ভয় পাইলে, কিংবা দুঃখে অধীর হইলে, মনে রাখিও,— আমরা অনাথা।

সম্মুখে ১লা এপ্রেল। সে দিন সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সকলের বুদ্ধি-প্রাখর্য্যের পরীক্ষা সেই দিন।'

হেমলতার ছোট ভগ্নী প্রমীলা দিদির নোটগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছিল, এবং বৃদ্ধা রাঙ্গা মাসীমা গ্রীবাসঞ্চালনপূর্ব্বক তাহার অনুমোদন করিতেছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ নলিনী দেবীর মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল।

৬

হেমলতা স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, 'আমি মিস্ দাসকে ডাকিয়া আনি। মাসীমা ও প্রমীলা শুশ্রূষা করিতে থাকুন।' ইহা বলিয়াই হেমলতা লেডী ডাক্তারের বাটীতে চলিয়া গেলেন।

রামহরি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিলেন, 'যদুর স্ত্রীকে ডাকিলে ভাল হয়; সে মূর্চ্ছারোগের অনেক ঔষধ জানে।'

সকলের সম্মতিক্রমে যদুর স্ত্রী ক্ষেমঙ্করী আসিয়া নলিনীর শিয়রে বসিল। যদু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি? সাংঘাতিক নয় ত? যদি তাহাই হয়, তবে নরেন বাবুকে ডাকিলে হয় না?'

যদুর স্ত্রী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, 'প্রমীলা, বসুজা মহাশয়কে বল যে, কোনও ভয় নাই। একালে ছোট ছোট মেয়েরা কবিতা লিখিয়া, চা খাইয়া, কট্‌লেট খাইয়া এই সব রোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। নলিনীর বয়স সবে সতের বৎসর, সারাদিন কেবল কাগজ কলম লইয়া বসিয়া থাকে, তাহার উপর এই সৃষ্টিছাড়া সম্মিলনীর পরিশ্রম, এরূপ ক্রমাগত চলিলে প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবে।'

রামহরি কিঞ্চিৎ অন্তরাল হইতে বলিলেন, 'নিশ্চয়।'

যদুর স্ত্রী সাহস পাইয়া আরও কহিল, 'এসেন্স্ ও ল্যাভেণ্ডারের ছড়াছড়ি! তেল ও জলের লেশমাত্র ব্যবহার নাই। এই যে অতুল রূপ, তা মাটী হইয়া যাইতেছে। ক্রমে দেহ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইবে। যক্ষ্মাকাশের সূত্রপাত হইবে। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, চারিটি অন্নের সহিত মৎস্যের ঝোল, ইহাই তাহার খাদ্য। কিন্তু কোথাকার 'করি', কটলেট্, চপ্, ডিম, পুডিং,—মা গো! ইহাতে কি জাতিধর্ম্ম থাকে?'

প্রমীলা বাধা দিয়া বলিল, 'আমরা ত মুরগী ছুঁই না; কেবল চিংড়ীমাছ ও হাঁসের ডিম খাই।'

যদুর স্ত্রী। (সক্রোধে) যাই খাও না, তোমাদের গতিক ভাল নয়।

প্রমীলা যত্নর স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। ইহাতে ক্ষেমঙ্করী আরও জ্বলিয়া উঠিল।

মাসীমা উভয়কে প্রশমিত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, 'নলিনীর চক্ষুর তারা উল্টাইয়া গিয়াছে, দাঁতে দাঁত বসিয়া গিয়াছে। আপনি একটু ভাল করিয়া দেখুন।'

নলিনীর সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ যথাসাধ্য আলুলায়িত করিয়া যত্নর স্ত্রী তাহার ললাটে ও মুখে জলধারা সেচন করিতে লাগিল। ক্রমে বায়ুসঞ্চালনে কম্পিত নয়ন-পল্লব উন্মুক্ত হইয়া ভ্রূ-মেঘের কোণে সন্ধ্যাতারকার ন্যায় যুগ্মনয়নতারকা প্রকাশিত করিল। নলিনী চেতনা লাভ করিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল, এবং লজ্জাভিভূতা হইয়া বলিল, 'আমার মাথার অঞ্চল টানিয়া দাও।'

যত্নর স্ত্রী প্রমীলাকে কহিল, 'উঁহাকে একটু সরিয়া যাইতে বল।'

রামহরি প্রমীলাকে ডাকিয়া কহিলেন, 'ওদের বল, আমি সরিয়া গিয়াছি।' কিন্তু ক্রমে দেখিলেন যে, নিজে তখনও সরিয়া যান নাই, এবং ক্রমে সরিতে লাগিলেন।

প্রমীলা বলিল, 'বসুজা মহাশয়, বেলা বারোটা, দিদি এখনও মিস্ দাসকে লইয়া ফিরিলেন না কেন? নরেন্ বাবুদের বাড়ীতে যান নাই ত?'

রামহরি। ( আশ্চর্য্য হইয়া ) তিনি কি নরেন বাবুদের বাড়ীতে যান?

প্রমীলা। আশ্চর্য্য নাই, হয় ত খবর দিতে গিয়াছেন। আহা! নরেন বাবু ও নলিনী দিদি—দুই জনেরই দুঃখের জীবন। সাহিত্যের ব্যবসা বড় কষ্টের ব্যবসা। পেটের জ্বালায় ভাব ফুটাইয়া লিখিতে হয়।

রামহরি। শুনিয়াছি, বেশ দু পয়সা হয়।

প্রমীলা। কোথায়? গত মাসে ত্রিশ টাকা হইয়াছিল। এ মাসে এখনও কিছু হয় নাই।

৭

রামহরি আহার করিয়া বহির্ব্বাটীতে বসিলেন। তখনও হেমলতা ফিরিয়া আসে নাই। প্রমীলা একখানা বই লইয়া পড়িতে বসিল।

রামহরি। ওখানা কি উপন্যাস?

প্রমীলা। কৃষ্ণকান্তের উইল। ইহাতে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর কথা আছে। আপনি পড়েছেন কি?

ইতিমধ্যে যত্নর স্ত্রী মাসীমার নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া দ্বার হইতে

নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল। 'ছি! মেয়েছেলেরা উচ্ছন্ন যাইতেছে। এই বয়সেই ভগ্নীপতির নিকট রোহিণীর কথা!'

কিয়ৎক্ষণ পরেই হেমলতা আসিয়া গম্ভীরভাবে কহিল, 'মিস্ দাস্‌কে পাওয়া গেল না। পিসী! সই এখন কেমন?'

প্রমীলা। এখন বেশ। আমি দেখিয়া আসি।

রামহরি। তুমি নরেনের বাড়ীতে যাও?

হেমলতা। যাওয়া উচিত। আসিবার সময় তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই। নরেন বাবু একটা কিম্ভূতকিমাকার, কাণা ও কালো মানুষ, কিন্তু বেশ কবিতা লেখেন। তাঁহার ত লিখিবারই কথা। ঘরে যাহার সই নলিনীর মত ভুবনমোহিনী স্ত্রী, যাহার কথায় বীণাঝঙ্কার, যাহার হাসিতে সুধা, যাহার প্রত্যেক গতিতে ছন্দ ও প্রত্যেক ভাবে কাব্য ও গান, সে রকমটি থাকিলে কে না কবি হয়?'

রামহরি একটা উত্তর দিবেন, স্থির করিতেছিলেন, কিন্তু হেমলতা অতিশয় দৃঢ়স্বরে বলিল, 'কোন উত্তরও দিও না। এখন একটা দরকারী কথা আছে। আমরা আগামী মঙ্গলবারে একবার রাণাঘাটে যাইব। মাসীমা ও প্রমীলা সঙ্গে যাইবেন। সই যাইবে। সেখানে আমাদের প্রথম সম্মিলনী হইবে। তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, যাইতে পার। সন্ধ্যার পর বনভোজন।'

রামহরি। নরেন বাবু যাইবেন?

হেমলতা। না।

রামহরি। পুরুষদিগের সেখানে যাইবার যখন কোনও দরকার নাই, তখন আমার গিয়া কি হইবে?

হেমলতা। আচ্ছা, তবে যেও না।

যদুর স্ত্রী অন্তরাল হইতে উভয়ের কথা শুনিতেছিল। সুযোগ পাইয়া অপসৃত হইয়া পড়িল।

রামহরির অভ্যাসগত দিবানিদ্রা সেদিন আসিল না। অনেক প্রকার কুচিন্তা ও দুশ্চিন্তা নিদ্রার স্থান অধিকার করিল।

যদু উপস্থিত। উভয়ের উদ্যানে গমন ও ভ্রমণ।

রামহরি যদুর নিকট নরেনের স্ত্রী মূর্চ্ছার ইতিহাস ও যদুর স্ত্রীর অসাধারণ চিকিৎসা প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া অবশেষে কহিলেন, 'আমার বোধ

যদু মৃদুভাবে বলিল, 'আর কিছু নয়, তোমার স্ত্রীর অনুকম্পায় উভয়ে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া লইতেছে। এই যে সম্মিলনী, ওটা একটা হাস্যজনক ব্যাপার। 'বৈধব্যের টীকার' মূলে কোনও অর্থ নাই। এই রাণাঘাটে প্রকাণ্ড সম্মিলন, বনভোজন ও বক্তৃতা, ইহাতে জগতের ও সমাজের কি উপকার? কেবল তোমার পয়সা নষ্ট!'

রাম। আমি পয়সার জন্য ভাবি না; কিন্তু ইহাতে যথার্থ চরিত্র-সংশোধন ও ধর্ম্মে কত দূর মতি হইতেছে, তাহা সন্দেহস্থল।

রাণাঘাটে রামহরির শ্বশুরালয়। অদ্য সন্ধ্যাকালেই হেমলতা, মাসীমা ও প্রমীলার যাইবার কথা। প্রমীলা আসিয়া বলিয়া গেল, 'বসুজা মহাশয়! আমরা বারাকপুর হইয়া রাণাঘাটে যাইব। আপনি সাবধানে থাকিবেন।' বাড়ীর চাবি আপনার নিকট রাখিয়া গেলাম।'

৮

বাড়ীতে এখন কেহ নাই, কেবল রামহরি। ডাকঘর হইতে একখানা পত্র আসিল। রামহরি খুলিয়া পাঠ করিলেন।—

'শীঘ্র টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে ৩০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিও; সম্মিলনীতে অনেক লোক আসিবে। অনেক দরিদ্রা বিধবার রেলভাড়া দিতে হইবে। তোমাদিগের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। নরেন।'

[ পুনশ্চঃ—সম্মিলনী গিরিজাবাবুর বাটীতে হইবে।—কল্য সন্ধ্যাকাল ]

উপরে 'শ্রীমতী হেমলতা দেবী'। পত্রখানি খুলিয়া পড়া রামহরির অভিপ্রেত ছিল না; কারণ, রাণাঘাটের মোহরাঙ্কিত পত্র সে পড়িত না। অদ্য এই অভিনব পত্র দেখিয়া রামহরির সন্দেহানল প্রজ্বলিত হইল। প্রথম সন্দেহ, তাঁহার স্ত্রীর মিথ্যা কথা। নরেন যাইবে না, ইহাই যদি সত্য হয়, তবে নরেন রাণাঘাট হইতে পত্র লিখিল কি করিয়া?

'ইহার একটা তদন্ত যে নিশ্চয় করা উচিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।' প্রথমতঃ, মামলাটি সুপরিপক্ক করিবার জন্য রামহরি তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রবাবুর নামে টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে তিন শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

রাত্রিকালে রামহরির নিদ্রা হইল না। গিরিজা বাবু নরেনের আত্মীয়, তাঁহার বাড়ীতে সম্মিলনী কেন? বারাকপুরে যাইবার মতলব কি?

অজানিত তমসাচ্ছন্ন বনে ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় রামহরি নানাবিধ দুর্ভাবনার

গতজীবন, বর্ত্তমান জীবন ও ভবিষ্যৎ জীবনের সমালোচনায় রাত্রি অতিবাহিত করিল।

প্রভাতে যদুনাথ আসিলে রামহরি কহিল, 'আমি রাণাঘাটে যাইব, তুমি বাড়ীর চাবি রাখ।'

যদু কোনও কারণ না জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, 'যদি নিতান্তই যাইতে হয়, তবে দাও।'

সেই মঙ্গলবার ১লা এপ্রেল দ্বিপ্রহরের ট্রেণেই রামহরি রাণাঘাটে রওনা হইয়া গিরিজাবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত। গিরিজাবাবু এক মাস হইল সপরিবারে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছেন!

নিমেষের মধ্যে রামহরি শ্বশুরালয়ে উপস্থিত। সেখানেও জন মনুষ্য কেহই নাই!

অতিশয় চীৎকার করিয়া রামহরি ডাকিলেন, 'এ বাড়ীতে কেহ আছে?'

এক জন বৃদ্ধ চাকর আসিয়া রামহরিকে দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিল। 'জামাইবাবু অদ্য এখানে! কর্ত্তা, মা ও বড় দিদি—সকলেই সকালের গাড়ীতে কলিকাতায় রওনা হইয়াছেন।'

রামহরি। আমার বাড়ীতে?

ভৃত্য। হাঁ। অদ্য সেখানে সম্মিলনী।

রামহরি বিকট গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, 'সম্মিলনী অধঃপাতে যাউক। আমাকে ডাকঘর দেখাইয়া দে।'

শকটারোহণে ভৃত্য সহ ডাকঘরে উপস্থিত হইয়া রামহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কল্য একটা টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার এখানে আসিয়াছিল?'

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, 'হাঁ।'

রামহরি। কে লইয়াছে?

পোষ্টমাষ্টার খাতা খুলিয়া বলিল 'নরেনবাবু।' 'নরেনবাবুকে জানেন?' পোষ্টমাষ্টার। 'তিনি ডাকঘরেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে চিনি না, এবং চেহারাও মনে নাই। কোনও সন্দেহের কারণ ছিল না; কারণ, তিনি জানিতেন যে, রামহরিবাবুর নিকট হইতে টাকা আসিবে। এটা তাঁহার স্ত্রীর সম্মিলনীর খরচের জন্য।'

প্রকাশ্যে তোলাপাড়া করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া রামহরি সেই ট্রেণেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৯

তাহা ভিন্ন অন্য কোনপ উপায় ছিল না। হয় টাকা কোনও জুয়াচোরের হস্তগত হইয়াছে, নচেৎ নরেন লইয়াছে। রাত্রি দশটার সময় কলিকাতায় পঁহুছিয়া রামহরি যদুকে ডাকিলেন। যদু তামাকু সেবন করিতেছিল।

রামহরি কহিল, 'যদু! আমি সমস্ত দিন আহার করি নাই। শীঘ্র বাড়ীর চাবি দাও, এবং তোমার স্ত্রীকে রন্ধনের যোগাড় করিতে বল। ইতিমধ্যে তুমি একবার নরেনের বাড়ীতে গিয়া দেখ—সে কোথায়। একটা ভয়ানক জুয়াচুরী ও জাল চলিতেছে। তাহার তদন্ত করা উচিত।'

যদু অতিশয় চিন্তাযুক্ত, তাহার মুখমণ্ডল শুষ্ক।

'নরেন বাবু বাড়ীতেই আছেন। তোমার বাড়ীতে সম্মিলনী চলিতেছে। আমার স্ত্রীও বোধ হয় সেইখানে। প্রচুর খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল, বোধ হয় এখনও কিছু থাকিতে পারে।'

রামহরি বেয়াকুফের ন্যায় যদুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'এ সকলের অর্থ কি?'

যদু অতিকষ্টে বলিল, 'আমিও কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার শ্বশুর শ্বাশুড়ী সকলেই খাওয়া দাওয়া সারিয়া এই ট্রেণে রাণাঘাটে ফিরিয়াছেন। তাঁহারা কোনও প্রকারে খবর পাইয়াছিলেন যে, আপনি তাঁহাদিগের সহিত রাণাঘাটে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। নরেন বাবুর সহিত দেখা করা বৃথা, তিনি সমস্ত দিন বাড়ীতে বসিয়া কবিতা লিখিতেছেন। তাঁহার মাথা খারাপ।'

রামহরি। এ কথা তুমি ত পূর্ব্বে বল নাই?

যদু। বলা আবশ্যক হয় নাই। কবি হইলেই মাথার একটু গোলমাল থাকে। তিনিই টেলিগ্রাফ করিয়া সকলকে বারাকপুর হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, এবং সকলে বৈকাল হইতেই সম্মিলনী আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

রামহরি একটানে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। সেখানে প্রমীলা 'বসুজা মহাশয় এসেছেন!' বলিয়া প্রকাণ্ড চীৎকার পূর্ব্বক তাঁহার হস্তধারণ করিল।

বাটী মহাজনতাপূর্ণ। প্রায় দুই শত সধবা ও ত্রেত্রিশটি বিধবা। সকলেই

সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মাসীমা শীঘ্র আসিয়া বলিলেন, 'বাবা রামহরি, তুমি কি খাবে? অনেক প্রকার খাবার প্রস্তুত।'

রামহরি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, কোনও জটিল বিষয়ের মীমাংসার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আহার নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং তিনি সকল প্রকার খাদ্যই বেশ করিয়া খাইলেন। উত্তমরূপ উদরপূর্ত্তি হওয়াতে রামহরির চেহারা প্রসন্ন হইয়া আসিল, মনোমালিন্য দূর হইল। তখন তিনি ধীরভাবে গত দুই দিনের ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় বাড়ীর মধ্যে কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল। প্রমীলা আসিয়া ত্রস্তভাবে কহিল, 'বসুজা মহাশয়! শীঘ্র আসুন, যদু বাবুর স্ত্রী পাগলের ন্যায় বকিতেছে।'

বাস্তবিক তাহাই। আলুলায়িতকেশে, দীনবেশে, সজলনয়নে ক্ষেমঙ্করী কহিতেছে,—'ও গো! তোমরা সকলে আমাকে মুক্ত কর, পরিত্রাণ কর।'

রামহরি ব্যস্তভাবে কহিলেন, 'ব্যাপারখানা কি?'

মাসীমা রামহরিকে অন্তরালে লইয়া গিয়া কহিলেন, 'আমাদের অনুপস্থিত-কালে উনি বাড়ীর চাবি খুলিয়া বৌমার ঘরে গিয়াছিলেন; সেখানে একটা মানুষের কঙ্কাল দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। এই রকম অবস্থায় কতক্ষণ ছিলেন, জানি না; পরে আমরা ফিরিয়া আসিলে সমিতি আরম্ভ হয়। তখন ঘর অন্ধকার ছিল, এখন বৌমা ঘরে গিয়া যদুর স্ত্রীকে এখনকার অবস্থায় পাইয়াছেন।'

রামহরি। নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকেরা চলিয়া যাউন, আমি ইহার বিশেষ তদন্ত করিতে চাহি।

১০

বিশেষ তদন্তপূর্ব্বক রামহরি যাহা জানিলেন, তাহা অদ্ভুত। যদুর স্ত্রীর স্বীকারোক্তি এই যে, তাহার পরামর্শমতে যদু রামহরিকে জাল পত্র লিখিয়া রাণাঘাটে লইয়া যায়, এবং হেমলতার পিতামাতাকে কলিকাতায় লইয়া আসে। এই সুযোগে যদু রামহরি-প্রদত্ত তিন শত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল; অপরঞ্চ, ক্ষেমঙ্করী হেমলতার ঘর খুলিয়া কিঞ্চিৎ অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রামহরি সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ইতিমধ্যে নরেন বাবু কোনও প্রকারে আভাস পাইয়া আসন্ন বিপদের কথা বারাকপুরে নলিনীকে লিখিয়া পাঠান, এবং সমিতির স্ত্রীলোকগণ তৎক্ষণাৎ বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন।

নরেনবাবুর স্ত্রী নলিনী যদুর স্ত্রীকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখিয়াছিল। হেমলতা ইণ্টারমিডিয়েট বিজ্ঞান-পরীক্ষায় দেহতত্ত্ব (ফিজিয়লজী) বিশদরূপে বুঝিবার জন্য একটি সমুণ্ড নরকঙ্কাল গৃহের বাতায়নের পার্শ্বে অনেক দিন হইতে রাখিয়া দিয়াছিল। বোধ হয়, ক্ষেমঙ্করী তাহাই দেখিয়া ভূত মনে করিয়া অজ্ঞান হইয়া যায়। সম্মিলনী-ভঙ্গের আশঙ্কায় হেমলতা ও নলিনী মূর্চ্ছিতার মুখে জলাদি-সেচনপূর্ব্বক তাহার চেতনাসঞ্চার করিয়া তাহাকে সেই ঘরে (নরকঙ্কাল অপসৃত করিয়া) বন্দী অবস্থায় রাখিয়া যায়। নানাবিধ আশঙ্কায় সে বরাবর চুপ করিয়াছিল, এখন সম্ভবতঃ স্বীয় কর্ম্মফলের আবশ্যম্ভাবী বিকাশের সম্ভাবনা দেখিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। রামহরি অনেকটা বুঝিতে পারিলেন।

'যতই দোষী হউক না কেন, স্ত্রীলোকের অবমাননা মহাপাপ। উহাকে ছাড়িয়া দাও।'

কারাগৃহ হইতে মুক্ত হইয়া যদুর স্ত্রী রামহরিকে আশীর্ব্বাদ করিল। 'বসুজা মহাশয়! আপনার মঙ্গল হউক। আমি মহাপাপী। আপনার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর নামে কুৎসা রটাইয়া আমিই এই বিবাহের সূত্রপাত করি। তাহার ফলাফল হাতে হাতে পাইয়াছি। আপনি বিবাহ করিয়া মস্ত ভুল করিয়াছেন। বাড়ীর লক্ষ্মী গিয়াছে—লক্ষ্মীশ্রী গিয়াছে। এখন কেবল ভূতের উপদ্রব।'

যদুর স্ত্রী অন্ধকার ভেদ করিয়া নিজগৃহের দিকে দৌড়িল। সকলে শয়নাগারে প্রবেশ করিল, কিন্তু রামহরি বসু বহির্দ্বারে বসিয়া রহিলেন।

নক্ষত্রখচিত আকাশের তলে অন্ধকারময়ী দ্বিপ্রহরা নিশা। সেই নির্জ্জনতায় মধ্যে অতীত জীবনের স্মৃতির সহিত রামহরির বুঝাপড়া! সকলেই নির্দ্দোষ। যে গিয়াছে, সে নির্দ্দোষ। নরেন নির্দ্দোষ। অন্নের অভাবে যদু ও যদুর স্ত্রী যাহা করিয়াছে তাহাও মার্জ্জনীয়। তবে দোষী কে? ভ্রম কাহার?

রামহরি দেখিলেন, ভ্রম তাঁহার নিজের। এক জন্মের ভুল কি অন্যজন্মে মিটানো যায় না?

রামহরি বুঝিতে পারিলেন যে, অভাবনীয় রূপে তিনি প্রকাণ্ড 'এপ্রেল-ফুল' নামক গর্দ্দভজাতীয় জীবে পরিণত হইয়াছেন।

রামহরির চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। উদ্যানে নিশির শিশির পত্রে পত্রে ঝরিতেছিল, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে হেমলতা আসিয়া রামহরির গলদেশ স্পর্শ করিবে। রামহরি বুঝিতে পারিলেন।

'হেমলতা! আমি তোমার সইকে দেখিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়াছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই অনুতাপে দগ্ধ হইয়াছি।'

হেমলতা ভূমির উপর জানু রাখিয়া স্বামীর পদযুগলে মস্তক লুকাইল। 'ছি! ও কথা বলিতে নাই। জীবনে অনেক ভুল হয়। আত্মহারা হইতেই আমরা মর্ত্ত্যে আসি। বোধ হয়, আমাদের জন্মভূমি অন্য কোথাও। যেখানে তোমার সতীলক্ষ্মী প্রথমা স্ত্রী গিয়াছে, আমার ইচ্ছা হয়, সেইখানে শীঘ্র যাই।'

রামহরি বলিলেন, 'আমারও সেই রকম ইচ্ছা করে।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

---

# জাপানের শিক্ষা-প্রণালী।

বর্ত্তমান 'মিকাদো'র (জাপান-সম্রাট্) জনক মুৎসুহিতো সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে প্রায় পাঁচ ছয় শতাব্দী ব্যাপিয়া জাপানে সোগুণগণের প্রাধান্য ছিল। সে সময়ে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক্, যাহাতে কেহ শিক্ষিত না হইতে পারে, সেই দিকেই তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পাছে জাপানীরা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সোগুণদিগকে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করে, এই ভয়ই তাঁহাদের প্রবল ছিল। এই কারণেই সাধারণের শিক্ষার পথ জাপানে একরূপ রুদ্ধ ছিল বলিলেও চলে।

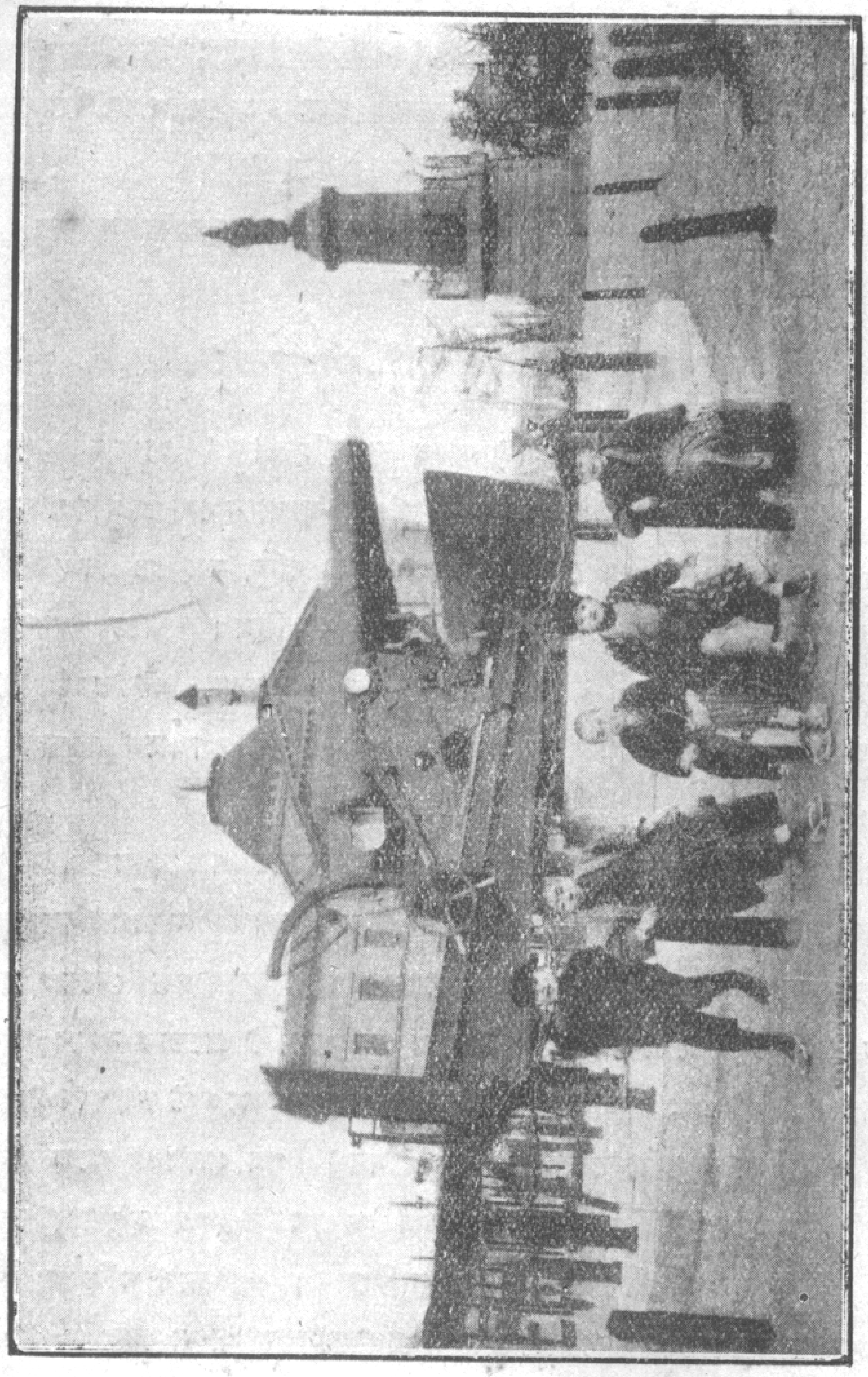
সম্রাট্ মুৎসুহিতো শাসন-ভার প্রাপ্ত হইয়াই জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই শিক্ষার ফলে জাপানে নব-জীবনের উন্মেষ হয়। অতঃপর স্বদেশভক্ত জাপানীদের আন্তরিক চেষ্টায় ও যত্নে জনসাধারণের সুবিধার জন্য দেশের সর্ব্বত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথম গবর্মেণ্ট প্রত্যেক নগরে আদর্শ-পাঠশালার প্রতিষ্ঠা এবং রাজবিধান দ্বারা রাজ্যস্থিত সকলকে উক্ত পাঠশালায় * বালকবালিকাদিগকে পাঠাইতে বাধ্য করিলেন। পল্লীবাসীদের পক্ষে বালক-বালিকাদিগকে সহরে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হওয়ায়, ক্রমশঃ তাঁহারা স্ব স্ব গ্রামে পাঠশালা বসাইতে লাগিলেন। এইরূপে অতি অল্পদিনের মধ্যেই জাপানের প্রত্যেক গ্রামে জাতীয় শিক্ষার সুব্যবস্থা হইয়া গেল।

শুধু পাঠশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াই জাপানীরা সন্তুষ্ট হইলেন না। পাঠাশালায়

---

* বালকের বয়স ছয় বৎসর এবং বালিকার বয়স সাত বৎসর হইলেই, রাজবিধান অনুসারে তাহাদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করিতে হয়।

কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাহারও আলোচনা হইতে লাগিল। পরে স্থির হইল, Kinder Garten systemই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তখন ঐ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল।



নাকানোশিমা পার্ক।

অনন্তর জাপানীরা পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক অতি সরল ভাষায় লিখিত। তাহাতে নানারূপ উপদেশপূর্ণ সুন্দর সুন্দর গল্প সন্নিবিষ্ট আছে। গল্পগুলি প্রায়শঃই

সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। পুরাকালের কীর্ত্তিমান্ স্বদেশভক্ত পুরুষদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত বিশদরূপে এই সমস্ত পুস্তকে বর্ণিত আছে। পুস্তকে সমস্ত গল্পের আদ্যোপান্ত না থাকিলে শিশুর মাতা পিতাকে উহা বলিতে হয়।



জাপানী বালক ও বালিকা।

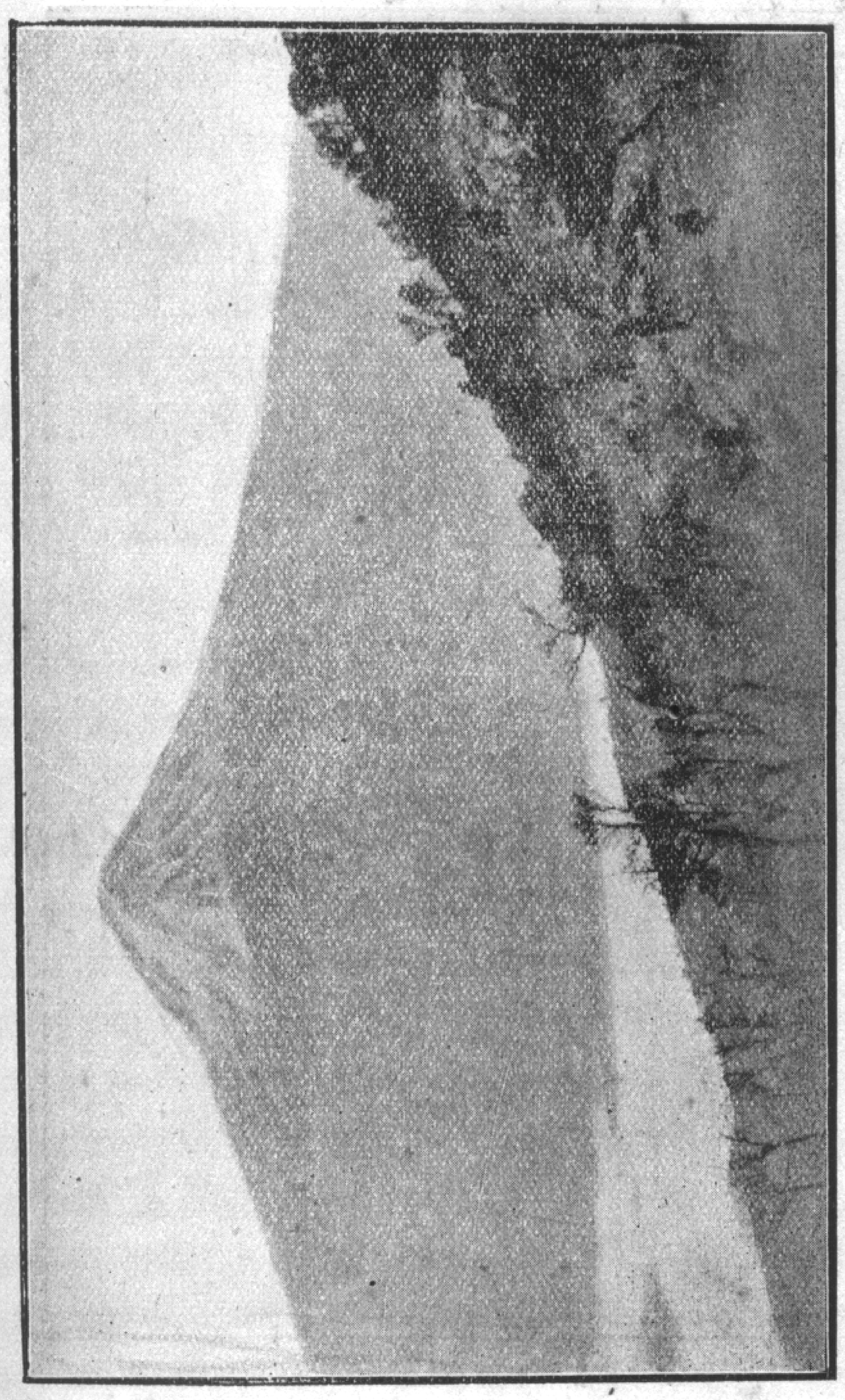
অভিভাবকেরাও সকলেই সুশিক্ষিত। তাঁহারা সন্তানদিগের আগ্রহ বর্দ্ধিত করিবার জন্য গল্পগুলি বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া বলিয়া থাকেন। ইহাতে বালকবালিকাদিগের গল্প শুনিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠে; তাহারা স্বজাতীয়

ইতিহাসবিশ্রুত মহাত্মগণের কীর্ত্তিসমূহও হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকে। এইরূপে জাপ-শিশুগণ বাল্যকাল হইতে জাতীয় গৌরব শিক্ষা করিয়া থাকে।

বিদ্যালয়সমূহ যাহাতে বালকবালিকাগণের চিত্তাকর্ষক হয়, সে জন্য তথায় নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ ও খেলা ধূলার বন্দোবস্ত আছে। গীত-বাদ্যশিক্ষার ব্যবস্থাও সর্ব্বত্র আছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই জাতীয়-সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত থাকেন। স্কুলের ইউনিফরম্ অর্থাৎ উর্দ্দি (School uniform ) পরিয়া ছাত্রগণ ছুটীর পর যখন দলে দলে গান করিতে করিতে বিদ্যালয় হইতে বাহির হয়, তখনকার দৃশ্য কি মনোহর! দুই তিন জন ছাত্র একত্র হইলেই গান আরম্ভ করিয়া দেয়। ক্রমশঃ পথের বালকবালিকাগণও তাহাদের সহিত যোগদান করিতে থাকে। যে সকল বালক বালিকা বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত হয় নাই, তাহারাও এই সমস্ত দেখিয়া, পাঠশালায় যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। জাপ-শিশু শৈশবেও মাতার নিকট হইতে নানারূপ সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সপ্তাহে ছাত্রবর্গকে লইয়া শিক্ষকগণকে ভ্রমণে (Excursion) বাহির হইতে হয়। এই সময়ে ছাত্রগণকে নানারূপ কায়িক ক্লেশে অভ্যস্ত হইতে হয়। কোনও দিন ঝড় বৃষ্টিতে তাহাদিগকে কর্দ্দমময় প্রকাণ্ড ময়দান অতিক্রম করিতে হয়; আবার কোনও দিন হয় ত অত্যন্ত রৌদ্রে দুই তিন মাইল পথ পদব্রজে চলিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিতে হয়। বালকবালিকা-দিগকে নদী কিংবা সমুদ্রে পড়িয়া সাঁতার শিক্ষা করিতে প্রায়শঃই দেখা যায়। অবশ্য, শিক্ষকগণ সর্ব্বদাই তাহাদের সঙ্গে থাকেন। তাঁহাদিগকেও ছাত্রগণের সহিত রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি ভোগ করিতে হয়। আমি একদা এক দল ছাত্রকে পর্ব্বতের পাদদেশে কৃত্রিম যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি। ইহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। শিক্ষক এক পার্শ্বে বসিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের বালকগণের মধ্যে কেহ সৈন্যাধ্যক্ষ, কেহ রণ-বাদ্যকর, এবং অন্যান্য সকলে যোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। আমি তাহাদের রণ-কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। জঙ্গলময় পর্ব্বতে শত্রুগণ কিরূপ ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, এবং তৎকালে কি বিধান আবশ্যক, শিক্ষকগণ তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। বলা আবশ্যক, এই সময়ে বালকগণ প্রকৃত যোদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া থাকে। তাহাদের হাতে

দুষ্ট বালককে যে প্রণালীতে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহাও আশ্চর্য্যজনক। কোনও বালক অন্যায় কাজ করিলে, তাহাকে প্রহার করা দূরে থাকুক, একটু রূঢ় ভাষাও ব্যবহৃত হয় না। দুই একটি সদুপদেশ দিয়া, পাঠশালার

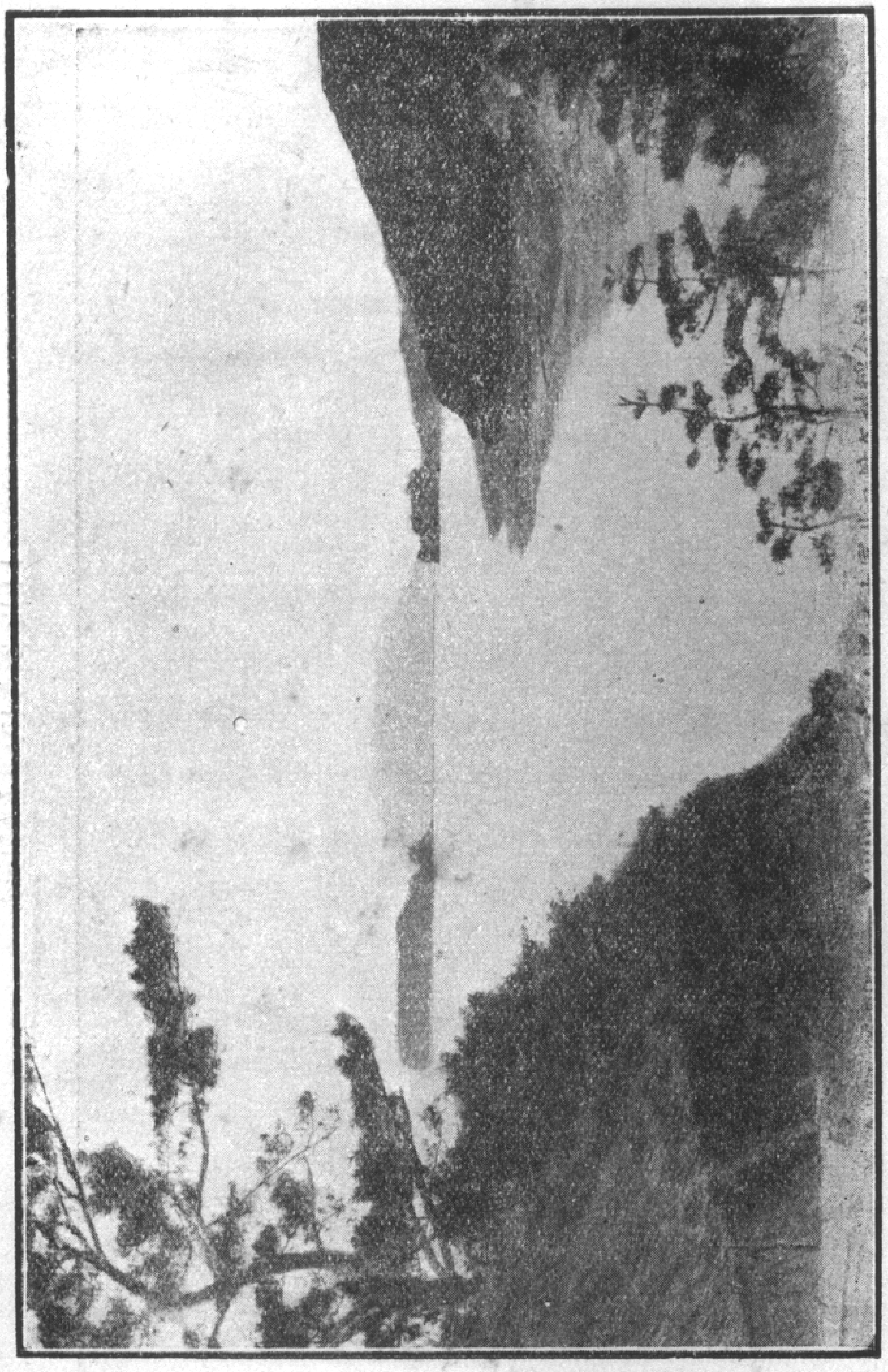


সমুদ্রকূলবর্ত্তী ফুজি-সান।

ছুটী হইলে তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য আট্‌কাইয়া রাখা হয়। অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ যখন মহাকোলাহল করিয়া ছুটী ঘোষণা করে, এবং গান ধরিয়া বিদ্যালয়

হইতে বাহির হইতে থাকে, তখন আবদ্ধ বালকের মানসিক অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে!

ছোট ছোট বালকবালিকাকে কিরূপে আত্মসম্মান শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা



ফুজি-সানের অন্য দৃশ্য।

একবার শুনুন। প্রহৃত হইয়া যদি কোনও ছাত্র অপর কোনও ছাত্রের বিরুদ্ধে শিক্ষকের নিকট নালিস করে, তাহা হইলে, বিচারপ্রার্থীকে তিরস্কৃত হইতে হয়। মার খাইয়া চুপ করিয়া থাকা শুধু যে কাপুরুষের লক্ষণ, তাহা নয়।

জাপানীরা বলে, তাহাতে বংশেরও গৌরবহানি হয়। এই কারণেই উপহাসচ্ছলে গায়ে হাত দিলেও জাপানীরা স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিয়া থাকেন।

শিশুগণের হস্তাক্ষর-শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। জাপানী ভাষায় অক্ষর অসংখ্য। প্রায় তিন সহস্রেরও উপর। জাপানীরা ঐ অক্ষরসমূহ থাকের কলম বা পেন দিয়া না লিখিয়া তূলি দ্বারা লিখিয়া থাকেন। বাল্যকাল হইতে তূলি দ্বারা অক্ষর লিখিতে হয় বলিয়া, প্রায় সকল জাপানীর হস্তই তূলিকা-ব্যবহারে বেশ অভ্যস্ত। বিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে তূলি দ্বারা কেবলমাত্র যে অক্ষর লিখিতে হয়, তাহা নহে। অনেক সময়ে উহার সাহায্যে তাহারা নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিয়া শিক্ষকের দ্বারা তাহা সংশোধন করাইয়া লয়। ছাত্রগণ চিত্রাঙ্কনে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইবার পর প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকিতে শিক্ষা করে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে 'ফুজি ইয়ামা' (Fuji San) জাপানীদের সর্ব্বাপেক্ষা আদরের বস্তু। বালকবালিকাগণ সর্ব্বপ্রথম এই পর্ব্বতটি আঁকিতে শিক্ষা করে। এই পর্ব্বতটি সাম্রাজ্যের মধ্যে উচ্চতায় দ্বিতীয় হইলেও, জাপানীরা উহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। জাপগণ এই পর্ব্বতপ্রবরের বন্দনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। চিত্রকরগণ উহার আড়ম্বরশূন্য তুষারাবৃত দেহ অঙ্কিত করিয়া তূলিকা সার্থক করিয়াছেন। আবার পাঠশালার ছাত্রেরাও বর্ণপরিচয়ের পূর্ব্বেই উহার সহিত পরিচিত হইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করে। জাপানীরাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আদর করিতে জানে! ভারতবর্ষের হিমালয় পর্ব্বত জগতের মধ্যে বৃহৎ হইলেও, উহার গৌরব আমরা কয় জন অনুভব করিয়া থাকি ?

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

---

# মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন।

[ রামগঞ্জ-লিপি। ]

## প্রশস্তি-পরিচয়।

বাঙ্গালীর ইতিহাসের সহিত সম্পর্ক-সংযুক্ত যে সকল প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সম সাময়িক বিবরণ উল্লিখিত থাকায়, অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিংবদন্তী অপেক্ষা এই সকল প্রমাণ যে

অধিক নির্ভর-যোগ্য, তাহাতে সংশয় নাই। এই শ্রেণীর প্রমাণে জানিতে পারা গিয়াছে,—বাঙ্গালা দেশ যখন পাল-নরপালগণের শাসন-কৌশলে পরিচালিত হইত, তখন বাঙ্গালা দেশের চতুঃসীমার বাহিরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের শাসন-ক্ষমতার প্রবল প্রভাব অনুভূত হইত। তৎকালে পরাক্রমশালী সামন্তগণ আপন আপন সামন্ত-চক্রে স্বাধীন নরপালের ন্যায় শাসন-ক্ষমতা বিস্তৃত করিয়া, সার্ব্বভৌম নরপালের সহচররূপে মর্য্যাদা লাভ করিতেন। সামন্ত-সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। ধর্ম্মপালদেবের [ খালিমপুরে আবিষ্কৃত ] তাম্রশাসনে "মহাসামন্তা-ধিপতি"-উপাধিধারী রাজপুরুষের উল্লেখ আছে; সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" কাব্যে [ ৪।১৮ ] "মণ্ডলাধিপতি"-উপাধিধারী এক রাজ-সুহৃদের উল্লেখ আছে; এবং "রামচরিতে"র টীকায় [ ২।৮ ] "মহামাণ্ডলিক"-উপাধিধারী কাহ্নুরদেব নামক রামপালদেবের মাতুল-পুত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু "মহামাণ্ডলিকে"র প্রকৃত পদমর্য্যাদা ও শাসন-ক্ষমতা কিরূপ ছিল, এ পর্য্যন্ত সে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উপায় ছিল না।

সৌভাগ্যক্রমে সে কালের এক জন "মহামাণ্ডলিকে"র একখানি তাম্রশাসন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির হস্তগত হইয়াছে। তাহা "মহামাণ্ডলিক" ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন। এই শাসনখানি বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত [ দিনাজপুর জেলার ] মালদোয়ার নামে সুপরিচিত রাজষ্টেটের দপ্তরখানায় বহুকাল হইতে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে; ইহার সহিত মালদোয়ার ষ্টেটের ভূসম্পত্তির সম্পর্ক থাকিবার জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে। মালদোয়ার ষ্টেট ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম বার কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের অধীন হইবার সময়ে, এই তাম্রশাসনখানিও তালিকাভুক্ত হইয়াছিল। মালদোয়ার ষ্টেটের বর্ত্তমান অধিকারী কুমার শ্রীযুক্ত ছত্রনাথ ও কুমার শ্রীযুক্ত টঙ্কনাথ চৌধুরী বি. এ. এই পুরাতন লিপির প্রতিকৃতি ও পাঠ পণ্ডিত-সমাজে প্রকাশিত করিবার অনুমতি দান করিয়া, ইতিহাসানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; এবং বহু রহস্যপূর্ণ বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার-সাধনের সহায়তা করিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতিকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছেন।

তাম্রশাসনখানির সকল অংশ এক্ষণে বর্ত্তমান নাই; ঊর্দ্ধভাগের দক্ষিণাংশের কিয়দংশ এবং নিম্নভাগের দক্ষিণাংশের অল্পাংশ খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে যাহা ক্ষোদিত ছিল, তাহা আর দেখিবার উপায় নাই। কিন্তু বহুপূর্ব্বে তৈরভুক্ত পণ্ডিত বাচ্চা ঝা এই তাম্রশাসনের যেরূপ পাঠ মৈথিল-অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও মালদোয়ার রাজষ্টেটের দপ্তরখানায় রক্ষিত

হইতেছে। তাহার সকল শব্দ সকল স্থানে মূলানুগত না হইলেও, অধিকাংশ পাঠই শুদ্ধরূপে উদ্ধৃত। যে অংশের অক্ষর এক্ষণে আর দেখিতে পাইবার উপায় নাই, সেই অংশের পাদ-পূরণ-কামনায় পূর্ব্বোদ্ধৃত পাঠই বন্ধনীমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবে।

তাম্রপট্টের আয়তন ৯২/৪ × ৮২/৪ ইঞ্চ। সম্মুখ পৃষ্ঠে ২২ পংক্তি, এবং অপর পৃষ্ঠে ২৫ পংক্তি সংস্কৃত-ভাষা-নিবদ্ধ গদ্যপদ্যাত্মক লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাহা "৩৫ সম্বতের ১ মার্গদিনে"র লিপি। মালদোয়ারে ইহা ৩৫ বিক্রম-সম্বতের লিপি বলিয়া পরিচিত। বলা বাহুল্য, এই লিপি সেরূপ পুরাতন হইতে পারে না। প্রতিকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা সুব্যক্ত হইবে।

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের শীর্ষদেশে "শ্রীপরাক্রমমূলস্ত" এবং তন্নিম্নে "নি" এই কয়েকটি অক্ষর উৎকীর্ণ আছে, এবং একটি ছত্রের চিহ্নও ক্ষোদিত আছে। ইহাই "মুদ্রা" ছিল বলিয়া প্রতিভাত হয়। "শ্রীপরাক্রমমূলস্ত" শব্দ কাহাকে সূচিত করিতেছে, লিপিমধ্যে তাহা উল্লিখিত নাই। এই শব্দের দক্ষিণ পার্শ্বেই ছত্র-চিহ্ন ক্ষোদিত আছে। তাহা [ মহামাণ্ডলিকের পরাক্রমের মূল ] সার্ব্বভৌম রাজাধিরাজকে সূচিত করিতেছে কি না, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন।

ঈশ্বর ঘোষের জাতি কি ছিল, তাহার উল্লেখ নাই। তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, এরূপ আভাসও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি যে কুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় শ্লোকে [ চতুর্থ পংক্তিতে ] তাহা "ঘোষকুল" বলিয়া উল্লিখিত আছে। তৎকালে তাহা "পৃথিবীতে প্রথিত" ছিল বলিয়া, জাতির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। পাল-নরপালগণও তাঁহাদিগের শাসন-লিপিতে জাতির উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা প্রথম শ্লোকে তাঁহাদিগের বৌদ্ধমতানুরক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। ঈশ্বর ঘোষ [তাঁহার তাম্রশাসনের ৩২ পংক্তিতে] ভগবান্ শঙ্করকে উদ্দেশ করিয়া দান করিবার উল্লেখ করিয়া, শৈব-মতানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

এই তাম্রশাসন সম্পাদিত করাইয়া, মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ নিব্বোক শর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকে [ ২৯ পংক্তি ] একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। মালদোয়ারে জনশ্রুতি আছে,—নিব্বোক শর্ম্মা ঈশ্বর ঘোষের গুরুদেব ছিলেন। তিনি দান গ্রহণ করিয়া, তাম্রশাসন সহ গ্রামখানি তাঁহার গুরুদেবের চরণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই গুরুবংশই মালদোয়ারের রাজবংশ। এই

জনশ্রুতি মালদোয়ার-রাজবংশে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত আছে। ইহা সত্য কি না, তদ্বিষয়ে কোনও লিখিত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

কোন্ সময়ে এই তাম্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল, লিপি-বিচার করিয়াই তাহার মীমাংসা করিতে হইবে ;—অন্য উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা এই শ্রেণীর লিপির পুনঃ পুনঃ পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার মীমাংসা করিতে পারিবেন। সকল স্থানে অবগ্রহ-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই ; বর্ণ-বিন্যাসের ভ্রম প্রমাদ বিরল ; সংস্কৃত-রচনাও ব্যাকরণদুষ্ট নহে ;—রেফের চিহ্ন মাত্রার উপর দক্ষিণ দিকে অঙ্কিত ; ত-কারের আকার প্রণিধান-যোগ্য, এবং রেফ-সংযোগে বর্ণের দ্বিত্ব যে ভাবে সাধিত হইয়াছে, তাহাও বিচারযোগ্য এই সকল কারণে, ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনকে পাল-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়-যুগের [ খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর ] লিপি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তৎকালে প্রাচ্যভারত পাল-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং ঈশ্বর ঘোষ যে পাল-সাম্রাজ্যের "মহামাণ্ডলিক" ছিলেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়।

গৌড়েশ্বরগণের তাম্রশাসন যে "জয়স্কন্ধাবার" হইতে প্রদত্ত হইত, তাম্রপট্টে তাহার নাম উৎকীর্ণ থাকিত। ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে "জয়স্কন্ধাবার" শব্দের উল্লেখ নাই ; কিন্তু যে স্থান হইতে ইহা প্রদত্ত হইয়াছিল, [ ১০ পংক্তিতে ] তাহার নাম উৎকীর্ণ আছে। সেই স্থানের নাম "ঢেক্করী"। পাল-নরপালগণের শাসনসময়ে "ঢেকরী" একটি "সামন্ত-চক্র" বলিয়া পরিচিত ছিল। "রামচরিতে"র টীকায় [ ২।৫ ] প্রতাপসিংহ নামক এক "ঢেক্করীয়"-রাজের উল্লেখ আছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্. এ. "রামচরিতে"র ভূমিকায় ইংরাজীতে "ঢেক্করীয়" বলিয়া উল্লেখ করিলেও, মূল গ্রন্থের "ঢেক্করীয়" শব্দটি [ মুদ্রাকর-প্রমাদে ] গ্রন্থমধ্যে "ডেক্করীয়" রূপে নাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী অজয়নদের অপর তীরে যে "ঢাকুরা" নামক স্থান আছে, তাহাই পুরাকালের "ঢেক্করীয়"। (১) "রামচরিতে"র টীকায় কযঙ্গলের রাজা "কযঙ্গলীয়-রাজ" রূপে লিখিত থাকায়, ঢেক্করীয়-রাজকেও ঢেক্করীয় রাজা বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সুতরাং স্থানের নাম "ঢেক্করীয়" না বলিয়া, "ঢেক্করী" বলাই

(১) Pratapa Sinha, the king of Dhekhariya or Dhekura on the other side of the river Ajaya near Katwa.—Ramacharita, Introduction, p. 14.

সঙ্গত। "ঢেক্করী" ঢেকুরা হইবার পক্ষে যে শব্দ-সাদৃশ্য বর্ত্তমান আছে, কেবল তাহার উপর নির্ভর করিয়া, উভয় স্থানকে এক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। কিন্তু ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোক হয়ত কিয়ৎপরিমাণে শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে পারিবে। (২) এই শ্লোকে ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্ধ-প্রপিতামহের উল্লেখ আছে; কিন্তু তাঁহার নাম উল্লিখিত নাই। তিনি এক জন "অধিপ" ছিলেন। অক্ষর এখন কিছু অস্পষ্ট হইলেও, [ বাচ্চা ঝা মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠের সাহায্যে ] বুঝিতে পারা যায়,—তিনি "রাঢ়াধিপ" ছিলেন। তাঁহাকে "রাঢ়াধিপ" বলিয়া, তাঁহার পুত্রকে "নৃপবংশকেতু" এবং পৌত্র হইতে অধস্তন পুরুষগণকে "ঘোষকুল"-সম্ভূত, ও ঈশ্বর ঘোষকে "মহামাণ্ডলিক" বলায়, হয় ত প্রসঙ্গক্রমে এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত প্রকাশিত হইয়াছে যে,—ঈশ্বর ঘোষের উর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষের ব্যক্তি "রাঢ়াধিপ" ও স্বাধীন নরপতি ছিলেন; তাঁহার পর হইতে তদীয় বংশধরগণ "মহামাণ্ডলিক" হইয়াছিলেন; এবং রাঢ়ারাজ্য কালক্রমে পাল-সাম্রাজ্যের একটি "সামন্ত-চক্রে" পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ইহা অনুমানমাত্র। কিন্তু এই তাম্রশাসনখানি অনেক নিঃসন্দিগ্ধ ঐতিহাসিক তথ্যেরও আধার। ইহার প্রধান কথাই "ঘোষকুলে"র কথা,—সেই কুলের লোক এক সময়ে "রাঢ়াধিপ", এবং উত্তর-কালে "মহামাণ্ডলিক" ছিলেন। এখন তাহার কিংবদন্তীও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। "রাঢ়াধিপ" থাকিবার সময়ে পদমর্য্যাদা কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু "মহামাণ্ডলিক" ঈশ্বর ঘোষের পদমর্য্যাদা বড় অল্প ছিল না। তাঁহার আজ্ঞা অশেষ রাজরাজন্যকগণকে পালন করিতে হইত। তাঁহারও সামন্ত-সহচর ছিল; তাঁহার অধীনেও "বিষয়পতি" ও "ভুক্তিপতি" ছিল;—তাঁহারও কোট্ট [ দুর্গ ] ছিল; সেনাপতি-কোট্টপতি ছিল;—এক জন রাজাধিরাজের প্রবলপ্রতাপ-বিজ্ঞাপক যে সকল "রাজপাদোপজীবী" থাকিত, মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষেরও সেই সকল "রাজপাদোপজীবী" ছিল। ঈশ্বর

(২) মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ ( ৩১ পংক্তি ) "জটোদায়াং স্নাত্বা" এই তাম্রশাসনোক্ত ভূমি দান করিয়াছিলেন। "জটোদা"-শব্দটিতে লিপিকরপ্রমাদ না থাকিলে, তাহাই ঢেক্করী নামক স্থানের নিকটবর্ত্তিনী নদী ছিল বলিয়া প্রতিভাত হইবে, এবং তাহার সাহায্যে ঢেক্করীর প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণীত হইতে পারিবে। পক্ষান্তরে, "জটোদা" অজয়ের পুরাতন নাম হইলে, অথবা "জটোদায়াং," লিপিকরপ্রমাদে "জটোদয়াঙ্গাং" সূচিত করিতে পারিলে, তাহাকে গঙ্গার নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়া, ঢেক্করীকে অজয়তীরবর্ত্তী ঢাকুরা বলা চলিতে পারে। ঢেক্করী কোথায় ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে না পারিলেও, তাহার সহিত রাঢ়া-মণ্ডলের সম্পর্ক ছিল বলিয়াই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঘোষকে কায়স্থ বলা যায় কি না, এবং আদিশূরের আমন্ত্রণে পঞ্চব্রাহ্মণের সঙ্গে যাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, ঈশ্বর ঘোষকে তাঁহাদিগের বংশধর বলা যায় কি না? বলিতে পারিলে, আদিশূরকে কোন্ শতাব্দীতে স্থান দিতে হইবে? এই সকল কথার বিচার করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইবে। কুলশাস্ত্র-লেখকগণ বাঙ্গালার কায়স্থগণকে "শূদ্রবংশজ" বলিয়া যে "ত্রিবর্ণসেবক"-মর্য্যাদা দান করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃত-পক্ষে বাঙ্গালার পূর্ব্বতন কায়স্থগণের তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আভিজাত্য-মর্য্যাদা বর্ত্তমান ছিল কি না, তাহার রহস্যভেদে সমর্থ হইলে, ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন বাঙ্গালীর ইতিহাসকে এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিবে। যাঁহারা সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং প্রবৃত্ত হইবার যোগ্য পাত্র, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য "মহামাণ্ডলিক" ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের প্রতিকৃতি-সংযুক্ত পাঠ ও সটীক বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে।

'মণ্ডল' শব্দ হইতে 'মহামাণ্ডলিক' শব্দ [ পারিভাষিক অর্থে ] ব্যবহৃত হইয়াছে। "বিশ্বে" মণ্ডল-শব্দের বিবিধার্থ-বিজ্ঞাপনার্থে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সে কালের 'মণ্ডল' নামক বিভাগের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা 'দ্বাদশ-রাজক' নামে কথিত হইত। যথা,—

সামণ্ডলে দ্বাদশরাজকে চ।
দেশে চ বিম্বে চ কদম্বকে চ॥

ভরত অমর-টীকায় ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মেদিনী-কোষেও মণ্ডল "দ্বাদশরাজক" বলিয়া উল্লিখিত আছে। মণ্ডলের শাসন-কর্ত্তা "মণ্ডলেশ", "মণ্ডলাধিপতি", "মণ্ডলেশ্বর" প্রভৃতি নামে কথিত হইতেন; অভিধানে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কামন্দকীয় নীতিসারে [ ৮।১ দেখিতে পাওয়া যায়,—মণ্ডলাধিপেরও কোষ-দণ্ড-অমাত্য-মন্ত্রি-দুর্গাদি সহায় ছিল। যথা,—

উপেতঃ কোষদণ্ডাভ্যাং সামাত্যঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
দুর্গস্থ শ্চিন্তয়েৎ সাধু মণ্ডলং মণ্ডলাধিপঃ॥

ইহাতে মণ্ডলাধিপতি "দুর্গস্থ" থাকিয়া, মণ্ডল শাসন করিতেন বলিয়া পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম খণ্ডে [ ৮৬ অধ্যায়ে ] দেখিতে পাওয়া যায়,—"মণ্ডলেশ্বরে"র পদমর্য্যাদা নৃপ-শব্দ-বাচক সাধারণ রাজ-রাজন্যকের পদমর্য্যাদা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। যথা,—

চতুর্যোজনপর্য্যন্ত মধিকারং নৃপস্য চ।
যো রাজা [illegible] স এব মণ্ডলেশ্বরঃ॥



স্বামী বিবেকানন্দ

Mohila Press, Cal.

এই বচনের প্রমাণে, মণ্ডলেশ্বরও "রাজ"-পদবাচ্য ছিলেন বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তাঁহার অধিকার সাধারণ "রাজ"-পদবাচ্য ব্যক্তির অধিকার অপেক্ষা শতগুণ অধিক ছিল। "মণ্ডলাধিপতিগণ" পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-রাজাধিরাজের "সামন্ত"-মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। সে কালের শাসনব্যবস্থায় রাজাধিরাজ "পরম ভট্টারক" ছিলেন; তাঁহার পরেই মণ্ডলাধিপতির স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

মাণ্ডলিক-শব্দ এই মণ্ডলাধিপতি শব্দেরই রূপান্তরমাত্র। মধ্যযুগের গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে "মাণ্ডলিক" ও "মহামাণ্ডলিক" শব্দ যে সত্য সত্যই প্রচলিত ছিল, "রামচরিত" কাব্যের যে অংশের টীকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "কয়ঙ্গলীয় মঙ্গলাধিপতি" প্রভৃতি রাজ-পুরুষগণ [ টীকায় ] "সামন্তাঃ" বলিয়া স্পষ্ট উল্লিখিত থাকায়, বুঝিতে পারা যায়,—তৎকালে "মণ্ডলাধিপতিগণ" বা "মাণ্ডলিকগণ" রাজাধিরাজের "সামন্ত"-মধ্যেই পরিগণিত হইতেন। "মহামাণ্ডলিক" ঈশ্বর ঘোষও এইরূপ এক জন "সামন্ত" ছিলেন; কাহার "সামন্ত" ছিলেন, তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ নাই। সামন্তগণের স্বাধিকারে, [ স্বামিধর্ম্মের প্রচলিত নিয়মানুসারে ] রাজাধিরাজের "রাজ্যসম্বৎ" প্রচলিত ছিল; কিংবা সামন্তগণের নিজের "রাজ্যসম্বৎ" প্রচলিত ছিল, তাহার মীমাংসা করিবার উপায় নাই।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে "মাৎস্যন্যায়" প্রচলিত হইয়াছিল। তারানাথ লিখিয়া গিয়াছেন,—সমগ্র দেশের একচ্ছত্র অধিপতি না থাকায়, সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া, অরাজকতার প্রশ্রয় দান করিতেছিল। ইহাতে বাহুবলই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সবলের কবলে দুর্ব্বল-দল নিপীড়িত হইতেছিল। (৩) ধর্ম্মপালের [ খালিমপুরে আবিষ্কৃত ] তাম্রশাসনে এবং তারানাথের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—সেই "মাৎস্যন্যায়" দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রকৃতি-পুঞ্জ গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। (৪) এইরূপে পাল-রাজগণের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল ঐতিহাসিক বিবরণ স্মরণ করিলে মনে হয়, যিনি "মাৎস্যন্যায়ে"র বিপ্লবযুগে "রাঢ়াধিপ" ছিলেন, তিনি বা তাঁহার "নৃপবংশকেতু" পুত্র, গোপালদেবের নির্ব্বাচন-সময়ে, [ দেশের কল্যাণকামনায় ] স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া, "মহামাণ্ডলিক"

(৩) গৌড়রাজমালা।

(৪) গৌড়লেখমালা।

হইয়া, "সামন্ত"-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। এরূপ অনুমানের অনুকূল স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলেও, নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়,—এই তাম্রশাসনে ঘোষ-কুলের সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের যেরূপ সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা উল্লেখযোগ্য গৌরবের সম্পর্ক ;—একালের ঘোষকুল এ পর্য্যন্ত যত গৌরব লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহার তুলনায়, অধিক বলিয়াই কথিত হইবার যোগ্য। গৌড়ীয় সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল প্রাচ্য ভারতে প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিল। তৎকালে গৌড়জন সাহিত্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে ও রাজ্যশাসনে, সর্ব্বত্র মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। কেবল এক বর্ণের উন্নতিতে সমগ্র দেশের এরূপ উন্নতি সাধিত হইতে পারিত না। ইতিহাসের অভাবে সে কথা জনশ্রুতি হইতেও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য জ্ঞানোজ্জ্বল বিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয়েও, সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সময়ে সময়ে কিরূপ সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিতেছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইতিহাসের অভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অভাব বলিয়া অনুভূত হয়। অশেষশ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম. এ. মহোদয় [ "ঈষ্ট এবং ওয়েষ্ট" পত্রিকার প্রথম ভাগের ৬৬৮ পৃষ্ঠায় ] লিখিয়াছেন :—

"We are already turning for inspiration and guidance not to the hereditary priests of the people or their descendants, but to our Pauls and Sarkars, our Dasses and Ghoses, our Boses and Mitras, men sprung from the lower castes, whose ancestors did not occupy an enviable position in ancient Hindu Society."

সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্য ও ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন, আধুনিক শিক্ষিত সমাজের এইরূপ ধারণা কিয়ৎপরিমাণে দূর করিতে পারিলে, বাঙ্গালীর পুরাতত্ত্ব বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে। ইংরেজী শিক্ষার স্পর্শমণি-সংস্পর্শে আমাদের পাল-সরকার-দাস-ঘোষ-বসু-মিত্র মহোদয়গণ হঠাৎ সুবর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিলে, রচনালালিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর পুরাতত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। গুণগ্রাহী প্রাচীন সমাজ গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে "কলিকাল-বাল্মীকি" উপাধি প্রদান করিয়াছিল ; সন্ধ্যাকরের পিতা প্রজাপতি নন্দীকে "সান্ধিবিগ্রহিকে"র উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিল, এবং ঘোষকুলোদ্ভব "মহামাণ্ডলিক" ঈশ্বর ঘোষকে রাজাধিরাজের দক্ষিণ বাহুর ন্যায় রাজ্যশাসনের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিল ; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ "ভার্গব-সগোত্র-যমদগ্নি-ঔর্ব্ব-চ্যবন-আপ্নুবান্" প্রবর যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী ভট্টশ্রীনিবোকশর্ম্মা ঈশ্বর ঘোষের মাতাপিতার ও নিজের

কামনায় উৎসর্গীকৃত ভূমিদান গ্রহণ করিয়া, সমসাময়িক হিন্দুসমাজের সম্মুখে "ঘোষকুলে"র সামাজিক আভিজাত্যের সাক্ষ্যদান করিয়াছিলেন। এ সকল বিবরণ সেকালের সামাজিক পদমর্য্যাদা-সম্ভোগের সংশয়শূন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ। তাহার তুলনায় একালের পদগৌরব আধুনিক শিক্ষাসম্ভূত অজ্ঞাতপূর্ব্ব অভিনব গৌরব বলিয়া কথিত হইতে পারে কি না, পাল-সরকার-দাস-ঘোষ বসু-মিত্র-মহোদয়গণ তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন অবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক রচনায় যে সকল কথা অবলীলাক্রমে উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন অপবাদ,—সমগ্র হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ। ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন তাহার কথঞ্চিৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিবে; এবং গৌড়-গৌরবযুগের যে সকল লিপি-প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারিবে। রামগঞ্জে প্রাপ্ত বলিয়া ইহা "রামগঞ্জ লিপি" নামে অভিহিত হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

# পুনর্মিলন।

[ গার্হস্থ্য চিত্র। ]

নলিনীকান্ত গোবিন্দপুরের রাধাকান্ত প্রামাণিকের জ্যেষ্ঠপুত্র। রাধাকান্ত তাঁত বুনিয়া কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিত। দুই পুত্র ও পত্নী ভিন্ন সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না; কিন্তু চারি জনের পেট ভরাইতে পারে, তাহার তাঁতের সেরূপ শক্তি ছিল না; কাজেই তাহাকে কোনদিন উপবাসে, কোনও দিন অর্দ্ধোপবাসে কাটাইতে হইত। নিজের উপবাসের কষ্ট সে সহিতে পারিত, কিন্তু যখন তাহার শিশুপুত্র শ্রীকান্ত তাহার সম্মুখে আসিয়া ছলছলনেত্রে বলিত, "খিদে 'নেগেচে' বাবা, একটা পয়সা দাও, মুড়কী কিনে খাবো," তখন দারিদ্র্য-যন্ত্রণা ক্রূর কেউটের ন্যায় ফণা তুলিয়া তাহার বক্ষঃপঞ্জরে দংশন করিত। সে মনে করিত, তাঁত ফেলিয়া দিয়া কৌপীন পরিয়া ভিক্ষায় বাহির হইবে, এবং ঝুলি লইয়া গৃহস্থের দ্বারে 'রাধাকৃষ্ণ' বলিয়া দাঁড়াইবে।

কিন্তু সে ভেক লইতে পারিল না; অনাহারে, থাকিয়া অতি কষ্টে সংসার

হইয়া গ্রাম্য উচ্চপ্রাথমিক পাঠশালায় 'পণ্ডিতি' লাভ করিল। রাধাকান্ত ভাবিল, মা অন্নপূর্ণা এইবার যদি দু বেলা দু মুঠো মাপান!

পণ্ডিতি লাভ করিয়াই নলীনী কন্যাদায়গ্রস্ত গুঁই, বসাক, প্রামাণিক মহাশয়দিগের 'চারে' ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যাদব গুঁই কৈথালী গ্রামের সম্ভ্রান্ত তন্তুবায়। তাহার তিনখানি তাঁত, এবং চারিখানি লাঙ্গল। বাড়ীতে পাঁচটি প্রকাণ্ড গোলা, সোনার বর্ণ আমনধানে পূর্ণ; ঘরে প্রতিদিন সাত আট সের দুধ হয়। নলিনী ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তাঁহাকেই কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিল।—সমান ঘরে পুত্রের বিবাহ হয়, রাধাকান্তের ইহাই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু কৃতবিদ্য পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কোনও কথা বলে নাই। বিবাহের পর সে একদিন বলিয়াছিল, "ভাগ্যিমন্ত লোকের মেয়ে বিয়ে করলি, তোর বাপের একখানা তাঁতে তার ভার সইবে ত? পণ্ডিতি করে তুই আর কত টাকা আন্‌বি?"

নলিনী অভিমান করিয়া বলিল, "আমাদের ভার আর তোমাকে সইতে হবে না বাবা, তুমি ভেবো না।"

রাধাকান্ত অন্যমনস্কভাবে হুঁকা টানিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, "এতটা কাল যার ভার বয়ে এলাম, আজ সে আমাকে অক্ষম মনে ক'রলে! বুড়ো বয়সে আর বেঁচে সুখ নেই।"

২

নলিনী পণ্ডিতি আরম্ভ করিয়া ভদ্রলোক হইয়া গেল। পূর্ব্বে সে এক আধ বার তাঁতের কাছে বসিত; পণ্ডিত হইয়া সে সে দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। সে ভাবিত, তাঁতে পয়সা থাকিলে সে এতদিন বি. এ. পাশ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারিত। তাহার প্রতিবেশী গয়েজ ওস্তাগরের পুত্র কলিকাতার গুলু ওস্তাগরের লেনে তাহার 'নানা' (মাতার পিতৃব্য) কাবিল খলিফার দোকানে থাকিয়া বি. এ. পাশ করিয়াছিল; এখন পূর্ব্ববঙ্গে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী করিতেছে। ন্যায়বান ইংরাজ গবর্মেণ্টের এই সাম্যজ্ঞানের দিনে নলিনী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটীর লোভ করিলে আমাদের গ্রাম্য জমীদার দাশরথী মজুমদার মহাশয়ের আভিজাত্য-গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্দাহ ভিন্ন ইহাতে অন্য কোনও লাভ হয় না।

নলিনী পণ্ডিতি করিয়া যে কয়েকটি টাকা পাইত, তাহাতে তাহার ধুতি,

করিতেই ফুরাইয়া যাইত। অগত্যা অবশেষে সে জমীদার-বাড়ীতে 'টিউশনি' লইল। সে মনে করিয়াছিল, টাকা কয়টি তাহার পিতাকে দিয়া সাংসারিক ভারবহনে সাহায্য করিবে, কিন্তু একদিন তাহার শাশুড়ী নূতন উপার্জ্জনের কথা শুনিয়া তাহাকে বলিল, "গতর খাটিয়ে দু পয়সা আন্‌চো, উহা আমার শিবরাণীর কাছে জমাও। এখন থেকে দু টাকা জমাতে না পারলে চল্‌বে কেন ?"

শিবরাণী নলিনীর স্ত্রী। শাশুড়ীর উপদেশ তাহার অমৃতময় মনে হইল। তাহার পর যে দিন তাহার পিতা বলিল, "নলিন, ঘরে 'চাল' 'বাড়ন্ত'; কাল সকালে আধমোন চাল কিন্‌তে হবে। টাকা আছে ?" সেদিন নলিনী রাগ করিয়া বলিল, 'আমার খরচ তো দেখ্‌তে পাও না ? দুবেলা দু' পেট খেতে দাও, সে জন্যে যখন তখন খরচ চাইতে তোমার লজ্জা হয় না।"

নিজের নির্লজ্জতায় বৃদ্ধ অত্যন্ত দুঃখিত হইল। সে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "শ্রীকান্ত আমাকে এমন কথা কখনও বল্‌তে পারবে না। তোকে লেখাপড়া না শিখিয়ে তাঁতে বসানো ভাল ছিল।"

৩

স্বদেশী আন্দোলনের সময় রাধাকান্ত তাঁত বুনিয়া বেশ দু' পয়সা পাইয়াছিল। কাপড় বুনিয়া বাজারে লইয়া যাইলেই বস্ত্রব্যবসায়ীরা তাহা নগদ টাকা দিয়া কিনিয়া লইত। সকলেরই স্বদেশী কাপড়ের জন্য আগ্রহ, 'তাঁতের ধুতি' অধিক দাম দিয়াও লোকে কিনিত; দোকানদার যথেষ্ট লাভ পাইত বলিয়া বস্ত্রনির্ম্মাতাকে দু' পয়সা 'ধরিয়া' দিতে কাতর হইত না।

কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গের অবসানে, খণ্ড-বঙ্গের পুনর্মিলনের পর হইতে স্বদেশী ভাগীরথীতে ভাঁটা দেখা দিয়াছে। গ্রাম্য নেতার দল বলিতেছেন, "বঙ্গ-ভঙ্গের আদেশ রহিত হইয়াছে, বয়কট উঠিয়া গিয়াছে, 'পরিষ্কার' পরিচ্ছন্ন বিলাতী ছাড়িয়া তাঁতের ধুতি কেন পরিব ?" পল্লীগ্রাম হইতে স্বদেশী প্রায় উঠিয়া গেল। বস্ত্রবিক্রেতৃগণ মিলের কাপড় প্রায়ই আমদানী করে না। আমদানী করিলে তাহা বাজারে বিকায় না। 'পুঁজি'র টাকা এমন ভাবে 'আবদ্ধ' রাখিতে তাহারা সম্মত নহে। গ্রাম্য তন্তুবায়গণের বস্ত্র ত অচল হইয়া উঠিল,—এক জোড়া কাপড় বুনিয়া লইয়া রাধাকান্ত বাজারে গিয়া দেখিল, সকলে যে দাম বলে, তাহাতে সূতার খরচ উঠে না!—সেই জন্য সে রাজী হইলেও কেহ নগদ টাকা দিতে রাজী

গ্রন্থকারগণের অবস্থা অপেক্ষা আশাপ্রদ নহে। পুস্তকবিক্রেতা পুস্তক বিক্রয় করিয়া কমিশনের টাকা কাটিয়া লইয়া তাঁহাদের প্রাপ্য প্রদান করেন ; আবার অনেক পুস্তকবিক্রেতা অল্প কমিশনে পুস্তক রাখেন। শেষে গ্রন্থকার না পান টাকা, না পান পুস্তক!—ইহা অপেক্ষা রাধাকান্ত তন্তুবায়ের অবস্থা ভাল।

স্বদেশীর দুর্দ্দশা দেখিয়া রাধাকান্ত ক্ষুণ্ণমনে ধুতি চাদর ছাড়িয়া গামছা-বয়নে মনসংযোগ করিল। ম্যাঞ্চেষ্টার এখনও গ্রাম্য গামছাকে 'বয়কট' করিতে পারে নাই।

গামছা বুনিয়া যেটুকু অবকাশ পাইত, সে সময়টুকু রাধাকান্ত গাভী-পরিচর্য্যায় যাপন করিত। তাহার 'মঙ্গলা গাই', তাহার শ্বশুরের প্রদত্ত। সুতরাং মঙ্গলার সহিত তাহার জীবনের সুখদুঃখের অনেক স্মৃতি বিজড়িত।—মঙ্গলা এক সের দুধ দেয়, কিন্তু তাহাকে প্রতিপালন করা রাধাকান্তের সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বে বারো আনায় এক গাড়ী বিচিলি মিলিত, এখন তিন টাকাতেও পাওয়া যায় না। মসীনার খৈল পাইবার উপায় নাই। রাধাকান্ত একখানি 'খুরপো' ও একটি ছালা লইয়া প্রত্যহ অপরাহ্ণে মাঠে তৃণসংগ্রহে যাইত।

মঙ্গলা এক সের করিয়া দুধ দিত। নলিনীর মা তাহাতে আধসের জল মিশাইয়া জাল দিত, জলটুকু মরিয়া এক সেরই থাকিত। নলিনীর মা সেই দুধের বড় গৌরব করিত ; বলিত, "আমার দুধ গয়লার দুধের চেয়ে ভাল।" সে কথা সত্য!

রাধাকান্ত বৃদ্ধ বয়সে একটু আফিং খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। গৃহিণী তাহাকে আধ সের দুধ দিত, অবশিষ্ট আধসেরে সে ছেলে দুটির ও বৌমার দুগ্ধপিপাসা নিবারণ করিত।

শিবরাণী বাপের বাড়ী গিয়া মাকে এ কথা বলিয়া দিল। আধসের দুধ চারি জন পান করে, শুনিয়া শিবরাণীর মা হাসিয়াই অস্থির ; তাহার ঘরে দশ সের দুধ, আর তার মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়া আধ পোয়া দুধও পায় না, এ কথা মনে হইবামাত্র তাহার হাসি বন্ধ হইল, এবং নয়নদ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। নলিনী স্ত্রীকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য শ্বশুরবাড়ী আসিলে সে বলিল, "শিবরাণীর জন্য দুধের রোজ করে দিতে পার ত তাকে নিয়ে যাও, আমার দুধের মেয়ে, আধ পোয়া দুধ খেয়ে সে বাঁচবে না।"

নলিনী বাড়ী আসিয়া অগত্যা এক সের দুধের রোজ করিল। রাধাকান্ত

ক্ষুণ্ণমনে বলিল, "দুধের রোজ আর দরকার কি? মঙ্গলার যে এক সের দুধ হয়—তার তিন পোয়া বৌমাকে দিও, এক পোয়া নলিনী খাবে।"

গিন্নী বলিল, "আর তুমি? তোমার যে আফিংএর ধাত!"

রাধাকান্ত সাশ্রুনেত্রে বলিল, "আমি নবীন ময়রার দোকান থেকে ছানার জল এনে খাব। কি করি, আফিং ত আর ছাড়্‌তে পারিনে।"

রাধাকান্তের সাধ্বী পত্নীর নয়নে অশ্রুর সঞ্চার হইল; সে বলিল, "সার্থক ছেলে পেটে ধরেছিলাম।"

রাধাকান্ত বলিল, "ও কথা বলো না গিন্নী, নলিনী আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। শুনচি, এবার বাবুরা তাকে মিউনিসিপালের কমিশনার করবেন। কালেক্টর সাহেব বলে গিয়েছেন, 'তোমরা ঘরে ঘরে মিউনিসিপালিটীটা দখল করে' রেখেছ; শুনেছি, চোর পুষে মিউনিসিপালিটীর টাকাগুলির শ্রাদ্ধ করছে। বাইরের লোক থেকে কমিশনার নাও।'—তাই চেয়ারম্যান বাবু নলিনীকে কমিশনার করবেন।"

গিন্নী বলিল, "না না, নলিনীকে ও চাকরী নিতে বারণ কর; কখন কার টেক্‌স্ বাড়িয়ে দেবে, আর সে 'নির্ব্বংশ হ' বলে অভিসম্পাত করবে; আমরা দুটো কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে সংসার, খেতে পাই না পাই, বাছারা বেঁচে থাক।"

নলিনী সে কথা শুনিল। চেয়ারম্যান গোপীকৃষ্ণ মজুমদার জমীদার মহাশয়ের চেষ্টায় নূতন ইলেক্‌সনে সে গোবিন্দপুর মিউনিসিপালিটীর ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার হইল।—সেই বৎসরই বানরের হাতে খন্তা পড়িল; অর্থাৎ, নলিনী ও তাহার ন্যায় অপোগণ্ড আর একটি কমিশনর, এবং আবদুল মহম্মদ নামক একটি ডাক্তার কমিশনরের উপর নূতন 'এসেস্‌মেণ্টে'র ভার পড়িল। তাহার ফলে যাহার আট টাকা ট্যাক্স ছিল, তাহার বিশ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য হইল। শুনিতে পাওয়া গেল, ডাক্তার কমিশনার 'এসেস্‌মেণ্ট' আরম্ভে পূর্ব্বেই স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। অপোগণ্ডদ্বয় গ্রামবাসীদের দ্বিগুণ আড়াই গুণ ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়াছিল। গ্রামবাসীরা নলিনী ও তাহার সহযোগীর জন্য অপূর্ব্ব খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করিতে লাগিল। চেয়ারম্যান বিব্রত হইয়া বলিলেন, "ছোকরারা কি করেছে, জানি না; তোমরা এক একটা দরখাস্ত কর।"

নলিনীর মা সকল কথা শুনিয়া স্বামীকে বলিল, "আমি ত তখনই বলে-

রাধাকান্ত গরুর 'সানি' মাখিতে মাখিতে বলিল, "আমি ত কতদিন আগে বলিছি, নলিন আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।"

৪

রাধাকান্ত আফিং ও ছানার জল খাইয়া গামছা বুনিতে লাগিল। নলিনী পণ্ডিতি ও মিউনিসিপালিটীর কমিশনরী করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে রাধাকান্তর সংসারে এক আগন্তুকের আবির্ভাব হইল। নলিনীর একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।—স্ত্রীকে বাড়ী আনিবার পর হইতে নলিনী পিতাকে মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে সাহায্য করিত।—তাহার নিজের ও শিবরাণীর খোরাকও এই পাঁচ টাকার মধ্যে!

নলিনীর মা আক্ষেপ করিয়া প্রতিবেশিনীদের কাছে বলিত, "মাসে পাঁচ টাকা দেয়। ওদের দু জনেরই ত পাঁচ টাকার বেশী খোরাক লাগে। নলিনী মাসে পনর টাকা উপায় করে; আর তিনটে টাকা দিতেও ত পারে, তা দেয় না। নিত্যি বৌমার নূতন জামা কাপড় আনছে।"

কথাটা নলিনীর কানে গেল।

পরদিন শিবরাণী শাশুড়ীকে বলিল, "মা, তুমি ছোট ছেলেকে নিয়ে ভিন্ন হয়ে রেঁধে খাও। কর্ত্তা আমাদের দিকে থাকুন। তিনি যা রোজকার করেন, আমরা তার ভাগ চাইনে।"

নলিনীর মা স্বামীকে সকল কথা বলিল। শুনিয়া বৃদ্ধ রাধাকান্তের নয়নে আনন্দাশ্রুর সঞ্চার হইল। সে বলিল, "জানি আমি, নলিন আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। সে 'নায়েক ছেলে', তার হুকুম অমান্য করা যায় না। তা, তোমরা পৃথক হও, আমি নলিনের দিকেই থাকি। আমি তোমাদের দু' জনের পেটের ভাতের জোগাড় করে' দিতে পারবো।"

তর্ক উঠিল, গরুটা কোন ভাগে পড়িবে।—নলিনীর বাবা বলিল, "গরু যদি নাও, তবে তার ঘাসও তোমাকে কাটতে হবে।"

নলিনী বলিল, "তুমি যখন আমার ভাগে, তখন ঘাসও তোমাকে কাটতে হবে, দুধও আমরা নেব।"

রাধাকান্ত বলিল, "গরুটা তোর আজা মশায়ের, তোর মার সম্পত্তি। তার স্ত্রীধন আমার দান করবার অধিকার কি?"

শেষে স্থির হইল, শ্রীকান্ত ঘাস কাটিবে। দুধ আধ সের নলিনীর মা পাইবে,



মানব-মিত্র বিবেকানন্দ

[১৯০০ খৃষ্টাব্দ]

Mohila Press, Cal.



প্রেমের স্বপ্ন

চিত্রকর—বুশের।



রতির প্রসাধন

চিত্রকর—বুশের।

Mohila Press, Cal.

নলিনীর মা বলিল, "বুকের রক্ত দিয়ে তোকে মানুষ করেছি, সব দুধ তুই-ই রাখিস্।"

কিন্তু গরুটা ভাগে পড়িলেও রাধাকান্তের 'ছানার জল খাওয়া' বন্ধ হইল না। ক্ষীরো ঘোষাণী আধসের দুধে আধসের জল মিশাইয়া নলিনীর ছেলের জন্য 'উঠনা' দিতে লাগিল।

তিন দিন ভাত রাঁধিয়া, বাসন মাজিয়া ও ঘর নিকাইয়া শিবরাণীর জ্বর হইল। শাশুড়ী প্রাণপণে তাহার সেবা করিতে লাগিল। নলিনীর মা নলিনীর ভাঁড়ার হইতে চাল ডাল লইয়া স্বামীকে ও নলিনীকে রাঁধিয়া দিত, নিজে সে অন্ন স্পর্শ করিত না। পুত্রের সংসারের কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় নলিনীর মা নিজের 'উনন' জ্বালিয়া দুটি ভাত রাঁধিত, শ্রীকান্তকে খাওয়াইয়া নিজে আহার করিত। এই ভাবে কিছুদিন চলিল।

শিবরাণী রোগশয্যা হইতে উঠিয়া বুঝিতে পারিল, একটি ঝি ভিন্ন তাহার চলিবার উপায় নাই। কিন্তু পল্লীগ্রামেও এখনও ঝি রাখা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে; সে ঘরে খাইবে না; 'শুখা' বেতন চারি টাকা, তাহার উপর কাপড়, গামছা, তেল, জলখাবার আছে। যদি বা স্বজাতীয়া কোনও অনাথা ঘরে খাইয়া পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলেও তাহাতে খোরাক পোষাক চারি পাঁচ টাকার কম পড়ে না। নলিনীর আর্থিক অবস্থা এমন সচ্ছল নহে যে, সে ঝি রাখে। অগত্যা একদিন শিবরাণী শাশুড়ীকে বলিল, "তোমার আর 'আলাদা' হইয়া রান্না বান্না করিতে হইবে না, তুমি সংসারের ভার লও, আমার পৃথক হইবার সাধ মিটিয়াছে।"

নলিনীর মা পূর্ব্ববৎ সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিল; দাসীর ন্যায় পুত্রবধূর সেবা করিতে লাগিল। শিবরাণী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। আর তাহাকে 'হেঁসেলে' যাইতে হয় না, নদী হইতে জল আনা, রাঁধা, ঘর নিকানো, বাসন মাজা,—সংসারের সকল কাজই শাশুড়ী করে। আর সে সাবান মাখে, আয়নায় মুখ দেখে, মধ্যাহ্নে আহারান্তে নিদ্রা যায়; তাহার পর অপরাহ্নে উঠিয়া, ছেলে কোলে লইয়া প্রতিবেশীদের বাড়ীতে গল্প করিতে যায়।

নলিনীর মা সমস্ত দিন সংসারের কাজ করিয়া সন্ধ্যার সময় গ্রাম্য পুষ্করিণীতে গা ধুইয়া এক কলসী জল লইয়া আসে; তাহার পর তুলসীতলায়

মনে মনে বলে, "হে গোবিন্দ নারায়ণ মধুসূদন, আমার 'ছরত' থাকিতে থাকিতে তোমার ছিচরণে স্থান দাও।"

বেয়ান আবার পুত্রবধূর স্কন্ধে ভর করিয়াছে শুনিয়া নলিনীর শ্বাশুড়ী বড় অসন্তুষ্ট হইল। কিছুদিন পরে নলিনী শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিলে তাহার শ্বাশুড়ী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আলাদা হয়ে থাচ্ছিলে, আবার মাকে এনে জুটুলে কেন? পয়সা কি খুব সস্তা!"

নলিনী বলিল, "সস্তা নয় বলেই মাকে দুবেলা দুমুঠো খেতে দিতে হচ্ছে। মাসে পাঁচ টাকার কম একটা ঝি মেলে না। মাকে প্রতিপালন কর্‌তে পাঁচ টাকার চেয়ে অনেক কম খরচ হয়। বিনা পয়সায় এমন ঝি মিলবে না।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

---

# বংশানুক্রম।

৯

দেহ ও মন তুল্যরূপেই বংশানুক্রমের অধীন। * বংশানুক্রমের প্রভাব বহুক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইয়াছে; তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে, দেহ ও মন সমভাবেই বংশানুগত হয়; বরং দেহ অপেক্ষা মন কিঞ্চিৎ অধিকমাত্রায় হইয়া থাকে। যাহা হউক, বংশানুক্রমের নিয়ম অনুসরণ করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, অপর সাধারণের বংশ অপেক্ষা, যোগ্য ব্যক্তির বংশেই অধিকসংখ্যক যোগ্য ব্যক্তি জাত হওয়া সম্ভব, অযোগ্য ব্যক্তির বংশে অধিকসংখ্যক যোগ্য ব্যক্তি উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। মৃত মহাত্মা গ্যাল্টন দেখাইয়াছেন যে, অতি নিম্নশ্রেণীর প্রায় আড়াই হাজার ব্যক্তি হইতে তিনটি সুযোগ্য অপত্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উত্তম শ্রেণীর ৩৫ জন ব্যক্তি হইতেই তাহার দ্বিগুণ সুযোগ্য অপত্য-লাভ হইয়া থাকে। † এই সকল সংখ্যা দেশভেদে বিভিন্ন হইতে পারে;

দৃষ্টান্ত।

---

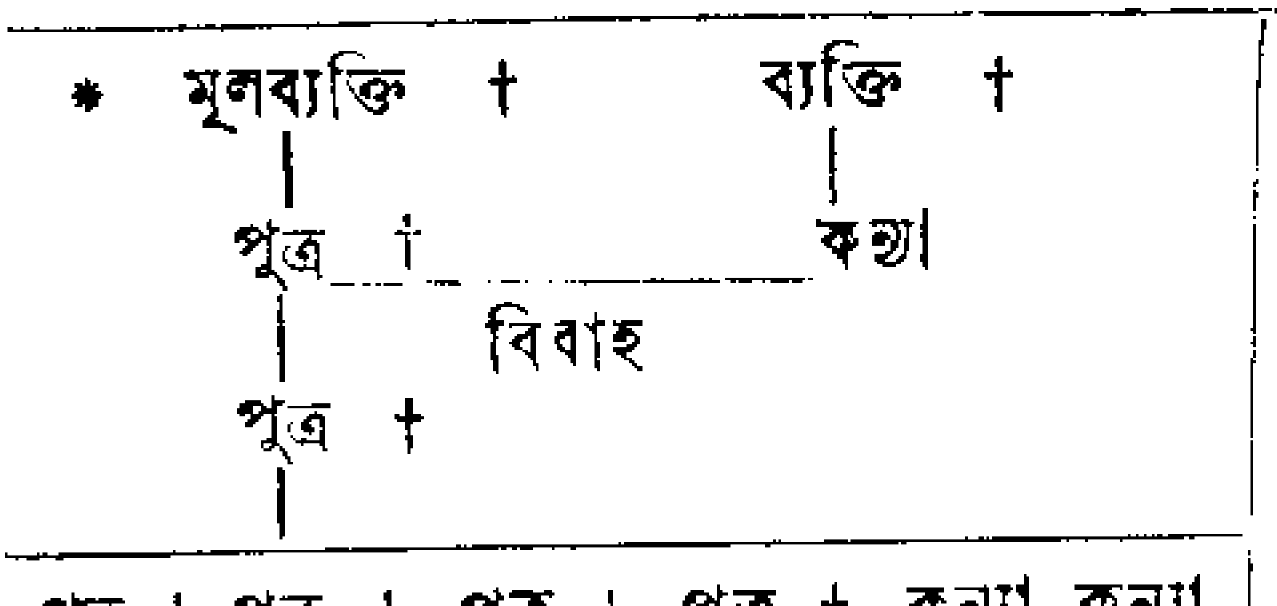
* To sum up, there appears no doubt that good or bad physique, * * * the moral characters the mental temperament are INHERITED in man, and with much the same intensity.

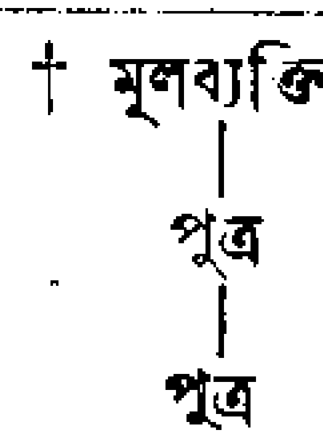
Pearson's "On the scope and importance to the state of the science of national Eugenics". P. 33.

† 35 V. class parents suffice to give 6 sons of the V. Class; it

কিন্তু তিনি যে মীমাংসা করিতেছেন, তাহা অসত্য নহে। তিনি বহুসংখ্যক যোগ্য এবং অযোগ্য ব্যক্তির বংশ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, সমাজ-মধ্যে যোগ্য ব্যক্তির আধিক্য দেখিতে ইচ্ছা করিলে, যোগ্যবংশীয় নরনারী-দিগকে পরিণীত করিবার চেষ্টা করাই সহজ পন্থা; অযোগ্য-বংশীয়গণকে কোনও উপায়ে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিলে তাদৃশ ফললাভ করিবার আশা করা যায় না।

অধ্যাপক পিয়াসনের সংগ্রহ হইতে নিম্নের বংশাবলী উদ্ধৃত করা গেল।* এফ্. আর. এস্. উপাধিধারিগণ অনেকেই অসাধারণ প্রতিভাশালী। এই তালিকাতে এফ্. আর. এস. শব্দের পরিবর্ত্তে † চিহ্ন ব্যবহার করা গেল। দেখা যাইতেছে যে তিন পুরুষের মধ্যে ৭ জন ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ ঐ উপাধিধারীর পুত্র এবং ঐ উপাধিধারীর কন্যা পরিণীত হইবার ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষে ৫ জন এফ্. আর. এস্. উৎপন্ন হইয়াছে। আমার সংগ্রহ হইতে একটি দৃষ্টান্তের † উল্লেখ করিতে পারি, কিন্তু নাম প্রকাশ করিবার অনুমতি না পাওয়ায় প্রচ্ছন্ন রহিল। মূল ব্যক্তি অসাধারণ প্রতিভাশালী ডাক্তার ছিলেন; তাঁহার পুত্রও অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দেশবিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক। ইঁহার একটিমাত্র শিশু পুত্র; বয়স ২।৩ বৎসর। এই বয়সেই তাহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমার পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দৌহিত্র ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের বিশেষ বিখ্যাত পণ্ডিত। পিতৃদেব অতিশয় বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পৌত্রও ছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে, তাঁহাকে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, ধর্ম্মপ্রাণ এবং বিষয়বুদ্ধিশালী দেখিতে পাইয়াছি। যাহা হউক, দৃষ্টান্ত আর বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। মোটের উপর, প্রতিভা বংশানুগত, ইহা গ্যাল্টন্ বহু পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন। তবে কখনও কখনও পিতৃপ্রতিভা পুত্রে সংক্রামিত হয় না। তদ্রূপ স্থলে "সাধারণ



সন্নিকর্ষে”র নিয়ম প্রবল হয়। এই নিয়ম পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। কিন্তু পিতা মাতা উভয়েই অধিক প্রতিভাশালী কিংবা অল্পবুদ্ধি হইলে নিয়ম খাটে না। তখন প্রথম ক্ষেত্রে পুত্র আরও প্রতিভাসম্পন্ন হয়; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আরও অল্প বুদ্ধি হইয়া থাকে।

বংশানুক্রমের আলোচনা কালে একটী কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত।

কর্ম্ম বংশানুগত নহে।

কথাটি এই যে, কর্ম্ম স্বভাবতঃ বংশানুগত নহে। তবে, পিতা পুত্রকে স্বীয় অত্যস্ত কর্ম্ম শিক্ষা দিলেন, পুত্র ঐ শিক্ষা-গ্রহণের উপযোগী হইলে সে ঐ কর্ম্মই অবলম্বন করিল;—এ কথা পৃথক। স্বভাবতঃ দেহ, সুতরাং মনও বংশানুগত, কর্ম্ম নহে। দেহ, এবং মন পিতা হইতে পুত্রে, পুত্র হইতে পৌত্রে চলিয়া আসে। ঐ দেহ এবং মন দ্বারা পিতা এক কর্ম্ম, পুত্র অন্য কর্ম্ম, পৌত্র পৃথক আর এক কর্ম্ম করিতে পারে; সকলই এক কর্ম্ম করিবে, এমন কোনও কথা নাই। অথবা এক ব্যক্তিই তাহার দেহ ও মন দ্বারা যত প্রকার কর্ম্ম সম্ভব, সমস্তই করিতে পারে। এক জন বাঙ্গালী সার্কাসে হিংস্র জন্তুর সহিত ক্রীড়া করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বিবেচনা করুন, ইঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, বিশেষতঃ স্নায়ু-সংস্থান কিরূপ ছিল।* নিশ্চয়ই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সাহস, তিতিক্ষা, অনন্যমনস্কতা, ধীরতা ইত্যাদি উপকরণ তাঁহার অধিক ছিল। ঠিক এই সকল গুণ সন্ন্যাসীরও আবশ্যক; নচেৎ তিনি সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবৎ-ধ্যানে মগ্ন হইতে পারেন না।† তাঁহার দেহ ও মন দুদিনেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ সকলের সহিত উভয় ক্ষেত্রেই একটু ঝোঁক্‌ও থাকা আবশ্যক। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, ঐ সার্কাসপ্রিয় পশু-ক্রীড়ক মুহূর্ত্তমধ্যে সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার দেহ ও মন দ্বারা কত বিভিন্ন কর্ম্ম সিদ্ধ হইল। ঐ পশু-ক্রীড়কের পুত্র যদি যোগীর ন্যায় ভগবদ্ভক্ত হইত, আমরা আশ্চর্য্য বোধ করিতাম। কিন্তু আশ্চর্য্যান্বিত হইবার বিশেষ কিছু নাই।

আবার বিবেচনা করুন, এক জনের হস্তের অঙ্গুলিগুলি সরু এবং লম্বা, কিন্তু বল-যুক্ত, এবং কিঞ্চিৎ পৃথকভাবে অবস্থিত। তিনি তদ্রূপ অঙ্গুলি দ্বারা গর্ভস্থ ভ্রূণ প্রসব করাইতে অন্যের অপেক্ষা অধিক সমর্থ হইতে পারেন।

এইরূপ অঙ্গুলি হার্মোনিম বাজাইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক; শেলাই কার্য্যেও উত্তম। সুতরাং [ অন্যান্য কারণ বিবেচনা না করিয়া শুধু অঙ্গুলিমাত্রই বিবেচনা করিলে ] বুঝা যাইবে যে, তিনি স্বয়ং ধাত্রীবিদ্যার অন্তর্গত প্রসব করান কার্য্যে দক্ষ হইতে পারেন, তাঁহার পুত্র ঐরূপ অঙ্গুলি পাইয়া থাকিলে, উত্তম হার্ম্মোনিয়ম-বাদক হইতে পারেন, এবং পৌত্র ঐরূপ স্থলে শেলাই কার্য্যে যশস্বী হইতে পারেন। অর্থাৎ, ঐ অঙ্গ দ্বারা যত প্রকার কর্ম্ম হওয়া সম্ভব, সমস্তই হইতে পারে। পিতা প্রসবকারক, পুত্র বাদ্যযন্ত্র-বাদক, পৌত্র-শেলাই পটু বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। এরূপ ক্ষেত্রে বংশানুক্রমের নিয়ম প্রতিপালিত হইল। খণ্ডিত হইল না। কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে ভ্রম ক্রমে বংশানুক্রমের ব্যতিক্রম, মনে করিতে পারেন। বস্তুতঃ ইহা তাহা নহে।

এতদ্দেশে ধাতুকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়। যথা, বায়ু, পিত্ত, কফ। ইহাদিগের প্রত্যেক শ্রেণীকেও তিন ভাবে বিভক্ত করাই প্রথা; যথা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। বায়ুপ্রধান ব্যক্তিও সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক হইতে পারে; পিত্তপ্রধান ব্যক্তিও তাহাই, এবং কফপ্রধান ব্যক্তিও তদ্রূপই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। এই সকল শব্দ উচ্চারণ করা কিংবা লেখা যত সহজ, বুঝা তত সহজ নহে। যাহা হউক, এই সকল শব্দ বিবেচনা করিলে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হয়, যে বায়ু প্রধান, পিত্ত প্রধান, ও কফ-প্রধান ব্যক্তিগণ সাত্বিক হইলেও, বিভিন্ন প্রকারের কর্ম্মী হইবে; রাজসিক হইলেও তাহাই; তামসিক হইলেও তাহাই। এই কথাই অন্য ভাবে বলিলে প্রতীয়মান হইবে যে, সাত্বিক ব্যক্তি বায়ুপ্রধান হইলে এক প্রকার কর্ম্ম করিবে, রজঃপ্রধান হইলে অন্য প্রকার, এবং তমঃপ্রধান হইলে পৃথক আর এক প্রকার কর্ম্ম করিবে।* এইরূপ রাজসিক, তামসিক, সকল প্রকার ব্যক্তি সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, জগতে যেমন দেহে ও মনে বংশ-পরম্পরায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই, তেমনই কর্ম্মেও নাই। বরং দেহে ও মনে যে পরিমাণে সাদৃশ্য বংশানুক্রমে লক্ষিত হয়, কর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাও হইতে পারে না। সমদেহ এবং সমভাবাপন্ন ব্যক্তিগণেরও কর্ম্ম অত্যন্ত পৃথক। তুল্যাকৃতি যমজ ভ্রাতারাও কেমন বিভিন্ন কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহা প্রায়

* কেহই কেবলমাত্র একটি গুণের আধার নহে। গুণত্রয় মিলিয়াই ব্যক্তি। তবে,

সকলেই জানেন। সুতরাং কর্ম্ম বংশানুগত নহে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পিতা ধার্ম্মিক, পুত্র লম্পট; এরূপ স্থলে অনেকেই চমৎকৃত হন। তাঁহারা বংশানুক্রমের নিয়ম সকল এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে অসম্মত হন। কিন্তু যে পিতা একাগ্রচিত্তে ভগবানকে চিন্তা করিয়া আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া, গৃহত্যাগ করিয়া, ধ্যানমগ্ন হইয়া গেলেন; এবং যে পুত্র একাগ্রচিত্তে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা আশ্রয় করিয়া আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া, ধন, ঐশ্বর্য্য, গৃহাদি ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া, কেবল লাম্পট্যেই মগ্ন হইয়া গেল;—এতদুভয়ে ধাতুগত বিশেষ প্রভেদ কিছু দেখা যায় না। কেবল আশ্রয়ভূত পদার্থের পার্থক্য। অর্থাৎ, একের আশ্রয় ভগবান; তিনি তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। অন্যের আশ্রয় ইন্দ্রিয়সেবা; সে উহা ভিন্ন আর কিছুই গ্রাহ্য করে না। সুতরাং ধার্ম্মিকের পুত্র লম্পট হইলে ধাতুগত কিংবা বীজগত সাদৃশ্যই রক্ষিত হইল, কেবল কর্ম্মগত পার্থক্য। এক জন ডাকাত প্রকাশ্যভাবে দিনে ডাকাতী করিয়া গৃহস্থের ধন লুণ্ঠন করিত। তাহার পুত্র শিক্ষালাভ করিয়া বিচারপতি হইয়াছিল। তখন সে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া উৎকোচদাতাকে মকদ্দমায় জয়ী করিয়া দিত। ইহাও কি লুণ্ঠন নহে? পরে যখন সে অন্য কার্য্য গ্রহণ করিল, তখনও স্বীয় প্রভুর অনিষ্ট করিয়া অসদুপায়ে অবৈধ উপার্জ্জন করিয়াছিল। ইহাও কি লুণ্ঠন নহে? এ সকল স্থলে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছু নাই। ধাতুগত সাদৃশ্য থাকিলেও, কর্ম্মগত বিভিন্নতা থাকিতে পারে। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যেও মূলে সমতা, (অর্থাৎ উদ্দেশ্যের সমতা) আছে, ইহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই প্রতীয়মান হইবে। বংশানুক্রমের প্রভাব সত্ত্বেও কর্ম্মের আকৃতিগত পার্থক্যমাত্রই লক্ষিত হইয়া থাকে; তাহাতে মূল ভাবের একতা নষ্ট হয় না।

বেষ্টনী।

কর্ম্মের প্ররোচক ভাব প্রকৃতপক্ষে বংশানুক্রমিক বীজ-বস্তুরই ফল, তবে উহা কখন কোন মূর্ত্তিতে ব্যক্ত হইবে, তাহা সাময়িক বেষ্টনীর উত্তেজনাসম্ভূত। বহু স্থলে এই কথা সত্য, কিন্তু এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। যে উত্তম হার্মোনিয়ম-বাদক হইতে পারিত, তাহার পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীতে ঐ যন্ত্র কখনই না থাকায় সে উহার উত্তেজনা কখনও প্রাপ্ত হইল না, সুতরাং সে হার্মোনিয়ম-বাদকও হইল না।

শেলাইপটু হইল। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও বহু স্থলে দেখা যায় যে, চতুষ্পার্শ্বস্থ বেষ্টনীমধ্যে সূচের কর্ম্মের বিশেষ উত্তেজনা থাকিলেও, কোথাও এক ব্যক্তি সে উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইল্ না, তাহার উপর ঐ উত্তেজনা ক্রিয়া করিল না; সুতরাং তাহার শেলাই শিক্ষা হইল না। তাহার বীজগত ধাতু ঐ উত্তেজনার প্রতিকূল। ধাতু এবং বেষ্টনী-সম্ভূত উত্তেজনা,—এতদুভয়ে পার্থক্য হইলে ধাতুই প্রবল হইয়া থাকে; বেষ্টনী পরাভূত হইয়া কর্ম্মে বিকাশ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ধাতুই মূল ও প্রধান কথা; পারিপার্শ্বিক বেষ্টনী তাহারই অনুগত। যাহা বীজ-বস্তুতে আছে, তাহাই ব্যক্তিতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়; যাহা নাই, তাহা বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু বিকাশকার্য্যে বেষ্টনীর শক্তি অধিক নহে। * কিন্তু কেহ কেহ বেষ্টনীকেই সর্ব্বশক্তির আধার বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভ্রান্ত।

শ্রীশশধর রায়।

---

# যাত্রা।

[ আলো ও ছায়া রচয়িত্রী রচিত। ]

১

দূরে ছিনু, প্রাণপণ সাধনার ফলে
আনিলে নিকটে মোরে। কোন ইন্দ্রজালে
দেখেছিলে দেবপ্রভা মানবীর ভালে?
ঢেলে দিলে, অযাচিত, এ চরণতলে
তোমার সর্ব্বস্ব? শীত উন্নত অচলে
কঠিন তুষার ছিনু, ধরায় নামালে
গলাইয়া বিন্দু বিন্দু; দেখি শেষকালে
শক্ত নহি, শুভ্র নহি, পরিণত জলে।

---

* What is present in the germ-cell will be present in the individual; * * external conditions as a rule play but a small part in determining its appearance. Doncaster's "Heredity in the light of

এ জলে তোমার তৃষা কর পরিহার,
সমূলে সংহার কর মোর লাজ ভয় ;
অচেনা এ দেশ, আমি লুকাইতে চাই
তোমার হৃদয়-গেহে। কি কহিব আর—
ছুটিলে এ ইন্দ্রজাল, টুটিলে প্রণয়,
মোর তরে নাহি আর দাঁড়াবার স্থান।

২

দূর হ'তে যবে মোরে ভালবাসা দিতে,
বলেছি সহস্র বার, "করি না প্রত্যয়
প্রেমের স্থায়িত্বে আমি ; কভু নাহি সয়
নর-ভাগ্যে এত সুধা।" কাতরে মাগিতে
নিত্য তুমি প্রেম মম, আমি শান্ত-চিতে
ফিরায়ে দিতাম তোমা। কিসে যে কি হয়—
কে বলিতে পারে কিন্তু! কালে পায় ক্ষয়
কঠিন পর্ব্বত-দেহ শিশিরে বৃষ্টিতে।
তোমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করেছে আমার
বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা। একদা প্রভাতে,
দুঃস্বপ্নপীড়িত চিত্ত, কি বেদনাভরে
উঠিলাম, বাহিরিতে খুলি গৃহদ্বার
সম্মুখে দেখিনু তোমা ; হাত রাখি হাতে
সুধা'নু,—"এসেছ পুনঃ এ জনেরি তরে ?"

৩

কহিলে, "তোমারি তরে এসেছি আবার,
যত ফিরাইয়া দাও, হয় দৃঢ়তর
তত আকর্ষণ তব। নিরাশার পর
আবার জেগেছে আশা ; নাশি' অন্ধকার
জাগে যথা উষা নিত্য। দেখ চারি ধার
কি আলোক, কি সঙ্গীত ; দেখ, কি সুন্দর
জীবন-তরঙ্গ-রঙ্গ! দুঃস্বপ্ন-কাতর

এই শুভ্র দিবালোকে চল দু জনায়
খুঁজি জীবনের সিদ্ধি। বিশাল জগৎ,
প্রেমের আনন্দ-গীতি, কর্ম্ম-কোলাহল,
সুখের দুঃখের স্রোত কত বহি যায়
পাশাপাশি। চল যাই ধরি প্রেম-পথ
দু জনে লভিয়া প্রাণে দু জনের বল।"

৪

আমি স্বপনের রাজ্যে ভ্রমি নিশিদিন,
ঘন অন্ধকার, কিবা রৌদ্র অতিশয়,
সমান দুঃসহ মম। আমার হৃদয়
অস্ফুট-কামনা-ভরা; গোধূলি-বিলীন
ক্ষুদ্র তারকার মত শত আশা ক্ষীণ
জ্বলিতেছে খুঁজি এক অটল আশ্রয়।
তোমার আমার পথ হয় কি না হয়
এক দিকে, বিচারিয়া দেখ হে প্রবীণ।
পিপাসিত তুমি যার তরে, সে প্রণয়
আমি কি পারিব দিতে, মিটায়ে পিয়াস?
পারিব কি চিরদিন ধরি এক পথ
চলিবারে এক সাথ, সদা নিঃসহায়?
জাগিবে না চিতে তব নব অভিলাষ,
পূর্ণ হলে আজিকার এই মনোরথ?

৫

কহিলে—"প্রণয়ে মোর কর গো প্রত্যয়;
বারবার প্রত্যাখ্যাত আসি বারবার;
সকল আশার মম, সর্ব্ব কামনার
সিদ্ধি তব প্রেমলাভ, জানিও নিশ্চয়।
তোমার হৃদয়ে প্রেম নাও যদি রয়,
আমার এ প্রেম গিয়া করিবে সঞ্চার
তোমাতে কনকশিখা; সুন্দর সংসার

জান না প্রেমের ধর্ম্ম? যথা দাবানল
কাননের কোন প্রান্তে শুষ্ক তরু-শাখে
জ্বলিয়া, বর্দ্ধিত-তনু, সর্ব্বদিক ধায়,
সরস নীরস তরু, লতা-গুল্ম-দল
অনল করিয়া লয়, কিছু নাহি রাখে,
এ প্রেম লইবে তথা তোমার হৃদয়।"

৬

কহিনু,—সার্থক হোক তোমার প্রণয়।
তুমি আপনারে দিয়া যদি সুখ পাও,
আমাতে যা আছে, যদি শুধু তাই চাও,
তোমার অতৃপ্তি, মোর অপুণ্য না হয়,
তবে আমি ত্যজিলাম ভবিষ্যের ভয়।
বিশাল হৃদয় তব, যদি পার, তা'ও
কর গো বিশালতর, তাহে স্থান দাও
সব দোষে গুণে মোরে,—হোক তব জয়।
বহু ভার বহে নারী, বহু ভার সহে,
কেবল নিজের ভার দুর্ব্বহ তাহার,
এ বোঝা নামায়ে লও। চল মোর আগে
দেখাইয়া পথ মোরে। যদি অশ্রু বহে,
ঢাকে আঁখি, কর স্পর্শে করিও সঞ্চার
নব দৃষ্টি, দীপস্পর্শে দীপ যথা জাগে।

---

# বিদেশী গল্প।

## প্রতিদ্বন্দ্বী।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। জর্ম্মনেরা ফরাসী রাজ্য অধিকার করিয়াছে। সমগ্র দেশটা যেন আজ বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর পদতলে শায়িত, অবসন্নদেহ মল্লের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

দীর্ঘকাল অনশনে পীড়িত, যন্ত্রণা ও নৈরাশ্যে অবসন্ন নগরবাসী আজ প্রথম ট্রেনযোগে প্যারী নগরী হইতে সীমান্ত প্রদেশে গমন করিতেছিল। রেল-গাড়ী মন্দগতিতে পল্লী ও নগরের

পদভরে বিদলিত, পল্লীকুটীর ভস্মীভূত হইয়াছে। যে সকল কুটীর ভাগ্যক্রমে অগ্নিদেবের লেলিহান রসনা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, তাহাদের বহির্দ্বারে চেয়ার পাতিয়া কোনও কোনও প্রুসীয় সৈনিক ধূমপান করিতেছে; কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে কুটীর-সম্মুখে বিচরণ করিতেছে। কোনও কোনও সৈনিক, যেন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আত্মীয়ের ন্যায় গৃহকর্ম্মে রত, কিংবা হাস্য পরিহাস ও গল্প করিয়া বেড়াইতেছে।

মঁসিয়ে ডুবিয়ে, নগরের অবরোধকালে, প্যারী নগরীতে "জাতীয় রক্ষী সৈন্যে"র দলভুক্ত ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমানের মত শত্রুর অভিযানের পূর্ব্বেই স্ত্রী ও কন্যাকে সুইজারলাণ্ডে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে আজ তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য রেলযোগে গমন করিতেছিলেন।

দুর্ভিক্ষ, অনশন ও নানারূপ কষ্টেও, ঐশ্বর্য্যশালী শান্তিপ্রিয় বণিকের বিশেষত্বসূচক মঁসিয়ে ডুবিয়ের বিপুল উদরটির আয়তনের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। বিগত বর্ষের ভীষণ ঘটনাবলী তাঁহার চক্ষুর উপর অভিনীত হইয়াছে। তিনি মানুষের প্রতি মানুষের পশুর ন্যায় নিষ্ঠুর ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। করুণায় অনুকম্পায় হৃদয় দ্রবীভূত হইলেও ডুবিয়ে নির্ব্বাকভাবে সব সহ্য করিয়াছেন। কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। যুদ্ধশেষে সীমান্ত প্রদেশে গমনকালে এই প্রথম তিনি প্রুসীয় সৈন্য দেখিলেন। দুর্গ-প্রাকারে থাকিয়া ফরাসী সৈন্য যখন নগর রক্ষা করিতেছিল, ডুবিয়ে তখন সেখানে ছিলেন বটে, কিন্তু কোনও প্রুসীয় সৈনিক কখনও তাঁহার নয়নপথে পতিত হয় নাই।

শ্মশ্রুল, শস্ত্রপাণি শত্রু-সৈন্যের দিকে চাহিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ আতঙ্ক ও ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাহারা সমগ্র ফরাসী রাজ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এ দেশ যেন তাহাদেরই স্বদেশ! এ কথা মনে করিয়া মঁসিয়ে ডুবিয়ের হৃদয়ে বন্ধ্যা স্বদেশানুরাগ জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার আত্মরক্ষার সংকল্প ও হিতাহিতজ্ঞানও প্রবল হইয়া উঠিল। সেই কামরায় দুইটি ইংরাজ আরোহীও ছিলেন। তাঁহারা তামাসা দেখিবার অভিপ্রায়ে ফ্রান্সে আসিয়াছিলেন। আরোহিদ্বয় বলিষ্ঠ ও স্থূলকায়। তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষায় আলাপ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে 'রেলওয়ে-গাইড্' বই লইয়া ষ্টেশনের নামগুলি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিলেন।

সহসা ট্রেন একটি পল্লী-ষ্টেশনে থামিল। জনৈক প্রুসীয় সামরিক কর্ম্মচারী লম্ফ দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন; তাঁহার কটিবিলম্বিত তরবারী ঝম্‌ঝম্ শব্দ করিয়া উঠিল। লোকটি দীর্ঘাকায়, অঙ্গে সামরিক পরিচ্ছদ; তাঁহার মুখমণ্ডল অত্যন্ত শ্মশ্রুল। সৈনিক পুরুষের কেশরাজি রক্তবর্ণ, যেন সর্ব্বদাই উহাতে আগুন লাগিয়া রহিয়াছে!

ইংরাজ আরোহীরা ঈষৎহাস্যস্ফুরিতাধরে নবাগতের প্রতি সকৌতূহল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মঁসিয়ে ডুবিয়ে সংবাদপত্র-পাঠের ভাণ করিলেন। পুলিস-কর্ম্মচারীকে দেখিয়া তস্কর যেমন শঙ্কিত হয়, তিনিও সেই ভাবে গাড়ীর এক কোণে বসিয়া রহিলেন।

গাড়ী ছাড়িল। ইংরাজেরা ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধস্থল দেখিয়া তৎসম্বন্ধে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আলোচনাকালে এক জন যখন দিকচক্রবালে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক

একটি গ্রামের উল্লেখ করিলেন, তখন প্রুসীয় সামরিক কর্ম্মচারী পদযুগল বিস্তৃত করিয়া ফরাসী ভাষায় বলিলেন, "ঐ গ্রামে আমরা বার জন ফরাসীকে মারিয়া ফেলিয়াছি, এবং শতাধিক লোককে বন্দী করিয়াছি।"

এক জন ইংরাজ যাত্রী কৌতূহলী হইয়া তখনই জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রামটির নাম কি ?"

প্রুসীয় সৈনিক পুরুষ বলিলেন, "ফারস্‌বার্গ।" তার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমরা এই সব ইতর ফরাসীর কান ধরিয়া ঘুরাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি অবজ্ঞা ও উপহাসসূচক হাস্যসহকারে মঁসিয়ে ডুবিয়ের প্রতি চাহিলেন।

বিজয়ী সেনাদলের অধিকৃত গ্রাম ও পল্লীর মধ্য দিয়া ট্রেন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল। রাজপথে, শস্যক্ষেত্রে, গৃহদ্বারে, সর্ব্বত্রই জর্ম্মন সৈনিক! পঙ্গপালের ন্যায় তাহারা ফরাসীদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সামরিক কর্ম্মচারী হাত নাড়িয়া বলিলেন, "যদি আমি প্রধান সেনাপতি হইতাম, তাহা হইলে প্যারী নগরী লুঠ করিয়া বাড়ী ঘরে আগুন দিয়া সব পুড়াইয়া দিতাম। একটা ফরাসীকেও জীবিত রাখিতাম না। ফরাসীর নাম পৃথিবী হইতে লুপ্ত করিতাম।"

ইংরাজ আরোহী শিষ্টতার অনুরোধে বলিলেন, "বটেই ত!"

প্রুসীয় কর্ম্মচারী বলিয়া চলিলেন, "আর বিশ বৎসর পরে সমগ্র ইউরোপ আমাদের অধিকারে আসিবে। প্রুসিয়া সমবেত শক্তিপুঞ্জকে পরাজিত করিতে সমর্থ।"

ইংরাজ আরোহীরা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু এ কথার কোনও উত্তর করিলেন না। প্রুসীয় সামরিক কর্ম্মচারী হাসিতে লাগিলেন। ফরাসীর পরাজয়ে তিনি বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন, ধূলিশায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপমানিত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। অষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য সংপ্রতি অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া, তাহার প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। সর্ব্ববিষয়ে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন যে, মন্ত্রী বিসমার্ক অধিকৃত কামান-পুঞ্জ লইয়া একটি লৌহময় নগর স্থাপন করিবেন। বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তিনি তাঁহার স-বুট পদযুগল মঁসিয়ে ডুবিয়ের উরুদেশে প্রসৃত করিয়া দিলেন। ডুবিয়ের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি একবার ফিরিয়া চাহিলেন।

ইংরাজ আরোহীরা ঘটনাটা যেন লক্ষ্যই করিলেন না। তাঁহারা তখন যেন জগতের কোলাহল হইতে বহু দূরে—আপনাদের দ্বীপে বসিয়া আছেন।

সামরিক কর্ম্মচারী পকেট হইতে ধূমপানের নল বাহির করিলেন। ফরাসী আরোহীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কাছে তামাক আছে ?"

মঁসিয়ে ডুবিয়ে বলিলেন, "না, মহাশয়।"

জর্ম্মন বলিলেন, "এবার গাড়ী থামিলে, নামিয়া গিয়া আমার জন্য কিছু তামাক কিনিয়া আনিবে।"

তার পর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি তোমাকে মদ্যপানের জন্য কিছু দিব।"

বাঁশী বাজিয়া উঠিল, ট্রেনের গতি কমিয়া আসিল। এখন যেখানে ট্রেন থামিল, সে ষ্টেশনটি অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

জর্ম্মণ সামরিক কর্ম্মচারী গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিলেন, মঁসিয়ে ডুবিয়ের হাত ধরিয়া বলিলেন, "যাও, যা বলেছি কর—শীঘ্র যাও!"

এক দল প্রুসীয় সৈন্য সেই ষ্টেশনে অবস্থান করিতেছিল। এঞ্জিন হইতে ধূম নির্গত হইতেছিল, এখনই গাড়ী ছাড়িবে। মঁসিয়ে ডুবিয়ে তাড়াতাড়ি প্লাটফরমে নামিয়া পড়িলেন, এবং ষ্টেশন-মাষ্টারের নিষেধ সত্ত্বেও পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে উঠিয়া পড়িলেন।

* * * * *

সে কক্ষে আর কেহ ছিল না! ক্ষিপ্রহস্তে তিনি ওয়েষ্ট-কোটটি খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বক্ষ দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতেছিল, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তিনি ললাট হইতে স্বেদ-ধারা মুছিয়া ফেলিলেন।

আর একটি ষ্টেশনে ট্রেন থামিল। অকস্মাৎ সেই জর্ম্মন সামরিক কর্ম্মচারী ডুবিয়ের কামরার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এক লম্ফে তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইংরাজ আরোহীরাও কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহার পশ্চাতে সেই কামরায় উঠিলেন। ফরাসীর সম্মুখস্থ আসনে বসিয়া জর্ম্মণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি তোমাকে যা করিতে বলিলাম, তাহা তুমি করিতে সম্মত নও?"

মঁসিয়ে ডুবিয়ে বলিলেন, "না, মহাশয়।"

তখন ট্রেন ছাড়িয়া দিয়াছিল।

সৈনিক পুরুষ বলিলেন, "আমি তোমার গোঁফ জোড়া ছিঁড়িয়া লইয়া আমার নলে ভরিব।"

তিনি ফরাসীর মুখের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন।

ইংরাজ যাত্রীরা নির্ব্বিকারচিত্তে তাঁহাদের পানে চাহিয়া রহিলেন।

জর্ম্মণটি ইতিমধ্যে মঁসিয়ে ডুবিয়ের গুম্ফ ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিলেন। ডুবিয়ে ঠেলা দিয়া সামরিক কর্ম্মচারীর হাত সরাইয়া দিলেন। তার পর জর্ম্মণ সৈনিকপুরুষের টুঁটী চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে আসনের উপর ফেলিয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ ফরাসীর মুখমণ্ডলের শিরাসমূহ উত্তেজনায় স্ফীত হইয়া উঠিল; নয়নযুগলে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। এক হস্তে তিনি সামরিক কর্ম্মচারীর গলা চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, এবং মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তের দ্বারা শত্রুর মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিলেন। প্রুসীয় বীর আততায়ীর কবল হইতে মুক্তি-লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তরবারী কোষোন্মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। মঁসিয়ে ডুবিয়ে প্রকাণ্ড ভুঁড়ীর চাপে তাহাকে যেন পিষ্ট করিতেছিলেন। অবিশ্রান্ত বারিধারার ন্যায় সামরিক কর্ম্মচারীর উপর মুষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছিল। জর্ম্মণের মুখমণ্ডল রক্তধারায় আপ্লুত হইয়া গেল। ভগ্নদন্ত, পরিশ্রান্ত জর্ম্মণ ফরাসীর কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না।

ইংরাজেরা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ব্যাপারটি ভাল করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে নিকটে সরিয়া আসিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বি-যুগলকে বাধা দিলেন না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে

মঁসিয়ে ডুবিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি অকস্মাৎ শত্রুকে ত্যাগ করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে আপনার আসনে উপবেশন করিলেন।

প্রুসীয় কর্ম্মচারী আর তাঁহাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলেন না। ফরাসীর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে জর্জ্জরিতদেহ জর্ম্মণ বিলক্ষণ ভীত হইয়াছিলেন। যখন তিনি একটু সুস্থভাবে নিঃশ্বাসত্যাগে সমর্থ হইলেন, তখন সৈনিকপুরুষ বলিলেন, "পিস্তল-যুদ্ধে আপনি সম্মত না হইলে আমি আপনাকে খুন করিব।"

ডুবিয়ে বলিলেন, "যখন ইচ্ছা, আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।"

জর্ম্মণ বলিলেন, "এই ত ষ্ট্রাসবার্গ নগর। আমি দুই জন সামরিক কর্ম্মচারীকে আমার সহকারী নিযুক্ত করিব। গাড়ী এই ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে।"

মসিয়ে ডুবিয়ের তখনও ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে ছিল। তিনি ইংরাজ যাত্রীদিগকে বলিলেন, "আপনারা আমার সহায়তা করিবেন?"

উভয়েই সমস্বরে বলিলেন, "নিশ্চয়।"

গাড়ী থামিল। এক মিনিটের মধ্যে প্রুসীয় বীর দুই জন জর্ম্মণ সৈনিক পুরুষকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তাঁহাদের কাছে এক যোড়া পিস্তল ছিল। তখন সকলে প্রাকারের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইংরাজেরা পুনঃ পুনঃ ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিতেছিলেন। তাঁহারা তাড়াতাড়ি সব কাজ সারিয়া লইলেন। পাছে ট্রেন ফেল হইতে হয় বলিয়া তাঁহারা অত্যন্ত চঞ্চলহৃদয়ে উপস্থিত কার্য্যগুলি ক্ষিপ্রহস্তে সম্পন্ন করিলেন।

মঁসিয়ে ডুবিয়ে জীবনে কখনও পিস্তল ব্যবহার করেন নাই।

প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট হইতে তাঁহাকে বিশ হস্ত দূরে দাঁড়াইতে হইল।

তাঁহাকে যখন প্রশ্ন করা হইল, "আপনি প্রস্তুত?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ মহাশয়।" সেই সময় তিনি দেখিলেন, জনৈক ইংরাজ ছাতা খুলিয়া রৌদ্র নিবারণ করিতেছেন।

এক জন বলিয়া উঠিলেন, "এইবার গুলি কর।"

মঁসিয়ে ডুবিয়ে কি করিতেছেন, কোন দিকে গুলি করিতেছেন, এ সব বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে গুলিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সবিস্ময়ে তিনি দেখিলেন, প্রুসীয় সৈনিকপুরুষ আহত হইয়াছেন, তিনি দুই বাহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সম্মুখে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার গুলিতে জর্ম্মণ বীর নিহত হইয়াছেন!

এক জন ইংরাজ আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেশ!" দ্বিতীয় ইংরাজ যাত্রী তখনও ঘড়ি দেখিতেছিলেন। তিনি মঁসিয়ে ডুবিয়ের বাহু ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন, এবং দ্রুতবেগে ষ্টেশনের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তিন জন পাশাপাশি চলিতে চলিতে সংবাদপত্রের পঞ্চরংয়ের ছবির ন্যায়, লঘুগতিতে ষ্টেশনে পঁহুছিলেন।

তখন ট্রেণ ছাড়িতেছিল। লম্ফ দিয়া তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করিলেন।

ইংরাজ যাত্রীরা টুপী খুলিয়া তিনবার মাথার উপর ঘুরাইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হিপ্ হিপ্ হুররে!"

তার পর গম্ভীরভাবে উভয়ে একে একে তাঁহাদের হস্ত মঁসিয়ে ডুবিয়ের দিকে বাড়াইয়া দিলেন। করকম্পন শেষ হইলে যে যার নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন। *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

---

# দাশরথী রায়।

আলোচনা।

পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল, দাশরথী রায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। পাঁচালী-কার ও গীত-রচয়িতা বলিয়া আজিও তাঁহার নাম দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা না হইয়াছে, এমন নহে। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" দাশরথীর উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইহাতে দাশরথীর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ও তাঁহার রচনার সমালোচনা আছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত দাশরথীর পাঁচালীর সংস্করণের প্রস্তাবনায় শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাশরথীর রচনা সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যত্রও দাশরথী সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। কিছুদিন পুর্ব্বে "অবসর" নামক মাসিক পত্রে "দাশরথী রায়" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, দেখিয়াছি।

মতদ্বৈধ।

দাশরথী রায় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাতে বড়ই মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে, দাশরথীর রচনায় গুণের ভাগ অতি অল্প, দোষ অত্যন্ত অধিক। বঙ্গবাসী, অবসর প্রভৃতির মত ইহার বিপরীত। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র প্রণয়নে দীনেশচন্দ্র যে অতুল অধ্যবসায়, বিপুল পরিশ্রম ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসী চিরদিন তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে। তিনি অসংখ্য গ্রন্থকার ও কবি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাহার সকল অভিমত সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে, এমন আশা করা যায় না। আমাদের মনে হয়, দীনেশ বাবু দাশরথী সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,

---

* গীদে মোপাঁসার গল্পের ইংরেজী হইতে অনূদিত।

তাহা সঙ্গত হয় নাই, এবং ইহাতে দাশরথীর প্রতি একান্ত অবিচার করা হইয়াছে। এইরূপ মনে হইয়াছে বলিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিতেছি।

দাশরথীর রচিত পাঁচালী ও গীতের সঙ্গেই কেবল আমাদের পরিচয়; কেন না, আমাদের জন্মের পূর্ব্বেই তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন। কিন্তু দাশরথীকে দেখিয়াছেন, এবং তাঁহার দলের পাঁচালী ও গান শুনিয়াছেন, দেশে এখনও স্থানে স্থানে এমন কেহ কেহ জীবিত আছেন। আমরা যত দূর সন্ধান করিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি যে, এই শ্রেণীর সকল লোকই একবাক্যে দাশরথীর প্রশংসা করেন, এবং কহেন যে, দেশে তাঁহার ন্যায় কবি অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

অনুকূল মত।

"বঙ্গবাসী"র শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় কাশীবাসী বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যে পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেই প্রকাশ যে, বঙ্গের তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী দাশরথীর পাঁচালী শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেন, এবং আসরে দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত কোলাকুলি করিতেন।

রাখালদাসের বয়সের বাঙ্গালী পণ্ডিত এখন আর কেহই জীবিত নাই। দাশরথী সম্বন্ধে কিছু লিখিব বলিয়া আমি বঙ্গের বহু অধ্যাপকের সহিত আলাপ করিয়াছি। পরলোকগত পণ্ডিতদিগের কথা বলিব না। যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে মূলাজোড় সংস্কৃত-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ভট্টপল্লীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, নবদ্বীপের কবিভূষণ অসাধারণ কবি ও বৈয়াকরণ শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও কাব্যনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা, আলঙ্কারিক, শান্তিপুরবাসী শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়দিগের নাম করিতে পারি। ইঁহারা সকলেই বাল্যকালে আসরে বসিয়া দাশরথীর গান শুনিয়াছেন। দাশরথীর প্রশংসার্থ ইহাঁদের প্রত্যেকে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লিখিতে গেলেই এক একটি প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস দাশরথীর যেরূপ সুখ্যাতি করিয়াছেন, ইহাদের প্রদত্ত প্রশংসা তদপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন নহে। ইহারা সকলেই বলেন, রচনা-মাধুর্য্যে ও শব্দ-যোজনা-চাতুর্য্যে দাশরথীর সমকক্ষ কবি বঙ্গে কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। দেশে দাশরথীর রচনার ন্যায় সরস জিনিস আর হইবে না।



আচার্য্য বিবেকানন্দ

[ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ ]

Mohila Press, Cal.



পরিব্রাজক বিবেকানন্দ

[ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ ]

Mohila Press, Cal.

মহাশয়ের দর্শন লাভ করি। দাশরথীর সম্বন্ধে তুটি কথা তাঁহার নিজের মুখে শুনিব, ইহাই ইচ্ছা ছিল। দাশরথীর নাম করিতেই এই ঋষিপ্রতিম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইল, এবং আমি দাশরথীর অনুকূলে তুই একটি কথা বলিতেই তিনি যে ভাবে আমার মস্তকে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তুমি দাশরথীকে কবি বল! আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও।" ইহার অর্থ এই যে, আমাদের শ্রেণীর লোক দাশরথীকে কবি বলিতে সম্মত নহেন। পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয় পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে, আমি এক জন সামান্য রাজকর্ম্মচারী এবং কিঞ্চিৎ ইংরাজী জানি। তাঁহার যেন মনে হইল যে, আমি দাশরথীর প্রশংসার্থ তুটি কথা কহিয়া তাঁহার শ্রেণীর পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মানবর্দ্ধন করিলাম! বৃদ্ধ যুবকের উৎসাহ ও আনন্দের সহিত দাশরথীর তুই তিনটি গান উদ্ধৃত করিয়া আমাকে তাহার সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দিলেন।

বঙ্গে এই শ্রেণীর লোক অবশ্যই বিরল হইয়া আসিতেছেন। আমাদের শিক্ষা অন্যরূপ। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা কাব্যের দোষগুণ-বিচারে অক্ষম, ইহা বলা যায় কি? ইহাদের সকলেরই মতে, দাশরথীর পাঁচালী উচ্চ অঙ্গের কাব্য। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় সংস্কৃত কলেজের এক জন প্রাচীন ছাত্র। ইহার সহিত আমার যখন দাশরথী সম্বন্ধে কথোপকথন হয়, তখন তিনি তাঁহার স্বরচিত কাব্যনির্ণয় খুলিয়া কবির তুইটি গান আমাকে দেখাইয়া দেন, এবং বলেন, গুণের উদাহরণ বলিয়াই আমি উহা উদ্ধৃত করিয়াছি। *

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কথা বলিলাম। এইবার ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত তুই এক জন সুধীর নাম করি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন, "যিনি বাঙ্গালা ভাষায় সম্যক্‌রূপ বুৎপন্ন হইতে বাসনা করেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দাশুরায়ের পাঁচালী পাঠ করুন।" সেদিন "আর্য্যাবর্ত্তে" দেখিলাম, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিষ্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়কে ঠিক এই ভাবের কথা বলিয়াছেন,—দাশরথীর পাঁচালীই খাঁটী বাঙ্গালার শেষ রচনা। বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ উপাসক ও বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে কহিয়াছেন,—যাঁহারা

* আমি আছি গো তারিণী ঋণী তব পায় ইত্যাদি—কাব্যনির্ণয়; অষ্টম সংস্করণ—৩২৯ পৃঃ।
ধনী আমি কেবল নিদানে ইত্যাদি—৩৩০ পৃঃ।

দাশরথীকে কবি বলিতে চাহেন না, তাঁহারা হয় কাব্যের রসাস্বাদনে অক্ষম, নচেৎ দাশরথীর রচনা বিষয়ে অজ্ঞ। আর মত উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন আছে কি ?

শিক্ষিতসমাজের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা।

এইরূপ মত সত্ত্বেও দাশরথী আধুনিক শিক্ষিতসমাজে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত। বঙ্গবাসীর শ্রীযুক্ত হরিমোহন শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রতি যেরূপ তীব্র শ্লেষ ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা করিতে চাহি না। তবে এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, বঙ্গসাহিত্যে দাশরথী রায়ের যে স্থান পাওয়া উচিত, তাহা তিনি পান নাই। শিক্ষিত বাঙ্গালী তাঁহার রচনার উপযুক্ত সমাদর করেন নাই। ইঁহাদের অনেকের মতে দাশরথী রায়ের রচনা অপাঠ্য।

এই উপেক্ষা ও অবজ্ঞার জন্য দীনেশচন্দ্রই অনেকপরিমাণে দায়ী। দাশরথী সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য অত্যন্ত প্রতিকূল জানিয়া অনেকে হয় ত দাশরথীর রচনা পড়েন নাই। ফল এই দাঁড়াইয়াছে, যদিও দীনেশচন্দ্র স্বয়ং দাশরথীকে কবি ও প্রতিভাশালী কবি বলিতে প্রস্তুত, শিক্ষিতসমাজের অনেকেই দাশু রায়কে কবি বলিলে শিহরিয়া উঠেন। অল্পদিন হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী এক জন যুবক আমাকে কহিয়াছিলেন, "আপনি কি দাশু রায়কে কবি বলেন? তিনি এক জন পাঁচালীর ছড়াদার মাত্র।" আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্"; অথবা "কথ্যতে কাব্য মিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী"; অর্থাৎ, রসাত্মক বাক্য অথবা চমৎকার-অর্থযুক্ত পদাবলীই যদি কাব্যের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে, দাশু রায়ের পাঁচালী কাব্য, এবং স্থানে স্থানে উহা অতি উৎকৃষ্ট কাব্য। দুই একটি উদাহরণ শুনিয়া তিনি কহিলেন, "দাশরথীর রচনাতেও যে পড়িবার জিনিস আছে, তাহা আপনার মুখে আজ প্রথম শুনিলাম।"

ফলতঃ অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিয়া বুঝিয়াছি যে, দাশরথীর রচনা অশ্লীলতা-দোষে দূষিত, এবং কদর্য্য অনুপ্রাসে পূর্ণ; উহাতে শব্দের ঝঙ্কার ভিন্ন অর্থের চমৎকারিত্ব কিছুই নাই, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। এই সকল কারণে অনেকেই দাশরথীর রচনা অপাঠ্য মনে করিয়া উহা পাঠ করেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের পরম অনুরাগী সুলেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বিদ্যারত্ন এম্. এ. মহাশয়ের লিখিত বানান-সমস্যায় দেখিলাম—

"দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

দাশরথীর এই গানটির স্বখাদ শব্দের টীকা করিতে যাইয়া তিনি ইহাকে "প্রসাদ-সঙ্গীত" * বলিয়াছেন! সত্য সত্যই বলিতেছি, "সাহিত্যে" যেদিন এইটি পড়িলাম, সেই দিনই মনে হইল, দাশরথীর দোষক্ষালনার্থ দুটি কথা লিখিব। অধ্যাপক ললিতকুমার দাশরথীর গানকে রামপ্রসাদের গান বলিবেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

সম্প্রতি একখানি গানের বহি দেখিলাম, নাম গীতিমালিকা। সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক বি. এ.। দাশরথীর একটি অতিপ্রসিদ্ধ গান—

"ননদিনী গো বলো নগরে, সবারে,
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।" ইত্যাদি।

উদ্ধৃত করিয়া, তলায় রচয়িতার নাম লিখিয়াছেন,—"মধুসূদন কিন্নর।" ইহা দাশরথীর দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলিব! "বঙ্গবাসীর" হরিমোহন অনায়াসেই বলিতে পারেন যে, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় মনে করেন যে, তাঁহারা রামপ্রসাদ, দাশরথী, মধু কান প্রভৃতির নাম জানেন, ইহাই যথেষ্ট। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় দাশরথীর প্রতি শিক্ষিতসমাজের অবজ্ঞার কথা তুলিয়া যে সরস বিদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমি উহা পত্রস্থ করিব না। উহার অর্থ এই যে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, দাশরথীকে না জানাই সুশিক্ষার পরিচয়।

কিন্তু শিক্ষিতসমাজ যতই অবজ্ঞা করুন না কেন, দাশরথীর রচনা দেশে অনাদরের বস্তু নহে। বঙ্গদেশে এমন স্থান অতি অল্পই আছে, যেখানে দাশরথীর রচনার প্রচার নাই।

প্রচার।

বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত দেশের কত স্থানে, কত ভাবে দাশরথীর ছড়া ও গান শুনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। অতি অল্প বয়সে ফরিদপুর জেলায় এক পরমাত্মীয়ের আলয়ে যাত্রা শুনিতে বসিয়াছি; গৌরচন্দ্রিকার পরে অধিকারী মহাশয় সাধা গলায় সীতার বনবাস পালা আরম্ভ করিলেন:— "শুনিলে পবিত্র চিত, বাল্মীকির সুরচিত, রামতত্ত্ব সুধার সোসর।" তখন জানিতাম না, এখন জানিয়াছি, ইহা দাশু রায়ের ছড়া। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে নলডাঙ্গার বিখ্যাত ভূস্বামী শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ দেব রায় বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর রাজবাটীতে সঙ্গীতের আয়োজন হইল।

* সাহিত্য, ১৩১৮, ভাদ্র, ৩৮০ পৃষ্ঠা।

রাজা বাহাদুরের সুযোগ্য দেওয়ান বরদা বাবু স্বয়ং গান ধরিলেন, "কে নাম দিলে ত্রিগুণধারিণী, কে নাম রেখেছে নিস্তারিণী" ইত্যাদি। ইহার তিন বৎসর পরে বাঁকুড়ায় গিয়াছিলাম, সেখানেও পল্লীগ্রামের এক ব্রাহ্মণের মুখে প্রথমেই গান শুনিলাম—

"মন রে বিপদে ত্রাণ আর হলিনে,
বলিতে হরি তোয় আর বলিনে,
তুই এ জনমে হরিপদ-নলিনে স্থান নলি নে" ইত্যাদি।

বার চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জেলার বকযুড়ি গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমীদার মুন্সী বাবুদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব দেখিতে গিয়াছি। রাত্রিতে দেবীমণ্ডপের সম্মুখে বামা-কণ্ঠে গান হইতেছে—

"জামাই নাই না আর তোর ভিখারী,
শিব কাশীতে রাজরাজেশ্বর, তোর মেয়ে রাজরাজেশ্বরী।" ইত্যাদি।

শুনিলাম, গৃহস্বামী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন সেন বি. এল. মহাশয় এই গানটি বড়ই ভালবাসেন।

ইহার কিছুদিন পরেই ঢাকা জেলার এক প্রান্তে পদ্মাবক্ষে তীরলগ্ন নৌকায় বসিয়া আছি, সকালবেলা এক ভিক্ষুক বৈষ্ণব নৌকায় আসিয়া গান ধরিল—

"কানাই, এ কি ভাই, রইলি প্রভাতে অচৈতন্য।
উঠলো ভানু, ও নীলতনু, যায় না ধেনু, বেণু ভিন্ন।" ইত্যাদি। *

বলা বাহুল্য, এ সকলই দাশরথী রায়ের গান।

আর কত বলিব? এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার চৌদ্দ পনেরটি জেলা ঘুরিয়াছি; যেখানে গিয়াছি, সেইখানেই দাশরথীর গান শুনিয়াছি। এক দিকে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, অন্য দিকে রাজসাহী, দিনাজপুর, অথবা ঢাকা, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, ইহার কোনও স্থানেই দাশরথী অপরিচিত নহেন। হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া, যশোহর, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সাময়িক সাহিত্যেও দাশরথীর সম্মান একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। "বঙ্গবাসী" সম্পাদক সুকবি বৃদ্ধ বিহারীলাল এখনও সময়ে সময়ে দাশরথীর গান কিংবা পদ উদ্ধৃত করিয়া থাকে। যত দূর মনে হয়, গত শারদ-উৎসবের পূর্ব্বে সমাজপতি মহাশয়ের সম্পাদকতা-কালে বসুমতীর স্তম্ভে "আগমনী" প্রবন্ধের আরম্ভেই তান শুনিয়াছিলাম—

"গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল, ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী ;
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে, মা কৈ মা কৈ ব'লে,
ডাক্‌ছে মা তোর শশধরবদনী।"

ইত্যাদি। আগমনীর গান ইহা অপেক্ষা সুন্দর, ইহা অপেক্ষা মধুর বাঙ্গালায় কিছু আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

দেশের ভিক্ষুক হইতে ভূস্বামী পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এমন প্রচার অন্য কাহারও কবিতার আছে কি? এমন কি, রামপ্রসাদের গানেরও নাই। প্রসাদের গানগুলি প্রায় একই সুরের, এবং একই ভাবের; দাশরথীর গানগুলি নানা সুরের, এবং নানা ভাবের। কাজেই অক্ষয়চন্দ্রের কথায় বলিতে হয়, যাঁহারা "দাশরথীর পাঁচালী অপাঠ্য" বলেন, তাঁহারা উহা পড়েন নাই।

এইবার দীনেশচন্দ্রের মন্তব্যের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। তাঁহার মতে, দাশরথীর প্রধান দোষ, অশ্লীলতা। দশরথীর রচনায় যে অশ্লীলতা আছে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? তবে এ কথা ঠিক যে, তাঁহার পৌরাণিক-আখ্যান-মূলক পাঁচালী-গুলিতে অশ্লীলতার অংশ অতি অল্প। অনেক পালায় অশ্লীলতা একবারেই নাই। নলিনী-ভ্রমরোক্তি, বিরহ, বা নবীন সোনামণির দ্বন্দ্ব প্রভৃতি দাশরথীর মূল গ্রন্থ নহে, প্রহসনমাত্র। এ কথা ত অবশ্যস্বীকার্য্য যে, দাশরথী যে কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কালে দেশে অশ্লীলতার আদর না থাকিলেও, প্রসার ছিল। তিনি প্রথম বয়সে কবির দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। তখন ইতর শ্রেণীর শ্রোতা অনেকেই কেবল "মোটা" শুনিবার জন্য কবির গান শুনিতে যাইত। দাশরথী সময়ের ও কবির দলের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি সুশিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার সময়ে সাহিত্যে নৈতিক চাবুকেরও ব্যবস্থা ছিল না। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় দাশরথীর সময়ের কবি। তিনিও অশ্লীলতা বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। দাশরথীর রচনা সম্পূর্ণরূপে অশ্লীলতা-বর্জ্জিত হইবে, ইহা কখনই আশা করা যায় না। দীনেশ বাবু নিজেই বলিয়াছেন যে, ভারতচন্দ্র, বায়রণ প্রভৃতি এ দোষ হইতে মুক্ত নহেন। স্বয়ং মহাকবি সেকস্‌পীয়ার ভিনস ও অ্যাডোনিস লিখিয়াছেন।

অশ্লীলতা।

সাধক কবি রামপ্রসাদ প্রথম বয়সে বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছেন, উহা অশ্লীলতায়

পরিপূর্ণ। তাই বলিয়া উঁহার রচিত ভাষার শ্রেষ্ঠরত্ন শান্তরসাত্মক গীতগুলি কি বর্জ্জন করিতে হইবে ?*

বস্তুতঃ অশ্লীলতার দোহাই দিয়া দাশরথীর রচনা বর্জ্জন করা যায় না। তবে দেশের রুচি অনুসারে সময়ের পরিবর্ত্তনে ধর্ম্মমূলক সাহিত্যের আদর নাই, ইহা ঠিক; সেদিন—গত মাঘ মাসের "সাহিত্যে" পাঁচকড়ি বাবুর প্রবন্ধে দেখিতে ছিলাম, ইংলণ্ডের এক ধর্ম্মযাজক দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য ধর্ম্মহীন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশেও তাহাই ঘটিয়াছে। বঙ্কিমের কৃষ্ণ-চরিত্র অপেক্ষা মৃণালিনীর পাঠক অধিক! নবীনের রৈবতক বা কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা ভানুমতীর বা অবকাশরঞ্জিনীর পাঠক অধিক। দাশরথীর মৃণালিনী, ভানুমতী নাই; কৃষ্ণচরিত্র, কুরুক্ষেত্র আছে। সুতরাং দাশরথীকে অনায়াসে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। নাট্যশালায় আমরা যে পৌরাণিক নাটক দেখিতে যাই, তাহার বোধ হয় অন্য কারণ আছে। ইহাই যদি কথা হয়, তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু এ হিসাবে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দাশরথীর বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই; কেন না, তিনি নিজে পৌরাণিক কথায় একান্ত শ্রদ্ধাবান্। তাঁহার রচিত 'সতী', 'বেহুলা', 'জড়ভরত' প্রভৃতি পড়িলেই ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ পৌরাণিক কথা লুপ্ত হইবার এখনও বিলম্ব আছে। অধ্যাপক ললিতকুমার "ছড়া ও গল্পে" রুহি মাছের মুখে দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইয়া থাকিবার তুলনা তুলিয়াছেন, দেখিয়াছি।

দীনেশ বাবুর কথা,—"দাশুর রচনা ভ্রমরের মত; মুখে মধু, কিন্তু হুলে বিষ বহন করে; উহা শিশুর নবোদ্গত দন্তের ন্যায় দর্শনে সুন্দর, কিন্তু দংশনে তীব্র! দাশু যেখানে গালি দিবেন, সেখানে তাঁহার লেখনীসংযম অভ্যাস নাই। শত্রুর গালে চুন কালি দিয়া তিনি তামাসা দেখিবেন, বৈষ্ণবনিন্দাটি শুনুন।"

আমাদের মতে, এ সমালোচনাতেও দাশুর প্রতি অবিচার করা হইয়াছে।

দাশরথীর পরনিন্দা।

দাশু কাহাকেও শত্রু মনে করিতেন, তাঁহার লেখা পড়িলে এ ধারণা হয় না। তিনি বৈষ্ণবকে গালি দেন নাই, কিন্তু শাক্তদ্বেষী ভাক্ত বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছেন। ভক্ত বৈষ্ণবের

* দুঃখের বিষয় এই যে, রামপ্রসাদের এই গানগুলির যেমন পৃথক সংস্করণ হইয়াছে, দাশরথীর অশ্লীল-অংশ-বর্জ্জিত পৌরাণিক পাঁচালীগুলির তেমন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গবাসী, বসুমতী প্রভৃতি কেহই এরূপ চেষ্টা করেন নাই।

প্রতি তাঁহার ভক্তি ছিল। ভাক্ত বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াই দাশরথী দেখাইয়াছেন যে, নারদ প্রভৃতি এরূপ বৈষ্ণব নহেন। তাঁহার রচনা সকল পড়িলে প্রতীতি হয় যে, তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব ও শাক্তের পূজা করিতেন। শাক্ত-বৈষ্ণব-দ্বন্দ্বে যিনি লিখিয়াছেন,—

"শক্তি-উপাসক হয়ে কৃষ্ণ ভাবে অন্য,
শক্তির কি শক্তি আছে তার মুক্তিজন্য ?
কৃষ্ণপদ ভাবিয়ে দুর্গাকে ভাবে ভিন্,
তাহাকে নিদয় কৃষ্ণ হন চিরদিন।"

তিনি কি প্রকৃত বৈষ্ণবের নিন্দা করিতে পারেন ? দাশরথী ভেদজ্ঞানীকে তিরস্কার করিয়াছেন। তাঁহার কৃষ্ণ ও কালীর প্রতি প্রযুক্ত এক **একটি** গান,—

অপরূপ রূপ কেশবে + (কে শবে)

শুনিয়া শাক্ত বৈষ্ণব উভয়ে একত্র আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন।

দাশরথীর গালিও শত্রুর গালে চুণ কালি দেওয়া নহে। তিনি যাহার দোষ দেখিয়াছেন, তাহাকে সম্মুখে পাইলেই মুখের উপর দু' কথা শুনাইয়া দিয়াছেন, ইহা বলিলেই ঠিক হয়! দাশরথী স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন। বিদ্বেষবশে কাহাকেও গালি দিয়াছেন, ইহা তাঁহার পাঁচালীর কোনও অংশ পড়িয়াই মনে হয় না।

উপমা।

দাশরথীর উপমা সম্বন্ধে দীনেশ বাবু বিদ্রূপের ভাষায় বলিয়াছেন যে—"দাশরথীর গুণের সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না।" তিনি বলিতেছেন,—"দাশরথী এক স্থানে রাশি রাশি উপমা আনিয়া পাঠকের ধৈর্য্য লোপ করেন ; থাম থাম বলিয়া পরিত্রাহি চীৎকার না করিলে বিরাম নাই।" এইরূপ উপমা এখনকার কালের পাঠকের বিরক্তিকর হইতে পারে, কিন্তু দাশরথীর সময়ের বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ এই উপমারই ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা দুই একটি পাঠককে শুনাই—

"যেমন তীর্থের শেরা কাশীধাম, কর্ম্মের শেরা নিষ্কাম,
নামের শেরা রামনাম তারকব্রহ্ম জানি ;

---

+ "অপরূপ রূপ কেশবে ( কে শবে ?
দেখ রে তারা এমন ধারা কাল রূপ কি আছে ভবে ?" ইত্যাদি

খাদ্যের শেরা ঘৃত ক্ষীর, দেশের শেরা গঙ্গাতীর,
বেশের শেরা শ্রীপতির গোষ্ঠ-বেশখানি ;
বলের শেরা যোগবল, ফলের শেরা মোক্ষফল,
জলের শেরা গঙ্গাজল, থলের শেরা ফণী ;
পুরাণের শেরা ভারত, রথের শেরা পুষ্পক রথ,
পুত্রের শেরা ভগীরথ—বংশচূড়ামণি।”

এরূপ উপমা কি সত্য সত্যই কেবল উপহাস করিবার সামগ্রী? ইহাতে কি রচনা-নৈপুণ্য কিছুই নাই? একটি বড় ছড়া উদ্ধৃত করি। কলঙ্ক-ভঞ্জন পালায় শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকে বুঝাইতেছেন যে,—জগদারাধ্য তোমাকে ভজন করিয়া আমার নাম হইল কলঙ্কিনী, ইহা কেমন বিপরীত, যেমন—

“অমৃত খাইয়া রোগ, ব্রহ্মবস্তুর প্রাণবিয়োগ,
ভেবে কিছু করতে নারি ধার্য্য।
সখ্য যার গরুড়ের সঙ্গে, তার বক্ষঃ খায় ভুজঙ্গে,
ওহে মোক্ষদাতা কিমাশ্চর্য্য!
গ্রহ-যাগের এই কি গুণ, দ্বিগুণ হয় গ্রহ বিগুণ,
জ্বেলে আগুণ দ্বিগুণ কম্প শীতে।
বাসকে বাড়িল কাশ, দয়া করে ধর্ম্মনাশ,
গয়া ক’রে কি নরকে যায় পিতে?
ভক্তি ক’রে ভাব চটে, দান ক’রে দুর্গতি ঘটে,
মিছরী-পানা পান ক’রে ক্ষিপ্ত।
কোন শাস্ত্রে শ্রীনিবাস! ফাঁসিতে ম’রে স্বর্গবাস,
আর কাশীতে ম’রে ভূতযোনি প্রাপ্ত।
জগন্নাথ দেখে রথে নর কি যায় নরকেতে,
গণেশ ভজিয়ে কর্ম্মে বাধা—
মাণিক রাখিয়ে ঘরে দৃষ্টি হয় না অন্ধকারে,
( তেমনই ) কৃষ্ণ ভ’জে কলঙ্কিনী রাধা॥

এই সকল উপমার আখ্যানবস্তু অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিক কথা, অথবা দেশের প্রাচীনবিশ্বাসমূলক, ইহা বলিয়া দোষ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু



ধ্যানী বিবেকানন্দ

[ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ ]

Mohila Press, Cal.



স্বামী বিবেকানন্দ

[ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ ]

দীনেশ বাবু দাশরথীর যমক ও অনুপ্রাসের কথা বিশেষভাবে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তবে এ কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, "শব্দের বাঁধুনীর জন্য" কিছু প্রশংসা দাশুর প্রাপ্য হইতে পারে। তাঁহার মত এই যে, দাশুর লেখায় শব্দের বাঁধুনী আছে, উহা "শ্রুতিসুখকর", কিন্তু উহাতে অর্থের গৌরব নাই। যমক অনুপ্রাসের নিমিত্ত দাশরথী অন্য স্থানেও নিন্দিত হইয়াছেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে দু'টি কথা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, স্বর্গীয় মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় দাশরথীর শব্দের বাঁধুনীর দুই একটি দোষ দেখাইতেন ; যথা, বৃন্দার প্রতি বৈদ্যবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

যমক ও অনুপ্রাস—শব্দের বাঁধুনী।

ভজন কর কৃষ্ণজীরে, ভোজন করো কৃষ্ণ জিরে।

আমরাও বলি, এইরূপ যমক, অথবা "কৃষ্ণ ডাকেন কুজায়, কুজাকে তা কু বুঝায়—" ইহা হয় ত সুন্দর নহে, কিন্তু দাশরথীর অধিকাংশ যমক ও অনুপ্রাসই যে অতি সুন্দর, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যমক ও অনুপ্রাসের রাজা, বাঙ্গালা সাহিত্যে এত যমক অনুপ্রাস কেহই ব্যবহার করেন নাই। যিনি সহস্র সহস্র অনুপ্রাস রচনা করিয়াছেন, তাঁহার দুই একটি সৌন্দর্য্যহীন হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

ফলতঃ অনুপ্রাস ও যমকই দাশরথীর কাব্যের প্রধান অলঙ্কার। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় দাশরথীর শব্দের বাঁধুনী দেখাইবার জন্য যমক ও অনুপ্রাসে পূর্ণ কয়েকটি গীত যে ভাবে আমার সমক্ষে আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বলা বাহুল্য, এগুলি তাঁহার মতে অতি সুন্দর। সমস্ত উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। এ স্থানে একটিমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

কার সাধ্য ওমা সীতে, তব বন্ধন দোষিতে ?
তুমি সীতে, তুমি অসীতে, তুমি অন্নদা কাশীতে।
অসিতে রূপে অসি ধরা, দনুজকুল নাশ করা,
সীতে রূপে এসেছ ধরা, রাবণকুল নাশিতে।
দেহি অন্ন দাসে দেহি, বিশ্বমাতা বৈদেহী,
ভব-ক্ষুধা নিবৃত্তি কর, আর দিও না আসিতে।
যদি না তোষিবে দীনে, অন্নাদি ভূষণ দানে,
দাশরথীরে হবে নিদানে, চরণ-দানে তোষিতে।

গীতিমালিকায় উদ্ধৃত গানটি এই—

ননদিনী গো ব'লো নগরে, সবারে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে।
কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে, কাজ কেবল সেই পীতবাসে,
সে থাকে যার হৃদয়-বাসে, সে কি বাসে বাস করে?
কাজ কি গোকুল, কাজ কি গো কুল, গোকুলবাসী হ'ক প্রতিকূল,
আমি ত সঁপেছি গো কুল, অকূল-কাণ্ডারীর করে।

নব্য পাঠকেরা কি বলিবেন, জানি না, কিন্তু এক সময়ে এই গানটি নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে পাগল করিয়াছিল। স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি যাঁহাদিগের সঙ্গতি ছিল, তাঁহারা দাশরথীকে মূল্যবান উপঢৌকন দিয়াছিলেন। ব্যাদ্ড়াপাড়ার বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য নামক এক দরিদ্র পণ্ডিত তাঁহার ব্রাহ্মণীর একমাত্র স্বর্ণ-অলঙ্কার কাণের ঢেঁড়ী দুইটি খুলিয়া আনিয়া তাহাই আসরে ফেলিয়া দেন। দাশরথী ইহা জানিতে পারিয়া ঢেঁড়ী দুইখানির সহিত ৫৲ পাঁচটি টাকা লইয়া বিষ্ণুচরণকে প্রণাম করিতে যান। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহা লইতে অসম্মত হইলে দাশরথী বলেন, আপনি ন'দের পণ্ডিত; আমার গান শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। ভট্টাচার্য্য উত্তর করেন, তোমার গান শুনিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, তাহাতে তোমাকে আমার ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়া পুরস্কার দিলেও যথেষ্ট হয় না। কেবল কি শব্দের ঝঙ্কারে মানুষ এমন ভাবে মুগ্ধ হয়?

এ না হয় প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মত। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় দাশরথী সম্বন্ধে আমি কিছু লিখিব জানিয়া আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,— "আপনি দাশরথীর ভাষা ও কবিত্ব, দুইই লিখিবেন। কেন না, উহা পৃথক্ করা চলে না—

সিংহ প্রতি বলেন বধরে বধরে,
আদরেতে হাসি না ধরে অধরে।

এখানে ভাষা কবিত্ব টানিয়া আনিয়াছে, বা কবিত্ব ভাষাকে টানিয়া আনিয়াছে, তাহা বলা যায় না।"

বস্তুতঃ ভাল ভাবে দেখিলে দাশরথীর শব্দের বাঁধুনীর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আর ইহা যে কেবল শব্দের ঝঙ্কার নহে, ইহাতে অর্থেরও গৌরব আছে, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। অর্থের সঙ্গতি রাখিয়া অনুপ্রাস

লিখিবার চেষ্টা সকল কালেই আছে, আমরা এ কালেও দেখিতে পাই,—বইএর নাম "বিষবৃক্ষ", "কড়ি ও কোমল", অথবা "পরপারে"। প্রহসনের নাম,—"বিবাহ-বিভ্রাট", "সম্মতি সঙ্কট, সাবাস আটাশ", বা প্রবন্ধের শিরোনাম "বাঙ্গালা ভাষায় মামলা"। গানের গোড়া, "তব মঙ্গল করে নির্ম্মল কর মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।" কিন্তু দোষী দাশরথী। কেন না, শব্দের বাঁধুনীতে বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। ফলতঃ দাশরথীর যমক অনুপ্রাসে শব্দের মালা অনেক স্থলেই এত সুন্দর, এমন মনোহর যে, সেগুলি মাতৃভাষার গলে মুক্তার মালার ন্যায় মূল্যবান অলঙ্কার বলিয়াই বোধ হয়।

উপাখ্যানভাগে অপটুতা।

দাশরথীর উপাখ্যানভাগে অপটুতা আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। দীনেশ বাবু প্রভাস-মিলনে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা দেখাইয়া দিয়াছেন। এরূপ অপটুতা অন্য পালাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরাধিকার দর্পচূর্ণ পালায় হরগৌরীর কন্দল এই ভাবেরই জিনিস। কিন্তু তাই বলিয়া কি দাশরথীর গুণ উপেক্ষা করিতে হইবে? অ্যাডিসন মিল্টনের কাব্য-সমালোচনায় সমালোচকের কর্ত্তব্য বুঝাইবার জন্য এক জন প্রাচীন পণ্ডিতের দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পাশ্চাত্য পণ্ডিত কাব্যকে জলধির সহিত তুলিত করিয়া বলিতেছেন :—

Errors like straws on the surface flow,
He who would search for pearls must dive below.

অর্থাৎ,—তৃণসম ভাসে ভ্রম—উপরেই রহে।
তলে না ডুবিলে, মুক্তা মিলিবার নহে॥

ফলতঃ ভ্রম সকলেরই চোখে পড়ে, কিন্তু কাব্যের সৌন্দর্য্য, যাহা সকলের অধিগম্য নহে,—তাহা দেখাইয়া দেওয়াই সমালোচকের কর্ত্তব্য। দুঃখের সহিত বলিতে হয়, দীনেশ বাবু দাশরথী সম্বন্ধে এ রীতি অবলম্বন করেন তাই। দাশরথীর পাঁচালাতে উপাখ্যানভাগে পটুতার যে প্রমাণ আছে, তাহা তিনি দেখান নাই। আমরা একটিমাত্র গান উদ্ধৃত করিব। শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমনে কৈকেয়ীর উক্তি :—

তুই কি ঘরে এলি রে রামধন।
আমার অন্তরে যে ব্যথা, তুই বই জানে কে তা,
আমি রে তোর কৈকেয়ী অভাগিনী মাতা,

ভুবন-জীবন রাম তোয় বনে দেই নাই আমি,
অন্তরেরি ব্যথা জান অন্তর্য্যামী,
রাবণে বধিতে বনে গেলে তুমি, আমায় ক'রে বিড়ম্বন।
বিধির চক্রে বাছা বনে গমন তোমার,
বনের পশু কাঁদে আমার দুঃখে কুমার,
পাপিনী মা ব'লে পুথ দেখে না আমার পুত্র ভরত শত্রুঘন॥

ইহা দাশরথীর নিজস্ব। ঋষিপ্রতিম শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় এই গানটি বড়ই ভালবাসেন। ইহার মাধুর্য্য কি বুঝাইয়া দিতে হইবে ?

দীনেশ বাবু অন্য কবির বেলায় (যথা কৃষ্ণকমল গোস্বামী) যেরূপ রচনার বড়ই প্রশংসা করিয়াছেন, দাশরথীর পাঁচালীতে সেরূপ রচনা অনেক থাকিলেও, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। কলঙ্ক-ভঞ্জনের পালায় নন্দালয়ে কৃষ্ণ মূর্চ্ছাগত, গোষ্ঠে বলরামের নিকট এই সংবাদ পাইয়া বাড়ী আসিতে আসিতে গোপরাজ কহিতেছেন,—

সন্দ করি নন্দ গোপ, যশোদা প্রতি করি কোপ
বলরামকে কহিছেন বাণী,—
অন্ত বুঝিলাম অন্তরে নীলমণিরে নিতান্ত রে
আঘাত ক'রেছে দুর্ভাগিনী।
নব লক্ষ ধেনু পাল, সবেমাত্র এক গোপাল,
সাগর সোসর ক্ষীর সর।
পাপিনী আমার দামোদরে খেতে দেয় না সমাদরে,
নির্দ্দয়া দেখিছি নিরন্তর ;
যত বাছা করে সর সর, পাপিনী বলে সর্ সর্,
অবসর হয় না সর দিতে।
সর সর ক'রে ত্রিভঙ্গ, হয় বাছার স্বরভঙ্গ,
বাক্য-শর হানে আবার তাতে।

এ রচনার গুণ কি আছে, পাঠক স্বয়ং বিচার করুন। সাহিত্যে স্থান থাকিলে এমন ছড়া কতই উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।

দীনেশ বাবুর লিখিত দাশরথীর জীবনকথায় তাঁহার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবিচার করা হইয়াছে। দীনেশ বাবু যে

মনে হয় যে, দাশরথী অতিশয় ঘৃণিতচরিত্র লোক ছিলেন। আমরা একাধিকবার পীলায় গিয়াছি এবং সন্ধানে যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, দাশরথীর চরিত্র প্রথম বয়সে কলুষিত থাকিলেও, কবির দলের সংস্রব-পরিত্যাগের পর হইতেই উহার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, এবং ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির ভাব আসিয়াছিল। দীনেশ বাবু দাশরথীর সমালোচনার শেষে যে দুইটি সুন্দর গান উদ্ধৃত করিয়াছেন ( হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি ইত্যাদি, এবং দুর্গে কর মা এ দীনের উপায়, যেন পায়ে স্থান পায়, ইত্যাদি) এবং যে গানের প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারিয়াছেন, জীবনে পরিবর্ত্তন না হইলে কি দাশরথীর মুখে তেমন গান আসিত ? শেষের গানটির বেলায় দীনেশ বাবুই "ভক্তের মৃত্যুচিন্তা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ দাশরথীর জীবনকথায় তাঁহার কি কলঙ্কিত চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন !

কেবল পীলায় নহে, নিকটবর্ত্তী গ্রাম পাটুলী, নারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানের ভদ্রসমাজ এখনও দাশরথীর নাম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন। পীলার ব্রাহ্মণেরা দাশরথী তাঁহাদের গ্রামে বাস করিয়া গিয়াছেন বলিয়া সত্য সত্যই গর্ব্বিত। ইঁহাদের মতে, দাশরথী দৈবশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা বলেন, অকাবই-এর কবির দলে গালি খাইয়া দাশরথী মাতুল কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন। মাতা কর্ত্তৃক নহে। ঘৃণায়, লজ্জায়, ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া দাশরথী তাঁহার মাতুলের জ্ঞাতি পীলার জমীদার স্বর্গীয় ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া একখানি পাল্কীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার দরজা বন্ধ করিয়া দেন, এবং অনাহারে ক্লান্তদেহে ঐ পাল্কীর মধ্যে ঘুমাইয়া পড়েন। এইখানেই তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, তুই পাঁচালী লেখ্, তোর যশঃ দিগ্‌দিগন্তব্যাপী হইবে।

রীতিমত লেখাপড়া না শিখিয়াও দাশরথী যেরূপ কবিত্ব ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে গ্রামবাসী ভদ্রলোকদিগকে এইরূপ জনশ্রুতিতে বিশ্বাসের জন্য বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

যাহা হউক, দীনেশ বাবু দাশরথীর জীবনকথা যে ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। কবির কাব্য-পরীক্ষাই কর্ত্তব্য, তাঁহার চরিত্রের দোষোদ্‌ঘাটন কর্ত্তব্য নহে। দাশরথীর অদৃষ্টদোষে দীনেশ বাবু তাঁহার জীবনের মন্দ অংশই অধিকতর মন্দ করিয়া লিখিয়াছেন। ভাল অংশ বাদ পড়িয়াছে।

অর্দ্ধচন্দ্র-প্রদান।

দীনেশ বাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, দাশরথীকে "অর্দ্ধচন্দ্র দক্ষিণা-প্রদানানন্তর ভদ্রলোকের সভা হইতে দূর করিয়া দিতে ইচ্ছা হয়।" এই কথাটি পড়িয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। এক দিকে ইহা দাশরথীর প্রতি প্রযোজ্য নহে; অন্য দিকে ইহা দীনেশ বাবুর ন্যায় সমালোচকেরও উপযুক্ত হয় নাই। দীনেশ বাবু অশ্লীলতার জন্য দাশরথীর জন্য অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অশ্লীলতার কথা পূর্ব্বেই কিছু বলিয়াছি। দাশরথীর অশ্লীলতা খোলা, উহা ঢাকা অশ্লীলতা নহে। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর কহিয়াছেন, খোলা অশ্লীলতা অপেক্ষা ঢাকা অশ্লীলতায় সমাজের অধিক অনিষ্ট হয়। দাশরথীর সময়ের রুচি ও শিক্ষার অভাবের প্রতি দৃষ্টি করিলে যে তাঁহার অশ্লীলতা কিয়দংশে মার্জ্জনীয় বলিয়া মনে হয়, দীনেশ বাবু ইহাও বলেন নাই। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গালার যে পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল, উহাতে দেখিয়াছি, স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরাতন লেখায় এমন দু' একটি শব্দ আছে, যাহা এখনকার দিনে অশ্লীল ও অব্যবহার্য্য।

দাশরথী তাঁহার জীবনে ভদ্রলোকের সভায় কখনও অর্দ্ধচন্দ্র দক্ষিণা পান নাই। পরন্তু তাঁহার যেরূপ আদর ছিল, অন্য কোনও গ্রাম্য কবির ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। ভট্টপল্লীর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় বলেন, আমি যখন ১০।১২ বৎসরের বালক, তখন আমাদের গ্রামে ( ভাটভাড়ায় ) দেখিয়াছি, ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাশরথীর গান শুনিতেছেন। আমি গান আরম্ভ হইবার কিছু পরে গিয়াছিলাম। বালক বলিয়া যুবক ও বৃদ্ধেরা আমাকে সম্মুখে যাইতে দিলেন; কেহ হাত সরাইলেন; কেহ পা সরাইলেন; কেহ বা সরিয়া বসিলেন; কিন্তু কাহারও মুখে একটি শব্দমাত্র শুনিলাম না।

শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি বলিলেন, আমার জ্যাঠা মহাশয় এ কালের সর্ব্বপ্রধান কবি কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় * উলায় তাঁহার ভগ্নীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন, এবং ভগ্নীপতি তিতু চাটুয্যে মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন। দাশরথী দল লইয়া ঐ পথে অন্যত্র যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমাকে গান শুনাইয়া যাও।" দাশরথীকে উপযুক্ত পরিশ্রমিক দিতে পারিবেন না বলিয়া পূর্ব্বে বাঁধুনী করিলেন, "এসেছি পাগলের

* ইনি [illegible]

গ্রামে ; * ভগ্নীপতি তিতু চাটুয্যে কুলীন ব্রাহ্মণ, কাজেই নিঃস্ব।" ইহার পরে গান শুনিয়া তিনি নিজের গায়ের কাপড়—একখানি বনাত ও সঙ্গের সম্বল দুইটি টাকাই দাশুকে দিয়াছিলেন। দাশু টাকা লইতে অস্বীকার করিলে কহিয়াছিলেন, "ইহা তোমাকে দেওয়া নহে ; তোমার গানের মূল্য টাকায় হয় না। দলের লোকদের দু'খানি ক'রে বাতাসা জল খেতে দিও।" ইহা কি অর্দ্ধচন্দ্র-প্রদান ?

যেখানে অর্দ্ধচন্দ্র পাইবার কথা, দাশরথী সেখানেও তাহা পান নাই। একবার তিনি মানকরে গান করিবার বায়না লইয়াছিলেন। পথে বর্দ্ধমানে ধরা পড়েন। সেখানকার ভদ্রলোকেরা না ছাড়ায় তাঁহাকে গান করিতে হয়, এবং মানকরে পঁহুছিবার নির্দ্দিষ্ট দিন উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মানকর-বাসীরা দাশরথীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। দাশু আহূত না হইয়াও আসরে যাইয়া গান আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে গ্রামের দুই একটি লোক আসিতে থাকেন। দাশরথী ছড়া ধরিলেন, "শুনি লোকে মান করে, মেয়ে মানুষেই ত মান করে, এ যে দেখি মানকরে পুরুষেও মান করে।" ইত্যাদি শব্দের এই সামান্য বাঁধুনীতেই মানকর-বাসীর ক্রোধ আনন্দে পরিণত হইল। দাশুরথীকে যাহা দিবার কথা ছিল, তাঁহারা তদপেক্ষা অধিক দিলেন। অন্য গায়ক হইলে হয় ত তাঁহারা তাড়াইয়া দিতেন, এবং তাঁহার নামে নালিশ করিতেন।

শুনিয়াছি, দাশরথী জীবনে একবারমাত্র অর্দ্ধচন্দ্র দক্ষিণা পাইয়াছিলেন ; কিন্তু সে ভদ্রলোকের সভায় নহে। পীলার নিকটে হুড়কোডাঙ্গা নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে কতকগুলি নিরক্ষর কৃষকের বাস। তাহারা একবার বারোয়ারী পূজা করে, এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া গান শুনিবার নিমিত্ত দাশরথীকে তাহাদের গ্রামে লইয়া যায়। যেরূপ আসর প্রস্তুত হইয়াছিল, দাশরথী পূর্ব্বে কখনই তেমন আসরে গান করেন নাই। আলোক অতি সামান্য, এবং আসন অতি কদর্য্য ছিল। তিনি দেখিলেন, আসরও যেমন, শ্রোতাও তেমনই। দাশরথী অন্য ভাবের গান গাহিতে চাহিলেও হুড়কোডাঙ্গার সকলেই বলিল, একটা ভাল পাঁচালী হউক। দাশরথী গান আরম্ভ করিলেন, কিন্তু উহা শ্রোতৃবর্গের ভাল লাগিল না। কিছুকাল পরে গ্রামের মোড়ল এক জনকে কহিল, "দে রে দে, দক্ষিণার টাকা ক'টা এনে দে, গান যা শুনলাম, তা বেশ। এইতে এত নাম।" দাশরথীর প্রাণে

বড়ই লাগিল। আর কিছু না বলিয়া এবং টাকা না লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, এবং মনের দুঃখে সকাল বেলায় গ্রামের লোককে শ্লোক শুনাইলেনঃ—

যার বিয়েতে এয়ো হলেন স্বয়ং লক্ষ্মী আসি,
তার বিয়েতে কুলো ধরলে না আকালে হাঁড়ির মাসী।
নদে শান্তিপুরে যার জয় জয় রব,
হুড়কোডাঙ্গায় হার হ'ল তার, হরির ইচ্ছা সব।

ইহাতে দাশরথীর একটু আত্মপ্রশংসার ভাব আছে, কিন্তু তাহা মার্জ্জনীয়।

বিনয় ও বাকচাতুর্য্য।

বস্তুতই তথন দেশ তাঁহার যশে পরিপূর্ণ ছিল, এবং "ন'দে শান্তিপুরে" তাঁর জয় জয় রব। দাশরথী স্বভাবতঃ অতিশয় বিনীত ছিলেন, এবং দেবতা ব্রাহ্মণে তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল। নিজে পাঁচালীর দল করিয়া ব্রাহ্মণের বৃত্তি পরিহার করিয়াছিলেন, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন, এবং এই জন্য আপনাকে অতি হীন বলিয়া মনে করিতেন। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা আছে। দাশরথীর সময়ে (পাটুলী) নারায়ণপুর গ্রামে শতঞ্জীব বিদ্যারত্ন নামে এক অধ্যাপক বাস করিতেন। এই গ্রাম পীলের অতি সন্নিহিত। দাশরথী তাঁহার রচিত পাঁচালী শতঞ্জীবের কাছে লইয়া যাইতেন, এবং কহিতেন, আপনি ইহার অশুদ্ধি-সংশোধন করিয়া দিন।" এই স্থানে একটু বিস্তৃতভাবে বলি, দাশরথী "কিতাবতী লেখাপড়া"ই শিখিয়াছিলেন; বিদ্যালয়ে কথনও রীতিমত লেখাপড়া শেখেন নাই। বঙ্গবাসীর শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, দাশরথী রীতিমত লেখাপড়া ও সংস্কৃত জানিতেন বলিয়া, ভুল করিয়াছেন। দাশরথী নিজে সর্ব্বদাই স্বীকার করিতেন যে, তিনি লেখাপড়া কিছুই শেখেন নাই। তিনি স্থানে স্থানে দুই একটি শব্দেরও অপব্যবহার করিয়াছেন। "দোষ কারও নয় গো মা" ইত্যাদি এই গানটিতে কোদালীর পরিবর্ত্তে কোদণ্ড শব্দের প্রয়োগই ইহার প্রমাণ। ইহা ছাড়া দুই এক স্থানে দাশরথী ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন। যাহা হউক, শতঞ্জীব বিদ্যারত্ন মহাশয় দাশরথীর রচিত দুই একথানি পাঁচালী পড়িয়াই বুঝিলেন যে, ইনি এক জন অসামান্য কবি। দাশরথী পুনরায় তাঁহার নিকট নূতন একথানি পাঁচালীর পাণ্ডুলিপি লইয়া গেলে তিনি কহিলেন, "দাশু, তুমি সিদ্ধ পুরুষ। তুমি যাহা লিখিয়াছ, উহাই শুদ্ধ; আমি আর উহাতে কলম চালাইব না।" দাশরথী বিনীতভাবে কহিলেন,

"আজ্ঞে আমি ত সিদ্ধ বটেই। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যখন পাঁচালীর দল করিয়াছি, তখন সিদ্ধ বই আর কি? আপনারা আতপ, আমি আর এ জন্মে আতপ হইতে পারিলাম না।" ইহাতে দাশরথীর বাক্‌চাতুর্য্য ও নিজের হীনতা-প্রকাশ, দুইই আছে। সিদ্ধ ও আতপ চাউলে যে প্রভেদ, তাঁহাতে ও প্রকৃত ব্রাহ্মণে সেই প্রভেদ, ইহা কি সুন্দর ভাবেই বলিলেন।

দাশরথী ছন্দ সর্ব্বত্র নিয়মানুবর্ত্তী নহে। তিনি উচ্চারণের মাত্রানুসারে শ্লোক লিখিয়া যাইতেন; অক্ষরের সংখ্যা দেখিতেন না। তাঁহার দীর্ঘ ত্রিপদীতে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে আট অক্ষরের পরিবর্ত্তে নয় অক্ষর, দশ অক্ষর, কখনও বা সাত অক্ষর, এবং তৃতীয় চরণে দশ অক্ষরের স্থলে কখনও এগার অক্ষর, বার অক্ষর, অথবা কোনও স্থানে নয় অক্ষর বা আট অক্ষরও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পয়ারও এইরূপ। উপরি-উদ্ধৃত হুড়কোডাঙ্গার ব্যাপার-ঘটিত চারি পংক্তিতেই তাহা প্রকাশ। আবার অনেক স্থলে তিনি ত্রিপদীর মধ্যে চৌপদী আনিয়াছেন। কোথায়ও বা পয়ারের মধ্যে ভঙ্গপয়ার আছে; ইহা ছাড়া কোনও কোনও স্থলে মিলও সঙ্গত নহে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই বিদ্যার অভাবেই তাঁহার কৃতিত্ব অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হয়। দাশরথী কোনও গ্রন্থ না পড়িয়া স্থানে স্থানে যেরূপ ভাবে শাস্ত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার প্রতিভার পরিচয়ে বিস্মিত হইতে হয়।

ফলতঃ যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, দাশরথীকে কোনও প্রকারেই উপেক্ষা অথবা অবজ্ঞা করা যায় না। আমরা স্বীকার না করিলেও, দেশের অনেক কবি ও গীত-রচয়িতা দাশরথার নিকট ঋণী। শুনিয়াছি, দাশরথীর মৃত্যুর অনেক দিন পরে স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ অধিকারী পীলার নিকটবর্ত্তী অগ্র-দ্বীপ গ্রামে মল্লিক বাবুদের বাড়ীতে গান করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি শুনিলেন, দাশরথীর বিধবা ব্রাহ্মণী তখনও জীবিত আছেন। তাঁহাকে এক পালা গান শুনাইবেন বলিয়া নীলকণ্ঠ পীলায় যান, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর অনুমতি লইয়া নিজ ব্যয়ে দাশরথীর বাড়ীর সম্মুখে আসর প্রস্তুত করেন এবং সেখানে নিজের রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পালা গান করেন। পীলা, পাটুলী প্রভৃতি গ্রামের ভদ্রলোকেরা গান শুনিতে আসিয়া কিছু কিছু "প্যালা" দিতে চাহিলে নীলকণ্ঠ বলেন, "পয়সা অন্যত্র অনেক উপার্জ্জন করিয়া থাকি; আজ এখানে আমি কিছুই লইব না। দাশরথীর বাসস্থানকে আমি পীঠস্থান বলিয়া মনে করি। মা ঠাকুরাণীকে এক পালা গান শুনাইতে পারিলাম, ইহাতে আমার জীবন

ধন্য হইল।” যাত্রার দলের অধিকারী, হইলেও উৎকৃষ্ট গীত-রচয়িতা বলিয়া দেশে নীলকণ্ঠের খ্যাতি আছে। দাশরথীর প্রতি তাঁহার ন্যায় লোকের এমন আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধার মূল্য আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

উপসংহার।

বস্তুতঃ দাশরথী অসামান্য প্রতিভা ও কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তিনি গ্রাম্য কবি ছিলেন। বিদ্যার অভাবে ও সময়ের প্রভাবে তাঁহার সমস্ত কবিতা মার্জ্জিত অথবা মার্জ্জিত রুচির অনুমোদিত না হইতে পারে, কিন্তু উহা যে সর্ব্বত্রই রসে পরিপুর্ণ, এবং বহু স্থলেই যে উহাতে শব্দের মাধুর্য্য ও অর্থের চমৎকারিত্ব, উভয়ই আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। শব্দচয়ন-নৈপুণ্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বঙ্গ-সাহিত্যে নাই। তিনি কবিতায় কথা কহিতেন। স্থানে স্থানে গান করিতে যাইয়া তিনি সেই সকল স্থানের লোক অথবা বস্তু সম্বন্ধে যে সকল কবিতা রচনা করিতেন, তাহার অনেক কবিতা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। পালার শেষে এইরূপ দুই একটি কবিতার আবৃত্তি করিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গকে হাস্যরসে ভাসাইয়া দিতেন। আমরা এই শ্রেণীর একটিমাত্র কবিতা পাঠককে শুনাইব। দাশরথী নদীয়া জেলায় ধর্ম্মদা গ্রামে গান করিতে আসিয়াছেন। দেখিলেন, পূজার পুরোহিত উপযুক্ত লোক নহেন, গ্রামের নাপিত ভাল কামাইতে পারে না, আর ময়রা যে মুড়কী মাখে, তাহার সহিত গুড়ের সম্পর্ক অতি অল্প, উহা কাপাসের ন্যায় সাদা। দাশরথীর কবিতা হইল—

দীনু পুরুৎ মন্ত্র পড়ান্, অর্দ্ধেক তার ভুল্;  
গুরো নাপিত দাড়ি কামায়, অর্দ্ধেক তার চুল্।  
রতন ময়রা মুড়কী মাখে, কাবাস্ কাবাস্।  
ঠাকুর্‌রা সব খেয়ে বলেন, সাবাস্ সাবাস্।

ইহা তরল রচনার সুন্দর উদাহরণ। আর সে সময়ের শ্রোতা ইহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন।

আর কিছুই বলিবার নাই। দাশরথীর সকল প্রকার রচনারই নমুনা প্রদর্শিত হইল। এই কবিতাটি ধরিয়াই বলি, দাশরথীর রচনা উত্তম ধানের টাট্‌কা মুড়কী। উহার সর্ব্বাঙ্গ খাঁটী গুড়রূপ রসে মাখা। কিন্তু উহা লুচী নহে। অধুনা সমাজে লুচীর প্রচলনই অধিক। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, লুচী অনেক স্থলেই ভেজাল ঘৃতে ভাজা। দেশে পুনরায় খাঁটী জিনিসের আদর বাড়িতেছে। শুনিতে পাই, পল্লীগ্রামে ভেজাল ঘৃতের অত্যাচারে অনেক স্থলে

লুচীর পরিবর্ত্তে মুড়কীই ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতেই আশা হয় যে, দাশরথীর কবিতারও আবার কিঞ্চিৎ আদর বাড়িতে পারে।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

---

# বিবেকানন্দ।*

যে মহাপুরুষ শ্রীভগবানের প্রত্যাদেশ পাইয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তিনি অঘটন ঘটাইয়া শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত করিয়া স্বীয় পরিচয় প্রকট করিয়া থাকেন। বিধি-নিষেধের বাহিরে একটা কিছু উৎকট রকমের ঘটাইতে পারিলে, তবেই সাধারণ লোকে ভাগবৎ-বিভূতির বিকাশে আস্থাবান হয়। শ্রীভগবান যুগে যুগে যত অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, ততবার তাঁহাকে এই প্রকারের অগ্নিপরীক্ষা দিতে হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে অলোক-সামান্য মহাপুরুষ ছিলেন, সে পক্ষের প্রতিপোষক অসংখ্য প্রমাণ থাকিলেও এক বিশিষ্ট প্রমাণ, স্বামী বিবেকানন্দ। পূর্ণব্রহ্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের যেমন পূর্ণত্ব-বিকাশ হইয়াছে, গীতার অর্জ্জুনে তেমনই রামকৃষ্ণের বিভূতির আংশিক বিকাশ হইয়াছে শিষ্য বিবেকানন্দের মনীষায়। শাস্ত্রোক্ত গুরু-শিষ্যের তত্ত্ব যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা আমাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিবেন।

আবার স্বামী বিবেকানন্দের মাধুরী ফুটিয়াছে শিষ্যা নিবেদিতায়। সেই নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দকে কি ভাবে কেমন দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহার পরিচয় এই ইংরেজী পুস্তিকাখানিতে পাওয়া যায়। ইহাতে দ্বাদশটি অধ্যায় আছে; এই দ্বাদশটি অধ্যায়ে যেন দ্বাদশ ভাবের কথা, দ্বাদশ অবস্থা-বিশেষে প্রকট করা হইয়াছে। বলিলে বোধ হয় তেমন অতিমাত্রায় শ্লাঘা করা হইবে না যে, আমরা ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের একটু আধটু খবর রাখি। আমাদের ধারণা ছিল যে, হিন্দুর ভাবের কথার অভিব্যঞ্জনার পক্ষে ইংরাজি ভাষা তেমন পর্য্যাপ্ত নহে। থিওসফিক্যাল সভার মনীষী লেখকবর্গের চেষ্টায় একটা নূতন রকমের ইংরেজী গদ্যের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু সে ভাষা একটু বেশী কটমট। কুমারী নিবেদিতার এই পুস্তকের ভাষা কটমট ত নহেই, পরন্তু ভাব ও রসে ভরপুর। কিন্তু মনে হয় যে, হিন্দু ভাব ও মাধুর্য্য এত অধিক-

---

* Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda by sister Nivedita of Ramakrishna Vivekananda. Published by the Brahmachari

মাত্রায় আছে বলিয়া, "ইংলিশম্যানে"র তুল্য উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্রের লেখককেও অকারণে কতকটা বিহ্বল হইতে হইয়াছে। এমন অনেক ভাব আছে, যাহা খাঁটী হিন্দু না হইলে বুঝা যায় না, প্রাঞ্জল ইংরেজী ভাষায় লেখা থাকিলেও, তাহা সাধারণ খৃষ্টানের বোধগম্য হয় না। এই পুস্তকে তেমন অনেক কথা আছে। তাহার একটা কথা ধরিয়া "ইংলিশম্যান"কে কবুল-জবাব দিতে হইয়াছে যে, তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সে কথাটা এই ঃ—স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন, "Who can say that God does not manifest himself as Evil as well as Good? But only the Hindu dares to worship him in the Evil." অর্থাৎ, কে বলিতে পারে যে, ভগবান পাপরূপে বা মন্দ-ভাবে প্রকট না হন? তিনি কল্যাণময় বটে, পরন্তু অমঙ্গলও ত তাঁহাতে থাকিতে পারে! একমাত্র হিন্দুই ভগবানের অকল্যাণকর বিকাশকে পূজা করিতে সাহসী হয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্রেই আছে—

"ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্।"

এই সিদ্ধান্তটা হিন্দুকে বুঝাইতে কষ্ট নাই, কেন না, হিন্দুর ভাবুক কবিগণ গানে ও ছড়ায় কথাটাকে এত সোজা করিয়া দিয়াছেন যে, উহা বাঙ্গালীর পক্ষে কতকটা স্বতঃসিদ্ধবৎ গ্রাহ্য হইয়াছে। তাই একদিন স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,—"But we worship neither pain nor pleasure. We seek through either to come at that which transcends their both." অর্থাৎ, আমরা আনন্দ বা নিরানন্দ, কোনও কিছুরই উপাসনা করি না; তবে উভয়ের ভিতর দিয়া যিনি সুখ দুঃখের অতীত, তাঁহারই আরাধনা করি। ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়া গিয়াছেন—

"শুচি আর অশুচিরে লয়ে, দিব্য ঘাটে যবে শুবি,—
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি।"

প্রেমের অধিকার উপাসনায় কতটুকু, তাহা বুঝাইতে যাইয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন,—"No other has such tremendous idealising power. The beloved actually becomes what he is imagined to be. This love transforms its object." অর্থাৎ, প্রেম আরাধনাকে ভাবমধুর করিয়া তোলে, ভালবাসার পাত্রকে যে সাজে ইচ্ছা সেই সাজেই সাজান যায়। ভাবের ঠাকুর প্রেমের আকর্ষণে ভাবানুরূপ হইয়া থাকেন।

এমনই ভাবে শাস্ত্রের সাধনার, উপাসনার অনেক সিদ্ধান্ত অতি সুন্দর ইংরে-

জীতে এই পুস্তকে নিহিত আছে। ভক্তিমতী কুমারী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সহিত পাঞ্জাব, আলমোরা, কাশ্মীর প্রভৃতি নানা প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া, যে সকল ভাবের কথা, সিদ্ধান্তের কথা আহরণ করিতে পারিয়াছিলেন, সে সকল কথা তিনি লিখিয়া রাখেন। সেই লেখা আজ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। শুনিয়াছিলাম, কাচপোকা ধরিলে তেলাপোকাও কাচপোকা হইয়া যায়; এই পুস্তক পাঠ করিয়া এই কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিলাম। কুমারী নোবল্ বিলাতী নারী; ভারতের কোনও ভাব, কোনও সিদ্ধান্তের কোনও খবরই রাখেন নাই। তাঁহাকে কোন পদ্ধতিক্রমে ভারতীয় ভাবে মজাইয়া মাতাইয়া তোলা যায়, তাহা এই পুস্তক পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের মনীষার ঔজ্জ্বল্য, প্রতিভার সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তির পরিচয় এই পুস্তকেই আছে। কিন্তু এ পুস্তক পড়িতে জানিতে হয়, ভক্তিমতী শিষ্যা কেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ ধরিয়া ভাবের লহরী গাঁথিতেছেন, তাহা যে ভাবুক বুঝিতে পারেন, তিনিই এই পুস্তক মাথায় করিয়া লইবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ কেমন স্পর্শমণি ছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে, কুমারী নিবেদিতার ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ এই পুস্তকখানি, ভক্তিভারাবনতচিত্তে পাঠ করিতে হইবে। শ্রদ্ধার পরিপ্রেক্ষণেই (Perespective) শ্রদ্ধার পাত্রের প্রতিমা অঙ্কিত করিতে হয়। যে পাঠক বা দর্শক এই পরিপ্রেক্ষণার বিন্যাস সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন, তিনি চিত্রের মহিমা বুঝিতেই পারিবেন না। "ইংলিশম্যানে"র লেখক পারেন নাই। পাছে আমাদের দেশবাসী কেহ বুঝিতে না পারেন, তাই সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে বার বার একটা কথাই বলিতে হইয়াছে। সন্ন্যাসীকে বুঝা বড় শক্ত কথা। সন্ন্যাসীর কোনও কিছুরই সঙ্গতি নাই। তিনি যে কখন কোন ভাবে থাকেন, কখন কোন খেয়ালে মশ্‌গুল্ হন, তাহা বলা যায় না, ধরা যায় না। তাই আজকাল আমরা সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই জুয়াচোর বলিয়া ধরিয়া লই। জুয়াচোর—মেকী সাধু যে নাই, এমন কথা বলি না; কিন্তু তুমি আমি যতটা মনে করি, ততটা নহে। প্রত্যেক সাধু সাক্ষাৎ শুকদেব গোস্বামী না হইলেও, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে যে একটু সাধুতার বিশিষ্টতা আছে, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং সিদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন, এবং ভারতের সাধু-সন্ত সম্প্রদায়ের ভাবুকতা তিনি গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে অমরনাথ দর্শন করিয়াছিলেন, সেই ভাবটাই তাঁহার বিশিষ্টতার দ্যোতক।

কুমারী নিবেদিতা স্বামীজীর অমরনাথ-দর্শনের কথাটা যোগ্যা শিষ্যার মতনই লিখিতে পারিয়াছেন। শ্রীনগর-বাস, ঝিলম নদীর তীরে শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি বিষয়ও সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত। ঐ যে দলে থাকিয়া শাস্ত্রালোচন করিতে করিতে এক একবার প্রচ্ছন্ন হইবার চেষ্টা, এক একবার সব ছাড়িয়া একান্তে যাইবার চেষ্টা, এবং মাঝে মাঝে সত্যই পলায়ন—ইহার বিবরণ লিখিতে যাইয়া নিবেদিতা বেশ মাধুর্য্যের সহিত গুরুর পরিচয় দিয়াছেন। এই কারিগরীর জন্য আমরা এই পুস্তকের আদর করিয়াছি। যে সকল সিদ্ধান্তকথা লেখা আছে, বাহুল্যভয়ে এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিলাম না—করিবার প্রয়োজন নাই। পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে সেই বিবেকানন্দকে মনে পড়ে—সেই দীপ্তচক্ষু, তীব্রদৃষ্টি, কষিত-কাঞ্চন-কান্তি, আলান-সংবদ্ধ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সদা চঞ্চলগতি বিবেকানন্দকেই মনে পড়ে—সেই গোমুখীধারার ন্যায় ভাষা ও ভাবের বিস্তার, সদাপ্রফুল্ল হাস্যমুখে, কদাচিৎ বা গম্ভীরভাবে যুক্তি তর্কের অবতারণা, ভাবগদ্‌গদকণ্ঠে অনুযোগের মাধুরীবিস্তার—বিবেকানন্দের বিশিষ্টতার সব কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে বলিয়াই পাঠকগণকে শ্রদ্ধার সহিত এই পুস্তক পাঠ করিতে বলিতেছি; পাঠ করিলে বুঝি বা তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারিবে।

---

# মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

**প্রবাসী।** চৈত্র।—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'আমাদিগের দারিদ্র্য ও অর্থবিজ্ঞানের সার্থকতা' চিন্তাশীলের অনুশীলনযোগ্য। লেখক বলিয়াছেন,—ইউরোপ ভ্রান্ত আদর্শের অনুবর্ত্তী। 'এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক বোধের দ্বারা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত।' শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী বিবেকানন্দও ভারতবাসীকে এই উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন। এখন ইহা স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়। এ পথ দুর্গম, সঙ্কট-কণ্টকে কণ্টকিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই আমাদের মুক্তির পথ,—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' লেখকের ভাষায় বাহুল্য আছে। তাঁহার বক্তব্য আরও সহজে ও সরলভাবে ব্যক্ত হইলে এই উপাদেয় ও উপকারী প্রবন্ধ অধিকতর প্রচার ও প্রসার লাভ করিত। শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্তের 'বাঙ্গালার তক্ষণ-শিল্পের নমুনা' উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামলাল সরকারের 'চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব' এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। 'পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম নাট্যকার' প্রবন্ধে শ্রীশরৎকুমার সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন,—'অভিমন্যুবধই পূর্ব্ববঙ্গে বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম নাট্যগ্রন্থ এবং উহার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাস মহাশয়ই পূর্ব্ববঙ্গের প্রথম নাট্যকার।' লেখক সংক্ষেপে শ্রীযুত দাস মহাশয়ের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী 'মশা, মাছি এবং স্বাস্থ্যে' প্রাঞ্জল ভাষায় কতকগুলি অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বীরসা ভগবানে'

দেখিতেছি,—ছোটনাগপুর, সিঙ্গভূম ও ধলভূমের কোল অধিবাসীরা বীরসা নামক এক জন মুণ্ডাকে 'ভগবানের অংশ-স্বরূপ জ্ঞান করিত।' বীরসা অবতারের কাহিনী কৌতুকাবহ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র' পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। ছন্দে যতি খুন হইয়াছে।—

'নরের হৃদ্গত যত গ্রন্থে যে রেখেছে গেঁথে গেঁথে,

পড়া যায় না। 'বায়বী কল্পনা ছবি' এখনকার কবিদের একচেটে। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় বায়ুর সম্পর্ক নাই, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিব। যাহারই গানে থাকুক, এটুকু আমরা পরিপাক করিতে পারিব না। দেবীমূর্ত্তির 'অব্রণ' বিশেষণ দেখিয়া সুরেশ সর্ব্বাধিকারীর প্রতিভাও চমকিয়া উঠিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! এমন পূয-রক্ত-গর্ভ বিষম বিশেষণ ত কখনও দেখি নাই! 'পুষ্পরাধা' শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। 'প্রবাসী'তে কেবল কালীর স্তূপ দেখিতেছি। ঘোর অন্ধকারে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের যে আভাস দেখিতেছি, তাহা পুরুষোত্তমের ভূত হইতে পারে, পুরুষোত্তম নহে।

**ভারতী।** চৈত্র।—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষের 'বিমানচারিণী'র আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না।—'বিমান' আকাশ বা ব্যোমপথ নহে। চিত্রকর গতি ও প্রবল বায়ুপ্রবাহের আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। বিমানচারিণী ত্রিভঙ্গ মুরারির মত 'পায়ের উপর পা' রাখিয়া চলিয়াছেন। মেঘলোকে এই ভাবে পদক্ষেপ করিতে হয় কি না, মেদিনীচারী আমাদের তাহা জানা নাই। সুতরাং বিমানচারিণীর পদভঙ্গী অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। চিত্রিতার চরণে স্থিতির ও সমীরসঞ্চালিত পরিধানে ও মালিকায় গতির ব্যঞ্জনা করিয়া শিল্পী 'দু নৌকায় পা' দিয়াছেন। শ্রীজগদীশ তরফদার 'চিত্রগুপ্ত' নামক পদ্যে লিখিয়াছেন,—'চিত্রগুপ্ত নহে রে সুপ্ত!' আমরা সকলেই এ তথ্যটুকু জানি, তবু ভুলিয়া থাকি। নতুবা তরফদারও কবি হইতেন না, আমিও এই পুরাতন সংবাদটি পাঠকবর্গের গোচর করিতাম না! চিত্রগুপ্ত আবার 'মেলিয়ে রেখেছে খাতা!' মর্ত্ত্যের মুহুরী, খাজাঞ্চী প্রভৃতি সকলে খাতা খুলিয়া রাখে, কিন্তু চিত্রগুপ্ত খাতা 'মেলিয়া' রাখেন। মেলাতে 'পাখা'রও একটু আমেজ আসে। চিত্রগুপ্তকে পৌরাণিক গরুত্মানের জ্ঞাতিকুটুম্ব বলিয়া মনে হয়। ইহাই 'মেলিয়া'র সার্থক ব্যঞ্জনা। খাতাখানি খেরুয়ায় বাঁধা, কি গোধূলির আলোয় মোড়া, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার একটি পাতা দেখিয়াই হতভম্ব হইয়াছি।—'অন্তবিহীন নগ্ন আকাশ সবখানি তার পাতা।' আকাশের 'এক-অংশিত' আকারের খাতা! আট-পেজী, বারো-পেজী হইলে বিরাট ভাবের দ্যোতনা হইত না,—হয় ত অনন্ত বিশেষণটি নিরর্থক—অন্ততঃ খর্ব্ব হইয়া পড়িত! তার পর 'নগ্ন' আকাশ! আকাশকে আমরা কেহ কখনও আলখাল্লা, ধুতি-চাদর, পাঁতলুন-কোট, ইজের-চাপকান, আবা-কাবা, কিমোনা, পঞ্জাবী, ফতুয়া, গেঞ্জী,—এমন কি, কৌপীন-টুকুও পরিতে দেখি নাই! আকাশ চিরকাল উলঙ্গ—কিন্তু তাহা এত দিন পৃথিবীর গোচর হয় নাই। প্রতিভাই নব নব আবিষ্কার করিতে পারে। এত বড় সত্যটা কাহারও চোখে পড়ে নাই, কিন্তু কবির উর্দ্ধনিবদ্ধ চক্ষু যোড়াটিকে খোদ আকাশও ফাঁকি দিতে পারে না। কবির মিলও পরম রমণীয়; নমুনা—'ক্রন্দন রোল মঙ্গল বোল।' বাস্তবিক, আমের বোলের ও মৎস্য শোলের মিলও এত সুস্বাদু

নহে। কয় চরণে কবিতার এত কারসাজি 'ভারতী'তেও প্রায় দেখা যায় না। 'মান-ভঙ্গ' গল্পটিতে বিশেষতঃ নাই। শ্রীঅসিতকুমার হালদার 'ভারত-শিল্পে' চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিয়াছেন। 'প্রাচ্য-শিল্প-সভার ষষ্ঠবার্ষিক প্রদর্শনী' প্রবন্ধে যে কয়খানি চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কালী' সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। ইহার কল্পনা অত্যন্ত উদ্ভট, উচ্ছৃঙ্খল; এমন কি, বর্ব্বর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুর দেবতার এ কি লাঞ্ছনা! অর্দ্ধেন্দুকুমারের প্রাচ্য-শিল্প-প্রতিভার জয় হউক,—তিনি হেলে ধরুন, এখন কেউটে ধরিবেন না। দাঁড়কাঁক, ছুঁচো, কেঁচো প্রভৃতি পটে ফুটাইয়া তুলিয়া আত্মীয়-সভার সভ্যগণের করতালি সম্ভোগ করুন, অনধিকারচর্চ্চা করিবেন না—হিন্দুর দেবতাকে বিকৃত করিয়া, শক্তির রূপে রাক্ষসী-ভাবের আরোপ করিয়া হিন্দুর মনে বেদনা দিলে হিন্দুসমাজ তাঁহাকে ক্ষমা করিবে না। ইহা কলা-প্রিয়তার দ্যোতক হইতে পারে, কিন্তু সমীচীনতার পরিচায়ক নহে। মহাশক্তির কল্পনা অর্দ্ধ-মস্তিষ্কে ইহজন্মে উদিত হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই, তাহা আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। তোমার ঐ তথাকথিত চিত্রই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' বাঙ্গালা ভাষার অনুরাগীদিগের অনুশীলনযোগ্য।

**সুপ্রভাত।** চৈত্র।—'জর্জ্জ এলিয়টের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' এবারকার প্রবন্ধহীন 'সুপ্রভাতে'র 'নিরস্তপাদপে দেশে' এরণ্ডের মত 'ক্রমায়তে'। সকলে পরিচয় পান, লেখক ইন্দুবাবু পরিচয় 'দেখিতে' পান। শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর 'পূর্ব্বকথা' সুখপাঠ্য। ভাষায় সৌষ্ঠব থাকিলে আরও রমণীয় হইত। 'বাবরের জীবনী' ও 'দ্বিপত্নীক' চলিতেছে। 'দ্বিপত্নীকে'র ভাষার পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। এবার একটি নমুনা দিব।—'অননুভূত পুলকে যামিনীর বক্ষের স্পন্দন মধ্যে মধ্যে দ্রুত হইয়া উঠিয়া থামিয়া আসিতে লাগিল।' রবীন্দ্রনাথের 'পুলক' 'গাছে গাছে নাচিয়া' অনেক দিন পূর্ব্বে চম্পট দিয়াছিল, বহুকাল পরে তাহার দর্শন পাইয়া আমাদের 'আত্মা পুলকিত' হইয়া উঠিয়েছে!—কিন্তু যাহা 'অননুভূত', অর্থাৎ আদৌ অনুভূত হয় নাই, তাহার প্রভাবে বক্ষের স্পন্দন প্রভৃতি ক্রিয়ার উৎপত্তি ঘটিল? 'বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের অভাব' বলিয়া ডাক্তার রায় আর কাঁদিবেন না। গৌড় দেশে বিজ্ঞানে উপন্যাস ও উপন্যাসে বিজ্ঞানের সন্ধান করিতে হয়!

**বঙ্গদর্শন।** ফাল্গুন।—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—'রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে যদি ব্যক্তিত্বাভিমানকে জাগাইয়া তোলাই জাতীয় জীবনের পক্ষে অবশ্যকরণীয় কাজ হয়, তবে সমাজক্ষেত্রেও গত্যন্তর নাই।' যে ক্ষেত্রেই হউক, ব্যষ্টির পূর্ণ বিকাশ না হইলে সমষ্টির বিকাশ হইতে পারে না। ব্যক্তিত্ব এক ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করিবে, এবং অন্য ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে, ইহাও সম্ভব বা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। ধীরেন্দ্রবাবুর মন্তব্যটি চিন্তনীয়। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'রামাবতী' নামক সারগর্ভ প্রবন্ধের উপসংহারে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের তথ্য উদ্ধার করিবার যে পথনির্দ্দেশ করিয়াছেন, আশা করি, তাহা বিফল হইবে না। শ্রীবিপিনচন্দ্র পালের 'বিলাতের টিকটিকী' পড়িয়া জানা গেল, এক পর্য্যায়ের অন্তর্গত হইলেও, উভয় দেশের জীবে প্রভেদ আছে।

**উদ্বোধন।** চৈত্র।—শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলালের 'ভক্ত গিরিশচন্দ্রে'র প্রথম প্রস্তাব পড়িয়া



স্নানান্তে।

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা চিত্রিত।

Blocks by G. N. Mukherji, Prop. Mohila Press. Mohila Press, Calcutta.

আমরা আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষের 'অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজাচার্য্যের আপত্তিখণ্ডন' বিশেষজ্ঞের আলোচ্য। শ্রীমতী—র 'কাশীতে শঙ্কর' সুখপাঠ্য রচনা।—'ভারতের সাধনা' নামক সুচিন্তিত, সুলিখিত প্রবন্ধাবলী এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল।

---

# সাহিত্য-সম্মিলন।

যখন অপূর্ব্ব ভাবরাজ্যের প্রজা ছিলাম, তখন ঘরে বসিয়া জাতি-কুল-মান বজায় রাখিতে পারিতাম, তখন হাসিয়া বলিতাম—

"কাজ কি আমার কাশী,
শ্যামাপদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।"

সে ভাব ছাড়িয়া যখন ইউরোপের ভাবে মুগ্ধ হইলাম, তখন মদান্ধ মৃগের ন্যায় আত্মহারা হইয়া চারি দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। সে ছুটাছুটির ফলে, বিষম জাতিবৈর-ভাব লাভ করিলাম; গড়া-জিনিস পাইয়াও, বালকের ন্যায় তাহা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া আর একটা কি গড়িতে উদ্যত হইলাম। তাই আজ বাজারে বাজারে কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, জাতি-বি,-জাতি,-উপ-জাতি, সকলের সমন্বয়চেষ্টায় নানাবিধ অভিনয় চলিতেছে। বারোইয়ারী পূজা উঠিয়াছে, পরন্তু বারোইয়ারী উৎসব উঠে নাই। পরে সে উৎসবের মুখে একটু চাপ পড়িতেই, বিহ্বল হইয়া আত্মান্বেষণ আরম্ভ করিতে হইল। তখন কাঁদিয়া বলিতে হইল—

"তুই কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকাইলি,
ছিঃ ছিঃ মন তোর কপাল পোড়া;—
কাজ হারালি কাজের গোড়া।"

সে রোদনের ফলে আত্মদর্শন হইল, পুরাতনের ছায়া দেখিতে পাইলাম। তাই আকাশগঙ্গা ভারতরঙ্গিণী ভাষা-মন্দাকিনীর প্রবাহে অবগাহন স্নান করিবার সাধ হইল। যে ভাষার অন্তরে ভাবের ঠাকুর লুকান আছেন, যে ভাষার কূলবিস্তারিণী বেলাভূমির স্তরে স্তরে যুগযুগান্তরের ভাব ও গৌরব-গাথা লুকান আছে, যে ভাষার স্নেহশীকরসম্পৃক্ত শীতল চেলাঞ্চলের আবরণে বঙ্গীয় মানবতার নিদর্শন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যে ভাষা ও সাহিত্য ভাগীরথীর ন্যায় আমার সর্ব্বস্ব—সর্ব্বাবলম্বন—ইহপরকাল; পবিত্রতা, স্নিগ্ধতা, কোমলতা যাহাতে নিত্য বিদ্যমান,—জনমে-মরণে, জরায় যৌবনে যাহার তীরে যাইয়া আমি শান্ত ও মুগ্ধ হই, আমার অনন্ত পিতৃগণের তর্পণ করিয়া আমি সুখী হই—

বাঙ্গালীর সেই 'সাত রাজার ধন এক মাণিক' ভাষা-তটিনীর তরল-তরঙ্গে ডুব দিবার অর্দ্ধোদয়-যোগ-কাল উপস্থিত হইল। তখন হাসিয়া বলিলাম—

"ডুব দে মন কালী বলে,
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।"

ইহাই সাহিত্য-সম্মিলন। উহাকে এই ভাবে বুঝি বলিয়া, নিজ নিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রথম উদ্যমতুল্য বুঝি বলিয়াই, তোমাদের ব্যক্তিগত দলাদলি ও রেষারিষীর দিকে দৃষ্টিপাত করি না; তীর্থগুরুগণের দ্বন্দ্বে দৃক্‌পাত করি না; নিজের ভাবে বিভোর হইয়া জাতি-প্রীতি-ত্রিবেণীসঙ্গমে শুভক্ষণে যাইয়া ডুব দিই। একবার ডুব দাও—"শ্যামা জন্মদে!" বলিয়া একবার ডুব দাও—সতী-অঙ্গ-লাঞ্ছিত বাহান্ন পীঠে বিভূষিতা সুজলা, শ্যামলা গিরিমেখলা, জন্মভূমিকে স্মরণ করিয়া একবার ডুব দাও! দেখিবে, ফল ফলিবেই। ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়া গিয়াছেন যে, হৃদিরত্নাকর—ভাবাম্বুধি নহে শূন্য কখনও, যদি কদাচিৎ দুই চার ডুবে ফল নাও পাও, তবুও ভয় নাই। এই ভাবে ডুব দিবার উদ্দেশ্যেই এবার চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্মিলনে গিয়াছিলাম।

বাড়বাকুণ্ডে সলিল, অনল ও অনিলের ত্রিবেণীসঙ্গম। সে সঙ্গম পর্ব্বত-মালার বত্রিশ পঞ্জরের আবরণে সংগুপ্ত,—ঠিক যেন হৃদ্‌কন্দর,—দুরবগাহ, দুজ্ঞেয় এবং দুর্ভেদ্য। সেখানে অনলে, অনিলে, সলিলে নিত্য খেলা চলিতেছে; অনল ও অনিল দুই বন্ধু সলিলের ভয়ে আত্মগোপন করে না, তাহারা সলিলের তরল বক্ষোবিস্তারের উপর অনবরত খেলা করিতেছে; শীতলহৃদয় সলিল অনিলের সঙ্গসুখে উষ্ণভাব ধারণ করিয়াছেন বটে, পরন্তু অনিলও নিভে নাই, সলিলও শুকায় নাই। তাই আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই জাতিকুল ভুলিয়া সেই কুণ্ডে ডুব দিতেছে। আমিও ডুব দিলাম; উঠিয়া ভাবিলাম, সাহিত্য-সম্মিলনও ত ঠিক এই রকমের। চট্টগ্রামের সম্মিলনে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, সবাই ত ডুব দিয়াছে; সেখানেও ত অনল ও সলিল এক সঙ্গে ছিল—চট্টগ্রাম-বাসীদিগের নিরাবিল স্নেহ-সলিলের উপর ত এমনই ভাবে অনল ও অনিলের খেলা হইয়াছে! কিন্তু ভাবের গুণে অনলও নির্ব্বাপিত হয় নাই; সলিলও শুকায় নাই। বারে বারে এমনই অঘটন ঘটাইতে পার? এমনই পর্ব্বত-পঞ্জর ভেদ করিয়া শীতল স্নেহ-সলিল-কুণ্ডের উপর সোহাগের অনলশিখা অনুরাগ-অনিলের সাহায্যে ছুটাইতে ছুটাইতে খেলাইতে পার, তবে ত বুঝি সাহিত্য-সম্মিলন! চট্টগ্রামের বাড়বাকুণ্ড সাহিত্য-সম্মিলনের অভিব্যঞ্জনামাত্র.

ভাবের তীর্থবিকাশমাত্র। একবার স্থূলে সূক্ষ্মে মিলাইয়া, দেহতত্ত্ব ও দেশতত্ত্ব এক করিয়া মিলিতে মিশিতে পার ?

ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে যে সাহিত্যের নবীন ধারা ছুটিয়াছে, তাহার পারম্পর্য্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, ভূদেবের ভাবমুগ্ধ আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রকে সভাপতির আসনে দেখিবার সাধে এবার চট্টগ্রামে গিয়াছিলাম। তাহা ত দেখিয়াছি; উপরন্তু নূতন কিছু দেখিয়াছি, নূতন তত্ত্ব বুঝিয়াছি। বুঝিলাম, বাঙ্গালার সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান এক হইয়া গিয়াছে; মুসলমানের মহাভারত ও পদ্মাবতীর উপাখ্যান হিন্দুর হিন্দুত্বের পরিচায়ক—সাহিত্যের এই মহাতীর্থে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়াইয়া স্নান করিয়াছে। মায়ের ভাষায় দুই ছেলেই সমান ও সমভাবে অধিকারী। মনে হয়, তাই ভাবুক হিন্দু দরাফ্ খাঁর রচিত গঙ্গাস্তোত্র অম্লানবদনে অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেন না, গঙ্গায় যেমন সকল জাতির সমান অধিকার, ভাষা-মন্দাকিনীতেও তেমনই হিন্দু-মুসলমানের সমান অধিকার। এই অধিকারের দাবী এবার চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্মিলনে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম; সে দাবী-রক্ষার পক্ষে সঙ্কল্প-নির্দ্ধারণও হইয়াছে। চট্টগ্রামের নিত্যশ্যামল পর্ব্বতমালা দেখিয়া, গিরিগাত্রে ব্রততী-বিতানে নানাবিধ কুঞ্জবনের সৃষ্টি দেখিয়া বলিয়াছিলাম যে—ঐ শ্যামকুঞ্জের শীতল ছায়ায় প্রথম বালারুণদ্যুতি দেখিয়া আমার বিদ্যা-সাধকগণ সুন্দর ভাবের প্লাবনে ভারতকে দীর্ঘকাল ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন; ঐ দেশ হইতে মায়ের কথা শতমুখী হইয়া ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল,—এই দেশেই চিন্ময়ী মা মৃণ্ময়ী রূপশালিনী হইয়াছিলেন। ইহাই—

সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং মলয়জশীতলাং মাতরম্

মন্ত্রে ফুটিয়াছে। আর এই মায়ের আমরা সবাই সন্তান, এই মাকে মা বলিতে যাইয়া যে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই আমাদের মাতৃভাষা—মায়ের ভাষা। বাঙ্গালী মায়ের কথা যেমন করিয়া কহিয়াছে, তেমন মধুর মধুর ভাবে মায়ের গাথা পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষায় গীত হয় নাই—বুঝি বা হইবার নহে। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইহাই বিশিষ্টতা। বাঙ্গালীই একা সোহাগভরে বলিতে পারিয়াছে—

"আদর ক'রে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে;
তুমি দেখ আর আমি দেখি মন,—আর যেন কেউ না দেখে॥"

তোমার আমার মত দেখা আর ত কেহই দেখিতে পারে না। আমার জননী

জগজ্জননীর অংশরূপিণী, আমার শ্যামা মা দেশরূপা, জ্ঞানরূপা, অনাদ্যা এবং আদ্যা। আমাদের মা শিবানী, অথচ শিবপ্রসূতি। ভাষা এই মাতৃতত্ত্বকে কত রকমে, কত ছলে, কত ছন্দোবন্ধে বুঝাইয়াছেন। আমি এক দিকে দেখি—স্তনভারানমিতাঙ্গী মা আমার তাঁহার স্তনযুগলবিনির্গত ক্ষীরনীরধারায় আমাকে পুষ্ট করিতেছেন; মা আমার গণেশ-জননী হইয়া ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন! অন্য দিকে আবার দেখি, সেই মায়ের দেহ বাহান্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ধরাবক্ষকে বাহান্ন পীঠে খচিত করিয়া রাখিয়াছেন—দেশমাতৃকা জগন্মাতৃকা হইয়াছেন; সতী অঙ্গ বিভূষণা, বালার্করুচিশোভনা উমা হইয়াছেন। আমরা মায়ের সন্তান মায়ের ক্রোড়ে বসিয়া সুখ দুঃখের খেলা করিতেছি। আমার ভাষা, আমার সাহিত্য—আমাকে এই কথাই শিখাইয়াছে, এখনও শিখাইতেছে। এই শিক্ষার প্রতিমা দর্শন-কামনায় চট্টগ্রামে গিয়াছিলাম। সে কামনা পূর্ণ হইয়াছে—

"তুমি দেখ আর আমি দেখি মন, আর যেন কেউ না দেখে।"

এই উক্তির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি। বটেই ত! আমরা দুই ভাই আমাদের মাকে যে নয়নে, যে ভাবে দেখিব, সে নয়নে আর সেই ভাবে আর ত কেহ দেখিতে পারিবে না। এই দর্শন-সিদ্ধিই সাহিত্য-সম্মিলন। দেখ দেখ, বাঙ্গালী, মায়ের অঙ্গনে দাঁড়াইয়া, ভাই ভাই এক ঠাঁই হইয়া দেখ, আর বল,—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী, বাণী বিদ্যাদায়িনী!

আমার সাহিত্যে আমার সমাজ ও ধর্ম্ম উভয়ই নিহিত। রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ হইতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত সকল গদ্যপদ্য গীত-গাথা আমার ধর্ম্ম ও সমাজের কথায় পূর্ণ। আমার সাহিত্যের চর্চ্চা হইলেই আমার সকল চর্চ্চা হইবে। ইহাই আমার বিশিষ্টতার পরিচায়ক।

ইহাই আমার স্মৃতি, আমার শ্রুতি, আমার ধর্ম্ম, আমার কর্ম্ম,—আমার সমাজ ও সাহিত্য। এমন সাহিত্য জগতে আর নাই, এমন ধর্ম্মও জগতে আর হইল না। আমার বিদ্যাপতি—চণ্ডীদাস, আমার মুকুন্দরাম—রামপ্রসাদ, আমার ঘনরাম—ভারতচন্দ্র আমার ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য জুড়িয়া বসিয়া আছেন। যাহারা বাঙ্গালার সাহিত্য বুঝে ও জানে, সে অনল-সলিলের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ বাড়বাকুণ্ডে ডুব দিয়াছে, তাহাদের কি ভাবনা আছে? তাহারা বাঁচিয়া থাকিয়া সাহিত্য-সাগরে ডুব দিতে পারিলেই তাহাদের জন্ম সার্থক হইবে। তাই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কথা তুলিয়া বাঁচিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। সে আহ্বান একবার শুন—সম্মিলনের সাধনা পূর্ণ হইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

PRINTED BY B. K. CHAKRAVARTI, LAKSHMIBILA SPRESS.
12 NARKELBAGAN LANE, CALCUTTA.

সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

# বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য। *

[ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত। ]

বাঙ্গালার জনসাধারণের পাঠ্য ও সেব্য সাহিত্য বলিতে হইলে খাঁটী বাঙ্গালা সাহিত্যকেই বুঝাইবে। এখনও বহুকাল বাঙ্গালীর সাহিত্য বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য হইয়া থাকিবে। যতদিন এ দেশে উচ্চশিক্ষা ইংরেজী ভাষার সাহায্যে প্রচারিত হইবে, যতদিন ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান উহাদের উচ্চ আদর্শ ও পদবী রক্ষা করিতে পারিবে, ততদিন উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ ইংরেজী ভাষার সাহায্যে মনীষার উৎকর্ষসাধন করিবেন; বঙ্গ-সাহিত্য ততদিন বঙ্গদেশের লোকসাধারণের পাঠ্য ও সেব্য সাহিত্য হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য যে, পুরাতন ও আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্য এই নিম্নস্তরে ব্যাপ্ত থাকিলেও লোকশিক্ষার কার্য্যে তেমন পর্য্যাপ্ত নহে।

অনেকের বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা সাহিত্য অতি অল্প লোকেই পড়িয়া থাকে; এ দেশের শিক্ষিতমাত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করেন না; তাঁহারা ইংরেজী পুস্তকই পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য নিহিত রহিয়াছে; তবে উহা যে সম্পূর্ণ প্রকৃত কথা, তাহা বলিতে পারি না। হইতে পারে যে, অতি অল্প লোকেই রীতিমত বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন; কেন না, বাঙ্গালায় অতি অল্প পুস্তকই আছে, যাহা আগাগোড়া পড়া চলে। তবে এই ধারণা ঠিক নহে যে, বঙ্গদেশে বাঙ্গালা পুস্তক-পাঠকের সংখ্যা এতই অল্প যে, তাহাকে নগণ্য বলিলেও চলে। দেশের শিল্পী, দোকানদার, যাহারা নিজ নিজ ব্যবসায়ের হিসাব রাখিতে পারে, এবং রাখিয়া থাকে, গ্রাম্য জমীদার ও মফস্বলের ব্যবহারাজীব, সরকারী কাছারীর নিম্নস্তরের কর্ম্মচারী, যাহাদের ইংরেজী বিদ্যা আফিসের কার্য্যের সীমায় নিবদ্ধ, এবং গ্রাম্য তালুকদার, যাহারা ইংরেজীও জানে না, কাছারীর কাজও বুঝে না— এবংবিধ সকল শ্রেণীর লোকেই বাঙ্গালা পুস্তকই পাঠ করে; ইহারাই বঙ্গ-সাহিত্যের চর্চ্চা করে। অর্থাৎ, নিরক্ষর কৃষক ও উচ্চশিক্ষিত ইংরেজীনবীশের মধ্যে যাহারা আছে, তাহারা সকলেই বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকে।

* ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, 'বেঙ্গল সোশ্যাল্ সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনে' পঠিত ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।

ইহা ছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাবে ও বিস্তারে যাহারা লেখাপড়া শিখিবে, তাহারাও এই বঙ্গসাহিত্যেরই পঠন-পাঠনে রত থাকিবে। অবশ্য, এই দেশীয় শিক্ষাকে সর্ব্ববিষয়ে, দেশের ও সমাজের উপযোগী করিয়া, উহার দ্বারা জ্ঞানসাধন করিতে হইবে। এই সকল লোকের জন্যই বঙ্গসাহিত্যের প্রয়োজন। এই সাহিত্য বাঙ্গালার লোকসাধারণের সাহিত্যই হইবে ; কারণ, এই সকল শ্রেণীর লোকেই জাতির পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে ; ইহারাই জনসাধারণ।

আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালী, আমাদের অদ্ভুত বিস্মৃতির প্রভাব। আমরা ভুলিয়া যাই যে, কেবল এই বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যেই বাঙ্গালী জাতিকে আমরা কোনও একটা ভাবে বিচলিত বা উত্তেজিত করিতে পারি। অথচ আমরা ইংরেজী ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করি, ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করি, ইংরেজী গদ্যে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকি। তখন আমাদের মনে থাকে না যে, দেশের জনসাধারণ ইংরেজী ভাষা-বোধে একেবারেই বধির ; তাহারা আমাদের ব্যবহৃত একটি ইংরেজী শব্দেরও অর্থবোধ করিতে পারে না। অথচ সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্ম বিষয়ে কোনও একটা নূতন ভাবের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে ; নহিলে কোনও ফলোদয়ই হইবে না। আমার মনে হয়, একটা বড় ভাবের কথা বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীদিগকে বুঝাইতে পারিলে, সে ভাব তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে ; হৃদয়ে নূতন তরঙ্গের উদ্ভব হইবে, সে তরঙ্গ জনে জনে আঘাত করিয়া দেশব্যাপী একটা বিরাট ভাবের ঢেউ তুলিতে পারিবে। এই নবভাবে জাতি উদ্বুদ্ধ হইবে, জাতির হৃদয়ে সজীবতা আনয়ন করিবে, সমাজের কল্যাণ আপনিই সাধিত হইবে। অন্য পক্ষে, কেবল ইংরেজী ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিলে, ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলে, জাতিব্যাপী বিরাট কার্য্যের সূচনা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। এই হেতু সামাজিক হিসাবে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তৃতি অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সে সাহিত্য জাতির সাহিত্য,—জনসাধারণের সাহিত্য হইবে।

বাঙ্গালার জনসাধারণের সেবা এক অভিনব সাহিত্য যেন প্রমাদের পথে উদ্ভূত হইতেছে। অর্থাৎ, যে পদ্ধতি অনুসারে উহা উৎপন্ন হইতেছে, সে পদ্ধতি হয় ত প্রমাদসঙ্কুল। যাহা হউক, এই অভিনব সাহিত্য-উদ্ভবের চেষ্টা আমাদের সকলের লক্ষ্যের বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য ; কেবল লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে না ; স্থির ও ধীরভাবে, বিচক্ষণতার সহিত উহাকে উদ্রিক্ত করিতে হইবে। কারণ, জাতির সাহিত্য

প্রভাব বিস্তীর্ণ হইবে। জনসাধারণের সাহিত্য এবং জাতির বিশিষ্টতা, উভয়েই উভয়ের উপর আপন-আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অর্থাৎ, সাহিত্য অনুসারে জাতির বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, বিশিষ্টতা অনুসারে জাতির সাহিত্যেরও বিস্তৃতি ও পুষ্টিসাধন হয়। অন্ততঃ বঙ্গদেশে জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাল হইতে এই উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পরিস্ফুট রহিয়াছে। জয়দেব তাঁহার যুগের কবি, সে কালের লোকসাধারণের কবি ছিলেন। পরবর্ত্তী কালেও জয়দেব বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর কবি ছিলেন। সে যুগে যাহারা লেখাপড়া করিত, তাহারা সংস্কৃত ভাষাতেই লেখাপড়া করিত। বিশেষতঃ, জয়দেবের কবিতা, এখনও যেমন হয়, তখনও তেমনই সভায় বা আসরে গীত হইত। সুতরাং উহার প্রচার ছিল, জন-সাধারণ উহা আদরের সহিত শুনিত। কাজেই জয়দেবকে বাঙ্গালার লোকসাধারণের কবি বলা চলে।

জয়দেবের গীত-গোবিন্দ তাৎকালিক বাঙ্গালী চরিত্রের দর্পণস্বরূপ। একটা জাতির বিশিষ্টতাজ্ঞাপক এমন কাব্য অন্য কোনও সাহিত্যে আছে কি না, বলা যায় না। মুসলমান বিজেতার লৌহময়, অতিকঠোর পাদুকার চাপে যখন বাঙ্গালীর মনুষ্যত্বের অপচয় ঘটিতে আরম্ভ করে, তখনই গীতগোবিন্দের প্রচার হয়। গীতগোবিন্দের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, আগাগোড়া কোনখানেই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক উন্নত ভাবের বিকাশমাত্র নাই; আছে কেবল রমণী-সুলভ কোমল মধুর ভাব। কবি কোনখানেই একটা নূতন সত্যের—একটা অপূর্ব্ব কথার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ কবিই,—তা তিনি ধর্ম্মবিষয়ক কবি হউন, বা বিষয়ি-বিনোদক কবি হউন,—এমন একটা ভাবের কথা মানুষকে শিখাইয়া যান, যাহার প্রভাবে মনুষ্যজীবন ধন্য হয়, মনুষ্য জাতি উন্নত হয়। কিন্তু জয়দেব এই প্রকারের কবি নহেন; তাঁহার ধরণ স্বতন্ত্র। তিনি যে কবিগুণোপেত নহেন, এমন কথা আমি বলি না। তিনি নিশ্চয়ই এক জন উচ্চাঙ্গের কবি। তাঁহার শব্দচয়ন ও শব্দযোজনার সামর্থ্য অসাধারণ; শব্দগুলি যেন বীণার ঝঙ্কারের মতন সুরের লহর তুলিয়া শ্রবণপথে ভাসিয়া যায়। শব্দযোজনার প্রভাবে তিনি যে এক একটা ভাবের আলেখ্য মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেন, তাহা অতি উজ্জ্বল, অতি সুন্দর, অতি মনোহর। কিন্তু তাঁহার অনুপম ভাষা ও চমৎকার ভাব-আলেখ্য কেবল কামের সন্ধুক্ষণ ঘটায়, মানুষকে কেবল রক্ত-মাংসের উপদ্রবের প্রতি যেন জোর করিয়া টানিয়া ধরে। দুর্ব্বল, স্থবির, কর্ম্মহীন জাতি যেমন কামকলাবিতানে সুখ বোধ করে, তেমনই সে জাতির

কবিও সে সুখলিপ্সার মুখে অপূর্ব্ব ভাষায় অপূর্ব্ব কাম-কাব্যের ইন্ধন যোগাইয়াছে। এই জয়দেবই পরবর্ত্তী সকল বাঙ্গালী কবির আদর্শস্বরূপ হইয়া আছেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ জয়দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন বটে, পরন্তু অনেকেই তাঁহার পদ-লালিত্য, কবিজনোচিত ভাবমাধুর্য্য প্রাপ্ত হন নাই। ইঁহাদের পরে নবদ্বীপের রাজসভার কবিগণ, বৈষ্ণব কবিদের মত, কামের পন্থা অবলম্বন করিয়া, কামের কবিতাই লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এখনও বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর প্রধান কাব্য গ্রন্থ। শেষে কবি, পাঁচালী, যাত্রায় ঐ এক রীতিতে টপ্পা ও অন্যান্য প্রেমসঙ্গীতের পুষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতি এই ভাবে, জয়দেবের কাল হইতে ভারতচন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত, এই দীর্ঘকাল কেবল কাম-কবিতায় বুদ্ধি ও চিত্তের তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন। স্থবির, দুর্ব্বল, কর্ম্মহীন, কোমল জাতির পক্ষে এই সাহিত্যই উপযোগী ; উহার দ্বারাই বাঙ্গালীর মনীষার পুষ্টি-সাধন হইয়াছে। তাই মনুষ্যত্বের পরিপোষক উচ্চভাব, উন্নত আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালীর সাহিত্যে স্থান পায় নাই।

এই কোমল কামপ্রধান কাব্য-সাহিত্যের পার্শ্বে বঙ্গদেশে আর এক অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ন্যায়-শাস্ত্র ও স্মৃতি-শাস্ত্র অবলম্বনে এক কচ্‌-কচীর সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যত্বের উন্নত সকল ভাব হারাইলেও, বাঙ্গালী মেধার তীক্ষ্ণতা হারায় নাই। তাই কুল্লুক ভট্ট ও ভবদেবের কাল হইতে জগন্নাথের কাল পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল বাঙ্গালী নব্যন্যায়ের ও নব্যস্মৃতির কত গ্রন্থই রচনা করিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা হয় না। টীকার উপর টীকা, ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা বাহির হইয়া স্মৃতি-শাস্ত্রকে একরূপ দুর্বোধ করিয়া তুলিয়াছে। এই দুর্ব্বোধ ও দুরবগাহ স্মৃতিশাস্ত্রের বিধিবিশেষের তাড়নায় ব্যক্তিমাত্রকেই কতকটা অধীর হইতে হইয়াছে। এই স্মৃতিশাস্ত্র গোভিলের সময় হইতে ভারতবর্ষের পূর্ব্বগামী ঋষি মুনির দ্বারায় অনেকটা কঠোর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর শূলপাণি জীমূতবাহন হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ব্যাখ্যাতাদিগের বন্ধনী যেন লৌহ-শৃঙ্খলে বাঙ্গালীকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। বাঙ্গালীর আমোদ-প্রমোদ, আনন্দ-উল্লাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিত্বের সকল বৃত্তিই স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি-নিষেধের নিগড়ে যেন আবদ্ধ—পিণ্ডীকৃত হইয়া রহিয়াছে। জীবনের সকল ব্যাপারে—সুখে দুঃখে বাঙ্গালীর গুরু-পুরোহিত বাঙ্গালীকে যেন আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

অপর পক্ষে, বাঙ্গালার নব্য ন্যায় মনীষার চমৎকার বিকাশে অপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয় হইলেও, উহা কখনই দেশের লোকসাধারণকে স্পর্শ করিতে পারে

নাই। সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচায়ক, মনীষার অতুল্য বিকাশের দ্যোতক এই নব্য ন্যায় বাঙ্গালার জনসাধারণের পক্ষে পূর্ণ অবোধ্য হইয়া রহিয়াছে। ন্যায়ের কচ্‌কচি বলিয়া ও দিকে সাধারণ বিষয়ী লোকে কখনই দৃষ্টিপাত করেন নাই। অথচ এই নব্যন্যায়ের কচ্‌কচির অন্তরালে যে অপূর্ব্ব বাস্তবতা (Rationalism) নিহিত, সত্য-অনুসন্ধিৎসার যে প্রশস্ত পন্থা উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহা জন কয়েক মেধাবী অধ্যাপকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকাতে, উহার দ্বারা জাতির চিত্তবৃত্তির পুষ্টিসাধন হয় নাই। বাঙ্গালীর এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির প্রভাবে বাঙ্গালী জাতির কোনও উপকারই হয় নাই। পরন্তু এই নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম তর্কজাল স্মৃতিশাস্ত্রের বিতণ্ডায় অপব্যবহৃত হইয়াছে। এই সামগ্রীটা যদি জাতির বিশিষ্টতা-রক্ষার ও পুষ্টির পক্ষে প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে না জানি বাঙ্গালী জাতির কি প্রভূত উপকার সাধিত হইত! এই নব্য ন্যায় বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্বোধ থাকাতে, উহার দ্বারা বাঙ্গালীর অনিষ্টসাধনই হইয়াছে।

এইরূপে বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্টতা এবং বাঙ্গালীর মনীষাজাত আর একটি বিষয়—অর্থাৎ নব্য-ন্যায় লইয়া, এক অপরের প্রতিঘাত করিয়া, জাতির চরিত্রের উন্মেষসাধন করিয়াছিল। কর্ম্মশূন্যতা, চিত্তের ও চরিত্রের জড়তা, এবং সদ্ধর্ম্মসাধক পদ্ধতির অভাব, এই কয়টি মিলিয়া মিশিয়া বাঙ্গালীর কামকলা-গন্ধপরিব্যাপ্ত কোমল কামিনীসুলভ পদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালী এই সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া স্বীয় পুরুষকারের অপচয় ঘটাইয়াছে, এবং দুর্ব্বল মনীষার তৃপ্তিসাধন করিয়াছে। পক্ষান্তরে, ভাবসৃষ্টি বিষয়ে স্থবির, জাড্যজড়িত, অথচ অতিতীক্ষ্ণ ধীশক্তি লইয়া বাঙ্গালী নব্যন্যায়ের উদ্ভাবন করিয়াছে, এবং উহারই সাহায্যে স্মৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া জীবনযাত্রার পদ্ধতির বন্ধনী অতি কঠোর ও লৌহ-নিগড়ের ন্যায় দুশ্ছেদ্য করিয়া তুলিয়াছে! 'এই ভাবে বাঙ্গালী এতকাল সজীব ছিল—নিজের ভাবে নিজে স্থবির, স্বীয় কল্পনাজাত সাহিত্যের চর্চ্চায় নিজে দুর্ব্বল, কোমল, কামসন্ধুক্ষণে সদারত, সুতরাং নিশ্চল ও নিজের দুঃখ কষ্টের অনুভূতিশূন্য হইয়া সজীব ছিল। ঠিক এই সময়ে বাঙ্গালায় নবজীবনের অরুণোদয় হইল। (উহা ইংরেজ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় এবং বঙ্গে ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতির বিস্তার।) অবশ্য, এমন স্থবির, গতিশূন্য জাতির পক্ষে নবজীবন ও নবভাবোদয় সম্ভবপর কি না, তাহা বিচার্য্য। যাহা হউক, এই নব জীবনের—নবভাবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার এক প্রবল অস্ত্র

বাঙ্গালীর হস্তগত হইল। উহা মুদ্রাযন্ত্র। এই নবভাবসজ্মাতে, নবজীবনের প্রণোদনায় ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। লোকে গীতগোবিন্দ শ্রেণীর সাহিত্য ছাড়িয়া, একটা নূতন ও স্বতন্ত্র সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। বাঙ্গালী জাতির মনীষার ইতিহাস-কথার অধিক আবৃত্তি আমি করিব না; কেন না, সে কথা সকলেই জানে, এবং বুঝে। তবে যাঁহারা এই বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, নিম্নলিখিত গোটাকয়েক ব্যাপারের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চাহি।

(১) বাঙ্গালীর মধ্যে অভিনব সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। এই সাহিত্য লোকসাধারণের সাহিত্য হইবে, এবং আকাঙ্ক্ষার মুখে যোগান দিতে হইবে।

(২) শীঘ্রই এবম্ভাবের সাহিত্যের টান বাঙ্গালায় অতিমাত্রায় বাড়িবে। এই টানের মুখে যোগান দিতে হইলে, পরিমাণ ও গুণ, উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অর্থাৎ, গদ্যপদ্যময় পুস্তক সকলের কেবল সংখ্যা হিসাব করিলেই চলিবে না, উহাদের গুণের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৩) এখন পরিমাণ যাহাই হউক, গুণের হিসাবে যে ভাল বহি বাহির হইতেছে না, তাহা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে।

সরকারী দপ্তর হইতে যে পুস্তক-প্রচারের একখানি ত্রৈমাসিক বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালীর মনীষা এখনও উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন হয় নাই। সংখ্যা ও পরিমাণের বিষয়ে শ্লাঘ্য হইলেও, গুণের পক্ষে উহা যে জঘন্য, তাহা বলিতে হইবে। এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে এই সাহিত্য অনিষ্টজনক ও ক্ষতিকারক। দুই চারিখানি উপাদেয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সকলগুলিই হীন অনুকরণমাত্র, অথবা সংস্কৃত সাহিত্যের গালগল্পে পূর্ণ, অথবা শাদামাটা বাজে কথায় পূর্ণ। এমন কেন ঘটিতেছে, তাহার দুইটি কারণ আমি নির্দ্দেশ করিতে পারি।

১। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করিতে অভিলাষী নহেন। চাটুকার মোসাহেব পণ্ডিত (fawning) ও অভাবজীর্ণ ব্যক্তিরা আমাদের দেশে গ্রন্থকার হইয়া থাকেন। অথবা স্কুলের ছেলেরা গ্রন্থকার হয়। কিংবা কর্ম্মহীন, ব্যবসায়হীন বাজে লেখকই গ্রন্থকার সাজিয়া বসে। কেন না, এমন লেখকের পক্ষে যে আর কিছু হইবার উপায় নাই, সে যে আর কিছু হইতে পারে না। যাঁহারা দেশের লোককে নূতন ভাবে শিক্ষিত করিতে পারেন, দেশের দশ জনকে নূতন কথা শুনাইতে পারেন, তাঁহারা

এ কার্য্যকে তাঁহাদের পদমর্য্যাদার যোগ্য বলিয়া মনে করেন না। যে তীব্র-বুদ্ধি, তেজস্বী বাঙ্গালী যুবক ঠিক ইংরেজের মতন ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতে ও লিখিতে পারে, সে মনে করে, বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচনা করা হীনবৃত্তি-মাত্র, তাহার পদের ও শিক্ষার যোগ্য নহে। যদি ক্বচিৎ কদাচিৎ কেহ লুকাইয়া কোনও বহি লেখেন ত সে পুস্তকে তাঁহার নাম থাকে না; উহা বিনামা বাহির হয়—চুপি-চুপি প্রকাশিত হয়। এই হেতু যে কয়খানি ভাল বহি বাহির হইয়াছে, তাহাদের শিরোনামায় গ্রন্থকারের নাম নাই। এমন কথা বলি না যে, সবাই এই ভাবে গ্রন্থরচনা করিয়া থাকেন। জন কয়েক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থরচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলি অতি উপাদেয় হইয়াছে। কিন্তু ইঁহারা কয় জন? এবং কয়খানিই বা পুস্তক রচনা করিতে পারিয়াছেন? ক্ষোভের কথাই ত এই।

(২) ভাল সমালোচনার অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে। গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুস্তকগত ভালমন্দের কথা নির্ব্বিকার ও নিরপেক্ষ ভাবে বলিবার ক্ষমতা আমাদের অনেকের নাই বলিলেও হয়! দেশীয় সংবাদপত্র সকলে বুদ্ধিমত্তার সহিত পুস্তক-সমালোচনার অত্যন্তাভাব। বাঙ্গালী চিত্তের ইহা বড়ই দোষের কথা যে, বাঙ্গালী জাঁকজমকের—ডাকের সাজের সৌন্দর্য্য হইতে খাঁটী মনোহর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যটুকুকে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারে না। বরং বাঙ্গালীর পক্ষে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি অল্পায়াসসাধ্য, পরন্তু সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ যেন বাঙ্গালীর পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার। চিত্তগত এই দোষের জন্য বাঙ্গালার সাহিত্যও একটু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যে সমালোচকের মতামতের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা আছে, তিনি প্রমাদবশতঃ মন্দ বহিকে ভাল বলিলে, এবং ভাল বহিকে মন্দ বলিলে, উন্নত সাহিত্যেরই ক্ষতি হয়। যাঁহারা বাঙ্গালীর থিয়েটারের শ্রোতৃমণ্ডলীর ভঙ্গী দেখিয়াছেন, (যেমন আমি দেখিয়াছি) তাঁহারা অনেকটা বাঙ্গালীর প্রশংসার মূল্য অবধারণ করিতে পারিবেন। থিয়েটারে সেই উৎকট উদ্ভট ভাষা, সেই বিকট কট্‌কটে ভাববিন্যাস, সেই বাজে ইয়ারকী, বাজে রসিকতার স্রোত চলিতেছে, আর স্থির ধীর ভাবে লোকে তাহা শুনিতেছে, এবং অম্লানবদনে প্রশংসা করিতেছে, সেই পুস্তককে ভাল নাটক বলিয়া আদর করিতেছে। এই অবিচারিত প্রশংসার প্রভাবে বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যের উন্নতি ঘটিতেছে না; এবং এই হেতু বাঙ্গালার সৎসাহিত্যের অন্য সকল শাখাই যেন শুকাইয়া

এই সঙ্গে আমি আর একটি কথা বলিতে চাহি। অনেকেই আমাদের দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তিকে বড়ই ছোট—বেজায় সামান্য বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। এই ভ্রান্ত ধারণা হেতু বাঙ্গালায় সৎসাহিত্যের পুষ্টি হইতেছে না। অনেকেই মনে করিয়া বসিয়া আছেন যে, বাঙ্গালার জনসাধারণের জন্য যে পুস্তক রচিত হইবে, তাহাতে কেবল ছেলে-ভুলান গল্প থাকিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। যদি বিজ্ঞান বা ইতিহাসঘটিত কোনও পুস্তকের রচনা করিতে হয়, তাহা হইলে সে সব পুস্তকও বালকোপযোগী করিয়া লেখা হয়। শব্দচাতুর্য্যের ও মাধুর্য্যের বিকাশ, উন্নত ভাবের ব্যাখ্যান, মনুষ্য-চরিত্রের অথবা মানবতার উদ্বোধক সিদ্ধান্তের বিন্যাস যেন এই সকল পুস্তকে করিতে নাই। আধুনিক ইউরোপীয় পদার্থবিজ্ঞানের অভিনব সিদ্ধান্ত সকল যেন বাঙ্গালী পাঠকের পড়িতে নাই। যদি বা এই অদ্ভুত সমাচার শুনাইতে হয়, তবে তাহাকে শুষ্ক নীরস করিয়া, কঠোর কঠিন করিয়া শুনাইতে হইবে। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা বাঙ্গালী পাঠকগণকে বোকা সাজাইয়া পুস্তক রচনা করেন, তাঁহাদের পুস্তক সাধারণ বাঙ্গালীতে পড়ে না। যে সকল পুস্তকে পড়িবার কিছু থাকিবে, বাঙ্গালী কেবল তেমনই পুস্তক পড়িবে। সে শুষ্ক, নীরস ছেলেভুলান পুস্তক পড়িবে না, পড়িতে চাহিবে না। এখন যাঁহাদের পুস্তক সকল বাঙ্গালী প্রায়শঃ পাঠ করে, তাঁহারা এই অপসিদ্ধান্ত মাথায় লইয়া পুস্তক রচনা করেন নাই। মনে হয়, এই হেতু Vernacular Literature Society বা বাঙ্গালা সাহিত্য-প্রচার-সমিতি সহজবোধ্য সরল পুস্তকরাশির প্রচার করিয়া বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ কোনও উপকার করেন নাই। তবে এই সমিতি-প্রচারিত সাময়িক পত্রখানির দ্বারা অনেক উপকার হইতেছে, সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হইতেছে।

এইবার সাহিত্য-প্রচারের কথা একটু বলিব। ইহা সত্য বটে, যে বহি বিকাইবে, তাহা লইয়া ফেরীওয়ালা গ্রামে গ্রামে ঘুরিবে। কিন্তু সে অবস্থা হইতে এখনও বিলম্ব আছে। টানের মুখে যোগান দিতে হয় বটে, পরন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যোগানের মুখে টানের সৃষ্টি করিতে হইবে। ফেরীওয়ালারা বহুগ্রামে বহি বেচিতে যায়; কিন্তু তাহারা ভাল বহি বেচে না। তাহাদের পুঁজি বড়ই কদর্য্য। বিশেষতঃ, তাহারা নিয়মিত ফেরী করে না, কচিৎ কদাচিৎ গ্রামে যায়। এমন ভাবে পুস্তক-প্রচার করিলে চলিবে না। আমি মফস্বলের বহু স্থান হইতে অভিযোগ শুনিয়াছি যে, লোকে ভাল পুস্তক পায় না বলিয়াই খরিদ করে না। দেশীয়-সাহিত্য-প্রচার-সমিতির (Vernacular Literature Society) অনেক স্থানে

শাখা-দোকান আছে। সমিতির প্রচারিত পুস্তক সকল এই সকল দোকানে পাওয়া যায়। সমিতির এই সকল দোকানে যদি অন্য ভাল পুস্তকের বিক্রয় হয়, তাহা হইলে, তাহাদের প্রচার বাড়ে, সৎসাহিত্যের পুষ্টিও হয়। এ পক্ষে সুব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়।

আপাততঃ পল্লীগ্রামে পাঠাগার বা লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। গোটাকয়েক পল্লীগ্রামে এই ভাবে সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, পরন্তু প্রত্যেক গ্রামে এক একটি পাঠাগার না থাকিলে কাজ হইবে না। অন্ততঃ যে সকল গ্রামে পাঠশালা বা স্কুল আছে, সেই সকল গ্রামে স্কুল বা পাঠশালার পণ্ডিত বা মাষ্টারের উপর ভার দিয়া এক একটি পাঠাগার খোলা চলে। শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক কর্ম্মচারী সকল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক গ্রামেই একটি করিয়া পাঠাগার খুলিতে পারেন। বিশেষতঃ, শাসন ও বিচার বিভাগের কর্ম্মচারিগণের প্রসার প্রতিপত্তি অত্যধিক; তাঁহারা অল্প চেষ্টাতেই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। পাঠাগারের সংখ্যা বাড়িলেই সৎসাহিত্যের চর্চ্চারও প্রসার বাড়িবেই; লোকের একটা রুচিরও সৃষ্টি হইবে। এ কাজটা তেমন কঠিন বলিয়া আমার বোধ হয় না।

প্রবন্ধপাঠের পর বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন যে, তিনি বহুকাল বঙ্গসাহিত্যের কল্যাণকামনায় রত রহিয়াছেন। তিনি মৌলিক-গ্রন্থ-প্রণয়নের পক্ষপাতী, অনুবাদের পক্ষপাতী নহেন। অবশ্য স্বীকার করি যে, সাহিত্যের সকল বিভাগেই নানা পুস্তকের রচনা হইয়াছে; বিজ্ঞান, বিশেষতঃ ধর্ম্মতত্ত্বে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে বটে। পরন্তু এখন বিচার্য্য এই যে, লোকে কি ইহাই চাহে? লোকের এই আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে হইলে, কলিকাতায় একটি এজেন্সী খুলিতে হইবে। এই এজেন্সীর সাহায্যে পুস্তকপ্রচার করিতে হইবে। প্রচার ও কাটতির মুখে অনেকটা বুঝা যাইবে যে, লোকে কি পড়িতে চাহে। এই ভাবে পুস্তকের প্রচার না হইলে পাঠের প্রবৃত্তি বাড়ান যাইবে না। লোকের পড়িবার প্রবৃত্তি বাড়িলে, এবং পুস্তক সকলের কাট্‌তি হইলে বুঝা যাইবে, কোন্ প্রকারের পুস্তক এখন রচনা করিতে হইবে, এবং কি ভাবেই তাহা লিখিতে হইবে। আমার মনে হয় যে, এই এজেন্সীর অভাব শীঘ্র দূর হইবে।

ডাক্তার চক্রবর্ত্তী বলেন যে, পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে আমাদের ধারণায় গোলযোগ ঘটিয়াছে, তাই এত কথা উঠিতেছে। পাঠ্যপুস্তক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে; এক বিষয়বিশেষের উপর পাঠ্যপুস্তক; অর্থাৎ যাহার সাহায্যে বিষয়-

বিশেষের অধ্যাপনা চলিবে; আর চিত্তবিনোদক পাঠ্যপুস্তক; যথা, উপন্যাস, গল্প, নাটক, কাব্যগ্রন্থাদি। প্রথম শ্রেণীতে বিজ্ঞান, পদার্থতত্ত্ব, ইতিহাস ও চিকিৎসা-ঘটিত পুস্তক সকল সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। এই সকল পুস্তক অতি সাবধানে ও আধুনিক সকল তথ্যে পূর্ণ করিয়া লিখিতে হইবে। এই শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক মৌলিক গ্রন্থ সকলের রচনা হইলে ভাল হয় বটে; কিন্তু এখনও সে সময় আইসে নাই। বিষয়বিশেষের পঠন পাঠন না হইলে, সে বিষয়ের মৌলিক-গ্রন্থ-রচনা সম্ভবপর নহে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানগ্রন্থ সকলের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিবার সময়ে অনেক নূতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নূতন শব্দ গড়িতে হইতেছে। এই সকল বিশেষ শব্দের পারিভাষিক অর্থ এখনও সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, সে অর্থ অনেকেই গ্রাহ্য করে নাই। সুতরাং এই সকল পারিভাষিক শব্দের জন্য অনুরূপ ইংরেজী শব্দ বাছিয়া উহাদের অর্থনির্দ্ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে। কারণ, ইংরেজী বহি সকল বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতে লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা যে ভাবে দেখিয়া শুনিয়া শব্দচয়ন করিয়া তাহাদের ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে ব্যবহৃত সকল শব্দের অর্থদ্যোতনার পক্ষে কোনও গোলমাল ঘটে না। এখন এই সকল ইংরেজী শব্দের অনুকূল বাঙ্গালা শব্দের রচনা করিলে অর্থসঙ্গতি বিষয়ে কোনও গোল ঘটিবে না। এই হেতু এখন ইংরেজী ভাষার লিখিত বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক সকল বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিলে ভাষার পুষ্টি হইবে। সকল সভ্য দেশেই প্রথমে এই পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়; শেষে বিজ্ঞান বিষয়ের সাধারণতঃ আলোচনা আরব্ধ হইলে, মৌলিক গ্রন্থ লেখা আরব্ধ হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের বিষয়বিশেষের অধ্যয়ন অধ্যাপনা আরব্ধ না হইলে, তৎতৎ বিষয়ের গ্রন্থ সকলের আদর হয় না। চিকিৎসা শাস্ত্রের যদি পঠনপাঠন না হয়, চিকিৎসা শাস্ত্র পড়াইবার কলেজ ও স্কুল সকল যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে দেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের বাঙ্গালা বহির আদর হয় না। কলিকাতা, আগ্রা, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, নাগপুর, বোম্বাই প্রভৃতি নগরে চিকিৎসা শাস্ত্রের স্কুলকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই, সে সকল স্কুলে ছাত্র হইতেছে বলিয়াই দেশীয় ভাষায় লিখিত চিকিৎসা শাস্ত্রের পুস্তক সকল অল্পবিস্তর বিকাইতেছে। বিজ্ঞানের অন্য শাখার পাঠ্য পুস্তক লিখিতে হইলে এই ভাবে কার্য্য করিতে হইবে। বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন স্কুলকলেজে না হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তক সকলের প্রচলন এই সকল পাঠশালায় না হইলে, পাঠ্য পুস্তক লেখা বৃথা হইবে। এই হেতু ডাক্তার চক্রবর্ত্তী মনে করেন যে, সর্ব্বাগ্রে বিজ্ঞান বিষয়ের

প্রচার হওয়া প্রয়োজন, তৎপরে ইংরেজী পুস্তক সকলের অনুবাদ করিয়া অভাব-মোচন করা আবশ্যক। শেষে মৌলিক গ্রন্থ সকল আপনা-আপনিই রচিত হইবে। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য পুস্তকের অভাব পূর্ণ হইয়া যাইবে।

পরন্তু গল্প, উপন্যাস, কাব্য গ্রন্থাদির রচনা বিষয়ে এ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে চলিবে না। ইংরেজী উপন্যাস বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিলে তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে চিত্তবিনোদক হইবে না। গৃহস্থলীর কথা, সমাজের কথা, দেশের ইতিহাসের কথা লইয়া উপন্যাস লিখিতে হইবে, তবে তাহা বাঙ্গালীর চিত্তবিনোদন করিতে পারিবে। ইংরেজের উপন্যাসে ইংরেজের সমাজ, ধর্ম্ম ও ইতিহাসের কথা আছে; সে সকল উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলে তাহা বাঙ্গালীর রুচিকর হইবে না। কাব্যের পক্ষেও ঐ একই কথা খাটে। অতএব এ ক্ষেত্রে মৌলিক পুস্তক লিখিতে না পারিলে বাঙ্গালী পাঠকের তৃপ্তি হইবে না, বাঙ্গালা ভাষারও পুষ্টি হইবে না। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাস লিখিয়া এই সিদ্ধান্তটা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। "আলালের ঘরের দুলালে"র ভাষা যেমন সহজসাধ্য, উহাতে লিখিত বিষয়গুলিও তেমনই সদুপদেশপূর্ণ। এই ভাবে উপন্যাস রচিত হইলে লোকেও পড়িবে, নবীন বঙ্গসাহিত্যেরও আদর বাড়িবে। অনেকে বলেন যে, ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালা পড়িতে চাহেন না। কথাটা সত্য হইতে পারে, কিন্তু কয় জন ইংরেজী শিখে ও জানে? যাহারা এখন কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, বিদ্যাসুন্দর ও পাঁচালী পড়িয়া কাল কাটায়, তাহারা ত নব্য বঙ্গসাহিত্যের পুস্তক সকল পড়িতে পারে। এই সকল গ্রন্থের পঠন-পাঠন অধিক থাকিলে, লোকের অন্ধ বিশ্বাসের বৃদ্ধি পাইবে, কামবৃত্তির পোষণ করা হইবে। এই সকল পুস্তকের পরিবর্ত্তে ভাল ভাল উপন্যাস রচনা করিয়া দিলে, পাঠকের মন প্রশস্ত হইবে, মনুষ্যত্বের উন্মেষ হইবে, ধীরে ধীরে দেশের ও সমাজের রুচি বদলাইবে। এখন এই ভাবে চালাইলে আগামিগণ বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিবেন, পারিভাষিক শব্দের নির্দ্ধারণ করিবেন, পরে বিজ্ঞানবিষয়ক ভাল ভাল মৌলিক পুস্তকও রচনা করিতে পারিবেন। এখন ভাষার পত্তনের সময়; এখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিলে পরে সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইতে পারিবে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

# গৌড়কবি মনোরথ।

গৌড়কবি মনোরথ যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের একটি স্মরণীয় যুগ। তখনও বাঙ্গালা দেশে পাল-নরপালগণের শাসন-ক্ষমতা বর্ত্তমান ছিল। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের স্বর্গারোহণের পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহন করিয়া, "অনীতিপরায়ণ" হইলে, একটি মহাবিপ্লবে পরাভূত ও নিহত হইয়াছিলেন। পাল-রাজগণের জনকভূমি বরেন্দ্র-মণ্ডল কৈবর্ত্ত-নায়ক দিব্য নামক রাজপুরুষের করতলগত হইয়াছিল; দ্বিতীয় মহীপালদেবের ভ্রাতা শূরপাল ও রামপাল বরেন্দ্র হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রমণ্ডলে রাজা হইয়াছিলেন! শূরপালদেব অল্পকালে পরলোক গমন করিলে, সামন্তগণের সহায়তায়, রামপালদেব বরেন্দ্রীর উদ্ধার-সাধন করিয়া, দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কুমারপাল অতঃপর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রামপালদেব বরেন্দ্রীর উদ্ধার-সাধন করিয়া, কামরূপে ও পূর্ব্ববঙ্গে পুনরায় শাসনপ্রভাব বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইলেও, তাঁহার তিরোভাবে ঐ সকল প্রদেশে পুনরায় বিদ্রোহবহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছিল। তজ্জন্য কুমারপাল তদীয় প্রিয়তম মন্ত্রী বৈদ্যদেবকে বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বৈদ্যদেব "অনুত্তর বঙ্গে"র জলযুদ্ধে বিজয়-লাভ করিয়া, কামরূপের বিদ্রোহী নরপালের নিধনসাধন করেন; এবং স্বয়ং কামরূপের সিংহাসনে আরোহন করিয়া, "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রশস্তি-রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া এই যুগের বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করিতে গিয়া, গৌড়কবি মনোরথ সে কালের বাঙ্গালীর বাহুবলের ও শাসন-কৌশলের অনেক পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যদি কখনও বাঙ্গালীর ইতিহাস যথাযোগ্যভাবে সঙ্কলিত হয়, তাহাতে মনোরথের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বরেন্দ্রমণ্ডলের সুশাসনসম্পন্ন ভাব গ্রামে কৌশিক-গোত্রসম্ভূত ভরত নামক এক পুণ্যশ্লোক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি এরূপ পুণ্যশীল ছিলেন যে, সমসাময়িক লোক মনে করিত,—তাঁহার নামমাত্র উচ্চারণ করিলেই পাপ-প্রপঞ্চ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভরতের পুত্র যুধিষ্ঠির সুধীসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীধর তীর্থভ্রমণে, বেদাধ্যয়নে, দানাধ্যাপনায়, যজ্ঞানুষ্ঠানে, ব্রতাচরণে ও বিবিধ কৃচ্ছ্র সাধনে জ্ঞানকাণ্ড-কর্ম্মকাণ্ডবিৎ পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।




দুটি ফুল।

চিত্রকর—জি, ডি, লেস্‌লী।

*Reproduced from a halftone.*

Blocks by G. N. Mukherji Pro. Mohila Press.

Mohila Press, Cal.

কামরূপাধিপতি মহারাজাধিরাজ বৈদ্যদেব তদীয় বিজয়রাজ্যের চতুর্থ সংবৎসরে বৈশাখ বিষুবৎ-সংক্রান্তিতে সেই শ্রীধরকে ভূমিদান করিয়া, এক তাম্র-শাসন সম্পাদিত করাইয়াছিলেন। তাহা কর্ণভদ্র নামক শিল্পী কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাহাতে যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা রাজগুরু মুরারির পুত্র পদ্মাগর্ভোৎপন্ন মনোরথ কর্তৃক বিরচিত। বারাণসীধামের গঙ্গা-বরুণা-সঙ্গম স্থলের নিকটবর্ত্তী কমৌলি গ্রামে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ভূমিখননোপলক্ষে সেই তাম্র-শাসনখানি আবিষ্কৃত হইবার পর, গৌড়কবি মনোরথের নাম ও পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মনোরথের কবিপ্রতিভার অন্য কোনও নিদর্শন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু এই একখানিমাত্র প্রশস্তি হইতেই মনোরথের রচনা-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১)

রামপালদেব "জনকভূমি"র উদ্ধারসাধন করিয়া সে কালের বাঙ্গালীর নিকট শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় "যথাবৎ" যশস্বী হইয়াছিলেন। সেই ঐতিহাসিক ব্যাপারের পরিচয়-প্রদানের জন্য মনোরথ একটিমাত্র শ্লোকে এক মহাবিপ্লবের ইতিহাস ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। শ্লোকটি এই,—

"তস্যোর্জ্জিতদল-পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ
পুত্রঃ পালকুলাব্ধি-শীতকিরণঃ সাম্রাজ্য-বিখ্যাতিভাক্।
তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূ-লাভাৎ যথাবৎ যশঃ
ক্ষৌণীনায়ক-ভীম-রাবণ-বধাৎ যুদ্ধার্ণবোল্লঙ্ঘনাৎ॥"

স্বনাম-সাদৃশ্যে ও স্বকর্ম্মসাদৃশ্যে রামপালদেব কিরূপে দ্বিতীয় রামচন্দ্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সন্ধ্যাকর-নন্দি-বিরচিত "রামচরিতম্" কাব্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (২) গৌড়কবি মনোরথের এই শ্লোকটি স্বল্পাক্ষরে সুকৌশলে সেই কাব্যের পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়াছে। রাম-পক্ষে ও রামপাল-পক্ষে তুল্যরূপে প্রয়োজ্য "জকভূ-লাভাৎ", "ভীম-রাবণ-বধাৎ" ও "যুদ্ধার্ণ-বোল্লঙ্ঘনাৎ", এই তিনটি শ্লিষ্টপদের ব্যবহারে, মনোরথ রচনা-কৌশলের পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। পাল-নরপালগণ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন; সে কথা মনোরথের রচনাতেই জানিতে পারা গিয়াছে। বরেন্দ্রী তাঁহাদিগের জনকভূমি ছিল, তাহাও মনোরথের রচনাতেই প্রথমে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সন্ধ্যাকর

(১) এই প্রশস্তি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত গৌড়-লেখমালা গ্রন্থের প্রথম স্তবকে সটীক বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

(২) এই গ্রন্থ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

নন্দীও "রামচরিতম্" কাব্যে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এক অর্থে "বরেন্দ্রী" ও অন্য অর্থে "সীতাদেবী" বলিয়া "জনকভূ" শব্দের ব্যবহার করিয়া, মনোরথ যে রচনা-কৌশলের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতম্" কাব্যে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে। "জনকভূ" শব্দের এইরূপ ব্যবহারের প্রথম পথ-প্রদর্শক মহাকবি সুবন্ধু। তিনি "বাসবদত্তা"য় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"রাঘবঃ পরিহৃন্নপি জনকভূবং জনকভুবা সহ বনং বিবেশ।" "বিরোধা-ভাসে"র আভাস-প্রদানের জন্য, সুবন্ধু এইরূপে "পিতৃভূমি" ও জনকনন্দিনী, এই উভয় অর্থেরি সূচনা করিয়া, যে রচনা-কৌশলের অবতারণা করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাহাতেই বরেন্দ্রীর ইতিহাস কাব্যাকারে গ্রথিত হইয়াছিল।

বৈদ্যদেবের প্রশস্তি-রচনা করিতে গিয়া, গৌড়কবি মনোরথ সেকালের "গৌড়জনে"র অনেক চিত্র চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। যে দেশের ইতিহাস নাই, সে দেশের পক্ষে এরূপ চিত্র বহুমূল্য। কবিকল্পনা চিত্রগুলিকে নানা মনোমত অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছে; সেগুলি পরিত্যাগ করিলেও, মূল ঐতিহাসিক তথ্য মনোজ্ঞ বলিয়াই স্বীকৃত হইবে।

বৈদ্যদেব রামপালদেবের পুত্র কুমারপাল দেবের মন্ত্রী ছিলেন। কুমার-পালের কীর্ত্তিকলাপের বিস্তৃত বর্ণনা না করিয়া, মনোরথ সুকৌশলে তাঁহার প্রাসাদ-বর্ণনায় তদীয় বীরকীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"যস্যারাতি-কিরীট-হাটক-কৃত-প্রাসাদ-কণ্ঠীরব-
গ্রাস-ত্রাসবশা দপৈব্যতি বিধোবিম্বাঙ্করূপী মৃগঃ।"

পরাজিত ভূপালবৃন্দের রাজমুকুট হইতে স্বর্ণ আহরণ করিয়া, তদ্দ্বারা 'সিংহমূর্ত্তি নির্ম্মিত করিয়া, প্রাসাদশীর্ষে সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া, বিজয়-গৌরব বিজ্ঞাপিত করিবার কৌশলের মধ্যে শিল্পরুচিরও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন,—সমুচ্চ প্রসাদ-শিখরে সংস্থাপিত সিংহমূর্ত্তির "গ্রাসত্রাসে" চন্দ্রমণ্ডলস্থ "বিম্বাঙ্করূপী" মৃগ পলায়নপর হইবে। ইহা কবিকল্পনা হইলেও, এই কল্পনার মধ্যে সেকালের কবি-হৃদয়ের কল্পনা-সামর্থ্য প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে।

মনোরথ ব্রাহ্মণ কবি। তিনি যাহার গুণগাথা গান করিয়াছিলেন, তিনিও ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। কিন্তু সেকালের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী কেবল মন্ত্রণাগৃহেই সকল কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারিতেন না;—প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাচালনাও করিতে হইত। বৈদ্যদেবের প্রশস্তিতে একটি জল-

যুদ্ধের ও একটি স্থলযুদ্ধের বর্ণনা করিয়া, গৌড়কবি মনোরথ এই ঐতিহাসিক তথ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

জলযুদ্ধটি প্রথমে সংঘটিত হইয়াছিল; তাহার পর স্থলযুদ্ধ। জলযুদ্ধের স্থান "অনুত্তরবঙ্গ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নদীবহুল দক্ষিণবঙ্গে জলযুদ্ধ সংঘটিত হইবার সময়ে, যে সকল রণতরণী ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা ক্ষেপণী-বিক্ষেপে পরিচালিত হইত। বহুসংখ্যক ক্ষেপণী এক সঙ্গে জলমধ্যে নিপতিত হইত, এক সঙ্গে ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলিত হইত।—এই ক্ষেপণীবিক্ষেপ ব্যাপারে জলকণাসমূহ বহু ঊর্দ্ধে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। ইহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে মনোরথ বলিয়াছেন,—"সেই জলকণা যদি আকাশে স্থিরতা লাভ করিতে পারিত, তবে চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্ককালিমা ধৌত হইয়া যাইত!" চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্ককালিমা ধৌত হয় নাই; কিন্তু মনোরথের রচনাকৌশলে অভিব্যক্ত এই ঐতিহাসিক তথ্যে বাঙ্গালীর কলঙ্ক-কালিমা ধৌত হইতে পারে। অনুশীলনের অভাবে যে শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সে শক্তি যখন পূর্ণগৌরবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বাহুতে বল ছিল; হৃদয়ে সাহস ছিল; বিজয়োল্লাসে উৎসাহ ছিল; জলযুদ্ধের বিজয়-বিজ্ঞাপক হীহীরবে দিগ্‌গজগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কেবল অন্যত্র গমন করিবার উপায় নাই বলিয়াই, দিগ্‌গজগণ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতে পারে নাই! মনোরথের এই কবিজনোচিত বর্ণনা সবল কবি-কল্পনার পরিচয় দান করিতেছে। যথা,—

> "যস্যানুত্তরবঙ্গ-সঙ্গরজয়ে নৌবাট-হীহীরব-
> ত্রস্তৈর্দিক্‌করিভিশ্চ যন্নচলিতং চেন্নাস্তি তদ্‌গম্যভূঃ।
> কিঞ্চোৎপাতুক-কেনিপাতকপতন-প্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈ-
> রাকাশে স্থিরতা কৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী॥"

কাহার সহিত এই জলযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, মনোরথ তাহার উল্লেখ করেন নাই। কেবল ইহাকে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর বিজয়-গৌরবের একটি দৃষ্টান্তরূপেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও প্রাচীন লিপিতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সমসাময়িক লোকসমাজে ইহার কথা অবশ্যই সুপরিচিত ছিল। সুতরাং ইহাকে মনোরথের কপোল-কল্পিত কবি-কাহিনী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না। ইহাকে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। মহাকবি কালিদাস "নৌসাধনোদ্যত" বাঙ্গালীর একটু গুণগান করিয়া গিয়াছিলেন; গৌড়কবি

মনোরথ তাহার একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এ সকল কথা নব্যবঙ্গের কবি-কল্পনার অতীত হইয়া রহিয়াছে। আধুনিক বঙ্গ-কবিকুল বঙ্গীয় নৌবাহিনীর বিজয়গৌরব বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন।

মনোরথ একটিমাত্র শ্লোকে জলযুদ্ধের পরিচয় দান করিয়া, স্থলযুদ্ধ-বর্ণনায় চারিটি শ্লোকের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা-কৌশল ব্রাহ্মণ বীরের ও ব্রাহ্মণ কবির পদমর্য্যাদার উপযুক্ত বলিয়াই স্বীকৃত হইবে। বৈদ্যদেব তাঁহার প্রভুর আজ্ঞায়, কতিপয় দিবসের রণযাত্রায়, কামরূপে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি প্রভুর আজ্ঞা মাল্যদামের ন্যায় মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, এই বর্ণনায় সুকৌশলে মন্ত্রিবরের রাজানুগত্যের মর্য্যাদা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। রণযাত্রার বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য। যথা,—"ব্যোমতল ধূলিপটলে সমাকীর্ণ হইয়া, বালুকাকীর্ণ 'স্থণ্ডিলে'র আকার ধারণ করিয়াছিল; তাহার উপর দিয়া সূর্য্যরথ টানিয়া লইতে সপ্তাশ্বের বড় পদবিন্যাসভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। এ দিকে ইন্দ্রদেবেরও বড় বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল। তিনি দুই হস্তে দুইটি চক্ষু আবৃত করিয়া, হস্ত দ্বারা অন্য ক্রিয়া করিতে অশক্ত হইয়া, তদীয় 'অনিমীলনকর' [স্পন্দনশূন্য] দেবনয়নলাভের কর্ম্মফলের নিন্দা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রণযাত্রার বর্ণনায় এই শ্রেণীর কবিকল্পনার অন্যান্য নিদর্শনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সমর-বর্ণনার সময়ে গৌড়কবি মনোরথ যে কবিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। যথা—

"দোর্দ্দণ্ডারণিজে হবির্ভুজি ভটব্রাতেন্ধনৈ রেধিতে
সংগ্রামাধ্বর-পূজিতে রিপুশিরঃ-শ্রেণীলসৎ-শ্রীফলৈঃ।
কৃত্বা হোমবিধিং পরক্ষিতিভুজা দত্বাথ পূর্ণাহুতিং
লব্ধোদগ্রযশো-মহৎ-ফলমসৌ শ্রীবৈদ্যদেবো বভৌ॥"

বৈদ্যদেব ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার সমর-ব্যাপারও যজ্ঞকার্য্যরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। সে রণযজ্ঞের 'অরণি' হইয়াছিল,—বাহুদণ্ড-সংঘর্ষণ; তদুৎপন্ন অগ্নির 'ইন্ধন' হইয়াছিল,—সেনামণ্ডল; রিপুশিরঃসমূহ তাহাতে শ্রীফলের ন্যায় হোমবিধির কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল; শত্রুনরপালের নিধনসাধনে সে রণযজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইয়াছিল। এই বর্ণনার শব্দবিন্যাস যেমন বিষয়োপযোগী, কল্পনাটিও সেইরূপ ব্রাহ্মণোপযোগিনী। এই রণযজ্ঞের অবসানে, তাহার মহৎ ফল লাভ করিয়া, বৈদ্যদেব কামরূপের রাজা হইয়াছিলেন।

মনোরথের রচনায় অভিব্যক্ত এই ঐতিহাসিক তথ্য অন্য কোনও প্রাচীন

লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছিল কি না, এ পর্য্যন্ত তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। গৌড়কবি মনোরথ এই প্রশস্তির মধ্যে প্রয়োজনানুরোধে সকল রসেরই অবতারণা করিয়া, ইহাকে একখানি কাব্যের মর্য্যাদা দান করিয়া গিয়াছেন। তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, বৃহৎ ব্যাপারের বর্ণনায় গৌরবান্বিত; রচনা-কৌশলে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

# বিদেশী গল্প।

## সমাপ্তি।

কাউণ্ট লোমেরিঁ প্রসাধনশেষে একবার প্রাচীর-বিলম্বিত দর্পণের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিলেন।

মস্তকের কেশরাজি শুভ্র হইলেও, এখনও তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হয় নাই। সত্যই তিনি সুপুরুষ। দেহ দীর্ঘ, সবল ও একহারা। ক্ষীণ মুখমণ্ডলে গুম্ফরাজি সুশোভিত। তাহাতে এখনও শুভ্রতার রেখা ভাল করিয়া পড়ে নাই।

দর্পণে আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তিনি মৃদুগুঞ্জনে বলিলেন, "লোমেরিঁ এখনও বাঁচিয়া আছে।"

প্রসাধন-কক্ষ হইতে উঠিয়া প্রভাতের চিঠিপত্র পড়িবার অভিপ্রায়ে কাউণ্ট বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। টেবিলের উপর দশ বারোখানি চিঠি ও বিভিন্ন রুচির তিনখানি সংবাদপত্র রক্ষিত ছিল। এক জোড়া তাসের মধ্য হইতে জুয়াড়ী যেমন মনোনীত তাসখানি তুলিয়া লয়, চিঠিগুলি তেমনই অঙ্গুলি-স্পর্শে ছড়াইয়া ফেলিয়া একদৃষ্টিপাতে তিনি পত্রগুলির শিরোনামার হস্তাক্ষর দেখিয়া লইলেন। প্রতিদিন খাম ছিঁড়িয়া চিঠিগুলি পড়িবার পূর্ব্বেই তিনি প্রত্যেক পত্রের হস্তাক্ষর এই ভাবে দেখিয়া থাকেন।

প্রত্যহ চিঠি পড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একটা অনির্দ্দিষ্ট উৎকণ্ঠা, আশা ও আনন্দ যুগপৎ তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইত। মোহরাঙ্কিত রহস্যপূর্ণ পত্রগুলি তাঁহার নিকট কোন্ সংবাদ বহন করিয়া আনিত? তাহাতে কিরূপ আনন্দ, সুখ, অথবা দুঃখ তিনি অনুভব করিতেন? একবার দৃষ্টিপাতেই তিনি বুঝিতে

পারিতেন, কোন্ পত্র কোথা হইতে আসিয়াছে। যে যে পত্রের মধ্যে যেরূপ বিষয়ের সংবাদ থাকিতে পারে বলিয়া তিনি অনুমান করিতেন, তদনুসারে তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাড়া বাঁধিয়া রাখিতেন। এইগুলি বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতে আসিয়াছে। ঐগুলি বাজে লোক লিখিয়াছে। বাকীগুলির লেখক তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই শেষোক্ত শ্রেণীর পত্রগুলিই তাঁহাকে বিব্রত ও বিচলিত করিয়া তুলিত। লেখকেরা তাঁহার নিকট কি চাহে? কে এইরূপ বিচিত্র বর্ণমালায় তাঁহার নিকট পত্র লিখিল? পত্রমধ্যে ভাব ও কল্পনার উচ্ছ্বাস, আশার সংবাদ, অথবা ভীতি-প্রদর্শনের চেষ্টা প্রচ্ছন্ন? পত্র-পাঠের পূর্ব্বে এইরূপ নানা চিন্তায় তিনি অভিভূত হইতেন।

আজ একখানি পত্র বিশেষভাবে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। শিরো-নাম-পাঠে পত্রমধ্যে যে কিছু বিশেষত্ব আছে, এরূপ অনুমিত হয় না। কিন্তু তথাপি তিনি অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন, অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেন।

তিনি ভাবিলেনঃ—"কে এ পত্র লিখিল? হাতের লেখা পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে বটে; কিন্তু লোকটা কে, বুঝিতে পারিতেছি না ত।"

দুইটি আঙ্গুলে চিঠিখানি তুলিয়া ধরিয়া খামের মধ্য দিয়া ভিতরের লেখা পড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু খামখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চিঠি পড়িবার ইচ্ছা হইল না।

একবার ঘ্রাণ লইয়া দেখিলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তার পর টেবিলের উপর হইতে একখানি আতসী কাচ তুলিয়া লইলেন। হস্তাক্ষরের সৌন্দর্য্য-অনুশীলনের জন্য তিনি এই কাচখানি ব্যবহার করিতেন। অকস্মাৎ তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।—"কে এ পত্র লিখিল? হাতের লেখা বিশেষ পরিচিত বলিয়া বুঝিতেছি। এ ভাষা যেন আমি অনেকবার পড়িয়াছি। বোধ হয়, সে অনেকদিন আগে। কে লিখ্‌লে হে? ও, লোকটা বুঝি কিছু টাকা চায়।" খাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি চিঠি পড়িলেন।

"প্রিয় বন্ধু,—নিঃসন্দেহ তুমি আমায় ভুলিয়া গিয়াছ। কারণ, প্রায় পঁচিশ বৎসর আমাদের দেখা শুনা হয় নাই। তখন আমার পূর্ণ যৌবন ছিল; এখন বুড়া হইয়াছি। তোমার কাছে বিদায় হইয়া আমি প্যারী ত্যাগ করি; তার পর আমার বৃদ্ধ স্বামীর সহিত দেশে চলিয়া যাই। তাঁর কথা কি তোমার মনে আছে? আজ পাঁচ বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমার কন্যার

বিবাহ দিব বলিয়া এখন আমি প্যারী নগরীতে ফিরিয়া যাইতেছি। আমার মেয়ের বয়স আঠারো বৎসর, সে খুব সুন্দরী। তাহাকে তুমি কখনও দেখ নাই। আমি তাহার বিবাহ সম্বন্ধে তোমাকে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু এ তুচ্ছ বিষয়ে তুমি আদৌ কান দাও নাই।

"আমি শুনিয়াছি, তুমি এখনও তেমনই সুন্দর আছ। ছোট লিজি, যাকে তুমি লিসোঁ বলিয়া ডাকিতে, যদি এখনও তার কথা তোমার মনে থাকে, তা হ'লে আজ বিকালে আসিয়া তাহার বাড়ীতে আহারাদি করিও। এখন সে বৃদ্ধা,—ব্যারনেস ভ্যান্‌স্‌ নামে পরিচিতা। এখনও সে তোমার প্রতি তেমনই শ্রদ্ধাশালিনী। তাহার অদৃষ্টকে সে কখনও নিন্দা করে নাই। তেমনই শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত সে তোমার সহিত করকম্পন করিতে সমুৎসুক। কিন্তু বন্ধু, সে হস্ত-চুম্বনের আকাঙ্ক্ষা রাখিও না। ইতি—

লিজি ভ্যান্‌স্‌।"

লোমেরিঁর হৃদয় দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। আরাম-কেদারায় তিনি একই ভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন; পত্রখানি জানুর উপর রাখিয়া তিনি শূন্যপানে চাহিয়া রহিলেন। স্মৃতির অঙ্কুশ-তাড়নায়, ভাবের আতিশয্যে তাঁহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল।

জীবনে এই লিজি ছাড়া তিনি আর কোনও রমণীকে ভালবাসেন নাই। লিজি কি সুন্দরী—কি মনোমোহিনীই ছিল! তাহার স্বামী ব্যারণ ভ্যানস্‌ বাতরোগগ্রস্ত ছিলেন। পাছে তাঁহার সুন্দরী পত্নী সুপুরুষ লোমেরিঁর প্রতি আকৃষ্ট হন, এই আশঙ্কায়, তিনি পত্নীকে নিজের জমীদারীতে লইয়া যান। সেইখানেই তাঁহাকে এতকাল নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সত্যই লোমেরিঁ এই নারীকে ভালবাসিতেন। লিজিও তাঁহাকে সত্যই ভালবাসেন, এ বিশ্বাসও তাঁহার ছিল।

মানসপট হইতে যে স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছিল, বহুদিন পরে আজ যৌবনের সুখদুঃখমিশ্রিত সহস্র কথা তাঁহার মনে পড়িল। একদিন সায়াহ্নে 'বল' নৃত্যের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার পর সুন্দরী লিজি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। উভয়ে তখন বয়দে বোলোঁতে বেড়াইতে গেলেন। যুবতীর অঙ্গে সান্ধ্য পরিচ্ছদ। তখন বসন্তকাল। প্রকৃতি মনোহারিণী। সুন্দরীর বর অঙ্গ ও সুরভিচর্চ্চিত বসনের সৌরভে ঈষদুষ্ণ পবন মাতিয়া উঠিল। কি মধুর রাত্রি! পত্রান্তরালচ্যুত চন্দ্ররশ্মি হ্রদের জলে পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল।

হ্রদতটে উপনীত হইলে লিজি অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সবিস্ময়ে লোমেরিঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

যুবতী বলিলেন, "জানি না; চাঁদের আলো ও হ্রদের জল আমার হৃদয় অভিভূত করিয়াছে। কোনও সুন্দর, কাব্যময় দৃশ্য দেখিলেই আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখনই আমার কান্না পায়।"

তিনি হাসিলেন। নারীজনোচিত এই ভাবাসক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া তিনি গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "লিজি, তুমি কি সুন্দর!"

এই ক্ষণস্থায়ী মধুর প্রেম-লীলার কি মোহিনী আকর্ষণী-শক্তি! কিন্তু দু দিনেই সব শেষ হইয়া গেল! প্রেম সবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে বৃদ্ধ ব্যারণ আসিয়া লিজিকে—তাঁহার প্রণয়িনীকে কাড়িয়া লইয়া গেল! তার পর আর কেহ লিজিকে দেখে নাই!

লোমেরিঁ দুই তিন মাসের মধ্যে সমস্ত বিস্মৃত হইলেন। প্যারী নগরীর হাওয়া এমনই বিচিত্র যে, অবিবাহিত যুবকের চিত্ত হইতে এক নারীর স্মৃতি অন্য নারী অতি সহজেই বিলুপ্ত করিয়া দেয়! কিন্তু লোমেরিঁ তাঁহার হৃদয়-মন্দিরের এক প্রান্তে লিজিকে স্থান দিয়াছিলেন। এই নারী ব্যতীত তিনি আর কাহাকেও ভালবাসেন নাই। অন্ততঃ এখন তিনি মনকে এই বলিয়াই আশ্বস্ত করিলেন।

আসন হইতে উঠিয়া তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই আজ বিকালে গিয়া তাহার সহিত একত্র ভোজন করিব!"

তিনি সঙ্গে সঙ্গে দর্পণের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। আপাদমস্তক নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া লইলেন। ভাবিলেন,—"আমার অপেক্ষাও বোধ হয় সে বেশী বুড়া হইয়াছে!" তিনি যে এখনও লিজি অপেক্ষা সুন্দর, এ চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র তিনি যেন আত্মতৃপ্তি অনুভব করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্যারনেসের অন্তরে অতীত সুখ-স্মৃতির জন্য অনুশোচনা জন্মিবে, এবং ভাবাবেশে তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, এ চিন্তাও লোমেরিঁর হৃদয়ে সমুদিত হইল।

কাউন্ট তখন অন্যান্য পত্র-পাঠে মনঃসংযোগ করিলেন। সেগুলি তেমন প্রয়োজনীয় নহে।

সমস্ত দিন তিনি এই চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। সে এখন দেখিতে কেমন? পঁচিশ বৎসর পরে এই ভাবে পরস্পরের সাক্ষাৎ কি কৌতুককর! তিনি কি তাহাকে চিনিতে পারিবেন?

বিলাসিনী নারীর ন্যায় তিনি প্রসাধনে রত হইলেন। বেশের পারিপাট্য



বিদায়!

চিত্রকর—লর্ড লেটন।

Mohila Press, Cal.

শেষ করিয়া তিনি কেশ-সংস্কারককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিয়া তাঁহার দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাজির প্রসাধান করিয়া দিল। তার পর বেলা থাকিতেই তিনি যাত্রা করিলেন।

সুসজ্জিত উপবেশনাগারে প্রবেশ করিয়াই তিনি দেখিলেন. প্রাচীরগাত্রে রেশমী ফ্রেমে বাঁধা তাঁহার প্রতিকৃতি শোভা পাইতেছে। ছায়াচিত্রখানি বহু কালের পুরাতন ও মলিন।

আসন গ্রহণ করিয়া তিনি গৃহস্বামিনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাতের দ্বার খুলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন; দেখিলেন, এক শুভ্রকেশা বৃদ্ধা নারী বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

তিনি তাঁহার করযুগল গ্রহণ করিয়া একে একে চুম্বন করিলেন। তার পর মস্তক উন্নত করিয়া একদৃষ্টে ভূতপূর্ব্বা প্রণয়িনীর পানে চাহিলেন।

সত্যই রমণী বৃদ্ধা। তাঁহাকে লোমেরিঁ চিনিতে পারিলেন না। বৃদ্ধা হাসিতেছিলেন বটে; কিন্তু অশ্রু যেন তাঁহার নয়নে উছলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল।

কাউন্ট অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "তুমিই কি লিজি?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "হাঁ। তুমি আমায় চিনিতে পার নাই, কেমন, না? আমার শরীর ও মনের উপর দিয়া দুঃখ ও শোকের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। শোকের আগুনে আমার জীবন দগ্ধ হইয়াছে। এখন আমার দিকে চাহিয়া দেখ! না থাক্, চাহিয়া কাজ নাই! কিন্তু তুমি এখনও কত সুন্দর—যৌবনের লালিত্য এখনও তোমার শরীরে বিদ্যমান। যদি দৈবাৎ পথিমধ্যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইত, যৌবনের সেই প্রিয় নামে হয় ত তোমায় ডাকিয়া ফেলিতাম! যাক্, এখন ব'স, গল্প করা যাক্। তার পর তোমাকে আমার মেয়েটি দেখাইব। দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, তাহার সহিত আমার কি বিচিত্র সাদৃশ্য! যৌবনে আমি যা ছিলাম, এখন সে ঠিক সেইরূপ! দেখিলেই বুঝিতে পারিবে! তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে আমার গোটাকয়েক কথা আছে। আমার আশঙ্কা ছিল, প্রথম দর্শনে হয় ত আমি খুব অভিভূত হইয়া পড়িব। কিন্তু যাক্ সে সব কথা। সে ভাব আর নাই। বন্ধু, ব'স।"

লোমেরিঁ ব্যারনেসের পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। এই নারীকে তিনি ত চিনেন না। তাঁহার মনে হইল,

ইহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। এ বাড়ীতে তিনি আসিবেন কেন? কি কথা তিনি বলিবেন? পূর্ব্বজীবনের কথা? উভয়ের মধ্যে কোনও বিষয়ের সামঞ্জস্য ত নাই! পিতামহীর তুল্যা এই নারীর মুখের প্রতি চাহিলে পূর্ব্বের কোনও কথাই ত তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয় না? সুন্দরী, নববিকশিত কুসুমের মত মনোহারিণী লিজিকে মনে করিয়া যে সব কোমল, মধুর ও করুণ ভাবের প্রবাহ তাঁহার হৃদয় প্লাবিত করিত, ইহাকে দেখিয়া তাহার কোনও ভাবেরই অনুভূতি হয় না। যাঁহাকে তিনি ভালবাসিতেন, তাঁহার তবে কি হইল? বহুদিনবিস্মৃত স্বপ্নের স্মৃতির মত সুন্দরী নারী আজ কোথায়?

উভয়ে নিঃস্পন্দভাবে পাশাপাশি বসিয়া ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিলেন। উভয়েই অত্যন্ত অশান্তি অনুভব করিতেছিলেন।

অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় সংক্ষিপ্ত ভাবে তাঁহারা পরস্পরের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন। অকস্মাৎ বৃদ্ধা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলেন।

"আমি বেনীকে ডাকিতেছি।"

দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল; বস্ত্রের খস্ খস্ ধ্বনিও শোনা গেল।

"মা, আমি এসেছি।"

প্রেতাত্মা দেখিলে মানুষ যেমন স্তম্ভিত হইয়া থাকে, লোমেরিঁর দশা সেইরূপ হইল।

ভগ্নস্বরে তিনি বলিলেন, "নমস্কার ম্যাডমঁসেল।"

যুবতীর জননীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া তিনি বলিলেন, "ও!.........তুমি!"

বাস্তবিক এ সেই! সুদূর অতীতে তিনি যে নারীকে জানিতেন, এই যুবতী সেই! যে লিজি অন্তর্হিত হইয়াছিল, সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে! পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যে নারীকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, এ সেই! আজ যাহাকে দেখিতেছেন, সে তাহার অপেক্ষাও অল্পবয়স্কা, প্রফুল্লতাময়ী ও শিশুবৎ সরলা।

* * * * * তিনি যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার কানে কানে "লিসেঁা!" বলিয়া ডাকিবার প্রবল প্রলোভন তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল।

জনৈক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "আহার্য্য প্রস্তুত।"

তিন জনে ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন।

আহারকালে কি কথোপকথন হইল? তাঁহারা তাঁহাকে কি কথা বলিলেন, উত্তরে তিনিই বা কি বলিলেন? তিনি তখন যেন এক বিচিত্র স্বপ্ন

দেখিতেছিলেন। তাঁহার তখন উন্মত্ততার অবস্থা। নারীযুগলের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ মনে মনে প্রশ্ন করিতেছিলেন,—"উভয়ের মধ্যে কোনটি প্রকৃত ?"

জননী সহাস্যবদনে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "তোমার মনে আছে ?" যুবতীর উজ্জ্বল নয়নযুগলে কাউণ্ট অতীতের স্মৃতি যেন মূর্ত্তিমতী দেখিতেছিলেন। অন্যূন বিংশতিবার তিনি যুবতীকে বলিবার চেষ্টা করিলেন, "লিসেঁা! তোমার মনে পড়ে—" ; কিন্তু শুভ্রকেশা নারী যে সস্নেহনয়নে তাঁহাকে দেখিতেছিলেন, সে দিকে কাউণ্ট একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না।

এক একবার তাঁহার মনে সন্দেহের সঞ্চার হইতেছিল। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, বর্ত্তমানের নারী অতীত কালের সেই নারীর প্রকৃত স্বরূপ নহে। অতীতের নারীর কণ্ঠস্বরে, দৃষ্টিতে, এমন কি, সমগ্র শরীরে যাহা ছিল, বর্ত্তমানের নারী-মূর্ত্তিতে তাহা নাই। তিনি ভূতপূর্ব্ব প্রণয়িনীর স্মৃতি ভাল করিয়া মানসপটে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন।

ব্যারনেস বলিলেন, "বন্ধু, তোমার পূর্ব্বের প্রসন্নতা, সজীবতা তুমি হারাইয়াছ।"

তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "অনেক বিষয়ই আমি হারাইয়াছি!"

কিন্তু ভাবাতিশয্যে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্ব-প্রেম যেন সজীব হইয়া উঠিতেছিল। এই প্রেম সুপ্তোত্থিত উন্মত্ত পশুর ন্যায় তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল।

যুবতী আপন মনে গল্প করিতেছিল। তাহার জননী যে সকল চিরপরিচিত শব্দ ব্যবহার করিতেন, সেও মাঝে মাঝে সেইরূপ দুই একটি শব্দ প্রয়োগ করিতেছিল। মাতার চিন্তার ধারাও সে অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিল। আলাপকালে সেই প্রণালীতে সে যখন কথা কহিতেছিল, তখন লোমেরিঁর সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। সাহচর্য্য হেতু লোকে এইরূপে পরস্পরের চিন্তার ধারা আয়ত্ত করিয়া লয়, পরস্পরের ভাষাও প্রয়োগ করে। কিন্তু এই সকল ব্যাপারে কাউণ্টের হৃদয় ব্যথিত হইতেছিল। তাঁহার হৃদয়ের শুষ্ক ক্ষত হইতে পুনরায় রক্তধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই তিনি বিদায় লইলেন। তিনি সমীপবর্ত্তী উদ্যানে কিয়ৎক্ষণ বিচরণ করিয়া চিত্তকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই যুবতীর মূর্ত্তি প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইতেছিল। কিছুতেই তাহার স্মৃতি মুছিয়া ফেলা যায় না। তাঁহার হৃদয় ক্রমশঃ দ্রুততরবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল,

উষ্ণ রক্তধারা ধমনীতে চঞ্চল হইয়া উঠিল। দুইটি নারীর পরিবর্ত্তে তখন তিনি শুধু একটির মূর্ত্তিই মানস নেত্রে দেখিতেছিলেন। সে মুর্ত্তি যুবতীর; অতীত জীবনে যে নারীকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, ইহা সেই নারীর প্রতিমূর্ত্তি। অতীত যুগে তিনি তাহাকে যেমন ভালবাসিতেন, আজ তেমনই ভালবাসায় তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পঁচিশ বৎসরের সুপ্তপ্রেম জাগ্রত হইয়া আজ প্রবলতর আবেগের সহিত প্রণয়িনীর পানে ধাবিত হইল।

এই বিচিত্র ও ভীষণ ভাবাবেশ সহ তিনি গৃহে ফিরিয়া গেলেন। ভবিষ্যতে কোন পথ অবলম্বনীয়, নির্জ্জনে বসিয়া তিনি একবার তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

প্রজ্বলিত-দীপাধার-হস্তে গৃহান্তরে গমনকালে সম্মুখবর্ত্তী দর্পণে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, উহাতে একটি শুক্লকেশ বর্ষীয়ান বৃদ্ধের ছায়া পড়িয়াছে। এই দর্পণে বহুবার তিনি আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া আপনার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। সহসা পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ব্বের স্মৃতি মানসপটে জাগিয়া উঠিল—লিজি তখন পূর্ণ যুবতী, সেই সময়ে তাঁহার নিজের আকৃতি কিরূপ ছিল, একবার চিন্তা করিয়া দেখিলেন। তখন তাঁহার পরিপূর্ণ যৌবন; লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যদীপ্তিতে দেহ সমুজ্জ্বল। আলোকাধার দর্পণের সন্নিকটে ধরিয়া তিনি আত্মপ্রতিবিম্ব বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন, ললাট রেখান্বিত, অঙ্গে বার্দ্ধক্যের আক্রমণচিহ্ন পরিস্ফুট। এতদিন তিনি এ সব লক্ষ্য করেন নাই ত?

দেহের শোচনীয় পরিণাম প্রতিবিম্বে দর্শন করিয়া কাউণ্টের হৃদয় অবসন্ন হইয়া গেল। হতাশভাবে তিনি আসনে বসিয়া পড়িয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "লোমেরিঁ! আজ তুমি মৃত! আজ সব শেষ!" *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

---

* গীদে মোপাঁসার রচিত কোনও গল্পের ইংরেজী হইতে অনূদিত।

# দান্তে। *

## জীবনকথা।

ইতালীর মহাকবি দান্তে ১২৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ফ্লোরেন্স নগরে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনি প্রাচীন সদ্বংশের বংশধর ছিলেন; তেমন অর্থস্বচ্ছলতা না থাকাতে, ব্যবসায়ি-প্রধান ফ্লোরেন্স নগরে দান্তের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষ প্রাধান্যলাভ করিতে পারেন নাই। তবে দান্তের পূর্ব্বপুরুষগণ অর্থাভাব হেতু বংশমর্য্যাদায় কখনও হীন হন নাই। দান্তে (Dante) পুরাতন ইতালীয় দুরান্তে (Durante) শব্দের অপভ্রংশ। দুরান্তেগণ পুরাতন টস্কান (Tuscan) জাতির একটি প্রসিদ্ধ বংশের নাম। কাজেই বলিতে হয় যে, দান্তের দেহে টস্কান-শোণিত প্রবাহিত হইত। দান্তের পিতা আলিঘিয়েরী (Alighieri) এক জন সামান্য Notary বা ব্যবহার শাস্ত্রের লেখক ছিলেন। তাঁহার জননীর নাম বেলা (Bella)। ইঁহাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না; তবে নিতান্ত 'হা-ঘরে হা-ভাতে' ছিলেন না। ফ্লোরেন্স নগরে তাঁহাদের নিজের বসতবাটী ছিল, নগরের বাহিরে সামান্য একটু ভূমিসম্পত্তি বা তালুক ছিল।

১২৭৪ খৃঃ অব্দে যখন দান্তের কেবল নয় বৎসর বয়স, তখন তিনি বিয়াট্রিস্ (Beatrice) নাম্নী এক বালিকার দর্শনলাভ করেন। বালিকার বয়সও নয় বৎসর। নয় বৎসরের বালক-বালিকার মধ্যে প্রেমসঞ্চার হইয়াছিল। এ প্রেম-কাহিনী ইতালীর সাহিত্যে অপূর্ব্ব হইয়া রহিয়াছে। বালিকা বিয়াট্রিস্ এ প্রেমের প্রতিদান করিয়াছিলেন কি না, জানি না; উভয়ের মধ্যে যে বিবাহ হয় নাই, ইহা ঠিক। কিন্তু দান্তের যখন আঠারো বৎসর বয়স, তখন তিনি এই প্রেম অবলম্বনে যে অদ্ভুত গীতিকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতালীয় ভাষায় অপূর্ব্ব ও অনুপম হইয়া আছে। এই কাব্যগ্রন্থের নাম ভাইটা নুয়োভা, (Vita Nuova) অথবা নব-জীবন। নবম বর্ষে তিনি নবমবর্ষীয়া বালিকার অপরূপ-রূপ-দর্শনে মুগ্ধ হন। সে মোহ হইতে তাঁহার নবজীবনের সঞ্চার হয়। সে নব-জীবনের পরিচয় ভাইটা নুয়োভা কাব্য গ্রন্থে পরিস্ফুট। এই প্রেম-সঞ্জাত নব-জীবন সম্বন্ধেও বলা যায়, 'কাম-গন্ধ নাহি তায়'।

"For him Love and Beatrice are one thing only, he feels her approach as that of a Deity. In her bearing there is ever something divine—she is no human creature, but yet in the poet's heart ever a woman".

* Alighieri Dante.

দান্তের দৃষ্টিতে প্রেম ও বিয়াট্রিস্ একই ছিল। বিয়াট্রিস্ প্রেমময়ী, প্রেমের প্রতিমাস্বরূপা ছিলেন। তিনি দান্তের কাছে আসিলে মনে হইত, কোনও স্বর্গের দেবী বুঝি আসিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তিখানি যেন দৈব ভাব মাখান—তিনি যেন পার্থিব জীব নহেন। পরন্তু স্বর্গীয়া হইলেও, ঐশীভাবমণ্ডিতা হইলেও, কবির হৃদয়ে বিয়াট্রিস্ নারী বলিয়াই পরিচিতা ছিলেন। নারী বটে, পরন্তু দেবী; অপার্থিব-ভাবমণ্ডিতা, দেহজ সুখ-দুঃখের অতীতা দেবী। সে দেবীর দর্শনে সুখ, স্মরণে সুখ, বিরহে সুখ, মিলনে সুখ;—সে স্বপ্নে ঘেরা মূর্ত্তিখানি কেবল হৃদয়পটে লুকাইয়া রাখিতে হয়। হৃদয়ে তেমন প্রতিমা লুকান থাকিলে আত্মার বিকাশ হয়, পবিত্রতার সঞ্চার হয়, স্বার্থের ধ্বংস হয়। ভাইটা নুয়োভা গীতিকাব্যে প্রেমের এই চিত্রই উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত আছে। অনেকের ধারণা ছিল যে, বিয়াট্রিস্ একটা কল্পনার প্রতিমামাত্র; সত্য সত্য বিয়াট্রিস্ নামে কোনও রমণী ছিল না, নবম বর্ষে বালক-বালিকার দেখাও হয় নাই। কিন্তু বোকাশিও (Boccaccio) বলিয়াছেন যে, বিয়াট্রিস্ সত্যই এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী ছিলেন; সাইমন-ডি-বার্ডি (Simone-dei-Bardi) নামক এক সম্ভ্রান্ত যুবকের সহিত বিয়াট্রিসের বিবাহ হয়, এবং ১২৯০ খৃঃ অব্দে চব্বিশ বৎসর বয়সে বিয়াট্রিসের মৃত্যু হয়।

দান্তে যে বাল্যকালে সুশিক্ষা পাইয়াছিলেন, এমন কোনও প্রমাণ তাঁহার চরিতকথা হইতে পাওয়া যায় না। সে সময়ে সুশিক্ষিত বলিলে লাটিন ও গ্রীক ভাষায় সুশিক্ষিতকেই বুঝাইত। দান্তে কখনই লাটিন ও গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত হইতে পারেন নাই। তবে তিনি প্রৌঢ়বয়সে মোটামুটি ভাবে লাটিন ভাষায় অভিভাষণাদি লিখিতে পারিতেন। দান্তে দেশীয় ইতালীয় ভাষায় সুকবি ও সুলেখক হইবার জন্য আবাল্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ইতালীয় ভাষাকে কাব্যের ও সাহিত্যের ভাষায় উন্নত করিবার চেষ্টায় একরূপ প্রাণপাত করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইতালীয় ভাষায় তিনিই প্রধান ও প্রথম মহাকবি। তাঁহার তুল্য মহাকবি ইউরোপেও বিরল। হোমর ও ভার্জ্জিলের পরই দান্তের নাম করিতে হয়; দান্তের পর মিল্টন। দান্তে সঙ্গীতবিদ্যায় পটু না হইলেও, সঙ্গীতের মাধুরী বুঝিতেন, এবং নিজেও গান করিতে পারিতেন। পটুয়ার বিদ্যাও তিনি সামান্য একটু শিখিয়াছিলেন; প্রিয়জনের মুখাকৃতি পত্রে অঙ্কিত করিয়া তিনি অনেকের প্রতিমাকে স্মৃতিপটে সজীব রাখিয়া গিয়াছেন। বিয়াট্রিসের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দান্তে কেবল প্রেমের কবিতাই লিখিতেন, ধর্ম্মতত্ত্বের ও দর্শন শাস্ত্রের কোনও চর্চ্চাই করেন

নাই। বিয়াট্রিসের মৃত্যু হইলে তিনি শোকে মুহ্যমান হইয়াছিলেন; এক বৎসর কাল সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল শোকগাথাই রচনা করিতেন। এ সময়ে তাঁহার চরিত্রগত অবনতিও কতকটা ঘটিয়াছিল। তিনি নিজেই এ কথা তাঁহার মহাকাব্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

"The things of the present with their false pleasure turned my steps aside as soon as your face was hidden" —Purgatory, XXXI, 34.

অর্থাৎ, যখন তোমার মুখখানি মৃত্যুর আবরণে আবৃত হইল, তখন হইতে কিছুকাল আমি সংসারের বর্ত্তমান সুখে মজিয়া তোমা হইতে কতকটা দূরে যাইয়া পড়িয়াছিলাম।

দান্তে কেবল কাব্যরসেই মুগ্ধ থাকিতেন না। তিনি ১২৮৯ খৃঃ অব্দে কম্পোণডিনোর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে ফ্লোরেন্স-নগরবাসীরা আরেট্জোর বিশপকে (Bishop of Arezzo) পরাজিত করেন। তিনি পরে কাপোনার (Capona) দুর্গের অবরোধ ব্যাপারেও লিপ্ত ছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, দান্তে সমরবিদ্যায় যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। দান্তে এক জন বীর ও তেজস্বী যোদ্ধা ছিলেন। ১২৯৮ খৃঃ অব্দে দান্তে বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম জেম্মা (Gemma); ইনি মানেত্তো দোনাতির (Manetto Donate) কন্যা ছিলেন। দোনাতি বংশ ফ্লোরেন্সের অভিজাতবর্গের মধ্যে এক প্রবল, সম্মানিত ও অশেষপদমর্য্যাদাসম্পন্ন বংশ ছিল। এই বিবাহের ফলে সামাজিক হিসাবে দান্তের পদোন্নতি ঘটিয়াছিল: তিনি ফ্লোরেন্সের শাসকসম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছিলেন; রাজনীতির কুটিল আবর্ত্তে এই হেতু তাঁহাকে পড়িতে হইয়াছিল। এই বিবাহের ফলে দান্তের পিয়েত্রো ও জাকোপো (Pietro and Jacopo) নামে দুই পুত্র, এবং বিয়াট্রিস্ ও এন্টোনিয়া (Antonia) নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বিয়াট্রিস্ পরে সন্ন্যাসিনী বা Nun হইয়া রাভেনার কন্ভেণ্টে বাস করিয়াছিলেন। এন্টোনিয়ার অন্য কোনও পরিচয় কেহ জানে না।

এইবার দান্তের রাজনীতিক জীবনের একটু পরিচয় দিব। যদিও বিবাহ করিয়া দান্তে ফ্লোরেন্সের অভিজাতবর্গ-ভুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি সে সময়ে ফ্লোরেন্সে পুরাতন বনীয়াদী ঘরের প্রাধান্য ছিল না। ব্যবসায়ী ও শিল্পি-সঙ্ঘ সকলের প্রতিনিধিগণ নগরশাসন করিতেন। ছয় জন প্রতিনিধি বা Prior নগর-শাসনের ভার লইয়াছিলেন। দান্তে চিকিৎসক-সঙ্ঘের সভ্য হইয়াছিলেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দান্তে চিকিৎসা-শাস্ত্র জানিতেন। ১৩০০ খৃঃ অব্দে দান্তে এক জন প্রতিনিধি বা প্রায়ার হইয়াছিলেন। পরে তিনি বিচারকের পদও প্রাপ্ত হন।

প্রজাতন্ত্রমূলক শাসনে দলাদলি থাকিবেই। দান্তে ফ্লোরেন্সের শাসক-সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার পর এই দলাদলির আবর্ত্তে পড়িয়াছিলেন। ফ্লোরেন্স-রাজনীতির দুই দল ছিল,—the Whites and the Blacks, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের দল। দান্তে শ্বেতাঙ্গ-দল-ভুক্ত ছিলেন। ১৩০১ খৃঃ অব্দে শ্বেতাঙ্গ-দল পরাজিত হন; কৃষ্ণাঙ্গের দল নগরের শাসন-ভার প্রাপ্ত হন। ইহার ফলে ১৩০২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দান্তে ফ্লোরেন্স নগর হইতে নির্ব্বাসিত হন। অভিযোগ এই ছিল যে, দান্তের দল সাধারণের অর্থের অপব্যবহার করিয়াছিলেন। এই জন্য দান্তে ও চারি জন শ্বেতাঙ্গ দলের প্রধানের নির্ব্বাসনদণ্ড হয়; তাঁহাদের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়; ইহা ছাড়া ইঁহাদিগকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হয়। ঐ বৎসরের ১০ই মার্চ্চ তারিখে দান্তের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হয়। এই আজ্ঞা অনুসারে দান্তে ও আরও চৌদ্দ জনকে ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত করিবার ভয় প্রদর্শিত হয়। ইঁহারা যদি ফ্লোরেন্সে ফিরিয়া আসেন ত ইঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জীয়ন্তে পোড়াইবার আদেশ হয়। কেন না, ইঁহারা এক হিসাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন। অতএব দান্তেকে এই সময়ে ফ্লোরেন্স হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইল। ইহাই তাঁহার চিরনির্ব্বাসন। তিনি ইহার পরে আর নিজ জন্মভূমি দর্শন করিতে যান নাই। খৃষ্টাব্দ ১৩০২—১৩১০ পর্য্যন্ত দান্তে ইতালীর নানা নগরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি একবার ফরাসী দেশে প্যারিস্ নগরী দেখিতে গিয়াছিলেন। এই নির্ব্বাসন জন্য দান্তের রাজনীতিক জীবনে একটা পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গেল। তিনি রাজনীতি ছাড়িয়া সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন—কাব্য-রচনায় আত্মহারা হইয়াছিলেন। তবে জর্ম্মন সম্রাট্ সপ্তম হেনেরী যখন ইতালী-পরিদর্শনে আসেন, তখন একবার দান্তে রাজনীতিক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের পক্ষসমর্থন করিয়া কয়েকখানি পত্র ফ্লোরেন্সবাসীদের লিখিয়া পাঠান। ইহা লাটিন ভাষায় লিখিত হয়। এই পত্র লেখার জন্য ১৩১১ খৃষ্টাব্দে যখন নির্ব্বাসিতগণের দণ্ডাদেশ রহিত হয়, তখন দান্তে সে ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই।



বুড়োর দল।

চিত্রকর—ই, প্রজ্নার।

Mohila Press, Calcutta

ত্রুটীস্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, এ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। বরং উল্টা ফল ফলিয়াছিল! ঐ বৎসরের ৬ই নবেম্বর তারিখে ফ্লোরেন্সের শাসক-সম্প্রদায় আদেশপ্রচার করেন যে, দান্তে ও তাঁহার পুত্রগণকে রাণিয়ারীর (Ranieri) দল ধরিতে পারিলে, পিতা ও পুত্রদের শিরশ্ছেদ করিতে পারিবে। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে ভিনিস্ ও রাভেনা নগরের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। দান্তে রাভেনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া দূত-রূপে ভিনিসে গমন করেন। এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা। পথে তাঁহার জ্বর হয়; সেই জ্বরেই তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। তবে আশ্রয়স্থল রাভেনায় তিনি জীবিতাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিলেন। ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে (১৩২১) তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহাই দান্তের জীবন-কথা। সেই বিপ্লব-বিরোধের কালে দান্তে একাধারে গীতি-কবি, প্রেমিক, বীর, যোদ্ধা, রাজনীতিক, শাসক, বিচারক, মহাকাব্য-রচয়িতা, ভাবুক ও ধার্ম্মিক ছিলেন। দেখিতে তিনি মধ্যাকৃতি, বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন; চুল কাল, রং লাল্‌চে—ফুট শ্বেতাঙ্গ নহে, মুখখানি গম্ভীর, নয়নে স্থিরদীপ্তি। প্রৌঢ়ে নির্ব্বাসনের নানা কষ্ট সহিয়া তিনি একটু ন্যুব্জভাব ধারণ করিয়াছিলেন।

## গীতিকাব্য ও ভাষা।

দান্তে প্রথম জীবনে গীতিকাব্য-রচয়িতা হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, লাটিন ভাষায় প্রাণ নাই; দেশের লোকসাধারণ লাটিনের পঠন-পাঠন ভুলিয়া গিয়াছে; অনেকেই লাটিন বুঝে না। যাহারা বুঝে, তাহারা কেবল শব্দের মার-প্যাঁচ লইয়া বিব্রত। কাজেই তিনি লাটিনে কাব্যরচনার অভিলাষ ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ইতালীর জন কয়েক কবি ফরাসী ত্রুবাদুর (Troubadours) বা গায়কদিগের অনুকরণে প্রভেন্সাল-ফরাসী (Provencal) ভাষায় কবিতা রচনা করিতেছিলেন। রাজপুতানার চারণ কবিগণ যে ভাবে গাথা রচনা করিয়া গান করিতেন, ত্রুবাদুরগণও কতকটা সেই ভাবে গান রচনা করিতেন। প্রথমে উঁহারা প্রেম ও সমরবিজয়বিষয়িনী গাথা রচনা করিতেন, এবং গান করিয়া বেড়াইতেন; শেষে কেবল প্রেমের কবি হইয়া পড়িলেন। ইঁহাদেরই অনুকরণে গীডো গিনি চেলি (Guido Guinicelli) এবং সর্দ্দেলো (Sordello) প্রভৃতি ইতালীয় কবিগণ গীতিকবিতা রচনা করিতেন। দান্তে এ পথও অবলম্বন করিলেন না। তিনি স্বীয় মাতৃভাষাকে কাব্যের ভাষায় উন্নীত করিবার চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। সিসিলির ও টস্কানীর প্রাদেশিক

ইতালীয় ভাষাকে মিলাইয়া মিশাইয়া তিনি এক অভিনব ইতালীয় ভাষা রচনা করিয়াছিলেন। এই ভাষা-সৃষ্টির কাণ্ডটা De Vulgari Eloquentia নামক পুস্তকে তিনি সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি the Science of the vernacular—প্রাদেশিক ভাষার তত্ত্বকথার আলোচনা করিয়াছেন। কবি নিজের ভাষা নিজে ছানিয়া বাছিয়া লইলেন; সে ভাষা ইতালীবাসিমাত্রেরই বোধগম্য হইয়াছিল। পরে সেই ভাষা মহাকাব্যের উপযোগী হইয়াছিল, এবং ইতালীকে ইউরোপ-ধন্য করিয়াছিল।

অথচ গোড়ায় তাঁহার কবিতার বিষয় প্রেমই ছিল। কেন না, তিনি ক্রুবাদুরদের অনুকরণে গীতিকাব্যরচনা আরম্ভ করেন। দান্তে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"Song can scarce be of any worth unless the song proceed from the heart, nor can song proceed from the heart unless pure and sincere love be there." প্রাণের কথা না হইলে গান হয় না, সে প্রাণ প্রেমে সঞ্জীবিত না হইলে গানও প্রাণ হইতে বাহির হয় না। এ প্রেম কেমন? অশরীরী, বা নিরবয়ব প্রেম; যে প্রেম নারীর প্রতি প্রযোজ্য, এবং ভগবানের প্রতিও প্রয়োগ করা যায়, ইহা সেই প্রেম। এই প্রেমের গাথা সর্ব্বাগ্রে ভাইটা নুয়োভা বা নবজীবন নামক পদ্য গ্রন্থে ফুটিয়া উঠে। নয় বৎসরের বালিকা বিয়াট্রিস্‌কে দেখিয়া এই প্রেমের প্রথম স্ফুরণ। ইহাতে আকাঙ্ক্ষা আছে, পরন্তু তৃপ্তির লালসা নাই। নূতন ভাষা, নবীন ছন্দ, নূতন ভাব—তাই দান্তের গীতি-কবিতা New style বা নবপদ্ধতির কবিতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

ভাইটা নুয়োভা বা নবজীবন গীতিকাব্যের পরই দান্তে Odes বা গীতাঞ্জলি নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-কবিতার মঞ্জুষা রচনা করেন। এই গীতাঞ্জলির প্রেম ঠিক অশরীরী নহে। ইহাতে দেহ আছে, দেহের রূপ আছে, অতৃপ্ত বাসনা আছে, বাসনা পূর্ণ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু এই গীতাঞ্জলিরও একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়াছিল! যাহা হউক, দান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া ভাষাকে নিজের মনের মতন করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার ছন্দেরও একটু বিশিষ্টতা ছিল। সে ছন্দ দেশপ্রচলিত ছন্দ নহে, কতকটা তাঁহার মনগড়া ছন্দ। এই ছন্দ তাঁহার ভাষার সহিত বেশ খাপ্ খাইয়াছিল। লোকে বুঝিয়াছিল যে, দান্তের কবিতা দেশের লোকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবে, সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত নূতন ভাবে আলোড়িত করিয়া দিবে।

## দান্তের রাজনীতি।

দান্তের মহাকাব্যের প্রকৃত পরিচয় পাইবার পূর্ব্বে তাঁহার রাজনীতিবিষয়ক মতামতের একটু আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইবে। কেন না, তাঁহার রাজনীতি ও সমাজনীতিবিষয়ক সিদ্ধান্ত সকল তাঁহার মহাকাব্যে স্থান পাইয়াছে; অনেক ক্ষেত্রে ছন্দের আকারে তিনি এই সকল সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা তাঁহার মহাকাব্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

দান্তে এরিষ্টটলের (Aristotle) মতের পোষকতা করিতেন। এরিষ্টটল বলেন,—মানুষ যখন পারিবারিক জীব, একাকী স্বতন্ত্র ও নির্দ্বন্দ্বভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তখন কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি, যে কোনও বিষয়ের চর্চ্চা করিতে হইলে, মানুষকে সমাজ-সমষ্টির ব্যষ্টিরূপেই গ্রাহ্য করিতে হইবে। দান্তে বলিয়াছেন—"No man is able to attain felicity by himself without the aid of many, inasmuch as he needs many things which no one is able to provide alone" অর্থাৎ, কোনও মনুষ্যই একাকী অন্যের সহায়তা ব্যতিরেকে সুখলাভ করিতে পারে না; কেন না, তাহার সুখের উপাদান ও অনুপান বহু; সে বহু উপাদান ও অনুপান একটা লোকে সরবরাহ করিতে পারে না। ডি মোনার্কিয়া (De Monarchia) বা রাজ-সম্বন্ধীয় পুস্তকে দান্তে স্বীয় রাজনীতিক মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যে ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের রাজনীতির পুস্তক। ইহাতে দান্তের প্রথম জিজ্ঞাসা এই—সমবায়ে মানব-সভ্যতার ইপ্সিত কি? অর্থাৎ, এই যে নানা দেশের নানা জাতি সভ্য হইতেছে, বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্মেষ-সাধন করিতেছে;—এমন কেন করিতেছে? কোন আশায় মুগ্ধ হইয়া সভ্যতার জন্য মানুষ পাগল হইয়াছে? উত্তরে দান্তে বলিতেছেন—

"It is the realising or actualising of the whole potentiality of the human intellect i. e. of the intellect of humanity as a whole, or in other words, the bringing about of that condition of things in which the intellect of all the individuals in the world would be working together in the most effective manner possible."

অর্থাৎ, মানব-মনীষার কূটস্থশক্তির উদ্বোধন বা বিকাশসাধনই হইল মানব-সভ্যতার উদ্দেশ্য। মানুষের মনীষা কূটস্থ থাকে; কখন যে কোন ভাবে কোন

জাতির মনীষা বিকাশ পায়, তাহা বলা যায় না। আজ যে অসভ্য, কাল সে সভ্য; আজ যে মূর্খ, কাল সে পণ্ডিত। দান্তে বলেন যে, জাতির হিসাবে, বিরোধী ভাবে বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারে মানব-মনীষার কূটস্থ শক্তির (Potentiality) বিকাশ হইলে চলিবে না। সর্ব্বসাকল্যে ও সর্ব্বসামঞ্জস্যে মানব জাতির মনীষার সম্যক্ বিকাশ ঘটাইতে হইবে। অর্থাৎ, মেদিনীমণ্ডলের সামাজিক বা প্রাকৃতিক অবস্থা এমন ঘটাইতে হইবে, যাহার প্রভাবে প্রত্যেক নরনারীর মনীষার বিকাশ সমভাবে ও সম্যক্‌ভাবে হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যের সিদ্ধি-পক্ষে সার্ব্বজাতিক শান্তির (Universal Peace) প্রয়োজন। পৃথিবীর কোনও স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলেই বুঝিতে হইবে, মানব-মনীষা কূটস্থ হইয়াছে, এবং মানব-হৃদয়ে রিপুর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। রিপুর ও আসক্তির অতি-বৃদ্ধি মনীষার সঙ্কোচ ঘটায়। মনীষার বিকাশেই সামঞ্জস্য ঘটে; সামঞ্জস্যই মনুষ্য-সভ্যতা। এই সার্ব্বজাতিক শান্তিলাভের জন্য দান্তে এক জন পৃথ্বীনাথের কল্পনা করিয়াছেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীর মহারাজ-চক্রবর্ত্তী হইবেন; তাঁহার আর জিগীষা থাকিবে না। তিনি শান্ত, দান্ত, সমাহিত পুরুষ হইবেন; তিনি ভগবানের অনুরূপ হইবেন—'মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।' ইনি সকলকে নিরপেক্ষদৃষ্টিতে দেখিবেন, সমদর্শী ও সাম্যবাদী হইবেন। এই যে সম্রাজ্‌শক্তির বিকাশ হইবে, ইহা কেমন হইবে? দান্তের—"Imperialism does not mean the supremacy of one nation over others, but the existence of a supreme law that can hold all national passions in check" সম্রাজ্‌শক্তির বিকাশের অর্থ তাহা নহে, যাহার প্রভাবে এক জাতি অন্য জাতির উপর প্রাধান্য করিতে পারে; পরন্তু উহা এমন একটা জগদ্ব্যাপী বিধির প্রাবল্য, যাহার প্রভাবে জাতিগত রিপু ও আসক্তির তীব্র তাড়নাকে সংযত ও সংহত করিয়া রাখিতে পারা যায়। এই বিধির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জগৎ-সম্রাট্‌কে প্রেমময় হইতে হইবে। কেন না, প্রেমই স্বাধীনতার আধার; রিপু ও আসক্তি পরাধীনতার শৃঙ্খলমাত্র। স্বাধীনতা কাহাকে বলি? দান্তে বলিতেছেন—"A man is free when his will is in absolute equilibrium, not in the slightest degree weighed down by passion or desire, but free to act in accordance with the judgment of his reason." অর্থাৎ, সেই মনুষ্যই স্বাধীন, যাহার ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে; যাহার ইচ্ছাশক্তি রিপু

বা আসক্তি দ্বারা অবনমিত নহে ; পরন্তু মনীষার দ্বারা সুবিচারিত পন্থায় স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে। যাহার ইচ্ছাশক্তি মনীষার দ্বারা শাসিত, সাধুপথে পরিচালিত, সেই পুরুষই স্বাধীন। এখন জিজ্ঞাস্য—বিচার কাহাকে বলিব ? Judgment কি ও কেমন ? উত্তরে দান্তে বলেন,—

"Judgment is the link between apprehension and appetite."

অর্থাৎ, বিচার, আকাঙ্ক্ষা ও বোধের মধ্যগত শৃঙ্খল—বা বন্ধনীমাত্র। বোধ বা জ্ঞান সংযমের নামান্তরমাত্র ; আকাঙ্ক্ষা উদ্দামপ্রকৃতিক। আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না ; জ্ঞান বা বোধ আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দাম হইতে দেয় না। যে পদ্ধতিতে বোধ আসক্তিকে সংযত রাখে, সেই পদ্ধতির নাম বিচার। মানুষের সুবিচারিত চেষ্টাই স্বাধীনতা। এই চেষ্টা যখন ভাগবতী ইচ্ছার অনুগত হয়, তখনই মানুষ পূর্ণ স্বাধীন হয়। শাসনেই স্বাধীনতার বিকাশ হয়, উচ্ছৃঙ্খলতা স্বাধীনতা নহে—অতি ভীষণ পরাধীনতা। মানুষ ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ এক সার্ব্বভৌম সম্রাটের শাসনাধীন থাকিলে, মানব-মনীষার সম্যক উন্মেষ হয়, মানুষ স্বাধীন হইতে পারে।

ইহার পরই দান্তে এই সূত্রের বিন্যাস করিয়াছেন :—"Every thing which is good is so in virtue of consisting unity, and consequently that the human race is best disposed when it is most one, that is when it is concordant."

অর্থাৎ, যাহা সৎ পদার্থ, তাহা স্বীয় মজ্জাগত সমতা ও একতার জন্যই সৎ। অর্থাৎ, যাহা অব্যভিচারী ও অবিরোধী ভাবে প্রকট, তাহাই সৎ। সুতরাং মনুষ্যজাতি তখনই সুখে অবস্থান করে, যখন সকল জাতির মধ্যে অব্যভিচারী ভাব—সামঞ্জস্যের ভাব প্রকট হয়। এইখানেই দান্তে সাম্যবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দান্তের সাম্যবাদ আর কিছুই নহে, কেবল এক ও অদ্বিতীয় ইচ্ছাশক্তির অধীনে মানবজাতির ইচ্ছার সমন্বয়-ভাব। যেমন আপ্তবাক্যে বা অপৌরুষেয় শাস্ত্র-বচনে ভগবানের ইচ্ছার অভিব্যঞ্জনা ঘটে, এবং সেই আপ্তবাক্য জাতিবিশেষের ইচ্ছাশক্তিকে সংযত ও শাসনে রাখে, তেমনই সাংসারিক ব্যাপারে এক সম্রাটের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সমগ্র জগতের অধিবাসিবৃন্দের ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তি যখন প্রণালীবদ্ধ বা সংযত হইবে, তখনই সাম্য ফুটিয়া উঠিবে। আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য ঘটিলেই বৈষম্য উৎপন্ন হয় ; যে ক্ষেত্রে এই

আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা বিধিপদ্ধতির দ্বারা শাসিত, সেইখানেই বৈষম্য দূর হয়; সাম্যের বিকাশ হয়। ধর্ম্মে ও বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দান্তে সার্ব্বভৌম সম্রাটের পার্শ্বে এক জন সার্ব্বভৌম পুরোহিত বা পোপের কল্পনা করিয়াছেন।

ডি মোনার্কিয়া পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য মানবজাতির মধ্যে সমন্বয়-সাধন, নির্ব্বিরোধিতার প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানের প্রভাব-বিস্তার। জগতের এই সম্ভাবিত অথচ কাল্পনিক চিত্রটি অঙ্কিত করিয়া, স্বীয় সিদ্ধান্ত সকল বিশদভাবে লিখিয়া দিয়া, তবে দান্তে মহাকাব্য-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

### মহাকাব্য—The Divine Comedy.

এইবার যাহার জন্য দান্তে ইউরোপের অতুল্য কবি বলিয়া পরিচিত, যাহার রচনা করিয়া তিনি ইতালীয় ভাষাকে গ্রীক লাটিনের সমাদর দিয়াছিলেন, সেই মহাকাব্যের আলোচনা করিব। এই মহাকাব্য তিন অংশে বিভক্ত, তিন পর্য্যায়ে খণ্ডিত। প্রথম পর্য্যায়ের নাম—The Inferno, অথবা নরকের বার্ত্তা; দ্বিতীয় পর্য্যায়ের নাম The Purgatorio, বা পাপক্ষয়ভূমির বার্ত্তা; তৃতীয় পর্য্যায়ের নাম—The Paradiso অর্থাৎ স্বর্গভোগের বার্ত্তা। এক হিসাবে প্রত্যেক পর্য্যায়ই মহাকাব্যের গুণোপেত। ভাষায়, ভাবে, বিষয়বিন্যাসে উহারা প্রত্যেকেই অপরাজেয় ও অতুল্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে ইন্‌ফর্ণো ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। পর্গেটেরিও ১৩১৯ খৃঃ অব্দে এবং প্যারাডিসো ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। প্রথম খণ্ড ও শেষ খণ্ড লেখা শেষ করিয়া তবে তিনি মধ্য খণ্ড লেখেন। লেখার কারিগরীর হিসাবে পর্গেটেরিও শ্রেষ্ঠ। দান্তে তাঁহার মহাকাব্যকে কমেডী (comedy) বলিলেন কেন? কমেডী শব্দটা দুইটা লাটিন শব্দের সমাসে ঘটিয়াছে। Comus অর্থে গ্রাম, oda অর্থে গীত; গ্রাম্যগীতকে কমেডী বলিত। দান্তের মহাকাব্য গ্রাম্যভাষায়, সাধারণ ইতালীয় ভাষায় লিখিত; তাই উহা কমেডী। যদি উহাকে মিলনান্তক ভাবে ধর, তাহা হইলে উহা মিলনান্তক কাব্য বটেই ত। প্রথমে নরক, পরে পাপভোগ ও পাপক্ষয়, শেষে স্বর্গে দেব-মানবের মিলন। মিলনান্তক নহে কি? দান্তের বিশ্বাস যে, মানুষ যত বড় পাপী হউক না কেন, তাহার উদ্ধার আছেই; সে কালে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিবেই। এই কথাটা ইউরোপকে বুঝাইবার জন্যই তিনি তাঁহার মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

Providence has set two ends before man to be aimed at by him ; the blessedness of this life, which consists in the exercise of his proper power and is represented by the Earthly Paradise ; and the blessedness of eternal life which consists in the fruition of the sight of God, to which his proper power cannot ascend unless assisted by the divine light.

অর্থাৎ, বিধাতা মানুষের সম্মুখে দুইটি উদ্দেশ্য বা সাধ্য বিষয় স্থির রাখিয়াছেন ; প্রথম—এই জীবনের ভোগ্য আনন্দ ও সুখ, যে আনন্দ বা সুখের জন্য মানুষ স্বীয় ক্ষমতার বিধি অনুগত ভাবে প্রয়োগ করিয়া একটা পার্থিব স্বর্গের বা আনন্দধামের সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা মানুষের সাধ্য, পুরুষকার-প্রয়োগে প্রাপ্য। দ্বিতীয়—অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখ ; যাহা ভগবদ্দর্শন ব্যতীত লভ্য নহে ; যাহা লাভ করিতে হইলে কেবল মানুষের পুরুষকারে কুলায় না, ভগবানের অশেষ কৃপায় ভাগবতী জ্যোতির প্রভাবে মানুষ এই দুর্লভ অবস্থা লাভ করিতে পারে। এই তত্ত্বটুকু বুঝাইবার জন্যই দান্তের মহাকাব্য-রচনা। দান্তে খৃষ্টান ; তিনি জন্মান্তরবাদ মানিতেন না ; কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফল-ভোগ তিনি বুঝিতেন না ; তাই তাঁহাকে প্রথমে নরকের বর্ণনা দিতে হইয়াছে। এ নরকের অধিবাসীদিগের মধ্যে পাপবোধ নাই ; সুতরাং পশ্চাত্তাপ নাই, অনুশোচনা নাই। আছে কেবল একটা উৎকট-যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় জীব-আত্মার অবস্থান। নরকে থাকিয়াও জীবাত্মা অহঙ্কারশূন্য নহেন। এই নরকভোগের পর যাহাদের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে, তাহারা পর্গেটরী (Purgatory) বা পাপক্ষয় করিবার স্থানে উপস্থিত হয়। পর্গেটরী প্রায়শ্চিত্তের স্থান, পশ্চাত্তাপ ও অনুশোচনার স্থান। এইখানে পাপক্ষয় হয়, জীবাত্মার কর্ম্মজন্য মালিন্য বিধৌত হইয়া যায়। শেষে স্বর্গারোহণ ; এই স্বর্গে জীবাত্মা ভগবানের সালোক্য ও সামীপ্য লাভ করিয়া মুক্ত হয়। খৃষ্টান শাস্ত্রে সাযুজ্য ও সারূপ্য মুক্তি নাই। জীবাত্মা যখন দেহী বা অবয়ববিশিষ্ট, তখনও দেহের ভিতরে থাকিয়া তাহাকে এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। দেহেই নরকভোগ হয়, প্রায়শ্চিত্ত হয়, স্বর্গবাসও হয়। আবার বিদেহ আত্মাকেও এই ভাবে তিন অবস্থার মধ্য দিয়া মুক্তিলাভ করিতে হয়। স্বয়ং কবি এই মহাকাব্যের নায়ক। তিনি নরকভোগ করিতেছেন ; নরকের কত আত্মার সহিত কথোপকথন চালাইতেছেন ; তিনিই আবার প্রায়শ্চিত্তের আগারে যাইয়া পাপক্ষয় করিতেছেন ; সে স্থানের আত্মাদের সহিত পাপ-পুণ্যের আলোচনা করিতেছেন ; শেষে তিনিই শতধৌত

তণ্ডুলকণার মত অমল-ধবল-রূপে স্বর্গারোহণ করিতেছেন। তাঁহার কাব্যে তাঁহাকে দুই রূপে আমরা দেখিতে পাই—

Sometimes he signifies the ideal Christian rescuing himself from the shipwreck that sin has made of his life and toiling in Gods' appointed way to the two goals of temporal and eternal felicity ; sometimes he is the actual Dante, the Florentine of the fourteenth century, the man who in his own person has been through the experience he is describing.

অর্থাৎ, কখনও বা তিনি আদর্শ খৃষ্টান ; নিয়তির বিধান অনুসারে, বিষয়ী জীবনের এবং আধ্যাত্মিক জীবনের দুই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ব্যস্ত, এবং দেহজ লোভে ও পাপে যে তাঁহার জীবনকে নির্দ্দিষ্ট পন্থা হইতে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে, তাহা সাম্‌লাইতে ব্যস্ত ; আবার কখনও বা তিনি দেহী দান্তের মতন—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ফ্লোরেন্সবাসী দান্তের মতন—নিজের ভূয়োদর্শনজাত সকল অভিজ্ঞতার বর্ণনা করিতেছেন। এই মহাকাব্যের মধ্যে দান্তে এমন ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ভগবানের দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই তিনি যেন কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। লেখা আছে, যেন তিনি "as the consecrated Herald of His will to man" যেন ভগবানের কার্য্যে উৎসর্গীকৃত দূত স্বরূপে ভাগবতী ইচ্ছা মানুষকে জ্ঞাপন করিতেছেন।

গল্পের ভঙ্গীটা এই। দান্তে যেন তাঁহার জীবনের পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে আবার একটা ভীষণ পথহীন বনমধ্যে পথ হারাইলেন। এই বনই সেই সময়কার ( ১৩০০ খৃঃ অঃ ) ইউরোপ। তখন অষ্ট্রিয়ার এলবার্ট সম্রাট্ ; তিনি সম্রাটের কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন, অযোগ্য, লোভী, বিলাসী সম্রাট্। আর অষ্টম বনিফেস্ (Boniface VIII) পোপ, বা ধর্ম্মকার্য্যের পুরোহিত। ইনিও অযোগ্য, বিলাসী ও লম্পট ছিলেন। যাঁহারা দুই জন জীবকে সৎপথ দেখাইবেন, তাঁহারাই অযোগ্য ; তাই সংসার মহাবন—পথশূন্য, গহন, ভীষণ, বিজন অরণ্য। সেই অরণ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে দান্তে সম্মুখে এক সুন্দর পর্ব্বতে দেখিলেন। এই পর্ব্বতের শিখরদেশ অরুণোদয়ে সমুজ্জ্বল। সাধুতার সূর্য্যের প্রথম অংশুমালায় গিরিগাত্র কনককান্তি ধারণ করিয়াছিল। দান্তে এই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিলেন। এই পর্ব্বতই তাঁহার কাল্পনিক পার্থিব স্বর্গ। দান্তে পর্ব্বতের মূলদেশে উপস্থিত হইয়া আরোহণের চেষ্টা করিতে-

ছেন, এমন সময়ে তিনটি ভীষণ হিংস্রক জন্তু তাঁহাকে আক্রমণ করিল। প্রথমটি চিতাবাঘ (Leopard) অর্থাৎ দেহজ কাম; দ্বিতীয়টি রিরংসা, শার্দ্দূলরূপে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তৃতীয়টি এক ভীমকায় সিংহ—অহঙ্কারের মূর্ত্তির স্বরূপ হইয়া অপর পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করিল। তিনি ইহাদের আক্রমণ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছেন এমন সময়ে এক দুরন্ত নেকৃড়ে বাঘ (wolf) তাঁহাকে কামড়াইয়া ধরিল। লোভই এই নেকৃড়ে বাঘ। উহার দংশন সহ্য করিতে না পারিয়া দান্তে গিরিগাত্র হইতে গড়াইয়া পড়িলেন। অর্থাৎ, কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিন প্রধান রিপুই স্বর্গারোহণের প্রধান অন্তরায়। লোভের দংশনজ্বালায় দান্তে যখন অধীর হইয়াছেন, তখন মহাকবি ভর্জ্জিলের (Virgil) প্রেতাত্মা আসিয়া দেখা দিলেন। ইনিই দান্তেকে জ্ঞানোপদেশ দিলেন, দান্তের দিব্যচক্ষু হইল; তিনি স্বচেষ্টায় উদ্ধারের নূতন পথ খুঁজিতে লাগিলেন। এই অন্বেষণে তাঁহার নরকদর্শন হয়; পরে প্রায়শ্চিত্ত-আগার (Purgatory) দেখেন; ইহারই শেষ দ্বারে দান্তে বিয়াট্রিস্‌কে দেখিতে পান। তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেম, তাঁহার স্বার্থহীন জীবন, তাঁহার পবিত্রতা ও স্নিগ্ধতা দান্তেকে যেন হেলায় স্বর্গরাজ্যে লইয়া গেল। অর্থাৎ, দান্তে এই মহাকাব্যে এই সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা করিলেন যে, পুরুষকারের সাহায্যে মনুষ্য নরকযন্ত্রণা ও প্রায়শ্চিত্তের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। পরন্তু অহেতুক প্রেম না হইলে স্বর্গারোহণ সম্ভবপর নহে। তাই বালিকারূপে বিয়াট্রিস্‌ আসিয়া তাঁহাকে অক্ষয় স্বর্গে লইয়া গেল। এই ভাবগত বর্ণনাতেই মহাকাব্যখানি পূর্ণ। উহার যেমন অতুলনীয়া ভাষা, তেমনই অনুপম ভাব। বাইবেলের স্বর্গ-নরক-তত্ত্ব অপূর্ব্ব পদ্ধতি অনুসারে ব্যাখ্যাত।

**দান্তের নরক**—is the representation of the state of impenitence—অনুশোচনাশূন্য পাপোদ্ধত অবস্থাকে বুঝায়। যতক্ষণ অনুশোচনা নাই, ততক্ষণ পাপের প্রাবল্য সমভাবেই থাকিবে; ততক্ষণ আত্মার প্রায়শ্চিত্ত নাই; ততক্ষণ পাপের গতি অবিরামভাবে চলিবে। নরকে পাপ নিত্য বিদ্যমান; যখন পাপজ কর্ম্মের জন্য অনুশোচনা হয়, তখনই প্রায়শ্চিত্ত আরব্ধ হয়। এই প্রায়শ্চিত্ত Purgatory. The object of the purgatorial discipline is to restore to the penitent the freedom of his will, which has been enslaved by sin. প্রায়শ্চিত্তগত কঠোর শাসনপদ্ধতির উদ্দেশ্যই এই যে, উহার প্রভাবে পশ্চাত্তাপদগ্ধ পাপান্ধ মানব-আত্মা পুনর্ব্বার ইচ্ছাশক্তির

বা চিত্ত ও বুদ্ধির স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে। পাপে চিত্তের স্বচ্ছন্দতা নষ্ট হয়; এই স্বচ্ছন্দতা না থাকিলে পুণ্যার্জ্জন সম্ভবপর হয় না; সুতরাং স্বর্গাকাঙ্ক্ষার স্ফূর্ত্তিও হয় না। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সে পথ পরিষ্কৃত হয়। এই প্রায়শ্চিত্ত পর্ব্বতের সাতটি স্তর আছে; প্রতি স্তরে এক একটা পাপের ক্ষালন হইয়া থাকে। সে সাতটি প্রধান পাপ—Pride, Envy, Anger, Sloth, Greed, Gluttony and Lust স্পর্দ্ধা বা দর্প, ঈর্ষ্যা, ক্রোধ, জাড্য বা স্থবিরতা বা আলস্য, অতিলোভ, অভিভোজন, লাম্পট্য। কর্ম্মফল-ভোগ, দণ্ডভোগ, অনুশোচনাজাত প্রার্থনা, কাতর বন্দনা, এই কয় উপায়ে প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে তবে স্বর্গারোহণ।

দান্তের Paradiso নামক শেষ পর্য্যায়ে দুইটি বিষয়ের আলোচনা আছে—Eternity and firuition—অনন্ত ও কর্ম্মসাফল্য। অনন্ত কাহাকে বলি? সমস্তাৎ ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের বিদ্যমানতাকে অনন্ত বলে। Eternity is all at once.—নিত্যবিদ্যমানতাকেই অনন্ত বলে। যেখানে গতি নাই, অপচয় উপচয় নাই, নিত্যসিদ্ধ অবিনাশী যাহা, তাহাই অনন্ত। দান্তেকে অনন্ত বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বিয়াট্রিসের আত্মা আসিয়া দেখা দিল; সে দান্তের হাত ধরিয়া এমন দেশে লইয়া গেল, যে দেশে রজনী নাই—অহর্নিশের পরিবর্ত্তন নাই। অর্থাৎ, fixed star বা সূর্য্যমণ্ডলে লইয়া গেল। সেইখান হইতে বিয়াট্রিস দেখাইল—ঐ দেখ, গ্রহনক্ষত্রতারাগণ ঘুরিতেছে, ঐখানে ত্রিকালের সম্যক্ বিকাশ। আর তুমি যেখানে আছ, সেখানে কালের পরিমাণ নাই—অখণ্ড দণ্ডায়মান নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ স্বভাব কাল। কালের অতীত যাহা, তাহাই অনন্ত।

Fruition—ফলপ্রাপ্তি বা তৃপ্তি ও ভক্তি কাহাকে বলে? The perfect conformity of our will with the will of God, মানুষের ইচ্ছা বা মানসবৃত্তি যখন ভগবানের ইচ্ছার সহিত পূর্ণভাবে সম্মিলিত হইবে, তখনই জীবনের ঈপ্সিত লাভ হইবে।

"To see God is to see as God sees." ভগবানকে এমন দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, যে দৃষ্টিতে ভগবান বিশ্বচরাচর দেখিয়া থাকেন। আর স্বর্গ কেমন?—that is unbodied light,' 'Light intellectual, replete with joy,' 'Joy that transcends all sweetness of delight.' অশরীরী জ্যোতিঃ যেখানে নিত্য বিরাজ করে; যে জ্যোতিঃ মনীষার দ্যুতির ন্যায় প্রেমসৌদামিনীস্নাতা; যে প্রেম নিত্য আনন্দঘন, চিদানন্দবিকাশ; আর সে

চিদানন্দ সংসারের সকল সুখের অতীত—এমন আনন্দময় স্থানই স্বর্গ। এই স্বর্গে থাকে কাহারা? নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাব চিদ্ঘন আনন্দময় পুরুষ সকল, তাহাদের—

"নাই ভেদাভেদ, আনন্দ খেদ, তৃষ্ণা কি রূপের জ্বালা।"

শেষ কথা।

দান্তের Divine Comedy বা মহাকাব্য পাঠ করিতে করিতে আমাদের পুরাণ সকল মনে পড়ে। পুরাণে যেমন আখ্যায়িকা, উপাখ্যান আছে, যেমন অর্থবাদ ও রোচক আছে, দান্তের মহাকাব্যেও তেমনই ভাবে বিষয় সকল বিন্যস্ত আছে। আবার পুরাণে যেমন অধ্যাত্ম-তত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে, দান্তের মহাকাব্যেও তেমনই অধ্যাত্ম-তত্ত্বের ও সাধন-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা আছে। যে পদ্ধতিতে পুরাণ লিখিত, সেই পদ্ধতি অনুসারে দান্তের মহাকাব্য লিখিত। পুরাণ বেদের ও উপনিষদের ব্যাখ্যা-পুস্তক—দান্তের মহাকাব্য বাইবেলের ব্যাখ্যাপুস্তক, gospel বা আপ্তবাক্য পুরাণের আকারে পরিবর্ত্তিত। পুরাণের নরক বর্ণনা ও দান্তের নরক বর্ণনা প্রায় একই রকমের। তবে হিন্দুর পুরাণে জন্মান্তরবাদ আছে, দান্তের মহাকাব্যে তাহা নাই। হিন্দু পাপী জন্মে জন্মে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কর্ম্মসূত্রের পাক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। দান্তের নরকভোগ অনন্ত; প্রায়শ্চিত্তকাল সান্ত হইলেও, জন্ম-জন্ম জন্মান্তরে উহার জের টানা হয় না। দান্তের স্বর্গও অনন্ত। হিন্দুর স্বর্গ-নরক-ভোগ—দুইই সান্ত। হিন্দুর পক্ষে নরকভোগও অনন্ত নহে, স্বর্গভোগও অনন্ত নহে; কর্ম্মানুসারে উভয়েই সীমাবদ্ধ ও সান্ত। এই মতগত পার্থক্য ছাড়া হিন্দুর পুরাণে ও দান্তের মহাকাব্যে অন্য কোনও বিরোধ বা বিভিন্নতা নাই। দান্তের মহাকাব্য মিল্টনের Paradise Lost স্বর্গচ্যুতি মহাকাব্যের আদর্শ-স্বরূপ। আমাদের হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারে নরকবর্ণনা ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সাধনা দান্তের মহাকাব্যের অনুবাদমাত্র। হিন্দুর পুরাণ ছাড়িয়া দিলে, ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তপূর্ণ এমন মহাকাব্য জগতের আর কোনও সভ্যজাতির সাহিত্যে নাই, পূর্ব্বেও ছিল না—ভবিষ্যতে আর হইবে না; কেন না, অদ্যাপি দান্তের মহা-কাব্যের সমকক্ষ আর একখানি মহাকাব্য রচিত হইল না। অনেকে কাব্য-রচনা বিষয়ে দান্তেকে নেপোলিয়নের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। নিজের প্রয়োজনমত ভাষা গড়িয়া, ছন্দ গড়িয়া তিনি মহাকাব্যের রচনা করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ন দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই ; দান্তের সাম্রাজ্য অক্ষয় ও অবিনশ্বর। বরং দান্তেকে ইতালীয় বাল্মীকি বলা চলে। দান্তের আদর্শ লাটিন কবি ভর্জ্জিল হইলেও, কাব্যাংশে ঈনীড (Ærneid) অপেক্ষা দান্তের মহাকাব্য শ্রেষ্ঠ,—ভাষার সজীবতার হিসাবে শ্রেষ্ঠ, ভাবের প্রফুল্লতা হিসাবে শ্রেষ্ঠ।

বাঙ্গালীর সহিত দান্তের তেমন পরিচয় নাই জানিয়া, অতিসংক্ষেপে দান্তের মতের ও ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া লেখনী সার্থক করিলাম।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# প্রাচীন শিল্প-পরিচয়।

## বস্ত্র।

আর্য্যশাস্ত্রে (অবস্থা-বিশেষে) ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র ব্যবহার করিবার বিধি দৃষ্ট হয়।

বিধি-নিষেধ।

সধবা রমণী [রক্তবস্ত্র] রঙ্গীন কাপড় পরিধান করিবেন ; বিধবার পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ। কুমারীগণ শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবেন। (১) এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম স্থলবিশেষে পাপজনক বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে। মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়া গিয়াছেন, (২) [নীলীবস্ত্র] নীলরঙ্গের কাপড় পরিধান করিলে স্নান, দান, তপস্যা, হোম, বেদ-পাঠ, তর্পণ ও পঞ্চযজ্ঞ নিষ্ফল হয়। কেবল তাহাই নহে ; ইহাতে যে পাপ হয়, তাহার ক্ষালনার্থ অহোরাত্র উপবাস ও পঞ্চগব্য-পান-রূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ভবিষ্যপুরাণের এ বচন শূলপাণির "প্রায়শ্চিত্তবিবেকে" উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু আপস্তম্বই আবার বলিয়া গিয়াছেন, (৩)

---

(১) ধারয়েদথ রক্তানি নারী চেৎ পতিসংযুতা।
বিধবা চ ন রক্তানি কুমারী শুক্লবাসসী॥—মৎস্যপুরাণ।

(২) স্নানং দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
পঞ্চযজ্ঞা বৃথা তস্য নীলীবস্ত্রস্য ধারণাৎ॥
নীলীরক্তং যদা বস্ত্রং ব্রাহ্মণোঽঙ্গেষু ধারয়েৎ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥—ষষ্ঠ অধ্যায়।

"রমণীদিগের 'ক্রীড়ার্থসংযোগে' অর্থাৎ উৎসবাদিসময়ে নীলবস্ত্রের ব্যবহারে দোষ নাই ; তাহা শয্যাতেও ব্যবহৃত হইতে পারে।" অন্যান্য স্মৃতি পুরাণেও নীলের এইরূপ নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষিদিগের এই নীল-বিদ্বেষের কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। রসায়ন বিজ্ঞানে কৃতবিদ্যগণ ইহার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিয়া, আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারিবেন কি? নীলের ন্যায় গাঢ়রক্তবর্ণ বস্ত্রও নরসিংহপুরাণে (৪) নিষিদ্ধ হইয়াছে। বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানসময়ে শেলাই করা কাপড়, দগ্ধবস্ত্র, পরকীয় বস্ত্র, মূষিকোৎকীর্ণ জীর্ণবস্ত্রের ব্যবহার বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। (৫)

শাস্ত্রে পুরুষের পক্ষে সাধারণতঃ একাধিক বস্ত্র ব্যবহার করিবার বিধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (৬) পরিণীতা রমণীর পক্ষে বহু বস্ত্র, এবং কুমারীর পক্ষে দুইখানি বস্ত্র ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। পুরুষের অধোবস্ত্র ও উত্তরীয়, মহিলাদিগের এই উভয় ও অবগুণ্ঠন, স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং পুরুষের বস্ত্রে (বাসসী) দ্বিবচন, এবং মহিলার বস্ত্রের বিশেষণে (রক্তানি) বহুবচন দেখিতে পাওয়া যায়।

অবগুণ্ঠন।

আজকাল আমাদিগের গৃহলক্ষ্মীগণ যেমন একখানা কাপড়ের দ্বারা আগুল্‌ফ মস্তক ঢাকিয়া আমাদিগের ব্যয়ভারের লাঘব করিতেছেন, পূর্ব্বকালে তেমন ছিল না। "অবগুণ্ঠন-প্রথা" আর্য্যাবর্ত্তের চিরন্তন প্রথা। এই প্রথা দাক্ষিণাত্যে পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও প্রচলিত নাই। সুতরাং মুসলমানের অত্যাচার ঘোমটার উদ্‌ভাবক বলিয়া কল্পিত হইতে পারে না। কারণ, প্রাচীন স্মৃতিতে (৭) শ্বশুর প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিদিগের সম্মুখে মহিলাবৃন্দের শিরঃপ্রচ্ছাদনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আদিকবি বাল্মীকির রচনাতেও ইহার উল্লেখ আছে। (৮) বীরকেশরী

---

(৪) ন রক্তমুল্বনং বাসো ন নীলঞ্চ প্রশস্যতে।

(৫) ন স্যূতেন ন দগ্ধেন পারক্যেণ বিশেষতঃ॥
মূষিকোৎকীর্ণ-জীর্ণেন কর্ম্ম কুর্য্যা দ্বিচক্ষণঃ॥—আহ্নিকতত্ত্বে ভারত।

(৬) জলতীরং সমাসাদ্য তত্র শুক্লে চ বাসসী।
পরিধায়োত্তরীয়ঞ্চ কুর্য্যাৎ কেশান্ন ধুনয়েৎ॥—গোভিলআর্য্যস্মৃতি।
নার্দ্রং পরিদধীত, নৈকং পরিদধীত।—গোভিলগৃহ্য। ৩ প্র। ৫।২৪।২৫

(৭) শ্বশুরস্যাগ্রতো যস্মাৎ শিরঃপ্রচ্ছাদনক্রিয়া।
পুত্রৈর্দর্ভেন সা কার্য্যা মাতুরভ্যুদয়ার্থিভিঃ।—গর্গ।

(৮) দীনাং বিলপতীং মন্দাং কিং চ মাং নাভিভাষসে।
দৃষ্ট্বা ন খল্বভিক্রুদ্ধো মামিহানবগুণ্ঠিতাম্।—যুদ্ধকাণ্ড।

"রমণীদিগের 'ক্রীড়ার্থসংযোগে' অর্থাৎ উৎসবাদিসময়ে নীলবস্ত্রের ব্যবহারে দোষ নাই; তাহা শয্যাতেও ব্যবহৃত হইতে পারে।" অন্যান্য স্মৃতি পুরাণেও নীলের এইরূপ নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষিদিগের এই নীল-বিদ্বেষের কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। রসায়ন বিজ্ঞানে কৃতবিদ্যগণ ইহার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিয়া, আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারিবেন কি? নীলের ন্যায় গাঢ়রক্তবর্ণ বস্ত্রও নরসিংহপুরাণে (৪) নিষিদ্ধ হইয়াছে। বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানসময়ে শেলাই করা কাপড়, দগ্ধবস্ত্র, পরকীয় বস্ত্র, মূষিকোৎকীর্ণ জীর্ণবস্ত্রের ব্যবহার বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। (৫)

শাস্ত্রে পুরুষের পক্ষে সাধারণতঃ একাধিক বস্ত্র ব্যবহার করিবার বিধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (৬) পরিণীতা রমণীর পক্ষে বহু বস্ত্র, এবং কুমারীর পক্ষে দুইখানি বস্ত্র ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। পুরুষের অধোবস্ত্র ও উত্তরীয়, মহিলাদিগের এই উভয় ও অবগুণ্ঠন, স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং পুরুষের বস্ত্রে (বাসসী) দ্বিবচন, এবং মহিলার বস্ত্রের বিশেষণে (রক্তানি) বহুবচন দেখিতে পাওয়া যায়।

অবগুণ্ঠন।

আজকাল আমাদিগের গৃহলক্ষ্মীগণ যেমন একখানা কাপড়ের দ্বারা আগুল্‌ফ মস্তক ঢাকিয়া আমাদিগের ব্যয়ভারের লাঘব করিতেছেন, পূর্ব্বকালে তেমন ছিল না। "অবগুণ্ঠন-প্রথা" আর্য্যাবর্ত্তের চিরন্তন প্রথা। এই প্রথা দাক্ষিণাত্যে পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও প্রচলিত নাই। সুতরাং মুসলমানের অত্যাচার ঘোমটার উদ্‌ভাবক বলিয়া কল্পিত হইতে পারে না। কারণ, প্রাচীন স্মৃতিতে (৭) শ্বশুর প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিদিগের সম্মুখে মহিলাবৃন্দের শিরঃপ্রচ্ছাদনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আদিকবি বাল্মীকির রচনাতেও ইহার উল্লেখ আছে। (৮) বীরকেশরী

---

(৪) ন রক্তমুল্বনং বাসো ন নীলঞ্চ প্রশস্যতে।

(৫) ন স্যূতেন ন দগ্ধেন পারক্যেণ বিশেষতঃ॥
মূষিকোৎকীর্ণ-জীর্ণেন কর্ম্ম কুর্য্যা দ্বিচক্ষণঃ॥—আহ্নিকতত্ত্বে ভারত।

(৬) জলতীরং সমাসাদ্য তত্র শুক্লে চ বাসসী।
পরিধায়োত্তরীয়ঞ্চ কুর্য্যাৎ কেশান্ন ধুনয়েৎ॥—গোভিলআর্য্যস্মৃতি।
নার্দ্রং পরিদধীত, নৈকং পরিদধীত।—গোভিলগৃহ্য। ৩ প্র। ৫।২৪।২৫

(৭) শ্বশুরস্যাগ্রতো যস্মাৎ শিরঃপ্রচ্ছাদনক্রিয়া।
পুত্রৈর্দর্ভেন সা কার্য্যা মাতুরভ্যুদয়ার্থিভিঃ।—গর্গ।

(৮) দীনাং বিলপতীং মন্দাং কিং চ মাং নাভিভাষসে।
দৃষ্ট্বা ন খল্বভিক্রুদ্ধো মামিহানবগুণ্ঠিতাম্।—যুদ্ধকাণ্ড।

রাক্ষসনেতা দশানন দাশরথির বাণে গতাসু হইয়া সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইলে, শোকাতুরা মন্দোদরী বিলাপকালে বলিয়াছিলেন,—"মহারাজ! তুমি আজ এই যুদ্ধভূমিতে আমাকে অবগুণ্ঠনশূন্যা দেখিয়া ক্রোধ করিতেছ না কেন?" মহাকবি মাঘের বর্ণনায় মহিলাগণের উত্তমাঙ্গে অবগুণ্ঠন দেখিতে পাওয়া যায়। (৯)

বাণভট্টের (গাউন্-পরা) চাণ্ডালকন্যকা দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়া, মস্তকে রক্তাংশুকের অবগুণ্ঠন ধারণ করিয়া রাজদরবারে উপস্থিত হইয়াছিল। (১০) কালিদাসের তপোবন-লালিতা শকুন্তলার মস্তকেও অবগুণ্ঠন দেখিতে পাই।

দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্য-বাসের ফলে যাহারা আর্য্যাবর্ত্তের ভাষা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের মহিলাবৃন্দের মস্তকেও চিরন্তন প্রথার অনুযায়ী অবগুণ্ঠন দেখিতে পাওয়া যায়।

কাটা কাপড়।

অনেকে মনে করেন, প্রাচীনকালে ঋষিযুগের ভারতবর্ষে 'কাটা কাপড়ে'র ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। এই অপসিদ্ধান্তের ফলে, কঞ্চুকাবৃত প্রস্তরমূর্ত্তি গ্রীক-শিল্পের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রে কঞ্চুক-ব্যবহারের নিদর্শনের অভাব নাই। আহ্নিক-তত্ত্বে একটি স্মৃতিবচনে [বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানসময়ে] কঞ্চুক-পরিত্যাগের উপদেশ আছে। (১১) তন্ত্র শাস্ত্রের বিশিষ্ট গ্রন্থ "শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণি" গ্রন্থে জপ-কালে কঞ্চুক-ধারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। (১২) ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় "মহাভারত" হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, (১৩) তাহাও এই বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রদর্শিত প্রভৃত প্রমাণ বিদ্যমান থাকিতেও, আধুনিক অভিধান-কার "কঞ্চুক" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—"মেয়েদের কাঁচলী"। মেয়ে-মহলে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ বা আপত্তি নাই। কিন্তু সীমন্ত-সিন্দূরের মত ইহাতে মেয়েদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মধ্যযুগের

---

(৯) স্রস্তাবগুণ্ঠনপটাঃ ক্ষণলক্ষ্যমাণবক্ত্রশ্রিয়ঃ সভয়কৌতুকমীক্ষতে স্ম।—৫।১৭

(১০) আগুল্ফালম্বিনা নীলকঞ্চুকেনাচ্ছন্নশরীরাম্, উপরি রক্তাংশুকরচিতাবগুণ্ঠনাম্।—কাদম্বরী।

(১১) ন স্যাৎ কর্ম্মণি কঞ্চুকী।

(১২) উষ্ণীষী কঞ্চুকী নগ্নো মুক্তকেশোঽপ্যনাবৃতঃ।
অপবিত্রকরোঽশুদ্ধপ্রলপন্ন জপেৎ ক্বচিৎ ॥

(১৩) = বিবিশুস্তে সভাং দিব্যাং সোষ্ণীষা ধৃতকঞ্চুকাঃ।—ইণ্ডো-এরিয়ান্।

অভিধানে কঞ্চুক অর্থে—"চোল, কঞ্চুলিকা, (১৪) কূর্পাসক, অঙ্গিকা, কঞ্চুক, এই কয়টি শব্দ গৃহীত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের এতদ্বিষয়িনী কারিকাটি এইরূপ—

"চণ্ডাতকং চলনকং চলনী ত্বিতরস্ত্রিয়াঃ।
চোলঃ কঞ্চুলিকা কূর্পাসকোঽঙ্গিকা চ কঞ্চুকে।

"চণ্ডাতক" শব্দের অর্থ,—দিব্যস্ত্রীদিগের [ বলনা নামে ] খ্যাত অর্দ্ধোরু পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত বস্ত্রবিশেষ। সাধারণ স্ত্রীলোকের এই বস্ত্রের নাম চলনী। "তু"-কারের দ্বারা ইতরস্ত্রীকে অন্য হইতে "ব্যাবৃত্ত" করা হইয়াছে। ঐ কারিকার অপরার্দ্ধে পঠিত চোল হইতে অঙ্গিকা পর্য্যন্ত শব্দগুলি সাধারণ স্ত্রীলোকের "কঞ্চুক" অর্থে অভিহিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা "কঞ্চুক" যে কেবল স্ত্রীমাত্রেরই ব্যবহার্য্য, এমন বুঝায় না।

যেমন "পশ্চান্নিতম্বঃ স্ত্রীকট্যাঃ", এই উক্তিতে স্ত্রীলোকেরই; কটীর পশ্চাদ্‌ভাগের নাম "নিতম্ব", এইরূপ বুঝায়, কিন্তু "কটী" স্ত্রীশরীরেরই অবয়ব, পুরুষের নহে, এমন বুঝায় না; এই স্থলেও ঠিক সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এই শ্রেণীর জামা-নির্ম্মাতা "কঞ্চুক-কার" নামে অভিহিত হইত। উদ্‌ভটে তাহার প্রমাণ দেখা যায়। (১৫) আজকাল যাঁহারা বিবিধ কোষ গ্রন্থের সঙ্কলন-কার্য্যে ব্যাপৃত, তাঁহারাই এ সকল বিষয়ে অনেক গোলযোগ ঘটাইতেছেন।

নীশার।

প্রাচীনকালে "নীশার" নামে একটি পদার্থের ব্যবহার ছিল। এই নীশার শব্দটিকে সাধু করিবার অভিপ্রায়ে, কাত্যায়ন পাণিনির "ইউশ্চ" [ ৩।৩।২১ ] এই স্থত্রে একটি বার্ত্তিক স্থত্রের [ শৃবায়ুবর্ণনিবৃতেষু ] যোগ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে কালে

---

(১৪) কঞ্চুলিকা-ধারণে কামিনীদিগের সুষমা বর্দ্ধিত হইত, "কাব্যপ্রকাশে"র কবিতায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। নায়ক নায়িকাকে বলিতেছেন,—"হে মনোহরনেত্রে! কঞ্চুলিকা ব্যতীতই তুমি পরম শোভা ধারণ কর। যথা ;—

ত্বং মুগ্ধাক্ষি! বিনৈব কঞ্চুলিকয়া ধৎসে মনোহারিণীম্
লক্ষ্মীমিত্যভিধায়িনি প্রিয়তমে তদ্বীটিকাসংস্পৃশি।
শয্যোপান্তনিবিষ্টসস্মিতমুখো নেত্রোৎসবানন্দিতো
নির্যাতঃ শনকৈরলীকবচনোপন্যাসমালীজনঃ॥

(১৫) বিমলধিয়াভিযোগ্যে শাস্ত্রে জড়ঃ খিদ্যতি ন মৌর্খ্যে স্বে।
নিন্দতি কঞ্চুককারঃ প্রায়ঃ শুষ্কস্তনী নারী॥
"চোলঃ কূর্পাসকোঽস্ত্রিয়াং। নীশারঃ স্যাৎ প্রাবরণে হিমানিলনিবারণে। অর্দ্ধোরুকং

"নীশার" কত দূর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহা মনীষিমাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। হেমচন্দ্র [ পূর্ব্বোক্ত কারিকার পরেই ] লিখিয়াছেন,—"শাটী চোট্যথ নীশারো হিমবাতাপহাংশুকে"। কঞ্চুকের পরেই "শাটী", তৎপরেই "নীশার" উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে "নীশার" একটি শরীর-ধার্য্য পদার্থ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। অমরসিংহ ইহার পূর্ব্বে "কূর্পাসে"র, এবং পরে বরস্ত্রী-ভোগ্য "অর্দ্ধোরুকে"র পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার এই পাঠের ক্রমানুসারে রমণীদিগের ভোগ্য বস্তুই যেন অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়।

মহাভাষ্যকার "নীশার" শব্দের প্রয়োগ দেখাইবার অভিপ্রায়ে উদাহরণ দিয়াছেন,—"গৌরিবাকৃতনীশারঃ প্রায়েণ শিশিরে কৃশঃ"; অর্থাৎ, শীতকালে গরু যেমন কৃশ হইয়া যায়, "অকৃত-নীশার" ব্যক্তিও সেইরূপ কৃশ হয়। ইহাতে শীতের সময়ে "নীশারে"র বিশেষরূপ উপযোগিতা প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল বিষয়ের বিচার না করিয়া, অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন,—"কানাৎ বা মসারীতি খ্যাতে শীর্য্যতে শীতমনেন ঘঞ্ হ্রস্বস্ত দীর্ঘতা।" এতদ্ব্যাখ্যাসূত্রে কানাৎ বা মসারী "নীশার" নামে কল্পিত হইবার পর, "শব্দকল্পদ্রুমে" ও "বিশ্বকোষে"ও তাহাই বিনা বিচারে গৃহীত হইয়াছে। "নীশার" শব্দের এরূপ অর্থ-বিজ্ঞাপক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও অমরসিংহ ও হেমচন্দ্র, উভয়েই "নীশার"কে স্ত্রীভোগ্য বস্ত্রের প্রকরণে পাঠ করিয়াছেন, তথাপি [ মহাভাষ্যের উদাহরণানুসারে ] ইহা সাধারণের উপভোগ্য বস্তু বলিয়াই বোধ হয়। প্রস্তরমূর্ত্তিতেও এই শ্রেণীর শিল্প পুরুষ-প্রতিকৃতির গাত্রে দেখা যায়। (১৬) হয় ত অমরসিংহ প্রভৃতির সময়ে স্ত্রীশরীরেই ইহার ব্যবহার হইত।

নিচোল।

"নিচোল" নামে মহিলাদিগের ব্যবহার্য্য আর এক প্রকার কাপড়ের নাম অভিধানে ও সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। "বিশ্বকোষ" ইহার অর্থ করিয়াছেন,—"আচ্ছাদন-বস্ত্র"—"স্ত্রীলোকদিগের পরিধানবস্ত্র"—চলিত "পাছুড়ী"—"ঘোমটা", এবং প্রমাণস্থলে হেমচন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের কারিকাটি এইরূপ,—"নিচোলঃ প্রচ্ছদপটো নিচোল শ্চোত্তরচ্ছদে।" অমর-কারিকা—"নিচোলঃ প্রচ্ছদপটঃ"। টীকাকার রঘুনাথ বলিয়াছেন,—"চলনাকারে পরিহিতবস্ত্রে"

(১৭) খণ্ডাচণ্ডের দ্বারপাল-মূর্ত্তিতে "নীশার"-ব্যবহারের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"পাছুড়ীতিখ্যাতে ;" এবং সমর্থনার্থ ব্যাড়ির "কারিকা" [ "নিচোলঃ প্রচ্ছদপটো নিচুলঃ প্রচ্ছদশ্চ সঃ" ] উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সমস্তের পর্য্যালোচনায় দেখা যায়,—"নিচোল, নিচুল, প্রচ্ছদপট, উত্তরচ্ছদ ও প্রচ্ছদ" শব্দ একার্থ। "পাছুড়ী" কি, বুঝিতে পারিলাম না ; আরও বুঝিলাম না—"স্ত্রীলোকদিগের পরিধানবস্ত্র পাছুড়ী।" স্ত্রীলোকের পরিহিত বস্ত্রমাত্রই কি পাছুড়ী ? আর ঘোমটা অর্থ ই বা কোথা হইতে আসিল ?

টীকাকার ভানুজী দীক্ষিত বলেন,—"নিচোল" পাল্‌কী প্রভৃতির আবরণ। তিনি আরও বলেন,—ইহা ( কাহারও মতে ) স্ত্রী পিধানপট, "বুরকা" নামে প্রসিদ্ধ। সাহিত্যের প্রয়োগ দেখিয়া "বুরকা" অর্থ ই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। মহিলাদিগের অভিসারসময়ে "নিচোল"-ব্যবহারের বিশেষ উপযোগিতা উপলব্ধ হইয়াছিল। "সাহিত্যদর্পণে" উক্ত হইয়াছে,—"যান্তি নীলনিচোলিন্যো রজনীষ্বভিসারিকাঃ"। অর্থাৎ, "অন্ধকার রাত্রিতে অভিসারিকাগণ নীল নীচোল ধারণ করিয়া গমন করিতেছে।" "গীতগোবিন্দে" সখীর উপদেশেও এই অর্থেরই সমর্থন হইয়াছে। যথা,—"শীলয় নীলনিচোলম্"। "রাজতরঙ্গিণী"র বর্ণনাও উক্ত অর্থেরই অনুকূল। (১৬) যথা,—"দিক্ সকল তীব্র শীতে আক্রান্ত ( অতএব ) গাঢ় অন্ধকারচ্ছলে, যেন নীল-নিচোলাচ্ছিত হইয়াই শোভা পাইতেছিল।" ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—শীতকালে অন্ধকার রাত্রিতে তুষারাবৃত দিঙ্‌মণ্ডলে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। তাহাতেই কবি "নীলনিচোলা-বরণে"র উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন। কারণ, "নীচোলাবৃতশরীরে"ও নীচোলের বর্ণাদি ব্যতীত অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না।

দেশকালের বৈচিত্র্যানুসারে মানব-রুচির পরিবর্ত্তন স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং

জামার ব্যবহার।

এক সময়ে যাহা সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, সময়ান্তরে তাহাই আবার নিতান্ত হেয়রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। "শিশুপালবধে" দেখা যায়, সভ্য সমাজের মহিলাবৃন্দের গাত্রে "কূর্পাসক" স্থান পাইয়াছিল। (১৭) এমন কি, ঋষিযুগে রমণীদিগের কঞ্চুকধারণ

(১৬) সন্ততধ্বান্তমিষত স্তীব্রশীতবশীকৃতা।
আশাশ্চকাসিরে নীলনীচোলাচ্ছাদিতা ইব॥

(১৭) প্রস্বেদবারিসবিশেষবিষক্তসঙ্গে কূর্পাসকং ক্ষতনখক্ষতমুৎক্ষিপন্তী।
আবির্ভবদ্ঘনপয়োধরবাহুমূলা শাতোদরীযুবদৃশাং ক্ষণমুৎসবোহভূৎ।

(১৮) সিতার্দ্রবাসসা যুক্তা মুক্তকেশা বিকঞ্চুকী।
শিরোহস্নাতা ব্যাধিতা স্ত্রী পাকং কুর্য্যান্ন পৈতৃকম্॥

ধর্ম্মকার্য্যের অঙ্গ বলিয়াও বিবেচিত হইয়াছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা প্রজাপতি কঞ্চুকশূন্যা মহিলাকে শ্রাদ্ধীয় অন্নপাকে অনধিকারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১৯) কিন্তু আধুনিক পল্লীসমাজে মহিলার কঞ্চুক-ধারণ ষষ্ঠ মহাপাতকের ন্যায় বিবেচিত ও সমালোচিত হইয়া থাকে।

কুলকামিনীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে আবরণীয়। সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে কঞ্চুক-ধারণ যে কত আবশ্যক, তাহা "পাংশুলপাদ হালিক"ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। বাঙ্গালী পণ্ডিতের গাত্রে জামা দেখিলে, কেহ কেহ তীব্র মন্তব্যপ্রকাশেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে জামা-ব্যবহারের পাপজনকতা কিছুই সমর্থিত হয় না। প্রত্যুত বৈধ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানসময়ে "কঞ্চুক"-ধারণ নিষিদ্ধ হওয়ায়, সময়ান্তরে ব্যবহারেরই "অভ্যনুজ্ঞা" বুঝা যায়।

"আত্মানং সততং গোপায়ীত"—এই শ্রুতিবাক্যেও সতত আত্মরক্ষার উপদেশ আছে। লৌকিক ও অলৌকিক উপায়ের দ্বারা দেহরক্ষাই এই বাক্যের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। কঞ্চুকের দ্বারা দেহ আবৃত থাকিলে, শীতবাতাদির আক্রমণ ও তন্নিবন্ধন ব্যাধির উৎপত্তি হয় না, ইহা প্রমাণসিদ্ধ। তবে যাঁহারা পণ্ডিতের দেহ 'অপার্থিব', অথবা 'তপোময়', কিংবা 'রক্ষার অযোগ্য' বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার নাই।

ঋতুভেদে বস্ত্রভেদ।

প্রাচীনকালে ঋতুভেদে বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্র ব্যবহার করিবার রীতি ছিল। সুশ্রুতে (২০) শরৎকালে "অমল লঘু" (পাতলা) বস্ত্র, এবং গ্রীষ্মকালে অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা দেখা যায়। বর্ষাকালের জন্য এক প্রকার বস্ত্র ছিল; তাহা "বার্ষিক" (২১) নামে অভিহিত হইত। হেমন্ত ঋতুতে ব্যবহার্য্য বস্ত্র "হৈমন্" নামে পরিচিত ছিল। ইহাদের পার্থক্য কিরূপ ছিল, তাহা বর্ত্তমান সময়ে বুঝিবার উপায় নাই। তবে "বার্ষিক" বস্ত্র বর্ত্তমান "ওয়াটার-প্রুফ্" শ্রেণীর ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। কারণ, বর্ষাতে 'সাধু=উপযোগী',—এই অর্থে তদ্ধিত হইয়াছে; বর্ষার জল-নিবারণই মুখ্য উপযোগ।

---

(১৯) সচন্দনং বা কর্পূরং বা যক্ষামলিনং লঘু।—উত্তর তন্ত্র; ৬৪ অ। ১৮।
ঘর্ম্মকালে নিষেবেত বাসাংসি সুলঘূন্যপি। ৪০।

(২০) বর্ষাভ্যষ্ঠক্। পাং ৪।৩।১৮। বার্ষিকং বাসঃ। কাশিকা।

(২১) সর্ব্বত্রাণ্ চ তলোপশ্চ। পাং ৪।৩।২২ হৈমনং বাসঃ। কাশিকা।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এক প্রকার "বহ্নি-শৌচ" (২২) বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। এই "বহ্নিশৌচ" বা অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র কি? গুপ্তবতী টীকার মতে, "সর্ব্বদা অগ্নির মত নির্ম্মল", অথবা অগ্নি-প্রক্ষেপের দ্বারা যাহার মল দূর করা হয়। চতুর্ধুরী বলেন—"অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া যাহা নির্ম্মল হয়।" অথবা, অগ্নিই যাহার শৌচ অর্থাৎ নির্ম্মলকারী। নাগোজী ভট্টের মত চতুর্ধুরীর অনুরূপ। দংশোদ্ধারের মতও প্রায় ইঁহাদেরই তুল্য। "অগ্নির দ্বারা শৌচ" [বোধ হয়] "ইস্তিরী" করা, তদ্ব্যতীত আর কি শৌচ হইতে পারে? সুতরাং "ইস্তিরী" করিবার প্রথাও অতি প্রাচীন কালেই উদ্ভূত হইয়াছিল।

বহ্নি-শৌচ বস্ত্র।

কাপড়ের উপরে সোনালী কাজের নৈপুণ্যও পুরাকালে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। রাবণের (২৩) বিচিত্র সভার উত্তরচ্ছদে অর্থাৎ আবরণ-বস্ত্রে "রুক্মপট্ট" এই বিশেষণ দেখিয়া, উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। রুক্মপট্ট = স্বর্ণের কাজ করা কাপড়; তাহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

কাপড়ে সোনালী কাজ।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

---

# নিষাদ।

ঋগ্বেদে আর্য্যগণের প্রতিযোগী জনগণ ["অদেব" ও "অব্রত"] দস্যু বা দাস নামে অভিহিত। কিন্তু ঋগ্বেদে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অবলম্বন করিয়া, দস্যু বা দাসগণ যে মানবজাতির কোন্ শাখাভুক্ত ছিল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। বৈদিক দস্যুদিগের বর্ত্তমান বংশধরগণের আকৃতির হিসাবে তাহাদের উৎপত্তি বিচার করা যাইতে পারে। কিন্তু ঋগ্বেদোক্ত দস্যু বা দাসগণের বর্ত্তমান বংশধর যে কাহারা, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন, বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত হইলে, দস্যু বা দাসগণ শূদ্র বর্ণে পরিণত হইয়াছিল। "আর্য্য" নামক প্রথম প্রস্তাবে দেখাইয়াছি, "আদৌ 'শূদ্র' শব্দে কোনও স্বতন্ত্র জাতি বুঝাইত না; দাস [slave] বুঝাইত।"

---

(২২) বহ্নিরপি দদৌ তভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী।

(১) শূদ্র বর্ণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও, যখন দস্যু বা দাসগণ স্বতন্ত্র ছিল, তখনও আর্য্যসমাজে বহুসংখ্যক "দাস" বিদ্যমান ছিল। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে ঋষিরা আপনাদিগকে ["নৃবৎ"] দাস-সম্পন্ন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং "নৃবৎ" হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। (২) একটি ঋকে (৩) ঋষি গৌতম ["দাস-প্রবর্গম্"] বহু-দাস-বিশিষ্ট ধন প্রার্থনা করিয়াছেন; আর একটি ঋকে (৪) এক জন ঋষি দাস সহিত ["সদাসাঃ"] একখানি রথ চাহিয়াছেন। এক স্থানে (৫) ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি দাসের ন্যায় ["দাসো ন"] বরুণের সেবা করিতে চাহেন। আর এক জন ঋষি অগ্নির নিকট শত দাস ভিক্ষা করিয়াছেন। (৬) ঋগ্বেদীয় আর্য্যসমাজের এই দাসগণের সকলেই দস্যুবংশীয় ছিলেন, এরূপ মনে করা যায় না। তখনকার সমাজে দস্যুবংশীয় দাস থাকার সম্ভাবনা যত, আর্য্যবংশীয় দাস থাকারও সম্ভাবনা তত। আর্য্য ও দস্যুর মধ্যে যেরূপ বিরোধ ছিল, বিভিন্ন শ্রেণীর আর্য্যগণের মধ্যেও তেমনই বিরোধ ছিল; এবং বিজিত ও সমরক্ষেত্রে ধৃত শত্রুকে দাসে পরিণত করার প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। সুতরাং আদিম শূদ্রগণকে ঋগ্বেদোক্ত দস্যুগণের বিশুদ্ধশোণিতসম্পন্ন বংশধর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

ঋগ্বেদোক্ত দস্যুগণ তবে কোন বর্ণ বা জাতি-রূপে পরবর্ত্তী বৈদিক সমাজে স্থান লাভ করিয়াছিল? ঋগ্বেদে "পঞ্চজনাঃ" উল্লিখিত হইয়াছে। যাস্ক "পঞ্চজনে"র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (৩।৮)—

"গন্ধর্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসীত্যেকে; চত্বারো বর্ণা নিষাদঃ পঞ্চম ইত্যৌপমন্যবঃ।"

কেহ কেহ বলেন, "পঞ্চজন" গণের অর্থ,—গন্ধর্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ, এবং রাক্ষসগণ। ঔপমন্যব বলেন,—"পঞ্চজন" গণের অর্থ,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণ, এবং পঞ্চম নিষাদ জাতি।

শৌনকের "বৃহদ্দেবতা"য় (৭।৬৮—৭২) "পঞ্চজনে"র অর্থ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি মত উদ্ধৃত হইয়াছে। শৌনক বলেন,—যাস্ক ও ঔপমন্যবের মতে, "পঞ্চজনাঃ"র অর্থ—মনুষ্যগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্বগণ, সর্প ও রাক্ষসগণ, এবং

"নিষাদপঞ্চমান্ বর্ণান্ মন্যতে শাকটায়নঃ।"

(১) "সাহিত্য" ২৩শ ভাগ (১৩১৯), ২৭৪ পৃঃ।
(২) ১।৯২।৭; ৫।১৮।৫; ৬।১৯।১০ ইত্যাদি। (৩) ১।৯২।৮ (৪) ৪।৫৩।৪ (৫) ৭।৮৬।৭
(৬) ৮।৫৬।৩।

এবং "শাকটায়ন" মনে করেন,—"পঞ্চজনাঃ"র অর্থ, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ, এবং পঞ্চম "নিষাদ জাতি"। যাস্ক (১০।৩।৫,৭) স্বয়ং দুইটি ঋকের ব্যাখ্যায় "পঞ্চকৃষ্টী"র অর্থ লিখিয়াছেন,—"পঞ্চ মনুষ্যজাতানি"। তাহার ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য্য "পঞ্চ মনুষ্যজাতানি"র অর্থ লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণপ্রমুখান্ নিষাদপঞ্চমান্ বর্ণান্।" সুতরাং ঋষিগণ "পঞ্চজনাঃ" বা "পঞ্চকৃষ্টী" যে অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকুন, প্রাচীন বেদব্যাখাতৃগণ নিষাদকেই বৈদিক যুগের পঞ্চম বর্ণ বা পঞ্চম জাতি বলিয়া মনে করিতেন। যজুর্বেদের "রুদ্রাধ্যায়ে" (তৈ, সং, ৪।৫।৪) নিষাদ জাতির প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীকে তিন রাত্রি ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে, তিন রাত্রি বৈশ্যগণের মধ্যে, এবং তিন রাত্রি নিষাদগণের মধ্যে বাস করিতে হইত। (৭) কাত্যায়ন (২২।৩০) নিষাদের লক্ষণ লিখিয়াছেন,—

"গ্রাম্যভোজনং নিষাদানাং মৃন্ময়াপানং চ।"

"নিষাদগণ অসভ্যের খাদ্য খায়, এবং মাটীর ভাণ্ডে জল পান করে।"

অধিকারিনিরূপণ প্রসঙ্গে কাত্যায়ন (১।১২) লিখিয়াছেন—

"নিষাদস্থপতির্গাবেধুকেঽধিকৃতঃ॥"

নিষাদজাতীয় অধিপতির (স্থপতির) বন্য গোধূমের চরুর দ্বারা যজ্ঞ করিবার অধিকার আছে।

এই সূত্রের ভাষ্যে কর্ক এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"যস্য রুদ্রঃ পশূন্ শময়েৎ স বাস্তুমধ্যে রৌদ্রং গাবেধুকং চরুং নির্বপেদিতি। ......এতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েদিতি।"

রুদ্র যাহার পশু সকল নাশ করেন, সে বসতবাড়ীতে বন্য গোধূমের চরুপাক করিয়া, রুদ্রের উদ্দেশ্যে যাগ করিবে। ......নিষাদজাতীয় স্থপতি এই যজ্ঞ করিবে।

মূলের "নিষাদ-স্থপতি" সম্বন্ধে তর্ক উঠিয়াছে,—এই পদের অর্থ "নিষাদগণের স্থপতি (অধিপতি)" না "নিষাদজাতীয় স্থপতি"? শেষোক্ত ব্যাখ্যার অনুকূলে কর্ক লিখিয়াছেন,—"নিষাদদ্রব্যং হি দক্ষিণা শ্রূয়তে। কূটং দক্ষিণা কাণো বা গর্দ্দভ ইতি।" অর্থাৎ, নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতির বচনে নিষাদের দ্রব্যই দক্ষিণাস্বরূপ বিহিত হইয়াছে। "(এই ইষ্টির) দক্ষিণা, পশুবন্ধনের জাল বা ফাঁদ (কূট) (৮) অথবা কাণা গাধা।" মীমাংসাসূত্রের ভাষ্যে (৬।১।৫২) শবর "কূটং দক্ষিণা" এই

(৭) তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, ১৬।৬।৭ ; কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র, ২২।২৬—২৯।

(৮) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বিদ্যারত্নের উপদেশানুসারে অনূদিত হইল।

এবং "শাকটায়ন" মনে করেন,—"পঞ্চজনাঃ"র: অর্থ, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ, এবং পঞ্চম "নিষাদ জাতি"। যাস্ক (১০।৩।৫,৭) স্বয়ং দুইটি ঋকের ব্যাখ্যায় "পঞ্চকৃষ্টী"র অর্থ লিখিয়াছেন,—"পঞ্চ মনুষ্যজাতানি"। তাহার ব্যাখ্যায় দুর্গাচার্য্য "পঞ্চ মনুষ্যজাতানি"র অর্থ লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণপ্রমুখান্ নিষাদপঞ্চমান্ বর্ণান্।" সুতরাং ঋষিগণ "পঞ্চজনাঃ" বা "পঞ্চকৃষ্টী" যে অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকুন, প্রাচীন বেদব্যাখাতৃগণ নিষাদকেই বৈদিক যুগের পঞ্চম বর্ণ বা পঞ্চম জাতি বলিয়া মনে করিতেন। যজুর্বেদের "রুদ্রাধ্যায়ে" (তৈ, সং, ৪।৫।৪) নিষাদ জাতির প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীকে তিন রাত্রি ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে, তিন রাত্রি বৈশ্যগণের মধ্যে, এবং তিন রাত্রি নিষাদগণের মধ্যে বাস করিতে হইত। (৭) কাত্যায়ন (২২।৩০) নিষাদের লক্ষণ লিখিয়াছেন.—

"গ্রাম্যভোজনং নিষাদানাং মৃন্ময়াপানং চ।"

"নিষাদগণ অসভ্যের খাদ্য খায়, এবং মাটীর ভাণ্ডে জল পান করে।"

অধিকারিনিরূপণ প্রসঙ্গে কাত্যায়ন (১।১২) লিখিয়াছেন—

"নিষাদস্থপতির্গাবেধুকেঽধিকৃতঃ॥"

নিষাদজাতীয় অধিপতির (স্থপতির) বন্য গোধূমের চরুর দ্বারা যজ্ঞ করিবার অধিকার আছে।

এই সূত্রের ভাষ্যে কর্ক এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"যস্য রুদ্রঃ পশূন্ শময়েৎ স বাস্তমধ্যে রৌদ্রং গাবেধুকং চরুং নির্বপেদিতি। ......এতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েদিতি।"

রুদ্র যাহার পশু সকল নাশ করেন, সে বসতবাড়ীতে বন্য গোধূমের চরুপাক করিয়া, রুদ্রের উদ্দেশ্যে যাগ করিবে। ......নিষাদজাতীয় স্থপতি এই যজ্ঞ করিবে।

মূলের "নিষাদ-স্থপতি" সম্বন্ধে তর্ক উঠিয়াছে,—এই পদের অর্থ "নিষাদগণের স্থপতি (অধিপতি)" না "নিষাদজাতীয় স্থপতি"? শেষোক্ত ব্যাখ্যার অনুকূলে কর্ক লিখিয়াছেন,—"নিষাদদ্রব্যং হি দক্ষিণা শ্রূয়তে। কূটং দক্ষিণা কাণো বা গর্দ্দভ ইতি।" অর্থাৎ, নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতির বচনে নিষাদের দ্রব্যই দক্ষিণাস্বরূপ বিহিত হইয়াছে। "(এই ইষ্টির) দক্ষিণা, পশুবন্ধনের জাল বা ফাঁদ (কূট) (৮) অথবা কাণা গাধা।" মীমাংসাসূত্রের ভাষ্যে (৬।১।৫২) শবর "কূটং দক্ষিণা" এই

(৭) তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, ১৬।৬।৭; কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র, ২২।২৬—২৯।

(৮) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বিদ্যারত্নের উপদেশানুসারে অনূদিত হইল।

শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—"ইতি নিষাদস্য দ্রব্যং দর্শয়তি। কূটং হি নিষাদানামেবোপকারকং ন আর্য্যানাম্।" অর্থাৎ, 'কূট দক্ষিণা' এই বাক্যে নিষাদের দ্রব্যই উল্লিখিত হইয়াছে। কূট বা পশুবন্ধনের জাল নিষাদগণের উপকারক বা প্রয়োজনীয়, আর্য্যগণের নহে।

এই সকল বচন-প্রমাণ হইতে দেখা যাইবে, বৈদিক যুগে নিষাদগণ আর্য্য-নিবাসের নিকটে স্বতন্ত্র ভাবে স্বজাতীয় অধিপতিগণের অধীনে বাস করিত। ফাঁদ পাতিয়া পশুবন্ধন ইহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। ব্রাহ্মণেরা নিষাদ-জাতীয় অধিপতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত রৌদ্রযাগে ঋত্বিকের কার্য্য করিতেন, এবং ফাঁদ বা কাণা গাধা দক্ষিণাস্বরূপ লাভ করিয়াই তৃপ্ত হইতেন। যখন সুসভ্য আর্য্য ও অসভ্য নিষাদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল, তখন নিষাদজাতীয় সর্দ্দারগণকে সহজে বশীভূত করিবার জন্য এইরূপ যজ্ঞ ও এইরূপ দক্ষিণা বিহিত হইয়া থাকিতে পারে।

পুরাণোক্ত বেণরাজার উপাখ্যানে নিষাদগণের আকৃতিপ্রকৃতির উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বেণরাজা বৈদিক যাগযজ্ঞের একান্ত বিরোধী ছিলেন। এই নিমিত্ত ঋষিগণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। তখন পৃথিবীতে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।

"ততঃ সংমন্থ্য তে সর্ব্বে মুনয়স্তস্য ভূভৃতঃ।
মমন্থুরূরুং পুত্রার্থম্ অনপত্যস্য যত্নতঃ॥
মথ্যতশ্চ সমুত্তস্থৌ তস্যোরোঃ পুরুষঃ কিল।
দগ্ধস্থূণাপ্রতীকাশঃ খর্ব্বটাস্যোঽতিহ্রস্বকঃ॥
কিং করোমীতি তান্ সর্ব্বান্ বিপ্রান্ প্রাহ ত্বরান্বিতঃ।
নিষীদেতি তমূচুস্তে নিষাদ স্তেন সোঽভবৎ॥
ততস্তৎসম্ভবা জাতা বিন্ধ্যশৈলনিবাসিনঃ।
নিষাদা মুনিশার্দ্দূল পাপকর্ম্মোপলক্ষণাঃ॥ (৯)

তার পর মুনিগণ মন্ত্রণা করিয়া পুত্র-উৎপাদনের জন্য সেই অপুত্রক রাজার উরু ঘর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার মথিত উরু হইতে দগ্ধ স্তম্ভের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, চিপিট-নাসিকা ও বদনবিশিষ্ট খর্ব্বকায় এক জন পুরুষ উত্থিত হইলেন; সেই পুরুষ ত্রস্ত বিপ্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি করিব?" তাঁহারা বলিলেন, উপবেশন কর। [ নিষীদ ]; এই জন্য সে 'নিষাদ' হইল। হে

(৯) বিষ্ণুপুরাণ ১।১৩।৩১—৩৬

মুনিশার্দ্দূল! বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী পাপকর্ম্মের চিহ্নে চিহ্নিত নিষাদগণ তাহার বংশধর।”

ভাগবতপুরাণোক্ত বেণোপাখ্যানে নিষাদের এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় (৪।১৪।৪৪)—

“কাককৃষ্ণোঽতিহ্রস্বাঙ্গো হ্রস্ববাহুর্ম্মহাহনুঃ।
হ্রস্বপান্নিম্ননাসাগ্রো রক্তাক্ষস্তাম্রমূর্দ্ধজঃ॥”

পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে (২৭।৪২—৪৩) নিষাদের বংশধরগণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে —

“পর্ব্বতেষু বনেষ্বেব তস্য বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
নিষাদাশ্চ কিরাতাশ্চ ভিল্লানাহলকাস্তথা॥
ভ্রমরাশ্চ পুলিন্দাশ্চ যে চান্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।”

বায়ুপুরাণে—উক্ত হইয়াছে (৬২।১২৩—১২৪)—

“নিষাদবংশকর্ত্তাঽসৌ বভূবানন্তবিক্রমঃ।
ধীবরানসৃজৎ সোঽপি বেণকল্মষসংভবান্॥
যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াঃ বর্বরা স্তবরাঃ খসাঃ।
অধর্মরুচয়শ্চাপি সংভূতা বেণকল্মষাৎ॥”

বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী বর্ব্বর জাতিনিচয়কে কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি ও চিপিট-নাসিকা-মুখসম্পন্ন নিষাদের বংশধর বলিয়া গণনা করিয়া, পুরাণকারগণ সুন্দর নৃতত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মধ্য-ভারতের পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী ভিল, গোন্দ, ওরাঁও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, শবর, জুয়াং, খন্দ প্রভৃতি জাতি আকারে এখনও অনেকটা পৌরাণিক নিষাদের সদৃশ। সুতরাং আকৃতির হিসাবে, এই সকল জাতিকে একবংশোদ্ভব মনে করা বিজ্ঞানসম্মত। বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে নিষাদ জাতির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা একত্র পাঠ করিলে অনুমান হয়, নিষাদাকৃতি মনুষ্যগণই আর্য্যাবর্ত্তের আদিম অধিবাসী ছিল। আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ ইহাদিগকে হয় বশীভূত ও অন্ত্যজ জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন, না হয় সন্নিহিত আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাপথের দ্রবিড়ভাষাভাষী পনিয়ান, কাদির, কুরুম্বা, সোলাগা, মলবেদর, ইরুলা, কণিকর প্রভৃতি জাতিও আকারে বিন্ধ্যবাসী ভিল, গোন্দ প্রভৃতির অনুরূপ। সুতরাং ইহাদিগকেও নিষাদবংশীয় মনে করা যাইতে পারে। সার হার্বার্ট রিস্‌লি মধ্যভারতের ও দাক্ষিণাপথের পার্ব্বত্য প্রদেশের এই সকল বর্ব্বর অধিবাসিগণকে সুসভ্য তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মলয়ালম্-ভাষাভাষী জনগণের সঙ্গে একই আকৃতিক জাতির (physical type)

"দ্রাবিড়-আকৃতি" (Dravidian Type)। রিস্‌লি তাঁহার "The People of India" গ্রন্থের চতুর্থ পরিশিষ্টে (Appendix IV, p, cxiii) এই দ্রাবিড় শাখার বিভিন্ন জাতির লোকের নাসিকার ও দেহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণফলের যে সারাংশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এরূপ শ্রেণীবিভাগ যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। এই তালিকার পেরিয়া ও ইরুলার মধ্যে একটি রেখা টানিয়া, রেখার উপরে উল্লিখিত সুসভ্য দ্রবিড়ভাষাভাষী জাতিনিচয়কে এক শ্রেণীতে, এবং নীচে উল্লিখিত বর্ব্বর আরণ্যক জাতিনিচয়কে স্বতন্ত্র এক শ্রেণীতে গণনা করিতে প্রবৃত্তি হয়। তুলনার জন্য নাসিকার উচ্চতা ও প্রশস্ততার অনুপাত (১০) বা নাসিকার অনুপাত ও দেহের দৈর্ঘ্য এ স্থলে বিবেচ্য। রেখার উপরিভাগে উল্লিখিত জাতিনিচয়ের নাসিকার গড় অনুপাত ৬৯'১ হইতে ৮০র মধ্যে ; এবং নীচে উল্লিখিত জাতিনিচয়ের নাসিকার গড় অনুপাত ৮০'৯ হইতে ৯৫'১এর মধ্যে। ইহার তাৎপর্য্য, উপরের শ্রেণীতে যেরূপ নাসিকা সর্ব্বাপেক্ষা চিপিট বা স্থূল বলিয়া গণ্য, নীচের শ্রেণীতে সেইরূপ নাসিকাই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। সুতরাং নাসিকার হিসাবে এ স্থলে শ্রেণীবিভাগ আবশ্যক। এরূপ শ্রেণীভেদ সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে, নাসিকার এই আকারভেদ জাতি বা বংশভেদজনিত নহে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেদজনিত। উত্তরে বক্তব্য এই যে, (১১) নীলগিরি পর্ব্বতে একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ইরুলা, কুরুম্বা, টোডা,

(১০) *Nasal height*—anatomical landmarks : (i) above, the *nasia* ; (ii) below, the nasal septum, at its union with the upper lip (deep pressure is not to be exerted in making the measurement). *Nasal width*—the outer surface of the ala of the nose on each side. The maximum width to be measured without pressure on the nose. Nasal index (নাসিকার অনুপাত) $\frac{\text{width} \times 100}{\text{height}}$ Instrument—Flowers, callipers.

(১১) Thursten is *lensles and Tribes of Southern India*, Vot. I. p. xxxiii.

কোটা ও বদগা জাতি বাস করিয়া আসিতেছে। অথচ ইরুলা ও কুরুম্বাগণের নাসিকা একান্ত স্থূল, কিন্তু টোডা, কোটা ও বদগাগণের নাসিকা সভ্য দ্রাবিড়গণের নাসিকার ন্যায় মধ্যমাকার। (১১) আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে পাসি, চামার, মুসাহার ও অন্যান্য জাতি একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছে। কিন্তু পাসি, চামার ও মুসাহারগণের নাসিকা স্থূল, অথচ অন্যান্য জাতির নাসিকা মোটের উপর সূক্ষ্ম বা মধ্যমাকার। সুতরাং এ স্থলে আকৃতিভেদ পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদ-জনিত মনে করা যায় না। ইরুলা

কুরুম্বা, সাঁওতাল, ভিল প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বাকার, চিপিটনাসিক পার্ব্বত্য জাতিনিচয়কে সুসভ্য তামিল তেলুগুগণ হইতে স্বতন্ত্রবংশোদ্ভব বলিয়া গণনা করাই সঙ্গত। রিস্‌লি ব্যতীত অন্যান্য পাশ্চাত্য নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাই করিয়া থাকেন, এবং ইরুলা, ভিল প্রভৃতি জাতিনিচয়কে প্রাক্‌-দ্রাবিড় (Pre-Dravidian) নামক স্বতন্ত্র-আকৃতিক জাতির মধ্যে গণনা করেন। প্রাক্‌দ্রাবিড় অপেক্ষা বৈদিক ও পৌরাণিক "নিষাদ" সংজ্ঞাই আমার সমীচীনতর বোধ হয়। সুতরাং

"কাককৃষ্ণোঽতিহ্রস্বাঙ্গো হ্রস্ববাহুর্ম্মহাহনুঃ
হ্রস্বপান্নিম্ননাসাগ্রো"

ভারতবর্ষীয় অধিবাসিগণকে "নিষাদ জাতি" (Nisada Race) বলিয়া অভিহিত করিব।

ভারতবর্ষের বাহিরে সিংহলের বেদ্দাগণ এবং মলয় উপদ্বীপের সকাই ও সেমাঙ্গ প্রভৃতি জাতি নিষাদাকৃতি। (১২) ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে নিষাদ জাতির আরও দূরবর্ত্তী জ্ঞাতিগণের ও ইহাদের আদিমবাসভূমিরও কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালের নিষাদগণ তিনটি পৃথক্‌ শ্রেণীর ভাষা ব্যবহার করে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর প্রভৃতি "মুণ্ডা"-শ্রেণীভুক্ত ভাষা ব্যবহার করে; ভিলেরা আর্য্য ভাষা ব্যবহার করে; এবং গোন্দ, খণ্ড, ইরুলা প্রভৃতি জাতি "দ্রাবিড়" শ্রেণীর ভাষানিচয় ব্যবহার করে। মুণ্ডা শ্রেণীর ভাষাই নিষাদ শ্রেণীর আদিম ভাষা, এবং আর্য্য ও দ্রাবিড় ভাষা এই শ্রেণীর কোনও কোনও জাতি সভ্যতর প্রতিবেশিগণের নিকট হইতে ধার করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আসামের খাসিয়া পাহাড়ের খাসিয়াগণের ভাষার সহিত মুণ্ডা ভাষার সম্পর্ক লক্ষিত হয়, এবং ডাক্তার ষ্টেন কনো দেখাইয়াছেন,—পঞ্জাবের অন্তর্গত কুনাওয়ার হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত বিস্তৃত হিমালয় প্রদেশে কথিত অনেক তিব্বতী-ব্রহ্ম শ্রেণীর ভাষায় মুণ্ডা শ্রেণীর কোনও প্রাচীন ভাষার চিহ্ন অদ্যাপি লক্ষিত হয়। সুতরাং এক সময় হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত এবং পঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত ভূভাগ যে মুণ্ডাভাষাভাষী নিষাদগণ কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। মুণ্ডা ভাষার সহিত নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণের ভাষার, মলয় উপদ্বীপে কথিত মন্‌খমের শ্রেণীর ভাষার, এবং পলং, ওয়া, রিয়াং, সকাই, সেমাং প্রভৃতি জাতির কথিত ভাষানিচয়ের সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। স্মিথ নামক এক জন পণ্ডিত এই সুবৃহৎ ভাষা-

গোষ্ঠীকে "অষ্ট্রো-এসিয়াটিক্" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন, এবং যাহারা এই সকল ভাষা ব্যবহার করে, তাহাদিগকে "অষ্ট্রো-এসিয়াটিক জাতি" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। স্মিথ অনুমান করেন, ভারতবর্ষই এই জাতির আদি-নিবাস-ভূমি।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

---

# সিন্ধু-সঙ্গীত।

১

আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে ?
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে ?
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন,
তোমার সঙ্গতে তারে ফুটালে কেমন ?
সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করিছে আকুল।
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী
তব গীতে ওগো সিন্ধু! দিবস যামিনী!

২

তোমায় আমায় যোগ ওগো পারাবার!
কোন্ দেশে কোন কালে কোন পরপার
উদারা মুদারা তারা বল কোন গ্রামে ?
কোন মহাশবদের কোন নিত্যধামে ?
কোন সঙ্গীতের কোন্ রাগিণীর প্রাণে ?
কোন সুরে, কোন তালে, কোন মহাগানে ?
অনাদি অনন্ত নিত্য মহাপ্রাণ হ'তে
দু'জনে এসেছি যেন দুটি প্রাণ-স্রোতে!
তার পর কতবার জনমে জনমে
আমরা মিলেছি দোঁহে মরমে মরমে,
কতবার ছাড়াছাড়ি, মিলেছি আবার
তুমি আর আমি আজ ওগো পারাবার।

তুমি ভেসে যাও সখা! অনন্তের পানে,
আমি যে ভেসেছি শুধু তোমারি এ গানে!

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস।

---

# সহযোগী সাহিত্য।

## সাহিত্যের উপাদান।

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক পত্রে সাহিত্যের উপাদান (The Elements of literature) শীর্ষক একটি সুন্দর সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সন্দর্ভ অবলম্বনে মার্কিণের অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক-পত্রে আলোচনা চলিতেছে। লেখক অধ্যাপক হর্টন (Proff. Horton) বলেন যে, নিম্নলিখিত কারণেই সাহিত্যের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়া থাকে :—

(১) ধর্ম্ম না থাকিলে সাহিত্য হয় না। পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির সাহিত্যের বনীয়াদ ধর্ম্ম। সকল দেশের সকল সাহিত্যের মূলে ধর্ম্ম আছেই।

(২) সাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তৃতি ঘটে Mysticism and Transcendentalism অর্থাৎ অজ্ঞেয়তাবাদে ও পরাতত্ত্ববাদে। এমন কি, প্রণয়ের কথাতেও তথন অজ্ঞেয়তাবাদ ও পরাতত্ত্ববাদ যেন জড়ান মাখান থাকে।

(৩) বিলাস ও দেহাত্মবাদ (Materialism) প্রবল হইলে সাহিত্যের অবনতি ঘটে। দেহাত্মবাদ প্রবল হইলে সে জাতির মধ্যে উচ্চাঙ্গের কাব্য-সৃষ্টি হয় না। ইংলণ্ডের শেষ কবি টেনিসন্; তাহার পর কেবল খুচরা কবির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল কবি কেবল গীতিকাব্য রচনা করিয়া শ্রান্ত হইতেছেন।

(৪) সাহিত্যে সংরক্ষণের (Conservation) চেষ্টা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। যথন নূতন সৃষ্টি হয়, তথন ঘর গোছাইবার অবসর থাকে না। মিল্টন বেকনের সময়ে কয়থানা Encyclopædia বা বিশ্বকোষের সৃষ্টি হইয়াছিল? আর এখনই বা এত কেন? এখন সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে একটা করিয়া বিশ্বকোষের সৃষ্টি হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই, এখন আর নূতন সৃষ্টি হইতেছে না, যাহা পুরাতন আছে, তাহা সাম্‌লাইবার কাল আসিয়াছে।

(৫) সাহিত্যে বিভীষিকা সাহিত্যের অবনতির একটি প্রধান কারণ।

আশা ও আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয় না। যতদিন মানুষ ভবিষ্যতের অজ্ঞেয় যবনিকা ভেদ করিতে চেষ্টা করিবে, ততদিন কাব্যের সৃষ্টি ও সাহিত্যের পুষ্টি হইবে। কিন্তু যে দিন হইতে মানুষ ইহকাল লইয়া ব্যস্ত থাকিবে, পরকালের ভাবনা ভাবিতে গেলেই ভয়ে শিহরিয়া উঠিবে, সেই দিন হইতে জাতির সাহিত্যের অবনতির সূত্রপাত হইবে। ইউরোপের তথা মার্কিণের সাহিত্যে এই বিভীষিকার ভাব প্রবেশ করিয়াছে; সাহিত্যেও অপচয় ঘটিতেছে। জীবনের প্রধান বিভীষিকা, মৃত্যু। মরণ আছে বলিয়াই আমরা ভয় পাই। মরিতে না হইলে আমরা কিছুতেই ভীত হইতাম না। মরণ-ভয়ই সকল ভয়ের মূল। ধর্ম্ম ও সাহিত্য এই মরণ-ভয়কে ছোট করিয়া দেয়; মরণের পরপারে একটা ভাব-জগতের সৃষ্টি করিয়া, মরণকে নব-জীবনের দ্বারস্বরূপ করিয়া, মৃত্যুর বিভীষিকাকে অতি ক্ষুদ্র করিয়া দেয়। কিন্তু মানুষ যখন দেহ-সুখী হয়, ভোগায়তন দেহের তুষ্টি পুষ্টিতে বিব্রত থাকিয়া মানুষ যখন অতীত ও অনাগতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে, তখনই এই বিভীষিকা নানা আকারে তাহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সাহিত্যে এই বিভীষিকা একবার প্রবেশ করিলে পরে আর কখনই প্রতিভার বিকাশ হয় না। প্রতিভার দামিনী-দীপ্তি না থাকিলে সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি আর হয় না। নূতন সৃষ্টি না হইলে সাহিত্য শুষ্ক হইয়া যায়।

এই পাঁচটি সিদ্ধান্ত ছাড়া লেখক আর একটা নূতন কথা কহিয়াছেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি জাপানী, চীনে, ভারতবাসী ও তুর্কী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। তিনি তাঁহাদের মনীষার উন্মেষভঙ্গী দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,—আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা do not co-ordinate with the genius of the East—প্রাচী-সংস্কারের সমবায়ী নহে। অর্থাৎ, প্রাচ্য প্রকৃতির অনুকূল নহে। এ শিক্ষা ও সভ্যতা অবলম্বনে প্রাচ্যজাতি সকল কেবল অনুচিকীর্ষু হইয়া পড়িবে—কেবল পাশ্চাত্যগণের নকলনবীশ হইবে। ফলে, উহাদের National individualism বা জাতিগত বিশিষ্টতা নষ্ট হইবে। জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতা অবলম্বন করিয়া প্রবল হইয়াছে বটে; পরন্তু জাপানের যাহা নিজস্ব ছিল—যে সৌন্দর্য্যলিপ্সা ও মাধুর্য্য-উপভোগসামর্থ্য, যে কোমলতা ও স্বজনপরায়ণতা নিজস্ব ছিল—তাহা হারাইতেছে। নিজস্ব সর্ব্বস্ব হারাইতেছে বলিয়াই, জাপান রুষবিজয়ী হইলেও, জাতির পুরাতন সাহিত্যের পুষ্টি করিতে পারিতেছে না। সুতরাং বলিতে হয় যে, জাপানের জাতিগত বিশিষ্টতা দীর্ঘকাল-

স্থায়ী হইবে না। যদি এই পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্ঘাতে জাপানে পুরাতন ও সনাতন সাহিত্যের পারম্পর্য্য বজায় রাখিয়া এক নূতন ও প্রবল সাহিত্যের ও ধর্ম্মের উদ্ভব হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, জাতির মেদমজ্জার সহিত এই পাশ্চাত্য সভ্যতা মিশিয়া গিয়াছে। তাহা যখন ঘটে নাই, ঘটিবার কোনও উপক্রম দেখিতেছি না, তখন হয় বলিতে হইবে যে, জাপানের অঙ্গে এই পাশ্চাত্য সভ্যতা পাতলা এক পোঁছ পালিশ্ মাত্র; নহে ত বলিতে হইবে, জাপান 'কাচমূল্যে কাঞ্চন বেচিয়াছে'। উহার জাতিগত বিশিষ্টতা চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়াছে। চীনের ভাগ্যও যে জাপান অপেক্ষা ভাল হইবে, এমনও বলা যায় না। ইহারা সবাই পাশ্চাত্য সভ্যতা অবলম্বন করে বিলাসের খাতিরে, সর্ব্বশক্তিমান ডলার বা অর্থের অন্বেষণে, কদাচিৎ বা ইংরেজের সহিত সমকক্ষতা করিবার চেষ্টায়। এমন হীন উদ্দেশ্যে (culture for such serdid ends) শিক্ষা ও সাধনা কখনই সার্থক হয় না। উহার ফল বিষম হইবেই। এই হেতু অধ্যাপক বলেন যে, প্রাচ্যগণকে পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়া ঠিক নহে।

## এডিসনের মত।

মার্কিণের বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ ও তড়িদ্বিদ্যাবিশারদ এডিসন সাহেবকে এই সন্দর্ভ অবলম্বনে একটা মত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি বলেন যে, "মিল্টন, বেকন, দান্তে, সেক্সপীয়রের সাহিত্য যাহা করিবার, তাহা করিয়াছে। যে মানবতার উন্মেষ ঘটাইলে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্ভবপর হয়, তাহা মিল্টন বেকন প্রমুখ প্রতিভাশালী কবিগণ করিয়া গিয়াছেন। এখন সে প্রয়োজন নাই, তাই তেমন কবি ও লেখক জন্মগ্রহণ করিতেছে না। ইহা ভাবের যুগ নহে, খেয়াল-কল্পনার যুগ নহে; ইহা কর্ম্মযুগ, আবিষ্কারের যুগ— প্রকৃতি-দেবীর অবগুণ্ঠন-মোচনের যুগ। এখনকার সাহিত্য পদার্থতত্ত্ব লইয়া পূর্ণ থাকিবে। এখনকার কবিতা কল্পনা নহে; যাহা দেখিতেছি, বুঝিতেছি, শুনিতেছি, তাহারই বর্ণনা। এখনকার সাহিত্য সৃষ্ট জগতের চাতুরী-বিকাশে প্রমত্ত থাকিবে। মিল্টন, চসারের মাপকাঠীতে এখনকার সাহিত্য মাপিলে চলিবে না। সাহিত্য জাতির প্রকৃতির পরিচায়ক; জাতির যেমন প্রকৃতি হইবে, সাহিত্যও সেই আকার ধারণ করিবে। সে জন্য চিন্তা করিতে নাই, বিহ্বল হইতে নাই। তবে জাতির উত্থান পতন যে বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সে বিধি মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। সুতরাং তাহার জন্যও চিন্তিত হইতে নাই। তবে ইহা আমি স্বীকার করি যে, সাহিত্যে বিভীষিকা জাতির অধঃপতনের লক্ষণ বটে।

চীন জাপানের কথা তুলিয়া অধ্যাপক যাহা বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে আমি এই বলিতে পারি যে, খৃষ্টান ইউরোপ খৃষ্টানী সভ্যতা এসিয়া মহাদেশ হইতে পাইয়াছিল ; মানব সারাসেন ও আরব সভ্যতার কাছে সভ্যতার বর্ণপরিচয় করিয়াছিল ; অথচ ইউরোপ এই পাঁচ শত বৎসরে একটা নিজস্ব সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। চীন ও জাপান সেই পন্থা অবলম্বন করিবে না, বা করিতে পারিবে না, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। পাশ্চাত্যগণ অপেক্ষা প্রাচ্য জাতি সকলের অধিকতর উপযোগিতা শক্তি-(adaptability) আছে। আমার মনে হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সজ্ঘাতে একটা অভিনব সভ্যতা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে। সে পক্ষে যিনি অন্তরায় হইবেন, তিনি মনুষ্যসাধারণের শত্রুতা করিবেন।”

এই Interview বা পরিচয়-বিবৃতি বোম্বাইয়ের কোনও একখানা দৈনিক কাগজে ছাপা হয়। আমি তাহারই সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# আমাদের জ্যোতিষ।

ভারতবর্ষ, মিশর ও বাবিলোন প্রভৃতি দেশে যখন অতি প্রাচীন কালে মানব-সভ্যতা বিকশিত হইতেছিল, তখন দেশনিষ্ঠ প্রাকৃতিক অবস্থার ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করিতেছিল। বৈদিক যুগের গ্রন্থ পড়িয়া এইরূপ অনুমান হয় যে, যজ্ঞক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবার নিমিত্ত কতকগুলি নক্ষত্রের গণনা ব্যতিরিক্ত অন্য কোনরূপ জ্যোতিষী গণনার খুব অধিক ব্যাবহারিক প্রয়োজন ছিল না। অনেক বিষয়ের জ্ঞানেই ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তাড়নার অভাবে জ্যোতিষ সম্বন্ধে হয় ত বা এ দেশে মিশর কিংবা বাবিলোনের মত উন্নতি হয় নাই। যাঁহারা এ কালের জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং প্রাচীন সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের বিশেষ পরিচয় আছে, তাঁহারা এ বিষয়ের বিশেষ তথ্য নিরূপণ করিয়া আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন। স্বদেশ-প্রীতির প্রেরণায় অনেক সুযোগ্য ব্যক্তি এই ইতিহাসের কথা শুনাইতে গিয়া এত কাল্পনিক কথা বলিয়া থাকেন যে, আমরা যথার্থ ইতিহাসটুকু ধরিয়া উঠিতে পারি না।

সম্ভবতঃ যে যুগে রাশিচক্র প্রভৃতি বিষয়ে এ দেশে কাহারও কোনও প্রকার

জ্ঞান ছিল না, অনেকে সেই যুগের সাহিত্যের এমন রূপক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, যাহাতে সেই সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাদিগকেই রাশিচক্র হইয়া দাঁড়াইতে হয়! মহাভারত সম্বন্ধে এইরূপ হাস্যকর ব্যাখ্যা পড়িয়াছি। যাহাতে জ্যোতিষ-বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানের কথা লিখিত হইবার কথা, সেই জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থে যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলে, পুরাণের কিংবা গল্প-গ্রন্থের নিগূঢ় ব্যাখ্যা করিয়া সেই জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া চলে না। যদি জ্যোতিষের জ্ঞানের ধারাবাহিক উন্নতির ইতিহাস থাকিত, তাহা হইলে সাহিত্য এত অধিকপরিমাণে বুদ্ধির খেয়ালে রচিত জালে জড়িত হইত না। যে শ্রেণীর লোক ক্রমাগতই বুদ্ধি খাটাইয়া পুষ্পক রথের নাম অবলম্বনে প্রাচীন কালের ব্যোমযানের কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কেহ থামাইতে পারিবে না; তবে বিতণ্ডাবুদ্ধিবিরহিত পাঠকেরা অনেক শিখিতে পারিবেন, এবং অনেক ভ্রম হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন।

এ দেশে প্রাচীনকালে জ্যোতিষের কত উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে গোটাকতক গোড়ার কথা স্থির করিয়া লইতে হয়। কথাগুলি এই—সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই সেকালে ও একালে সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দেখিয়া কতকগুলি গণনা সহজেই হইতে পারিয়াছে। জ্ঞানের সূক্ষ্মতা ও উন্নতির বিচার করিতে হইলে দেখিতে হয় যে, সে সহজলভ্য তত্ত্ব-সংগ্রহের পর কি কারণে কোন্ জাতি কত অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের সহজদৃষ্টিতে যেগুলি ধরিতে পারা যায়, এমন গোটাকতক কথা বলিতেছি।

(১) জ্যোতিষ্কেরা অত্রির নয়নসমুত্থ কি না, অথবা ঐ কথাটার মধ্যে কোনও একটা নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতত্ত্ব লুকাইয়া আছে কি না, সে সকল কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, এটুকু সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোনও মানবসমাজের বিবরণ পাওয়া যায় নাই, যাহাদের মধ্যে সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের সহিত পরিচয়ের অভাব জানিতে পারা গিয়াছে। অতি বর্ব্বরের নিকটেও জ্যোতিষ্কপুঞ্জ বিস্ময় ও ধ্যানের বিষয়। সূর্য্যের উদয় অস্ত হইতে দিবারাত্রির গণনা হয়; ঋতুভেদে উত্তাপের ন্যূনাধিক্য ঘটে, এবং ঋতুর গণনা হইতে বৎসর-গণনা আরব্ধ হয়। কাজেই সূর্য্যের পথ ও উত্তরায়ন, দক্ষিণায়ন প্রভৃতি অতি সহজে সকল জাতির মধ্যেই গণিত হইতে পারে, এবং হইয়াছে।

(২) অতি বর্ব্বরের নিকটেও চন্দ্রের গতি ও ক্ষয়-বৃদ্ধি সুস্পষ্ট হয়। পক্ষ ও মাসগণনাও অতি সহজ কথা। এই মাসগুলি লইয়া ঋতুর সহিত

ও সূর্য্যের অয়নের সহিত মিলাইতে গেলে ৩৬০ দিনের বৎসরে কুলায় না। ৩৬০ দিনের বৎসর-গণনায় অয়নের সহিত মিলাইতে গেলে, ৩৬০ দিনের বৎসর গণনার বিদ্যাকে জ্যোতিষ বলিয়া গৌরব করিতে গেলে, গদ্য না শিখিয়া গদ্যে কথা কহিবার ক্ষমতার গৌরবের মতই হয়। বৈদিক ও পৌরাণিক গণনায় আমরা অধিমাস ধরিয়া লইয়া ৩৬৫ দিনের হিসাব বজায় রাখিয়া আসিতেছি। এই ৩৬৫ দিনে বৎসর-গণনা অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে মিশরে প্রচলিত হইয়াছিল, এবং মিশরের জ্ঞান নিরপেক্ষভাবেই বাবিলোনেও প্রচলিত হইয়াছিল। বৈদিক গণনায়ও এই ৩৬৫ দিনের বিচার আছে; কিন্তু বৈদিক যুগের বয়স এখনও নির্ণীত হয় নাই।

(৩) যাহারা নিতান্ত অসভ্য অবস্থা হইতে একটু উন্নতিলাভ করিয়াছিল, এবং বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জ্যোতিষ্কপুঞ্জ দেখিতে দেখিতে উহাদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহারাই নক্ষত্রে নক্ষত্রে একটা প্রভেদ বুঝিতে পারিয়াছিল। নক্ষত্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, ওগুলি যেন ঠিক্ যথাস্থানে অবস্থিত থাকিয়া, অর্থাৎ relative position বজায় রাখিয়া চলিতেছে। অনুসন্ধানটা কিঞ্চিৎমাত্র সূক্ষ্ম হইবার পর ইহাও সহজে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল যে, গোটাকতক জ্যোতিষ্কের গতি সাধারণ রীতির অন্তর্ভুক্ত নহে। পাঁচটি তারার আপেক্ষিক অবস্থিতি সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। এই পাঁচটি মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি নামে অভিহিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর গণনা এখন সহজ মনে হইলেও, এক সময়ে উহা খুব সূক্ষ্ম গণনাই ছিল। প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র না পড়িলেও সাধারণ সাহিত্য হইতেই উহা সুস্পষ্ট হয়। ইতিহাসে পড়িয়া থাকি যে, মিশর ও বাবিলোনে এ জ্ঞান বহু পূর্ব্ব কাল হইতেই ছিল।

(৪) অন্যান্য নক্ষত্রগুলি স্থির থাকিলেও সাধারণ ভাবে তাহাদের গতি ও উদয় অস্ত লক্ষিত হয়। কোনও একটি বিশেষ নক্ষত্রের প্রতি যদি দৃষ্টি রাখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক মাস পূর্ব্বে যে নক্ষত্রটি যে সময়ে যেখানে উঠিয়াছিল, এক মাস পরে তাহার উদয়ে দুই ঘণ্টা প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দুটি ঘণ্টার প্রভেদ সহজেই লক্ষিত হয়। এই সময়টি ভাগ করিয়া ঠিক দৈনিক চারি মিনিটের প্রভেদ সুস্পষ্ট লক্ষিত না হইলেও, প্রভেদ ও পরিবর্ত্তনটুকু বুঝিতে গোল থাকে না। সকল প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যেই এই জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫) এই গণনার একটু সূক্ষ্মতা হইতে এবং সূর্য্যের গতিপথের সহিত ঐ

নক্ষত্রগতি মিলাইতে গিয়া রাশিচক্রের গণনা হইয়াছে। এই রাশিগুলি গোলক চক্রপথে সমদূরবর্ত্তিরূপে স্থিত নহে; অর্থাৎ উহাদিগের দ্বারা আকাশপথটিকে সমান বারো ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায় না। এই রাশিচক্রের গণনা আমরা বিদেশ হইতে পাইয়াছি বলিয়া অনেক পণ্ডিতই বলিয়া থাকেন। সাহিত্যের মোটা বিচারে এ বিষয়ের যতটুকু সিদ্ধান্ত হইতে পারে, তাহা এই প্রবন্ধেই করিব। চন্দ্রের অয়নপথ ধরিয়া যে ২৭টি নক্ষত্রের গণনা হইয়াছে, উহা এ দেশে খুব প্রাচীন। কিন্তু রাশিচক্রের নাম বহু প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, এ কথার বিচার পরে করিতেছি।

(৬) কলাক্ষয় ও কলাবৃদ্ধি দেখিয়া চন্দ্রকে জ্যোতিঃহীন ও সূর্য্যের আলোকে প্রদীপ্ত বলিয়া অতি প্রাচীন কালের সকল জাতিই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। কেহ কাহারও নিকট হইতে তত্ত্বটা ধার করিয়া লয় নাই। যে পক্ষে যেদিক হইতে সূর্য্যের আলোক পাইবার কথা, চন্দ্রের আলোকিত কলা সেই দিকে মুখ করিয়া থাকে; এটা সকলে সর্ব্বদা দেখিতে পাইত। কবি কালিদাসের মেঘদূতে আছে—প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।

(৭) চন্দ্রটিকে যদি কোনও এক সময়ে একটি নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রের কাছে দেখিবার পর উহার আপেক্ষিক অবস্থিতির বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতিবারেই চন্দ্র সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। তাহার পর আবার ২৭ দিনের পর (২৭ দিন ৮ ঘণ্টা) চন্দ্রটি নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে প্রথম-পরিদৃষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্য্যবেক্ষণও খুব শাদা। মনে করুন, এই গণনাটা পূর্ণিমায় আরম্ভ করা গিয়াছিল; তাহা হইলে চন্দ্র যখন পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিল, তখনও উহার কলা পূর্ণ হয় নাই। সূর্য্য এই সময় যতটা পথ চলিয়া গিয়াছে, ততটা অগ্রসর হইতে, এবং পূর্ণ কলা পাইতে চন্দ্রের আরও দুই দিন লাগিবে। নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে চন্দ্রের এই স্থিতি-গণনাও বহু প্রাচীন কাল হইতে সকল সভ্য দেশেই হইয়া গিয়াছিল। সকল সভ্যদেশেই হইয়াছিল বলিলে এ কথা বুঝায় না যে, এ গণনায় সূক্ষ্মতা নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক গণনা অপেক্ষা এ গণনায় পরিদর্শন-ক্ষমতা বেশী লক্ষ্য করা যায়।

(৮) গ্রহণ-গণনার সহিত সপ্তম তত্ত্বটির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে চন্দ্রের প্রত্যাগমনে ২৭⅓ দিন লাগে; কিন্তু সূর্য্যের প্রায় ৩৪৭ দিন লাগে; অর্থাৎ, চন্দ্রের ২৪২ বার প্রত্যাগমনের সময়ে সূর্য্যের প্রত্যাগমন

লইয়াই প্রাচীন কালে ভবিষ্যৎ গ্রহণ-গণনা সুসাধ্য হইয়াছিল। কেবলমাত্র গ্রহণ দেখিয়া গ্রহণ-গণনার কথা অপেক্ষাকৃত সহজ। গ্রহণের কারণ বুঝিতে না পারিলেও গ্রহণ দেখা অসভ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। চন্দ্রগ্রহণ অপেক্ষা সূর্য্যগ্রহণ অবশ্য সহজে উপলব্ধ হয়। সময়ে সময়ে গ্রহণ দর্শন করিয়া লোকে যে ভীত ও বিস্মিত হইত, এ কালেও সে কথা এ দেশে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। কয়েকবার গ্রহণ দেখিবার পরই যে দিন গ্রহণ হয়, লোকে সে দিন বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিত। একটি মনুষ্যের পক্ষে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত এই গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ অত্যন্ত সম্ভব হইলেও, পরিদর্শন-ক্ষমতা ও কৌতূহল বেশী জাগিয়া না উঠিলে কেহই গণনা করিতে পারেন না। আজিকার দিনে যে প্রকার গ্রহণ দেখা গেল, আঠার বৎসর দশ দিন পরে প্রায় ঠিক সেই প্রকার গ্রহণ দৃষ্ট হয়। একবার এটা ধরিয়া ফেলিয়া গণনা করিলে, গণনাটা প্রায়শঃ নির্ভুল হওয়া সম্ভব।

(৯) এই মোটামুটি গ্রহণ-গণনার বিস্তার সহিত চন্দ্র সূর্য্যের প্রত্যাগমনের যে কালের কথা বলিয়াছি, তাহা মিলাইয়া লইলে, গণনা সহজ হইয়া পড়ে। তাহার উপর আবার চন্দ্র-গ্রহণ পূর্ণিমায় ও সূর্য্য-গ্রহণ অমাবস্যায় দেখিয়া নূতন কথারও আবিষ্কার হইতে পারে। ভূ-ভ্রমণবাদ জানা না থাকিলেও সাধারণ গণনাগুলিতে কোনও বাধা উপস্থিত হয় না। চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। উহাদের যখন গতিবৈষম্য আছে, তখন দুইটি সমদূরবর্ত্তী হইলে পরস্পর সংঘর্ষণ হইত; কাজেই একটা অপেক্ষা অন্যটা অবশ্যই কিছু দূরবর্ত্তী। গ্রহণটা যখন অমাবস্যা পূর্ণিমায় হয়, এবং একটা যখন ঘুরিতে ঘুরিতে অবশ্যই অন্যটার দৃষ্টিরোধ করিয়া দিতে পারে, তখন একটু সূক্ষ্ম গণনায় ধীরে ধীরে ছায়াপাতের কথাও জানা যায়। কালিদাসের রঘুবংশের ১৪শ সর্গে এই ছায়া-পাতের কথায় লিখিত হইয়াছে—

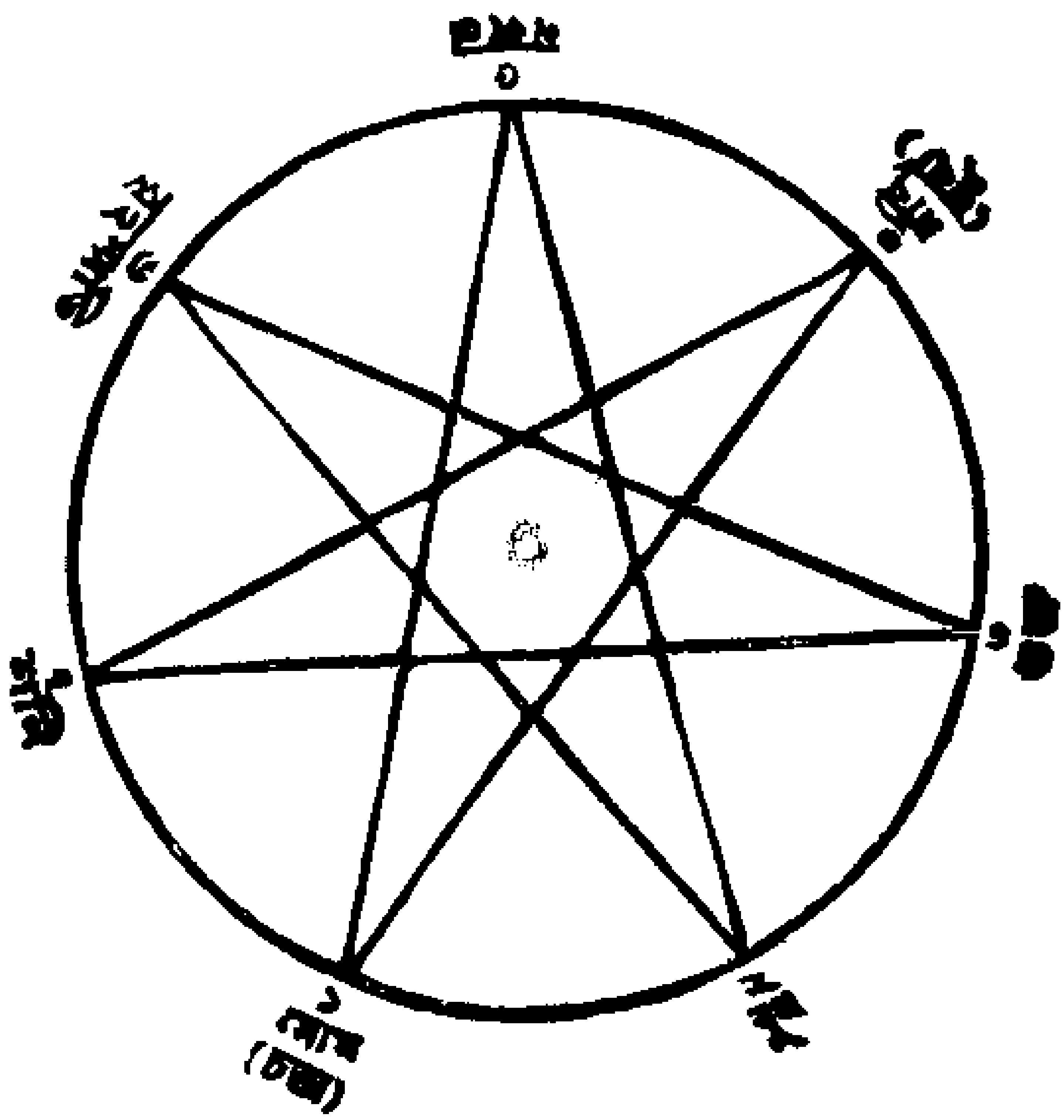
ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বে-
নারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ।

চন্দ্রের উপরকার যে দাগটা কলঙ্ক বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহা ছায়াপাতের তত্ত্ব-আবিষ্কারের পর হইতে ভূমির ছায়া বলিয়াই এ যুগে বিচারিত হইয়াছিল। জ্যোতিষীদিগের বিশুদ্ধতর তত্ত্বের আবিষ্কার কালিদাসের সময়ের পরবর্ত্তী সময়ে হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে হয়।

টলেমির (Ptolemy) "অল্‌মাগেষ্ট" খ্রীষ্টাব্দের ২য় শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত। এই গ্রন্থখানির যে সর্ব্বলোকসুবোধ্য বিবৃতি পাওয়া যায়, তাহাতে দেখিতে পাই

যে, উল্লিখিত সমস্ত গণনার কথা ছাড়াও উহাতে আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বেরও ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত ভূ-ভ্রমণবাদ আবিষ্কৃত হয় নাই, বিদেশ-বাণিজ্য, সমুদ্র-গমন প্রভৃতি সামাজিক সভ্যতার ফলে ঐ গ্রন্থের সহজ তত্ত্বগুলির মধ্যেও অনেক প্রশংসনীয় সূক্ষ্মতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশীয়দিগের জ্যোতিষের জ্ঞানের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে বসি নাই। কিন্তু এই গ্রন্থের একটি গণনার কথা উল্লেখ করিতে হইবে। রাশিচক্রের গণনা টলেমির গ্রন্থ হইতে ২য় শতাব্দীর পরে ভারতে আগত বলিয়া যে কথা আছে, তাহার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। টলেমির গণনায় যে গ্রহ পৃথিবী হইতে যত অধিক দূরে অবস্থিত, তাহার তালিকা দিতেছি। চন্দ্র পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিহিত, এবং শনি সর্ব্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত। দূরত্বের হিসাবে নামগুলি পরে পরে এইরূপ, যথা—

১। চন্দ্র (সোম)　　২। বুধ　　৩। শুক্র
৪। রবি (সূর্য্য)　　৫। মঙ্গল　　৬। বৃহস্পতি
৭। শনি।




এই গ্রহগুলি লইয়া বারের গণনা ও সপ্তাহগণনা কি প্রকারে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। বিদেশীয়দিগের মধ্যে যাহারা ফলিত জ্যোতিষ মানিত,

সাজাইয়া, একটা উল্টাপাল্টা শৃঙ্খলায় ওগুলির গণনা করিত। যাদুবিদ্যার জন্য টেড়াবাঁকা গণনাই সর্ব্বত্র প্রশস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে গ্রহের দূরত্বের হিসাবে একটি চক্রে গ্রহগুলি সাজাইয়া দিতেছি। এখন দেখুন যে, টলেমির গণনার হিসাবে সোম হইতে আরম্ভ করিয়া শনি পর্য্যন্ত গ্রহগুলি পরে পরে চক্রের উপর সাজান হইয়াছে। এখন রবি হইতে আরম্ভ করিয়া বৃত্তের মধ্যস্থ রেখাগুলির পথ দেখিয়া লউন। রবি হইতে সোম পর্য্যন্ত আসিয়া, তাহার পর সহজ ভাবে সোম হইতে মঙ্গল, মঙ্গল হইতে বুধ, বুধ হইতে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে শনিতে আসিলে, যাদুকরের ক্ষেত্রটি অঙ্কিত হইয়া যাইবে। বিদেশের বার-গণনার এই ইতিহাস।

এখানে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। (১) আমাদের দেশের কোনও জ্যোতিষী পণ্ডিতই বলেন না যে, টলেমির গণনায় পৃথিবী হইতে যে গ্রহ যত দূরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত, তাহা এ দেশের কোনও জ্যোতিষ শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। (২) টলেমির দেশের লোক যে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যে যাদুবিদ্যার ক্ষেত্র আঁকিয়া উল্টাপাল্টা পদ্ধতিতে গ্রহগুলির নাম করিয়াছে, সেই কুসংস্কার ও সেই যাদুবিদ্যা এ দেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। (৩) তবুও মজা এই যে, ভারতবর্ষে টলেমির গণনার উল্টাপাল্টা পদ্ধতি প্রভৃতি স্বীকৃত না হইয়াও, সেই কারণগুলির ফলস্বরূপে যে ভাবে রবি সোম প্রভৃতি হইতে শনিবারের পর্য্যন্ত গণনা প্রচলিত হইয়াছিল, সেই গণনাই আমাদের দেশে লক্ষ্য করিতেছি। ইহা হইতে সন্দেহটা গভীর হইয়া উঠে যে, রবি সোম প্রভৃতি ক্রমে গ্রহ লইয়া বার গণনাটা আমরা বিদেশ হইতেই পাইয়াছি। ঐ গণনার উৎপত্তির কারণ গুলির সহিত আমাদের সম্পর্ক না থাকিলেও, আমরা সাধারণ ব্যবহারে গণনার ঐ ক্রমটি লইয়াছি, এই সন্দেহটি দৃঢ়ীভূত হইবার আরও অনেক কারণ আছে। সেগুলিরও উল্লেখ করিতেছি।

বৈদিক সাহিত্যে গ্রন্থের নাম নাই, এবং গ্রহ লইয়া বার-গণনা নাই। ঐ গণনা প্রাচীন বৌদ্ধযুগের সাহিত্যে নাই, পাণিনিতে নাই, খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীর মহাভাষ্যেও নাই। মহাভারতের কোনও স্থানেই যে বারগণনা নাই, এ কথাও সকলের জানিয়া রাখা উচিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ নিশ্চয়ই খৃষ্ট পূর্ব্ব কোনও অব্দে, কিংবা খ্রীষ্টাব্দের ১ম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অন্য কারণে প্রমাণিত হয়, তাহার কোনও স্থলেই গ্রহগণনা কিংবা বারগণনা পাওয়া যায় না। সর্ব্বত্রই কেবল নক্ষত্র ও তিথি লইয়া গণনা, এবং তিথি দ্বারা

দিবসগণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সন্দেহের কথাটা কি সত্য বলিয়াই মনে হয় না?

রাশিচক্রের গণনাও বিদেশ হইতে এ দেশে আসিয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। যে ঋতুর যে প্রকার অবস্থা হইতে দ্বাদশ রাশির নাম করণ হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের ঋতু ও অবস্থার সহিত মেলে না। মেষ বৃষাদির বসন্তে সন্তানপ্রসব হইতে যদি ঐ নামের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে মেষপালক ভবঘুরে জাতির মধ্যেই ঐ নামের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। সে দেশের ঋতুগুলির সঙ্গেও রাশিগুলির মিল আছে বলিয়া পণ্ডিতদিগের মুখে শুনিতে পাই। রাশি ও রাশিচক্রের কথা আমাদের বৈদিক কিংবা তৎপরবর্ত্তী বৌদ্ধযুগের কোনও সাহিত্যে নাই।

বারের নাম সম্বন্ধে আমার আর একটা খট্‌কা আছে। আমার এ খট্‌কার কথা চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কয়েক জন ইউরোপীয় পণ্ডিতকে বলিয়াছিলাম। প্রায় খৃষ্টোত্তর পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থে রবিবারের নাম পাই "ভট্টারক বাসর"। কুত্রাপি কোনও শাস্ত্রে সূর্য্যকে "ভট্টারক" বলা হয় নাই। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর অনেক লিপিতে প্রভূত সম্পন্ন রাজাকে "ভট্টারক" বলা হইয়াছে। প্রভুর বার অর্থাৎ lords day শব্দের অনুবাদ হইতে ত উহার উৎপত্তি নয়? খৃষ্টোত্তর প্রথম শতাব্দীর কথা যাহাই হউক, ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত গান্ধার প্রভৃতি দেশের অদূরে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল, তাহার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। রবিবার বলিয়া উপবাস করিবার কথা কোনও প্রাচীন স্মৃতিতে দেখি নাই। এরূপ হইতে পারে না কি যে, ঐ যুগে গান্ধারের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে যাহারা খৃষ্টান হইয়া সে কালের নিয়মে রবিবার পালন করিত, এবং সে দিন মাছ মাংস খাইত না, ধূর্ত্তের সহিত তাহাদিগের তুলনা করিয়া পঞ্চতন্ত্র-কার পরিহাসচ্ছলেই লিখিয়াছিলেন যে, "আজ ভট্টারক-বাসরে এই তন্ত্রগুলি কেমন করিয়া দন্তে স্পর্শ করিব?" এই সময়কার অন্ত খ্রীষ্টানদের কথার বিচার যদি নাই করা যায়, তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে, এ যুগে রোমবাসীর সহিত ভারতবর্ষীয়দিগের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। ইটালীর ভাষায় রবিবারের নাম কিন্তু ঠিক্ ভট্টারকবার, বা Domenica। আমাদের দেশে বারের নাম নূতন বলিয়া এ সন্দেহও হইয়াছে যে, বৃহস্পতিবারের ইটালীয় নাম Giovdia সহিত সুরে মিলাইয়া ঐ বারের "জীববাসর" নামের

যাহাই হউক, যুগের পর যুগে যে ভাবে এ দেশে জ্যোতিষের জ্ঞান বিকশিত হইয়াছিল, আমরা তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস চাই। কয়েক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, জানি। কিন্তু এ দেশ হইতে এই তত্ত্ব-সংগ্রহের জন্য কেহ কি অগ্রসর হইবেন না? অধ্যাপক রায়সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের জ্যোতিষশাস্ত্রের যে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু খাঁটী স্বদেশের উন্নতি ও বিদেশীয় প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথাই তাঁহার গ্রন্থে অস্পষ্ট রহিয়াছে। জানি না, ঐ অস্পষ্টতা স্বদেশপ্রীতির প্রেরণায় উৎপন্ন কি না। যোগেশ বাবু যদি তাঁহার এখনকার অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে পূর্ব্বের গ্রন্থখানির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন, তাহা হইলে, প্রাচীনকালের জ্ঞানের একটি দিকের ইতিহাস জানিতে পারিয়া আমরা কৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

---

# মায়ার খেলা।

১

বৈশাখের শুক্ল পক্ষের শুভ রজনীতে প্রসন্নকুমার বেদান্তবাগীশ সংসারের একমাত্র স্নেহবন্ধন চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যা মনোরমাকে সহায়সম্পদশূন্য পিতৃহীন তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত-বংশীয়, বিদ্বান ও ধনবান পাত্রও মিলিয়াছিল; কিন্তু আজীবন স্নেহ ও আদরে প্রতিপালিতা মনোরমাকে তিনি নয়নের অন্তরাল করিতে সম্মত ছিলেন না। কোনও সদ্বংশজ দরিদ্র সচ্চরিত্র যুবককে জামাতৃপদে বরণ করিয়া নিজভবনের অনতিদূরে কন্যা-জামাতার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, বেদান্তবাগীশের এইরূপই সংকল্প ছিল। তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তির তাহারাই ত একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু এতদিন তাঁহার মনের আশা মিটে নাই; বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অনুরূপ পাত্রের কোনও সন্ধানই তিনি পান নাই।

তাই যখন কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিঃস্ব তারাপদ বেদান্ত-পাঠের জন্য কমলাপুরে আসিল, তখন হইতেই এই প্রিয়দর্শন মেধাবী

ছাত্রটির প্রতি বেদান্তবাগীশের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তারাপদর জননী ব্যতীত সংসারে আর কেহ ছিল না। আশ্রয়হীন যুবক মাতাকে সঙ্গে করিয়াই কমলা-পুরে আসিয়াছিল। অন্যত্র তাহার স্থান ছিল না। জ্ঞাতিদিগের দৌরাত্ম্যে ও অত্যাচারে ভদ্রাসনটুকু পর্য্যন্ত সে হারাইয়াছিল। গবর্মেণ্টের প্রদত্ত মাসিক বৃত্তিমাত্র তাহার ভরসা। কমলাপুরের কোনও ভদ্র ব্রাহ্মণের বহির্ব্বাটীর একটি ঘর ভাড়া লইয়া সে মাতাকে তথায় রাখিয়াছিল।

কুলে শীলে সর্ব্বাংশেই তারাপদ শ্রেষ্ঠ। বেদান্তবাগীশ এইরূপ পাত্রেরই অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কয়েক মাস পরে তিনি স্বয়ং তারাপদর জননীর কাছে কথাটা পাড়িলেন। বিধবা অত্যন্ত আগ্রহে সম্মতি দিলেন। এমন সম্বন্ধ কোথায় পাইবেন? দেশে দশে প্রসন্নকুমার বেদান্তবাগীশকে কে না চিনিত? এত বড় বৈদান্তিক সে অঞ্চলে আর কেহ ছিলেন না। দেবী ভারতীর ন্যায় জননী কমলার প্রসন্ন দৃষ্টিও ব্রাহ্মণের উপর অজস্রধারে বর্ষিত হইয়াছিল। এরূপ ঐশ্বর্য্যশালী দেশপূজ্য পণ্ডিতের একমাত্র সুন্দরী কন্যার সহিত, ভিখারী তারাপদর বিবাহ হইবে, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে?

নিজবাসগৃহের অনতিদূরে ভাবী জামাতার জন্য গৃহ নির্ম্মিত হইল। বেদান্ত-বাগীশ তারাপদর নামে উহা রেজেষ্ট্রী করিয়া দিলেন। তার পর শুভ দিনে শুভ লগ্নে বেদান্তবাগীশ নয়নপুত্তলী মনোরমাকে তারাপদর হস্তে সমর্পণ করিলেন। শুভ শঙ্খরোল, উলুধ্বনি ও প্রচণ্ড বাদ্যোদ্যমে সে রাত্রি কমলাপুর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন উৎসব সে গ্রামের লোক আর কখনও দেখে নাই।

সম্প্রদানের শেষে বেদান্তবাগীশ যখন সর্ব্বসমক্ষে তারাপদর হাত ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার অন্ধের নড়িকে তোমার হাতে দিয়া আজ নিশ্চিন্ত হইলাম", তখন উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর অনেকেরই নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল।

২

বিবাহ হইল বটে; কিন্তু মনোরমা এখনও পূর্ব্বের ন্যায় অধিকাংশ কালই পিতার পরিচর্য্যা করিত। বৈবাহিকের পাছে কোনরূপ অসুবিধা হয়, এ জন্য তারাপদর জননী পুত্রবধূকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "মা, আমার জন্য তোমার কিছু ভাবিতে হইবে না; কিন্তু দেখো, তোমার বাবার সেবার যেন কোনরূপ ক্রটী না হয়! তুমি ছাড়া তাঁর আর কেহ নাই।"

সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যত ক্ষণ বেদান্তবাগীশ মহাশয় শয়ন না করিতেন, সে পিতার সকল কার্য্যে সহায়তা করিত। যতক্ষণ তিনি আহারাদির জন্য অন্তঃপুরে থাকিতেন, সে ছায়ার ন্যায় তাঁহার পাশে পাশে বেড়াইত।

এমন স্নেহময় পিতা আর কার আছে? শৈশবেই সে মাতৃহীন; কিন্তু বেদান্তবাগীশ এক দিন মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে সে অভাব বুঝিতে দেন নাই। পিতার স্নেহ মাতার আদর মনোরমা একাধারেই পাইয়াছিল। দাস দাসী সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ কন্যার পরিচর্য্যার ভার স্বয়ংই লইয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে তাহাকে স্নান করাইতেন, খাওয়াইতেন; কোনও দিন সামান্য অসুখ হইলে বুকে করিয়া রাখিতেন। কাহারও উপর নির্ভর করিতেন না। সে যত দিন ছোট ছিল, বেদান্তবাগীশ বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইলেও, বহুদূরবর্ত্তী স্থানে কোনও বিশিষ্ট ক্রিয়া কর্ম্মে যোগদান করিতেন না। শুধু মায়ার মোহে অন্ধ হইয়াই যে তিনি এমন করিতেন, তাহা নয়। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত দৃঢ় ছিল; গ্রামের কেহ কখনও বেদান্তবাগীশকে কোনও বিষয়ে বিচলিত হইতে অথবা অশ্রুপাত করিতে দেখে নাই। মাতৃহীনা কন্যার প্রতি কর্ত্তব্যবোধই অনেক সময় তাঁহাকে তুচ্ছ অর্থ, সম্ভ্রম ও সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত রাখিত।

বিবাহের পর পাছে পিতৃপরিচর্য্যায় বঞ্চিত হইতে হয়, মনোরমার হৃদয়ে এইরূপ একটা আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সে যখন শাশুড়ীর আদেশ ও স্বামীর অনুমোদন পাইল, তখন সরলা ব্রাহ্মণকন্যার আনন্দ রাখিবার আর স্থান রহিল না। উভয় বাটীর ব্যবধান অতি সামান্য; সুতরাং সে শাশুড়ী ও স্বামীর সেবা করিয়াও পিতার পরিচর্য্যার যথেষ্ট অবকাশ পাইত। অধিকাংশ সময়ই সে পিতৃগৃহে থাকিত।

স্বয়ং অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও মনোরমাকে বেদান্তবাগীশ মহাশয় বেশী লেখাপড়া শিখান নাই। সে মোটামুটী বাঙ্গালা জানিত, এবং কয়েকখানি সরল সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়াছিল। প্রসন্নকুমার সেবা-ধর্ম্মটাই কন্যাকে ভাল করিয়া শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু বিদুষী না হইলেও মনোরমা দর্শনশাস্ত্রের ছোট বড় অনেকগুলি তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াছিল। বেদান্তবাগীশ যখন ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেন, গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া অনেক সময় মনোরমা তাহা শ্রবণ করিত। তীক্ষ্ণমেধাবলে বালিকা বয়সেই সে সমুদয় বিষয় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। অনেক সময় কোনও কোনও বিষয়ে সে এমন দুই চারিটি কথা বলিত যে, বৈদান্তিক

৩

শশুর মহাশয়ের পদধূলি লইয়া তারাপদ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, মা নৌকায় উঠিয়াছেন।"

বেদান্তবাগীশ প্রশান্তস্বরে বলিলেন, "খুব সাবধানে থাকিও। সর্ব্বদা পত্র লিখিও। কোনও বিষয়ের অভাব হইলে তখনই আমায় জানাইতে কুণ্ঠিত হইও না। শুনিয়াছি, পুরুষোত্তমে নানাপ্রকার জুয়াচোরের প্রাদুর্ভাব। অজ্ঞাত-কুলশীলের সহিত সতর্কভাবে চলিবে। রাম সর্দ্দার ছাড়া আরও দুই এক জন লোক সঙ্গে লইবে কি ?"

সস্মিতমুখে তারাপদ বলিল, "আজ্ঞা, বেশী লোকের প্রয়োজন নাই। আমি ও রামসর্দ্দার মাকে অনায়াসে তীর্থ করাইয়া আনিতে পারিব।"

"ভাল, ভাল, আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা নিরাপদে শীঘ্র ফিরিয়া আইস।"

তারাপদর মাতার বহুদিন হইতে পুরুষোত্তম-দর্শনের সাধ ছিল। পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহার স্থিতি করিবার পর পুরী যাইবার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বেদান্তবাগীশ বৈবাহিকার তীর্থযাত্রার আয়োজন করিয়া দিলেন। তখনও পুরী রেলপথ খুলে নাই। পদব্রজে অথবা কলিকাতা হইতে ষ্টীমারযোগে পুরুষোত্তমে যাইতে হইত। পথে নানারূপ অসুবিধা ও বিপদের সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু তা বলিয়া কি তীর্থদর্শনে বাধা দেওয়া যায় ? বেদান্তবাগীশ তারাপদকেই মাতার সহিত পুরী যাইবার জন্য উপদেশ দিলেন।

গ্রামের গদাই মাঝি নৌকা করিয়া তাঁহাদিগকে গোয়ালন্দ পঁহুছিয়া দিবে। তথা হইতে রেলযোগে তাঁহারা কলিকাতায় যাইবেন; তার পর ষ্টীমারে পুরী যাত্রা করিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

তারাপদ অন্তঃপুরে মনোরমার নিকট বিদায় লইতে গেল। বিবাহের পর এই তাহাদের প্রথম বিচ্ছেদ। এক বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও বিরহের যন্ত্রণা কেহ অনুভব করে নাই। অবিচ্ছিন্ন মিলনসুখে দীর্ঘ বৎসর চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় উভয়েরই হৃদয় ম্রিয়মাণ!

স্বামীর জন্য এক ডিবা পান সাজিয়া রাখিয়া মনোরমা তখন দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। আজ হাসিমুখে বিদায় দিতে হইবে, কিন্তু হৃদয় কি ভাঙ্গিয়া যাইবে না ? কর্ত্তব্য কি কঠোর! আজীবন সংযমে ও মনোবৃত্তিদমনে শিক্ষালাভ করিলেও, আজ মনোরমা কিছুতেই হৃদয়বেগ সংবরণ করিতে পারিতেছিল না।

ছল ছল করিতেছিল। স্বামীকে আসিতে দেখিয়া যুবতী তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে নয়নমার্জ্জনা করিল। শুভযাত্রার সময় কি চোখের জল ফেলিতে আছে?

পত্নীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তারাপদ গাঢ়স্বরে বলিল, "ভয় কি মনু? শীঘ্রই নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আস্‌বো। বড় জোর্‌ ছ' মাস দেরী হবে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এই ছ' মাস দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলে যাবে। তুমি ভেবো না।"

মনোরমার হৃদয়ে বান ডাকিতেছিল; কিন্তু অভ্যাসবশে সে আত্মসংবরণ করিল। ধীরে ধীরে নীরবে সে স্বামীর চরণধূলি মাথায় তুলিয়া লইল।

আর দেরী করা চলে না। শুভ সময় অতীত হইয়া যায়; মাঝি বাহির হইতে ডাকিতেছে। মনোরমার প্রতি চাহিতে চাহিতে তারাপদ বাহিরে চলিয়া গেল। যুবতী জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বেদান্তবাগীশ গদাই মাঝিকে বিশেষ সাবধানে নৌকা চালাইবার আদেশ দিয়া প্রণত তারাপদকে আবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। গদাই ঠাকুর মহাশয়কে বুঝাইয়া দিল যে, এখন ভয়ের কোনও কারণই নাই। শীতকালে জলপথে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প।

তারাপদ রাজপথে উঠিয়া আর একবার বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, তখনও মনোরমা নির্নিমেষভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে।

৪

তখনও অদূরবর্ত্তী শস্যশ্যামল ক্ষেত্রের উপর কুহেলিকার ধূম্র যবনিকা দুলিতেছিল। প্রাচীদিক্‌চক্রবালে তরুণ তপনের মুকুট-জ্যোতিঃ বিকশিত হইলেও, দিগন্তবিস্তৃত নভোরেণুজাল সম্পূর্ণ অপসৃত হয় নাই।

প্রাতঃকৃত্যশেষে বেদান্তবাগীশ মহাশয় চণ্ডীমণ্ডপের রকের উপর বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। ছাত্রগণ ভিতরে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতেছিল।

এমন সময় এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে আসিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। বেদান্তবাগীশ তাহাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কে—গদাই? এর মধ্যে ফিরে এলি? ব্যাপার কি?"

গদাই মাঝি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, পরিধেয় বসন বহু স্থলে ছিন্ন। তাহারই এক প্রান্ত গায়ে জড়াইয়া সে শীতে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ব্রাহ্মণের হৃদয় অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় কম্পিত হইল; তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কাঁদিস কেন, কি হয়েছে?"

মাঝি সংক্ষেপে জানাইল, সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আড়িয়াল নদীর সীমা ছাড়াইয়া নৌকা যখন পদ্মার মধ্যে পড়িয়াছিল, সেই সময় একখানি ষ্টীমারের ঢেউ লাগিয়া নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। কুয়াসায় দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া সে যথাসময়ে ষ্টীমারের পথ হইতে নৌকা সরাইয়া লইতে পারে নাই। জামাই বাবু তাঁহার মাকে বাঁচাইবার জন্য অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তার পর দু' জনেই ডুবিয়া গিয়াছেন। রাম সর্দ্দার ও আর তিন জন দাঁড়ির কেহই রক্ষা পায় নাই। শুধু কোনও রকমে সে বাঁচিয়া গিয়াছে।

পাথরের মূর্ত্তির ন্যায় বেদান্তবাগীশ বসিয়া রহিলেন।

কথাটা মনোরমার কানে যাইতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না। বজ্রাহতার ন্যায় যুবতী প্রথমে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। সত্যই কি এত শীঘ্র তাহার সাধের বাসর-বাতি নিবিয়া গেল? বসন্তের ফুল না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়িল? না, না! এমন অসম্ভব কথা সে বিশ্বাস করিতে পারে না! তাহার এয়োতির চিহ্ন মুছিয়া যাইবার কোনও সম্ভাবনাই ত ছিল না! তবে এ কি হইল মা ভবানী!

মুহূর্ত্তমধ্যে এই নিদারুণ সংবাদ গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইল। পল্লীকামিনীরা দ্রুতপদে বেদান্তবাগীশের গৃহপ্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। মনোরমা নীরবে পল্লীবৃদ্ধাদিগের সান্ত্বনাবাক্য শুনিতে লাগিল।

কিছুকাল নানারূপ আলোচনার পর স্থির হইল, যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াছে। এখন অভাগিনী মনোরমার বেশ-পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কয়েকটি পল্লীবিধবা এই অপ্রীতিকর অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের ভার লইলেন। মনোরমাকে সকলেই স্নেহ করিতেন; তাহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি উন্মোচন করা কি সহজ ব্যাপার?

বৃদ্ধারা অশ্রুসিক্তলোচনে বলিলেন, "কি করিবে বল মা, উপায় ত নাই। এ বেশ তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে।"

মনোরমা এতক্ষণ উদাসনয়নে শূন্যপানে চাহিয়াছিল। তাহার হৃদয়ে যে শোকের মহাসমুদ্র আলোড়িত হইতেছিল, বাহিরে অবশ্য তাহার বিশেষ কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। মনোরমা কিছুতেই মনকে বুঝাইতে পারিতেছিল না যে, সত্যই সে আজ অভাগিনী, স্বামিহীনা! বৃদ্ধারা যখন তাহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিতে গেলেন, তখন সে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার নয়নে সতীগর্ব্বের উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠিল; দৃঢ়কণ্ঠে সে ডাকিল, "বাবা!"

বেদান্তবাগীশ চমকিয়া উঠিলেন।

মনোরমা বলিল, "বাবা, আমি বিধবা হই নাই !"

ব্রাহ্মণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রমণীদিগের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আজ থাক, কোনও দোষ হইবে না।"

সে অঞ্চলের ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য বেদান্তবাগীশ যখন বলিতেছেন, তখন প্রতিবাদ করিবে কে ? লোকাচারের বিরুদ্ধ হইলেও সে যাত্রা মনোরমার বৈধব্য-বেশ ঘটিল না।

৫

মৃদুকণ্ঠে পিতা বলিলেন, "মা, আজ তোমাকে এ বেশ ত্যাগ করিতে হইবে। এ কয় দিন রাখিয়াছ ; কিন্তু আজ হইতে আর চলিবে না। তোমার স্বামীর আদ্যকৃত্য আজ ত করিতে হইবে। এখন—"

মনোরমা পিতার আদেশ শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখমণ্ডলে পাণ্ডুরচ্ছায়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সহসা দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের দিব্যজ্যোতিঃ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমি বিধবা হই নাই বাবা ; তিনি বলিয়া গিয়াছেন, শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহার কথা কখনই মিথ্যা হইবে না।"

কন্যার দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া বেদান্তবাগীশ মুহূর্ত্তমাত্র বিচলিত হইলেন। ম্লান-হাস্যে বলিলেন, "পাগলী, এমন অসম্ভবে বিশ্বাস করিয়া কেন প্রতারিত হইবি ? সে যদি বাঁচিয়া থাকিত, এত দিন নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিত ; নয় ত তাহার সংবাদ পাওয়া যাইত। আমি লোক দ্বারা বহু সন্ধান লইয়াছি—সে বাঁচিয়া নাই। বৃথা আশ্বাসে মুগ্ধ হইলে কেবল কষ্ট পাইবি, মা।"

মনোরমা পূর্ব্ববৎ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তিনি ফিরিয়া আসিবেন বলিয়াছেন।"

বেদান্তবাগীশ সে কথায় কান না দিয়া বলিলেন, "সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। পাড়ার অনেকেই আসিতেছেন। আজ আর হাতের লোহা, শাঁখা খুলিতে আপত্তি করিও না ; তাহা হইলে সমাজে নিন্দা হইবে। আমি মুখ দেখাইতে পারিব না। আজ শ্রাদ্ধের দিন ; হিন্দুশাস্ত্র মতে তোমার স্বামীর পরলোকগত আত্মার মঙ্গলের জন্য সকলই সহ্য করিতে হইবে।"

"কিসের শ্রাদ্ধ, বাবা ? আমার স্বামী কখনই মরেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁহার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না। তিনি নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবেন। আমি

কিন্তু বেদান্তবাগীশ সে কথা শুনিলেন না। ভাবিলেন, স্বামিবিয়োগশোকে কন্যার মস্তিষ্কের বিকার ঘটিয়াছে।

পল্লীবিধবারা গৃহপ্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। শ্রাদ্ধের সমুদয় আয়োজন হইয়াছিল। পুরোহিত আসনে উপবেশন করিলেন। বেদান্তবাগীশ প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

বিধবারা মনোরমাকে বুঝাইয়া শঙ্খ-বস্ত্রাদি ত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু সে যেমন নীরবে বসিয়াছিল, পাষাণমূর্ত্তির মত তেমনই স্থির হইয়া রহিল। কোনও ক্রমেই সধবার বেশ ত্যাগ করিল না। তখন সকলে বলপূর্ব্বক তাহাকে নিরাভরণা করিবার চেষ্টা করিলেন। মনোরমা আর্ত্তস্বরে বলিল, "ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার এয়োতির চিহ্ন কাড়িয়া লইও না! তিনি বলে' গেছেন,—নিশ্চয় ফিরে আস্‌বেন। ব্রাহ্মণের কথা কখনও মিথ্যা হয় না, কেন জোর ক'রে তোমরা আমায় বিধবা সাজাচ্ছ? আমার সর্ব্বনাশ ক'রো না!"

কিন্তু তাহার ক্রন্দন, অনুনয়, বিনয় ও আপত্তি সত্ত্বেও সকলে বলপূর্ব্বক তাহার হাতের লোহা খুলিয়া লইলেন, শাঁখা ভাঙ্গিয়া দিলেন। কোনও রকমে স্নান করাইয়া শুভ্র বস্ত্রে মনোরমার দেহ আবৃত করিলেন। যখন বিধবারা ধরাধরি করিয়া নিরাভরণা শ্বেতবসনা যুবতীকে কুশাসনের সম্মুখে লইয়া আসিলেন, তখন হৃদয়ভেদী চীৎকার করিয়া হতভাগিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। বেদান্তবাগীশ কন্যার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার চৈতন্যসম্পাদনের বহু চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনও ফল হইল না।

তখন মনোরমার সংজ্ঞাশূন্য দেহ শয্যার উপর শায়িত হইল। কবিরাজকে ডাকিবার জন্য লোক চলিয়া গেল। বেদান্তবাগীশ প্রশান্তভাবে কন্যার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে তখন কি গভীর পরিতাপের বেদনা বাজিতেছিল, লোকে তাহা অনুমান করিতে পারিল না।

কবিরাজ আসিয়া মনোরমার নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। ললাটের উত্তাপ লইয়া তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। বেদান্তবাগীশ তাঁহাকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবস্থা কেমন দেখিতেছেন? আমার কাছে কিছু গোপন করিবেন না।"

কবিরাজ বলিলেন, "অবস্থা ভাল নয়। অকস্মাৎ মানসিক উত্তেজনায় রক্ত মাথায় উঠিয়াছে, জ্বর অত্যন্ত প্রবল, ঘোর বিকারের অবস্থা।"

বেদান্তবাগীশের সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। কিন্তু মুহূর্ত্তে তিনি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দমন করিলেন। জীব কর্ম্মবশে ফলভোগ করে। সুখ দুঃখ সবই অনিত্য। মানব মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কেবলই কষ্ট পায়। বৈদান্তিক দৃঢ়পদে পুনরায় কন্যার শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া গেলেন।

বিকারঘোরে মনোরমা বলিয়া উঠিল, "ব্রাহ্মণের কথা কখনও কি মিথ্যা হয়? বাবা, তিনি ঠিক আস্‌বেন।"

চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার কোনও ত্রুটী হইল না। কিন্তু ঔষধ পান করিবে কে? জ্বরের উত্তাপ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া আসিল। জীবন ও মৃত্যুর প্রবল সংঘর্ষে মৃত্যুর বিজয়-ভেরী ভীষণ-রবে বাজিয়া উঠিল। রাত্রিশেষে সকল চেষ্টার অবসান হইল।

৬

সোনার কুসুম শ্মশানচুল্লীতে ভস্মীভূত করিয়া দাহকারীরা সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সমগ্র কমলাপুর যেন শোকে ম্রিয়মাণ। বাড়ীর পোষা বাঘা কুকুরটিও মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়া উঠিতেছিল। মনোরমা স্বহস্তে যে প্রত্যহ তাহাকে আহার দিত!

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া বামার মা কাঁদিতেছিল। মনোরমাকে যে সে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছিল! নির্ব্বিকারভাবে বেদান্তবাগীশ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রোরুদ্যমানা বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বলিলেন, "তুই যদি অমন করে' কাঁদিস্, তা হ'লে আমার সাম্‌নে থেকে চলে যা।"

নদীর তীরে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনা সারিয়া আসিয়াছিলেন; আজ আর তাহার প্রয়োজন নাই। স্বহস্তে তিনি ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া দিলেন। এ কার্য্য ত প্রত্যহ মনোরমাই করিত। অন্যমনস্কভাবে ব্রাহ্মণ এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়া আসিলেন। হাস্যময়ী স্নেহপ্রতিমা অন্যদিন এতক্ষণ শতবার তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিত। তাঁহার কি প্রয়োজন, কিসের অভাব হইতেছে, জিজ্ঞাসা না করিয়াই সব গুছাইয়া রাখিত। আজ হইতে সে স্নেহের সেবা একান্তই দুর্লভ হইল।

একবার কন্যার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। আজ দর্শনের একটা জটিল বিষয় ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিবার কথা ছিল; অকস্মাৎ সে

ছাত্রেরা নীরবে মুখোমুখী করিয়া অন্ধকারে বসিয়া ছিল। বেদান্তবাগীশ বলিলেন, "চুপ করিয়া বসিয়া কেন? আলো জ্বাল, আজ মায়া ও দুঃখ সম্বন্ধে তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিব।"

বিস্ময়ে ছাত্রগণ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। এত ধৈর্য্য, এমন সংযম তাহারা কোনও মানুষে ত দেখে নাই! ব্রাহ্মণের কি হৃদয় নাই?

আধ ঘণ্টা পরে ধূমপান করিতে করিতে বেদান্তবাগীশ চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। ছাত্রেরা আজ তেমন মনঃসংযোগপূর্ব্বক তাঁহার কথা শুনিতেছিল না। অগত্যা তিনি ব্যাখ্যা বন্ধ করিয়া দিলেন।

বাহিরে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছিল। বেদান্তবাগীশ ধূমপান করিতে করিতে কিছুক্ষণ ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া রহিলেন, সহসা তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কে যেন বাড়ীর ভিতর হইতে তাঁহার কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—

"মনো, মনু, ও মনোরমা।"

এ স্বর যে পরিচিত! ব্রাহ্মণ দ্রুতবেগে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। আজ কি তাঁহারও মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে?

চন্দ্রালোকে তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, মুণ্ডিতশীর্ষ, নগ্নপদ, উত্তরীয়ধারী এক ব্যক্তি দ্রুতপদে প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিল। বেদান্তবাগীশের সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

আগন্তুক ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিল। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে তাহার মুখ দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

"তুমি, তুমি?—সত্যই তুমি তারাপদ? না স্বপ্ন দেখ্‌ছি!"

তারাপদ শোকরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "হঠাৎ এ অবস্থায় আমায় দেখে বিস্মিত হইবারই কথা। পদ্মায় মাকে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি। আমি ছাড়া আর কেহ বাঁচে নাই, শুনিয়াছি। আমি হতভাগ্য, তাই মাকে তীর্থ দেখাইতে গিয়া জন্মের মত তাঁহাকে হারাইয়াছি! কয়েক জন জেলে আমার ও মার দেহ অতিকষ্টে তাহাদের নৌকায় তুলিয়াছিল। মার আর জ্ঞান হয় নাই। পাঁচ দিন আমি এক ব্রাহ্মণের বাড়ী শয্যাশায়ী ছিলাম। পরে শুনিয়াছি, তাঁহারাই আমার মার সৎকার করিয়াছিলেন। আজ দুই দিন শরীরে বল পাইয়াছি। কাল ক্ষৌরকার্য্য করিয়া বালির পিণ্ড দিয়া আসিয়াছি। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল; এখানে সস্ত্রীক মার শ্রাদ্ধ করিব। কিন্তু আপনার কন্যা কোথায়? ও বাড়ীতে কেহ নাই; এখানেও তাহাকে দেখিতেছি না।"

বেদান্তবাগীশ এতক্ষণ অতিকষ্টে জামাতার কথা শুনিতেছিলেন; কিন্তু সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। বেদান্তের কোনও সূত্র আজ প্রকৃতির প্লাবনের গতিরোধ করিতে পারিল না! জামাতাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অত বড় বৈদান্তিক বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, আমায় ক্ষমা কর! আমি তাহাকে নিজের হাতে মারিয়া ফেলিয়াছি! পাণ্ডিত্যের অভিমানে সাধ্বীর বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিতে গিয়াছিলাম, তাই মা আমায় ফাঁকি দিয়া পলাইয়াছে।"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

---

# উদ্যানের রঙ্গ।

উদ্ভিদ-শাস্ত্রের অন্তর্গত উদ্যান-কলার মধ্যে উদ্ভিদ-পরিচর্য্যা প্রকরণে দুইটি বিশেষ ইংরেজী শব্দের ব্যবহার আছে। উক্ত শব্দ দুইটি যথাক্রমে—Forcing ও Retarding। প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা সাদা কথায় জবরদস্তি বা পীড়ন ও শেষোক্ত শব্দ দ্বারা পিছাইয়া দেওয়া বুঝিতে হয়। উক্ত শব্দদ্বয় বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার জ্ঞাপক। এক্ষণে উহাদিগের প্রত্যেকের প্রয়োগ-কার্য্য ও ফলাফল কি, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

উদ্যানপাল যত ঘন ঘন উক্ত দুটি শব্দের ব্যবহার করেন, কৃষককে তত ব্যবহার করিতে হয় না। কৃষক অনেক কার্য্যের জন্য স্বভাবের উপর নির্ভর করে। কারণ, কৃষক যে কোনও ফসলের আবাদ করুক, তাহাকে সর্ব্বদা খরচের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। কৃষিজাত প্রায় সমস্ত দ্রব্যই লোকসমাজের অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলিয়া সকল জিনিসই সম্ভবমত স্বল্পব্যয়ে উৎপন্ন করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। উদ্যানপাল যে সকল জিনিস—তরিতরকারী ফলপাকুড়—উৎপন্ন করে, তৎসমুদয় আমাদিগের প্রয়োজনীয় হইলেও, কতকটা ভোজনের উপাদেয়তা-সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ধান্য, গোধূম, মাড়ুয়া, মকাই প্রভৃতি প্রধান আহার্য্য ফসল সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। ধান্য গোধূমাদি অবশ্যই চাই। তবে যে যেরূপ অবস্থার লোক, তাহার জন্য সেইরূপ ফসল আছে। যাহা হউক, এগুলি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, তার পরে তরিতরকারী বা ফল পাকুড়, এবং তাহারও পরে ফুল। তরিতরকারী না হইলে চলিতে পারে। অনেক দেশে গরীব দুঃখীরা অর্থাভাব-বশতঃ তরকারী খাইতে পায় না; আর যদি বা খায়, প্রায় তাহা স্বভাবজাত

শাক পাতা মূল কন্দ। আবার অনেক সময় অন্ন, রুটী, বা বিদগ্ধ মকাই, বা মাড়ুয়া-চূর্ণ কেবলমাত্র লবণ ও লঙ্কাসহযোগে উদরস্থ করিয়া থাকে। মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই যে, ঔদ্যানিক ফসল অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য; সুতরাং সে সকল সামগ্রী তুলনায় কিছু মহার্ঘ, এবং উৎপন্ন করিতেও ব্যয় কিছু অধিক হয়, কিছু অধিক পরিশ্রমও করিতে হয়। এই সকল ও তদানুষঙ্গিক আরও কতকগুলি কারণে ঔদ্যানিক ফসল যাহাতে উৎকৃষ্ট হয়, সেই বিষয়েই উদ্যানপালের লক্ষ্য থাকে, খরচের দিকে তত থাকে না। উদ্যানপাল যত উৎকৃষ্ট প্রণালীতে আবাদ করে, কৃষক তাহা করে না। এই জন্য কৃষকগণকে forcing বা retardingএর ধার ধারিতে হয় না।

উদ্যানপালকে উদ্ভিদের সহিত প্রকৃত পক্ষে লড়াই করিতে হয়, এবং সে যুদ্ধে উদ্যানপালকে জিতিতেই হইবে। Forcing ও Retarding সেই যুদ্ধের একটি বিশেষ উপকরণ। উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফলশীলতা প্রভৃতি অনেকগুলি কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য উদ্ভিদের উপর কখনও জুলুম করিতে হয়; আবার কখনও দাবাইয়া দিতে হয়। গাছে সার প্রদান করা, গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া, জুলুম ক্রিয়ার অন্তর্গত। আবার কখনও বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য গাছের বৃদ্ধি রুদ্ধ করিতে হয়, ফলনকালের 'আগুপিছু' করিবার জন্য গাছের স্বাভাবিকগতিকে অল্পাধিক কালের জন্য স্থগিত করিতে হয়। এ সকলকে স্থগিতক্রিয়া বা retardation বলা যায়।

প্রকৃতির মধ্যে স্বভাবতঃ যাহা প্রসারিত আছে, তদ্দ্বারাই উদ্ভিদ জীবিত থাকিতে পারে। ভূগর্ভে উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী প্রচুর পদার্থ বিদ্যমান, পানের জন্য রসও বর্ত্তমান, শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য আকাশভরা বাষ্পীয় পদার্থও ভাসমান। মাটীতে বীজ পড়িবার পর কোনরূপ প্রতিকূল অবস্থার বাধা না পাইলে মানুষের বিনা চেষ্টায় বা যত্নে উহা আপনিই উদ্ভিন্ন হইবে, এবং স্ব স্ব বংশগত পরমায়ু অনুসারে স্বল্পকাল বা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে, বর্দ্ধিত হইবে, ফলফুলও প্রদান করিবে। মাঠে বাটে অসংখ্য বৃক্ষলতা গুল্মাদি কত জন্মিতেছে, কত মরিতেছে, কে তাহার গণনা করে? স্বাভাবিকতার মধ্যে অনেক প্রতিকূল অবস্থা ও কারণ আছে; তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য, কিংবা পালকের মনোগত অভীষ্ট সুসিদ্ধ করিবার জন্য কখনও আমরা উদ্ভিদে জলসেচন করি, বা পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করি; কখনও বা নিজের মনোগত আকারে পরিণত করিবার জন্য উদ্ভিদকে ছাঁটিয়া দিই, শাখাপ্রশাখার সংখ্যার হ্রাস করিয়া দিই

স্বভাবজাত উদ্ভিদগণ প্রকৃতির নিয়মাধীন থাকিয়া জীবিত থাকে ; ফলমূলাদি প্রদান করে ; কিন্তু তাহাদিগকে কৃত্রিম শক্তি প্রদান করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক-বৃদ্ধিশীল করিতে হইলে, কিংবা নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে ফলপুষ্পে সুশোভিত করিতে হইলে, আমরা উদ্ভিদে শক্তির প্রয়োগ করি। এই জন্য গাছে সার প্রদান করা সাধারণ নিয়ম। সার-প্রদানের ফলে উদ্ভিদ উত্তেজিত হয়, এবং সেই উত্তেজনাকে বর্জ্জন করিবার জন্যই যেন নূতন নূতন শাখা প্রশাখার উদ্গম হয়। অধিক বা তেজস্কর সার হইলে সেই সকল শাখা প্রশাখার বৃদ্ধি ফলন-ফুলনে নিযুক্ত হয়—গাছে ফুল ফোটে, ফল হয়। অনতিকালমধ্যে ফলফুলের উৎপাদন করিতে হইলে উদ্ভিদের অবয়বকে সমধিক বর্দ্ধিত হইতে দিতে নাই ; বরং তাহাতে সমধিক তেজস্কর সার দেওয়াই বিধি। স্থূলসার প্রদানে গাছের বৃদ্ধি তত ত্বরিত হয় না, সুতরাং ফলফুলও বিলম্বিত হয়। কিন্তু সেই সারে জল মিশ্রিত করিয়া তরল সারে পরিণত করিয়া উদ্ভিদের পাদদেশে প্রদান করিলে, উদ্ভিদের সমগ্র শক্তি উদ্দীপিত হইয়া উঠে, অথচ উদ্ভিদ বৃদ্ধি পাইবার অবসর না পাইয়া, সেই সমাবিষ্ট শক্তির প্রাবল্য হেতু পুষ্পোৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়। সচরাচর আমরা কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে গোলাপ গাছ ছাঁটিয়া দিই, তাহার গোড়ার সার দিই, অন্যান্য পাট করি। এ স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বসন্ত কালই গোলাপের পুষ্পিত হইবার স্বাভাবিক সময়। কিন্তু আমরা তাহাদিগকে শীতকালেই পুষ্পিত হইবার জন্য বাধ্য করি। ইহাই হইল জুলুম। ঋতুজীবী উদ্ভিদগণ (annuals) কয়েক মাসের মধ্যে উদ্ভিদলীলা সাঙ্গ করে। কিন্তু একাধিকবর্ষজীবী প্রায় সকল উদ্ভিদই বর্ষাকাল উত্তীর্ণ হইবার পর হইতে, শীত যত বেশী হইতে থাকে, ততই সঙ্কোচভাব ধারণ করে ; তখন কিছু দিনের জন্য তাহাদের বৃদ্ধিও স্থগিত হয়, শরীরস্থ রস ঘন হয়, রসের সঞ্চালন-ক্রিয়া অল্পাধিক ধীরতা প্রাপ্ত হয়। এ সময়ে গোলাপগাছে ফুল আসিতে পারে না। ক্রমে শীতাবসান হইলে গাছের অসাড়তা ভাঙ্গিয়া যায়, গাছ জাগিয়া উঠে, রস-প্রবাহ ত্বরিত ভাব ধারণ করে, রসও তরল হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ইহাই হইল গোলাপের ফুলের মরশুম। স্বাভাবিক মরসুমের অপেক্ষা না করিয়া কয়েক মাস পূর্ব্বেই আমরা কেন গোলাপ গাছে ফুল ফোটাই, তাহা এ স্থলে আমাদের আলোচ্য নহে। গোলাপদিগকে অসময়ে পুষ্পিত করিবার জন্য আমরা যে যে উপায় অবলম্বন করি, তৎসমুদায় উদ্দীপনার অঙ্গ। এই জন্য আমরা প্রত্যেক গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিই, অনেক শিকড় কাটিয়া দিই, অনেক শিকড় ছিঁড়িয়া যায়, ১০।১৫ বা ২০।২৫ দিন গাছের মূলদেশে রৌদ্র ও শিশির লাগিতে

দিই, এবং শাখা প্রশাখা কাটিয়া ছোট করিয়া দিই। এই সকল উপায়ে গাছের সাময়িক নির্জীবতা নষ্ট করি। ইতিপূর্ব্বে যে শক্তি সমগ্র গাছে প্রসারিত ছিল, যে শক্তি সমগ্র গাছটিকে নিয়মিত করিতেছিল, এক্ষণে সে শক্তি সংক্ষিপ্তাকার-প্রাপ্ত গাছে সম্যক্‌ভাবে নিয়োজিত হয়। ফলে উদ্ভিদ শীঘ্র তেজাল হইয়া উঠে, এবং নির্দ্দিষ্ট কালের বহুপূর্ব্বেই পুষ্পধারণ করে।

আর এক প্রকার বলপ্রয়োগের কথা বলি। অনেক পেঁয়াজ-মূলক উদ্ভিদ, রজনীগন্ধা, উদ্বাহ-কমল ( Eucharis বা Bridal lily ) প্রভৃতি উদ্ভিদকে ইচ্ছামত নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে পুষ্পিত করিবার জন্য গাছগুলিকে মৃত্তিকা হইতে উৎপাটিত ও মূলগুলিকে ছেদন করিবার পর মৃন্ময় আধারে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়া, গরম যায়গায় বা কাচ-নির্ম্মিত বাক্সে ( Wardian case ) বা কাচের ঘরে রাখিয়া দিলে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি বা পুষ্পিত হইবার কাল পিছাইয়া দিবার জন্য উদ্যানপালকে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধিহীনতা যেরূপ অবাঞ্ছনীয়, অতিবৃদ্ধিও সেইরূপ। যে সকল গাছ অতিশয় 'বাড়ন্ত' বা বৃদ্ধিশীল, তাহাদিগকে 'ষাঁড়া' গাছ কহে। ষাঁড়া গাছে প্রায় ফলফুল হয় না। লাউ কুমড়া গাছ অনেক সময় ষাঁড়াইয়া যায়; কদলীবৃক্ষ 'ফুলিয়া' যায়। এ সকল গাছে ফল হয় না। অবস্থাবিশেষে প্রায় সকল গাছেরই এ দশা ঘটিতে পারে। কোনও গাছে ষাঁড়াইবার উপক্রম দেখা গেলে, প্রতীকারার্থ তাহাকে হীনতেজ করিয়া দিতে হয়। অনেক ফলকর বৃক্ষের ফল গাছে থাকিতেই আপনা হইতে ফাটিয়া যায়। কয়েকজাতীয় গোলাপ গাছ স্বভাবতঃ পুষ্প প্রদান করিতে নারাজ, অথচ গাছগুলি খুব শাখা-প্রশাখাসম্পন্ন বিশাল ঝাড়াল হইয়া থাকে। ইহাদিগকে তেজোহীন করিয়া দিতে হয়। ইহাকে 'দাবাইয়া দেওয়া' কহে। দাবাইয়া দিতে হইলে কোনও স্থলে গাছের শিকড় অল্লাধিক কমাইয়া বা ছাঁটিয়া দিতে হয়। কোনও কোনও গাছের শাখা-সংখ্যার হ্রাস করিয়া দিতে হয়। শাখা ও কাণ্ডের কোনও কোনও স্থানে কাটারি বা কুঠার দ্বারা কোপ দিলে কতক রস নির্গত হইয়া যায়। ফলে গাছ কিছু তেজমরা হইয়া যায়। এই উপায়ে অনেক গাছ সুধরাইয়া গিয়াছে। গাছে ফুল বা ফল আসিবার পূর্ব্বে গাছকে ছায়ায় রাখিলে, ফল ফুল হওয়া স্থগিত হয়। গামলায় পালিত উদ্ভিদগণকে এই সকল উপায়ে সুবিধামত নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আবার

এ সকল কাজে বড় সাফল্যলাভ করা যায়। সে সাফল্যে উদ্যানপালের বড় আনন্দ! কোনও উদ্ভিদে হয় ত ফাল্গুন মাসে ফুলের সমাগম হয়। পালক ইচ্ছা করিলে তাহাকে মাঘ মাসে কিংবা চৈত্র মাসে ফুটাইতে পারেন। ইহার জন্য গরম ও ঠাণ্ডা, উভয়বিধ ঘর থাকা আবশ্যক। সে সকল ঘরে বায়ুমণ্ডলকে কৃত্রিম উপায়ে গরম বা ঠাণ্ডা করিতে পারা যায়। কখনও উত্তাপ, কখনও বা শৈত্য বাড়াইতে বা কমাইতে পারা যায়। পুষ্পিত হইবার কালকে অগ্রে অর্থাৎ ফাল্গুনের স্থলে মাঘে আনিতে হইলে, গরম গৃহে রাখিয়া ক্রমে গৃহের উত্তাপ বর্দ্ধিত করিতে হয়। কিন্তু পুষ্পিত হইবার দিনকে পিছাইয়া দিতে হইলে, অর্থাৎ ফাল্গুনের স্থলে চৈত্র বা বৈশাখে আনিতে হইলে, পুষ্পোন্মুখ গাছকে ঠাণ্ডা গৃহে রাখিতে হয়; প্রয়োজন বোধ করিলে গৃহাভ্যন্তরের শৈত্যও বর্দ্ধিত করিতে হয়।

মানুষ মনে করিলে গাছে অধিক বা অল্প ফুল ফল আনিতে পারে; ইচ্ছা করিলে বড় বা ছোট ফুল ফলও উৎপন্ন করিতে পারে। ইহাকে গাছে মানুষে খেলা ভিন্ন আর কি বলিব?

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

---

# ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন।

[ প্রশস্তি-পাঠ। ]

শ্রীপরাক্রমমূলস্য।

নি

১। ওঁ * স্বস্তি॥

বভূব রাঢ়াধিপ-লব্ধজন্মা

তি [ গ্মাংশু-চণ্ডো নৃপবংশ- ]

২। কেতুঃ।

শ্রীধূর্ত্তঘোষো নিশিতাসিধারা-

নির্ব্বা [ পিতারিব্রজ-গর্ব্ব- ]

৩। লেশঃ॥ (১)

---

* ওঁকার-বিজ্ঞাপক চিহ্নমাত্রই উৎকীর্ণ আছে।

(১—২) ইন্দ্রবজ্রা। দ্বিতীয় শ্লোকের শেষে "পৃথিব্যাম্" স্থলে "পৃথিব্যাং" উৎকীর্ণ আছে। "জাত" শব্দটি সমূহার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।




মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন [ সম্মুখের পৃষ্ঠা ]।

Mohila Press, Cal.

আসীত্ততোপি সমর-ব্যবসায়সার-
বি [ স্ফূর্জ্জিতাসি-কুলি- ]

৪। শ-ক্ষত-বৈরিবর্গঃ।
শ্রীবালঘোষ ইতি ঘোষ-কু [ লাব্জজাত-
মার্ত্ত- ]

৫। গু-মণ্ডলমিব প্রথিতঃ পৃথিব্যাং ॥ (২)
তস্যাভবদ্ধবলঘোষ [ ইতি প্রচ- ]

৫। গু-
দণ্ডঃ সুতো জগতি গীত-মহাপ্রতাপঃ।
যেনেহ যোধ-তি [ মিরৈক- ]

৭। দিবাকরেণ
বজ্রায়িতং প্রবল-বৈরি কুলাচলেষু ॥ (৩)
ভবানীবাপরা মূর্ত্ত্যা সীতে [ ব চ পতি- ]

৮। ব্রতা।
সদ্ভাবা নাম তস্যাভূদ্ ভার্য্যা পদ্মেব শার্ঙ্গিণঃ ॥ (৪)
তস্যা ঈশ্বরঘোষ এষ তনয়ঃ [ সপ্তাংশু- ]

৯। ধামা জয়-
ত্যেকো দুর্দ্ধর-সাহসঃ কিমপরং কান্ত্যা জিতেন্দ্রদ্যুতিঃ।
যস্য প্রোর্জ্জিত-শৌর্য্যনির্জ্জিত-রিপোঃ [ প্রৌ- ]

১০। ঢ়-প্রতাপশ্রুতে-
রাস্য স্বাষ্পজল-প্রণালমলিনং শত্রুস্ত্রিয়ো বিভ্রতি ॥ (৫)
স খলু ঢেক্করীতঃ। মহামাণ্ডলিকঃ

---

(৩) বসন্ততিলক। বাজা ঝা "দণ্ড"কে "চণ্ড" বলিয়া এবং "যোধ"কে "যৌধ" বলিয়া পাঠ করিয়া গিয়াছেন।

(৪) অনুষ্টুভ।

(৫) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

১১। শ্রীমদীশ্বরঘোষঃ কুশলী (৬) পিপোল্ল-মণ্ডলান্তঃপাতি- (৭)
গাল্লিটিপ্যক-
বিষয়-সম্ভোগ-দিগ্ঘা সোদি-

১২। কা-গ্রামে সমুপগতাশেষ-রাজ। রাজণ্যক। রাজ্ঞী। রাণক।
রাজপুত্র-কুমারামাত্য। মহাসান্ধিবিগ্র-

১৩। হিক মহাপ্রতীহার-মহাকরণাধ্যক্ষ-মহামুদ্রাধিকৃত-
মহা আক্ষপটলিক- (৮)-মহাসর্ব্বাধিকৃত-

১৪। মহাসেনাপতি-মহাপাদমূলিক-মহাভোগপতি-
মহাতন্ত্রাধিকৃত-মহাব্যূহপতি-মহাদণ্ডনায়-

১৫। ক মহাকায়স্থ-মহাবলাকোষ্ঠিক (৯)-মহাবলাধিকরণিক-
মহাসামন্ত-মহাঠকুর- (১০)-অঙ্গিকর-

১৬। ণিক-দাণ্ডপাণিক- (১১)-কোট্টপতি-হট্টপতি-
ভুক্তিপতি-বিষয়পতি-ঐন্ধিতাসনিক- (১২)-অন্তঃ-
প্রতীহার-দ [ ণ্ড ]-

১৭। পাল-খণ্ডপাল-দুঃসাধ্যসাধনিক-চৌরোদ্ধরণিক-
উপরিক-তদানিযুক্তক-আভ্যন্তরিক-বাসাগা- (১৩)

১৮। রিক-খড়্গগ্রাহ-শিরোরক্ষিক-বৃদ্ধধানুষ্ক-একসরক-
খোলদূত-গমাগমিক-লেখ ০০০০০০ (১৪)

---

(৬) ২১ পংক্তিতে [ মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি ] ক্রিয়াপদ উল্লিখিত আছে।

(৭) মণ্ডলের নাম বাচ্চা ঝা কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইবার সময়ে পকার যকার রূপে, এবং "সোদিকা" শব্দ "সাড়িকা" রূপে পঠিত হইয়াছিল।

(৮) 'মহাক্ষপটলিক' পাঠ করিতে হইবে।

(৯) এরূপ রাজপাদোপজীবীর নাম পালরাজগণের তাম্রশাসনে অপরিচিত।

(১০) বাচ্চা ঝা ঠকার পাঠ করিতে পারেন নাই।

(১১) "দাণ্ডপাশিক" শব্দের স্থলে "দাণ্ডপাণিক" আছে।

(১২) বাচ্চা ঝা "ঔন্ধিতাসনিক" পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। ৩০ পংক্তিতে দুইবার ঔকার যে ভাবে উৎকীর্ণ আছে, তাহার সহিত এই শব্দের ঔকারের আকৃতিগত পার্থক্য আছে।

(১৩) "বাসাগারিক শব্দ" পালরাজগণের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় না।

(১৪) এই স্থানের কয়েকটি অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

১৯। ষণিক-পানীয়াগারিক-শাস্তকিকর্ম্মকর-গৌল্মিক-

গৌল্মিক-

হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যাপৃতক-গো-

২০। মহিষ্যজাবিকবড়বাধ্যক্ষাদি-সকলরাজপাদোপজীবি-

নোঽন্যাংশ্চ চাটভটজাতীয়ান্ স [ কর- ]

২১। ণ-ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং (১৫) মানয়তি বোধয়তি

সমাদিশতি চ

বিদিতমতমস্তু ভবতাং গ্রামো-

২২। য়ং চতুঃসীমাপর্য্যন্তঃ স্বসম্ভোগসমেতঃ সজলস্থলঃ

সোদ্দেশঃ সগর্ত্তোষরঃ সাম্র [ মধু- ]

২৩। কঃ সগোকুলঃ স [ শাদ্ব ] ল-

২৪। বিটপলতান্বিতঃ সহট্ট-প-

২৫। ট্টঃ

২৬। সমস্তক্ষিতি-

২৭। ঃ পরিহৃতসর্ব্বপীড়ঃ আচটভটপ্রবেশঃ

অকিঞ্চিৎকরপ্রগ্রা-

২৮। [হ্য আচন্দ্রার্কতারকক্ষিতি-সমকালং যাবৎ।

……বিন ( নি ) র্গতায়

২৯। ভট্ট। শ্রীবাসুদেবপুত্রায় ভট্টশ্রীনিব্বোকশর্ম্মণে

ভার্গবসগোত্রায়

৩০। য-] মদগ্নি-ঔর্ব্ব্য-আপ্নুবান্-প্রবরায় আপ্নুবান্-

ঔর্ব্ব্য-যামদগ্ন-চ্যবন-ভা-……

---

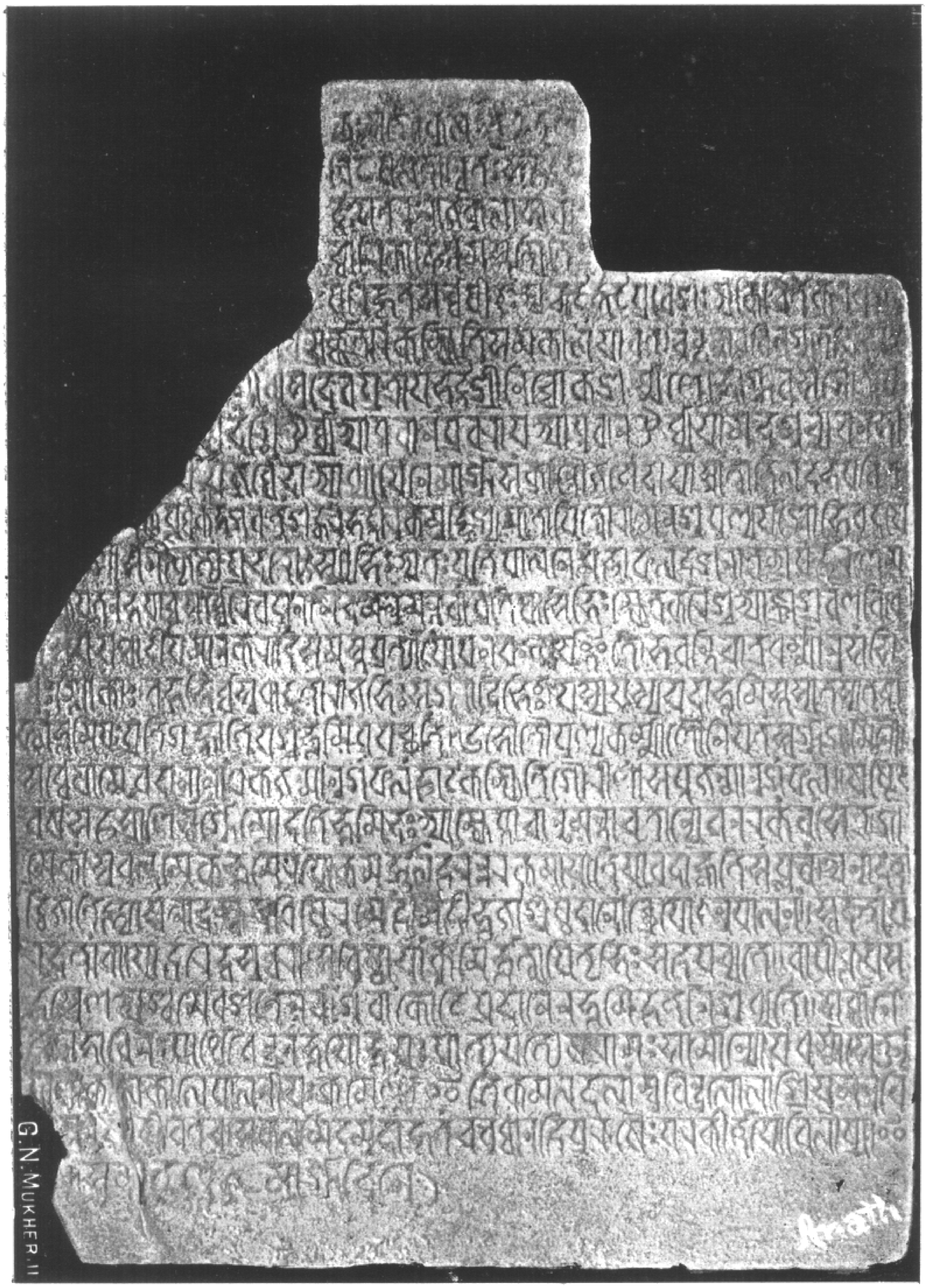
(১৫) বাচ্চা ঝা "সচরণ-ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং" পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। ২০ পংক্তিতে স অক্ষরের পর ক-অক্ষরের কিয়দংশমাত্র বর্ত্তমান আছে; ২১ পংক্তির প্রথমেই মূর্দ্ধণ্য ণকার; ব্রাহ্মণ-শব্দের সহিত সমাস-নিবদ্ধ এই শব্দটি "সকরণ" বলিয়াই প্রতিভাত হয়। ধর্ম্মপালের [ খালিমপুরে আবিষ্কৃত ] তাম্রশাসনে "ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বক" আছে; পরবর্ত্তী পাল-নরপালগণের শাসনে তাহা নাই। "সকরণব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং" পাঠ

৩১। যজুর্ব্বেদা আধ্যায়িনে (১৬) মার্গসংক্রান্তৌ
জটোদায়াং ( জটোদয়ায়াং ? ) স্নাত্বা তিলদর্ভপবিত্র-
৩২। পূর্ব্বকং ভগবন্তং শঙ্করভট্টারকমুদ্দিশ্য
মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে
৩৩। [ তাম্র- ] শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। অতঃ প্রতিপালনে
মহাফলদর্শনাৎ অপহরণে ম-
৩৪। [ হা-নর ] কপতন-ভয়াৎ সর্ব্বৈরেব দানমিদনুমন্তব্যং
প্রতিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরৈশ্চাজ্ঞাশ্রবণবিধে-
৩৫। [ য়ৈ ] ভূয় যথাদীয়মান-করাদি-সমস্ত-প্রত্যায়োপনয়ঃ
কার্য্য ইতি।
ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুসং (শং) সি-
৩৬। নঃ শ্লোকাঃ।
বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা
৩৭। ফলং [ ॥ ]
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
৩৮। সর্ব্বেষামেব দানানাং একজন্মানুগং ফলং [ । ]
হাটক-ক্ষিতি-গৌরীণাং সপ্তজন্মানুগং ফলং ॥
ষষ্টিং ( ১৭ )-
৩৯। বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ [ । ]
আক্ষেপ্তা চানুমন্তাচ তান্যেব নরকং বসেৎ [ ॥ ]
গা-
৪০। মেকাং সুবর্ণমেকং ভূমেরপ্যেকমঙ্গলং [ । ]

---

(১৬) "যজুর্ব্বেদাধ্যায়িনে" পাঠ করিতে হইবে।

(১৭) এই একটিমাত্র স্থলে অনুস্বার-চিহ্ন প্রচলিত বাঙ্গালা চিহ্নের ন্যায় উৎকীর্ণ রহিয়াছে; অন্যান্য স্থলে মাত্রার উপরে বিন্দু ক্ষোদিত আছে।




মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন [ পশ্চাতের পৃষ্ঠা ]।

Mohila Press, Cal.

হরন্নরক মায়াতি যাবদাহূতি-সংপ্লবং [ ॥ ] ( ১৮ )
অন্যদত্তাং

৪১। দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির।
মহামহীভুজাং শ্রেষ্ঠ দা  চ্ছ্রেয়োঽনুপালনং ॥
স্বদত্তাং প-

৪২। রদত্তাং বা যো হরে দ্বসুন্ধরাং ( ১৯ )।
স বিষ্ঠায়াং কৃমি র্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥
বাপীকূপ-স

৪৩। হস্রেণ অশ্বমেধ-শতেন চ।
গবাং কোটিপ্রদানেন ভূমিহর্ত্তা ন শুধ্যতি ॥
সর্ব্বানে-

৪৪। তান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্র ( ন্দ্রা ) ন্।
ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ [ । ]
সামান্যোয়ং ধর্ম্মসেতু র্নৃ-

৪৫। পানাং
কালে কালে পালনীয়ঃ ক্রমেণ ॥
ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং
শ্রিয় মনুচি-

৪৬। [ ন্ত্য ম ] নুষ্য-জীবিতঞ্চ।
সকলমিদ মুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা
ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যা ॥
ই-

৪৮। [ তি ] সম্বৎ ৩৫ মার্গ দিনে [ ১ ]

(১৮) এই শ্লোক ধর্ম্মপালের এবং দেবপালের তাম্রশাসনে উদ্ধৃত হয় নাই। প্রথম মহীপালদেবের [ বাণগড়ে আবিষ্কৃত ] তাম্রশাসনে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহাতে "স্বর্ণমেকঞ্চ" এবং "ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলং" পাঠ উদ্ধৃত আছে।

(১৯) "যো হরেত বসুন্ধরাং" এই পাঠ পরিত্যক্ত হওয়ায়, ছন্দোভঙ্গ ঘটিয়াছে। ইহা লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই বোধ হয়।

[ বঙ্গানুবাদ ]

( ১ )

রাঢ়াদেশের অধিপতির পুত্র নৃপবংশকেতু ৺ধূর্ত্ত ঘোষ [ তিগ্মাংশুচণ্ডঃ ]। সূর্য্যের ন্যায় প্রচণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন ; তাঁহার শাণিত অসিধারায় অরিকুলের গর্ব্বলেশ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।

( ২ )

তাঁহা হইতে শ্রীবালঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সমরব্যবসায়-সার-বিস্ফূর্জ্জিত তরবারিরূপ বজ্রের আঘাতে বৈরিবর্গ ক্ষতবিক্ষত হইত। তিনি ঘোষ-কুল-কমল-সমূহের পক্ষে [ আনন্দদায়ক ] মার্ত্তণ্ডমণ্ডল বলিয়া পৃথিবীতে প্রথিত হইয়াছিলেন।

( ৩ )

তাঁহার ধবলঘোষ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রচণ্ডদণ্ড ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতাপ পৃথিবীতে গীত হইয়াছিল। তিনি [শত্রু] সেনা-তিমির-বিনাশী দিবাকরতুল্য ছিলেন ; বৈরিকুল পর্ব্বতের পক্ষে বজ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেন।

( ৪ )

ভবানীর অপরা মূর্ত্তির ন্যায়, সীতার ন্যায় পতিব্রতা, এবং ( শার্ঙ্গীর ) বিষ্ণু-দায়িতা লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার সদ্ভাবা নাম্নী ভার্য্যা ছিলেন।

( ৫ )

সেই ভার্য্যার গর্ভে এই পুত্র ঈশ্বরঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সূর্য্যের ন্যায় বীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত সাহস ছিল, অধিক কি বলিব, কান্তিপ্রভায় তিনি ইন্দ্রের কান্তিদ্যুতিকে পরাভূত করিয়াছিলেন। সেই শৌর্য্যনির্জ্জিতরিপু সুবিখ্যাত প্রতাপশালী বীরবরের প্রতাপে শত্রুরমণীগণ বাষ্পজলমলিন বদনমণ্ডল ধারণ করিতেন।

[ গদ্যাংশ সরল বলিয়া অনূদিত হইল না। ]

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

# মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

**ভারতী।** বৈশাখ।—শ্রীঅজিতকুমার হালদারের 'কল্যাণী' নামক পটের প্রতিপাদ্য কি, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারিলাম না। চিত্রিতা নারীর এক হস্তে কমল বা কুমুদ, আর এক হস্ত বীণায় নিবিষ্ট। কমলে কি কল্যাণ সূচিত হইতেছে? 'ভারতীয় চিত্রকলা'র বহু মুদ্রাদোষে পটখানি ধন্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে অন্য কোনও বিশেষত্ব নাই। অবনীন্দ্রনাথের পাঠশালে যাঁহাদের হাতে খড়ি হয় নাই, তাঁহারা 'কল্যাণী'র বর্ণলেপে কোনও সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিতে পারিবেন না। 'নব বর্ষ' নামক পদ্যে কবি লিখিয়াছেন,—

> 'বিদায়-আসরে ওই থেমে গেল গাজনের ঢাক,
> সন্ন্যাসীর উন্মাদ চীৎকার।'

এটুকু অত্যন্ত মিষ্ট, সে বিষয়ে মতভেদ হইবার কারণ নাই। কেন না, 'ঢাকের বাদ্যি' থামিলেই মিষ্ট লাগে। 'উন্মাদ-চীৎকারে'র অবসানও সর্ব্বথা প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের অরাজক সাহিত্যে এক উন্মাদ-চীৎকার শব্দ-ব্রহ্মে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই নূতন চীৎকারের উদ্ভব হয়। সুতরাং বধির না হইয়া আর নিস্তার নাই!

কবিতা—নববর্ষের কবিতাও আবশ্যকমত লেখা যায় না। বিধাতা সকলকে কবিতা লিখিবার শক্তি দিয়াও দুনিয়ায় পাঠান না। বিধাতা শক্তি না দিন, দুরাকাঙ্ক্ষাটুকু মুক্তহস্তে দান করিয়া থাকেন। তাহার ফলে অনেকেই প্রাংশু-লভ্য ফলের লোভে উদ্বাহু বামনের দশা লাভ করেন। কিন্তু 'গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্'—এ চিন্তা কখনও তাঁহাদের মনে উদিত হয় না! কালিদাসের হইয়াছিল বটে; কিন্তু এই শ্রেণীর কবি-যশঃপ্রার্থীরা কালিদাস-বিজয়ী! শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যুগ্মতারা' সুখপাঠ্য আখ্যায়িকা। উর্দ্দু শব্দগুলির টীকা দিলে বর্ণনার সৌন্দর্য্য সাধারণের উপভোগ্য হইত! শ্রীসুরেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাপানে নববর্ষ' উল্লেখযোগ্য। লেখক ভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বর্ণনীয় বস্তু কৌতূহলের সৃষ্টি করে। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ নাগের 'চা-প্রসঙ্গ' নানা তথ্যে পূর্ণ। উপসংহারে লেখক লিখিয়াছেন,—

'আসাম ও বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এখনও চা-র উপযোগী জমী রহিয়াছে। ধনশালী ব্যক্তিগণের উচিত সেই সমস্ত স্থানে চা বাগান খুলিয়া ধনাগমের উপায় করা। বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জলপাইগুড়ীই চা-আবাদের উপযুক্ত স্থান; কিন্তু জলপাইগুড়ীর জমী প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। আসামে কিন্তু এখনও লক্ষ লক্ষ একর জমী পড়িয়া রহিয়াছে। অর্থের অভাবে সে স্থানের অধিবাসিগণ কাজ করিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গালীগণ কোম্পানী করিয়া আসামবাসীদের সঙ্গে কার্য্য করিলে ভাল হয়।'

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী 'দুপুরে ও নিশীথে' বৈরাগ্যের—দেহতত্ত্বের—'ও পারে'র গান ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'তাঁহার' সন্ধানে মানসীকে নিযুক্ত করিবার পর, বাঙ্গালা সাহিত্যের কবিতাকুঞ্জে—টপ্পার আসরে বৈরাগ্যের সুর জমিয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের মানসীর ব্রহ্ম-লাভের বয়স হইয়াছে। নবীন কবিরাও যদি সঙ্গে সঙ্গে গেরুয়ার আলখেল্লা পরিয়া বাউলের সুরে

দেহ-তত্ত্বের গান ধরেন, তাহা হইলে আমাদিগকেও সুরদাসের ভাষায় বলিতে হয়,—'দেখো এক বালা যোগী' ইত্যাদি! টপ্পায়, খেয়ালে, ধ্রুপদে, মেঠো সুরে, সঙ্কীর্ত্তনে 'তাঁহাকে' পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালার কবিতা কি 'যৌবনে যোগিনী' সাজিবে? এই যে নব-নারীকুঞ্জর দেখিতেছিলাম! নিমেষ না পড়িতে এ কি পরিবর্ত্তন! এই অকালপক্কের দেশে কবির অনুভূতিও কি শুকদেব গোস্বামীর মত ভূমিষ্ঠ হইয়াই তপোবনে—ও' বিষ্ণু—'সমাজে' যাত্রা করিবে? সুর-সপ্তক অক্কালাভ করিবে? কবিদের কণ্ঠে কণ্ঠে কেবল নাদব্রহ্ম গর্জ্জিতে থাকিবে? জটাজূট-শালিনী, রুদ্রাক্ষমালিনী, গেরুয়া-ধারিণী, তরুণী কবিতার কচিমুখে করুণ সুরে 'শেষের সে দিন' শুনিলে সহজ মানুষের ধমনী স্তব্ধ হইয়া যায়, গলায় ঘড়্ ঘড়্ শব্দ উপস্থিত হয়, আশা করি, নবীন কবিরাও তাহা অস্বীকার করিবেন না। অতএব, ভোঃ ভোঃ কিশোর কবিগণ! ফ্যাশনের অনুবর্ত্তী হইয়া অকালে 'ও পারে' পাড়ী জমাইবার চেষ্টা করিও না। তাহা এক দিকে যেমন হাস্যরসের উদ্দীপক, অন্য দিকে তেমনই সাংঘাতিক।—এই নবজাগরণের যুগে গতানুগতিক হইয়া দেবর্ষি নারদের বীণাতন্ত্রীর ঝঙ্কারের অনুকরণে সফল হইলেও, কোনও লাভ নাই। যদি কিছু বলিবার থাকে, নিজস্ব থাকে, বলিয়া যাও। জীবনের সন্ধ্যায় পূরবী-ইমন ভাঁজিও, এখন—অরুণরঞ্জিত প্রভাতে ললিত ভৈরবী আলাপ কর। তাহ ই স্বাভাবিক। শ্রীপঞ্চানন নিয়োগীর 'বৈজ্ঞানিক-জীবনী (?)—সুশ্রুত' নামক নিবন্ধে নানা তথ্যের সমাবেশ আছে। বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার 'জর্ণ্যাল্ অফ্ মেডিসিনে' সুশ্রুতের ও তাঁহার শস্ত্রোপচারপদ্ধতির পরিচয় দিয়াছিলেন। সে পরিচয়ে ইউরোপ স্তম্ভিত হইয়াছিল। সম্প্রতি গণ্ডালের ঠাকুর, প্রত্নতত্ত্ববিৎ হরণলী প্রভৃতিও ভারতের প্রাচীন বৈদ্যক-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। নিয়োগী মহাশয় সঙ্ক্ষেপে সুশ্রুতের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছেন; প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রতীচ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন সুধীগণের মন্তব্য উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধটি আরও উৎকর্ষ লাভ করিত। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' মামুলী 'সেন্টিমেন্টে' পূর্ণ। বাস্তুভিটায় এত আবর্জ্জনা দেখিলে দুঃখ হয় না? আগে ঠাকুরমা ও দিদিমারা গল্প শেষ করিয়া বলিতেন,—'আমার কথাটি ফুরুলো, নটে গাছটি মুড়ুলো' ইত্যাদি। এখনকার অধিকাংশ গল্পে অবশ্য 'কথা'ও থাকে না, যদি বা কচিৎ এক বিন্দু থাকে, সে কথা কিছুতেই শেষ হইতে চায় না। অগত্যা বাঙ্গালার স্বয়ংসিদ্ধ মোপার্সাঁ ও মেরিমীরা হয় কাহারও ঘাড় ভাঙ্গিয়া গল্প শেষ করেন, নয় কোনও নিপুণ লেখকের ব্যর্থ অনুকরণে ভিখারীর অবতারণা করিয়া তাহার মুখে কোনও পুরাতন গানের একটি কলি তুলিয়া দিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া দেন। নিতান্ত পক্ষে নিকটবর্ত্তী বনে একটা শেয়াল 'হুয়া-কাকা-হুয়া' রবে ডাকিতে থাকে,—কিংবা সন্নিহিত কোনও গাছের ডালে পাখী ডাকিয়া উঠে। অন্তঃপ্রকৃতির গল্প বহিঃপ্রকৃতির চীৎকারে, বা কূজনে চরিতার্থ হইয়া নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করে। আবার গাছের ডালের ও পাখীর নামের নির্ব্বাচনেও কবিত্ব থাকে। গাছটি যদি শিরীষ, চাঁপা, বা কদম হয়, তাহা হইলে তাহার ডালে ছাতারে, বা কাঠ্‌ঠোকরা 'বিরাজ' করে। আর যদি বৌ-কথা-কও, পাপিয়া, বা ঐরূপ কোনও সৌখীন পাখীকে ডাকাইতে হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালার গল্প-কল্পদ্রুম সজিনা, শ্যাওড়া, বা আমড়ার রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ, উৎকৃষ্ট ... । সৌরীন্দ্রমোহনের গল্পেও 'সজিনা গাছের ডাল

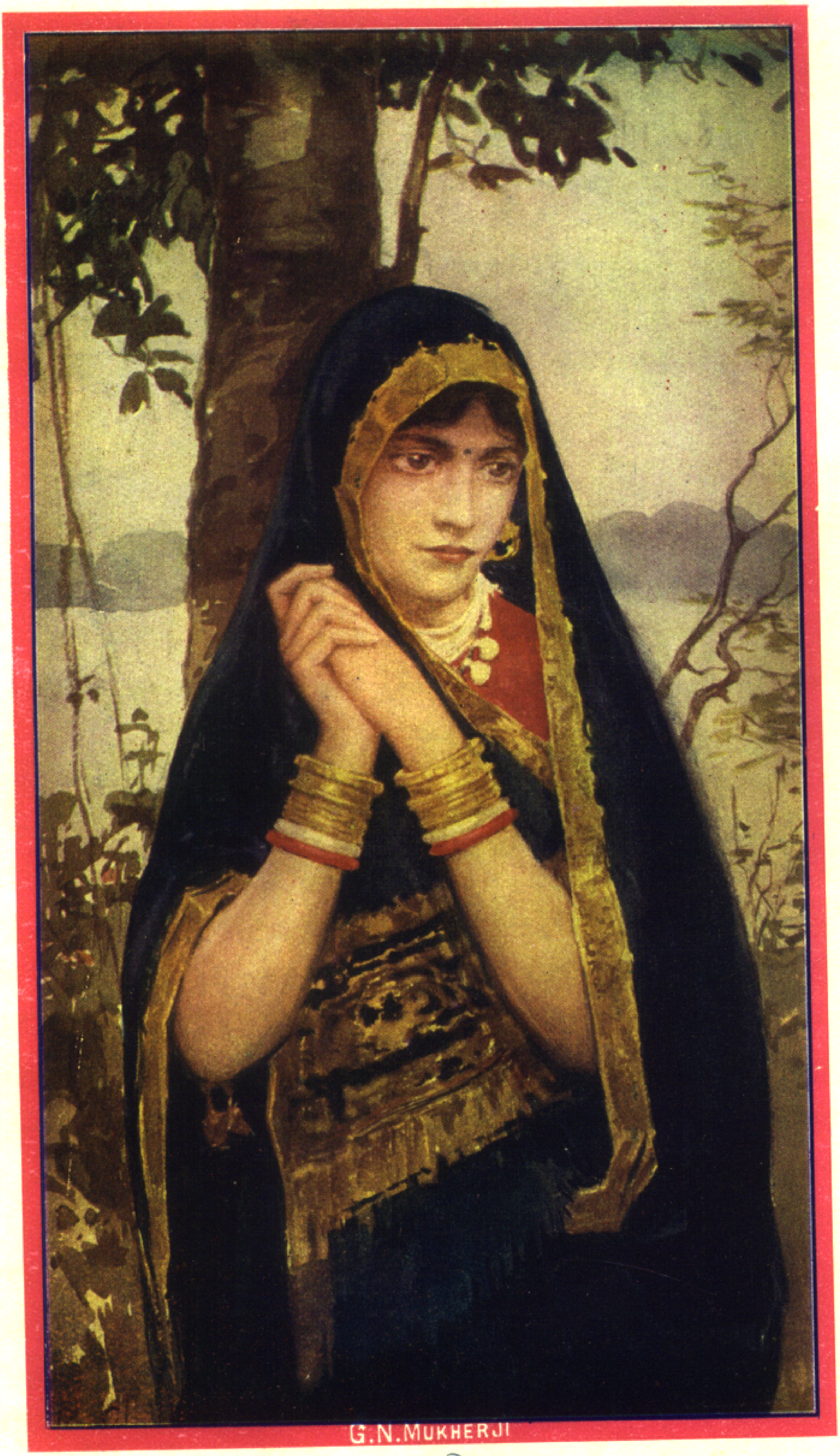
হইতে একটা পাখী ফুকারিয়া গাহিয়া' উঠিয়াছে—'চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল!" বিস্ময়ের চিহ্নটি আমাদের নহে, লেখক কর্তৃক বিন্যস্ত! গল্পে যে দৃশ্য দেখিয়া লেখকের চোখ টন্ টন্ করিতেছে, সজিনা গাছে বসিয়া পাপিয়া বেচারাও অগত্যা তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে, 'চোখ গেল!' আশ্চর্য্য নহে কি? কোনও কোনও গল্পে কোনও কোনও সিদ্ধহস্ত লেখক বহিঃপ্রকৃতির চিত্রে ও অন্তঃপ্রকৃতির ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অপূর্ব্ব রসোদ্গারে সফল হইয়াছেন, তাহা সত্য। কিন্তু সকলেই যদি 'হেলে ধরিবার পূর্ব্বেই কেউটে ও গোখ্‌রো ধরিবার' চেষ্টা করে, তাহা হইলে, নবোদ্গত-পক্ষ কল্পনা-চটকীর সর্পাঘাত যে অনিবার্য্য হইয়া উঠে! কলাকুশল নিপুণ কবির রচনায় যাহা সৌন্দর্য্য, তাহার অক্ষম অনুকরণ সর্ব্বত্র হাস্যরসের ও 'ন্যাকামী'র সৃষ্টি করে। নূতন লেখকেরা যদি নকল-নবীশীর ক্রীত-দাস না হইয়া, কল্পনাকে একটু সংযত করিয়া, সহজ-বুদ্ধিকে একটু লাগাম ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে, সুকুমার সাহিত্যে ন্যাকামীর এত বাহুল্য দেখিয়া ব্যথিত হইতে হয় না। শ্রীমতী সরলা দেবীর 'হিন্দোলা' পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। লাহোরের ও পঞ্চনদের সমাজের এক অংশের সুন্দর শব্দ-চিত্র। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষের 'সীতা ও সরমা' নামক চিত্রখানির অঙ্কন-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। চিত্রখানি ইতিপূর্ব্বে পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল!—একটা বরের পোষাকে অনেক বরের বিবাহ হইয়া যায়। স্ত্রী-সমাজেও গহনা চাহিয়া পরিবার প্রথা আছে। মামুলী পথের পথিক হইলে হানি কি?

**প্রবাসী।** বৈশাখ।—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'প্রিয়ের উদ্দেশে' নামক ছবিখানিতে নানা বর্ণের সমাবেশ আছে। বর্ণবিন্যাসের দ্যোতনা কি, তাহা আমরা 'গবেষণা' করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না। এই বর্ণ-বিভ্রাটের অন্তর্গত কোন বস্তু যে 'প্রিয়ের উদ্দেশে' কল্পিত, তাহাও সাধারণ অনুমানখণ্ডের বহির্ভূত! শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিনামূল্যে' নামক রূপকটি উপভোগ্য। প্রথম স্তবকটি না থাকিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। 'ছোটনাগপুরের ওঁরাও জাতি' উল্লেখযোগ্য। বৈশাখের 'প্রবাসী'র বিপুল কলেবর অনুবাদেই পূর্ণ হইয়াছে। 'বিজলী চমকে' নামক ছবিখানির ভাবাভিব্যঞ্জনা প্রশংসাযোগ্য। রাফেলের মাতৃমূর্ত্তির ছবি-খানি সুন্দর ছাপা হইয়াছে। এই চিত্রখানি ইতিপূর্ব্বে 'মডারণ রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত হইয়া-ছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইটি দর্গা, সুতরাং এক মুরগী দুইবার জবাই করিবার সুবিধা আছে।

**অর্চ্চনা।** বৈশাখ।—এই সংখ্যায় শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় 'ভারতে প্রথম রেলওয়ে প্রবন্ধের সূত্রপাত করিয়াছেন। আরম্ভ কৌতূহলোদ্দীপক। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থের 'শ্রুতির ইতিহাস' চলিতেছে। শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়ের 'মুঙ্গেরের রামলীলা'র উৎসবের চিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে। 'উপন্যাস-প্রসঙ্গে' বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-বিষয়ক অভিমতগুলি একত্র সংকলিত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র কোন অভিমত কোথায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নির্দ্দেশ না করি-বার কারণ কি? সম্পাদকের 'সৃষ্টি-বৈচিত্র্য' পড়িয়া আমরা এক সঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিয়াছি। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষালের 'যন্ত্রমন্দির' উল্লেখযোগ্য। সম্পাদকের 'যক্ষের ধন' নামক গল্পটি সুখপাঠ্য। 'অর্চ্চনা'র পূর্ব্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

বিজয়া। বৈশাখ।—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাজ-শক্তি ও পাতিত্য' প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য। বাঙ্গলা দেশে এ সকল কথা এমন করিয়া গুছাইয়া লিখিবার শক্তি দ্বিতীয় কাহারও নাই, তাহা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যায়। শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও থিয়েটারে' তথ্যের বাহুল্য নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কথা যতটুকু শুনি, যাহা শুনি, তাহাই মিষ্ট লাগে। বঙ্কিমচন্দ্র একটি অপেরা-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। সেই দল গঠিত হইতে না হইতেই 'জলবুদ্বুদের ন্যায় অকালে অনন্তগর্ভে মিলাইয়া গিয়াছিল' শুনিয়া, জন্সনের এক টিপ্ নস্য চাহিবার কাহিনী মনে পড়ে! শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলালের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' গৃহস্থের উপাদেয় পথ্য। রামকৃষ্ণচরিত নানা ভাবে আলোচিত ও প্রচারিত হউক, দেশবাসী কল্যাণ লাভ করিবে। শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্তের প্রাচীন 'উড়িয়া পথিক'কে 'ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার লীলা' দেখিতে পাইবেন। শ্রীবিপিনচন্দ্র পালের 'চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন' ও 'সাহিত্যাচার্য্য পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস' উল্লেখযোগ্য।

---




বনলক্ষ্মী।

চিত্রকর—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

Blocks by G. N. Mukherji, Mohila Press, Calcutta.

সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।



# সাগরিকা।

## তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

### কলিঙ্গ।

কলিঙ্গদেশ সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। তাহা অনির্ব্বচনীয় নৈসর্গিক শোভার আধার। বীচিবিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগর তাহার অতলস্পর্শ পরিখা;—বিন্ধ্য-মহেন্দ্র-কুলাচল-কলেবর তাহার দুরতিক্রম শৈলপ্রাকার;—কলিঙ্গের সশৈল-বনকানন। বসুন্ধরা যেন অসংখ্য দৃঢ় দুর্গে সুসজ্জিত।

যাহারা এক সময়ে এ দেশে নানা কীর্ত্তিকলাপের পরিচয়-প্রদানে মানব-সভ্যতার গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিল, তাহারা অতীতের ঘনান্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে;—কেহ স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত;—কাহারও স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত! তথাপি তাহাদের কীর্ত্তিকলাপের পরিচয়-গ্রহণের জন্য আধুনিক সভ্যসমাজে কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তজ্জন্য তথ্যানুসন্ধানেরও সূত্রপাত হইয়াছে। তাহার ফলে কালক্রমে ইতিহাস যথাযোগ্যভাবে সঙ্কলিত হইতে পারিবে।

তথ্যানুসন্ধানের সাহায্যে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখনও তাহা "পূর্ব্ববৃত্ত কথা"র কঙ্কালমাত্র;—প্রাণহীন, লাবণ্যহীন, হাবভাববিহীন, অযত্নবিন্যস্ত অস্থিপঞ্জর! তাহাতে শৃঙ্খলার অভাব, পৌর্ব্বাপর্য্যের অভাব, অনেক প্রয়োজনীয় গ্রন্থির অভাব। তজ্জন্য তাহা বৈজ্ঞানিক-সমাজে সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হইলেও, জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তথ্যানুসন্ধানের জন্য যে যৎসামান্য আয়োজনের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাকে এখনও যথেষ্ট বলিয়া অভ্যর্থনা করা যায় না। বরং বর্ত্তমান অবস্থায়, প্রয়োজনের হিসাবে, তাহা উল্লেখ করিতেই সঙ্কুচিত হইতে হয়। সুতরাং জনসাধারণের পক্ষে এখনও আখ্যায়িকার যুগ চলিতেছে;—কল্পনা এখনও আখ্যায়িকাকে পুষ্টতর করিয়া তুলিতেছে;—জনশ্রুতি তাহাকে নানা কাহিনীর সহিত জড়িত করিয়া ফেলিতেছে; তীর্থমাহাত্ম্য তাহারই উপর আধ্যাত্মিকতার এক অলৌকিক মোহাবরণ বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে! জনসাধারণের বিশ্বাস,—কলিঙ্গ কলিঙ্গ। তাহার সহিত কখনও অন্য কোনও প্রদেশের কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল কি না,—এখন যাহা কলিঙ্গ নামে

কথিত, তাহা কখন অন্য কোনও নামে কথিত হইত কি না,—এখন যাহা অন্য নাম ধারণ করিয়াছে, তাহা কখনও কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল কি না,—এতকাল এ সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই; তাহার মীমাংসার জন্য তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজনও অনুভূত হইতে পারে নাই।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের নাম সকলের নিকটই সুপরিচিত। অঙ্গ বঙ্গের সঙ্গে কলিঙ্গের কখনও কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল কি না? থাকিলে, কলিঙ্গে অঙ্গ বঙ্গের কীর্ত্তিকলাপের পরিচয়-লাভের উপায় আছে কি না? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কেহ কখনও বাঙ্গালার বাহিরে তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলে সমালোচকের নিকট উৎসাহের পরিবর্ত্তে উপহাস লাভ করিতে হয়;—কখনও কখনও বাঙ্গালীর প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্রেও এই আত্ম-চেষ্টার নবোন্মেষ অভিনন্দন লাভ না করিয়া, গঞ্জনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। অথচ কলিঙ্গের কথা কেবল কলিঙ্গের কথা নয়,—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের কথা,—একটি যুক্ত রাজ্যের শৌর্য্য-বীর্য্য-জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যের কথা। তাহার সহিত "সাগরিকা"র সম্পর্ক আছে। সুতরাং তাহার আলোচনা অপরিহার্য্য।

কলিঙ্গ বহু পুরাতন মানব-নিবাস। আর্য্য-সমাজে অতি পুরাকাল হইতেই তাহার নাম সুপরিচিত ছিল। কিন্তু তাহা তৎকালে আর্য্যগণের পক্ষে অগম্য দেশ বলিয়া নিন্দিত হইত। সে কোন্ পুরাতন যুগের কথা, তাহার সন্ধানলাভের সম্ভাবনা নাই। বৌধায়ন-স্মৃতিতে [ ১।১।৩৩ ] তাহার একটি জনশ্রুতিমাত্রই উল্লিখিত আছে। যথা;—

"পদ্ভ্যাং সঃ কুরুতে পাপং যঃ কলিঙ্গান্ প্রপদ্যতে।
ঋষয়ো নিষ্কৃতিং তস্য প্রাহুর্বৈশ্বানরং হবিঃ॥"

তখন কলিঙ্গ-গমনে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইত। কেবল কলিঙ্গে কেন, [ তখন ভারতবর্ষের অল্প স্থানই আর্য্যাধিকারভুক্ত ছিল, ] অধিকাংশ স্থানে গমনাগমনের পক্ষেই আর্য্য-সমাজে এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বৌধায়ন-স্মৃতিতে [ ১।১।৩২ ] তাহারও উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা;—

"অবন্তয়োঽঙ্গমগধাঃ সুরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
উপাবৃৎ সিন্ধুসৌবীরা এতে সংকীর্ণযোনয়ঃ॥"

"আরট্টান্ কারস্করান্ পুণ্ড্রান্ সৌবীরান্ বঙ্গকলিঙ্গান্ প্রানূনান্ ইতি
চ গত্বা পুনঃ স্তোমেন যজেত। সর্ব্বপৃষ্ঠয়া বা॥"

এই প্রমাণে বুঝিতে পারা যায়,—এক সময়ে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের কোনও

স্থানেই আর্য্যগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। যখন এই সকল প্রদেশে আর্য্যগণের গমনাগমনের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল, তখনও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে হইত। তাহার পর, অঙ্গ বঙ্গের ন্যায় কলিঙ্গও আর্য্য-নিবাসযোগ্য তীর্থপূর্ণ পুণ্যভূমি বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছিল। যাহা নিন্দিত ছিল, বর্জ্জনীয় ছিল, তাহা অভিনন্দনীয় হইয়াছিল। তখন আর বাধা ছিল না; নিষেধ ছিল না, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল না। বরং আত্ম-শুদ্ধিকামী তীর্থগামী ব্যক্তির পক্ষে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের তীর্থগুলি দর্শন করিবারও উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। কোন্ যুগে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান-লাভের সম্ভাবনা নাই। মহাভারতের রচনাকালের পূর্ব্বেই যে এরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু আভাস "অর্জ্জুন-তীর্থযাত্রা"-প্রসঙ্গে মহাভারতে [ আদি ; ২১৫।৫—৯ ] প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা ;—

"অবতীর্য্য নরশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভারত।
প্রাচীং দিশং অভিপ্রেপ্সুর্জ্জগাম ভরতর্ষভ ॥
আনুপূর্ব্বোণ তীর্থানি দৃষ্টবান্ কুরুসত্তমঃ।
নদীঞ্চোৎপলিনীং রম্যামরণ্যং নৈমিষং প্রতি ॥
নন্দামপরনন্দাঞ্চ কৌশিকীঞ্চ যশস্বিনীম্।
মহানদীং গয়াঞ্চৈব গঙ্গামপি চ ভারত ॥
এবং তীর্থানি সর্ব্বাণি পশ্যমান স্তথাশ্রমান্।
আত্মনঃ পাবনং কুর্ব্বন্ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ চ গাঃ ॥
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু যানি তীর্থানি কানিচিৎ।
জগাম তানি সর্ব্বাণি পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥"

সংস্কৃত-সাহিত্য-নিহিত এই দুইটি নিন্দা-প্রশংসাত্মক প্রমাণ ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়াই স্বীকৃত হইবার যোগ্য। ইহার মধ্যে আর্য্যাভিযানের বিলুপ্ত পুরাতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়,—অতি পুরা-কাল হইতে আর্য্যসমাজে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের নাম অপরিচিত না থাকিলেও, এই সকল স্থান প্রথমে আর্য্যনিবাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। তখন তাহা অনার্য্য-নিবাস বলিয়া পরিচিত ছিল, আর্য্যগণের পক্ষে অগম্য স্থান বলিয়াই নিন্দিত হইত। উত্তরকালে [ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে আর্য্যাধিকার বিস্তৃত হইবার পর ] এই নিন্দা ধীরে ধীরে প্রশংসায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল ;—এক যুগের ম্লেচ্ছভূমি আর এক যুগে যজ্ঞীয় ভূমি বলিয়া অভ্যর্থনা লাভ

করিয়াছিল। সেই সময় হইতে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে আর্য্যসভ্যতাও প্রবেশলাভ করিয়াছিল।

যাঁহারা কলিঙ্গ-ভূমিকে সভ্যতায় সমুন্নত করিয়াছিলেন, শিল্পে সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন, প্রাসাদে মন্দিরে সুসজ্জিত করিয়া নৈসর্গিক শোভা উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছিলেন, পুণ্যপ্রতাপে আর্য্যসমাজের অগম্য দেশকেও পবিত্র তীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবশ্যই কলিঙ্গের আদিম অধিবাসী ছিলেন না। তাঁহাদের বিজয়-প্রবাহ অঙ্গ বঙ্গের ভিতর দিয়াই কলিঙ্গাভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকিবে। উত্তরকালে মহাকবি কালিদাসের কল্পনা-প্রবাহ যে পথে দিগ্বিজয়ী রঘুবীরকে কলিঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, তাহাই হয় ত প্রাচ্যভারতে আর্য্যোপনিবেশ-সংস্থাপনার ঐতিহাসিক পুণ্য পথ। অঙ্গ বঙ্গ তাহার প্রবেশদ্বার। প্রথম হইতে অঙ্গ বঙ্গের সঙ্গে কলিঙ্গের এই সম্বন্ধ;—পুরাণ-কাহিনীতেও অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের নাম একসূত্রে গ্রথিত।

ইতিহাস থাকিলে, এই পূর্ব্ব সম্পর্কের ধারাবাহিক পরিচয়-লাভের সম্ভাবনা থাকিত। আধুনিক তথ্যানুসন্ধানে যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট না হইলেও, পূর্ব্ব সম্পর্কের আভাস দিবার পক্ষে যথেষ্ট। তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে,—অঙ্গ বঙ্গের কথা না জানিলে, কলিঙ্গের সকল কথা জানা যাইবে না;—কলিঙ্গের কথা না জানিলেও, অঙ্গ বঙ্গের অনেক কথা অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। সুতরাং বাঙ্গালীর পুরাকীর্ত্তির তথ্যানুসন্ধানকারিগণকে "অঙ্গ বঙ্গ উল্লঙ্ঘন (?) করিয়া", কলিঙ্গ-ভ্রমণেও ব্যাপৃত হইতে হইবে; কলিঙ্গের পুরাকীর্ত্তির তথ্যানুসন্ধানকারিগণকেও অঙ্গ বঙ্গে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে হইবে।

আর্য্যবিজয়-যুগের ইতিহাস—উত্তরোত্তর পূর্ব্বাভিমুখে রাজ্য-বিস্তারের ইতিহাস। যে মহাশক্তি পঞ্চনদ প্রদেশে আত্মবিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা চিরকাল পঞ্চনদের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে কোটরাবদ্ধ ছিল না। গঙ্গা যমুনার প্রবল প্রবাহের অনুগামী হইয়া, সে মহাশক্তি দেশের পর দেশ জয় করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বসাগরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। নদ-নদী-গিরি-কানন তাহার গতিরোধ করিতে পারে নাই; সাগর-সৈকতে উপনীত হইবার পর, অনন্ত বিস্তৃত লবণাম্বুরাশিও তাহার গতিরোধ করিতে পারে নাই। তাহা এক নূতন উচ্চাভিলাসে উৎফুল্ল হইয়া, দ্বীপ-দ্বীপান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তথা হইতে আবার দেশদেশান্তরে আর্য্য-শিক্ষা বিস্তৃত করিয়া

দিয়া, [ ভারতবর্ষের চতুঃসীমার বাহিরে, ] এক দিগন্তবিস্তৃত ভারতীয় জ্ঞান-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাসাধন করিয়াছিল। তাহার কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে কত দেবালয় এখনও উচ্চশিরে এসিয়া মহাদেশের প্রাচ্য খণ্ডের জলে স্থলে আর্য্য-বিজয়-গৌরব বিঘোষিত করিতেছে ; কত জাতির কত নতজানু নরনারী ভারতবর্ষের দিকে মুখ ফিরাইয়া করযোড়ে প্রভাতে সন্ধ্যায় ধ্যান-ধারণা-বন্দনা-নমস্কারে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া মানব-জন্ম ধন্য জ্ঞান করিতেছে। যে পথে আর্য্য-প্রভাব এইরূপে ভারতমহাসাগরবক্ষে বিচরণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ তাহার প্রবেশ-দ্বার ;—তাহার সহিত অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সম্বন্ধ সমানভাবে বর্ত্তমান।

কেহ কেহ মনে করেন,—তাহা নয়। আর্য্যাভিযানের বহু পূর্ব্বে, স্মরণাতীত পুরাকালে, মানব-সভ্যতার উন্মেষ-সময়ে, কলিঙ্গের অনার্য্যগণই সমুদ্রপথে দ্বীপদ্বীপান্তরে যাতায়াতের কৌশল উদ্ভাসিত করিয়াছিল ;—তাহারাই "নৌসাধনোদ্যত" প্রথম নাবিক ;—ভারত-দ্বীপপুঞ্জের প্রথম উপনিবেশ-সংস্থাপক। ইহাকে ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। অধিক কারণের উল্লেখ না করিয়া, দুইটিমাত্র কারণের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

আজ কাল ভারত-দ্বীপপুঞ্জে কলিঙ্গের অধিবাসীর অসদ্ভাব নাই। তাহারা কিন্তু আধুনিক যুগের জীবিকালোলুপ যাযাবরমাত্র। কলিঙ্গের অনার্য্য অধিবাসিগণের চেষ্টায় ভারত-দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া থাকিলে, তদ্দেশে তাহাদের বংশধরগণের সন্ধান-লাভের সম্ভাবনা থাকিত ; ভাষার মধ্যেও কলিঙ্গের অনার্য্য-ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতে পারিত। তাহার অভাব বিশিষ্ট প্রমাণ বলিয়াই উল্লিখিত হইবার যোগ্য।

এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি কারণ উল্লিখিত হইতে পারে। তন্মধ্যে কলিঙ্গের আদিম অধিবাসিগণের স্বাভাবিক সমুদ্রভীতি সর্ব্বজন-পরিচিত। যাহারা উৎকলের সমুদ্রোপকূলে কুটীর বাঁধিয়া, কাষ্ঠখণ্ডমাত্র অবলম্বন করিয়া ধীবর-বৃত্তিতে জীবিকার্জ্জন করিতেছে, তাহারা মাদ্রাজ প্রদেশের অধিবাসী,—কলিঙ্গের দক্ষিণ সীমার দক্ষিণ হইতে আগত। একটি নৈসর্গিক ব্যাপারও উল্লেখযোগ্য। বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমোপকূল নিয়ত তরঙ্গসঙ্কুল,—সুবৃহৎ অর্ণবপোতের পক্ষে বিষম বিভীষিকার আধার,—সে উপকূলে পোতারোহণযোগ্য অধিক আশ্রয়স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে, বঙ্গোপসাগরকূলের বিশ্ববিখ্যাত প্রধান বন্দর [ তাম্রলিপ্তি বঙ্গদেশে ;—"নৌসাধনোদ্যত" বাঙ্গালীর নৌচালনকৌশল চিরপরিচিত ;— তাহার জনশ্রুতি এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। এখনও বাঙ্গালী "লস্কর" সমুদ্রপথে পৃথিবীর সকল দেশেই যাতায়াত করিতেছে। এখন আর তাহাদের নিজের অবর্ণপোত নাই। কিন্তু তাহারা অভিজ্ঞ পোতচালক ছিল বলিয়াই, পাশ্চাত্য বণিগ্বর্গ [ এ দেশে আসিয়া ] তাহা-দিগকে চিরাভ্যস্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাহসে, অকুতোভয়তায়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠায়, আত্মত্যাগে, পরিমিতাচারে, প্রভুভক্তিতে তাহারা সভ্যসমাজের পোতচালকগণের মধ্যে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

বাঙ্গালায় কবিতার প্রভাব প্রবল। আজ বলিয়া নয়, চিরদিনই প্রবল বলিয়া সুপরিচিত। যে দিন তান-লয়-সংযোগে "ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে" জয়দেব "গীতগোবিন্দে"র সঙ্গীত-সুধার প্রবল প্লাবনে বাঙ্গালীর চিত্তক্ষেত্র রসসিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত রস-সাহিত্যই বাঙ্গালীর প্রধান সাহিত্য ;—তাহার স্তাবকের সংখ্যাই অসংখ্য ;—তাহার প্রভাব এত প্রবল যে, তাহা বৈজ্ঞানিক বিচার-প্রণালীর সুসংযত গতিভঙ্গীকেও হাস্যে লাস্যে নৃত্যকলাকৌশলে কমনীয় সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না! যে দেশ এইরূপ চির-পরিচিত কবির দেশ, এই অধঃপতনের যুগেও যে দেশের কবিতারস-মাধুর্য্যে সভ্যসমাজ মন্ত্রমুগ্ধ, সে দেশের কবিকুল স্বদেশের নাবিককুলের কীর্ত্তিকাহিনী যথেষ্টভাবে গান করেন নাই কেন,—তাহা প্রথমে একটি বিস্ময়ের ব্যাপার বলিয়াই প্রতিভাত হইতে পারে ; এবং তাহা একটি প্রতিকূল প্রমাণ-রূপেও উপন্যস্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহা ইতিহাসবিমুখ বাঙ্গালীর আত্মতৃপ্ত সরল স্বভাবের পরিচায়কমাত্র। এখনও সেই স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এখনও "সমুদ্রদর্শনে" কত কবির হৃদয়সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়া, কত অমূল্য রত্নরাজিতে বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিতেছে ; তথাপি যাহারা রত্নাকরের চিরপরিচিত বঙ্গীয় "লস্কর," তাহাদের কীর্ত্তিকাহিনী বাঙ্গা-লীর গীতিকাব্যে কীর্ত্তিত হইতেছে না কেন? যাহারা নক্ষত্রমাত্র সম্বল করিয়া, অকূল পাথারে তরণী ভাসাইয়া, নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বহির্গত হইত, পুরাতন বঙ্গসাহিত্যে তাহাদের কথা একেবারে অপরিচিত ছিল না। তাহা-দের কথা বাঙ্গালীর জনশ্রুতিতে মিশ্রিত হইয়া, বংশানুক্রমে সঞ্চারিত

হইত; উপকথায় প্রাণসঞ্চার করিয়া, বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বণিক-পুত্রের অসীম সাহসের অসামান্য কাহিনী প্রচারিত করিয়া জনসমাজকে বিস্মিত করিয়া দিত; তদীয় বিরহবিধুরা প্রাণপ্রিয়তমার "বারমাসিয়া" করুণগীতি বাঙ্গালীর নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত করিয়া রাখিত! এখন যাহা কলিঙ্গ নামে পরিচিত, সে দেশের জনসমাজের সাহিত্য বা জনশ্রুতিতে এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিদেশের গ্রন্থকারগণের গ্রন্থেও বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়;—কলিঙ্গের অধিবাসিগণের সেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বন্দরের স্মৃতি বঙ্গদেশে;—সমুদ্রযাত্রার জনশ্রুতি বঙ্গদেশে;—লস্করগণের চরিত্রবলের পরিচয় বঙ্গদেশে;—বঙ্গদেশের দক্ষিণে এ সকল বিষয়ের এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভারত-দ্বীপপুঞ্জের ভাষায়, সাহিত্যে, আচার-ব্যবহারে, শিল্পে, সৌভাগ্যে বাঙ্গালীর বিবিধ প্রভাব অভিব্যক্ত;—বঙ্গদেশের দক্ষিণে অবস্থিত আধুনিক কলিঙ্গদেশের এই শ্রেণীর প্রভাব দ্বীপপুঞ্জে অপরিচিত। তথাপি দ্বীপপুঞ্জের জনশ্রুতিতে কলিঙ্গের নামই উল্লিখিত;—অঙ্গ বঙ্গের নাম অপরিজ্ঞাত। ইহাতে বিষয়টি প্রহেলিকাপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ইহাতেই তথ্যানুসন্ধানকারিগণের দৃষ্টি এতকাল অঙ্গ বঙ্গের প্রতি নিপতিত হইতে পারে নাই। এখন ধীরে ধীরে তথ্যানুসন্ধানের পুরাতন রীতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে;—ধীরে ধীরে নিকট হইতে সুদূরেও দৃষ্টিসঞ্চালনের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে;—কোনও কোনও পাশ্চাত্য লেখক ভারত-দ্বীপপুঞ্জের সহিত বাঙ্গালীর সম্পর্ক থাকিবার সম্ভাবনায় আস্থাস্থাপন করিতে আরম্ভ করিতেছেন।

ঋষিকুল্যার দক্ষিণে এবং গোদাবরীর উত্তরে—বঙ্গোপসাগরতীরে,—যে সংকীর্ণ ভূমিখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই এখন কলিঙ্গ নামে পরিচিত,—তাহা মাদ্রাজ-প্রদেশের অন্তর্গত। তাহার উত্তরে উৎকল বা ওড়িষা; তাহার উত্তরে বঙ্গভূমি। পুরাকালেও ঠিক এইরূপ তিনটি বিভাগ ও পৃথক নাম প্রচলিত ছিল কি না, তাহার তথ্যানুসন্ধান আবশ্যক। তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে জানিতে পারা যায়,—পুরাকালে সকল সময়ে এরূপ পৃথক ভৌগোলিক বিভাগ ও পৃথক্ নাম প্রচলিত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, বঙ্গভূমির কিয়দংশও যে কলিঙ্গ নামে কথিত হইত, তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়;—একদা বঙ্গভূমির কিয়দংশ যে কলিঙ্গের

সহিত যুক্তরাজ্যরূপে শাসিত হইত, তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা কলিঙ্গের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য কথা।

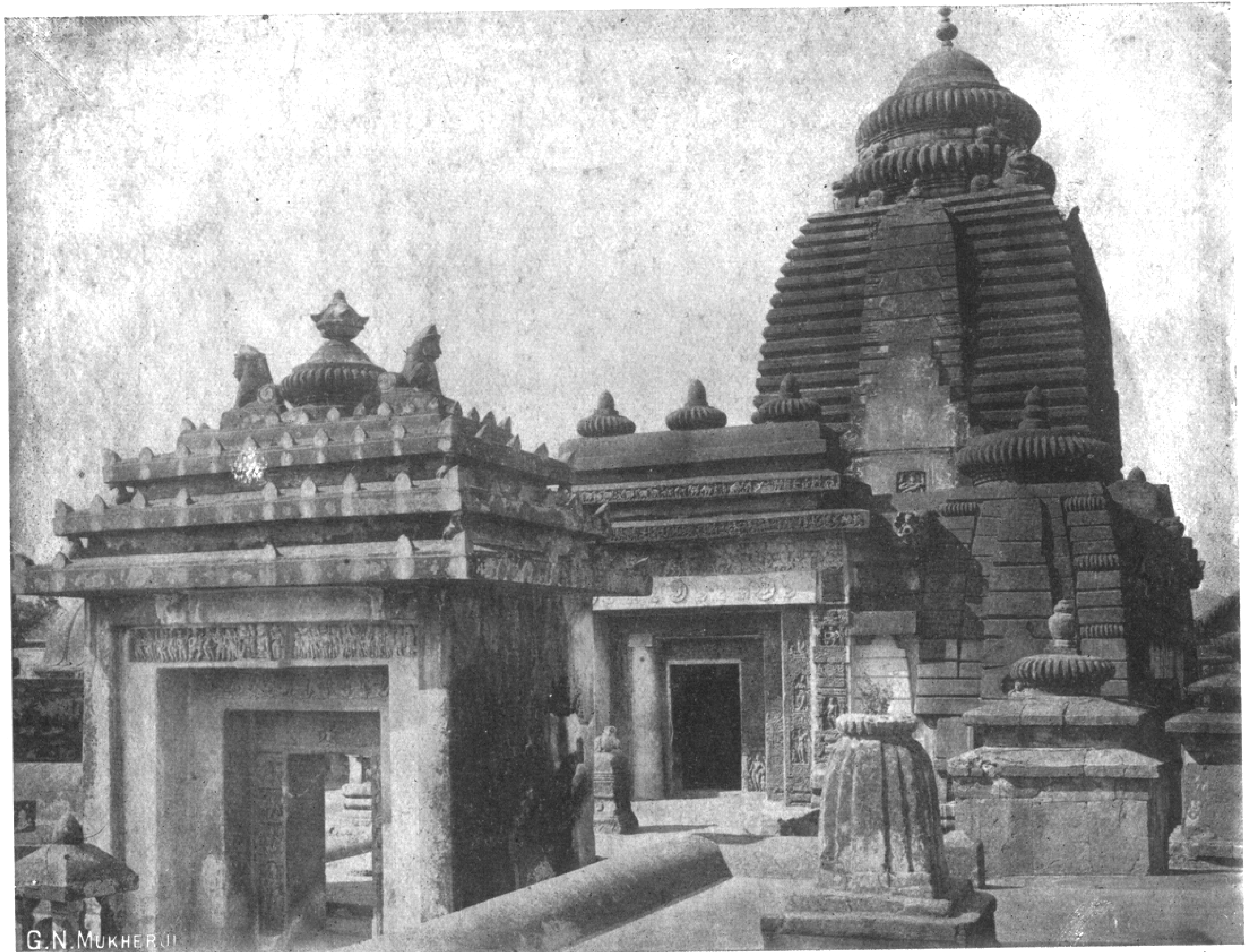
ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ইতিহাসই বিবিধ যুগে বিভক্ত হইবার যোগ্য। এক স্থানের এক যুগের বিবরণের সঙ্গে অন্য যুগের বিবরণের অসামঞ্জস্য দেখিলে, উভয় যুগের মধ্যে ব্যবধানের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারতে [ বিবিধ কথা-প্রসঙ্গে ] এইরূপ ব্যবধানসূচক বিবিধ যুগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারত এক ; কিন্তু মহাভারতোক্ত সকল স্থানের সকল বিবরণ এক নয়। অন্ততঃ কলিঙ্গের বিবরণের এক পর্ব্বের সহিত অন্য পর্ব্বের সকল সময়ে সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কর্ণ-পর্ব্বে [ ৪৪।৪২ ] দেখিতে পাওয়া যায়,—যে সকল দেশের অধিবাসিগণের সঙ্গ বর্জ্জনীয় বলিয়া কথিত হইত, কলিঙ্গ তন্মধ্যে উল্লিখিত। যথা ;—

"কারস্করাণ্ মাহিষকান্ কালিঙ্গান্ কেরলাংস্তথা।
কর্কোটকান্ বীরকাংশ্চ দুর্ধর্ম্মাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

যে যুগে কলিঙ্গ আর্য্যনিবাসের অযোগ্য ও আর্য্যগণের অগম্য বলিয়া কথিত হইত, ইহা সেই যুগের কথা। ইহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ অর্জ্জুন-তীর্থযাত্রার কাহিনীর সহিত অসামঞ্জস্য উপস্থিত হইবে। কলিঙ্গ যখন আর্য্যনিবাসের যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, তখন কোন্ স্থান কলিঙ্গ বলিয়া কথিত হইত, মহাভারতে প্রসঙ্গক্রমে তাহারও একটি আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বনপর্ব্বে [ ১১৪। ২—৪ ] যে বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় ;—গঙ্গাসাগরসঙ্গমের পরে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী পথে, কলিঙ্গে গমন করিতে হইত ;—যেখানে বৈতরণী নদী, তাহাই কলিঙ্গ। যথা ;—

"এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয়! যত্র বৈতরণী নদী।"

তখন বৈতরণীর উত্তর তীর "দ্বিজসেবিত" ছিল। তখন কলিঙ্গ বলিতে উৎকলকেই বুঝাইত। তাহার দক্ষিণের ভূভাগ মহেন্দ্র নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা কলিঙ্গের অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত থাকিলে, পৃথক্ নামে উল্লিখিত হইত না। ইহাতে যেন মনে হয়,—আর্য্যোপনিবেশ যেমন ধীরে ধীরে দক্ষিণাভিমুখে অধিকার বিস্তার করিতেছিল, কলিঙ্গের আদিম অধিবাসিগণ সেইরূপ উত্তর হইতে দক্ষিণে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইতে-ছিল, এবং তজ্জন্য দক্ষিণের অনেক স্থানই ক্রমে ক্রমে কলিঙ্গ নামে অভি-হিত হইতেছিল। এই কারণে ...




Mohila Press, Calcutta.

মুখলিঙ্গেশ্বর-মন্দির।

বর্ত্তমান কালের কলিঙ্গের আদিম অধিবাসিগণ পুরাকালে আরও উত্তরে বাস করিত; এবং তজ্জন্যই পুরাকালের কলিঙ্গ অনেক উত্তরে অবস্থিত ছিল।

প্রথম অবস্থায় প্রবল নদীস্রোত, দুরারোহ পর্ব্বতমালা, দুরতিক্রম্য মহাসাগরাদি নৈসর্গিক বাধা রাজ্যসীমারূপে ব্যবহৃত হইত। তদনুসারে বৈতরণীর উত্তরে এক রাজ্য, তাহার দক্ষিণে [ঋষিকুল্যার উত্তর তীর পর্য্যন্ত] আর এক রাজ্য, এবং তাহারও দক্ষিণে [গোদাবরীর উত্তর তীর পর্য্যন্ত] আর একটি রাজ্য নির্দ্দিষ্ট হইত। এই তিনটি রাজ্যই পর্য্যায়ক্রমে কলিঙ্গ নামে কথিত হইয়াছিল। সর্ব্বোর দক্ষিণাংশ এখনও কলিঙ্গ নামে পরিচিত; মধ্যাংশের নাম এখনও উৎকল বা ওড়িষা; উত্তরাংশ [ওড়িষার অন্তর্গত হইলেও,] বঙ্গভূমির সীমাসংলগ্ন, এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে বঙ্গভূমির একাংশ বলিয়াই কথিত হইবার যোগ্য।

পুরাতন গ্রন্থে একটিমাত্র কলিঙ্গের নামই উল্লিখিত, কিন্তু রাজশাসন-লিপিতে ত্রিকলিঙ্গ নাম অপরিচিত নহে। পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিভাগই যে সেই ত্রি-কলিঙ্গ, তাহাই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। মহেন্দ্র নামক পুরাতন প্রদেশের অন্তর্গত, মহেন্দ্রাচল হইতে চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, মহেন্দ্রগিরির বহুবিস্তৃত উপত্যকাভূমির একাংশে,—বংশীধারা নদীতীরে, মুখলিঙ্গম্ নামক একটি প্রাচীন স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী নগরকটকম্ নামক স্থান এক সময়ে কলিঙ্গনগর নামে কলিঙ্গের রাজধানীরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। মুখলিঙ্গম্ সেই রাজনগরের উপকণ্ঠমাত্র,—বহুসংখ্যক দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ, তথাকার প্রধান মন্দিরের নাম মুখলিঙ্গেশ্বর। তাহা এখনও উপাসকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। তাহার স্তম্ভে ও ভিত্তিগাত্রে অনেকগুলি ক্ষোদিত লিপি বর্ত্তমান আছে। একটি লিপি এইরূপ :—

১। স্বস্তি সমরমুখানেক-রিপুদর্প-ম-
২। র্দ্দন-ভুজবল পরাক্রম-পরমমা-
৩। হেশ্বর-পরমভট্টারক-নবনবতি-স-
৪। হস্র-কুঞ্জরাধীশ্বর-মহারাজা-
৫। ধিরাজ-ত্রিকলিঙ্গাধিপতি-শ্রীশ্রীমদ-
৬। নন্তবর্ম্মদেব-রাইনা চোড়গঙ্গদে-
৭। বর প্রবর্দ্ধমান-বিজয়রাজ্য-
৮। সম্বৎসর শ্র্াহি শকবর্ষাম্বুলু ১০০৩ চৈত্র

৯। মাসমোনা একাদশীয়ো আদিত্যবারমোনা

ইত্যাদি।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর এই তেলুগু-লিপিতে যে ভাবে "ত্রিকলিঙ্গ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, অন্যান্য রাজশাসনলিপিতেও সেই ভাবে ব্যবহৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্থলে একটিমাত্র লিপিই উদ্ধৃত হইল। ইহাতে যে তিনটি কলিঙ্গের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ত্রি-কলিঙ্গের এক রাজশাসনের অধীন থাকিবারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত আধুনিক কলিঙ্গই সকল সময়ে একমাত্র কলিঙ্গ ছিল না;—উৎকলও কলিঙ্গ নামে কথিত হইত; তাহার উত্তরের রাজ্যও কখনও কখনও কলিঙ্গ নামে কথিত হইত। ভারতদ্বীপপুঞ্জে যে কলিঙ্গের ক্ষীণ স্মৃতি বর্ত্তমান আছে, তাহা কোন্ কলিঙ্গ? ভাষা, সাহিত্য, আচার ব্যবহার, উপাসনাপদ্ধতি, শিল্পকলা ইত্যাদির যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াই তাহার তথ্যাবিষ্কার করিতে হইবে। বঙ্গভূমির সহিত যে তাহার কখনও কিছু-মাত্র সম্পর্ক বর্ত্তমান ছিল না, সে কথায় আর নিঃসংশয়ে আস্থাস্থাপন করিবার উপায় নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

# কাঙ্গালের স্মৃতিচর্চ্চা।*

পঞ্জিকাকার লিখিয়াছেন, বৈশাখ মাসে অক্ষয়-তৃতীয়ায় সত্যযুগের উৎপত্তি। হিন্দুর সন্তান হইয়া পঞ্জিকার দৈববাণী অবিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

কিন্তু যাঁহারা বিনা প্রমাণে এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারাও বোধ হয় ক্ষুব্ধহৃদয়ে স্বীকার করিবেন—এইরূপ এক বৈশাখে অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে আমরা সত্যই এক জন সত্যযুগের মানুষ হারাইয়াছি; এবং তাঁহারই স্মৃতিচর্চ্চার জন্য আজ এখানে সমবেত হইয়াছি।

কাঙ্গাল হরিনাথ সত্যযুগের মানুষ ছিলেন, এ কথা বলিলে সেই স্মরণীয় আদিযুগের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই। হরিনাথ কাঙ্গাল হইয়াও প্রবলের দম্ভে অবজ্ঞাপ্রকাশ করিয়াছেন; অর্থের বিপুল প্রভাবে উপেক্ষা-প্রদর্শন করিয়াছেন; অত্যাচারের উদ্যত খড়্গ অনায়াসে অগ্রাহ্য করিয়াছেন;

* স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদারের স্মৃতিসভায় প্রপঠিত।

দুর্নীতির কণ্টকপূর্ণ অরণ্যানী সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া সমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রভাব-বিস্তারের জন্য মানব-প্রীতির পবিত্র যজ্ঞে আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিয়াছেন। হরিনাথকে সত্যযুগের মানুষ না বলিব কেন? সত্যযুগের দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে সুধাময় হরিগুণগান করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়াছিলেন, ; অরণ্যের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত ভাবে বিভোর হইয়া সেই মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিত। আর বাঙ্গালার বাঙ্গালীর কাঙ্গাল হরিনাথ সেই মহাভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বাউল-সঙ্গীতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ প্লাবিত করিয়াছিলেন; সেই অমৃতময় সঙ্গীতধারা সগরকুলপাবন ভগীরথের অনুসরণকারিণী সুখ-মোক্ষ-দায়িনী জাহ্নবীর স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া সহস্র সহস্র পতিতের উদ্ধার-সাধন করিয়াছিল; কত অবিশ্বাসী নাস্তিক ও ধর্ম্মজ্ঞানহীন মূঢ়ের হৃদয়নিহিত ভস্মস্তূপে প্রেম ভক্তির প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করিয়াছিল; কত দাম্ভিক ঐরাবত সেই বিপুল প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছিল; পরমার্থসঙ্গীতে, দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গানে, প্রেম ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে তিনি অনেক নর-পশুর প্রাণে মনুষ্যত্বের সঞ্চার করিয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয়নিহিত অমূল্য স্পর্শমণির সংস্পর্শে অনেক লোহা সোনা হইয়াছিল। হরিনাথকে যদি সত্যযুগের মানুষ না বলি, তবে আর কাহাকে বলিব?

সত্য বটে, হরিনাথের দেহ সত্যযুগের মনুষ্যের দেহের মত একবিংশ হস্ত দীর্ঘ ছিল না; কিংবা তিনি লক্ষ বৎসর পরমায়ু লইয়া স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিতেন না; কিন্তু তাঁহার সেই সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত দেহে যে হৃদয় ছিল— তাহা একুশ হাত লম্বা মানুষের হৃদয়ের মতই 'দরাজ' ছিল; তাঁহার এই প্রকার পরদুঃখকাতর, ভগবৎপ্রেমে সদা বিভোর, সংসারে থাকিয়াও সদা নির্লিপ্ত, রোগে শোকে চিরনির্ব্বিকার, মানব প্রেমের সুনির্ম্মল উৎসস্বরূপ দেবোপম হৃদয় ছিল বলিয়াই কাঙ্গাল হইয়াও তিনি আমাদের মত অযোগ্য ভক্তের হৃদয়সিংহাসনে অমর-মহিমায় নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন।

কুমারখালির সহিত আমার বহুদিনের সম্বন্ধ। কুমারখালির সহিত আমার হৃদয়ের যোগ আছে বলিয়াই এখানে আমি বহুবার আসিয়াছি, তাই আজ মনে পড়িতেছে,—সেই অতীত জীবনের কথা, যখন বঙ্গজননীর ক্রোড়-সংস্থিতা এই সুজলা সুফলা গৌরী-শীকর-সিক্ত-সমীর-শীতলা নগরীর 'পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা' জনবিরল পল্লীবাটে আসিয়া ইহার অনুপম দৃশ্য-বৈচিত্র্যে ও আত্মীয় বন্ধুগণের অকৃত্রিম স্নেহে বাৎসল্যে, আদরে ও আপ্যায়নে হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত।

দুর্নীতির কণ্টকপূর্ণ অরণ্যানী সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া সমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রভাব-বিস্তারের জন্য মানব-প্রীতির পবিত্র যজ্ঞে আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিয়াছেন। হরিনাথকে সত্যযুগের মানুষ না বলিব কেন? সত্যযুগের দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে সুধাময় হরিগুণগান করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়াছিলেন,; অরণ্যের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত ভাবে বিভোর হইয়া সেই মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিত। আর বাঙ্গালার বাঙ্গালীর কাঙ্গাল হরিনাথ সেই মহাভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বাউল-সঙ্গীতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ প্লাবিত করিয়াছিলেন; সেই অমৃতময় সঙ্গীতধারা সগরকুলপাবন ভগীরথের অনুসরণকারিণী সুখ-মোক্ষ-দায়িনী জাহ্নবীর স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া সহস্র সহস্র পতিতের উদ্ধার-সাধন করিয়াছিল; কত অবিশ্বাসী নাস্তিক ও ধর্ম্মজ্ঞানহীন মূঢ়ের হৃদয়নিহিত ভস্মস্তূপে প্রেম ভক্তির প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করিয়াছিল; কত দাম্ভিক ঐরাবত সেই বিপুল প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছিল; পরমার্থসঙ্গীতে, দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গানে, প্রেম ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে তিনি অনেক নর-পশুর প্রাণে মনুষ্যত্বের সঞ্চার করিয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয়নিহিত অমূল্য স্পর্শমণির সংস্পর্শে অনেক লোহা সোনা হইয়াছিল। হরিনাথকে যদি সত্যযুগের মানুষ না বলি, তবে আর কাহাকে বলিব?

সত্য বটে, হরিনাথের দেহ সত্যযুগের মনুষ্যের দেহের মত একবিংশ হস্ত দীর্ঘ ছিল না; কিংবা তিনি লক্ষ বৎসর পরমায়ু লইয়া স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিতেন না; কিন্তু তাঁহার সেই সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত দেহে যে হৃদয় ছিল—তাহা একুশ হাত লম্বা মানুষের হৃদয়ের মতই 'দরাজ' ছিল; তাঁহার এই প্রকার পরদুঃখকাতর, ভগবৎপ্রেমে সদা বিভোর, সংসারে থাকিয়াও সদা নির্লিপ্ত, রোগে শোকে চিরনির্ব্বিকার, মানব প্রেমের সুনির্ম্মল উৎসস্বরূপ দেবোপম হৃদয় ছিল বলিয়াই কাঙ্গাল হইয়াও তিনি আমাদের মত অযোগ্য ভক্তের হৃদয়সিংহাসনে অমর-মহিমায় নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন।

কুমারখালির সহিত আমার বহুদিনের সম্বন্ধ। কুমারখালির সহিত আমার হৃদয়ের যোগ আছে বলিয়াই এখানে আমি বহুবার আসিয়াছি, তাই আজ মনে পড়িতেছে,—সেই অতীত জীবনের কথা, যখন বঙ্গজননীর ক্রোড়-সংস্থিতা এই সুজলা সুফলা গৌরী-শীকর-সিক্ত-সমীর-শীতলা নগরীর 'পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা' জনবিরল পল্লীবাটে আসিয়া ইহার অনুপম দৃশ্য-বৈচিত্র্যে ও আত্মীয় বন্ধুগণের অকৃত্রিম স্নেহে বাৎসল্যে, আদরে ও আপ্যায়নে হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত।

দুর্নীতির কণ্টকপূর্ণ অরণ্যানী সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া সমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রভাব-বিস্তারের জন্য মানব-প্রীতির পবিত্র যজ্ঞে আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিয়াছেন। হরিনাথকে সত্যযুগের মানুষ না বলিব কেন? সত্যযুগের দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে সুধাময় হরিগুণগান করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়াছিলেন, ; অরণ্যের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত ভাবে বিভোর হইয়া সেই মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিত। আর বাঙ্গালার বাঙ্গালীর কাঙ্গাল হরিনাথ সেই মহাভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বাউল-সঙ্গীতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ প্লাবিত করিয়াছিলেন; সেই অমৃতময় সঙ্গীতধারা সগরকুলপাবন ভগীরথের অনুসরণকারিণী সুখ-মোক্ষ-দায়িনী জাহ্নবীর স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া সহস্র সহস্র পতিতের উদ্ধার-সাধন করিয়াছিল; কত অবিশ্বাসী নাস্তিক ও ধর্ম্মজ্ঞানহীন মূঢ়ের হৃদয়নিহিত ভস্মস্তূপে প্রেম ভক্তির প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করিয়াছিল; কত দাম্ভিক ঐরাবত সেই বিপুল প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছিল; পরমার্থসঙ্গীতে, দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গানে, প্রেম ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে তিনি অনেক নর-পশুর প্রাণে মনুষ্যত্বের সঞ্চার করিয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয়নিহিত অমূল্য স্পর্শমণির সংস্পর্শে অনেক লোহা সোনা হইয়াছিল। হরিনাথকে যদি সত্যযুগের মানুষ না বলি, তবে আর কাহাকে বলিব?

সত্য বটে, হরিনাথের দেহ সত্যযুগের মনুষ্যের দেহের মত একবিংশ হস্ত দীর্ঘ ছিল না; কিংবা তিনি লক্ষ বৎসর পরমায়ু লইয়া স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিতেন না; কিন্তু তাঁহার সেই সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত দেহে যে হৃদয় ছিল—তাহা একুশ হাত লম্বা মানুষের হৃদয়ের মতই 'দরাজ' ছিল; তাঁহার এই প্রকার পরদুঃখকাতর, ভগবৎপ্রেমে সদা বিভোর, সংসারে থাকিয়াও সদা নির্লিপ্ত, রোগে শোকে চিরনির্ব্বিকার, মানব প্রেমের সুনির্ম্মল উৎসস্বরূপ দেবোপম হৃদয় ছিল বলিয়াই কাঙ্গাল হইয়াও তিনি আমাদের মত অযোগ্য ভক্তের হৃদয়সিংহাসনে অমর-মহিমায় নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন।

কুমারখালির সহিত আমার বহুদিনের সম্বন্ধ। কুমারখালির সহিত আমার হৃদয়ের যোগ আছে বলিয়াই এখানে আমি বহুবার আসিয়াছি, তাই আজ মনে পড়িতেছে,—সেই অতীত জীবনের কথা, যখন বঙ্গজননীর ক্রোড়-সংস্থিতা এই সুজলা সুফলা গৌরী-শীকর-সিক্ত-সমীর-শীতলা নগরীর 'পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা' জনবিরল পল্লীবাটে আসিয়া ইহার অনুপম দৃশ্য-বৈচিত্র্যে ও আত্মীয় বন্ধুগণের অকৃত্রিম স্নেহে বাৎসল্যে, আদরে ও আপ্যায়নে হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত।

এতদিন পরেও জীবনের এই জ্বালাময় মধ্যাহ্নেও কুমারখালিতে আসিয়া কাঙ্গালের সুপ্রসন্ন সৌম্যমূর্ত্তি, তাঁহার মধুর বচন, তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আমার মনে পড়িতেছে ; মনে হইতেছে, দেবতা মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, শুধু ভক্তের অর্ঘ্য তাঁহার পবিত্র স্মৃতি সুরভি করিয়া রাখিয়াছে। মনে হইতেছে, এমন মানুষকে আমরা কোন পাপে হারাইয়াছি ! যখন সময় ছিল, তখন তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনি নাই ; তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। ক্ষুদ্র কূপমণ্ডুক বিশাল মানস সরোবরের বিরাট ভাবের কিরূপে ধারণা করিবে ?

বেণুরববিমুগ্ধ মৃগশিশুর ন্যায় কাঙ্গালের প্রাণস্পর্শী আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া কিশোর বয়সে কতবার তাঁহার নিকটে গিয়াছি। তাঁহার মনুষ্যত্ব অনুভব করিয়া নিজের ক্ষুদ্রতা বুঝিতে পারিয়াছি। যাঁহাদের সহবাসে মানুষ আপনাকে চিনিতে পারে, ক্ষুদ্রতা পরিহারপূর্ব্বক উদারতা ও মহত্ত্বে ভূষিত হইবার জন্য মানবের হৃদয়ে আগ্রহের সঞ্চার হয়, তাঁহারা ধন্য ! বিধাতার কোনও নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই তাঁহারা ধরাতলে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ; তাঁহারা যাবজ্জীবন অক্লান্তপরিশ্রমে অনন্যমনে সেই মহাব্রতের উদ্‌যাপন করেন। হরিনাথ এই প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন। সংসারে থাকিয়াও যদি ঋষিত্বলাভ সম্ভব হয়, তবে তিনি 'ঋষি'-আখ্যা-লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। তিনি ধনবান ছিলেন না ; সেই জন্যই সম্ভবতঃ তিনি 'ঋষি' খেতাব লাভ করিতে পারেন নাই ! কিন্তু গৌরবপূর্ণ 'কাঙ্গাল' খেতাবে কেহ তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারে নাই।

হরিনাথের এই কাঙ্গাল অভিধা সাধারণের নিকট 'মহর্ষি' বা 'রাজর্ষি' খেতাবের অপেক্ষা অল্প গৌরবের, অল্প আদরের পরিচয় নহে। কাঙ্গাল খেতাব আমাদের এই কাঙ্গাল দেশে অগৌরবের খেতাব নহে। কাঙ্গাল আমাদের শ্মশানেশ্বর পশুপতি ! বিশ্বের অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত, তথাপি ভিখারী শঙ্করের শিঙ্গা ডমরু, জটা বাঘছাল, ভস্মবিভূতি ভিন্ন অন্য সম্বল কিছুই নাই। ভিখারী শিব কাঙ্গালের কাঙ্গাল ! কিন্তু তিনি আমাদের হৃদয়সিংহাসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত, ভক্তির অম্লান মন্দারমাল্যে নিত্য বিভূষিত। মহর্ষি হইলে কাঙ্গাল জনসমাজে যেরূপ সম্মানিত হইতেন, 'কাঙ্গাল' হইয়াও তিনি ঠিক সেইরূপই সম্মানিত হইয়াছেন। একদিন বাঙ্গালার লক্ষ কণ্ঠে কাঙ্গালের সুযশঃ কীর্ত্তিত হইয়াছিল—এ কথা কে অস্বীকার করিবে ?

কিন্তু সে দিন আর নাই। আজ বাঙ্গালার লোক কাঙ্গালের কথা ভুলিতে বসিয়াছে! ইহা তাঁহার দুর্ভাগ্য নহে, আমাদের দুর্ভাগ্য; আমাদের স্বদেশের দুর্ভাগ্য! কাঙ্গাল কোনও দিন নিজের ঢাক নিজে বাজাইয়া দেশ বিদেশে আত্মপ্রশংসা বিঘোষিত করেন নাই। তিনি আজীবন নীরবে কাজ করিয়া গিয়াছেন; তিনি নীরবে দেশের সেবা করিয়াছেন, নীরবে আর্ত্তের অশ্রু মুছাইয়া দিয়াছেন; বিপন্নের রক্ষার জন্য নীরবে অত্যাচারী বকধার্ম্মিকের নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন। অথচ যখন তিনি ভক্তিবিহ্বলচিত্তে ভগবানের মহিমার প্রচার করিয়াছেন, তখন তাঁহার সুমধুর উদাত্ত স্বরে আকৃষ্ট হয় নাই, এমন কঠিন প্রাণ কাহার ছিল?

সেই কাঙ্গাল আর ইহলোকে নাই, সুতরাং তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছি। আমরা মৃতবৎ স্পন্দনহীন জাতি; উৎসাহহীন, অসাড়, অবসাদগ্রস্ত; আমরা সমাজের বন্ধু, দেশের নায়ক, মানবের মিত্রগণকে বক্তৃতার সময় ভিন্ন অন্য সময় নিতান্তই লঘু মনে করি, এবং তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে নিদারুণ অনশনক্লেশ সহ্য করিয়া, পরার্থে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া বিধাতার বিধানে যখন ভবপারে যাত্রা করেন, তখন তাঁহাদিগকে ভুলিবার সুযোগ পাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি! দুর্লভ বাঙ্গালী-জন্ম লাভ করিয়া এ পর্য্যন্ত সকলেরই স্মৃতির সম্মান রাখিলাম, কেবল হরিনাথই বাদ রহিয়া গিয়াছেন!

আজ কাঙ্গালের স্বর্গারোহণ-তিথিতে আমরা কতিপয় বন্ধু এখানে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছি; তাঁহার আত্মার প্রীত্যর্থ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য অর্পণ করিতেছি। কিন্তু বিশাল বাঙ্গালার আর কোথাও কেহ কি তাঁহার কথা স্মরণ করিতেছে? তাঁহার কথা স্মরণ না থাকিলেও,—

"রবেনা দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে;
এই যে আমার আমার, সব ফক্কিকার; কেবল তোমার নামটি রবে।"

তাঁহার এই স্মরণীয় সঙ্গীত আমাদের সকলকেই একদিন না একদিন স্মরণ করিতে হইবে। কাঙ্গাল তাঁহার গীতে, কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে—তাঁহার বিরাট স্মৃতি-সৌধ সুবিশাল 'ব্রহ্মাণ্ড বেদে' স্ব-মহিমায় চিরদিন বিরাজিত থাকিবেন; পৃথিবীর সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষা বিলুপ্ত না হইলে কেহ তাঁহাকে ভাবরাজ্যের সমুজ্জ্বল রত্নবেদী হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। বিপন্নের বন্ধু, আর্ত্তের ত্রাতা, পতিতের সুহৃদ, অনাথের আশ্রয় কাঙ্গাল হরি-

নাথের গুণকীর্ত্তন করিতে আসিয়া আমরা তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে বসি নাই, আপনারাই ধন্য হইতে আসিয়াছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে ফরাসীর 'সাহিত্য-সম্রাট' ভিক্তর হুগোর বর্ষ-স্মৃতির উৎসব হইয়াছিল। তদুপলক্ষে ফরাসী রাজ্যে যেন নূতন জীবনের হিল্লোল প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই উৎসবকাহিনী-পাঠে বুঝিতে পারা যায়, সে উৎসব প্রকৃতই রাষ্ট্রীয় উৎসব। ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতি পর্য্যন্ত নত জানু হইয়া তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন; ফরাসী দেশের যত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, সমাজমিত্র, সাহিত্য-সেবক, সকলেই মহোৎসাহে এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া প্রতিভা ও মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। সাহিত্যাচার্য্যের স্মৃতির প্রতি ফরাসী জাতির এই বিপুল শ্রদ্ধা ও সম্মানের কথা মনে করিলে, আমাদের অপদার্থতায় হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। মনে হয়,—হরিনাথ যদি এ দেশে জন্মগ্রহণ না করিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আবির্ভূত হইতেন, তাহা হইলে এতদিন তাঁহার স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা হইত, এবং সে চেষ্টা সফলও হইত।

বঙ্গসাহিত্যে হরিনাথের কৃতিত্ব অসাধারণ। স্থুলদর্শী পল্লবগ্রাহীরা বঙ্গসাহিত্যে হরিনাথের বিশেষত্ব দেখিতে পান না; কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, হরিনাথ অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা রামমোহন রায় ও দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুসরণে কোদালী ধরিয়া জঙ্গল কাটিয়া বহুপরিশ্রমে যে প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন—আজ তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে সেই পথে চলিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার কোদালীর সমালোচনা করিতেছেন! বঙ্গের লেখকশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয়গণের নিকট যদি আমাদের মাতৃভাষা ঋণী থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার—হরিনাথের ঋণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হরিনাথের রচনা-সমালোচনার স্থান নাই; আমার সে শক্তিও নাই। তবে এইটুকু বুঝিতে পারি,—হরিনাথের রচনায় যে বিশ্বজনীন ভাব আছে, তাহা চিরন্তন, তাহা সত্য, তাহা বিশ্বসাহিত্যে স্থানলাভের যোগ্য। ভাবরাজ্যের এই বিপুল সম্পদ ভাষার ভাণ্ডারে অক্ষয় রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়াই সাহিত্য-সাম্রাজ্যে প্রাচীনযুগের বাল্মীকি, হোমার, দান্তে হইতে আধুনিক যুগের ভিক্তর হুগো,

এমারসন, কার্লাইল, ইব্‌সেন ও ঋষিপ্রতিম শ্লাভ্‌ কবি টলষ্টয় পর্য্যন্ত সকলেই সম্রাটের ন্যায় পূজিত হইতেছেন। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন কোন্‌ স্মরণাতীত যুগের—তমসাচ্ছন্ন অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে—কিন্তু বাণীর বরপুত্র কালিদাসের প্রতিভা সাহিত্য-জগতে অবিনশ্বর হইয়া আছে। সাহিত্য-সাধনায় হরিনাথ সর্ব্বাংশে আমাদের পূজার পাত্র ছিলেন।

সমাজে বাস করিয়াও হরিনাথ নিঃশঙ্ক ছিলেন; চতুঃপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র এরণ্ড-সমূহের মধ্যে তিনি সুবিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় সমুন্নত ছিলেন, মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্য তাঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে নাই, শোকদুঃখ অভাব নির্য্যাতনের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা তাঁহার শাখা প্রশাখা ভাঙ্গিতে পারে নাই। তিনি স্বতন্ত্র, উন্নত; তাঁহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধে ভগবানের চরণে নিত্য প্রসারিত ছিল; কিন্তু যখনই তিনি সেই ভাববিমুগ্ধ ভগবৎপ্রসঙ্গলিপ্সু তন্ময় দৃষ্টি অবনত করিতেন, তখনই ব্যথিতের, বিপন্নের, শোকার্ত্তের দুঃখকষ্টে তাঁহার নয়নপল্লব করুণায় সিক্ত হইত।

প্রেমভক্তি ও পরমার্থবিষয়ক সঙ্গীতের রচনায় হরিনাথের সাফল্য অসাধারণ। রামপ্রসাদ হইতে দাশরথি পর্য্যন্ত অনেক সাধক, অনেক ভক্ত প্রাচীন যুগে ভক্তিসঙ্গীত রচনা করিয়া বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছেন; তাঁহাদের সহযোগিগণের মধ্যে কাঙ্গাল হরিনাথের দান উপেক্ষার যোগ্য নহে। তাঁহার দেহতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত, ভক্তিসঙ্গীত, বাৎসল্যরসস্নিগ্ধ সকরুণ পৌরাণিক সঙ্গীতগুলি জনসমাজে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, তাহা অভিজ্ঞগণের অবিদিত নহে। তাঁহার সঙ্গীতশ্রবণে ভাবে বিভোর হইয়া যাহারা অশ্রুত্যাগ করিত, তাহাদের ভাবাভিব্যক্তি আমাদের এই বৈজ্ঞানিকযুগে উপহাসের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ভক্তের নিকট চিরদিনই তাহা অমূল্য।

হরিনাথ সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পদ আজকাল এতই সুলভ হইয়াছে যে, এই অকৃতী নগণ্য লেখকের মত সামান্য ব্যক্তির উপরও এক সময় কলিকাতার একখানি প্রধান বাঙ্গালা সাপ্তাহিকের সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের সম্পাদকতায় ও হরিনাথের সম্পাদকতায় পার্থক্য বিস্তর; আমাদের সম্পাদকতা ছিল চাকুরী, চাকুরীটা কোনও রকমে বজায় রাখিবার জন্য—আমরা সংবাদপত্র লিখিতাম। একটা বিবাদের উপলক্ষ্য পাইলেই আমরা শব্দকল্পদ্রুমের শাখায় উঠিয়া

শাখামৃগের ন্যায় নৃত্য করিতাম; এবং বাক্‌যুদ্ধে অপর পক্ষকে নির্ব্বাক করিতে না পারিলে, খবরের কাগজে ছড়া কাটিয়া ছবি আঁকিয়া তাহাকে গাধা সাজাইতাম! আমাদের 'পঞ্চাশ' হাজার গ্রাহক দুই পয়সা মূল্যে তাহা কিনিয়া পড়িত, এবং লক্ষপাটী দন্ত বিকশিত করিয়া মজা উপভোগ করিত, এবং পেট ভরিয়া হাসিয়া লইত। হাসিতে যিনি অপমান বোধ করিতেন,—এই সৃষ্টিছাড়া বেহায়াপণায় যিনি বিরক্তি অনুভব করিতেন, আমরা তাঁহাকে অরসিক ও 'বেকুব' মনে করিয়া আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইতাম। আমাদের সম্পাদকতা এইরূপ বিড়ম্বনাপূর্ণ ছিল। কিন্তু হরিনাথ উদরান্নের সংস্থানের আশায় সম্পাদকের বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই, স্বত্বাধিকারীর মনোরঞ্জনের জন্য ভাড়াটে সম্পাদকের মত তাঁহাকে আত্মসম্মান বিক্রয় করিতে হয় নাই; তাঁহার সম্পাদিত ক্ষুদ্র বার্ত্তাবহ পঞ্চাশ হাজার গ্রাহকের দ্বারেও বিশ্বের বিচিত্র বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাইত না। তাঁহার পত্রিকার পাঠক-সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার যুক্তিতর্ক, তাঁহার নির্ভীকতা, তাঁহার জনহিতৈষণা সেই সঙ্কীর্ণ পাঠকসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত; কোনও জটিল সমস্যা উপস্থিত হইলে তৎসম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তি-গত অভিমত জানিবার জন্য সকলেই আগ্রহপ্রকাশ করিত।—হরিনাথ বহু অত্যা-চারে জর্জ্জরিত, নানা অভাবে পীড়িত পল্লী-অঞ্চলের অভাব অভিযোগ বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে লেখনীধারণ করিয়াছিলেন; কাহারও ধমকে তিনি এই কঠোর কর্ত্তব্যব্রত পরিত্যাগ করেন নাই, কাহারও লাঠীর ভয়ে তিনি তাঁহার স্বাধীন মন্তব্য প্রত্যাহার করেন নাই। আর্ত্তের পরিত্রাণের জন্য, উৎপীড়কের দমনের নিমিত্ত তিনি লেখনীর ব্যবহার করিয়াছিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণদাস যে জাতির অলঙ্কার, কাঙ্গাল হরিনাথও সেই জাতির গৌরববর্দ্ধন করিয়া, সংবাদপত্র-পরিচালনে দেশের ও সমাজের হিতসাধন করিয়াছিলেন। হরিনাথ সংবাদ-পত্র-সম্পাদকগণের আদর্শ ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের এই অতি-প্রসারের দিনে, এখনও মফস্বল হইতে কত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু হরিনাথের গ্রামবার্ত্তার মত বার্ত্তাবহ একালে সর্ব্বদা দেখিতে পাই না। হয় ত বাঙ্গালা দেশের অনেক লেখক ও সংবাদ-পত্র-সম্পাদক হরিনাথের নামও জানেন না! অনেকে জানেন, হরিনাথ কতকগুলা ন্যাড়া বাউলের গান বাঁধিয়া গিয়াছেন মাত্র! সেই সকল শিক্ষিত ভদ্র জনের নিকট হরিনাথ নিতান্ত উপেক্ষার পাত্র; কারণ, তিনি বাঙ্গালার মিল্‌টন, স্কট, বাঙ্গালার শেলী, বায়রণ, বা মেকলে ছিলেন না; কিন্তু তিনি

বাঙ্গালার হরিনাথ—বাঙ্গালীর হরিনাথ। তাঁহার সনেট বনেট পরিয়া কখনও জননী বাণীর কাব্যকুঞ্জে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তাঁহার মানসী প্রতিমা সীমন্তে সিন্দুরবিন্দুশোভিতা, চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গী, অলক্তকরাগলাঞ্ছিতচরণা, কস্তাপেড়ে শাড়ী পরিহিতা, করুণার মূর্ত্তি, কোমলপ্রাণা বঙ্গগৃহলক্ষ্মী। ইহাতেই হরিনাথের মৌলিকতা, ইহাতেই তাঁহার রচনার গৌরব। তাঁহার কবিতায় আমরা বিদেশীয় ভায়োলেট, হাস্-না-হানা; ম্যাগ্‌নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা, ডেফোডিল্, বা লিলির সৌরভ পাই না বটে, কিন্তু প্রস্ফুটিত কদম্ব, কেতকী, শেফালিকা, চম্পক, রজনীগন্ধার দেশী সুগন্ধে তাঁহার কবিতা ভরপুর। ইংরেজী শিক্ষায় আমা-আমাদের রুচি কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন আমরা কারি-কটলেট-সমন্বিত, ভ্যাজাল ঘৃতে ভাজা ফুল্‌কো লুচির অত্যন্ত পক্ষপাতী; কিন্তু হরি-নাথের খাঁটী দেশীভাবপূর্ণ কবিতাগুলি আমাদের পল্লীগ্রামের সনাতন চিঁড়ার 'ফলার'! ভ্যাজালের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই; তাহার উপভোগে আমাদের শোণিতকণায় উগ্র বিষ সংমিশ্রিত হইতে পারে না। তথাপি কালধর্ম্মে সেই চিপীটক, ইক্ষুগুড়, শুখা দই ও সুপক্ক রম্ভার সংযোগে অমৃতোপম করিয়া হঠাৎ সহর অঞ্চলের 'ডিস্‌পেপ্সিয়া-গ্রস্ত বাবু লোকের পাতে দিতে সাহস হয় না। হরিনাথ কেবল কুমারখালীর নহেন, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব। হয় ত বাঙ্গালী এক দিন তাঁহাকে চিনিতে পারিবে; তাঁহার রচনার আদর করিতে শিখিবে; কিন্তু কতদিনে? একমাত্র মহাকালই তাহার উত্তর দিতে পারেন।

আমাদের এই নদীয়া জেলায় এখন সাহিত্য-চর্চ্চা উপেক্ষিত বলিয়া কোনও শ্রদ্ধাভাজন লেখক সংপ্রতি কোনও একখানি নবপ্রকাশিত বাঙ্গালা মাসিকে আক্ষেপ করিয়াছেন, শুনিয়াছি। কিন্তু নদীয়ায় সাহিত্যচর্চ্চা সত্যই কি উপেক্ষিত? নদীয়ার বর্ত্তমান সাহিত্য-সেবকগণের সংখ্যা অন্য কোনও জেলার সাহিত্যিকগণের অপেক্ষা অল্প নহে বলিয়াই আমার ধারণা। তবে তাঁহারা সকলে স্ব স্ব বাসস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সাহিত্যচর্চ্চা করেন না বটে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও হাস্যরসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'সাহিত্যে'র সুযোগ্য সম্পাদক, আমার শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সুকবি যতীন্দ্রমোহন ও গিরিজানাথ, নদীয়া-কাহিনীর লেখক কুমুদনাথ, আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃদ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত

জলধর সেন, সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণ বঙ্গ সাহিত্যে যে সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা সম্বল করিয়া নদীয়াকে সাহিত্যের দরবারে কোনও দিন অন্য সকলের পশ্চাতে কুণ্ঠিতভাবে দণ্ডায়মান হইতে হইবে না, ইহা নিশ্চিত। এই সকল স্বনামধন্য সাহিত্য-সেবকগণের মধ্যে শেষোক্ত তিন জন হরিনাথের প্রতিভায় প্রভাবান্বিত। তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক প্রবীণ লেখকগণের অগ্রণী হইলেও মাতৃভাষার রচনায় হরিনাথের নিকটেই তাঁহাদের হাতে-খড়ি। শুনিয়াছি, আমাদের অন্যতর সহযোগী লেখক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর—যিনি উপন্যাসে কল্পনাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিতে পারেন, যাঁহার রচিত বিবিধ প্রবন্ধে আমরা খাঁটী বাঙ্গলার আদর্শ চিত্র পরিস্ফুট দেখিয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করি, শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা ও রুচির এই উৎকট পরিবর্ত্তনের দিনে বাঙ্গালীকে যিনি খাঁটী বাঙ্গালী করিয়া রাখিবার জন্য জননী বাণীর উপাসনায় নিরত আছেন—তাঁহার উপরেও হরিনাথের মহৎ চরিত্র ও মোহকর সাহিত্যানুরাগের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল।

হরিনাথ খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার ধাত বুঝিতেন। বাঙ্গালীর মর্ম্মস্থলের তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন; তিনি সহজ বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন। বঙ্গের পল্লীসমাজের অন্তরে কি আশা আকাঙ্ক্ষা, কি সুখ দুঃখ বেদনা, কি আনন্দ উল্লাস হিল্লোলিত হইতেছে, হরিনাথ তাহা বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার বহুমুখ সঙ্গীতে সহানুভূতি ও করুণার বর্ণসম্পাতে তাহা মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিতেন। সেই অমৃত-মধুর সঙ্গীত উৎপীড়িতের—রোগার্ত্তের—শোকাতুরের কর্ণে, এমন কি, ভোগ-লালসাবিহ্বল বিলাসসর্ব্বস্ব ধনীর শ্রবণবিবরেও সুরসঙ্গীতের ন্যায় ধ্বনিত হইত।

জীবনের সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে! অমানিশীথিনীর নিবিড় অন্ধকারে চরাচর আবৃত; নৈশাকাশে নক্ষত্র-নিকর নির্ব্বাপিত; নিম্নে ধরাবক্ষে লতাগুল্মের পত্রান্তরালে খদ্যোতপুঞ্জের স্তিমিত দীপ্তি অদৃশ্য। গগনমণ্ডল দিগন্তব্যাপিনী কাদম্বিনীর নিকষকৃষ্ণ মুক্ত কুন্তলজালে সমাচ্ছন্ন; উদ্দাম প্রভঞ্জন সন্ সন্ শব্দে অশ্রান্তবেগে প্রবাহিত হইতেছে, আর অবিরাম জলকল্লোল ছল্ ছল্ শব্দে শ্রবণে প্রবেশ করিতেছে;—গগনে পবনে আঁধারে পাথারে প্রকৃতির কি প্রলয়ঙ্করী রুদ্র-মূর্ত্তি! এই দুঃসময়ে উদ্বেলিত উচ্ছলিত তরঙ্গভঙ্গময়ী ভব-

নদীতে আলোকহীন, শিথিলবন্ধন, শ্রান্ত জীবন-তরণী নিমগ্নপ্রায়। ভবের কূলে এবার আর বুঝি পাড়ি জমাইতে পারিলাম না, তরণী কূল হইতে এখনও বহু দূরে! মত্ত ঝটিকা শৃঙ্খলমুক্ত লক্ষ দানবের হুঙ্কারধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলিতেছে; সংসারের সকল সুখ—সকল আশার অবসান হইয়াছে; যাহারা আপনার ছিল, তাহারা পর হইয়া গিয়াছে; যাহাদিগকে শৈশবে বুকে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলাম, অনাহারে থাকিয়া নিজের মুখের গ্রাস যাহাদের মুখে তুলিয়া দিয়াছিলাম, তাহাদেরই নিকট এখন অনাবশ্যক উপসর্গে পরিণত হইয়াছি। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় সকল আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া অতীত জীবনের মর্ম্মান্তিক নিষ্ফল স্মৃতির আলোচনা করিতে বসিতে অকূলের কাণ্ডারীকে স্মরণ হয়, তখন অবসন্ন কাতর ব্যথিত হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া স্বতঃই উৎসারিত হয়,—

ওহে দিন ত গেল; সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে;  
তুমি পারের কর্ত্তা শুনে বার্ত্তা, ডাক্‌ছি হে তোমারে!  
আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে।

তখন বুঝিতে পারি, নবীন যখন প্রবীণ হইবে, বালক যখন প্রৌঢ় হইবে, তখন তাহারা হরিনাথকে চিনিতে পারিবে। আমরাও প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিয়াছি বলিয়াই হরিনাথকে কতকটা চিনিতে পারিয়াছি। তাই তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার অর্ঘ্যপ্রদানের জন্য তাঁহার চিরজীবনের সুপবিত্র সাধনক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছি। ভগবানের নিকট অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি, হরিনাথের কঠোর সাধনা সফল হউক, কাঙ্গালী বাঙ্গালীর নিজস্ব বাঙ্গালী-হৃদয় যেন উৎকট বিজাতীয় স্বভাব হইতে মুক্তিলাভ করে। যাঁহারা আমাদের পরে আসিতেছেন, তাঁহারা হরিনাথকে চিনিতে পারুন, এবং আমাদের এই জড় দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইবার পরও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সাধকশ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর হরিনাথের এই সুপবিত্র পীঠতল অনাগত ভবিষ্যতের বঙ্গীয় সাহিত্যসেবকমণ্ডলীর সাহিত্যতীর্থে পরিণত হউক। *

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

---

* ২৬শে বৈশাখ অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে কুমারখালীর হরিনাথ-উৎসবে পঠিত।

# বংশানুক্রম।

( * )

মনোবৃত্তি সম্বন্ধে দেখাইয়াছি যে, বংশানুক্রমের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়াও পিতার একরূপ, এবং পুত্র পৌত্রের অন্যরূপ ভাব, [ সুতরাং কর্ম্ম ] হইতে পারে। ভাব বিভিন্ন হইলেই কর্ম্মও বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষণে দেহের ও দৈহিক ক্রিয়ার বংশানুক্রম বিবেচনা করিলেও, মানসিক বংশানুক্রমের অনুরূপই বিবেচিত হইবে। দেহ ও মন তুল্য-রূপেই বংশানুগত হয়। (১) দেহ অথবা কোনও বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পিতা পুত্রের এক প্রকার নহে; যদিও সাদৃশ্য থাকুক, কিন্তু ঐক্য দেখা যায় না। বংশানু-গত পরিবর্ত্তন একটি মৌলিক সত্য। কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াই বংশানুক্রমে ঠিক এক প্রকার হয় না। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, যকৃতের রস-স্রাব, পাকস্থলীর পরিপাক-ক্রিয়া, মলপ্রণালীর উর্দ্ধাধঃ-সংঙ্কোচ, চক্ষু কর্ণ ইত্যাদির শক্তি, স্নায়ু ও পেশী সকলের গঠন, সংস্থান ও সংখ্যা, কঙ্কালের পরিমাপ, গঠন ও অবস্থিতি—এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষগত ক্রিয়া বংশানুক্রমে ঠিক এক প্রকার থাকে না। যেমন এই সকল সুস্থাবস্থার ক্রিয়া পুরুষানুক্রমে পরিবর্ত্তনশীল, তেমনই বিকৃত ক্রিয়া, অর্থাৎ অসুস্থ অবস্থার ক্রিয়াও পরিবর্ত্তনশীল। পিতার শিরোঘূর্ণন পীড়া ছিল; পুত্রের মৃগী রোগ হইল। পিতার ক্ষণ-ক্রোধ ছিল, পুত্রের উন্মত্ততা হইল। পিতার স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ছিল; (২) পুত্রের হস্ত-পদাদি-কম্পন-পীড়া হইল। পিতার উপদংশ পীড়া ছিল, পুত্রের স্নায়বিক অবশতা ও জড়তা হইল;—এ সকল অনেক স্থলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এ সকল স্থলে যদিও পিতৃ-অবস্থা ঠিক পুত্র-পৌত্রে সংক্রামিত হইল না, তথাপি ইহা বংশানুক্রমের উদাহরণ। কারণ, পিতার দৈহিক অবস্থাই পুত্রে আগত হইয়াছিল; কিন্তু আগত হইতেই [ সাধারণ পরিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে ] কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল; আর তাহাতেই পিতৃলক্ষণ পুত্রে ঐ সকল ভেদ প্রাপ্ত হইল। এ সকল আপাততঃ বংশানুক্রমের ব্যভিচার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত

পরিবর্ত্তিত বংশানুক্রম।

(১) Pearson's The scope and imprtance to the state of the science of Natural Eugenics.

(২) st. Vitus' Dance.

পক্ষে ইহা বংশানুক্রমের নিয়ম অনুবর্ত্তন করিয়াই চলিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আয়ুঃ; দৈর্ঘ্য; দন্তোদ্গম ও দন্তপতন; পীড়াপ্রবণতা; চাঞ্চল্য ও গাম্ভীর্য্য।

বংশানুক্রমের পরীক্ষায় মোটের উপর বুঝা যায় যে, আয়ুঃ, দৈর্ঘ্য, দন্তোদ্গম ও দন্তপতনের ফল,—এ সকল বংশানুক্রমে প্রায় ঠিক থাকে। পিতা বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেও পুত্র-পৌত্রগণ বাল্যে অথবা যৌবনে মৃত হইতে পারে। সে অন্য কথা। কিন্তু যাহারা প্রৌঢ় বয়স পার হইল, তাহারা প্রায় পিতা মাতার অনুরূপ বয়স প্রাপ্ত হয়। পুত্রকে পিতামাতার দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হইতেও অনেক স্থলেই দেখা যায়; তবে কখনও কখনও পুত্র উভয়ের মধ্যবর্ত্তী দৈর্ঘ্যও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দন্তোদ্গম অপেক্ষা দন্তপতন অধিকমাত্রায় বংশানুগত হয়, ইহা আমি অনেক স্থলে দেখিয়াছি। পিতার ৭০।৮০।৯০ বৎসর বয়সেও দন্ত পড়ে নাই; পুত্রের ও পৌত্রেরও তাহাই হইল;—পক্ষান্তরে, পিতা মাতার ৩৫।৪০ বৎসর বয়সেই দন্ত পড়িয়া গিয়াছিল, পুত্রেরও তাহাই হইল;—এরূপও অনেক সময় দেখা যায়। কিন্তু পিতা অথবা মাতার মধ্যে অপত্য যাঁহার লক্ষণ অধিক প্রাপ্ত হয়, এ সকল বিষয়ও অনেক স্থলে তাঁহারই অনুরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ হইবে, তাহা মিশ্র, অমিশ্র ও উভচিহ্নিত বংশানুক্রমের গতি পূর্ব্বপুরুষ হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিবার আশা করা যায়। জাতকের কোন্ লক্ষণ পিতার কি মাতার অনুসরণ করিবে, তাহা তাহার দেহ ও মন, মাতাপিতার দেহমনের সহিত তুলনা করিয়া বুঝিতে হয়। তৎপর বংশানুক্রমের গতি পুরুষানুক্রমে কিরূপে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাও বিবেচনা করিতে হয়। এইরূপে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে বংশানুক্রম বুঝিবার আশা করা যায়; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে বুঝিতে পারা যাইবে, তাহা বলা যায় না।

লিঙ্গ-ভেদ।

লিঙ্গ-ভেদ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, উহা এক্ষণে মেণ্ডেলের বিধান অবলম্বনে বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে। বোধ হয়, এই ভাবেই ইহার প্রকৃত মীমাংসা হইবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বাহ্য লক্ষণ সকল উপরে উপরে দেখিতে গিয়া যে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, লিঙ্গভেদও কিয়ৎপরিমাণে বংশগত। কোন নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে পুত্র অথবা কন্যা জাত হইবে,

তাহা কি বলা যায় ? আনুষঙ্গিক লক্ষণ দেখিয়া আমার মাতাঠাকুরাণী ও শ্বশ্রূঠাকুরাণী সর্ব্বদাই ঠিক্ ঠিক্ বলিতে পারিতেন। ৫।৬ মাসের গর্ভবতী নারীকে ইঁহারা অনেক সময় ঠিক্ ঠিক্ বলিয়াছেন যে, গর্ভে পুত্র কি কন্যা জন্মিবে। ৭।৮।৯ মাসে ত আমার মাতৃদেবী নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেন। আমি নিজেও চারিটি স্থলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা ঠিক বলিয়াছিলাম। পুত্র কন্যা জন্মিবার যে বংশানুক্রম, তাহা নানা উপায়েই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করা বোধ হয় মানুষের অসাধ্য নহে। বিজ্ঞান এই বিষয়ে এখনও ভাল করিয়া কিছু বলিতে সমর্থ নহে। কিন্তু পণ্ডিতগণ ও সাধারণে কতিপয় মীমাংসা এ স্থলে স্থির করিয়া লইয়াছেন। তাহারই দুই একটির সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

পিতা মাতার অত্যল্পসংখ্যক অপত্য জন্মিলে; পুত্র কন্যার তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা; অথবা, অপত্য একটিও না হইতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় শাস্ত্রে বলে, যে কন্যার ভাই জন্মে নাই, তাহাকে বিবাহ করা দোষ; কারণ, সে বন্ধ্যা হইবার আশঙ্কা আছে। পক্ষান্তরে, পিতা মাতার বহুসংখ্যক অপত্য জন্মিলে, অপত্যও কতক পরিমাণে তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা।

পিতা মাতার পুত্রসন্তান অধিক জন্মিলে পুত্রের সেই প্রকার হইবার সম্ভাবনা অধিক; তাঁহাদিগের কন্যাসন্তান অধিক জন্মিলে, পুত্রেরও সেইরূপ হইতে পারে। কিন্তু কোনও কোনও স্থলে এই বিধানের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়। আমার সংগৃহীত তালিকা-মধ্যে দুই ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে, পিতার পুত্রসন্তান অধিক হইয়াছিল, কন্যাসন্তান অত্যল্প। এমন অবস্থায় এক জনের পুত্রের পুত্রসন্তান অধিক হইল, আর এক জনের কন্যার কন্যাসন্তানই অধিক হইল। যেন এক পুরুষের পুত্রাধিক্য পরবংশের কন্যাধিক্য দ্বারা পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু পুত্রে পুত্রাধিক্য ও কন্যায় কন্যাধিক্য দেখিয়া বিবেচনা করিতে হয় যে, এরূপ ক্ষেত্রে সমলিঙ্গতা বংশানুগত হইতে পারে।

অনেক স্থলে সমতল ভূমি অপেক্ষা উচ্চ দেশে বংশানুক্রমে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের সংখ্যা অধিক হইতে দেখা যায়। সভ্যাবস্থা অপেক্ষা অসভ্যাবস্থাতেও তাহাই দেখা গিয়াছে।

দুর্ব্বল, রুগ্ন, বৃদ্ধের পুত্রসন্তান অধিক হয়।

যাহা হউক, এই সকল স্থলে পারিপার্শ্বিক অবস্থাবশতঃ জননযন্ত্রের অথবা শুক্রশোণিতের পরিবর্ত্তন হয়, এমন বলা যায় না; বরং শুক্রশোণিতের

পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত কারণে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহার অনুকূল হইয়া ফল আরও সুস্পষ্ট হইল, এইরূপ বলাই সঙ্গত। কারণ, আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, অন্তর্নিহিত শক্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় দ্বন্দ্ব হইলে, অন্তর্নিহিত শক্তিই প্রবল হইয়া থাকে।

আমরা বংশানুক্রমের আলোচনায় যে সকল তত্ত্ব অবগত হইলাম, তাহার সামাজিক ফল কিরূপ? মানবসমাজের বহুবিধ সমস্যা আমাদিগের মীমাংসার জন্য সর্ব্বদাই উপস্থিত। জীববিজ্ঞান, বিশেষতঃ বংশানুক্রমশাস্ত্র সে সকলের কি উত্তর দেয়? এই বিষয় নিতান্ত জটিল। তথাপি পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ জেদ করিয়া কোনও পক্ষের সমর্থন করা উচিত নহে। নিরপেক্ষ বিচার যে দিকে লইয়া যায়, তাহাই স্বীকার্য্য। বারান্তরে এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীশশধর রায়।

---

# ৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সামান্য একটু জোর বাতাসে যেমন কাঁচা আমটি বোঁটা ছিঁড়িয়া পড়িয়া যায়, তেমনই যেন কালের একটু জোর নিশ্বাসের তাড়না সহিতে না পারিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল গাছপাকা ফলটির মতন সংসার-কল্পবৃক্ষ হইতে টুপ করিয়া পড়িয়া গেলেন। জল-ঝড় নাই, কাল-বৈশাখীর ঝঞ্ঝাবাত নাই, শুক্লপক্ষের কৌমুদীস্নাত ত্রয়োদশীর নিশাতে আকাশের কোণে কাকচক্ষু জ্যোৎস্নার খেলা দেখিতে দেখিতে, জ্যৈষ্ঠের প্রথম বর্ষণের পর মেঘমালার শীকরস্নিগ্ধ সমীর-সন্তাড়নে যেন অম্লমধুর নিশার প্রথম যামের মাধুরী উপভোগ করিতে করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল নীরবে ভক্তসাধকের ন্যায় মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। কবির জীবন কাব্যময় মৃত্যুর আলিঙ্গনে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। কবির মহাপ্রাণ, যেন বিধাতার নির্দ্দেশে, জীবনের ক্রোড় হইতে উঠিয়া মরণের ক্রোড়ে যাইয়া বসিল। এই আসন-পরিবর্ত্তন হেতু দ্বিজেন্দ্রলালকে কাহারও নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হয় নাই, কাহাকেও কাঁদাইতে হয় নাই, কাহারও জন্য কাঁদিতে হয় নাই। মহাযাত্রার পূর্ব্বে তিনি সখা সহচরগণের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছেন, বাদ-বিতণ্ডা করিয়াছেন—কাহাকেও জানিতে দেন নাই যে, তাঁহার গণা দিন ফুরাইয়াছে; তিনি বুঝেন নাই যে তাঁহার জীবনের সন্ধ্যা মধ্যাহ্ন শেষ হইতে

না হইতেই আরব্ধ হইবে।—যাই সন্ধ্যার শঙ্খ বাজিল, মাতৃমন্দিরে প্রদীপ জ্বলিল, অমনই মায়ের আহ্বানে মায়ের ছেলে সব ভুলিয়া, সব ছাড়িয়া, মায়ের কোলে গিয়া উঠিলেন। মায়ামুগ্ধ জীব আমরা তাঁহার শবদেহ দেখিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইলাম। এমনই ভাবে তাঁহার চির-অভ্যস্ত রঙ্গের সহিত দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সংসার রঙ্গালয়ের যবনিকানিক্ষেপ করিলেন।

মৃত্যুকালে দ্বিজেন্দ্রলালের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হয় নাই। আগামী ৪ঠা শ্রাবণ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে তিনি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ করিতে পারিতেন। নদীয়ার মহারাজের প্রসিদ্ধ দেওয়ান মনস্বী কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের জনক ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মাতা শান্তি-পুরের গোস্বামী অদ্বৈতাচার্য্যের বংশের কন্যা ছিলেন। পিতৃমাতৃ উভয় পক্ষেই দ্বিজেন্দ্রলাল সিদ্ধ ব্রাহ্মণবংশের বংশধর ছিলেন। তাঁহারা সাত ভাই, এক ভগিনী; ভগিনী মালতী দেবী সর্ব্বাগ্রে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; পরে সর্ব্বাগ্রজ রাজেন্দ্রলাল দেহত্যাগ করেন। এইবার দ্বিজেন্দ্রলাল চলিয়া গেলেন। এখন দ্বিজেন্দ্রলালের পাঁচ সহোদর বর্ত্তমান রহিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এক পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন; পুত্রের নাম শ্রীমান দিলীপকুমার; কন্যা শ্রীমতী মায়া দেবী। মায়া দেবী এখনও বালিকা এবং অনুঢ়া। বালক দিলীপকুমার ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

প্রথম যৌবনে প্রশংসার সহিত এম্. এ. পাশ করিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল গবর্মেণ্টের বৃত্তিলাভ করিয়া সিসেষ্টার (cireucester) কলেজে কৃষি-বিদ্যা শিখিবার জন্য বিলাতে গমন করেন। তখন দ্বিজেন্দ্রলালের তৃতীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ মনস্বী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় তখন বিলাতে ছিলেন; সিসেষ্টার-কলেজে কৃষিবিদ্যার চর্চ্চা করিতেছিলেন। ছোট ভাইটি বিলাত যাইতেছে দেখিয়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় বিলাতে গিরিশ বাবুকে এক-খানি পত্র লেখেন। সেই পত্র পাইয়া গিরিশ বাবু সিসেষ্টার হইতে লণ্ডনে আসেন, এবং যে জাহাজে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন, সেই জাহাজ বন্দরে আসিলে গিরিশ বাবু স্বয়ং জাহাজে উঠিয়া দ্বিজেন্দ্রলালকে খুঁজিয়া বাহির করেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া যান। দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত

৺নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় বিলাতে গিয়াছিলেন। বিলাতে থাকিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল স্বীয় কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। Lyrics of Ind বা ভারতগাথা নাম দিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায় একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক রচনা করেন। ইংরেজ কবি ও মনীষী স্যর এডুইন আর্নল্ড দ্বিজেন্দ্রলালকে স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহার কবিত্বের আদর করিতেন। ভারতগাথা পুস্তকখানি তিনি আর্নল্ডের নামেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে দ্বিজেন্দ্র প্রায় এক বৎসর কাল রীতিমত ইউরোপীয় সঙ্গীতবিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছিলেন। এই চর্চ্চার ফলে, পরে তিনি বহু বিলাতী সুর ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা গানে যোজনা করিতে পারিয়াছিলেন। বিলাতের লেখাপড়া শেষ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দ্বিজেন্দ্রলাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের চাকরী লাভ করেন। এই চাকরীতেই তিনি জীবনের অবশিষ্ট অংশ যাপন করেন। বিহার প্রদেশ স্বতন্ত্র হইলে, তাঁহাকে বিহারে বদলী করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সে দেশে যাইয়া তাঁহাকে আর চাকরী করিতে হয় নাই। বাঁকুড়া হইতে ছুটী লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন; আসিয়াই শুনিলেন যে, তাঁহাকে মুঙ্গেরে বদলী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহারই অল্পদিন পরেই সন্ন্যাস রোগের সূচনা হইল; প্রায় এক বৎসর পরে ঐ রোগেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনকথা। তিনি সাধ্বী সহধর্ম্মিণী পাইয়াছিলেন; সংসার-সুখে সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার দৃষ্টিতে বাঙ্গালীর এত সুখ ত সহে না। আজ প্রায় আট বৎসর হইল, সে সতী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনের শেষটুকু বিপত্নীক অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন,—পুত্রকন্যার মুখ দেখিয়া, তাহাদিগকে জীবনের সম্বল করিয়া গণা দিন শেষ করিয়াছিলেন। এই ভাবের ছোট খাট সুখ দুঃখ জড়াইয়া বাঙ্গালীর জীবন। দেহসুখ বা দৈহিক কষ্ট, অর্থস্বাচ্ছল্য বা অর্থকৃচ্ছ্রতা, শোকের তপ্ত শ্বাস বা সম্মিলনের স্মেরানন, মানমর্য্যাদা বা উপেক্ষা—সংসারের এই কয়টি সামান্য উপাদানের আধিক্য বা রাহিত্য লইয়াই বাঙ্গালীর জীবন। বিধাতার বিধানে অল্প বাঙ্গালীর জীবনকথা ঘটনাময়ী হইতে পারে, অথবা হইয়াছে। সাধারণতঃ বাঙ্গালীমাত্রই প্রণালীসংবদ্ধা গিরিতটিনীর মত কেহ বা স্বচ্ছ সলিলসম্ভার লইয়া কুল্ কুল্ রবে বহিয়া যাইতেছে; কেহ বা দুঃখের ও দারিদ্র্যের ক্লেশ-কর্দ্দমের উপর দিয়া গৈরিকবসনে গলিয়া গড়াইয়া যাইতেছে। কাহারও জীবনে ঘটনার উত্তাল তরঙ্গ নাই, বাধাজনিত ফেনিল উর্ম্মিমালার উৎক্ষেপ নাই।

পরন্তু বালুকাবিস্তারপ্রচ্ছন্না, গুপ্তসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় ভাবুক বাঙ্গালীর জীবন সংসারের বাহ্য উষরতাকে অবহেলা করিয়া ভিতরের ভাবপঞ্জরকে যেন চূর্ণ করিয়া, অনেক সময়ে নূতন পথ ধরিয়া বহিয়া যায়। এই হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনকথা ঘটনাময়ী; এই হিসাবে তিনি বাঙ্গালীর শুষ্কস্মৃতির বেলাভূমির উপরে স্বনাম ঘন-গভীর অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; এই হিসাবে তিনি বাঙ্গালাকে ও বাঙ্গালীজাতিকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। এই ভাবের দিক্ দিয়াই দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনকথা আমাদের আলোচ্য, বিবেচ্য ও বিশ্লেষণযোগ্য।

যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে এ দেশে ফিরিয়া আসেন, তখন বাঙ্গালার ভাবস্থবিরতা ঘটিয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষার ও সভ্যতার সঙ্গীতে বঙ্গদেশে জাতিবৈরের প্রাধান্য যে নূতন ভাবের প্লাবন-তরঙ্গ আনিয়াছিল, যাহার প্রেরণায় এক দিকে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব, অন্য দিকে ভাষার ও সাহিত্যের অপূর্ব্ব উন্নতি ঘটিয়াছিল; সেই প্লাবনপ্রবাহ অতিবিস্তৃতি হেতু স্থির-স্থবির-ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাহার বেগ ছিল না; তরঙ্গভঙ্গমহিমা ছিল না; বিরোধ বা বাধা জন্য জলোচ্ছ্বাস—ভাবোচ্ছ্বাসও ছিল না। ব্রাহ্মসমাজ শ্রান্ত, ক্লান্ত, ত্রিধা বিভক্ত; বঙ্কিমচন্দ্র মুমূর্ষু, তাঁহার সাহিত্যচেষ্টা ধর্ম্মের প্রণালীতে পড়িয়া একটু জড়ভাবাপন্ন হইয়াছিল, নবহিন্দুত্বের জল-প্রপাতবিলাসের বালুকায় পড়িয়া আত্মগোপন করিয়াছিল;—বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মনীষা যেন নিশ্চল-অসাড়বৎ হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কেবল বচনের আস্ফালন ছিল; নবহিন্দু কেবল আর্য্যামীর আস্ফালন করিতেছিলেন, উন্নতিশীল শিক্ষিত-সম্প্রদায় সমাজ-সংস্কারের দোহাই দিয়া কেবল স্বেচ্ছাচারের আস্ফালন করিতেছিলেন; এবং রাজনীতিক-সম্প্রদায়, কংগ্রেসের বিশালতায় আগ্রীব-নিমজ্জিত হইয়া, কেবল একতার আস্ফালন করিতেছিলেন। 'ন্যাকামী'র প্রভাব চারি দিকে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতের Humour বা ব্যঙ্গের এ দেশে আমদানী করিয়া, দেশীয় শ্লেষের একটু মাদকতা উহাতে মিশাইয়া, বিলাতী ঢঙ্গের সুরে হাসির গানের প্রচার করিলেন। সে গান বাঙ্গালা ভাষায় যেমন অপূর্ব্ব, সে গানের সুর ও গীতপদ্ধতিও তেমনই বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন। হাসির গানের রচনায় তিনি যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন, হাসির গান গায়িতে তিনি স্বয়ং তেমনই অতুল্য ছিলেন। ময়মনসিং হইতে মালদহ পর্য্যন্ত, দার্জিলিঙ্গ হইতে ডায়মণ্ডহার্ব্বার পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সকল জেলার, সকল সমাজে,

তিনি স্বয়ং তাঁহার হাসির গান গায়িয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই নূতন, উপাদেয়, অম্লমধুর সামগ্রী শিক্ষিত বাঙ্গালী হাসিমুখেই গ্রহণ করিয়াছিল। কথায় আছে—"হাসিতে হাসিতে বালা কাঁদিয়া আকুল"—দ্বিজেন্দ্রলালের এই হাসির গান শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বহু ভাবুক বাঙ্গালী কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। কেন না, এই হাসির অন্তরালে, ব্যঙ্গশ্লেষের অবগুণ্ঠনের ভিতরে আত্মদৃষ্টির সকরুণ অনুরোধ ছিল—সে কারুণ্যপূর্ণ আহ্বানের ক্ষীণ ধ্বনি যাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে গিয়া আঘাত করিয়াছে, তাঁহাকেই কাঁদিতে হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার রচিত হাসির গানের সাহায্যে বাঙ্গালীকে হাসাইয়া মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। নব্য হিন্দু তাঁহার ব্যঙ্গে নিজের দিকে তাকাইয়াছিল। বিলাত-ফের্ত্তা বাঙ্গালী সাহেব তাঁহার শ্লেষের কশাঘাতে দেশের মুকুরে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিল; রাজনীতিক দেশহিতৈষী তাঁহার বিদ্রূপবাণে অধীর হইয়া বিদেশের আদর্শ প্রচ্ছন্ন রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল, স্বদেশের আদর্শের অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এক হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে একটা ভাব-বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন—'ন্যাকামী'র সঙ্কোচ করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ঠিক ফরাসী satire বা বিদ্রূপ নহে; উহা খাঁটী British humour বা বিলাতী ব্যঙ্গ; বাঙ্গালীর পোষাকে বাঙ্গালায় আমদানী করা হইয়াছে। ইন্দ্রনাথ শ্লেষবিদ্রূপের রাজা ছিলেন; তিনি ন্যাকামীর বিকটতাটুকুকে ফুটাইয়া তুলিয়া পথের মাঝে ন্যাকাকে অপ্রস্তুত করিতেন—লজ্জা দিতেন। তাঁহার শ্লেষবিদ্রূপে যেমন তীব্রতা ছিল, তেমনই গাঢ়তা ছিল; যেন শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক, যেখানে লাগে, সেখানকার হাড় পর্য্যন্ত কাটিয়া বসে,—মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথা লাগে, জ্বালায় অধীর হইতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান নির্ভাঁজ রঙ্গভঙ্গ। সেকালের বিদূষক যেমন মমত্বভাবমুগ্ধ হইয়া প্রতিপালক রাজার অর্থ ও প্রাধান্যজনিত ন্যাকামীটুকু মধুর মোলায়েমভাবে সভার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়া রাজাকে সংযত করিত; দ্বিজেন্দ্রলালও তেমনই বিদূষকের মাধুরী লইয়া, জাতি ও সমাজের প্রতি প্রগাঢ় মমত্বভাবে বিভোর হইয়া, সখা সহচরের দুষ্টামীর সম্ভার দিয়া, যেন সে ব্যঙ্গে নিজেকেও ডুবাইয়া, হাসির গান রচনা করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যাহাদিগকে গালাগালি করিতেন, তাহাদিগকে কখনই পর করিয়া রাখেন নাই। হাসিতে হাসিতে জড়াইয়া ধরিয়া

চিম্‌টি-টি কাটিয়া ছাড়িয়া দিতেন। তাই তাঁহার হাসির গানে বিছুটীর জ্বালা ছিল না ; আল্‌কুশীর বিস্ফোটক উদ্ভূত হইত না। পরন্তু যাহারা এই হাসির গানের চাপা করুণার অশ্রুকণার লবণস্বাদ পাইত, তাহারাই মরমে মরিয়া যাইত ; ক্ষোভে, নৈরাশ্যে, অনুশোচনায় তাহাদের এক একটি করিয়া পঞ্জর ভাঙ্গিয়া পড়িত। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সেকালের যাত্রার সঙ্গের গান নহে, ভাঁড়ের ভাঁড়ামী নহে, কথকের নকল নহে, ঠাকুর-দাদার ব্যঙ্গ নহে ; পরন্তু এই সকলের সমবায়ে বিলাতী 'হিউমরে'র চাটনীমাত্র। হাসির গানে তিনি ব্যঙ্গ করেন নাই কাহাকে লইয়া? ব্রাহ্ম, থিওসফিষ্ট, নব্যহিন্দু, বিলাতফের্ত্তা বাঙ্গালী সাহেব, ভণ্ড দেশহিতৈষী, রাজনীতিক আন্দোলনকারী, বাবু, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, হাকিম—বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর সকল রকমের ন্যাকা ধরিয়া তিনি ব্যঙ্গ করিয়াছেন। অথচ কেহই তাঁহার প্রতি রুষ্ট নহে, কেহই তাঁহাকে পর ভাবিয়া দূরে থাকে না। এই হেতু বলিতেছিলাম যে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে একটা ভাব-বিপ্লব ঘটাইয়াছিল ; স্থবির বাঙ্গালীকে কর্ম্মপ্রণোদনায় উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালীর পক্ষে উহা নূতন সামগ্রী ; পূর্ব্বে উহা বাঙ্গালায় ছিল না।

এই হাসির গান রচনা করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালী ইংরেজীনবীশকে একটা নূতন তত্ত্ব ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বিদেশের সামগ্রী কেমন করিয়া স্বদেশে আমদানী করিতে হয়, তাহা এই হাসির গানেই বাঙ্গালীকে তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার রচিত "বিরহ" ও "প্রায়শ্চিত্ত" প্রভৃতি প্রহসন হাসির গানের মঞ্জুষা নহে, পরস্বকে নিজস্ব করিবার বকযন্ত্রবিশেষ। বাঙ্গালী সাহেবের স্ত্রী রেবেকা পতি-অন্বেষণে ভারতবর্ষে আসিয়াও রেবেকা রহিয়া গেল ; বাঙ্গালিনী হইল না ; পরন্তু বাঙ্গালী সাহেব বিলাতী 'পলিশ' চাঁচিয়া ফেলিয়া অল্পায়াসেই খাঁটী বাঙ্গালী হইতে পারে, ফরাসে বসিয়া তামাকু সেবন করিতে পারে। সাহেব সাজা সহজ, পরন্তু গোরা সাজা সহজ নহে ; গোরার গুণ গ্রহণ করিতে পারিলে তাহা রহে ও সহে, কিন্তু সাহেবের হ্যাটকোট পুরাতন হইলেই জীর্ণবস্ত্রের মতন ছিঁড়িয়া পড়ে। "বিরহে" এই বাঙ্গালীত্বের পরিস্ফুরণ অতি সুন্দর ভাবে দেখান আছে। তাঁহার হাসির গান এক একটি

পড়িয়াছেন অনেক পাখী—অনেক হরবোলা, অনেক কাকাতুয়া, অনেক পাহাড়ী ময়না।

কিন্তু যে বিধাতা দ্বিজেন্দ্রলালকে অশেষ মনীষায় অধিকারী ও প্রতিভাশালী করিয়াছিলেন, সেই বিধাতা তাঁহাকে কেবল হাসিয়া ও হাসাইয়া জীবনযাপন করিতে দিলেন না। "এত সুখ সহে না"—এ কথাটা দ্বিজেন্দ্র সর্ব্বদা বলিতেন, নাটকে লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনেও খাটিয়া গিয়াছিল। নিজে সুরূপ, বিদ্বান, সুরসিক ও বহুবল্লভ; পত্নী অনিন্দ্যসুন্দরী, অশেষগুণসম্পন্না, গৃহের গৃহিণী, সংসারের সচিব, জীবনের সঙ্গিনী। এমন মণিকাঞ্চনের সংযোগ কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? দ্বিজেন্দ্রলাল ভাগ্যধর ছিলেন; তাই যৌবনকালটা সংসার-সরোবর-বক্ষে অনুরাগের কহ্লার-সদৃশ হইয়া ভাসিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কিন্তু এত সুখ বহুদিন সহিল না; প্রৌঢ়তার শীর্ষে আরোহণ করিতে না করিতে তিনি সতীর সাধ্বী পত্নীর সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলেন। যে অফুরন্ত হাসির লহর তাঁহার অধরমধ্য হইতে অজস্র জলপ্রপাতের মতন বাহির হইত; সহসা তাহা নিয়তির এক বজ্রাঘাতে বিশুষ্ক হইয়া গেল। হাস্যময় ভাবময় হইলেন; ব্যঙ্গময় করুণার ধারায় আপ্লুত হইলেন; সুখময় সোহাগের শিরীষকেশর ছাড়িয়া দুঃখের প্রস্তরপঞ্জর ভেদ করিতে উদ্যত হইলেন। জীবন-নাট্যের হাসির অঙ্ক ফুরাইল; ভাবের অঙ্ক আরব্ধ হইল।

পত্নীবিয়োগের পূর্ব্ব হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির লহরের সহিত যে ভাবের লহর আইসে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। "সীতা", "পাষাণী" প্রভৃতি নাটক ভাবসূচনার প্রথম যুগের লেখা। এ লেখায় ভাব আছে; সে ভাবাভিব্যঞ্জনায় যথেষ্ট কারিকরীও আছে। তাই "সীতা" সখের সামগ্রী, চেষ্টা-সাধা ভাবকুসুমমাত্র। "পাষাণী"তেও কারিকরীর অভাব নাই;—আয়োজনের চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত। পরন্তু পত্নীবিয়োগের পর সে ভাব উদ্দাম প্রবাহতরঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যকে যেন ডুবাইয়া পরিস্নাত করিয়া তুলিয়াছিল। এ তরঙ্গে দেশহিতৈষণার সোনার কমল, বিশ্বমানবতার পারিজাতমালা, জাতি-প্রীতির নন্দনকুসুমপরম্পরা নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। ইহাদের স্নিগ্ধ, শান্ত, শীতল সৌরভে বাঙ্গালা সাহিত্য, বঙ্গীয়-মনীষা বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। এই সৌরভে মাদকতা আছে, কিন্তু

"দুর্গাদাস","রাণা প্রতাপ", "নূরজাহান", "সাজাহান", "চন্দ্রগুপ্ত" প্রভৃতি নাটকে যে ভাবের একটানা স্রোত বহিয়াছে,—তাহা গঙ্গাতরঙ্গের ন্যায়। যেমন সকল নদনদী গঙ্গায় আসিয়া পড়িলে গঙ্গা হইয়া যায়, তেমনই ইউরোপের নানা ভাব, নানা আদর্শ, নানা স্ফুটোক্তি কবির মনীষা-খাত, প্রতিভাসমুজ্জ্বল ভাবগঙ্গার গর্ভে আসিয়া পড়িয়া আমাদের পেয়, ব্যবহার্য্য, পবিত্রীকরণের অবস্থলনস্বরূপ ভাগীরথীসলিল হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল পরস্বকে নিজস্ব করিয়াছেন; পরের সামগ্রী নিজের অঙ্গনে আনিয়া এক পার্শ্বে বোঝা বাঁধিয়া তিনি ফেলিয়া রাখেন নাই। আমাদের গৃহস্থলীর প্রত্যেক কার্য্যে সে সকল প্রযুক্ত করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন; তাঁহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয় নাই। বরং বলিব, এ পক্ষে তিনি যেমন সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন, ইদানীং অতটা সফলতা-লাভ আর কোনও বাঙ্গালী কবি ও লেখকের ভাগ্যে ঘটে নাই। কথাটা এই, দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজী সাহিত্যের ও ইংরেজী সমাজধর্ম্মের গুণপ্রধান অংশটা ধরিতে পারিয়াছিলেন—বুঝিতে পারিয়াছিলেন; পক্ষান্তরে, তিনি বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব অনেকটা বুঝিতে ও চিনিতে শিখিয়াছিলেন। উভয়পক্ষের এই পরিচয়ের ফলে, তিনি ইংরেজী সাহিত্যের সৌন্দর্য্যটুকু, আধুনিক Humanitarianism বা মানবপ্রীতির মাধুরীটুকু বাঙ্গালার সাহিত্যে আমদানী করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার গম্ভীর গানে, নাটকের ভূমিকাবিন্যাসে, ঘটনাপারম্পর্য্যের উন্মেষচেষ্টায় তিনি মানবপ্রীতির পরিচয় অনেকটা দিয়াছেন। হাসির গানে বাঙ্গালী জাতির প্রতি মমত্ববোধের প্রথম বিকাশ হইয়াছে; সে মমত্ববোধ "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" এই দুইটি গানে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই মমত্ববোধের স্ফুরণ হইয়াছে দেশাত্মবোধে; "দুর্গাদাসে" ও "রাণাপ্রতাপে" এই দেশাত্মবোধ ষোলকলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি মমত্ববোধটুকু প্রগাঢ়তালাভ করিলে, উহা বিশ্বমানবতার প্রতি পরমাপ্রীতিরূপে প্রকাশিত হইবেই; কেন না, ভারতবর্ষ যে বিশ্বের সংক্ষিপ্তসার। জগতের সকল জাতি, সকল ধর্ম্ম, সর্ব্বপ্রকারের ও সর্ব্বস্তরের সভ্যতা ভারতবর্ষে নিত্য বিদ্যমান। এই ভূমির প্রতি মমত্ববোধ ঘটিলেই উহা বিশ্বব্যাপী হইবেই। "নূরজাহান", "সাজাহান' প্রভৃতি নাটকে জগদ্ব্যাপিনী প্রীতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। বিলাতী Humanitarianismটুকু স্থানে স্থানে ঠিক বিলাতী ঢঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। প্রীতির এই

হয় নাই। ভাবের এই উচ্চতম স্তরে পহুঁছিবার পূর্ব্বেই বিধাতা তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া গেলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান লিখনপদ্ধতির উপর প্রতিভার দৌরাত্ম্য ঘটান নাই। তিনি বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের পরবর্ত্তিরূপে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে, বাঙ্গালা গদ্যপদ্যে যাহা অতি অল্পমাত্রায় ছিল, তিনি তাহাই অধিকমাত্রায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। প্রথম Directness, ভাবসরলতা, বা শব্দের নারাচ-গতি তাঁহাতে পর্য্যাপ্তপরিমাণে ছিল। যেমন "মানুষ আমরা, নহি ত মেষ", "এই দেশেতে জন্ম আমার, এই দেশেতে মরি" প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষা অভিলাষের কথাগুলি যেন তীর-গতিতে সোজাসুজি ভাবে হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে আসিয়া আঘাত করে। তিনি শব্দ-সারল্যের প্রভাবে তাঁহার মনোগত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে এমন ভাবে মুখর করিতে পারিতেন যে, তাহাদের প্রতিধ্বনি শ্রোতৃবর্গের প্রত্যেকের হৃৎতন্ত্রীতে যাইয়া সমান স্বরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। লেখকের সঙ্গে পাঠকগণও সমান আশা-আকাঙ্ক্ষায় প্রমত্ত হইয়া উঠে—তদ্ভাবভাবুক, সমরসরসিক হইতে পারে। লেখার এমন কৌশলকে একটা বড় কৌশল বলিয়া আলঙ্কারিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শব্দের ও ভাবের এই 'নারাচ-গতি'র অন্তরালে একটু পরুষ ভাব থাকেই। দ্বিজেন্দ্রলাল এই পারুষ্যকে অনুরাগের ভাবমদিরায় এতটাই মধুর করিয়াছিলেন যে, তাঁহার Masculinism বা verbe বা পারুষ্য কখনও কাহারও কর্ণে বাজে নাই; সে পারুষ্য শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কাহাকেও দূরে ঠেলিয়া ফেলে নাই;—সকলকেই আপন করিয়া যেন কোলের দিকে টানিয়া লইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখার আর একটি অপূর্ব্ব গুণ আছে—তিনি স্ফুটোক্তির সাহায্যে বিরোধালঙ্কারের অভিব্যঞ্জনা ঘটাইয়া এমন একটি অভিনব রসের অবতারণা করিতেন যে, শ্রবণমাত্রই পাঠকগণ ও শ্রোতৃমণ্ডলী অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া যাইত। ইহা ইংরেজী Climax ও Antithesis, এই দুইয়ের সমবায়ে প্রায়ই ফুটান হইত; অনেক ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষা ও মালোপমার সম্মিলনে রসের সঞ্চার করা হইত। একটা উদাহরণ দিব ঃ—

"নারীর রূপ—যা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠদান; নারীর রূপ—যা ইন্দ্রধনুর মত সেই অনাদি শুভ্ররূপকে রঞ্জিত করে; নারীর রূপ—যাহার মহিমায় পৃথিবী মদভরে

মাথা উঁচু করে' স্বর্গকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কর্চ্ছে, যেন বল্‌ছে—দেখাও দেখি,এর মত তোমার কি আছে; নারীর রূপ —যার পদতলে সমস্ত বিশ্বসৌন্দর্য্য এসে লুটিয়ে পড়ে; যার দিকে চেয়ে শব্দ সঙ্গীতে বেজে উঠে, ভাষা ছন্দে গেয়ে উঠে, জ্ঞান উন্মাদ হয়, ভক্তি নতজানু হয়ে নুয়ে পড়ে, যে সৌন্দর্য্যের কোমল করস্পর্শে পশুও বশ হয়—সেই নারীর রূপ।"

এই ভঙ্গীর লেখা তাঁহার নাটক সকলে অনেক আছে। এই ভঙ্গীর সাহায্যে তিনি ভাষায় একটা নূতন জোর, নবীন তেজ, একটা স্পর্দ্ধার প্রায়া ফুটাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই ভঙ্গী আমাদের বাঙ্গালার গদ্যে পূর্ব্বে এতটা ছিল না। ইহা দ্বিজেন্দ্রলালের আমদানী; ইহার সদ্ব্যবহার করিতে জানিলে ও পারিলে বাঙ্গালা ভাষা একটা নূতন তেজ লাভ করিবে। দ্বিজেন্দ্রলাল ধ্বনির অনুপ্রাসে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, ধ্বনির অনুপ্রাসের রাজা হইলেও, দ্বিজেন্দ্রলাল বড় ছোট ছিলেন না। তাঁহার—

"একি সরিৎরঙ্গ, শত তরঙ্গ, নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।"

যে কোনও কবিকে শ্লাঘাযুক্ত করিতে পারে। এই শব্দের ঝঙ্কার দিতে, সেই ঝঙ্কারের ভিতর দিয়া মধুর ভাবের মীড় ও গমক ফুটাইতে দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন পারিতেন, তেমন বুঝি বাঙ্গালার খুব অল্প কবিই পারিয়াছেন। নিজের ও পরের, সকলের মাধুরী তিনি তাঁহার প্রতিভার বীণায় এমন পটুতার সহিত ফুটাইতেন যে, শুনিলেই মনে হইত, বুঝি কোথায়—কোন অজানা দেশে, কেমন এক অজানা মুহূর্ত্তে শুনিয়াছি; এতদিন বিস্মৃতির ঘোরে ঢাকা ছিল, আজ কবির প্রতিভায় তাহা উদ্বুদ্ধ হইল। শ্রোতৃবর্গের মনে এই অনুকম্পার ভাব জাগাইয়া তুলিতে যে কবি যে লেখক পারেন, তিনিই ত প্রকৃত প্রতিভাশালী, তিনিই ত মনীষী। হাসির গান বলুন, কাব্যগাথা বলুন, নাটক-প্রহসন বলুন, সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্টতা—individualism ফুটিয়া আছে। দান্তের মতন তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্বকে কবিত্বের প্লাবনে ডুবাইতে পারেন নাই। তাঁহার বিশিষ্টতা সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট; তাঁহার কাব্যনাটকের দোষ গুণ তাঁহার ব্যক্তিত্বের দোষ গুণ হইতেই নিঃসৃত;—পটুতার অভাবজন্য নহে, আরাধনার ত্রুটীজন্য নহে, মনীষা ও প্রতিভার ন্যূনতা জন্য নহে। যদি কখনও তাঁহার নাটক, কাব্যগাথা ও হাসির গানের বিস্তৃত সমালোচনা হয়, যদি তাঁহার সৃষ্টির বিশ্লেষণ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, তখন তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের, মতামতের, ভাব অভাবের বিশ্লেষণও আবশ্যক হইবে; কেন না,



স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল।

[ বিভিন্ন বয়সের চিত্র ; যুগ্ম-চিত্রে কবিবরের পার্শ্বে তদীয় সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সুরবালা দেবী। ]

তাঁহাকে বুঝিতে না পারিলে, তাঁহার কাব্যগত ত্রুটী বিচ্যুতির, উৎকর্ষাপকর্ষের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না। তিনি তাঁহার বিশিষ্টতার ছাপ তাঁহার লেখায় খুব চাপিয়া জাঁতিয়া দিয়া গিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল মেঘচরিত্রের পুরুষ ছিলেন না। কখনও ঘনঘোর গর্জ্জন, কখনও আসারধারাসম্পাত, কখনও ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণানুরঞ্জন, কখনও ঊষার ঘোর লোহিতাভা, কখনও বা সূর্য্যাস্তের বর্ণের খেলা তিনি দেখাইতে পারেন নাই! তিনি নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু নট ছিলেন না। "এ সংসার রঙ্গশালা"—এ কথাটা তিনি জানিতেন বটে, বুঝিতেনও বটে, পরন্তু জীবনটাকে লইয়া তিনি কখনই অভিনয়ের চাতুরী দেখাইতে পারেন নাই। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,—

"শুধু দু' দিনেরই খেলা।
ঘুম না ভাঙ্গিতে, আঁখি না মেলিতে,
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা।
আশার ছলনে কত উঠি পড়ি,
কত কাঁদি হাসি, কত ভাঙ্গি গড়ি,
না বাঁধিতে ঘর হাটের ভিতর—
ভেঙ্গে যায় এই সাধের মেলা।
আমাদেরও এই দেহ-প্রাণ-মন,
সুখ দুঃখ এই জীবন-মরণ,
—এও বিধাতার-পুতুল খেলা
—শুধু গড়া আর ভাঙ্গিয়া ফেলা॥"

ইহা বিধাতার পুতুল খেলা, তোমার আমার নহে। আমরাও পুত্তলিকামাত্র। দ্বিজেন্দ্রলাল আস্তিক ছিলেন, ভগবানের লীলায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাই নিজে কখনও জীবনটাকে লইয়া অভিনয় করেন নাই। তিনি সদাই ভাবিতেন,-সখা সহচরের সহিত আমোদে প্রমোদে, হাসির তরঙ্গে, রঙ্গভঙ্গে, শোকের বজ্রসূচী-বেধকালে সর্ব্বদাই ভাবিতেন,—"কি-জানি কখন সন্ধ্যা হয়,"—"ঘুম না ভাঙ্গিতে, আঁখি না মেলিতে, দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা,"—এই বেলা মনের সাধবাসনা যতটুকু পারো, যতটুকু সামর্থ্য কুলায়, মিটাইয়া লও। তাই তিনি সংসারযাত্রায় সরল সোজা পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাই তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া সর্ব্বদাই বলিতেন—"জুয়াচোর,

অহঙ্কারী, হম্বাগ্ কখনও কি বুদ্ধিমান হইতে পারে ? তাহারা জীবনসংগ্রামে জিতিলে ভগবানের সৃষ্টি থাকিবে না। তাহারা ধরা পড়িবেই।” এই কথাটা তিনি সর্ব্বদাই মনে রাখিতেন বলিয়া তিনি কখনই ন্যাকামীর প্রশ্রয় দেন নাই, পাপের সহিত আপোষ করেন নাই। পরন্তু দুর্ব্বলতার ক্ষমা তিনি সর্ব্বদাই করিতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল মিত্র সঙ্গে, সখা সহচরের দলে খোলা প্রাণে সরল উদারভাবে মিশিতেন ; নিজে কখনই পীর বা ওস্তাদ্ সাজিয়া উচ্চমঞ্চে বসিতেন না। যে রসিক ( Humourist ) হয়, ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতে পারে ও জানে, সে জীবনের কৌতুকটুকু বুঝে, সে ব্যবহার-বিশেষের Ludicrousness বা উৎকটতাটুকু ধরিতে জানে ও পারে ; সে ত এমন বাজে বুজরুকী করিয়া মিত্রসমক্ষে হাস্যাস্পদ হইতে পারে না। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল সরল, উদার, খোলা প্রাণের বন্ধু ছিলেন। তবে প্রতিভার Assertiveness বা স্বপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা তাঁহারও অতিমাত্রায় ছিল। দ্বিজেন্দ্র যাহা ধরিতেন, তাহা শেষ করিতেন, যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহা শতবাধাবিঘ্নসত্ত্বেও করিতেন। এই assertiveness বা একগুঁয়ে ভাবটা তাঁহার নাটক সকলের স্থানে স্থানে বেশ ফুটিয়া আছে। হিন্দুর সমাজতত্ত্ব যে তিনি ভাল করিয়া বুঝিতেন, শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্ম যে তিন ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, এমন কথা বলিতে পারি না। এই অনভিজ্ঞতা হেতু সমাজের পদ্ধতির ধারার উপর, সমাজের ভাব-পারস্পর্য্যের উপর দুই একটা অভিমানের উপদ্রব তিনি করিয়াছেন বটে ; কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া তিনি হিন্দু সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অবহেলা করেন নাই। আবাল্য ইংরেজী-শিক্ষা, বিলাতে যাইয়া বিলাতী ভাবে অবগাহন-স্নান, তাহার পর দেশে আসিয়া সেই বিলাতী মোহমাধুরীর বিন্যাস-প্রয়াস—এতটা হইলেও দ্বিজেন্দ্রলাল স্বজাতিকে চিনিয়াছিলেন, স্বদেশকে মাথায় করিয়া লইয়াছিলেন।

“জীবনে মরণে আমি তোমারি ; তোমারি কাছে
জনমে জনমে ফিরে আসিব।”

এই সাধ, এই বাসনা, এই ব্রত, এই উপাসনা দ্বিজেন্দ্রের লেখার সকল ভঙ্গীতেই আছে। প্রেমের গানে এই সাধ, দেশহিতৈষণার গানে এই বাসনা, ধর্ম্মের সঙ্গীতে এই উপাসনা, সংসারযাত্রায়ও এই ধারণার অনুসরণ ! গোটাকয়েক Fixed ideas বা স্থির ধারণার সমবায়ে তাঁহার নাটকগুলি সৃষ্ট। তাঁহার জীবনটাও ঐ গোটাকয়েক স্থির ধারণার ব্যঞ্জনামাত্র ; তাঁহার ধারণার

মূলে কদাচিৎ কেহ আঘাত করিলে, সহোদর হইলেও, তাহাকে তিনি অব্যাহতি দিতেন না—দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে তিনি তাহাকে বর্জ্জন করিতেন। তিনি সংযমী পুরুষ ছিলেন; বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তিনি অনেকটা, অনেক বিষয়ে, অনেক ভাবে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মত সখা দেখি নাই, তাঁহার মত বন্ধুও পাই নাই। তিনি সত্যবাদী, মিত্র-বৎসল, লোকপ্রিয় ও পরদুঃখকাতর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কথা মনে করিলে তাঁহার রচিত একটি গান মনে পড়ে—

"আর কেন মা ডাক্‌ছ আমায়, এই যে এইছি তোমার কাছে,
না ও মা কোলে, দাও মা চুমা, এখন তোমার যত আছে।
সাঙ্গ হলো ধূলা-খেলা, হয়ে এলো সন্ধ্যাবেলা,
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা, এখন তোমায় হারাই পাছে।
আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে,
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি—মা তোমার ঐ বুকের মাঝে।
এবার যদি পেইছি শ্যামা, আর ত তোমায় ছাড়ব না মা
ও মা—ঘরের ছেলে, পরের কাছে, মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে।"

যেন এই গানের সার্থকতা বুঝাইবার জন্য, উহার যথার্থতা দেখাইবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল দেহত্যাগ করিলেন। মরণেও সেই Assertiveness, সেই ঝোঁক, সেই জবরদস্তি, সেই আদুরে-আব্দার-ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল মায়ের আদরের আস্বাদন ত ইহজীবনে ভুলিতে পারেন নাই, তাই তিনি সে আব্দারের ভাবটা তাঁহার সকল কার্য্যেই—কাব্য গাথায়, নাটকে, প্রহসনে—কোনও খানেই চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। ইহাই দ্বিজেন্দ্রের বিশিষ্টতা—এই হেতুতেই দ্বিজেন্দ্র এত বড় কবি, এত বড় লোক, এমন বন্ধু—এমন সখা।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যসৃষ্টির দোষগুণের বিচার করিবার এখনও সময় হয় নাই। তাঁহার কাব্যগাথা নাটক-প্রহসন সমাজে কতকটা না থিতাইলে,—সমাজের সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া না পড়িলে, তাঁহার কীর্ত্তির সুবিচার ঠিকমত হইবে না। এখনও তাঁহার ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার মোহ সমাজে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; এখনও আমরা সকলেই বন্ধুবিচ্ছেদে বিহ্বল—ভ্রাতৃশোকে উন্মত্তপ্রায়;—এখনও বাঙ্গালীসমাজ এমন কবির জীবনের মধ্যাহ্নে তাঁহাকে হারাইয়া প্রবঞ্চিতের ন্যায় বিভ্রান্ত। এখন তেমন চুলচেরা

বিচারের সময় আইসে নাই। এখন কাঁদিতে হয়—কাঁদাইতে হয়। সখার বিহনে কাঁদিতে হয় ;—সে সখা কেবল আমাদেরই নহে—জাতির, সমাজের, ভাষার সখা, তাঁহা বুঝাইয়া, তাহার ঘোষণা করিয়া কাঁদাইতে হয়। কাঁদিতে পারি—কাঁদিতেছিও ; পরন্তু কাঁদাইব কেমন করিয়া ? যদি বুঝাইতে পারিতাম যে, সর্ব্বনাশের সূচনা হইলে, নিকুম্ভিলা যজ্ঞের পূর্ণাহুতির পূর্ব্বে ইন্দ্রজিৎতুল্য সৃষ্টিধর পুরুষগণ স্বধামে চলিয়া যান—বাঙ্গালার তেমন ইন্দ্রজিৎ-গুলিই এমনই ভাবে যজ্ঞ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন—তাহা হইলে, কাঁদাইতে পারিতাম। শিবরাত্রের শলিতা এক একটি শিবমন্দিরের স্বর্ণপ্রদীপে জীবন-ঘৃতাভাবে দ্বিযামার পূর্ব্বেই জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে ; চারি প্রহরের কোনও পূজাই শেষ হইতেছে না;—এইটুকু বুঝাইতে পারিলে কাঁদাইতে পারিতাম। আর কাঁদাইবই বা কাহাকে ? সবাই ত স্ত্রীরোদন করিবে। কুরু-ক্ষেত্রের মহাসমরের পরে আর্য্যাবর্ত্তে যে নারীমগুলীর রোদনধ্বনি উত্থিত হইয়াছে, তাহার প্রতিধ্বনি আজ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইল না! যুগে যুগে সম-বায়ে সে ক্রন্দনরোল আকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠে, গৃহে গৃহে ব্যষ্টিতে সে ক্রন্দনরোল একতারার শব্দের মত থাকিয়া-থাকিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের বিয়োগজনিত শোকধ্বনি এই একতারার করুণধ্বনি। যে শুনে, যে বুঝে, সেই কাঁদিবে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# গৌড়-কবি চতুর্ভুজ।

পুরাকালে যে সকল গৌড়-কবি সংস্কৃত ভাষায় কাব্যাদির অবতারণা করিয়া রচনা-প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চতুর্ভুজ এক জন উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁহার নাম ও তাঁহার কাব্য কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর যত্নে, নেপাল-দরবার-পুস্তকালয়ের সযত্ন-সংগৃহীত পুরাতন পুস্তকাবলীর পরীক্ষাকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইবার পর, চতুর্ভুজের নাম ও তাঁহার কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সুধীসমাজে পরিচিত হইয়াছে (১)।

---

(১) A Catalogue of Palmleaf and selected paper-Mss belonging to the Durbar-Lidrary, Nepal, 1905.

চতুর্ভুজের গ্রন্থের নাম—"হরিচরিতকাব্যম্"। তাহার বর্ণনীয় বিষয় "কৃষ্ণলীলা"। তাহা ত্রয়োদশ সর্গে, ১২৫০ শ্লোকে সমাপ্ত। ভানুকর নামক জনৈক লেখকের লিখিত মিথিল-অক্ষরের একখানিমাত্র গ্রন্থই এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার আরম্ভ এইরূপ :—

"সুরসমূহ-সমীহিত-সিদ্ধয়ে ধরণিধারণ-গোদ্বিজ-বৃদ্ধয়ে।
যদুকুলেঽবতার য এব নঃ সততমস্তু মুদে মধুসূদনঃ ॥"

কাব্যের কথা চিরপুরাতন ; তাহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কাব্যমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে কবির বংশপরিচয় যেরূপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নূতন এবং অপরিজ্ঞাত। সুতরাং কাব্যাংশের আলোচনা অপেক্ষা, কবির বংশপরিচয়ের আলোচনা অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিভাত হইবে। তাহার সহিত বাঙ্গালীর ইতিহাসের সম্পর্ক আছে।

এই কাব্যের পুষ্পিকায় রচনা-কাল উল্লিখিত আছে। তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের একটি স্মরণীয় কাল বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য। তৎকালে গৌড়ের ইতিহাসবিখ্যাত সুলতানগণের সিংহাসনে তাঁহাদের হাব্সী ক্রীতদাস-গণ উপবিষ্ট ;—বঙ্গভূমি নিত্য বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত। সেই বিপ্লবকালে, গৌড়-নগরেই, চতুর্ভুজের কাব্য রচিত হইয়াছিল। কবি রচনাকাল-বিজ্ঞাপনার্থ লিখিয়া গিয়াছেন,—

"শর-বিধু-মনুভিঃ শকস্য বর্ষে পরিগণিতেঽথ নভস্তশুক্লপক্ষে।
প্রতিপদি শশি-বাসরে সম্পূর্ণঃ হরিচরিতাহ্বয়-নবকাব্যমেতৎ ॥"

এই নির্দ্দেশ-অনুসারে ১৪১৫ শকাব্দ [ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ ] কাব্য-সমাপ্তির কাল বলিয়া জানিতে পারা যায়। ইহার পর বৎসরেই স্বনামখ্যাত আলাউদ্দীন হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন ; এবং তাঁহার শাসনসময়ে স্মরণযোগ্য অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়। কবি লিখিয়া গিয়াছেন,—তিনি বাস করিতেন,—"ভাগীরথী-পরিসরে",—"বহুশিষ্টজুষ্টে",—"শ্রীরামকেলি-নগরে।" তাহা গৌড়-নগরের একাংশমাত্র। তৎকালে তাহা বিদ্যাচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বৈষ্ণব-সাহিত্যেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামকেলির নাম বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এই নগরে দিবস-ত্রয় বাস করিয়া, হরিনামামৃত বিতরণ করিয়াছিলেন ;—হোসেন শাহের বিশ্বস্ত মন্ত্রী রূপ-সনাতন এই নগর হইতেই সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখনও বর্ষে বর্ষে এখানে জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তি হইতে দিবসত্রয় ভক্তগণের

উৎসব সম্পাদিত হয় ;—এখনও "রামকেলির-মেলা" গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত।

চতুর্ভুজ বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজের কাশ্যপগোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন। তাঁহার জন্মকালে, তাঁহার পিতা স্বর্ণ লেখনীতে মধুসংযুক্ত করিয়া, নবজাত শিশুর জিহ্বায় "ত্রৈপুর-মন্ত্র" লিখিয়া দিয়াছিলেন। চতুর্ভুজ ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেরূপ বংশাবলীর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই,—

স্বর্ণরেখ
⋮
[ তদন্বয়ে ]
ভুন্দ্
|
দিবাকর আচার্য্য
|
নিত্যানন্দ কবীন্দ্র
|
শিবদাস
|
নারায়ণ | মাধব | ভানুশর্ম্মা | চতুর্ভুজ

ভুন্দ্ এক জন সাধু পুরুষ ছিলেন। সমসাময়িক আর্য্যগণ তাঁহাকে "আচার্য্য-বরে"র পদে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দিবাকরও "আচার্য্যবর" বলিয়া উল্লিখিত। তিনি "কাশ্যপগোত্র-ভাস্কর" ছিলেন। তাঁহার "বংশাবতংস" নিত্যানন্দের উপাধি ছিল "কবীন্দ্র"। তিনি "স্মৃতি-কৌমুদী" গ্রন্থের রচয়িতা। কাশীধামে "ভগবদ্ভবপাদপদ্মে"র আরাধনা করিয়া, পুত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, কবীন্দ্র পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন শিবদাস। শিবদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণ মহামন্ত্রী ছিলেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন গৌড়কবি চতুর্ভুজ।

ভুন্দ্ কাহার পুত্র ছিলেন, চতুর্ভুজ তাহার উল্লেখ করেন নাই। তিনি স্বর্ণরেখের "অন্বয়-ক্ষীরসমুদ্র-চন্দ্র" বলিয়াই উল্লিখিত। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজে কাশ্যপগোত্র-সম্ভূত স্বর্ণরেখের নাম অদ্যাপি সুপরিচিত। বারেন্দ্র কুলজ্ঞগণ বলেন, "স্বর্ণরেখ" এবং ভবদেব দুই সহোদর ছিলেন। বরেন্দ্র দেশে বাস করিয়া স্বর্ণরেখ "বারেন্দ্র", এবং রাঢ়দেশে বাস করিয়া ভবদেব "রাঢ়ীয়" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

বারেন্দ্র কুলজ্ঞগণের গ্রন্থে মৈত্র-কুলের বংশাবলী যেরূপভাবে লিখিত আছে, আদিশূরের আমন্ত্রণে যিনি গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন,

তাঁহার নাম সুষেন মুনি। তাঁহার বর্ত্তমান বংশধরগণ কেহ মৈত্র এবং কেহ ভাদুড়া উপাধিতে পরিচিত। তাঁহার বংশাবলী এইরূপ,—

সুষেণ
↓
ব্রহ্মণা ওঝা
↓
দক্ষ
↓
পীতাম্বর
↓
শান্তনু
↓
হিরণ্যগর্ভ
↓
ভূগর্ভ
↓
বেদগর্ভ
↓
জিগ্নী মহামুনি
├── স্বর্ণরেখ [ বারেন্দ্র ]
│   ↓
│   সন্দেকা ওঝা
│   ├── মতু [ মৈত্র ]
│   └── ক্রতু [ ভাদুড়া ]
└── ভবদেব [ রাঢ়ীয় ]

কুলজ্ঞগণের মতে, স্বর্ণরেখ সুষেণের অধস্তন নবম পুরুষের ব্যক্তি; এবং তাঁহারই পৌত্রগণ বল্লালসেনদেবের সভায় "কৌলীন্য-মর্য্যাদা" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং স্বর্ণরেখ বল্লালসেনের পিতামহের [ হেমন্ত সেনের ] সমসাময়িক ব্যক্তি। তাঁহার পূর্ব্বে, সপ্তদশ পাল-নরপাল গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সুতরাং কুলজ্ঞগণের মতানুসারে গণনা করিলে, পালরাজগণের শাসনকালকেই সুষেণ মুনির গৌড়াগমনকাল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বারেন্দ্র-কুলশাস্ত্রগ্রন্থে পালরাজগণের শাসনকালের অবসানেই ব্রাহ্মণাগমনের আখ্যায়িকা উল্লিখিত আছে। যথা,—

"তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধান্ নৃপপালবংশান্।
শশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত্য যথা সুরেন্দ্রস্ত্রিদিবং শশাস॥"

কুলজ্ঞগণের গ্রন্থে স্বর্ণরেখের নাম আছে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের কাশ্যপ-গোত্রের ব্যক্তিগণকে বল্লালসেন কর্ত্তৃক করঞ্জ নামক গ্রাম প্রদত্ত হইবারও কথা

আছে। চতুর্ভুজের গ্রন্থেও এতদ্বিষয়ক কিছু কিছু বিবরণ উল্লিখিত আছে। কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র। চতুর্ভুজ লিখিয়া গিয়াছেন,—

"গ্রামোত্তমোঽস্ত্যমলমঞ্জুগুণৈকপুঞ্জঃ
শ্রীমান্ করঞ্জ ইতি বন্দ্যতমো বরেন্দ্র্যাম্।
যত্র শ্রুতিস্মৃতিপুরাণপদ-প্রবীণাঃ
সচ্ছাস্ত্রকাব্যনিপুণাঃ স্ম বসন্তি বিপ্রাঃ॥
কার্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকামঃ
শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোঽবতীর্ণঃ।
তং গ্রাম মগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং
জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্ম্মপালাৎ।"

এই বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়;—পুরাকালে বরেন্দ্রীমণ্ডলে, করঞ্জ নামে সুপরিচিত গ্রামে, শ্রুতিস্মৃতিপুরাণকাব্য-নিপুণ বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। স্বর্ণরেখ সেই সমগ্র গ্রামখানি ধর্ম্মপাল নামক নৃপতির নিকট হইতে "শাসন"-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং স্বর্ণরেখ ধর্ম্মপালদেবের সমসাময়িক ছিলেন। ইহার সহিত কুলজ্ঞগণের গ্রন্থের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত করিবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা কুলশাস্ত্রের আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা ইহার মীমাংসা করিতে পারিবেন। না পারিলে, ইতিহাস চতুর্ভুজের কাব্যোক্ত বিবরণেরই অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িবে। কুলশাস্ত্রের বিবরণ জন-শ্রুতিমূলক; চতুর্ভুজের কাব্যোক্ত বিবরণও জনশ্রুতিমূলক। কোনও বিবরণই সমসাময়িক প্রমাণ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তথাপি চতুর্ভুজের কাব্যোক্ত বিবরণ স্ববংশে প্রচলিত জনশ্রুতিমূলক; কুলশাস্ত্রের বিবরণের সেরূপ মর্য্যাদা দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌড়কবি চতুর্ভুজের সময়ে [পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে] বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের কাশ্যপগোত্রে কিরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল, "হরিচরিত"-কাব্যে তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার সহিত কুলজ্ঞগণের গ্রন্থের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না কেন, ইহাও অবশ্যই অনুসন্ধানের বিষয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

# 'দ্বিজু।'

বাণীর অমূল্যনিধি, সাহিত্য-সম্রাট,
অকস্মাৎ তোমা তরে স্বর্গের কপাট
খুলি গেল ; অসময়ে গেলে তাড়াতাড়ি
সাধের "জনমভূমি"—মাতৃবক্ষ ছাড়ি !
"আর্য্যগাথা" দিয়া পূজা করিলে হরষে
জননীর পাদপদ্ম ; বালকণ্ঠ-গীতে
ঢালিলে অপূর্ব্ব সুধা মধুর-ললিতে।
যৌবন-বসন্ত সনে মানস তোমার
স্বদেশের প্রেমরাগে বাজিল আবার
ব্যঙ্গহাস্যে ; উচ্ছ্বসিয়া উঠিল হৃদয় ;
হাসি-স্রোত বহাইল বঙ্গদেশময়।
তার পরে দেহ মন মাতার চরণে
সঁপি দিয়া, কি গাহিলে অমর-নিক্কণে
"জন্মভূমি", "ধন ধান্য পুষ্পে ভরা" গান ;
তারি মাঝে নিমজ্জিত তোমারি পরাণ।
"আমার দেশে"র কথা কার মুখে আর
শুনিবে ভারতবাসী অনন্ত ঝঙ্কার !
অশ্রান্ত অমৃতধারা পান করিবার
কা'র মুখ পানে চাহি ভুলিবে সংসারে—
দুঃখ দৈন্য রোগ শোক বাঙ্গালী-জীবন ?
সঞ্জীবনী-সুধা-দানে আবার নূতন
গড়িবে দেশের হিয়া, প্রীতি অনুরাগে
ভায়ে ভায়ে আলিঙ্গন কেবা দিবে আগে ?
এ দুর্দ্দিনে তুমি "দ্বিজু" ! ছেড়ে গেলে সবে—
কার গীতে বঙ্গমাতা জীবন লভিবে ?
কবীন্দ্র দ্বিজেন্দ্র তুমি, মধ্যাহ্ন-জীবনে
শিখাইলে মাতৃপূজা বিবিধ বিধানে।
শিক্ষক বলিয়া আজি করিব সম্মান,
সারদার বরপুত্র চিরমতিমান্।

# সভাপতির অভিভাষণ। *

প্রাচীন ঋষিরা সভা ও সমিতিকে প্রজাপতিদুহিতা বলিয়া আখ্যান করিয়াছেন। এই সভা তাঁহাদিগের স্তুতিছন্দের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, যদিচ আমি তাহা উচ্চারণ করিবার যোগ্য নহি। তবে আজ পরিষদের অনুগ্রহে সভাপতি পদে বৃত হইয়াছি বলিয়া সেই দ্যুতিমতী ভাষায় আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে।

সভা চ সমিতিশ্চ অবতাম্ প্রজাপতে দু´হিতরৌ সম্বিদানে .
যে না সংগচ্ছে উপ মা স শিক্ষাৎ চারুবদানি পিতরঃ সঙ্গতেষু ॥
বিদ্মাতে সভানাম্ নরিষ্টা নাম বৈ অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে তে মে সন্তু সবাচসঃ ॥
এষামহং সমাসীনানা বর্চ্চো বিজ্ঞানমাদদে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদো মামইন্দ্র ভগিনং কৃণু ॥
যদ্বো মনঃ পরাগতং যদবন্ধং ইহ বেহ বা।
তদাঃবর্ত্তায়ামাস ময়ি বো রমতাং মনঃ ॥

এই সভা আমার উপর সুপ্রসন্ন হউন।

আমি যেন উপস্থিত পিতৃদিগের আশীর্ব্বাদে উপস্থিত সভাস্থলে চারু-বাদী হইতে পারি।

এই সভার অর্থ, আমি জ্ঞাত আছি, ইহার অন্যতর নাম অক্ষুণ্ণা। (নরিষ্টা)

সভাসদেরা যেন আমার সহবাচী হয়েন।

আমি যেন তাঁহাদিগের তেজ ও জ্ঞানের গৌরব প্রাপ্ত হই।

এই সংসদের সৌভাগ্য আমি যেন লাভ করিতে পারি।

যদি এই সভায় কাহারও মন পরাগত হইয়া থাকে, কিংবা ইতস্ততঃ আবদ্ধ থাকে, যেন এই স্থানে আবর্ত্তিত হইয়া আমার মনেতে অনুরক্ত হয়।

যে দেবভাষায় আপনাদিগকে অভিভাষণ করিলাম, তাহাতে আমার অধিকার নাই, স্বীকার করি। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ভাষা, আদি কবিদিগের হৃদয়ের ভাষা, সকলের তাহাতে অধিকার নাই। অধিকার সত্ত্বেও আমরা অধিকারভ্রষ্ট। পূর্ব্বের অধিকার কিসে যে রক্ষা করিয়াছি,

* উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনীর দিনাজপুর-অধিবেশনে পঠিত।

তাহা জানি না। নিজের ভিটা ছাড়িয়া, আবর্জ্জনাস্তূপের উপর স্থান গ্রহণ করিয়াছি। উচ্ছৃঙ্খল জীবন অবলম্বন করিয়াছি। ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি, সমাজের বন্ধন অবজ্ঞা করি, প্রাণের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। হৃদয়ে অনার্য্য ভাব, জিহ্বাগ্রে অনার্য্য ভাষা। গ্রামে গৃহস্থ নাই, দেবমন্দিরে জাগ্রত দেবতা নাই; নিজের ঘর ছাড়িয়া, পরের দ্বারে উপযাচক আমরা! আমাদের কিসে অধিকার আছে? নির্ম্মম হৃদয় নির্ব্বাক, অথচ আমরা বহুবাচী, অতএব সত্যের প্রতি লক্ষ্যশূন্য; নির্ভীক আত্মা হিরণ্যবর্ত্তিনী, পঙ্কিলপদে সে পথে চলা যায় না। গৃহে আলোক নাই, অথচ "মুস্কিল-আশান" সাজিয়া, পরের কল্যাণ কামনা করিয়া বেড়াইতেছি। যদি তাহাতেই কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। শূন্যহস্তে আশীর্ব্বাদ করিতে শিখিয়াছি। ভিক্ষার ধন লইয়া দান করিতে বসিয়াছি। সূর্য্যোদয় হয় পূর্ব্বে, আর আমরা পরাঙ্মুখ হইয়া আছি।

হে ইন্দ্র, আমাদিগকে জ্ঞান দাও, পিতা যেমন পুত্রকে জ্ঞান দান করে। এমন পথে শিক্ষা দাও, জীবনে যেন সূর্য্যকে দেখিতে পাই। হে পুরুহূত, আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হই।

ইদং ধাতুঃ ন আভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা ণো অস্মিন্ পুরুহতয়ামনি, জীবা জ্যোতিরশীমহি॥

যদি আমরা এই প্রার্থনা করিতে পারিতাম, ঈশ্বরও আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দিতেন।

সচন্দ্র জ্যোতিঃপ্রকাশিতা নেত্রী উষা আকাশের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দীপ্তিমতী, আলোক-বিকাশিতাঙ্গী দেবী উষা প্রত্যহ সেই দ্বারে দণ্ডায়মানা, আমরা নিদ্রাতুর, কখনও তাঁহাকে দেখি না। এই বিচিত্রা বিস্তীর্ণা দেবীকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্তুতি দেবলোকে গ্রাহ্য হইত। আমরাও বিনীতভাবে আজ স্তুতি করিতেছি। আমাদের আঁধার হৃদয়ে আলোক আনিয়া দাও, প্রাণে বল আনিয়া দাও। অনাবৃত আকাশের নীচে, স্বাধীনচেতা কবি, গুরু ছিলেন। নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতা আমরা, তাঁহাদিগের মত মনের সাহস আমাদিগের হইবে কিসে?

তাঁহাদিগের এক একটি শব্দ, এক একখানি আলেখ্য।

উষা জ্বলন্ত বলিয়া "ভাস্বতী"।

আলোকের উৎস বলিয়া "শুদতী"।

অন্যকে আলোকিত করেন বলিয়া "দ্যোতনা"।

রক্তিম বলিয়া "অরুণী"।

শ্রেষ্ঠ বলিয়া "মঘোনী"।

শুদ্ধ বলিয়া "রিতাবরী"।

জাজ্বল্যমান বলিয়া "বিভাবরী", যাহা আমাদের ভাষায় আজকাল রাত্রি।

সঞ্চারিণী বলিয়া "সুনৃতা"।

দেবতা কি, না বুঝিলে, তাঁহার উপযুক্ত নাম ধরিয়া ডাকিতে পার না। বৈদিক কবি উষাকে অনাবৃতবক্ষা নর্ত্তকীর সহিত তুলনা করিতে সঙ্কোচ করেন নাই। যে কণ্ঠে তাঁহাকে মঘোনী রিতাবরী সম্বোধন করিয়াছেন সেই কণ্ঠে, দেবী তুমি কন্যার ন্যায় শরীর বিকাশ করিয়া, দীপ্তিমান সূর্য্যের নিকট গমন কর; যুবতীর ন্যায় উজ্জ্বল-দীপ্তি-বিশিষ্টা হইয়া, হাস্যমুখে তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর, বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন।

মনে যেরূপ দেখিয়াছেন, সেরূপ অবতারণা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই। তাঁহাকে কখনও বালিকা, কখনও জরাযুতা, কখনও সূর্য্য-পত্নী, কখনও বা সূর্য্য-জনয়িত্রী বলিয়া অভিহিতা করিয়াছেন। নির্ভীক কবি সহস্র ভিন্ন ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন। দ্বিধাশূন্যা সংশয়শূন্যা, অপরের অবলম্বন রহিত। বীর্য্যশালী মহাপুরুষের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, তোমার আমার সে চেষ্টায় পাপ স্পর্শে। সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহারা কি বলিতেছেন, শুন :—

> না সদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসিদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
> কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীৎ গহনং গভীরং॥
> ন মৃত্যুরাসীদমৃতং নতর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
> আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নঃ পরঃ কিং চনাস॥

R. V. 10. 120.

Nor aught no naught existed;

Yon bright sky was not; no heaven's broad roof out-

streched above, what covered all ? what sheltered ? what concealed ?

Was it the water's fathomless abyss ?

There was not death—There was naught immortal.

Maxmuller, p. 290.

দাম্ভিক কবি গর্ব্বের সহিত বলিয়াছেন—

আমরা সত্যবাদী—মিথ্যা কহি না।

নূনমৃতা বদন্তো অনৃতং রপেম।

R. V. 10. 10. 4.

এই সত্যের তেজোবলেই তাঁহাদিগের কাব্য তেজোময়। আমাদিগের কবিতাও ওজস্বিনী হইবে। সাহিত্যের মূলে সত্য ও সাহস চাই। এ বল আসিবে কিসে ? ধর্ম্মের পথ অবলম্বন না করিলে, সামাজিক গ্রন্থি দৃঢ় না করিলে, অসত্য-উপেক্ষী না হইলে, এ শক্তির কখনও সঞ্চার হইবে না। আপনার পারিচর্য্যে আপনাহারা হইয়া চিরদিন রহিতে হইবে। একদিন ঘরের দিকে চোখ পড়িয়াছিল, অবসন্ন আত্মা গৃহ-দেবতাকে জাগ্রত দেখিতে পাইয়াছিল, নূতন ভাব মনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, নূতন আলোক আপনার হৃদয়ে দেখিতে পাইয়াছিলাম, বহু দিনের কথা নহে, কিন্তু আলোক স্তিমিতপ্রায়, সে অঙ্কুর বিকাশের পূর্ব্বেই যেন শুকাইয়া গেল, দেলতা শিলাখণ্ডে পরিণত হইল, দৃষ্টি আবার বাহিরের জঞ্জালের উপর নিক্ষিপ্ত হইল—ভাগ্যের দোষ দেই না, বালকত্ব না ঘুচিতেই আমরা পিতা, শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিতেই আমরা শিক্ষক। মাত্রা শুদ্ধ না হইতেই আমরা লেখক। সাধ্যাতীতের সাধনা বলের অপচয়মাত্র, তাহাতে অকল্যাণ ভিন্ন কল্যাণ হইতে পারে না। যাহা আয়ত্তাধীন, তাহাতেই বলের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকার যতই আমরা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিব, আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়িব। জাতীয়তার অবতারণা রাজসূয় যজ্ঞ, সহজে সে যজ্ঞের অধিকারী হওয়া যায় না। শুদ্ধ, সংযমী, প্রশান্তচেতা হওয়া চাই। আমার হৃদয় আমার রাজ্য, অনুভব করা চাই, আমি আছি না বুঝিলে, আপনার কি অপরের, চিনিয়া লইবে কি প্রকারে ? আদর্শভ্রষ্ট আমরা, স্বেচ্ছাচারিণীর অঞ্চল ধরিয়া মার অনুসন্ধানে চলিয়াছিলাম। প্রথমে আপনার ঘরের ভিতর অপনার স্থান

সহিত কর, পরে পৃথিবীর কোন খণ্ডে বাসা বাঁধিয়াছ তাহা বুঝিতে পারিবে, বিশ্বের সহিত কি সম্বন্ধ, তখন উপলব্ধি হইবে। ঋত্বিকেরাই আহুতি দিতে সক্ষম, আহুতি-ভেদে দেব কি দানব, যজ্ঞক্ষেত্র অধিকার করে।

আদি কবিই আর্য্যাবর্ত্তে আদি পুরোহিত, গুরু, শিক্ষক ছিলেন, সে স্থান আজ কে অধিকার করিতে পারে? আমরা নিজের খেয়ালে আপন আপন ধর্ম্ম গড়িয়া লইতে শিখিয়াছি। কখনও বা ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি, কিংবা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমরা বিজ্ঞানের দোহাই দিতে শিখিয়াছি; ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মাপ জোঁক করিতে পারি, জগৎ-কারণ অপরিমেয় বলিয়া, তাঁহার ধ্যান করা নিষ্ফল মনে করি। আমরা দেবতার ধার ধারি না, দেবালয়ের পাশ দিয়া চলি না—আমরা কি বলের উপর নির্ভর করিয়া অপরকে বলদান করিতে পারি? তুমি আপনি অবলম্বন-রহিত, কি ভরসায় তোমায় অবলম্বন করিব? তাই বলি, চিত্ত শুদ্ধ করিতে শিক্ষা কর, নিজের গৃহ পরিষ্কার করিয়া লও। ঘরের আঁধার কোণে বসিয়া জগতের আঁধার অনুভব করা সহজ, কিন্তু অবারিত দ্বারে না দাঁড়াইলে জগতের বিস্তীর্ণ আলোক দেখা যায় না। তাই বলি, হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত কর। বিশ্বের প্রাণের ভিতর স্থান না পাইলে বায়ুবিতাড়িত বাষ্পের ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। সমাজে প্রাণ নাই, বিশ্বের প্রাণ-অনুসন্ধান নিষ্ফল।

স্বাধীনচেতারই হস্তে লেখনী জ্বালামুখী হয়। দেবীতমা সরস্বতী সূর্য্যালোকাবৃতা। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ভিন্ন স্থূল দৃষ্টির গোচর নহেন। ঐ দৃষ্টি সাধনায় মেলে। যখন বলিতে পারিবে, My mind to me a Kingdom is, তখন সে রাজ্যে দেবীতমার পূর্ণোপচারে পূজা সম্ভব। মিথ্যার বোঝা ঘাড়ে লইয়া সমাজ গড়া যায় না। দেবীর পূজা সোলার ফুল দিয়া হয় না। সত্যই জীবনের ভিত্তি, মানব-হৃদয়ের সাহস। ধর্ম্ম বল, কাব্য বল, সবই সত্যের উপর নির্ভর করে। সমাজে লুকাচুরী করিতে করিতে মন জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুখে যাহা কাজে তাহা যে জাতি করিতে অশক্ত, কোন্ আশা তাহার ফলবতী হইবে? বক্তা বাঙ্গালী বাহিরে বীর, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই মার্জ্জার হইয়া পড়েন। ধর্ম্মাচার্য্য বাঙ্গালী আপনার গৃহমধ্যে অত্যাচার

করিতে কুণ্ঠিত হ'ন না, পরের কোষ্ঠী কাটিতে অণুমাত্র সঙ্কোচ করেন না। কাণাকাণি করিয়া গালাগালি দিতে ছাড়ি না, সকলেই প্রায় অনাচারী, কিন্তু সকলেই আচারের গণ্ডীর ভিতর আছি বলিয়া বুঝাইতে চাই। মিথ্যার হাটে মূর্ত্তি কেনা চলিতে পারে, দেবী পাওয়া যায় না।

প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি Beranger নেপোলিয়নের সমসাময়িক ছিলেন। নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছিল। Beranger সাহিত্য-সমাজের কাছে এই বলিয়া বিদায় লইয়াছিলেন,—আর লিখিব না, বলিতে পারি না; কিন্তু লেখা প্রকাশ করিব না, ইহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি। দেখিবার শক্তি আছে, কিন্তু আর দেখিতে চাহি না। জীবনের শেষ সন্ধ্যাতে চক্ষু মুদিয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া পড়িতে ইচ্ছা নাই। সময় আসিয়াছে মনে হইলে, অকাতরে ধরাশায়ী হইয়া চিরনিদ্রা লাভ করিব। প্রাণের কথা লইয়া হাটের মধ্যে দাঁড়াইতে পারি না; সে কথা যদি বেচা কেনা চলে চলুক—ঘরে ক্ষুদ কুঁড়া আছে, তাহাতেই আমার চলিবে। আতুরের পায়ের ধুলি চক্ষুতে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা নাই—আমি বিদায় লইলাম, সহজেই সে স্থান আপনারা পূরাইয়া লইতে পারিবেন। অনেকেই এ কথার সত্যতা বোধ হয় অনুভব করেন, আমিও করিলাম বলিয়া যদি আমাকে মাপ করা প্রয়োজন মনে করেন, মাপ করিবেন। কারণ, আপনাদিকে বিশ্বাস করিতে বলি, আমি সত্য যাহা ভাবি, তাহাই বলিতেছি। হাটের মধ্যে বাস করিবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবস্থাক্রমে অনেকেই বাস করিতে বাধ্য। হাটে বারওয়ারী হইতে পারে, উহা পূজার স্থান নহে।

কথা সত্য, তাহার অন্যতর প্রমাণ আছে। বাঙ্গালা নাটক সাধারণতঃ বলিতে গেলে নাট্যজগতে উচ্চ স্থান পায় নাই। আমাদিগের সামাজিক অবস্থায় পাইতে পারে না। পৃথিবীর কোনও স্থানে পারে নাই। নাটক সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। জাতীয় ধীশক্তির প্রধান পরিচয় নাটকেই পাওয়া যায়। অন্য কবিতা কবির মানস জাত, গাথা নিজের প্রাণের গান, মহাকাব্য পৌরাণিক ইতিহাসের অবতারণা—যাহারা আর জগতে নাই, কল্পনার সাহায্যে তাহা সাজাইয়া ল'ন, কঙ্কালে পুনর্জ্জীবন দেন। তাঁহারা রচনা-মধ্যে দেব দেবী মানব যেখানে উপযুক্ত মনে করেন, সেইখানে বসাইয়া ল'ন। কিন্তু যথার্থ নাটকে, সামাজিক

চিত্র যাহা আছে, কবি তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তোলেন। যাহা প্রত্যহ দেখি, তাহার ভিতরের প্রাণ কোথায় প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। একের মনোভাব নহে, সামাজিক প্রাণী সকল কি সূত্রে গ্রথিত আছে, যদি বিচ্ছিন্ন থাকে, কোথায় তাহাদের ছেদ হইয়াছে, তাহাই আবিষ্কার করা—তাহাই সেই সমাজের লোকের যাহাতে উপলব্ধি হয়, সে শিক্ষা নাটক হইতে হয়।

যোগ বিয়োগ শুদ্ধমাত্র গণিতের ভাষা নহে, মানবহৃদয়ের ভাষা। এক এক জনের আশা মনোভাব লইয়া সমাজ সৃষ্ট নহে—অথচ মানুষের নিজত্ব যতদিন আছে, আমার হৃদয়ের আশা আমারই, আমার স্নেহ মমতা আমারই, কিন্তু সমাজের শৃঙ্খল কোথায় তাহা অবরোধ করিয়াছে—কোথায় তাহার বিস্তৃতিসাধন করিতেছে, কোথায় তাহা বিশ্বজগতের প্রাণের ভিতর আমাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাই যথার্থ নাটকে প্রতিভাত। সুন্দর কুৎসিত, সত্য মিথ্যা, অনুরাগ বিরাগ—সকলেরই স্থান আছে। নাটক মানব-সমাজের প্রতিরূপ, মনুষ্য-হৃদয় জলন্ত, জীবন্ত আখ্যান—পয়ারে তাহাকে আবদ্ধ করা কঠিন, গদ্যে যাহা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় না, তাহার ভাষা, তাহার ছন্দ কবিকে আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়, তাহা নিয়মবদ্ধ করা যায় না। বহির্জগৎ কিংবা অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করা কাব্যের উদ্দেশ্য নয়। সম্ভাবিতের বিস্তৃতি আর সুদূর আশাকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা, অর্থাৎ অসম্ভাবিতকে সম্ভবপর করার সাধনা, বিরাগ হইতে নূতন রাগের মূর্ত্তি অবতারণা করা, অকল্পিতকে কল্পনার আয়ত্ত মধ্যে আনা, সকল প্রকার কাব্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই আশা, সেই রাগ, সে আদর্শ সমাজের হৃদয়ে জাগ্রত করা নাটকের শিক্ষা। নাটকেই কবি শিক্ষক।

ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাস দেখ, এই কথার সত্যতা সপ্রমাণ হইবে। এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডে নাটক চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করে। সে সময় ইংলণ্ডে নূতন প্রাণ আসিয়াছিল, নূতন আশা নূতন শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী জগতের রাজ্য-অধিকার-প্রয়াসী হইয়াছিল। সেই সময়ে ইংরাজী ভাষাতেও নূতন তেজের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন এক সময় আমাদের দেশে বাঙ্গালা লেখাপড়ার অনাদর ছিল, ইংলণ্ডেও এই সময়ের

পূর্ব্বে ঠিক তাহাই হয়। লাটিন এবং গ্রীকের চর্চ্চা ভিন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা লজ্জাকর মনে করিতেন। আমাদিগের পণ্ডিতেরাও সংস্কৃত ভাষা ছাড়া, বাঙ্গালা ভাষার অনাদর বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন; আর আমাদের ইংরাজী-ভাষামুগ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করা, অনেক দিন ধরিয়া হেয় জ্ঞান করিতেন। Roger Ascham ইংরাজী ভাষায় বই লিখিবার সময় এইরূপ ভূমিকা করিয়াছিলেন—"...although to have written this book either in Latin or Greek had been more easier and fit for my trade in study, yet I have written this English matter English tongue for English-men .." তাহার পর কিছুকাল ধরিয়া লেখকেরা লাটিন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এক অদ্ভুত রচনা-রীতির সৃষ্টি করেন, যখন I trust the learned poets will give me leave and vouchsafe my book passage as being for the rudeness thereof no prejudice to their noble studies but even (as my intent is) an instax cotes to stir up some other of meet ability to bestow travail in this matter. আমাদের দেশেও তাহা ঘটিয়াছিল, নবজলধর-পটলসংযোগে প্রভৃতি সমাসের ও অনুপ্রাসের বেড়ায় বাঙ্গালা ভাষা সোনার হাতকড়ি ও বেড়ী পারিয়াছিল। পুস্তকের নাম Hecatompathia ও প্রত্নকম্রতত্ত্বনন্দিনী প্রায় একজাতীয়। তখন ইংরাজী ব্যাকরণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার প্রয়োজনজ্ঞান জন্মায় নাই, more easier প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যাইত। আমরাও তাই করিয়াছি, বাঙ্গালায় ব্যাকরণ নাই বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা বলা হইয়াছে। রাজা সতী অসতী, শনি ভানুতনুজা প্রভৃতি অনেক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ করিতে করিতে সহজ সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা জন্মিতে থাকে। লাটিন দেবদেবী ছাড়িয়া, সাদাসিধা মানুষের জীবনের উপর ক্রমে দৃষ্টি পড়ে। Morality plays, Interludes, Senecan tragediea, Chronical plays একে একে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শূন্য-পুরাণ, মাণিকচাঁদের গান, রামযাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি রচনা আমাদের মধ্যে আজকাল নাই। নিজের ঘরের ছেলে মেয়ের উপর যখন চোখ পড়ে, তখন নিজের শক্তির তেজও অনুভূত হয়। সেই সময় ইংলণ্ডে জাতীয় জীবন উদ্ভাসিত হয়। এই সময়ের কাব্য নাটক

অদ্ভুত বীর্য্যশালী, তাহার প্রত্যেক ছত্রে নবজাত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার প্রতিভা নূতন ছন্দে আবিষ্কৃত হয়। Sackville ও Shrileyর মধ্যবিং সময়ে এই বলের উল্লাস প্রত্যক্ষ হয়। দেখিতে দেখিতে সেক্সপীয়র সাহিত্য-জগতে সূর্য্যের মত উদিত হইলেন। এই নাটকগুলি পড়িয়া দেখিলে অনেক কুৎসিত কথা, কুশ্রী ভাব দেখিতে পাইবেন। কিন্তু কুৎসিত কথা মানুষের মুখে আছে, কুৎসিত ভাব মানবের মনে আছে। পাপ অপ্রচ্ছন্ন ভাবে সমাজে আছে, পুণ্যই অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থাকে। পাপপুণ্যে মানুষের হৃদয়, পাপপুণ্যে আমাদের জগৎ; অপাপবিদ্ধ জগৎ মানুষের নহে, দেবতার। এ জগতে ঈশ্বরের স্বরূপ রাহুগ্রস্ত, তাহার সম্যক উপলব্ধি এ জগতে সম্ভবপর নহে।

সত্য যদিচ বলের কারণ, তাহাতে অহং-এর অধিকার নাই, তাহা সার্ব্বজনীন। সত্য যেমন মানব-আত্মার ভাষা, মিথ্যা তেমনই মানব-হৃদয়ের দরদ দিয়া মাখা—এই সত্য-মিথ্যা-জড়িত মানবসমাজের চিত্র নাটকে প্রতিফলিত। সব সময়ে জীবনে মিথ্যা পরাজিত হয় না; Renan এক স্থানে বলিয়াছেন,—জগদীশ্বর! তোমার রহস্য বুঝিতে পারি না, তুমি যে আমাদের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখ, সেটা আমাদের উপর তোমার আশীর্ব্বাদ। সত্য যদি সর্ব্বত্র বিকাশিত হইত, তাহা হইলে মানব-হৃদয়ের স্বাধীনতা থাকিত না।

যথা ইচ্ছা মন যায়, পৃথিবীতে মানব যথা ইচ্ছা বিচরণ করে। নাটক এই যথেচ্ছাচারী মানবসমাজের অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। সেক্ষপীয়রের পূর্ব্বে যেমন জনকতক ইংরাজ কবি তাঁহার জন্য স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহার পরেও জনকতক কবি সে স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। যত দিন ইংলণ্ডে সেই নবজীবনের স্রোত বহিয়াছিল, ততদিন ধরিয়া ইংরাজী নাটকের প্রতিপত্তি ছিল। যে সময় হইতে সে আলো মন্দীভূত হইল, সেই সময় হইতে ইংরাজী নাটকের গৌরব-হ্রাস হইয়াছে। বড় গাছে যেমন পরগাছা আশ্রয় করে, সেইরূপ তাঁহাদিগের আধুনিক নাটক পরগাছা-স্বরূপ। নাট্যশালায় তাঁহারা ফরাসী নাটক অনুবাদ করিয়া চালাইতেছেন। বিলাতের জীবনের বৈচিত্র্য গিয়াছে, উৎসাহ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আজকাল বহুদেশের সংসর্গে তাহাদের সহিত মিলিয়া চলিতে হইতেছে। যাহা আছে, তাহা বজায় রাখিতে যত্ন-

বান হইতে হইয়াছে। সমাজের প্রাণী আর এক ছাঁচে ঢালা, মানসিক তেজ বহু ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত হইয়া কেন্দ্রীভূত হইতে পারিতেছে না। তাহা ছাড়া ঘরে কোঁদল বাধিয়াছে। গৃহের ভিতর কচকচিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত—নাটক লিখিবার অবসর কোথায়? যেমন ইংরেজী সাহিত্যে নাটকের উল্লাসের কথা বলিলাম, ফরাসী দেশেও ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল। ফ্রান্সের চারি দিকে অন্য অন্য দেশ। কাজেই তাহাকে নিজের বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া চলিতে হইয়াছে। যখন রোমান সভ্যতা চূর্ণ হইয়া যায়, ফরাসী ভাষার তখন জন্ম—ল্যাটিন ভাষা হইতেই তাহার উৎপত্তি। রোমানদিগের পূর্ব্বে কেল্টদিগের প্রভাবের ছায়া তাহাতে পড়ে নাই। conquering Frank সেই ভাষার মধ্যে নূতন ভাষা চালাইতে পারে নাই। ক্রমে এই ভাষার তেজ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, কিন্তু চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে Civil War গৃহবিচ্ছেদের দরুণ ফ্রান্সের সাহিত্য চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময়ের শেষভাগে বিশৃঙ্খল ফরাসী সমাজে নূতন ভাবের আভাষ পাওয়া যায়। সেই বিশৃঙ্খল সমাজে এক মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই কবি দস্যু ছিলেন; বহুদিন ধরিয়া কারাবদ্ধ ছিলেন। একবার তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তিনি কোনরূপে পরিত্রাণ পান। কিন্তু এই অসাধারণ পুরুষ, অসাধারণ কাব্যশক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম Villon। সেই সময় হইতে Ronsard পর্য্যন্ত দিন দিন ফরাসী সাহিত্যের উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই Byzantine রাজত্ব ধ্বংস হয়, এবং নূতন তেজ ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, ইংলণ্ডে উদ্ভূত হয়। ফ্রান্সে এই সময় Ronsard বলিয়া এক-জন মহাকবির অভ্যুত্থান হয়, এবং নাট্য-জগতে Corneille, Racine, পরে Moliere, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে Voltaire এক এক যুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সের ইতিহাস এক মহাকাব্য—ফ্রান্সের সাহিত্য তাহারই পরবর্ত্তী, ফ্রান্সে কবি, শিক্ষক, চিরদিন সমাদৃত। Plieadsদিগের সময় হইতেই ফরাসী দেশে সাহিত্যের একটি বিশেষ সমাজ সৃষ্টি হয়। সে সমাজে রাজা প্রজা ছিল না, গুরু শিষ্য ছিল, ধনী নির্ধন ছিল না। সকলেরই সেই সমাজে সমান অধিকার। ফ্রান্স যেমন দিন দিন প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে, তাহার সাহিত্য সমাজে দিন দিন নূতন বলে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। French Revolutionএর সময় দেখ, জাতীয় তেজের

কি আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিতে পাইবে। এই সময়ের একটি চিত্র আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাই।

ফরাসী সমাজে যেমন এক সময়ে অভিজাতবর্গ এবং জনসাধারণের মধ্যে একটি ঘোর বিচ্ছেদ হইয়া পড়িয়াছিল, ফরাসী সাহিত্য, বিশেষ কাব্যের ভাষাতেও সেইরূপ Noble এবং Bas, মহৎ ও নীচ জাতীয় কথার ভাগ হইয়াছিল। যাহা সাধারণের ভাষা, তাহা নীচ বলিয়া অভিহিত ও কাব্যে অব্যবহার্য্য ছিল। নীচের ভাষা নীচ ভাবে কলুষিত মনে করা হইত। গাছ বলা অসঙ্গত, বিটপী কিংবা পাদপ না বলিলে ভাগবত অশুদ্ধ হইত। Racine তাঁহার একখানি নাটকে Chien কুক্কুর কথাটি ব্যবহার করেন। তাহা লইয়া কতই না আন্দোলন চলিয়াছিল। Mouchior রুমাল কথা এক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া, নাট্যশালায় খুনাখুনি হইয়া গিয়াছিল। আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত কেহ কেহ চলিত কথা ব্যবহার করিতে কাতর হ'ন। কথার মধ্যেও আমরা ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ন্যায় জাতিভেদ দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যে জাতি বড় ছোটর মধ্যে ভেদ অবহেলে উঠাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই জাতির কবিও কতদিন ধরিয়া কথার জাতিভেদ সহ্য করিতে পারে? এই বিষয় লইয়া সাহিত্য-জগৎ Victor Hugoর কিছু পূর্ব্ব হইতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক দল লেখক Romantic School নামে পরিজ্ঞাত; সাধারণ কথাগুলি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের Classic Schoolএর সহিত ঘোর দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেল। যাঁহারা আধুনিক, তাঁহাদের বয়স কম, সাহস অধিক, তাহারা উন্মত্তের মত এই বিবাদে যোগ দিলেন। এমন কি, অনেকে নিজের পারিবারিক নাম পর্য্যন্ত তুলিয়া দিলেন। তাঁহার স্থানে Dick, Tom, Harry যাহা মনে আসিল, তাহাই ডাকনাম করিয়া লইলেন। পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাহাই হইল। তাহারা শুদ্ধমাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী ভদ্রসমাজের কালো Hat Coat ছাড়িয়া—বিবিধ বর্ণের বিবিধ রকমের কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ লম্বা চুল রাখিলেন, কেহ মাথা মুড়াইয়া লইলেন, পারিসের রাস্তায় যেখানে সেখানে এই অদ্ভুত-বেশধারী অভিনবের দল দেখা যাইতে লাগিল। ইঁহারা প্রায় সকলেই সাহিত্যসেবক। অপর দলের মধ্যে কতিপয় যুবক, Jupiter, Neptune,

Mars প্রভৃতি দেবতাদিগের সাজে সজ্জিত হইয়া পথে চলিতে লাগিলেন। দুই দলে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইলে লাঠালাঠীতে পরিণত হইত। এই সময় Victor Hugoর কাব্যের অভ্যুদয় হয়। সময় থাকিলে তাঁহার প্রথম নাটক Cromwellএর উপক্রমণিকা পড়িয়া শুনাইতাম। Theophile Gautier এই উপক্রমণিকা সাহিত্যে Mount Sinaiএর Ten Commandments বলিয়া গিয়াছেন।

Cromwell লইয়া অনেক বাদ-বিসংবাদ চলিল। তাহার পরেই তিনি Hernani বলিয়া নাটকখানি লেখেন। ফরাসী সাহিত্য-সমাজে, 22th Feb. 1830, যে দিন Harnani অভিনীত হয়, 14th Julyএর মত পূজার দিন বলিয়া গণ্য। Hernani পৌরাণিক শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফ্রান্সের কাব্য-জগৎকে নূতন আলোকে আলোকিত করিল। হুগো পুরাতন ছন্দের নিয়ম অনায়াসে ওলট-পালট করিয়া নূতন ছন্দের সৃষ্টি করেন। প্রথম অভিনয়ের দিন বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সহস্রাধিক সেবকের দল রঙ্গালয় দখল করিয়া লইলেন। পৌরাণিক দলও বলপূর্ব্বক স্থান অধিকার করিতে ছাড়িলেন না। অদ্ভুত অদ্ভুত বেশধারী শত শত যুবক-বৃন্দ সারাদিনের খাদ্যদ্রব্য লইয়া রঙ্গালয়ে সারাদিন যাপন করিবার যোগাড় করিয়া লইয়া গিয়াছিল। দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, ভিতরে পুলিস, বাহিরে সৈনিকের দল রঙ্গালয়-রক্ষার্থ নিয়োজিত হইয়াছিল। অভিনয়ের সময় উপস্থিত হইল। পটোত্তলনমাত্র অভিনবের দলের হুঙ্কারে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। পৌরাণিকেরাও গর্জ্জন করিতে ছাড়িলেন না। একটু অবসর পাইবামাত্র অভিনয় আরম্ভ হইল। সূত্রপাতেই Escalier, তাহার পর dérobé (বিবস্ত্র সোপানাবলি) উচ্চারিত হইবামাত্র বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গেল— dérodé নূতন রকমের বিশেষণ, আবার তাহার উপর এক ছত্রের শেষ ভাগে বিশেষ্য Escalier, তার পর ছত্রে তাহার বিশেষণ dérobé. ভাষার উপর এ কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার বলিয়া পৌরাণিকেরা গালাগালি আরম্ভ করিলেন। অভিনবেরা তাহাদিগকে বাপান্ত করিতে ছাড়িলেন না। তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। গোলমাল কিছু কমিয়া গেলে আবার অভিনয় আরম্ভ হইল। সাপেও বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হয়। এই অসাধারণ কবির ভাষা ও ছন্দে মন্ত্রমুগ্ধবৎ ক্রমে সকলে ধীরভাবে কতকটা শুনিলেন। মধ্যে

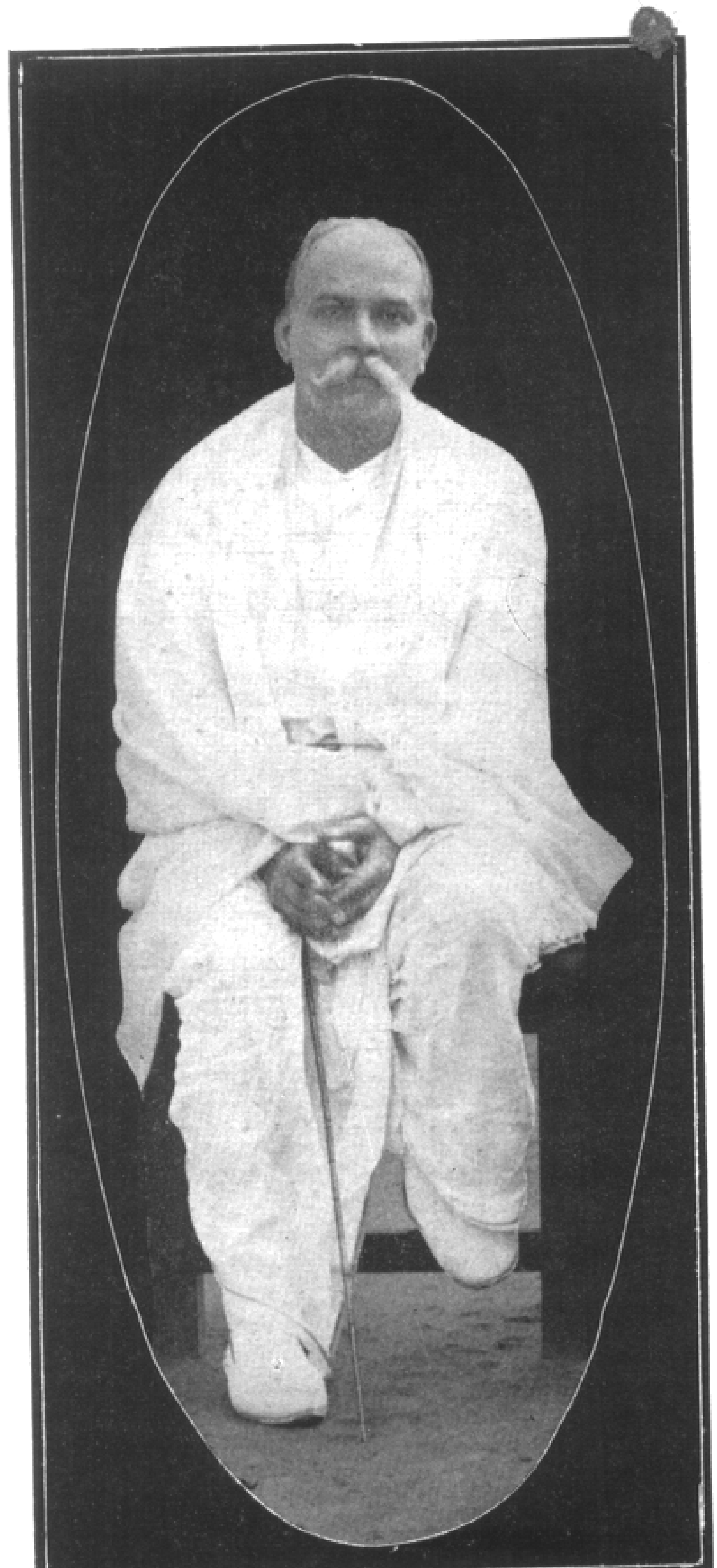
অভিনয়ের পূর্ব্বেই Victor Hugoর নিকট গিয়া নাটকখানি প্রকাশের সত্বের জন্য ছয় হাজার ফ্রাঙ্ক দিবেন বলিয়া হাতে পায়ে ধরিতে লাগিলেন, বলিলেন, প্রথম অঙ্ক শেষ হইতেই দুই হাজার ফ্র্যাঙ্ক দিবেন—ঠিক করেন, ২য় অঙ্কের শেষে ৪০০০, তৃতীয় অঙ্কের পর ৬০০০ দিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, অভিনয় স্থগিত থাকুক, কথাবার্ত্তা শেষ কর, না হইলে পঞ্চম পর্য্যন্ত শুনিলে ১০০০০ ফ্র্যাঙ্ক দিতে ইচ্ছা হইবে, কিন্তু দিবার সাধ্য নাই। Hugoর তখন দুই পাউণ্ড পর্য্যন্ত ঘরে সম্বল ছিল না, তিনি ছয় হাজার ফ্র্যাঙ্ক আনন্দসহকারে গ্রহণ করিলেন। অভিনবেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সজোরে গান ধরিলেন। অন্য পক্ষ ছড়া কাটিতে ছাড়িলেন না। এইরূপে অভিনয় শেষ হইল। কোনরূপে পুলিস ও সৈনিক শান্তিরক্ষা করিল। কিছুদিন ধরিয়া এইরূপ ঝগড়াঝাটী চলিয়াছিল—পরে সকলেই নতমস্তকে কবির শিক্ষা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন। ভাষায় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই, স্বীকার করিয়া লইলেন। Harnani নাটক-কল্পে উচ্চ স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত নহে; কিন্তু ফরাসী সাহিত্যে ইহা নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া এখনও পূজিত। আমি তাই বলি, মাতৃভাষার আদর না জানিলে, নিজ সমাজের সমাদর করিতে না শিখিলে, মিথ্যার মধ্যে সত্যের রূপ না দেখিতে পাইলে, সাহিত্যসেবা বৃথা। আমাদের ভাষার আদর করা কি এতই কঠিন? যে ভাষায় মাকে আহ্বান করিতে শিখিয়াছি, তাহার যদি সম্মান করিতে না জানি, নরকেও আমাদের স্থান হইবে না। আজকাল, মনে হয়, এ কথাটি আমরা বুঝিয়াছি। তবে দুটি কথা বলিতে পারি কি? নিজের মা থাকিতে, পরের গৃহিণীকে মা বলিও না। আর নিজের মাকে বিদেশী জামাজোড়া পরাইও না। প্রথমটি স্বতঃসিদ্ধ, দ্বিতীয়টির অর্থ বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে কি?

এক স্থানে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালার পায়ে এক সময় সোনার শৃঙ্খল পরাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল আমরা দেব দেবীর প্রতিমা জর্ম্মান ডাকের সাজে সাজাই, দেবীর পূজায় হোটেলের খানা দিয়া দেবের ভোগ দেই। আর্য্যসঙ্গীত হার্ম্মোনিয়মের সাহায্য ভিন্ন চলে না। তেমনই ঘরের কথাগুলিকে বিদেশী রূপ না দিলে, আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালা ভাষায় তেজ হয় না। তাই আজকাল দেখি বর্ণসঙ্কর ও জারজ

phraseএ কি senten.eএ তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে হয়, সেটা কি উচিত? বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গালা লিখিয়া বুঝাইতে পারিলাম না, ইহা লজ্জার কথা। যে ইংরেজী ভাবটি (চৌর্য্যবৃত্তিলব্ধ) বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হয়, করুন, কিন্তু এমন কথা প্রয়োগ করিয়া অনুবাদ করিবেন না, যাহার পাশাপাশি ইংরাজী কথাগুলি না বসাইয়া দিলে বোধগম্য হয় না। আজকাল দেখিতে পাই, ইংরাজী এক আধটি কথামাত্র নহে, সমগ্র পদ এবং sentence পর্য্যন্ত না বসাইয়া দিলে অর্থবোধ সঙ্কট। সংস্কৃত যে ভাষার মাতা, তাহার অভাব কি? তবে সংস্কৃত সাহিত্য পড়ি না, জোর করিয়া শব্দ গড়াইতে বসি। ইংরাজী ভাব, সংস্কৃত ধাতু অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করা সহজ নহে, কিন্তু আমরা এ কথাটি যেন ভুলিয়া না যাই যে, শব্দমাত্রেরই জীবনের ইতিহাস আছে। পৃথিবীতে যেমন Geological periods আছে, শব্দেরও সেইরূপ। মানুষের যেমন উন্নতি অবনতি আছে, শব্দেরও সেইরূপ। সুব্যবহারেই শব্দ গৌরবান্বিত, অসাধু প্রয়োগে তাহার অগৌরব। শব্দের প্রাণ পিঞ্জরাবদ্ধ করা কঠিন। সে একের নহে, কোটী প্রাণের ধন, অগণ্য কণ্ঠে উচ্চারিত। তবে যিনি মৃত কথায় জীবন দান করিতে পারেন, কিংবা নূতন কথার সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি সঞ্জীবনী-মন্ত্রজ্ঞ ঋষি পুরুষ, তিনি দেবতুল্য। তবে আমরা নাকি সকলেই গঙ্গা-মৃত্তিকা লইয়া শিব গড়িতে বসিয়াছি, তাহাতেই মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, কি গড়িয়া তুলিতে গিয়া কি গড়িয়া বসি! ভাস্কর-হস্তে দেবমূর্ত্তি বিকশিত হয়। হাতুড়ী পেটা কথা সহজে চলে না।

বাঙ্গালা সাহিত্য জটিল হইয়া পড়িতেছে। ইংরাজী না জানিলে অনেক সময় লেখকের মনের ভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরাজী ভাষা জারজ। Froude বলেন,—mongrel। তাহার শব্দার্থে অনেক বৈচিত্র্য আছে। পরের ঘর হইতে মেয়ে আনিয়া নিজের ঘরের করিয়া লইতে সময় লাগে। অনেক সময় একবারেই নিজের ঘরের হয় না। হৃদয়ে অনুরাগ না জন্মাইলে একপ্রাণা হইতে পারে না। ক্ষেত্র-তত্ত্ব না বলিয়া জ্যামিতি বলা, রসায়ন শাস্ত্রকে কিমিতিনির্ণীতি বলাতে পাগলামী আছে। জোর করিয়া Geometry ও Chemistryর জ্ঞাতিত্ব-স্থাপন করা বিধেয় মনে করি না। কুল ভাঙ্গায় গৌরব নাই। এক সময়

শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায় নিজের নামেও বিদেশীর রূপ দিয়াছিলেন। তাহা মনে করিলে হাসি পায়। হিন্দু দেবীর "কালী" নামের পরিবর্ত্তে collie স্কচ কুকুরের নাম আনন্দে বহন করিতে দেখা গিয়াছে। সেইরূপ নিজের দেশের কথাকেও বিলাতী চেহারা দেওয়া হেয় জ্ঞান করি। যাহারা নিজের হাট বাজারে পরের জিনিস লইয়া বেচা কেনা করে, তাহাদের পক্ষে ভাঁড়ানই প্রয়োজন। তবে সাহিত্য, পণ্য জগতের নহে, সাহিত্যের গৌরব যদি রক্ষা করিতে চাও, বিলাতী সজ্জা দূর করিবার চেষ্টা কর। বুঝি, কথার অভাব পড়ে, ভাষাতে নূতন ভাব-বিকাশের সহিত নূতন কথার প্রয়োজন। Franceএর Acadamy যেমন নূতন কথার উপর, কথার নূতন ব্যবহারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, আমাদিগের পরিষদেরও সেইরূপ কর্ত্তব্য। একবার বসিয়া বাঙ্গালার অভিধান ঝাড়িয়া বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আর সহ্য করিতে পারি না। আধ আধ ভাষা, সে ভাষা অপোগণ্ড শিশুর মুখে ভাল লাগিতে পারে, মানুষের মুখে নহে। আজকাল কবিতাতে এইরূপ কথার ছড়া-ছড়ি দেখিতে পাই—মুখানি, আলা, জোছনা, দিঠি, ইত্যাদি। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। চিরদিন কি আমরা সৌখীন কবিতা লিখিয়া সময় কাটাইব, তরুলতা, জাতিযূথী, সোনার আলা, সাঁজের বেলা, জোছনা-রাতি, সবই অতি সুন্দর; কিন্তু এই সৌন্দর্য্য-উপভোগে ক্লান্তি কি কখনও হয় না? স্বীকার করি, বাঙ্গালী কবি এই সৌখীন কাব্য-জগতে অদ্বিতীয়। বাঙ্গালা ভাষার মত মধুর ভাষা কাব্য-জগতে নাই। বাঙ্গালীর মুক্তার হার গাঁথা সহজ। তবে "জোছনা" দেখিতে দেখিতে মনে হয়—বলি, আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে? রাহুর পায়ে ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, যদি চন্দ্র গ্রাস করিলেন, তবে অত সহজে তাহাকে ছাড়িবেন না। আমরা এই অবসরে গঙ্গা-স্নান করিয়া লই—আঁধারের মাহাত্ম্য একটু বুঝিয়া লই। মনে হয় না কি—মনে হয় না কি, কি কারণে "মহাকাব্য" লিখিতে বসিয়া বাঙ্গালী কবি লিখিতে পারিলেন না? তোড় জোড়ের অভাব হয় নাই, তবে বাঙ্গালী তলওয়ার লইয়া বেহাত হইয়া পড়েন। মাতৃদুগ্ধপিপাসু বালিকার হৃদয়ের দুলাল, দুধে আলতা দেওয়া সরস ভাষার পক্ষপাতী। আমাদের দেশেই রাইরাজা। আমাদের কবি শৈশব যৌবনের মিলনের সৌন্দর্য্য বিমুগ্ধ, সন্ধিস্থলে মোহ



বিচারপতি শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী।

Mohila Press, Calcutta.

মুগ্ধ হইয়া কতদিন যাপন করিবে? তোমাকে মদন-মনোহর বেশ ত্যাগ করিতে বলি না, এই বেশে তুমি অতি সুন্দর, স্বীকার করি; আমার বিশ্বাস যে, তুমি অন্য বেশেও সুন্দর। তোমার মত ধীশক্তি জগতে বিরল; তোমাতে অসাধারণ কল্পনার প্রতিভা আছে; তুমি সরস্বতীর বর-পুত্র। তবে রতি-মন্দিরে দিনযাপন করিও না। সহস্রনির্ঝরপ্রসূত মন্দাকিনীবারি-বিধৌত সাহিত্যের প্রাণ মহাসাগরে লীন হইয়া আছে। এই সাগর মন্থন করিবার শক্তি সাধনায় মেলে।

আমি এক স্থানে বলিয়াছি, সত্য-জগতে "অহং"এর স্থান নাই। ইহাতে প্রকৃত আমার যাহা বলিবার ইচ্ছা, তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। সত্য কাহারও বিশেষ সম্পত্তি নহে। এক জনের মনে সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু সত্য আবিষ্কার হইবামাত্র সমগ্র জগতের ধন হইয়া যায়। সত্যে কোনও ব্যক্তি কিংবা কোন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অধি-কার নাই। সাহিত্য ও ধর্ম্ম, বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের যে সম্বন্ধ আছে, ভিন্ন পথে তাহারই আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া থাকে। সেই জন্য কবি ও ঋষি সময়ে একই ছিলেন। Prophet, Poet, Vates and Seer অনেক ভাষাতেই একই নাম। সাহিত্য সেই জন্য "সাধনা"। সত্যের অবতারণাতেই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও সাহিত্যের শক্তি।

জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস একই। এই জীবন পরিস্ফুট না হইলে সাহিত্যেও তেজ ও বল দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে বড় বড় লেখক জন্মাইতে পারে, কিন্তু সাহিত্য যথার্থ যাহাকে বলে, তাহার জন্মগ্রহণ হয় না। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ইতিহাসে এই কথার সত্যতা সপ্রমাণ হয়, এবং এই দুই দেশের সাহিত্য দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, জাতীয় ইতিহাস কতটা সাহিত্যের সহায়।

সুকুমার সাহিত্যে বাঙ্গালীর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তবে সুকুমার সাহিত্য, যে "সাধনা"র কথা আমি বলিলাম, তাহার উপযোগী নয়। যেমন চন্দ্রালোক সুন্দর, প্রচণ্ড সূর্য্যালোকও সুন্দর। চন্দ্রালোকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে, কিন্তু জীবনের উল্লাসের জন্য রৌদ্র-তেজের প্রয়োজন।

আমি পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি যে, জাতীয় ভাষার সাহায্য ভিন্ন

জাতি কখনও গঠিত হয় না। নিজের হৃদয়ে নিজের দেশের ভাষা ভিন্ন অন্য যে কোনও ভাষারই স্থান সংকীর্ণ। সাহিত্য বিদেশী সাজে সাজাইলে কখনই সুন্দর হইতে পারে না। যেমন ভাষা জারজ হয়, সেইরকম বিভিন্ন ভাব-মিশ্রণে ভাবেও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। Burns, আপনারা সকলেই জানেন, Scotlandএর মহাকবি, তিনি ইংরাজীতেও অল্প স্বল্প কিছু কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার সবগুলিই প্রায় অপাঠ্য। French কবি Musset Italianএ কবিতা লিখিয়াছেন, Heine Frenchএ, সেগুলিও প্রায়ই অপাঠ্য। এ কথাটি বিশেষ করিয়া বলার আমার একটু উদ্দেশ্য আছে। বাঙ্গালায় বিদেশী ভাষার ছাঁদ আমার কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত মনে হয়। ইংরাজী-নবীশ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে "আমার উপর ডাকিয়াছিলেন", অর্থাৎ, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন (called on me) র অনুবাদ করিয়া বলেন। এ ভাষা কি নিতান্ত ঘৃণাজনক নয়? তাঁহারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন না বলিয়া, আমাদের ডাকিয়াছেন, বলিতে শুনিয়াছি; অর্থাৎ, (They have asked me), এইরূপ ভাষা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ভাষা ব্যবহার করেন, তাঁহাদেরই বা দোষ দিই কি করিয়া? মাতৃদুগ্ধপালিত শিশু ও Mellin's food প্রভৃতি পায়ী শিশুতে প্রভেদ আছে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যদি বাঙ্গালা না শিখিয়া অন্য ভাষা শিখিবার জন্য আমরা সকলেই প্রাণপণে প্রয়াসী হই, তাহা হইলে শিখিবার শক্তির কত অপচয় হয়। আমাদের শিক্ষার এইটি মৌলিক দোষ। এই দোষ যতদিন পর্য্যন্ত রহিবে, ততদিন বাঙ্গালীর জাতীয়তা লাভ করিবার আশা স্বল্পমাত্র। নিজের দেশের ভাষায় অর্থ যতখানি বোঝায়, পরের ভাষাতে তাহা বুঝাইতে পারে না। বিমাতা মাতা হইয়াও মাতা নহে। সৌভাগ্যের ফলে আমরা এখনও পর্য্যন্ত বিপিতা প্রাপ্ত হই নাই। তবে কপালে কি আছে, বলিতে পারি না। কথার রূপ আছে। সেই রূপ সম্যক্ উপলব্ধি না হইলে, তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করা কঠিন ও তাহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়াও কঠিন। ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমাদের মানসিক অনেক উপকার হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের সাহিত্যও তাহার বলে বলীয়ান হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তবে

ইউরোপীয় সাহিত্য ইহুদীয় আদর্শ ও গ্রীক মনোবিজ্ঞানের আদর্শের উপর সংগঠিত। এই ইহুদীয় প্রভাবটুকু আমরা প্রাচ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সেইখানেই যাহা কিছু সামঞ্জস্য আছে। বাইবেলের ভাষায় ও ভাবে অনেক স্থলে আমাদের আর্য্যঋষিদের ভাষা ও ভাবের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের বৈচিত্র্যের কারণ বহুতর। তাহাদিগের সমাজ একেবারে স্বতন্ত্র। তবে মানুষের হৃদয়-মাত্রই এক, এবং সেই নিমিত্ত গীতিকাব্য প্রায় সব দেশেরই সমান এক জন ফ্রেঞ্চ মহাকবি বলিয়াছেন,—মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া থাকে, কিন্তু অমর জগতের ভাষা একই। এ বিষয় উল্লেখ করিবার এই উদ্দেশ্য যে, এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ এক পক্ষে উন্নতির কারণ হইতে পারে; তেমনই অপর পক্ষে সাহিত্যের প্রাণ যাহা তাহা ক্রমশঃ লোপ পায়, অর্থাৎ জাতীয় বিশেষত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে; সেই জন্য আমি সাহিত্যে অনুবাদের বিশেষ পক্ষপাতী নহি। যতদিন হইতে ইংল্যাণ্ডে, Russian কিংবা Danish উপন্যাসের অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে, ততদিন হইতে ইংল্যাণ্ডে কোনও বিশেষ বড় নভেল প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহাদিগের জীবনের বৈচিত্র্য এবং সকলে নিয়ত বিবিধ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকার দরুণ, আজকাল ইংল্যাণ্ডে চিন্তার সময় কম হইয়া পড়িয়াছে। দেশ বিদেশের কথা এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন সমাজের প্রয়োজনোদ্ভূত নূতন উত্তেজনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ সাদাসিধা কথায় ও দৈনিক সামাজিক চিত্রে মন উত্তেজনা পায় না বলিয়া বাহিরের উত্তেজনার জন্য মন ব্যস্ত হইয়া থাকে। তাহার জন্য আজকালকার ইংরাজী সাহিত্যে ইংরাজ জাতির বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। ফরাসী দেশের সাহিত্যের প্রথম উদ্ভাসের সময় Lesp Chausons de geste এবং পরে chante fableএর দরুণ অর্থাৎ জাতীয় গীতিকবিতার বলে সাধারণের মধ্যে সাহিত্য প্রচারিত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশের সাহিত্যের প্রথম অবস্থায়ও মাণিকচাঁদের গীত প্রভৃতির ও গম্ভীরা চণ্ডী ইত্যাদির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল কিসের বলে সাহিত্য গড়িয়া তুলিবেন? বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই ইতিহাসের যদি উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগের সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, আমার বিশ্বাস। সেই জন্য আনন্দ এবং উৎসাহের

সহিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্য এখানে উল্লেখ করিতেছি। যাঁহাদের যত্ন এবং চেষ্টায় এই সমিতি সংগঠিত হইয়াছে ও সংরক্ষিত হইতেছে, তাহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

উপসংহারে বাল্যবন্ধু দ্বিজেন্দ্রলালের কথা দু একটি বলিতে চাই! তাঁহার বিয়োগে আমার মনে অত্যন্তই আঘাত লাগিয়াছে। অনেক বৎসর ধরিয়া আমরা একত্র ছিলাম, চিরকাল তাঁহাকে আমি নিজের ভায়ের মত দেখিয়া আসিয়াছি, এবং তিনিও আমাকে বড় ভায়ের মত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। অতি বাল্যকালে তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়াছি; তাহাও অদ্য মনে পড়িতেছে। তিনি যদি "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" এই দুইটি গানমাত্র রচনা করিয়া রাখিয়া যাইতেন, তাঁহার কীর্ত্তি চিরদিনের মত অক্ষয় রহিত। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানে অনেকের স্থান কখনও হইবে না। তাহার পার্শ্বে বসিবার আমাদের মধ্যে অনেকেই যোগ্য নই। কিন্তু তোমার স্মৃতি চিরদিনই হৃদয়ে আদরের সহিত রক্ষা করিব। এই প্রার্থনা করি, আমাদের ছেলে মেয়েরা, তুমি যে চক্ষে নিজের দেশকে সুন্দর দেখিয়াছিলে, তাহারাও যেন সেইরূপ সুন্দর দেখে, এবং সেই দেশের ছেলে মেয়ে বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। স্বর্গ হইতে তুমিও তাহাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিও।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

---

# দ্বিজেন্দ্র-বিয়োগে।

১

এই ত সংসার! এ যে সত্য, ফাঁকি, আলো, অন্ধকার,
করুণার তালে তালে নৃত্য করে ভাগ্যের ধিক্কার।
ধোঁয়া-ধোঁয়া, আবছায়া, যেন এটা বাস্পের ভুবন,
মুঠায় কি ধরা পড়ে দেবতার স্বপ্নের লিখন!
কত দেশ, কত জাতি, কত যুগ প্রাণ দিল ডালি,
কালের গহ্বর তবু চিরদিন খালি—শুধু খালি!
এই ছিল! এই নাই! কোথা গেল?—শূন্যে এ জিজ্ঞাসা,
এ পারের কাণ নাই, ও পারের নাই বুঝি ভাষা!

হে সর্ব্বমঙ্গলা, পদে কাঁদে বিশ্ব—শিশু নিরাশ্রয়,
তুমি তা'রে বর দাও, তুমি তা'রে শুনাও অভয়।

২

বড় ভাগ্যে জন্ম নিলে, এই ভূমে ; এ যে তীর্থ ভাই,
বড় পুণ্যে ধন্য হয়ে, হ'লে তার শ্মশানেই ছাই!
নাই থাক্ মাতা, পিতা, জায়া,—কাছে করিতে রোদন,
তব তরে ঘরে ঘরে কাঁদে আজ অগণ্য স্বজন।
এই ত মায়ের বর, এই ত মায়ের দুর্ব্বা-ধান,
এক জন চলে' গেলে নিখিলের শূন্য হয় প্রাণ।
পুত্র-ঋণ শোধে মাতা, করি আজ অশ্রুর তর্পণ,
হে দ্বিজেন্দ্র, হে কবীন্দ্র, অমরতা রচিল মরণ।

৩

যাও, কবি, স্বপ্ন-লোকে, মনোগামী পুষ্পকের রথে,
সুরবালা সনে বাণী বর্ষিছেন লাজাঞ্জলি পথে।
ওই শোন মেঘে মেঘে দ্রিম্ দ্রিম্ বাজিছে মৃদঙ্গ,
সপ্ত-স্বর-সরোবরে দল্-মল্ ফুটিছে সরোজ।
মত্ত করী সম তুমি পশ গিয়া কমল-কাননে,
মুক্তি-স্নান কর নীরে, জ্ঞানাঞ্জন মাখ দু'নয়নে।
ধীরে হ'বে প্রতিভাত, ছিল যাহা ঢাকা অন্ধকারে,
খুঁজেছ যা' আতি-পাতি, এই পার হ'তে 'পর-পারে'।
দেখিবে নিকটে এক রঙ্গ-ভরা মহানাট্য-শালা,
মহাকাল অভিনেতা, বিশ্বেশ্বর রচিছেন পালা।
আবার আসিবে তুমি ;—যুগে যুগে, জন্মে জন্মে যারে
মা বলেছ, সেই কোলে চির-স্নেহে টানিবে তোমারে।
এ যে উৎসর্গের তরে সুধা-কুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন,
অসমাপ্ত আছে যাহা, হ'বে, বন্ধু, হ'বে তা' পূরণ।
হারায় না কিছু বিশ্বে, প্রকৃতির গুছান-স্বভাব,
দ্বিজেন্দ্র পুরাবে এসে, দ্বিজেন্দ্রের অকাল-অভাব।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

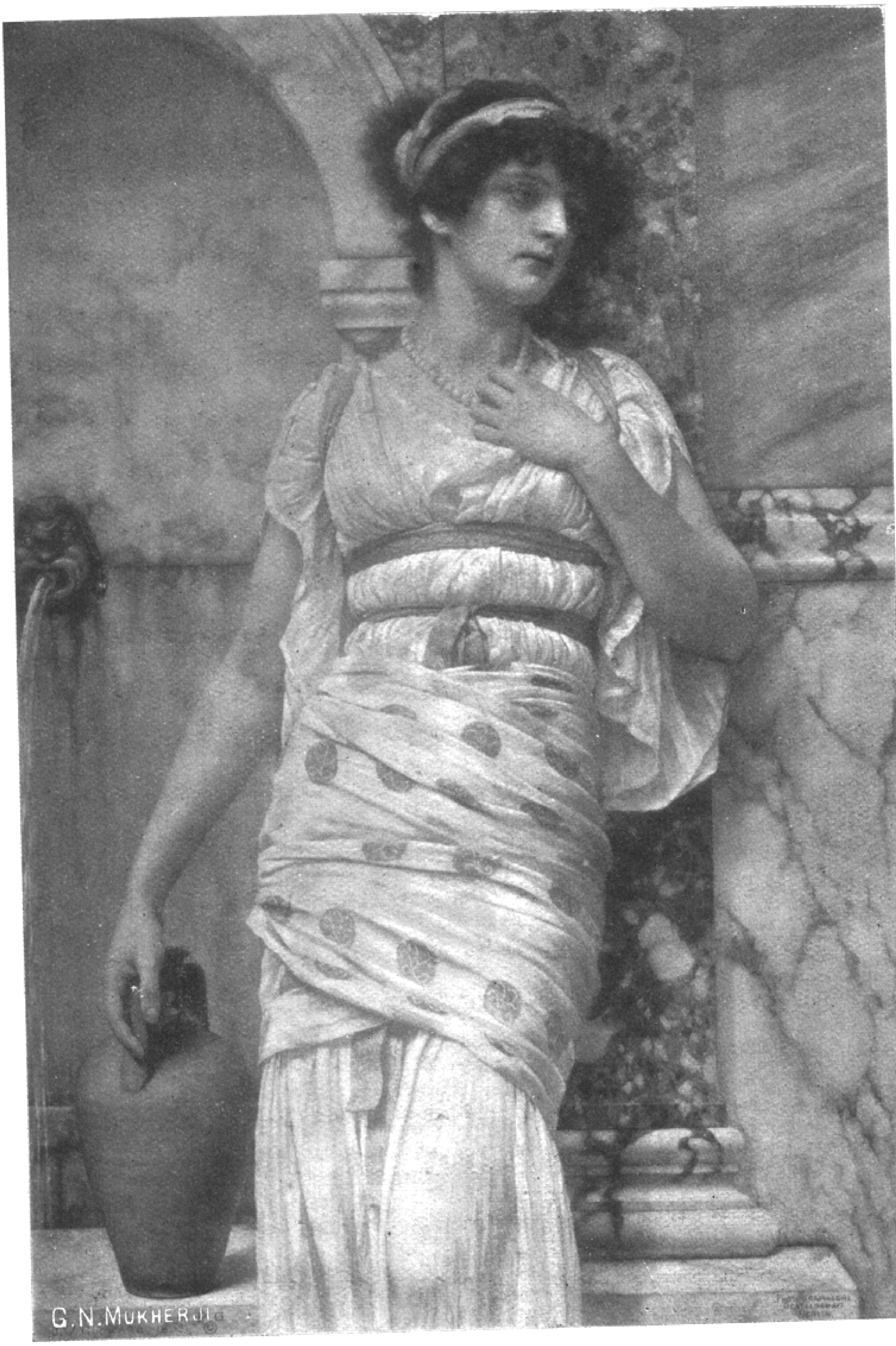
# অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির নিবেদন।

মা বাগ্বাদিনী বীণাপাণি! আজ অকৃতী সন্তানের হৃদয়-সরোজে উদিত হও মা। তোমার করুণাকণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তোমারই ভক্ত, তোমারই সেবক, তোমারই বরপুত্রগণের আবাহন করিতে যেন সমর্থ হই। আজ আমি ধন্য, আজ দিনাজপুরবাসিগণ ধন্য, আজ বীণাপাণির বরপুত্রগণের সমাগমে দিনাজপুর সারস্বত-তীর্থ বলিয়া গণ্য। হে সমাগত সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী সজ্জনবৃন্দ! এই গ্রীষ্মের নিদারুণ আতপতাপে সন্তপ্ত, তদুপরি অসাময়িক বর্ষায় উৎপীড়িত ও প্রবাসের নানা অসুবিধা অভাবে ক্লিষ্ট হইয়াও আপনারা যে এখানে পদার্পণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা কৃতার্থ বোধ করিতেছি। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্য-সেবার উপচারে অনভ্যস্ত আমাদের ন্যায় অসাহিত্যিকের নিকট আপনাদের কতই অনাদর, কতই অসুবিধা ও কতই কষ্ট হইতে পারে, আশা করি, আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্যগুণে আমাদের সকল ক্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। এত অসুবিধা, এত অযোগ্যতার মধ্যেও আমরা আজ আপনাদিগকে কেন আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছি, কেন আমরা এই দুঃসাহসের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহার কারণ, আমরা জানি, আপনাদের সেবা করিলে—আপনাদের পরিচর্য্যা করিলে বীণাপাণি সরস্বতীরই পূজা করা হয়। যাঁহারা উন্নত-চিন্তায় ও উদ্দাম-আকাঙ্ক্ষায় মানস-আকাশে বিশ্বপ্রেম অনুভব করিতে পারেন, কল্পনার রাজ্যে যাঁহারা বাস্তবতা আনিতে উপযুক্ত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গমে যাঁহারা দেশভক্তি ও মাতৃভাষার বিকাশ করিতে সমর্থ, সংসারের কল্লোল-কোলাহল-মধ্যে অশান্তিকর বিষয়লিপ্সার পার্শ্ব দিয়াও যাঁহারা ভাবরাজ্যে, জ্ঞানরাজ্যে ও প্রেমরাজ্যে বিচরণ করিতে অধিকারী, খরতর জ্ঞানজ্যোতির মধ্যেও যাঁহাদের হৃদয়-সরসী প্রেমের শান্তিময় কুসুম-সৌরভে আমোদিত,—তাঁহারা যে ভগবান্ পঞ্চাননের আত্মপ্রসাদের ন্যায় আমাদের পূজার উপযুক্ত সম্ভার না থাকিলেও সামান্য বিল্বদলে প্রীত ও হৃষ্ট হইবেন, এই বিশ্বাসে আজ দিনাজপুরবাসী তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতিথি নারায়ণ। বিদুরের খুদেও নারায়ণ সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা আমরা ভক্তির সহিত ও আনন্দের সহিত বলিতে পারি।

আপনাদের শুভাগমনে আমাদের কতই স্মৃতি, কতই অতীত কীর্ত্তি,

কতই আর্য্যগীতি স্মরণ হইতেছে। করতোয়া ও মহানন্দের মধ্যবর্ত্তী এই দিনাজপুর-ভূভাগ একদিন আর্য্য ও প্রাচ্যের মিলন-রঙ্গস্থলী বলিয়া ধন্য হইয়াছিল। এখানকার সদানীরা যদিও এখন বর্ষা ব্যতীত স্রোতস্বতী বলিয়া গণ্য নহে। কিন্তু স্মরণাতীত বৈদিক যুগে ইহাই নিত্যজলসিক্তা পবিত্রসলিলা 'সদানীরা' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইহারই তীরে প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্য আর্য্য-সমাজের প্রথম মিলন হইয়াছিল। প্রাচীন কালে এই স্থানই জ্যোতির্বিষক ও কোটিবর্ষ বলিয়া পরিচিত ছিল। এই স্থানেই খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দে জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোটিবর্ষীয় নামক শাখার উদ্ভব হইয়াছিল। এই কোটি-বর্ষই বাণরাজাদিগের এক সময়ের লীলাস্থলী ছিল। বাণরাজবংশের যত্নে এখানকার শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহাদের যত্নে এখানে নানা স্থানে কতই দেব-কীর্ত্তি —কতই দেবসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সেই কীর্ত্তিসৌধ কালের করালকবলে নিপতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সেই বিরাট ধ্বংসের মধ্যে অতীত শিল্পের যে উজ্জ্বল নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা সভ্যজগতের নিকট গৌড়-শিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। সেই বাণবংশের ও গৌড়ের পালবংশের বহুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এই দিনাজপুর জেলার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই বিরাট্ ধ্বংসাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুরাতত্ত্ব-উদ্ধারের এতদিন উপযুক্ত আয়োজন হয় নাই। সম্প্রতি "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" সেই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কেবল গৌড়-বঙ্গ-বাসী বলিয়া নহে, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সমস্ত শিল্পকলাবিদের ধন্যবাদের পাত্র ও আমাদের পরম কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এখানে যেমন অতিপূর্ব্বকালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন হইয়াছে, সেইরূপ এখানে তৎপরবর্ত্তী কালেও ভারতের বাহিরে পূর্ব্ব-উপদ্বীপের প্রান্তে সুদূর চীনসমুদ্রতটবর্ত্তী অধুনা কাম্বোডিয়া নামে পরিচিত সুপ্রাচীন কম্বোজের রাজবংশেরও সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। অদ্যাপি দিনাজপুর-রাজবাটিতে রক্ষিত সেই কাম্বোজান্বয়ের শিলালেখ হইতে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাইতেছি। চীন-সমুদ্রকূলবর্ত্তী কম্বোজ হইতে বর্ম্মনৃপতিগণের শত শত শৈবকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই শৈব-রাজ-বংশেরই সম্ভবতঃ কেহ কেহ এই দিনাজপুর অঞ্চলে আসিয়া শিবমন্দির-প্রতিষ্ঠার সহিত কাম্বোজীয় শৈবকীর্ত্তি-স্থাপনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই কাম্বোজবংশই পরবর্ত্তী জনপ্রবাদে পরম শৈব বাণরাজবংশ বলিয়া গণ্য

হইয়াছে কি না, তাহা ঐতিহাসিক ও পুরাবিদ্‌গণের বিশেষ ভাবে চিন্তনীয় সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই আধিপত্যকালে ভারত-বহির্ভূত প্রাচ্যভূভাগের বহুজাতি এই জেলায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। এখনও তাহারা এই জেলার নানা স্থানে বাস করিতেছে। এই সকল জাতির প্রকৃত তত্ত্বোদ্ধারও আপনাদের একটি কর্ত্তব্য। উক্ত কাম্বোজবংশের সমকালে বৌদ্ধপালরাজবংশেরও এখানে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহাদের কীর্ত্তির নিদর্শন এই জেলার নানা স্থানে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানকার বুদালস্তম্ভে উৎকীর্ণ দর্ভপাণির প্রশস্তিও বিশাল মহীপাল দীঘী, আমাদিগকে পালবংশের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এক সময়ে এখানে সর্ব্বত্রই মহীপালের গান গীত হইত। চেষ্টা করিলে এখনও সেই অতীত বৌদ্ধগাথা বাহির হইতে পারে। এখানকার দেবকোটেই প্রথম মুসলমানরাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং সেই সময় হইতে এখানকার অতীত কীর্ত্তি ধ্বংসমুখে পতিত হইতে থাকে। বৌদ্ধ, জৈন ও শৈব প্রভাবের ন্যায় এখানেও মহাতান্ত্রিক শাক্তসম্প্রদায়ের প্রতিপত্তিও প্রসারিত হইয়াছিল। এই জেলার প্রায় প্রতি গ্রামেই শাক্ত-প্রভাবের নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। আপনারা গোপীচাঁদের গানে হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধার নাম শুনিয়াছেন; এখনও এই দিনাজপুরের নানা স্থানে মহাশাক্ত হাড়িগণের সন্ধান পাইতেছি, তাহারাই স্বয়ং মহাকালীর পূজা করিয়া থাকে; স্বহস্তে বলি দিয়া থাকে; এমন কি, কোনও কোনও গ্রামে তাহারা অগ্রে পূজা না করিলে অপর কেহ শক্তিপূজা করিতে পারে না। এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রভাবের ও অপূর্ব্ব শাক্তপ্রভাবের ইতিহাস অবশ্যই আপনাদের অনুসন্ধেয়। মুসলমান প্রভাবের সঙ্গে এখানে বহু মুসলমান সাধু আগমন করেন, এবং তাঁহাদের পদার্পণে এই জেলার নানা স্থানে দরগা, মসজিদ ও তকৃত নির্ম্মিত হইয়াছে, এখনও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যেখানে মুসলমান পীরের আস্তানা, তাহারই নিকট প্রায় সুপ্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে একটি প্রসিদ্ধ আস্তানার সংবাদ দিতেছি;—পাঁচবিবি থানার উত্তরপূর্ব্বে পাহাড়পুর হইতে প্রায় ৫৷৷০ ক্রোশ উত্তরে তুলসীগঙ্গার ধারে নিমাই সা নামক এক পীরের আস্তানা, এবং তাহারই নিকট বৃহৎ বৌদ্ধস্তূপ রহিয়াছে। উক্ত বৌদ্ধস্তূপের অর্দ্ধক্রোশ দূরে বৌদ্ধরাজ মহীপালের স্থাপিত মহীপুর গ্রাম। উক্ত পাহাড়পুরেও বৌদ্ধস্তূপ




নির্ঝর-সমীপে ।

চিত্রকর—গড্‌ওয়ার্ড ।

Mohiia Press, Calcutta.

আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়পুরের ২৷৷০ ক্রোশ পশ্চিমে যোগিগুহা নামে একটি বিখ্যাত স্থান রহিয়াছে। ইহার চারি দিকেই বিস্তর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে, ঐ স্থানে দেবপাল, দেবপালের মাতা ভীমা-দেবী এবং চন্দ্রপাল, মহীপাল প্রভৃতির প্রাসাদ ছিল। এই স্থানের তিন ক্রোশ দূরে বুদলস্তম্ভে নারায়ণপালের সময়কার শিলালিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। পালরাজ দেবপালের নাম হইতেই দেবকোট নাম হইয়াছে কি না, তাহাও আপনারা অনুসন্ধান করিতে পারেন। এইরূপে এই জেলার নানা স্থানে বিভিন্নধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন সময়ের বহু কীর্ত্তিনিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেই সমস্ত উল্লেখ করিয়া আপনাদের মহামূল্য সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না।

দিনাজপুরের রাজা গণেশের নাম আপনারা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে দিনাজপুর হইতেই রাজা গণেশের অভ্যুদয়। তিনি আমাদের উত্তররাঢ়ীয় কুলকারিকায় দত্তবংশীয় বলিয়া পরিচিত আছেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে তিনি "দত্তখান" বলিয়া পরিচিত। সেই মহাত্মা মুসলমানপ্রভাব থর্ব্ব করিয়া সমস্ত গৌড়মণ্ডলে কেবল যে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার যত্নে গৌড়ীয় হিন্দু-সমাজে বহু সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। শিল্প ও সাহিত্য উভয়েরই তিনি উৎসাহ-দাতা ছিলেন। বঙ্গের বাল্মীকি কৃত্তিবাস তাঁহারই নিকট পূজা পাইয়া, আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সুতরাং আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, এই দিনাজপুরের সহিত সমস্ত বঙ্গের ইতিহাসের এবং সমস্ত বাঙ্গালী জাতির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই অতীতের মহাশ্মশানে আপনাদের দেখিবার, ভাবিবার ও আলোচনা করিবার অনেক জিনিস আছে বুঝিয়াই আপনাদিগকে আহ্বান করিতে আমরা সাহসী হইয়াছি।

আমি ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক নহি, অথবা সাহিত্যিকগণের মধ্যেও এক জন সামান্য সেবক বলিয়া গণ্য হইবার অধিকার রাখি না। আপনাদের সমাগমে উৎসাহিত হইয়া যাহা যতদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এবং আপনাদের আলোচনার ফলে যে সকল চিন্তা আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে, কর্ত্তব্যবোধে সেই সকল কথাই আপনাদের নিকট আবেদন করিলাম। আশা করি, আমার এই ধৃষ্টতা

আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। যে জিনিসটি যাহার ভাল লাগে, সে সেই জিনিসটি তাহার পরমাত্মীয়ের নিকট উপস্থিত করিতে চায়, তাই আজ কর্ত্তব্যবোধে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। ইহাতে যদি কিছু আমার ধৃষ্টতা হইয়া থাকে, আপনারা দোষ বর্জ্জন করিয়া গুণ-টুকু গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

আজ অভ্যর্থনা-সমিতি আপনাদের নিকট আমার মনের কথা প্রকাশ করিবার অবসর দিয়া বাস্তবিক আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, সকল স্থানের বঙ্গ-জননীর কৃতী সন্তানগণ আজ উত্তরবঙ্গের এই সাহিত্য-সম্মিলনে সম্মিলিত হইয়া আমাদের আতিথ্য-গ্রহণ করায় আমরা কৃতার্থ বোধ করিতেছি। এই শুভ-সম্মিলনে সাহিত্যিকগণের মিলন-বন্ধন দৃঢ় হউক, আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হউক, উত্তরবঙ্গের গৌরববৃদ্ধি হউক, বঙ্গবাণীর কল্যাণে আমদের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হউক, ইহাই পরমমঙ্গলময় ভগবানের নিকট ও আপনাদের নিকট একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীগিরিজানাথ রায়।

---

# দাদা।

পল্লীগ্রাম। আষাঢ়ের সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আকাশ-মণ্ডল ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন; সমস্ত দিন সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই, কেবল সূর্য্যাস্তকালে পশ্চিমগগন-বিলম্বী ধূসর মেঘস্তর লোহিতাভ হইয়া চরাচরে দিবাবসানবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছিল। কিন্তু আচম্বিতে একখানি কালো মেঘ উদ্দাম-ঝটিকা-প্রবাহে কোথা হইতে ভাসিয়া আসিয়া, বিদ্যুদ্দন্তবিকাশ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল; নদীতীরবর্ত্তী দীর্ঘশীর্ষ ঝাউয়ের শাখাগুলি সোঁ সোঁ শব্দ করিতে লাগিল। তাহার পর ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে বৃষ্টির বিরাম নাই। গৃহস্থের খড়ের চালে, গৃহপ্রান্তস্থিত কলাগাছে, বাঁশ-ঝাড়ের ঘন বাঁশের পাতায় ও তাহার পাশে শশার মাচায় ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। ক্ষুদ্র মাণিক-পুরের রাস্তা পথ কর্দমে পূর্ণ, পথের ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবা, তাহা বৃষ্টির জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, এবং ভেকের দল একত্র জোটিয়া নানা স্বরে মহানন্দে

বর্ষার বন্দনাগান আরম্ভ করিয়াছে। পথে লোক চলিতেছে না, সকলে স্ব স্ব গৃহে আশ্রয় লইয়াছে; কেহ মৃৎপ্রদীপের অদূরে বসিয়া 'ঢেরা'য় পাট কাটিতেছে; কেহ পুঁথি পড়িতেছে; কেহ বালি দিয়া 'হেঁসো'য় সান দিতেছে; কোনও নিষ্কর্ম্মা বসিয়া বসিয়া ডাবা হুঁকায় তামাক টানিতেছে। শিশু মায়ের কোলে শুইয়া নিমীলিতনেত্রে স্তন্যপান করিতেছে। ছেলে মেয়েরা ঘরের মেঝেতে সারি দিয়া বসিয়া 'আগাডুম্ বাগাডুম্ ঘোড়াডুম্ সাজে'—কোমল স্বরে ছড়া আবৃত্তি করিতেছে; দোকানে দোকানী ঝাঁপ বাঁধিয়া একান্তমনে জমা খরচ লিখিতেছে। বহিঃপ্রকৃতির এই বর্ষাসুলভ দুর্য্যোগে তাহার লক্ষ্য নাই, যেন তাহার খরিদ বিক্রয়ের হিসাবটাই পৃথিবীতে একমাত্র সত্য—আর সকলই মিথ্যা, মায়াময়!

মাণিকনগরের একখানি ক্ষুদ্র গৃহস্থ-গৃহের অভ্যন্তরে সে সময় বহিঃ-প্রকৃতির এই দুর্য্যোগের ও অন্ধকারের ছায়া পড়িয়াছিল। এই গৃহে বৃদ্ধ নীলমাধব মুখোপাধ্যায় মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া অন্তিমের সম্বল জননী ব্রহ্মময়ীর চরণযুগল চিন্তা করিতেছিলেন, এবং দুশ্ছেদ্য মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া কোটরগত মুদ্রিত নেত্র হইতে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। পুত্র লাল-মাধব তাঁহার শিয়রে উপবেশন করিয়া পিতার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতেছিলেন, আর একাগ্র মনে প্রার্থনা করিতেছিলেন, মা মঙ্গল-চণ্ডী! এ যাত্রা বাবাকে বাঁচাও। বাবার অভাবে আমি কি করিয়া এ সংসার চালাইব?"

কিন্তু লালমাধবের চিন্তাস্রোত সহসা অবরুদ্ধ হইল। বৃদ্ধ নীলমাধব চক্ষু খুলিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বাবা লালু, আমার আর অধিক বিলম্ব নাই,—জীবনটা বৃথা কাজে কাটাইয়াছি, তোমাদের জন্য কোনও সম্বল রাখিয়া যাইতে পারিলাম না; পথের সম্বলও কিছু নাই। জানি না, ব্রহ্ম-ময়ী চরণে স্থান দিবেন কি না; কিন্তু এ সময়েও তোমাদের কথা ভাবিয়া বড় কাতর হইয়াছি। নবীনের মা নাই, তাহাকে তোমার ও বৌমার হাতে ত সঁপিয়া দিলাম, ছোঁড়াটা যাহাতে মানুষ হইতে পারে—সে চেষ্টা করিও।—দুধের ছেলে নবীন, আমার কাছেই তাহার যত আবদার। দেখো, সে যেন কখনও মনে ব্যথা না পায়। একবার তাকে ডাক, আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন করছে।"

পিতৃভক্ত লালমাধব অশ্রুপূর্ণনেত্রে পিতার আদেশ পালন করিতে

চলিলেন। তখন নবীনমাধব রান্নাঘরে একখানি কাঁথায় শুইয়া ঘুমাইতেছিল, আর লালমাধবের স্ত্রী গিরিবালা উনানে পাচন সিদ্ধ করিতেছিলেন।

লালমাধব ব্যগ্রভাবে রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আর পাঁচন তৈয়ারী করে কি কর্‌বে? বাবা কেমন যেন করচেন। সন্ধ্যা থেকে তিনবার ডেকে ত কবিরাজ মশায়কে আন্‌তে পারলাম না!—এই দুর্য্যোগের রাত্রি, কি যে হবে, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনে। নব্‌নে, নব্‌নে, ওঠ, জন্মের মত বাবাকে দেখে নিবি আয়!"

নবীন উঠিয়া বসিল। আট বৎসরের বালক; মৃত্যুসম্বন্ধে তাহার কোনও ধারণা নাই। সমস্ত দিন পিতার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া থাকিয়া সন্ধ্যার পর সে বৌদিদির কাছে আসিয়া শ্রান্তিভরে সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

লালমাধব সুপ্তোত্থিত নবীনকে কোলে লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। গিরিবালাও ব্যস্তভাবে শ্বশুরকে দেখিতে আসিলেন। তখন বৃদ্ধের নাভিশ্বাস উপস্থিত।—লালমাধব নবীনকে পিতার ক্রোড়ের কাছে বসাইয়া তাঁহার মস্তক কোলে তুলিয়া লইলেন, কাতরস্বরে বলিলেন, "বাবা, নবীনকে এনেছি! তাকে কি বল্‌ছেন, বলুন।" নীলমাধব বলিলেন, "মায়ের নাম শুনাও বাবা, আমার ছুটী!"—লালমাধব পিতার কর্ণমূলে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইতে লাগিলেন। নীলমাধবের প্রাণ অনিত্য দেহ ত্যাগ করিল। লালমাধব শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। গিরিবালা শ্বশুরের পদ-দ্বয়ে মস্তক রক্ষা করিয়া অশ্রুধারায় তাহা সিক্ত করিতে লাগিলেন। নবীন-মাধব উভয় হস্তে পিতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া "বাবা গো! বাবা!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাহিরে দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিল।

২

লালমাধব কথকতা করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ভাল কথক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল; কথকতার জন্য অনেক বড়লোকের বাড়ী তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। কোনও কোনও স্থলে তিন মাস পর্য্যন্ত "কথা" চলিত; তাহাতে তিনি যে সিধা ও দক্ষিণা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার সংবৎসর সংসার চলিত। কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ন্যায় তিনিও অমিতব্যয়ী ও পরদুঃখকাতর ছিলেন; এ জন্য তিনি কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। বার্দ্ধক্যে শরীর অপটু হওয়ায় তিনি কথকতা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; পৈতৃক কিছু ব্রহ্মোত্তর জমী ছিল, তাহা হইতেই

কোনও রকমে সংসার চলিত। গৃহবিগ্রহের সেবার ত্রুটী হইত না; অতিথিরাও তাঁহার দ্বার হইতে ফিরিত না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুখদুঃখের সঙ্গিনী প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যু হওয়ায় কথক মহাশয় হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছিলেন, সে ব্যথা তিনি সামলাইতে পারেন নাই; তিনি হরিনাম করিতেন, আর পত্নীবিরহে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিত। মহাপ্রস্থানের জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, কিন্তু নবীন-মাধবকে 'মানুষ' করিয়া তুলিবার পূর্ব্বে তাঁহার ইহলোক-ত্যাগে মন করিতেছিল না। যম মানুষের সুবিধা অসুবিধা দেখে না, হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে তাঁহাকে সংসার-পারাবারের পরপ্রান্তে এক অজ্ঞাত রাজ্যে লইয়া গেল।

কাহারও অভাবে সংসার অচল থাকে না। পিতার অভাবেও লাল-মাধবের সংসার চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে সুখে ও নিরুদ্বেগে সংসার চলিত; এখন দুঃখে ও নানা দুশ্চিন্তায় সংসার চলিতে লাগিল! শ্বাশুড়ী গিরিবালাকে পাকা গৃহিণী করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। সংসারের অভাব ও দারিদ্র্যের অশান্তি গিরিবালা প্রাণপণে গোপন করিতেন, স্বামীকে তাহা জানিতে দিতেন না। বস্তুতঃ পিতার মৃত্যুর পর গিরিবালাই লালমাধবের অভিভাবিকা হইলেন। গিরিবালা এ কালের শিক্ষিতা বধূ হইলে লালমাধবকে পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসার ছাড়িয়া পলাইতে হইত।

গিরিবালার প্রধান কার্য্য ছিল, দেবর নবীনমাধবের লালনপালন। নবীনমাধবের বয়স যখন তিন বৎসর, সেই সময় তাহার মাতার মৃত্যু হয়।—সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। সেই সময় হইতে গিরিবালা নবীনকে পুত্রাধিক স্নেহে যত্নে লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। নবীন এখন গিরিবালাকেই মা বলিয়া জানে। গিরিবালার সন্তান ছিল না, নবীনই তাঁহার সকল স্নেহ অধিকার করিয়াছিল।—পিতার নিকট তাড়া খাইয়া সে বৌদিদির কোলে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিত।

লালমাধব পল্লীগ্রামের গৃহস্থ, তাঁহার অভাব সামান্য ছিল। কারণ, বিলাসিতার সহিত কখনও তাঁহার পরিচয় হয় নাই। বাড়ীতে যে দুই তিনটি পয়স্বিনী গাভী ছিল, তাহারা মাঠে চরিয়া আসিয়া যথেষ্ট

বাড়ীর আঙ্গিনায় কয়েক কাঠা জমীতে একটি বাগান ছিল, তাহাতে নিত্য ব্যবহার্য্য তরিতরকারী ও কলা, পেঁপে, আতা, ডালিম প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হইত। মাঠে ধানের জমীতে যে ধান হইত, তাহাতে সংসারের খরচ চলিত; তবে কয়েক বৎসর অজন্মা হওয়ায় লালমাধব কিছু কষ্টে পড়িয়াছিলেন। তথাপি তিনি দুঃস্থ গ্রামবাসিগণের দুঃখ দেখিলে সাধ্যানুসারে তাহাদের সাহায্য করিতেন। দরিদ্র পল্লীরমণীগণ গিরিবালাকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা মনে করিত।

সাংসারিক অস্বচ্ছলতা নিবন্ধন লালমাধব দাস দাসী রাখিতে পারিতেন না। এ জন্য গিরিবালাকে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে হইত; লালমাধব ইহাতে বড় কষ্ট বোধ করিতেন; একদিন তিনি গিরিবালাকে বলিলেন, "তোমার কষ্ট আর দেখিতে পারি না। এত পরিশ্রম কি সহ্য হয়? সস্তায় একটা ঝি পাইলে রাখিতাম, কিন্তু যে কঠিন কাল পড়িয়াছে, মাসে পাঁচ টাকা খরচ না করিলে আর একটা চাকরাণী রাখা যায় না।"

গিরিবালা সলজ্জভাবে বলিল, "চাক্‌রাণীতে আমার দরকার কি? গোবিন্দ করুন, খাটিতে খাটিতে তোমার পায়ে মাথা রাখিয়াই যেন চক্ষু বুজিতে পারি। দুঃখকে দুঃখ মনে করিলেই দুঃখ।"

লালমাধব বলিলেন, "নব্‌নে যদি কখনও মানুষ হতে পারে, তা' হলেই আমাদের দুঃখ ঘুচবে।"

গিরিবালা বলিল, "আমরা খেয়ে না খেয়ে ওকে মানুষ করে তুলতে পারি ত ঠাকুর স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন।—ঠাকুরপো মনে করে,—আমিই ওর মা, মায়ের কথা ওর মনে নেই। আহা, একশ' বছরের হয়ে বেঁচে থাক, ওর যেমন পড়া শুনায় ঝোঁক, তাতে বাপ দাদার নাম রাখ্‌বে।"

কয়েক বৎসর পরে নবীনমাধব গ্রামের এণ্ট্রেন্স স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিল। কয়েক মাসের বেতন ও পরীক্ষার ফি দাখিল করিতে লালমাধবকে দশ দিক অন্ধকার দেখিতে হইল; অবশেষে তিনি দুই বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী বিক্রয় করিয়া এই দায় হইতে উদ্ধারলাভ করিলেন।—সেবার শীতকালে আর তাঁহার চালে খড় উঠিল না; বর্ষাকালে জীর্ণ-চাল ভেদ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; 'চালি'র উপর লেপ, কাঁথা,

বালিশ ছিল, আষাঢ়ের অবিশ্রান্ত বর্ষণে তাহা ভিজিয়া গেল। লালমাধব ভুঃখিতভাবে স্ত্রীকে বলিলেন, “শীত কালে ঘর ছাইতে পারিনি, জানি, এবার বর্ষায় ভিজতে হবে। আমার ‘নুন আন্‌তে পান্‌তো ফুরোয়, পান্‌তো আন্‌তে নুন,’—কি দিয়ে কি করি, ভেবে পাইনে! টাকায় বিশ আঁটি খড়, বারো আনা কেশে, আর শিকি উলু। উইয়ের দৌরাত্ম্যে বছর অন্তর চালে খড় না দিলেও চলে না। নবুনের পরীক্ষার খরচ যোগাইতেই এবার সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। পাশটা যদি করতে পারে, তবে অর্থব্যয় সার্থক হয়।”

গিরিবালা বলিল, ‘কষ্টেস্রেষ্টে ত ঠাকুরপোকে মানুষ করে তোল, এমন দিন থাক্‌বে না। ঠাকুরপো ভু পয়সা আন্‌তে পারলে একটা ছোটখাট পাকা কুঠুরী করো, যে ‘আগুন পাণি’র ভয়!”

লালমাধব হাসিয়া বলিলেন, “কাঙ্গালের কর্কট রাশ! আমি আবার পাকা ইমারত করবো! তুমিও যেমন!”—তাঁহার হাসি নৈরাশ্য-মিশ্রিত।

৩

নবীনমাধব সে বৎসর এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পনের টাকা বৃত্তি লাভ করিল।—এ দিকে গিরিবালার ত্রিশ বৎসর বয়সে একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।—গ্রামের লোকেরা বলিতে লাগিল, “এতদিনে লালমাধব মুখুয্যের ‘অদেষ্ট’ ফিরেছে।” ছত্রিশ বৎসর বয়সে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া লালমাধব স্বর্গ হাতে পাইলেন, পুত্রের নাম রাখিলেন,—ইন্দুমাধব।

নবীনমাধব তাহার বাসগ্রামের আঠার ক্রোশ দূরবর্ত্তী বহরমপুর কলেজে এল্‌ এ. পড়িতে গেল। নবীন দাদাকে পাঠ্যপুস্তকের ফর্দ্দ পাঠাইল। পুস্তকের দাম দেখিয়াই লালমাধব মাথায় হাত দিয়া বসিলেন! তাঁহার ভুশ্চিন্তার কারণ শুনিয়া গিরিবালা বলিল, “টাকার জন্য তুমি ভেবো না, আমি একটা উপায় করিব।”—সে তাহার পিতৃদত্ত পাচ ভরির সোনার বালা দত্ত-বাড়ীতে বন্ধক দিয়া সত্তর টাকা আনিয়া স্বামীর হস্তে দিল।—লালমাধব বিপদ-সমুদ্রে কূল পাইলেন; গিরিবালাকে বলিলেন, “আমি গরীব বটে, কিন্তু হতভাগ্য নই; তোমার মত যার স্ত্রী সংসারে, তার ভুঃখ কি? কেবল আক্ষেপ এই যে, তোমাকে

ত কখনও দু তোলা সোনা রূপা দিতে পারিলাম না, উপরন্তু তোমার বাবা তোমাকে যে দু ভরি দিয়েছিলেন, তাও তোমাকে খোয়াতে হচ্ছে।”

গিরিবালা হাসিয়া বলিল, “ঠাকুরপোর বিদ্যা হোক; আমি না হয় হাতে লাল সুতো জড়িয়ে ‘এয়োতি’ রক্ষা করবো।”

লালমাধব আহ্লাদে গদগদ হইয়া পত্নীকে আলিঙ্গন-দানে উদ্যত হইলেন! গিরিবালা লজ্জায় অভিভূত হইয়া দুই হাত সরিয়া গিয়া বলিল, “ও আবার কি রঙ্গ!—আমি কচি খুকী কি না, তাই আদর করতে এলে।

নবীনমাধবের ঐ পনের টাকা বৃত্তিমাত্র সম্বল; সে তাহার অবস্থার কথা জানাইয়া রাজবাড়ীতে কিছু মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করিল; কিন্তু সে পল্লীগ্রামবাসী দরিদ্রের পুত্র, কোনও হাকিম বা ক্ষমতাশালী পদস্থ ব্যক্তির নিকট সুপারিস চিঠি সংগ্রহ করিতে পারিল না, কাজেই তাহার প্রার্থনা নামঞ্জুর হইল। সাধকশ্রেষ্ঠ পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, “যাহার চাপরাস নাই, তাহার কথা কেহ শোনে না।”—যে চাপরাসে রাজা মহারাজার মন আকৃষ্ট হয়, এবং লোহার সিন্ধুক খুলিয়া যায়, বালক নবীন সে চাপরাস কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে?—তাহার দুঃখ ঘুচিল না, সে একটি ‘টিউসনী’ জুটাইয়া ভরণ-পোষণ ও পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। কিন্তু এল্. এ. পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে, পাঠের ক্ষতি হয় দেখিয়া সে ‘টিউসনী’ ছাড়িয়া দিয়া তাহার অর্থাভাবের কথা দাদাকে জানাইল। লালমাধব আবার পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন; গিরিবালা তাহার শেষ সম্বল সোনার তাগা জোড়াটা বিক্রয় করিয়া দেবরের এল্ এ. পরীক্ষার খরচ চালাইলেন।

এইবার যখন নবীনমাধব কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়া বহরমপুর কলেজ হইতে এল্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তখন অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত চট্টোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। নানা স্থান হইতে ঘটকের দল আসিয়া লালমাধবকে বিব্রত করিয়া তুলিল। যাহারা তাঁহাকে একটি রাজকন্যা ও অর্দ্ধরাজ্য প্রদানের লোভ দেখাইল, তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন, তিনি দরিদ্র বটে, কিন্তু ভ্রাতার বিবাহ দিয়া একটা বড় রকম দাঁও মারিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই; মেয়েটি

সুন্দরী হয়, বংশ ভাল হয়, এবং কন্যার পিতা নবীনের উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভারবহনে সম্মত হন, তাহাহইলেই তিনি যথেষ্ট মনে করিবেন।

লালমাধবকে এত অল্পে রাজী হইতে দেখিয়া গ্রামের বুদ্ধিমানেরা তাঁহার বুদ্ধির নিন্দা করিতে লাগিল। প্রতিবেশী চাটুয্যে মহাশয় তিনটি ছেলেকে বিবাহের বাজারে নিলামে বিক্রয় করিয়া হাজার দশেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ; তিনি একদিন লালমাধবকে ডাকিয়া মিষ্ট ভৎর্সনা করিলেন, বলিলেন, "বাবাজী, আজকাল যেমন কাল পড়িয়াছে, সেই ভাবেই চলা উচিত ; রাঢ়ী ব্রাহ্মণের ঘরের এল্. এ. পাশ ছেলে, মাসে বিশ টাকা জলপানি পাইতেছে, একটু যদি 'আঁট' ধর, তা হলে উহার বিবাহ দিয়া অনায়াসে পাঁচটি হাজার টাকা ঘরে তুলিতে পার। তা না করিয়া তুমি এমন সুপাত্রকে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিতে চাও ? পরিবারের গহনা বিক্রয় করিয়া, জোত জমা বন্দক রাখিয়া ভাইটিকে মানুষ করিলে, তাহাতে তোমার লাভ কি ? এমন বোকামী করিও না ; একটু বুঝিয়া চল।"

লালমাধব বলিলেন, "খুড়ো মশায়, আপনি একজন প্রবীণ ব্যক্তি, আপনি এমন আদেশ করিবেন না। আমি ত পাঁঠা বিক্রয় করিতে বসি নাই ; গরীব মানুষ আমি, আমার কি এত লোভ শোভা পায় ? যাঁহার সহিত কুটুম্বিতা করিব তাঁহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া কিছু আদায় করিলেই কি আমি বড়মানুষ হইব ? বাবা আজ বাঁচিয়া থাকিলে আপনার কথা শুনিয়া কানে হাত দিতেন। আমার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয় বলিয়াই ভায়ার বিবাহ দিয়া তাহার লেখাপড়ার খরচটা লইতে চাহিয়াছি ; এই হীনতা-স্বীকারের জন্য আমার মনে যে কষ্ট হইতেছে, তা অন্তর্য্যামীই জানেন ; ইহার উপর আবার টাকার চাপ দিব ? তা আমি পারিব না। আমার যদি দুই একটি মেয়ে থাকিত, আর বেয়াই মশায় যদি লম্বা ফর্দ্দ বাহির করিতেন, তাহা হইলে আমার কি গতি হইত ?"

খুড়ো চাটুয্যে মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তাহাদের বিবাহের খরচও নবীনের শ্বশুরের ঘাড়ে চাপাইতে। তুমি আমার নিতান্ত আপনার জন, তাই তোমাকে সৎপরামর্শ দিলাম, তা না শোনো, শেষে পস্তাইবে।"

কৈলাস বাবুর কন্যা সুকুমারীর সহিত ভ্রাতার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কৈলাসবাবু লালমাধবের সাংসারিক অবস্থার কথা জানিতেন; কিন্তু নবীনমাধবের মত ছেলে সচরাচর মেলে না। তিনি নবীনকে এম্‌. এ. পর্য্যন্ত নিজের খরচে পড়াইতে রাজী হইলেন। মেয়েটিও পরমা সুন্দরী। লালমাধব দেনা পাওনা সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলেন না। কৈলাসবাবু মনে করিলেন, "আমি উহার ঘরে মেয়ে দিতেছি, ইহাই উহার বাপের ভাগ্য, আবার টাকার দাবী করিবে? মেয়েটিকে খুব সস্তায় পার করিলাম।" মাঘ মাসের শেষে কৈলাসবাবুর কলিকাতাস্থ ভবনে সুকুমারীর সহিত নবীনের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল।

বিবাহের পর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে সঙ্গে লইয়া লালমাধব মাণিক-নগরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। জজবাবুর আদরিণী সুন্দরী কন্যা গরীবের ঘরে পড়িয়াছে, গ্রামের রমণীসমাজ সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌ দেখিতে আসিল। সুকুমারীর যেমন রূপ, তেমনই গা-ভরা গহনা। পল্লীরমণীগণের মুখে প্রশংসার বান ডাকিল।

আজ গিরিবালার আনন্দের সীমা নাই। সে নববধূকে কোথায় রাখিবে, কি খাওয়াইবে, কেমন করিয়া আদর যত্ন করিবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।—নববধূকে বরণ করিয়া লইবার সময় তাহার মনে পড়িল, তাহার শাশুড়ী অকালে সংসার ত্যাগ করিলে সে প্রাণপণ যত্নে শিশু দেবরটিকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল; নিজের মুখের গ্রাস তাহার মুখে তুলিয়া দিয়াছে,; নিজে ছিন্ন বস্ত্রে থাকিয়া তাহার বস্ত্র যোগাইয়াছে, দেবরের রোগের সময় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছে, পিতৃদত্ত অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছে, তাহাকে কোনও দিন মায়ের অভাব জানিতে দেয় নাই।—সেই দেবর আজ বিদ্বান হইয়া বংশ উজ্জ্বল করিয়াছে! মস্ত হাকিমের মেয়ে সে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে। ভগবান তাহাদের ভাগ্যে এত সুখ লিখিয়াছিলেন! হায়, আজ যদি শ্বশুর শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিতেন।—তাঁহারা এই সুখ ভোগ করিতে পাইলেন না ভাবিয়া গিরিবালার চক্ষু হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তাহাদিগকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি তাহাদের সহিত এমন ব্যবহার করিতে লাগিলেন, যেন গুরুঠাকুর শিষ্য-বাড়ী আসিয়াছেন!—পাকস্পর্শের ভোজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি নববধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে পারিলেন না।

বাড়ীতে দুইখানিমাত্র বাসের ঘর; আর একখানি ছোট খাটো চণ্ডীমণ্ডপ। গিরিবালা যে ঘরখানিতে থাকিতেন, তাহার মেটে দেওয়াল, দেওয়ালে কয়েকখানি ঠাকুর দেবতার চিত্র, তক্তা দিয়া ঘরে মাটী-কোঠা পাতা। ঘরের মধ্যে চৌকি, তাহার অন্য দিকে কাঠের সিন্দুক, সিন্দুকের পাশে একটি প্রকাণ্ড বেতের ঝাঁপি, একটি বাঁশের আড়ায় লেপ তুস্থক স্তরে স্তরে সজ্জিত, তাহার উপর 'ধোপদস্ত' কাপড়ের আভরণ। পরিচ্ছন্ন মেঝেতে ধূলা নাই। ঘরের যে কয়েকটি দ্বার জানালা ছিল, তাহা প্রশস্ত নহে।—গিরিবালা নববধূর বাসের জন্য এই ঘর ছাড়িয়া দিল।

ঘর দেখিয়া সুকুমারীর ভয় হইল। এই গরুর গোয়ালে তাহাকে থাকিতে হইবে?—সবজজবাবুর গোয়ালঘরও ইহা অপেক্ষা শতগুণে ভাল। শার্সি খড়খড়ি, বৈদ্যুতিক পাখা ও বিদ্যুতের আলো দূরে থাক, দ্বার জানালাগুলি এত ছোট যে, ঘরে প্রবেশ করিয়া সুকুমারী পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হাঁপাইয়া উঠিল।—তাহার পর যে দিন অরণ্যবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ বনপথ দিয়া বিরলসলিলা অপ্রশস্ত নদীর পঙ্কিল জলে সে স্নান করিয়া আসিল, সে দিন পিতৃভবনের আঙ্গিনাস্থিত জলের কল ও চৌবাচ্চাপূর্ণ কলের জলের জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল! সে পল্লীজীবনকে নিদারুণ অভিশাপ ও পল্লীবাসকে বনবাস মনে করিতে লাগিল।—আবার তাহার বড় জাটিই বা কেমন?—গায়ে একটা সেমিজ বা জামা নাই, কস্তাপেড়ে ময়লা শাড়ী পরা, হাতে শাঁখা, সাদাসিধে গড়ন-বিশিষ্ট মোটা সোটা একটা স্ত্রীলোক; হাতে না আছে দুগাছ বালা, গলায় না আছে বিনোদবেণী 'নেকলেস্'!—সুকুমারী ভাবিল, তাহার মায়ের দাসী মুক্তশশী ইহা অপেক্ষা অনেক সুন্দরী।—এই জায়ের সঙ্গে একত্র বাস করিতে হইবে ভাবিয়া সুকুমারী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।—সুকুমারীর সঙ্গে যে ঝি আসিয়াছিল তাহার নাম ভবতারিণী। ভবতারিণী অনেক কালের ঝি, সুকুমারীকে সে কোলে

পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল; ভবতারিণীর হাতে তাগা, গলায় সোনার দানা, পরিধানে তসর।—দেখিয়া মনে হয়, গুরুঠাকুরাণী শ্রীপাঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক শিষ্যকে কৃতার্থ করিবার জন্য তাহার গৃহে পদরজ দান করিয়াছেন।—সুকুমারী ভবতারিণীর কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ভবতারিণী তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিল, "তোর বাপের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে, এমন সোনার সীতেকেও এমন বনে পাঠায়! কোথায় সোনার 'অট্টালিকে', আর কোথায় এই কুঁড়ে ঘর!"

কথাটা তখনই শাখাপল্লবসমন্বিত হইয়া পাড়ায় পাড়ায় পল্লীবধূগণের মুখে মুখে ঘুরিতে লাগিল।—গিরিবালা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "রাঙ্গা বৌর ঝি এ কথা কখনও বলেনি।" গৌরীর মা বলিল, "কেন? ঝিয়ে-বৌয়ে যখন কথা হয়, তখন পিঁড়েয়ে বসে আমাদের নয়নতারা তা শুনে এসেছে। ঢাকো কেন?"

এ সকল প্রসঙ্গ স্নানের ঘাটে হইতেছিল। কালাচাঁদের মা গামছার ভিতর হাত রাখিয়া আহ্নিক করিতে করিতে বলিলেন, "লুকোলে কি হবে বৌমা! কাজটা কিন্তু তোমাদের ভাল হয় নি; তোমরা হ'লে 'গেরস্ত' মানুষ; জজ ম্যাজেষ্টরের মেয়ে ঘরে আনা কি তোমাদের মত লোকের সাজে? এই দেখ আমার 'ভগ্‌গিন্‌পোত' ডেপুটী হাকিম, সে যদি আমাদের ফণীর (ভগিনীপুত্র) বিয়ে কোনও সদরালার মেয়ের সঙ্গে দেয় ত সাজে ভাল। কেউ কোনও কথা বল্‌তে পারে না। কিন্তু তোমাদের হয়েছে হাত চেয়ে আম মোটা। এখন কত কথা শুন্‌তে হবে।"

দত্ত-গিন্নী গামছায় মুখমার্জ্জনা করিতে করিতে বলিলেন, "পেটের ছেলের মত দেওরটিকে মানুষ করেছ।—হাকিমের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে, শেষটা সামলাতে পারবে ত? এ বৌ যদি তোমার সঙ্গে ঘর করে ত আমি কায়েতের মেয়ে নই। তোমার আমও যাবে ছালাও যাবে। পরের মেয়ের সুখের জন্যই কি দেওরকে এত বড়টা করেছিলে?" গিরিবালা অস্ফুটস্বরে বলিল, "ঠাকুরপোর ত ভাল হবে। নিজের সুখের 'পিত্যাশায়' এ কাজ করিনি ঠাক্‌রুণ!"

গিরিবালা এ কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে কি এক অব্যক্ত

বেদনা অনুভব করিল। তাহার নয়নকোণে অশ্রুর সঞ্চার হইল। রমণী-হৃদয়ের রহস্য দুর্ব্বোধ্য! গিরিবালা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া জলপূর্ণ কলস কক্ষে বাড়ী ফিরিল।—তখন ঘাটে খুব উৎসাহের সহিত সমালোচনা আরম্ভ হইল। দত্তগিন্নী ঘড়ায় জল পুরিতে পুরিতে বলিলেন, "ঢের ঢের দাসী বাঁদী দেখেছি বাবু! কিন্তু কলিকাতার এই ঝি যেন খড়দার মা ঠাকরুণ, চোখে মুখে কথা!"

কালাচাঁদের মা আহ্নিক মুলতবী রাখিয়া বলিলেন, "আবার মাগীর গলায় সোনার দানা! বুড়ো বয়সে চুড়ো কর্ম্ম!"

ঠিক সেই সময়ে বকুলতলায় দাঁড়াইয়া তামাক টানিতে টানিতে লালমাধবের গ্রাম সম্পর্কের খুড়ো সেই বুড়ো চাটুয্যে মশায় লালমাধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, "বাপু হে, তখনই বলেছিলাম, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেয়ো না। গরীবের ঘর থেকে খাসা টুকটুকে বৌ আন্‌বে; মন দিয়ে ঘরকন্না করবে, দু কথা জোর করে বল্‌লে ঘাড় হেঁট করে শুন্‌বে। তা নয়, ভায়ের বিয়ে দিলে এক সদরওয়ালার মেয়ের সঙ্গে! পেলে ত কচু, মধ্যে থেকে ভাইটি হাতছাড়া হলো, "লাভঃ পরম গোবধঃ।"

লালমাধব বলিলেন, "লাভের জন্য ত একাজ করিনি। ছোঁড়ার ত একটা 'হিল্লে' হলো।"

গ্রামের পুরুষ ও রমণীসমাজ একমত হইয়া রায় প্রকাশ করিলেন,—লালমাধব বুঝিতে না পারিয়া বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছে।—লালমাধবের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় তাঁহারা অস্থির হইলেন।

পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ লালমাধব সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া গ্রামের 'শূদ্র-ভদ্র' সকলকে পাকস্পর্শের ভোজ দিলেন।—গিরিবালা অনুগত দাসীর ন্যায় পরম যত্নে নববধূর সেবা করিতে লাগিল।

৪

সুকুমারী পিতৃগৃহে ফিরিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল, যেন সে একটা বিকট দুঃস্বপ্নের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিল। বিশেষতঃ দাসী ভবতারিণী যখন লালমাধবের গৃহস্থালীর কথা সালঙ্কারে সদরালা-গৃহিণীর গোচর করিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, জীবনে তিনি কন্যাকে এমন কুস্থলে পাঠাইবেন না; নবীন চাকরী করিয়া দু পয়সা

সঞ্চয় করিলে কলিকাতার কাঁশারীপাড়ার নিজের বাড়ীর কাছে একটি বাড়ী করিয়া দিবেন। নবীনকে দেখিয়াই তিনি তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন, পাড়াগেঁয়ে লালমাধবের সহিত তাঁহার মেয়ের সম্বন্ধ কি?

শ্বশুরের কাঁশারীপাড়ার বাড়ীতে থাকিয়া নবীনমাধব প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. পড়িতে লাগিল। বি. এ. পাশ করিয়াই সে মুরুব্বী শ্বশুরের চেষ্টায় ও মুরুব্বীর মুরুব্বীর অনুগ্রহে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী লাভ করিল, এবং বর্দ্ধমানে শিক্ষানবীশ ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইল।

সদরালার কন্যাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বেই নবীনের মেজাজ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ডেপুটীগিরি লাভ করিয়া তাহার মাথা অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। সে সদরলা কৈলাস বাবুর জামাতা, এবং বর্দ্ধমানের 'প্রবেশ-নারী' ডেপুটী কালেক্টর, ইহাই এখন তাহার পরিচয়।—কিন্তু স্মৃতি সহজে মানুষের মস্তিষ্ক-কোটর ত্যাগ করে না। নবীনমাধবের যথনই মনে হইত, সে পল্লীগ্রামের এক নিঃস্ব কথকের পুত্র, অভাব ও দৈন্যে তাহার শৈশব-জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, তখন লজ্জায় ও ক্ষোভে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইত। সে সযত্নে দুঃখময় শৈশবস্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত। বন্ধুসমাজে পল্লীগ্রামের প্রসঙ্গ উঠিলে, নবীন অধিক উৎসাহে আমাদের অনন্ত স্নেহের আধার স্নেহময়ী পল্লীজননীর নিন্দা করিত।

নবীন ডেপুটী হইয়াছে শুনিয়া লালমাধব ও গিরিবালা আনন্দে অভিভূত হইলেন, এবং মঙ্গলচণ্ডীর পূজা পাঠাইয়া দিলেন।—খুড়ো চাটুয্যে মহাশয় এই সুসংবাদে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বেল পাকলে কাকের কি?"

অতঃপর ডেপুটী ভাইটিকে একবার বাড়ীতে আনিবার জন্য লালমাধব তাহাকে দুই তিনখানি পত্র লিখিলেন। নবীন অনেক দিন হইতেই দাদাকে পত্র লেখা এক রকম ছাড়িয়া দিয়াছিল, ক্রমাগত তিনখানি পত্র পাইয়া সে উত্তর না দেওয়া তেমন সঙ্গত মনে করিল না, সংক্ষেপে দাদাকে জানাইল, এখন বাড়ী যাইবার তাহার অবকাশ নাই; পল্লীগ্রামের সহিত সম্বন্ধ রাখাও সে গৌরবজনক মনে করে না। বিশেষতঃ

ম্যালেরিয়ার বাস্তুভিটা পল্লীগ্রামে যাইতে তাহার সাহসও হয় না।

লালমাধব ভ্রাতার পত্র পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন; গিরিবালার মর্ম্মবেদনার সীমা রহিল না।—সে কাঁদিয়া স্বামীকে বলিল, "ঠাকুরপোকে ছেলেবেলা থেকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি, নিজে না খাইয়া খাওয়াইয়াছি, মায়ের অভাব কোন দিন তাহাকে জানিতে দিই নাই!—বড়লোকের ঘরে ঠাকুরপোর বিয়ে না দিলে আজ হয়ত সে আমাদের পর মনে করতো না।"

লালমাধব বলিলেন, "নবীন যা-ই মনে করুক, সে আমার ভাই, আমার ত পর নয়। সে যাতে সুখী হয়, তাই ভাল। তার সুখেই আমাদের সুখ। আহা, ছেলেবেলায় সে কত কষ্ট পেয়েছে; সে কথা মনে করিয়া যদি তার দুঃখ হইয়া থাকে; তবে সে জন্য আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও যেন তাকে অকৃতজ্ঞ মনে না করি।"

কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল না। এ দিকে নবীনমাধব অল্পদিনেই চাকরীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে মহকুমার শাসন-ভার পাইলেন। মহকুমাও পল্লীগ্রাম, বাধ্য হইয়া সেখানে তাঁহাকে যাইতে হইল! কিন্তু জন্মভিটায় গিয়া একবার দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিবার তিনি অবসর পাইলেন না।—কয়েক বৎসর পরে তিন মাসের 'প্রিভিলেজ্ লিভ' লইয়া নবীন কলিকাতায় গিয়াছেন শুনিয়া লালমাধব আবার তাঁহাকে বাড়ী আসার জন্য পত্র লিখিলেন, কিন্তু নবীনের সেই একই উত্তর; পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার দারুণ উপদ্রব, সেখানে সুপেয় জল নাই, বাস করিবার উপযুক্ত ঘর নাই; সেখানে তিনি কিরূপে বাস করিবেন?

কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহের নিকট কোনরকম কুণ্ঠা বা বাচবিচার নাই। প্রাণাধিক ভাইটিকে দীর্ঘকাল না দেখিয়া লালমাধব অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিলেন; এবং কলিকাতায় একবার ভাইকে দেখিতে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া পত্নীর নিকট তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিলেন।—লালমাধবের পুত্র ইন্দুমাধব তখন একটু বড় হইয়াছিল, সে বলিল, 'বাবা! আমি তোমার সঙ্গে কাকাকে দেখ্‌তে যাব।' গিরিবালা একবার

আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার আপত্তি টিঁকিল না! পুত্রকে সঙ্গে লইয়া লালমাধব কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

গিরিবালা দেবরের জন্য এক হাঁড়ি সোনা মুগের ডাল, বাগানের আমের কয়েকখানি আমসত্ত্ব, বাগানের নারিকেলের একহাঁড়ি নাড়ু ও ঘরের দুধের সর বাটীয়া এক ভাঁড় ঘি প্রস্তুত করিয়া স্বামীর সঙ্গে দিলেন।

লালমাধব বলিলেন, "কলিকাতা যায়গা, সেখানে কতরকম মেঠাই মণ্ডা, ছানাবড়া, পান্তুয়া, খাজা, গজা পাওয়া যায়—সেখানে তোমার এ নারকেলের নাড়ু লইয়া গিয়া কি করিব? লোকে দেখিয়া হাসিবে যে?"

গিরিবালা বলিল, "আমি নারিকেলের নাড়ুগুলি চিনির রসে পাক করিয়া মশ্‌লা দিয়া তৈয়ারী করেছি। ঠাকুরপো ছেলেবেলায় এই নাড়ু বড় ভালবাস্‌তো। কতদিন তাকে নিজের হাতে খেতে দিইনি, দুটো নাড়ুও যদি ঠাকুরপো মুখে দেয়, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। তুমি নিয়ে যাও।"

এই সকল উপহার-দ্রব্য সঙ্গে লইয়া শিশু পুত্র ইন্দুমাধব সহ লালমাধব গরুর গাড়ীতে দীর্ঘ সাত ক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক আলমডাঙ্গা ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিলেন, এবং সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিলেন।

লালমাধব কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্বে অনেকবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন, সুতরাং কলিকাতার পথ ঘাট তাঁহার নিতান্ত অপরিচিত ছিল না।—আষাঢ় মাস, বর্ষার মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কাদায় কলিকাতার পথে চলা দুঃসাধ্য। ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া লালমাধব একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিবার চেষ্টা করিলেন; গাড়োয়ান সময় বুঝিয়া হাঁকিল, কাঁশারীপাড়ায় যাইতে দেড় টাকা ভাড়া লাগিবে।

লালমাধব পল্লীগ্রামের লোক, তাহার উপর সেকেলে লোক; দেড় টাকা গাড়ীভাড়া দিয়া এক ক্রোশ পথ যাওয়া তিনি ব্যয়বাহুল্য মনে করিলেন।—ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে ইন্দু, এক ক্রোশ পথ হেঁটে যেতে পারবি?"—কাকাকে দেখিবার জন্য ইন্দুমাধবের ভারি উৎসাহ হইয়াছিল, সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "খুব পারবো বাবা, চল, হেঁটেই যাই, গাড়ীতে কাজ নেই।"

তখন মুটের মাথায় মোট তুলিয়া দিয়া পুত্রের হাত ধরিয়া লালমাধব 'শ্রীদুর্গা' স্মরণ করিয়া রাজপথে নামিয়া পড়িলেন। মুটে হাঁড়িগুলি ঝাঁকায় সাজাইয়া লইয়া দুল্‌কীচালে আগে আগে চলিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় আটটার সময় লালমাধব সদরালা বাবুর দেউড়ীতে আসিয়া মোট নামাইলেন।—এক জন দ্বারবান তখন সিদ্ধির নেশায় ভরপুর হইয়া দেউড়ীর পাশের একটা কুঠুরীতে চার-পাইর উপর শয়ন করিয়া মিহি স্বরে একটা ভজন গায়িতেছিল। দেউড়ীতে কলরব শুনিয়া সে উঠিয়া আসিল; লালমাধবের পরিচয় লইয়া সে জানিতে পারিল, আগন্তুক জামাইবাবুর দাদা, ভাইকে দেখিবার জন্য দেশ হইতে আসিয়াছেন।

ডেপুটীবাবু তখন দ্বিতলস্থ সুসজ্জিত আলোকিত বৈঠকখানায় বসিয়া বন্ধুগণের সহিত পাশা খেলিতেছিলেন। গড়গড়ার মাথায় প্রকাণ্ড কলিকাতে সুগন্ধি তামাকুর মিষ্টগন্ধ গৃহের বায়ুস্তর সুরভিত করিতেছিল, এবং নবীনমাধবের 'টেরিয়ার' কুকুরটি পাপোশের উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল। এমন সময় পুরাতন ঠন্‌ঠনের চটীপায়ে এক পা কাদা ও মাথায় দোদুল্যমান টিকি লইয়া লালমাধব পুত্রের হাত ধরিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

লালমাধবকে দেখিয়া নবীনের বন্ধুগণ সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহাদের মনে হইল, লোকটা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ; বোধ হয়, কিছু ভিক্ষার আশায় অসময়ে এখানে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছে।—কিন্তু নবীনমাধবের কথায় তাহাদের বিস্ময় কৌতূহলে পরিণত হইল। নবীনমাধব দীর্ঘকাল পরে দাদাকে দেখিলেও, তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন; তিনি মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিতভাবে চাহিয়া বলিলেন, "কি রকম? আপনি হঠাৎ এখানে!"—উঠিয়া দাদাকে প্রণাম করিতেও তাঁহার ভুল হইয়া গেল!

দাদা বলিলেন, "অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, তাই একবার তোমাকে দেখিতে আসিলাম।"

নবীন বলিলেন, "বিলক্ষণ, আগে একটা সংবাদ দিতে হয়।—সঙ্গে এ ছেলেটি—?"

লালমাধব তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ওকে চিন্‌তে পারছো না? চিন্‌বেই বা কি করে, বহুদিন দেখনি, ও ইন্দুমাধব, তোমার ভাইপো।—আমি তোমাকে সংবাদ না দিয়েই এসেছি; ইন্দু, তোর কাকাকে প্রণাম কর।"

ইন্দুমাধব এত বড় বাড়ীতে কখনও প্রবেশ করে নাই, গৃহসজ্জা দেখিয়া তাহার তাক্ লাগিয়া গেল। সে তাহার ছেঁড়া জুতা খুলিয়া গালিচার উপর গেল, এবং কাকাকে প্রণাম করিল। লালমাধব-দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া ভৃত্য একখানি চেয়ার সরাইয়া দিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল।

এক জন বন্ধু সকৌতুকে নবীনকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে হন তিনি ?"

নবীন কিছু অপ্রস্তুত হইয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "দাদা।"

খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। বন্ধুগণ উঠিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। লালমাধব উপহারের জিনিসগুলি আনাইয়া, কোন্ হাঁড়িতে কি আছে, তাহা নবীনকে বলিলেন; নবীন হাসিয়া অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "এ সকল জিনিস কি জন্য এখানে বয়ে এনেছেন ? আমার কি আর নারকেলের নাড়ু খাবার বয়স আছে ? আর এখানে দ্বারভাঙ্গার আমের উৎকৃষ্ট আমসত্ত, মাখন-গলানো ঘি যথেষ্ট পাওয়া যায়। কষ্ট করে এ সকল জিনিস বাড়ী থেকে বয়ে আনবার কোনও দরকার ছিল না।"

লালমাধব কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "তোমার বৌদি দিয়েছেন, আমার কোনও দোষ নাই।"

নবীন বলিলেন, "বৌদি বোধ হয় আমাকে এখনও তেমনই ছেলে-মানুষ মনে করেন। তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালবাস্তেন, আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ আছি। তিনি ভাল আছেন ত!"

লালমাধব বলিলেন, হাঁ, আছে, একবার তোমাকে দেখবার জন্য তারা বড় আগ্রহ।"

নবীন বলিলেন, "সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু কি করে তাঁর আগ্রহ মিটাই ? —আমার ভয়ানক 'ডিস্‌পেপ্‌সিয়া', পাড়াগায়ে গিয়ে তাঁকে দেখ্‌বার মত আমার অবস্থা নয়।"

ইন্দুমাধব তাঁহার পিতার কানে কানে বলিল, "কাকীমাকে একবার দে[illegible]বো।"

নবীন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও বলে কি ?"

লালমাধব বলিলেন, "ও বল্‌ছে—কাকীমাকে একবার দেখ্‌বে।"

নবীন বলিলেন, "তা কাল দেখা হবে; তার শরীর ভাল নয়, বোধ হয় শুয়ে পড়েছে, রাত্রে আর দেখা করবার সুবিধা হবে না।"

কাকার কথা শুনিয়া বালক ক্ষুণ্ণ হইল।—উভয় ভ্রাতায় আর অধিক কথা হইল না। নবীনমাধবের মাথা ধরিয়াছিল, তিনি দাদার নিকট বিদায় লইয়া শয়ন করিতে চলিলেন।—অধিক রাত্রে পাচক বাহিরের একটা কুঠরীতে দু জনের ভাত দিয়া গেল। লালমাধব সপুত্র আহার করিয়া বহির্ব্বাটীতেই শয়ন করিলেন। বালক পথশ্রমে কাতর হইয়াছিল, সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল; কিন্তু লালমাধব অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিলেন না; তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কেন আসিলাম? এ ত সে নবীন নহে।—তবু ত আমি তাহার দাদা!"

অন্তঃপুরে সুকুমারী পূর্ব্বেই ভাসুর ও ভাসুরপুত্রের আগমন-সংবাদ পাইয়াছিল। স্বামীকে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দেশ থেকে কারা নাকি এসেছে শুনচি?"

নবীন বলিলেন, "হাঁ, দাদা ছেলে নিয়ে এখানে এসেছেন। বুড়ো হলে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়।"

সুকুমারী বলিল, "কেন? চাকরী বাক্রীর উমেদারীতে এলেন নাকি?"

নবীন বলিলেন, "না, অনেক দিন আমাকে দেখেন নি, তাই শুনলুম, দেখ্তে এসেছেন।"

সুকুমারী বলিল, "তবু ভাল, আমি ভাবছিলুম—কিছু মতলব আছে। এসেছেন, আজ থাকুন; কাল খাইয়ে দাইয়ে ওদের বিদেয় করে দিও। তোমার দাদার পরিচয় পেলে তোমার উপর লোকের ভক্তি চটে যেতে পারে। 'অজ' পাড়া-গেঁয়েদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?—আমি ভাব্ছি, ছোঁড়াটাকে ঘাড়ে চাপিয়ে না যান।"

ঠিক সেই সময় লালমাধব করতলে মস্তক রাখিয়া ভাবিতেছিলেন, "এই কি আমার সেই ভাই! এতকাল পরে উপযাচক হইয়া দেখা করিতে আসিলাম, একটা কুশলবার্ত্তাও জিজ্ঞাসা করলে না? আমি গরীব, আমি পল্লীবাসী মূর্খ, কিন্তু আমি যে তার দাদা!"

হঠাৎ বহুকাল পূর্ব্বের এমনই এক ঘনঘোর বাদলের রাত্রি তাহার মনে পড়িল—যে রাত্রে তাহার পিতা শিশু নবীনকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। সঙ্গে সঙ্গে স্নেহময়ী জননীর কথা মনে পড়িল, স্বামীস্ত্রীতে কত কষ্টে নবীনকে মানুষ করিয়াছেন—তাহাও মনে পড়িল। অশ্রুধারায় তাঁহার শীর্ণ গণ্ড সিক্ত হইল, এবং তাঁহার

সহিত সহানুভূতি-প্রকাশের জন্যই বোধ হয়, আষাঢ়ের দিগন্তব্যাপী মেঘ চরাচর অন্ধকার করিয়া মুষলধারে অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ করিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

---

# সহযোগী সাহিত্য।

## শিক্ষা-তত্ত্ব

আমাদের ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা বা University Educationএর বিস্তার লইয়া বিশেষ উদ্‌যোগ-আয়োজন চলিতেছে; এই সময়ে বিলাতে তথা ইউরোপে শিক্ষা-বিষয়ক আন্দোলনের একটু পরিচয় দিলে বুঝা যাইবে, সভ্য ইউরোপ কেমন দৃষ্টিতে শিক্ষা ব্যাপারটা দেখিয়া থাকেন, এ পক্ষে ইউরোপের আদর্শ কেমন। এই সঙ্গে ভারতের পুরাতন আর্য্য শিক্ষার আদর্শ জানিতে পারিলে, তুলনায় সমালোচনা অল্পায়াস-সাধ্য হইবে। লণ্ডন ইউনিভারসিটীর শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা করিবার জন্য, উহার রীতির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ঘটাইবার জন্য, মৃত রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড একটি কমিশন বসাইয়া যান। লর্ড হ্যালডেন ঐ কমিশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। এই কমিশনের মন্তব্য এতদিনে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ফ্রান্স, জর্ম্মণী এবং সুইডেনের শিক্ষা-পদ্ধতির বিবরণ-সমন্বিত একখানি পুস্তক ইংলণ্ডে প্রচারিত হইয়াছে। শেষ, ডাক্তার পল মন্‌রোর (Paul Monroe) A Cyclopædia of Education বা শিক্ষা-বিষয়ক বিশ্বকোষ নামক বিরাট গ্রন্থ প্রায় পরিসমাপ্ত হইয়া আসিল। উহাতেও শিক্ষা-বিষয়ক অনেক তত্ত্বের সবিস্তর আলোচনা আছে। এই সকল গ্রন্থ ও রিপোর্ট অবলম্বনে The Times (Educational Supplement) নামক সাময়িক পত্রে কয়েকটা চিন্তা-পূর্ণ সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই সকল সন্দর্ভ অবলম্বনে আমাদের বক্তব্য ব্যক্ত করিব।

আমরা 'শিক্ষা' বলিলে বুঝি কেবল লেখা আর পড়া;—যাহার সাহায্যে ভারতীয় ছাত্রগণ ইংরেজী ভাষা লিখিতে, পড়িতে এবং বলিতে পারে। এই লেখাপড়ায় পটুতা-লাভের পরিচায়কস্বরূপ গোটাকয়েক পরীক্ষা পাশ করিতে পারে—উপাধিধারী হইতে পারে—তাহাই আমাদের দেশে 'শিক্ষা' বলিয়া পরিচিত। ইংলণ্ডে তথা ইউরোপের অন্য সকল সভ্য দেশে এবংবিধ শিক্ষার প্রচলন নাই। উহারা লেখাপড়াকে শিক্ষা বলে না। যাহার প্রভাবে দেহের পুষ্টি, মনের স্ফূর্ত্তি সাধিত হয়, যাহা শিখিলে বিদ্যার্থী

জীবন-যাত্রায় একটা-না-একটা প্রশস্ত পন্থা অবলম্বন করিতে পারে, এবং এই জীবিকা-অর্জ্জনের প্রতিযোগিতায় স্বীয় জাতির ও সমাজের পুষ্টিসাধন করিতে পারে, ইউরোপে তাহাকেই শিক্ষা বলে। এই শিক্ষা ধর্ম্মশূন্য নহে; এই শিক্ষার অন্তর্গত সঙ্গীত, ব্যায়াম, নৌচালন, সন্তরণ, নানাবিধ ক্রীড়া, সমর-কৌশল প্রভৃতি বহু বিষয় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সোজা কথা এই—ইউরোপ বলিতেছেন, "তুমি সমাজের ব্যষ্টি বা ব্যক্তি, তোমাকে যে সমাজ বা গবর্মেণ্ট যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষা দিতেছেন; সে ঋণ পরিশোধ করিতে তুমি কোন ভাবে প্রস্তুত আছ? তুমি কি ধর্ম্ম-যাজক হইয়া সমাজকে ধর্ম্মের পথে রক্ষা করিতে চাও? তুমি কি সমর বা নৌবিভাগে প্রবেশ করিয়া দেশরক্ষা ও সমাজরক্ষার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত আছ? তুমি শাসন বা বিচার বিভাগে থাকিয়া সমাজের দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকার্য্যে সহায়তা করিতে উদযোগী?" বিদ্যার্থীর প্রতি ইহাই সভ্য ইউরোপের জিজ্ঞাসা; এই জিজ্ঞাসার যেমন উত্তর হইবে, তদনুসারে বিদ্যার্থীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। ইউরোপ বলিতেছেন যে, অর্থোপার্জ্জনের জন্য একাধিক বহু পন্থা আমি খুলিয়া রাখিয়াছি। তোমার যেমন যোগ্যতা হইবে, তুমি তদনুসারে সেই পথ অবলম্বন করিবে; পরন্তু তোমার যোগ্যতা কেবল তোমারই ব্যক্তিগত তুষ্টি-পুষ্টির জন্য বিনিযুক্ত হইবে না, সে যোগ্যতার সাহায্যে সমাজকে, জাতিকে ধন্য করিতেই হইবে। যে শিক্ষা এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে সহায়তা বা আনুকূল্য করে, তাহাই ইউরোপের আধুনিক শিক্ষা।

জর্ম্মণী এবং ফ্রান্স সর্ব্বাগ্রে দেখে, বালক সবল কিংবা দুর্ব্বল। দুর্ব্বল হইলে বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাকে সর্ব্বাগ্রে সবল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। জর্ম্মণীতে দুর্ব্বল শিশুদের পাঠশালা গৃহের মধ্যে অবস্থিত নহে; বিপিনে, কান্তারে, বা পর্ব্বত-সানুদেশে এমন সকল পাঠশালা প্রতিষ্ঠাপিত থাকে; এইখানে ছেলেরা ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, যখন ইচ্ছা তখন লেখা-পড়া করে, যখন ইচ্ছা তখন খেলা করে। ফ্রান্সে Body-culture বা শরীর-উন্মেষ নামক এক প্রকারের চিকিৎসা এবং শিক্ষা-পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে বালকের দেহগঠনের ত্রুটী সকলের সংস্কার করা হয়। যাহার বুক সরু, ভাবী যক্ষ্মা-সম্ভাবনার দ্যোতক, তাহার বুক ও পিঠ চওড়া করিয়া দেওয়া হয়; যাহার কোমর মোটা, দেহ মেদবাহুল্যের পরিচায়ক, তাহার কোমর সরু করিয়া দেওয়া হয়। এই Body-culture বা শরীর-উন্মেষরীতি ইউরোপের সকল দেশেই অবলম্বিত হইয়াছে। সুইডেন এবং জর্ম্মনীতে আমাদের প্রাণায়াম-পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাকে ইংরেজী ভাষায় Intensive method একাগ্রপদ্ধতি বলা হয়। মানস-ক্রিয়ার দ্বারা শরীরের উন্নতিসাধন এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য; ইহা ব্যয়সাধ্য নহে; তাই জর্ম্মণী, সুইডেন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশে এই পদ্ধতির আদর অতিমাত্রায় বাড়িয়াছে। তবে ফ্রান্সের নৌবিভাগের লেফ্‌টেনাণ্ট হেবার্ট (M. Hebert) ভারতে আসিয়া ভারবর্ষের ডন-কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়াম-পদ্ধতি দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, এ পক্ষে ভারতবাসীর পদ্ধতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ, তিনি বিজ্ঞানের

সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, দেহরক্ষার জন্য air-bath and ablutions অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে বায়ুসেবন বা সমীর-অবগাহ এবং স্নান অতি প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন, সর্ব্বাঙ্গের পূর্ণ-স্ফূর্ত্তি ঘটাইতে হইলে, যতদূর সম্ভব নগ্ন হইয়া ব্যায়াম করিতে হইবে; তবে সে ব্যায়াম ফলপ্রদ হয়। ভারতবর্ষের ডন-কুস্তি এই হেতু দেহপুষ্টির পক্ষে, সর্ব্ব শরীরের উন্মেষসাধন পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইঁহারই চেষ্টায় ফ্রান্সের বহু পাঠশালায় ভারতবর্ষের রীত্যনুসারে ডন-কুস্তি অবলম্বিত হইয়াছে। দেহপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতে হয়; কণ্ঠসঙ্গীতচর্চ্চার ফলে ছাত্রের ফুস্‌ফুস্ ও ক্লোমের সকল রোগ দূর হয়। তাই জর্ম্মণীর প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সঙ্গীতচর্চ্চার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

একটা কথা এই স্থানে বলিয়া রাখিতে হইবে। আমাদের এ দেশে সবই Day School বা দিনের পাঠশালা; আফিস কাছারীর মতন ছাত্রেরা দশটা পাঁচটা লেখা-পড়া শিখিয়া আইসে। ইউরোপের কোনও দেশেই এই day school পদ্ধতি সাধারণ ভাবে প্রচলিত নাই। যাহারা অতি দরিদ্র, তাহাদের বালকগণই 'ডে-স্কুল' বা 'নাইট-স্কুলে' লেখাপড়া শিখিয়া থাকে। অভিভাবক একটু অবস্থাপন্ন হইলে ছাত্রগণের খোর-পোষের খরচ দিতে পারিলে তাহাদিগকে ছাত্রাবাসসমন্বিত বিদ্যালয়ে পাঠান হয়। সেখানে ছেলেদের ছাত্রাবাসে থাকিতে হয়, এবং চব্বিশ ঘণ্টা কাল শিক্ষক বা অধ্যাপকের দৃষ্টির অধীন থাকিতে হয়। ফ্রান্সে এবং জর্ম্মণীতে দরিদ্রের ছেলেদেরও এই ভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; গবর্মেণ্ট দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষাজন্য সকল ব্যয়ভার বহন করেন। ইহাদিগকে পরে সমর ও নৌবিভাগে উপর্য্যুপরি তিন বৎসরের জন্য কাজ করিতে হয়। মোট কথা এই, আমাদের সেই পুরাতন ও সনাতন গুরু-গৃহে বাসের পদ্ধতি প্রকারান্তরে এখনও ইউরোপে প্রচলিত আছে। সৎশিক্ষার উহাই প্রশস্ত পদ্ধতি বলিয়া এখনও মান্য।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের সকল দেশে শিক্ষা ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ গ্রাহ্য ছিল। বড় বড় ধর্ম্মযাজক শিক্ষকতা করিতেন। ধর্ম্মশূন্য শিক্ষা ইউরোপে ছিল না, এখনও নাই। তবে ফ্রান্সে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম বলিয়া আর গ্রাহ্য হয় না, ইংলণ্ডে Non-Conformist খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মান্য বাড়িয়াছে, তাই এই দুই দেশে ধর্ম্মশিক্ষা এখন তেমন প্রবলভাবে প্রচলিত নহে। লর্ড হ্যাল্‌ডেন কিন্তু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মশূন্য লেখাপড়া হইতে পারে; পরন্তু Culture বা শিক্ষা ধর্ম্মহীন হইলে হয় না। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, সমাজের বন্ধনই যখন ধর্ম্ম, ধর্ম্ম আছে বলিয়া সমাজ আছে, সমাজ আছে বলিয়া ধর্ম্ম আছে, তখন ধর্ম্মকে বাদ দিয়া সামাজিক শিক্ষা সম্ভবপর নহে। যে সমাজের যে ধর্ম্ম, সেই সমাজের সামাজিকগণকে সেই ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে। নতুবা সমাজের সমষ্টিশক্তি (Cohesiveness) শিথিল হইয়া যাইবে। লর্ড হ্যাল্‌ডেনের এই অভিমত শুনিয়া বিলাতের Nonconformist দলের নেতৃবৃন্দ একটু বিচলিত হইয়াছেন; পরন্তু সমাজধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিলে, এ মতের বিরোধ ন্যায়ানুসারে করা যায় না। ফলে, এই কথাটা লইয়া

বিলাতে বেশ একটু আন্দোলন চলিতেছে। Church Quarterly Review নামক সাময়িক পত্রে এই সিদ্ধান্ত ধরিয়া বেশ আলোচনা হইতেছে। বিলাতের ধর্ম্ম-যাজকগণের মত এই যে, অধুনা বিলাতে ধর্ম্মশিক্ষা বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, ঘন ঘন পরীক্ষার উৎপাতে এই দোষ ঘটিয়াছে।

এইবার "ইউনিভারসিটী শিক্ষা"র বিষয় বলিব। এই উচ্চশিক্ষার অর্থ কি? "টাইম্‌স্" বলিতেছেন—

"When we say that a man has received a university education, do we mean that he has set the seal upon his studies by taking a degree conferred by a University, on the results of an examination, or do we mean some thing more indefinite, but much wider in its scope—that he has acquired by association with fellow students and teaches that spirit and love of learning which is an end in itself and enables the student to apply his knowledge throughout his life in an ever-widening circle?"

অর্থাৎ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বলিলে আমরা কি বুঝিব এমন কেহ যে, কোনও বিশ্ব বিদ্যালয়ের কোনও একটা উচ্চপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধিধারী হইয়াছে, এবং স্বীয় বিদ্যাবত্তার পদক লইয়া সমাজে পরিচিত হইয়াছে? অথবা এমন কেহ যে, সহতীর্থগণের সহিত বিদ্যা আরাধনা করিয়া, অধ্যাপক ও আচার্য্যের নিকট এই সাধনার উপদেশ লাভ করিয়া বিদ্যার সাধক হইয়াছে—বাণীর সেবক হইয়াছে? এবং এই আরাধনা ও সাধন-লিপ্সা সংসারের বিস্তীর্ণক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানভাণ্ডারকে পূর্ণ করিতেছে? যদি প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, উপাধিধারী হইয়াছে, তাহাকেই 'শিক্ষিত'-পদবাচ্য করিতে হইবে। তাহা হইলে পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলকে গ্রাহ্য করিতে হইবে। পরন্তু দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত যদি গ্রাহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে "পাশের মহিমা" থাকে না, পরীক্ষার আবশ্যকতা অনুভূত হয় না। প্রথম সিদ্ধান্ত অনুসারে যে "পাশকরা" লেখা-পড়ার প্রচলন আছে, তাহাকে ইংরেজীতে "external education" বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে যে বিদ্যাচর্চ্চা করিতে হয়, তাহাকে ইংরেজীতে "Internal education' বলা হয়। উহা বাহ্য, ইহা আন্তরিক; উহা দেখাইবার, ইহা অনুভব করিবার শিক্ষা। লর্ড হ্যাল্‌ডেনের কমিটী এই অনুভবী শিক্ষা-পদ্ধতির পক্ষপাতী। পরন্তু পরীক্ষারও একটা উপযোগিতা আছে, যথা—

"The first and main function of examination is to test the extent to which the efforts of educator have been successfull."

"It is a test of absolute and of relative merit respectively."

"Examination brings home to both educator and educated

alike, their failures or imperfections, and so becomes a constant and indispensable ally of teaching."

প্রতিযোগী পরীক্ষার পক্ষে এই তিনটা কথা বলা চলে : প্রথম, ছাত্রদের পরীক্ষার ফল হইতে অধ্যাপকের পরিশ্রমের এবং যোগ্যতার পরিমাণ করা যায় ; দ্বিতীয়, পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও আপেক্ষিক পটুতার পরিচয় পাওয়া যায় ; তৃতীয়, পরীক্ষার ফলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই ত্রুটীবিচ্যুতি বুঝা যায়। অনেকে বলেন যে, প্রতিযোগী পরীক্ষা কেবল মেধার পরিমাণ-চেষ্টা মাত্র। কিন্তু মেধা ব্যতীত লেখাপড়াই হয় না ; কণ্ঠস্থ করিতে না পারিলে কিছুই শেখা যায় না। শিশু যাহা দেখে, তাহারই পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, এবং সেই সকল পরিচয়কথা মেধার সাহায্যে স্মৃতির কোটরে সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই সঞ্চয় প্রকরণটা শিশুর পক্ষে যতই সুখকর ও আমোদজনক করিয়া তুলিতে পারিবে, ততই অল্পায়াসে বালক অনেক বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিবে। চরিত্রের ও ভাবের উন্মেষ শুনিতে শুনিতে, দেখিতে দেখিতে আপনিই হয়। কেমন করিয়া কোনটা দেখাইলে বা শুনাইলে ছাত্রের মনের মধ্যে—চিত্তের ক্ষেত্রে ভাবের উন্মেষ ঘটিবে, এই গূঢ়তত্ত্ব যে শিক্ষক জানেন, তিনিই সিদ্ধ-আচার্য্য ; জ্ঞানাঞ্জনশলাকার সাহায্যে দিব্য চক্ষু বা মানসচক্ষু যে গুরু ফুটাইয়া দিতে পারেন, তিনিই সার্থক গুরু। এমন গুরুর সংখ্যা ইউরোপেও অল্প হইয়া পড়িয়াছে, তাই ইউরোপের সকল দেশের শাসকসম্প্রদায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। উত্তমশিক্ষক সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা জলের মতন অর্থব্যয় করিতেছেন ; কেন না, যে দেশে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের অত্যন্তাভাব ঘটে, সেই দেশের সামাজিক অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

এবংবিধ নানা কথায় লর্ড হ্যাল্‌ডেনের বিবরণী পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার মন্‌রো বলিয়াছেন যে, শিক্ষাব্যাপারে ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা (free will) নাই ; সমাজের কল্যাণকর পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যাহা সমাজিকগণকে শিখান আবশ্যক, তাহাই শিখাইতে হইবে। শিক্ষা লাভ করিলে প্রাজ্ঞতা অর্জ্জন করিলে, তখন ইচ্ছাশক্তির কথা যদি কেহ কহে ত কহিতে পারে ; শিক্ষানবীশীর কালে সকলকেই নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কথাটা আমাদেরও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত। যখন হিন্দুসমাজ সজীব ছিল, তখন শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। তাই এখনকার ইউরোপের সজীব সমাজের ব্যবস্থাপদ্ধতি ও সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনেকটা এক হইয়া যাইতেছে। সেই গুরুগৃহ, সেই সহতীর্থ-সাহচর্য্যে শাস্ত্রালাপ, সেই গ্রামে তপোবনে বাস, ইউরোপে বিশেষতঃ জর্ম্মাণ দেশে দেশকালপাত্র অনুসারে আকারান্তরিত হইয়া প্রচলিত রহিয়াছে। সজীব মনুষ্য-সমাজ অনেক ব্যাপারে, বিশেষতঃ শিক্ষাবিষয়ে সমধর্ম্মা; কেন না, উদ্দেশ্য যে সকল পক্ষেই সমান—সমাজ, ধর্ম্ম, জাতি, বংশ, বংশের ধারার রক্ষা সকল সমাজেরই ঈপ্সিত। লর্ড হ্যাল্‌ডেনের রিপোর্টে এই তত্ত্বটাই যেন চারি দিক দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির দোষ দেখিয়াছেন। তিনি

স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কেবল 'পাশকরা' পণ্ডিত লইয়া জাতির পুষ্টিসাধন হয় না, সে শিক্ষা শিক্ষা (culture) নহে, হরবোলা কাকাতুয়ার বোল কপ্‌চান মাত্র। Internal বা আন্তরিক শিক্ষা না হইলে, বিদ্যার্থীর মনো-বুদ্ধি-চিত্তের "স্বাস্থ্য" সাধন করিতে না পারিলে তেমন বিদ্যার্থীর দলের দ্বারা জাতিরক্ষা সম্ভবপর নহে। গবর্মেণ্ট যে বর্ষে বর্ষে এত অর্থব্যয় করিয়া উচ্চশিক্ষার বিস্তার করিতেছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য,—সৎ ও সাধু সামাজিকগণের সৃষ্টি; উদ্দেশ্য,—স্বজাতিকে মানবতার---মনুষ্যত্বের উচ্চতম স্তরে উন্নীত করিয়া রাখা। এই উদ্দেশ্য-সাধন করিতে পারিলে, জাতি উন্নত হয়, সমাজ উচ্চাদর্শযুক্ত হয়। অতএব লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবল পরীক্ষাগ্রাহী বিদ্যামন্দির করিয়া না রাখিয়া, ছাত্রবাসসমন্বিত, সদ্ভাবপ্রচারক, সৎশিক্ষার আকরস্বরূপ করিতে হইবে। এই হেতু তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ঘটাইবার জন্য নানাবিধ পরামর্শ দিয়াছেন।

লর্ড হ্যালডেনের কমিটীর এই রিপোর্ট লইয়া বিলাতে বিদ্বজ্জনসমাজে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমরা "টাইমস্‌" পত্রের শিক্ষাবিষয়ক অতিরিক্ত কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত আন্দোলন আলোচনা অবলম্বনে এই সন্দর্ভ পত্রস্থ করিলাম। রিপোর্টে এমন অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে, যাহার সহিত বঙ্গীয় পাঠকগণের সাক্ষাতে বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই, যেমন ধর্ম্মশিক্ষা, খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচার প্রভৃতি। পরন্তু মূলতঃ শিক্ষা-সম্বন্ধীয় যে সকল সমাজ-সামান্য সিদ্ধান্তের আলোচনা আছে, তাহার সহিত বঙ্গীয় পাঠকবর্গের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া আবশ্যক। আমাদের মধ্যে এখনও অনেকে ইংরেজী culture শব্দের দ্যোতনা ও অভিব্যঞ্জনা ভাল করিয়া বুঝেন নাই। বঙ্গদেশে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। লর্ড হ্যালডেনের রিপোর্ট এ দেশে প্রচারিত হইলে, শিক্ষার মূল সূত্র ধরিয়া culture বিষয়ের আলোচনা কর্ত্তব্য হইবে। আপাততঃ বাহিরের গোটাকয়েক মোটা কথা বলিয়া রাখিলাম; কেন না, অনুমানে বোধ হয় যে, লর্ড হ্যাল্‌ডেনের সিদ্ধান্ত অবলম্বনে ভারতের শিক্ষা-পদ্ধতির আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটান হইবে। কাজেই এই বিষয়টা এখন হইতে সাধারণের বোধগম্য করিয়া রাখিতে পারিলে, ভবিষ্যতে সুফল ফলিতে পারে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

**স্বাস্থ্য-সমাচার।** জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীযতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'শারীরিক পরিশ্রম ও স্বাস্থ্য' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলে বাঙ্গালী উপকৃত হইবেন। লেখক এই প্রবন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্‌'—এই অমূল্য সত্য আমরা যেন কখনও বিস্মৃত না হই। জীর্ণ শীর্ণ আধারে আত্মার স্ফূর্ত্তি হয় না। বর্ত্তমান

কালের ভীষণ জীবন-যুদ্ধে 'বলহীন' কখনও বিজয় লাভ করিতে পারিবে না। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আত্মবলে বলী হইতে না পারিলে, কোনও জাতি মুক্তি লাভ করিতে পারে না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—ইহা সকল ক্ষেত্রেই সত্য। অতএব শারীর-চর্চ্চা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সমীচীন ; প্রত্যেক বাঙ্গালীর পালনীয়। 'মক্ষিকা মানবের শত্রু' উল্লেখযোগ্য। 'স্বাস্থ্য-সমাচারে'র ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

**দেবালয়।** জ্যৈষ্ঠ।—প্রথমে জেনারল বুথের হাফটোন ছবি আছে। ছবিখানি মন্দ নহে। 'কাহার উপাসনা, ঈশ্বর না সোনা' তিন পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। লেখক বলেন,—'ধনের উপাসনা যদি করিতে হয়, তবে সরল ভাবে তাহাই কর।' উপসংহারে বলিয়াছেন,—'মাটীর পুতুল অনেকে ভগ্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার স্থানে সোনা রূপার পুতুল স্থাপন করিয়াছেন।' কাঞ্চন-পন্থা প্রাচীন ভারতে ছিল না। এই কুৎসিত আদর্শ প্রতীচী হইতে প্রাচ্যে আসিতেছে। ধর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও মনুষ্যত্ব হারাইয়া আমাদের সমাজ কাঞ্চনের ক্রীত-দাস হইতেছে। সর্ব্বজয়ী সাহিত্যও এখন কাঞ্চনের উপাসক। স্বার্থই যাহাদের পরমার্থ, কাঞ্চনই যাহাদের ইষ্টদেবতা, দেশমাতৃকার উপাসনা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। স্বার্থসর্ব্বস্ব ভক্তের মুখে মাতৃভক্তির খই ফুটিতে পারে, কিন্তু মা তাহাদের মৌখিক পূজা গ্রহণ করেন না। আন্তরিকতাই মাতৃপূজার প্রধান উপাদান। যে দেশে স্বর্ণ সত্যকে ক্রয় করিতে পারে, সে দেশের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকার।

'স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥'

যে দেশের আদর্শ ছিল, সে দেশের এ কি ভীষণ অধঃপাত! মা! আবার এই পুণ্যভূমির অধিবাসীদিগকে নিষ্কাম-ধর্ম্মের পথ—মুক্তির পথ দেখাইয়া দাও। ভারতবাসী আবার কর্ম্ম-ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া জীবনের ব্রত পালন করিতে শিখুক,—মানব-জন্মের ঋণ-পরিশোধে সমর্থ হউক। শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষালের 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।—'দেবালয়ে' ভাষার দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ হয়। সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে একটু অবহিত হইলে ভাল হয়। 'কবিতা-গুচ্ছে'র পদ্যগুলি কেন ছাপা হইল? এমনতর আবর্জ্জনা কি দেবালয়ে ছড়াইতে আছে?

**সুপ্রভাত।** জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় 'ভারতবর্ষের পথের গান' রচিয়াছেন। পথ বলিতেছে,—'আমারই বুকেতে হেঁটেছে ধন্য বুদ্ধ, শ্রমণদল!"—তাহার পর মামুদ হইতে মাইকেল পর্যন্ত যাঁহারা ভারতের বুকে হাঁটিয়াছেন, তাহার একটি অসম্পূর্ণ ফর্দ্দ দিয়া ভারতবর্ষের পথ বলিতেছে,—'তবু আমি ওরে পথই আছি—আছি—আমি সেই পথ!' বাস্তবিক, দুঃখ হয় না কি? এত মহাজনের পদধূলি পড়িল, তবু পথ পর্ব্বত হইল না! কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভারতের বহু পথ কান্তারে, কৃষিক্ষেত্রে, নদীগর্ভে,—সর্ব্বোপরি কলির বিরাট রাজার গোশালায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। তাহা কাহার পায়ের ধূলার ফল, বলা

দুষ্কর। মহাকালের স্পর্শে এইরূপ বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। অতএব পথের বিলাপ অহেতুক হইয়া উঠিতেছে।—কবি-যশঃ-প্রার্থী ত্রিগুণানন্দ বাবু বিষয়-নির্ব্বাচনে পটুতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু রচনায় বিফল হইয়াছেন। এমন কি, ঐতিহাসিক ঘটনার নির্দ্দেশে পর্য্যায়ের ক্রমও তিনি রাখিতে পারেন নাই। কাচা হাতে তালিকা ও ফর্দ্দ মক্স করা যায়; কবিতার প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা তত সহজ নহে। প্রতিভার অধিকারে চেষ্টার প্রবেশাধিকার নাই। স্বভাবসিদ্ধ শক্তির সাধ্য ব্রত আয়াস কখনও উদ্‌যাপন করিতে পারে না। এ দেশের নবীন কবিযশঃপ্রার্থীরা এই সহজ সত্যটুকু ভুলিয়া যাইতেছেন। শ্রীমতী যামিনী সেন 'মহিলা-পরিষদে' যে পরামর্শ দিয়াছেন, আশা করি, তাহাতে সুফল ফলিবে। লেখিকা রূপক ও গল্পের সাহায্যে আপনার বক্তব্য বিশদ করিয়াছেন। ফলে শুষ্ক তথ্যগুলিও সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তিনি মহিলাদের লক্ষ্য করিয়া যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা এ দেশের পুরুষগণের পক্ষেও সুপথ্য ও চিন্তনীয় বলিয়া মনে করি। শ্রীমতী বিনোদিনি দেবীর 'ডেরাডুন-ভ্রমণ' সুখপাঠ্য।

**বিজ্ঞান।** ফেব্রুয়ারী।—ডাক্তার শ্রীঅমৃতলাল সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'বিজ্ঞানে' নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হয়। আলোচ্য সংখ্যায় 'ভারতীয় কাগজ', 'জর্ম্মন-অধিকার-ভুক্ত চীনরাজ্যে ডিম্বের ব্যবসা', 'কারবাইড', 'প্রাচীন সিংহলের লোহ ও ইস্পাত', 'আফ্রিকাদেশের পিপীলিকা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। 'ছানা' প্রবন্ধে কাজের কথা আছে। এ দেশের যুবক-সম্প্রদায় চাকরীর জন্য লালায়িত না হইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে ছানা, মাখম প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়া জীবিকার সংস্থানে প্রবৃত্ত হইলে দেশের দারিদ্র্য কমিতে পারে; উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ খাদ্য সুলভ ও সুপ্রাপ্য হইলে বাঙ্গালীর জীবনী-শক্তিও উপচিত হইতে পারে।—'বিজ্ঞানে'র ভাষা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হইলে আমরা আনন্দিত হইব। কাজের কথায় ভাষার আড়ম্বর সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়, তাহা সত্য। শব্দ-সমৃদ্ধি না থাকিলেও সহজ সরল শব্দের সাহায্যে ব্যক্ত হইলে বৈজ্ঞানিক সত্য অনায়াসে সুপ্রকাশ হয়, তাহাও আমরা স্বীকার করি। বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের রচনায় পারিভাষিক ও ভাব-প্রকাশের উপযোগী শব্দসম্ভারের অত্যন্ত অভাব, তাহাও আমরা জানি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় ভাব ও তথ্য সহজে ব্যক্ত হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে অপভাষার প্রয়োগ করিয়া কোনও লাভ নাই। বৈজ্ঞানিক রচনায় বাঙ্গালার পাঠক এখনও অনভ্যস্ত; ভাষার কদর্য্যতায় তাঁহারা বিমুখ না হন, তাহাও দ্রষ্টব্য। আমরা বৈজ্ঞানিক লেখকগণকে 'খোসা' লইয়াই ব্যস্ত হইতে বলি না। তাঁহারা 'দানা'রই সন্ধান করুন।—আমাদের সবিনয়ে নিবেদন এই, যাঁহাদের জন্য লিখিতেছেন, প্রবন্ধগুলি যেন তাঁহাদের উপযোগী ও উপভোগ্য হয়।

**অর্ঘ্য।** জ্যৈষ্ঠ।—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসুর 'ভারত ও মিশর' এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য 'সাহিত্যে' ধারাবাহিক প্রবন্ধে মিশর ও ভারতের সমাজ, রাজতন্ত্র প্রভৃতির তুলনা করিয়াছিলেন। মিশর ও ভারতের প্রত্নতত্ত্ব এখন অনেক

দূর অগ্রসর হইয়াছে। 'মিশরে ভারতীয় অভিযানসমূহ' ও 'ভারত হইতে যাদবগণের কুশদ্বীপে গমন' প্রভৃতি গুরুতর বিষয়গুলি এ কালে এক 'প্যারা'য় লিখিলে চলিবে না। এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা, প্রমাণ প্রভৃতির প্রয়োগ, প্রচলিত সিদ্ধান্তসমূহের বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি-ক্রমে প্রতিপাদ্য সত্যের অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠা না করিলে, এ যুগে কোনও নির্দ্দেশই গ্রহণ-যোগ্য হইবে না। আশা করি, নবীন লেখকগণ, গ্রন্থবিশেষের মত-বিশেষের অনুবাদে, সংক্ষিপ্তসারে, বা মর্ম্মোদ্ধারে পণ্ডশ্রম না করিয়া, স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবেন। তাহাতেই দেশের ও দশের ও সাহিত্যের উপকারের আশা করা যায়।—নবীন লেখকগণ মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে অগ্রসর হইয়াছেন, এই দারিদ্র্যদগ্ধ দেশে কষ্টলব্ধ অবসরটুকু প্রসন্নচিত্তে মার সেবায় অর্পণ করিতেছেন।—ইহা সুলক্ষণ। নব-যুগের সাহিত্যে নবীন সম্প্রদায়ের নূতন চেষ্টা ও উৎসাহ দেখিয়া বুক দশ-হাত হয়, কিন্তু সেই শ্রমের অপব্যবহার ও অপচয় দেখিয়া দুঃখের সীমা থাকে না। সাহিত্যপরিষৎ আত্মস্থ, কূটস্থ,—আপনার ভাবে আপনি বিভোর। এই যে নবীন-সম্প্রদায় মাতৃভাষাকে দেবতা বলিয়া বরণ করিতেছেন, কে তাঁহাদিগকে দীক্ষা দিবে?—কেমন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়, কি ভাবে ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার করিতে হয়, সত্য-সন্ধানের ও তুলনায় সমালোচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কিরূপ, প্রমাণের প্রকৃতি কি, কাহাকে প্রমাণ বলে,—এই সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিবার কোনও ব্যবস্থাই নাই। এই জন্য বাঙ্গালীর বহু চেষ্টা ও প্রভূত শ্রম ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় ব্যর্থ হইতেছে। বাঙ্গালার উন্নতির প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হইতেছে। বাঙ্গালার সাহিত্য পঙ্গুর ন্যায় স্বল্পগতি হইতেছে। এই শ্রম, এই উদ্যম, এই চেষ্টা সুপ্রযুক্ত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য নবজীবন লাভ করিতে পারে। মহামহোপাধ্যায় পূজাপাদ পণ্ডিত হরপ্রসাদ প্রভৃতি বাঙ্গালার আশার তীর্থ, বাঙ্গালীর গৌরব বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি শিক্ষানবীশদিগকে দীক্ষা দিন। নতুবা ভাষার দুর্দ্দশা ঘুচিবে না, বাঙ্গালার ইতিহাস মূর্ত্ত হইয়া বাঙ্গালীকে বরাভয় প্রদান করিবে না, তাঁহাদের আশার স্বপ্ন কখনও সফল হইবে না! ভবিষ্যতে কে তাঁহাদের উত্তরাধিকার আহবনীয় বহ্নির ন্যায় অতিসন্তর্পণে রক্ষা করিবে? উত্তরকালে তাঁহাদের ঐতিহাসিকতত্ত্ব-সঞ্চয়ের এই পবিত্র ধারা, কোন খাত অবলম্বন করিয়া তেত্রিশ কোটী ভারতসন্তানের মুক্তির জন্য লক্ষ্য-সাগর-সঙ্গমের অভিমুখে ধাবিত হইবে? যে সংযম-হীন, বন্ধনহীন, লক্ষ্য-হীন, বিচ্ছিন্ন সাহিত্য-চেষ্টা এখন ব্যর্থ হইতেছে, তাহা যদি সংযত, প্রণালীবদ্ধ, এক লক্ষ্যে সুপ্রযুক্ত, এক সংঘে বদ্ধ, এক মন্ত্রে দীক্ষিত ও এক সাধনায় ব্রতী হয়, তাহা হইলে, বিন্দু-সঞ্চয়ে পরিপূর্ণ জলপ্রপাতের মত শক্তিশালী হইয়া বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ নূতন করিয়া গড়িতে পারে। সাহিত্য-সমাজ, সাহিত্য-সম্মিলন, সাহিত্য-রথী ও সাহিত্যের উপাসকগণ আমাদের এই নিবেদনে অবহিত হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'রঙ্গমঞ্চ' ক্ষুদ্র প্রবন্ধ, কিন্তু সুখপাঠ্য ও আলোচনার যোগ্য। ক্ষুদ্র পরিসরে অনেক 'অপ্রিয়' তথ্যের সমাবেশ আছে। কিন্তু ভীষণ হইলেও সত্যের সম্মুখীন হইতে হয়। নতুবা মানবের নিস্তার নাই। রঙ্গমঞ্চেও আর যবনিকা ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। যাহা সত্য, তাহা দেখিয়া, যাহা উপযোগী ও হিতকারী,

তাহার সংস্থান করিতে হয়। লেখক ক্রমে ক্রমে রঙ্গমঞ্চ-সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিব। ইউরোপে রঙ্গালয় হেয় কি প্রেয়, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমাদের রঙ্গমঞ্চ যাহাতে আমাদের প্রেয় হইতে পারে, লেখক তুলনায় সমালোচনা করিয়া আমাদিগকে তাহার পথ নির্দ্দেশ করুন। কেবল শুচিবাই কোনও জাতিকে পবিত্র করিতে পারে না। শুচিতাই জাতীয় পবিত্রতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে; শুচিতাই তাহার প্রাণরক্ষা করে। সেই মাতৃ-ও-ধাত্রী-শক্তির স্বরূপ যদি নির্ণীত হয়, আমরা লেখকের নিকট কৃতজ্ঞ হইব।

---

# মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ।

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন প্রকাশিত হইবার পর আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। "জনৈক কায়স্থ" আপন নাম অপ্রকাশিত রাখিয়া, "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় একটি আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে,—শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের ইছাই গোয়ালা এবং তাম্রশাসনের ঈশ্বর ঘোষ অভিন্ন ব্যক্তি হইবার পক্ষে বাধা কি? শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত পাঁচালী গ্রন্থ। যদিও কেহ কেহ তাহাকে ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তথাপি তাহার আদৌ ঐতিহাসিক মূল্য আছে কি না, জানি না। তাহাতে যে ইছাই গোয়ালার আখ্যায়িকা আছে, সেই ইছাই ঘোষের পিতা সোমঘোষ [পদোন্নতিলাভের পূর্ব্বে] রাজকর-পরিশোধে অসমর্থ হইয়া, রাজপুরুষগণের নিকট লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। তাম্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষ রাজবংশ-প্রসূত,—ধবল ঘোষের পুত্র, এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ এক সময়ে 'রাঢ়াধিপ' ছিলেন। সুতরাং ইছাই ঘোষকে এবং ঈশ্বর ঘোষকে এক ব্যক্তি বলিতে হইলে, এই সকল অসামঞ্জস্যের কথা বিস্মৃত হইতে হইবে, অথবা সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহারা শ্রীধর্ম্মমঙ্গলকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সহিত তর্ক চলিতে পারে না। বিশ্বাসে 'কৃষ্ণ' মিলে; ইতিহাসের সহিত তাহার কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না। যাহা হউক, ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের পাঠমুদ্রাঙ্কনসময়ে, প্রুফ হারাইয়া মুদ্রাকর অনেকগুলি ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন। নিম্নে

কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। সহৃদয় পাঠক তজ্জন্য ক্রটী গ্রহণ করিবেন না; ইহাই প্রার্থনা।

| পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|
| ৪ | বৈরিবর্গঃ | বৈরিবর্গ্গঃ |
| ৯ | শৌর্য্য | শৌর্য |
| ১২ | রাজণ্যক | রাজন্যক |
| ১৫ | মহাঠক্কুর | মহাকটকঠক্কুর |
| ১৯ | শান্তকিক | সান্তকিক |
| ” | গৌল্মিক গৌল্মিক | গৌল্মিক শৌল্কিক |
| | ট্টঃ | ট্টঃ সতরু × জকল্যভাব্য |
| ২৫ | সমস্তক্ষিতি | দ্বারিকাদি সমস্তক্ষিতি |
| ২৬ | স্বর্গগামিনৌ | স্বর্গ্গগামিনৌ |
| ৩৭ | স্বর্গে | স্বর্গ্গে |
| ৩৯ | মহামহীভুজাং | মহীং মহীভুজাং |
| ৪১ | দা চ্ছে্যোনুপালনং | দানচ্ছে্যোনুপালনং |
| ” | | |
| ৪৪ | ধর্ম্মসেতু নৃপানাং | ধর্ম্মসেতুর্নৃপানাং |

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

# গ্রন্থ-পরিচয়।

## ঢাকার ইতিহাস।

ঢাকার ইতিহাস শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত। আমরা এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি; এই খণ্ড ৫৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে ঢাকা জেলার (১) উষ্ণ-উৎস নদ নদী, (২) নদনদীর গতি-পরিবর্ত্তনে প্রাকৃতিক বিপর্যায় ও তাহার কারণনির্দ্দেশ, (৩) খাল, ঝিল ও বিল, প্রসিদ্ধ বর্ত্ম ও বন, (৪) কৃষি, ভেষজ, উদ্ভিজ্জ, (৫) মৎস্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি (৬) বিবিধ শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, (৭) বাণিজ্য, বন্দর, মেলা, (৮) সাধারণ স্বাস্থ্য ও জলবায়ু, (৯) প্রাকৃতিক বিপ্লব, (১০) তীর্থস্থান, প্রাচীনকীর্ত্তি, প্রাচীন দেবমন্দির ও বিগ্রহাদিযুক্ত পল্লী, ঐতিহাসিক স্থান, প্রশস্তিপরিচয়, প্রাচীন দীঘীসমূহের বিবরণ প্রভৃতি বহুবিধ প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তকে তিনখানি রেনেলের মানচিত্রের

চৈত্য, ধামরাই এর যশোমাধব, ঢাকেশ্বরীর মন্দির, রমনার মাঠ, রাজবাড়ীর মঠ, তালতলার পুল, রাজবল্লভের একুশ-রত্ন, ঢাকার জন্মাষ্টমীর চৌকী প্রভৃতি কয়েকখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই ইতিহাসখানির আদ্যন্ত বিবিধ মূল্যবান্ উপকরণে পূর্ণ। গ্রন্থকার সর্ব্বত্রই যে মৌলিক তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু তিনি আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, ঢাকা সম্বন্ধে আর কোনও বঙ্গীয় ঐতিহাসিক এ পর্য্যন্ত তাহা দিতে পারেন নাই। তবে দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা তাঁহার গুণপণার পরিচয় পাইব, এইরূপ আশা করিতেছি। এই উপকরণরাশি অনেকটা বিশ্লিষ্ট অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে। উদাহরণ-স্থলে বলা যাইতে পারে, অনেক মেলা, প্রাচীন উৎসব ও বিগ্রহাদির কথা আমরা পাইতেছি। অনেক শিল্প, ভাস্কর্য্য ও ঐতিহাসিক প্রবাদ উল্লিখিত হইয়াছে। লতা যেরূপ কোনও পাদপের আশ্রয় লাভ করিয়া ফলফুলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ প্রাচীন কীর্ত্তিগুলিও বিশেষ বিশেষ নৃপতির সাহায্য অবলম্বন করিয়া শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। রাজ-অন্তঃপুরের অবরোধ-ক্লান্তা মহিলাগণের কৌতুহলনিবৃত্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া, কোন্ কোন্ রাজা কার্ত্তিকবারুণী ও লাঙ্গলবন্ধ প্রভৃতি বঙ্গবিখ্যাত মেলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং কোন্ নৃপতির প্রিয়া মহিষীর কোমলকরদ্বয় সুশোভিত করিবার জন্য ঢাকার শাঁখারী এইরূপ শাঁখা গড়িতে শিখিয়াছিল, এবং সেই কমকণ্ঠ ও ভুজবল্লী বিভূষিত করিবার সংকল্পে তথাকার সেক্‌রা ঐরূপ বিচিত্র ভূষণরাশি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিকের আলোচ্য বিষয়। এই সমস্ত উৎকৃষ্ট শিল্প, ভাস্কর্য্য, মন্দির ও বিগ্রহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তির সহায়তা নিশ্চয়ই কার্য্য করিয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগে আমরা শুধু উপকরণে পরিতৃপ্ত হইব না। এই সমস্ত খড়, কুটা, মাল মশ্‌লা দিয়া বঙ্গলক্ষ্মীর প্রতিমা গড়িতে হইবে। এই কার্য্য অতিগুরুতর, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভক্ত ও প্রেমিকের নীরব সাধনায় মূকদেবতা তাঁহার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া সেবকের নিকট স্বীয় তথ্য প্রকাশিত করিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ঢাকার শঙ্খবণিকগণ জানেন, তাঁহারা রামপাল হইতে আসিয়াছিলেন। সেনবংশীয় রাজলক্ষ্মী মোগলদের বাহু আশ্রয় করিয়া জাহাঙ্গীর-নগরকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য্যের অস্তোন্মুখ কিরণ নবোদিত ঢাকার ললাটে আসিয়া পড়িয়াছিল। যতীন বাবু লিখেন নাই, কিন্তু আমরা জানি, তাঁহার উল্লিখিত গাজিখালি নদীর পূর্ব্ব-নাম 'কানাই' ছিল। কানাই ও বংশাই, ধলেশ্বরীর এই দুই পুত্রের প্রথমটি কোন্ অভিসম্পাতে মুসলমানী নামে পরিচিত হইল, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। মুসলমানী নাম পরিগ্রহ করিয়া অনেক প্রাচীন হিন্দুপল্লী বল্লালী উপদ্রবে উপবীত-বিচ্যুত বৈদ্যের ন্যায় ছদ্মবেশে আত্মরক্ষা করিয়া রহিয়াছে। ইহাদের ধারাবাহিক বিবরণ-সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত। এখনকার রাজনীতিক সুবিধা অনুসারে যেরূপ প্রদেশ-বিভাগ হইয়াছে, তাহাতে ঢাকার যথাযথ তথ্যের নিরূপণ করা সহজ নহে। ফরিদপুরের অনেকাংশ জুড়িয়া বিক্রমপুরে যে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত ছিল, তাহার একাংশের কথা বিচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থকার কিরূপে কহিবেন? পুস্তকের নাম 'পূর্ব্ববঙ্গ' লিখিয়া

১ম, ২য় খণ্ডে এক একটি বিশেষ বিশেষ রাজবংশের পরিচয় দিলে, অনেকটা সঙ্গতি রক্ষিত হইত। কোনও বিশেষ রাজবংশের পরিচয় দিবার সময় 'ঢাকা জেলা' অভিধানটি গ্রন্থকারের লেখনীর গতি অন্যায়ভাবে সীমাবদ্ধ করিবে। তিনি কি আধখানা গীত গাহিয়া ছাড়িয়া দিবেন? এই সমস্যার মীমাংসা তিনিই করুন।

যতীনবাবুর মুখে সাভারের নিকটস্থ কোণ্ডাগ্রামবাসী রাজবংশীয় মাহিষ্যগণের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আমি 'প্রবাসী'তে তাহাদিগকে হরিশ্চন্দ্র রাজার বংশধর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। আলোচ্য গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন। সম্প্রতি এই বিষয়টি লইয়া একটু সাহিত্যিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। পাল-রাজারা ও কাম্বোজিয়া নৃপতিগণ যে তাদৃশ উচ্চজাতীয় ছিলেন না, তাহা এ দেশের চিরাগত প্রবাদ। কিন্তু ব্রাহ্মণেতরজাতীয় ব্যক্তিগণ যখনই রাজতক্তে বসিয়াছেন, তখনই তাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। অতি নীচ শবর ও চণ্ডালাদি জাতি পর্য্যন্ত রাজসিংহাসন লাভ করিয়া তাম্রশাসনে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ঐতিহাসিকগণের তাহা অবিদিত নাই। এখন যাঁহারা আপনাদিগকে যে যে জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, সেন্সাস্ রিপোর্টে তাঁহাদের সেই আবদার অনেক সময়েই অগ্রাহ্য হইয়া যাইতেছে। নিজেদের হাতে তাম্রশাসন থাকিলে সেই সব জাতি স্বীয় সামাজিক গৌরব বাড়াইয়া লিখিতেন, তাহাতে সন্দেহ কি? সুতরাং তাম্রশাসনোক্ত জাতিপরিচয় আমরা শিরোপার ন্যায় শিরোধার্য্য করিয়া লইব না। রাজারা সুন্দরী কন্যা পাইলে সমস্ত জাতি হইতেই গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ করিয়া থাকেন। ত্রিপুরা রাজ্যের গত তিন শত বৎসরের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিলেও তাহা জানা যাইতে পারে। পাল রাজারা কি জাতীয়, এবং তাঁহারা কোন্ কোন্ জাতীয়া কন্যার পাণি-পীড়ন করিতেন, তাহা জানিতে চাহিলে, নুলপঞ্চাননের কারিকা পাঠ করা উচিত; নুলপঞ্চাননের ন্যায় স্পষ্টবক্তা ও বিশ্বস্ত ঘটক এ পর্য্যন্ত কেহ ব্রাহ্মণসমাজে আবির্ভূত হন নাই। তিনি সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তখনও অস্তমিত পাল-রাজশ্রীর আভা লোকের স্মৃতি হইতে তিরোহিত হয় নাই, তিনি পালরাজাদের প্রায় সমসাময়িক প্রাচীনতর কুলপঞ্জিকা-কারগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রম কল্পনা করা অন্যায়। উচ্চবর্ণের শিক্ষিত লেখকগণই হস্তে লেখনী পাইয়া বিচিত্র প্রকারে আত্ম-গৌরব ঘোষণা করিতে পারেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত নিম্নতর জাতির লোকেরা যে বংশাবলী উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা মূলতঃ অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ পাইতেছি না। আপাততঃ থাইডাডোঙ্গা কোন্ জাতীয় ছিলেন, তাহা নিরূপণ করুন। যতীনবাবু আমাদিগকে তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিরাট ঐতিহাসিক ভোজের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমরা পেটুক ব্রাহ্মণের ন্যায় আমন্ত্রিত হইয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।




লুইসী।

চিত্রকর—জি. রিশ্‌লার।

Blocks by G. N. Mukherji, Mohila Press, Calcutta.

# সাগরিকা।

## চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

### কলিঙ্গ-কাহিনী।

কলিঙ্গের ইতিহাস যথাযোগ্যভাবে সঙ্কলিত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু জানিতে পারা গিয়াছে, তাহার সাহায্যে ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। তাহা কলিঙ্গ-কাহিনীর উপাদান-মাত্র। অশোক-শাসন-সময় হইতে তাহার আরম্ভ। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলীর সমসাময়িক প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

বিন্দুসারের পুত্র রাজাধিরাজ অশোক বিশ্ববিখ্যাত। তিনি অভিষিক্ত হইবার আট বৎসর পরে, কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। তোষালী নামক স্থানে কলিঙ্গের এক প্রাদেশিক রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় কলিঙ্গ প্রদেশেও অশোকের উদার শাসন-নীতি প্রচারিত হইয়াছিল; গিরিলিপিতে এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১)

অশোক কোন পথে কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা অপরিজ্ঞাত। কোন্ কোন্ স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও অপরিজ্ঞাত। যুদ্ধের ফল কি হইয়াছিল, তাহাই কেবল গিরিলিপিতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল; এবং তাহাই চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাহা এক লোমহর্ষণ ব্যাপার।

কলিঙ্গ সহজে বা সহসা পরাজয় স্বীকার করে নাই। বসুন্ধরা নর-শোণিতে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল;—হতাহতের সংখ্যা গণনার অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল;—অশোক অসাধারণ অধ্যবসায়ে এক মহাশ্মশানের উপর বিজয়-পতাকা সংস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কলিঙ্গ যে ভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল, সে পরাজয়-কাহিনী বহু বিজয়-কাহিনীর

---

(১) ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লেপ্টেনাণ্ট কিট্টো কর্ত্তৃক ধৌলির গিরিলিপি আবিষ্কৃত হয়। ডাক্তার বুলর যে পাঠ Reports of the Archaeological Survey of Southern India, Vol. I (1887) গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাই বিশুদ্ধ পাঠ বলিয়া পরিচিত।

তুলনায় অধিক গৌরবের সঙ্গে ইতিহাস উল্লিখিত হইবার যোগ্য। স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য কলিঙ্গের অধিবাসিগণ, অশোকের ন্যায় প্রবল প্রতাপশালী ভারত-সম্রাটের গতিরোধ করিতে গিয়া, যেরূপ অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল,।(২) তাহাতে [অন্যের কথা দূরে থাকুক] বিজেতার শরীরও শিহরিয়া উঠিয়াছিল,—হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল,—বিজয়োল্লাস গভীর অনুশোচনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

অশোক ইহার যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে এক অনন্যসাধারণ সাধু দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া, তিনি চিরজীবনের জন্য শোণিতাক্ত শাণিত খরসান কোষবদ্ধ করিয়াছিলেন;—সুশাসন-বিতরণের জন্য প্রেমের দিগ্বিজয় বিঘোষিত করিয়াছিলেন। তাহার সুসমাচার গিরিলিপিতে উৎকীর্ণ করাইয়া, রণবীর ধর্ম্মবীর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন;—ভারতবর্ষে এক ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। সে গিরিলিপি রাজলিপি হইলেও দেবলিপি;—দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার প্রাণপ্রিয় ধর্ম্মলিপি। রণদুর্ম্মদ দানব-হৃদয় তাহার প্রকৃত মর্য্যাদার উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু মানব-সমাজ যখনই হিংসাদ্বেষে জর্জ্জরিত হইয়া, নর-শোণিতপাতে শিহরিয়া উঠিবে,—মানব-সভ্যতার দানব-পরিণামে ক্ষণকালের জন্যও অনুশোচনায় অশ্রুসিক্ত হইবে,—তখনই অক্ষরে অক্ষরে তাহার মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিবে।

অশোকের কলিঙ্গ-বিজয় মানব-সমাজে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। প্রেমের শাসন, পুণ্যের শাসন, করুণার শাসন, সমবেদনার শাসন, ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া, দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছিল; প্রত্যন্ত নরপালগণের সুদূর সাম্রাজ্য-সীমা পর্যন্ত সমগ্র জীবজগতে শান্তির সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহার সহিত কলিঙ্গ-বিজয়ের সম্পর্ক থাকায়, কলিঙ্গের নামও প্রসঙ্গক্রমে জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

অশোক-বিজিত কলিঙ্গ-দেশ কোথায় ছিল, তাহা কিন্তু অতীতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তোষালী নগরী কোথায় সংস্থাপিত

---

(২) 15,0000 persons were carried away captive, 100,000 were slain, and Many times that number perished.—Rock Edict XIII.

হইয়াছিল, তাহারও স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কখনও কখনও তাহার তথ্যানুসন্ধানের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া থাকে; কিন্তু এখনও তাহার আবিষ্কার-সাধনের জন্য খনন-কার্য্যের সূত্রপাত হয় নাই। আধুনিক ওড়িষার অন্তর্গত ভুবনেশ্বর তীর্থক্ষেত্রের চারি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে,—বর্ত্তমান দয়া নদীর দক্ষিণতীরে,—ধৌলি নামে পরিচিত ক্ষুদ্র পল্লীর পার্শ্ব-দেশে, ধবল গিরির মসৃণীকৃত শৈলকলেবরে, অশোকের কলিঙ্গ-শাসন-লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তোষালী তাহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া থাকিবে বলিয়া, অনেকে অনুমান করিয়া আসিতেছেন। (৩)

উৎকল যে অশোক-বিজিত কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহাতে সংশয়-প্রকাশের উপায় নাই। দক্ষিণে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহার অধিকার বিস্তৃত ছিল। চিল্কা-হ্রদের দক্ষিণে, মান্দ্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম জেলায়, যৌগাভা-পর্ব্বতগাত্রের অশোক-লিপি তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু উত্তরে কলিঙ্গ-রাজ্যের সীমা কোন্ স্থানে বর্ত্তমান ছিল, তাহার কোনরূপ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না।

কতকগুলি কারণে মনে হয়, তৎকালে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ হয় ত একটি যুক্ত-রাজ্যরূপে পরিচিত ছিল। তজ্জন্য অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের কথাই উল্লিখিত আছে; প্রয়োজনাভাবে অঙ্গ-বঙ্গ-বিজয়ের কথা উল্লিখিত নাই। "গৌড়রাজমালা"র লেখক এইরূপ একটি সিদ্ধান্তেরই অবতারণা করিয়াছেন। (৪) অশোক-শাসনের অধীন হইয়া, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ এক অখণ্ড শাসন-শৃঙ্খলার অন্তর্গত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বাবস্থা কিরূপ ছিল? সে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত অধিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই।

অশোকের পিতৃ-পিতামহের শাসন-সময়ে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের অবস্থা কিরূপ ছিল, গ্রীক্ সাহিত্যে তাহার যৎসামান্য আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যৎসামান্য হইলেও, বর্ত্তমান অবস্থায়, তাহা একেবারে উপেক্ষিত হইতে পারে না। কারণ, তাহা পরবর্ত্তী বিদেশীয় লেখকগণের গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে। মেগাস্থিনিসের বর্ণনার অনুসরণ করিয়া, প্লিনি লিখিয়া

(৩) Bengal District Gazetteers. PURI. PP. 249-250.

(৪) গৌড়রাজমালা, ২-৩ পৃষ্ঠা।

গিয়াছেন,—"গঙ্গা নদীর শেষভাগ গঙ্গারিডি-কলিঙ্গি রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত।" (৫) ইহাতে আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, তৎকালে গঙ্গা-সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত [ বঙ্গভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ ] কলিঙ্গ-নামে, এবং "গঙ্গারিডি-কলিঙ্গি" একটি যুক্তরাজ্যরূপে পরিচিত না থাকিলে, এরূপ জনশ্রুতি বিদেশীয় লেখকগণের গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হইত না। ত্রি-কলিঙ্গের জনশ্রুতির সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য থাকায়, ইহাকে অমূলক কল্পনামাত্র বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

অশোকের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিশ্ব-বিখ্যাত বিপুল সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইবার পর, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ হয় ত আবার স্বাতন্ত্র্য-লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কারণ, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবার এক প্রবল নরপালের কীর্ত্তিকলাপ উৎকলের পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই নরপতির নাম মহামেঘবাহন খারবেল। তাঁহার গিরি-লিপি খণ্ডাচলের হস্তিগুম্ফা নামক সুপরিচিত গহ্বরদ্বারশীর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। (৬)

খারবেলের অন্য কোনও পরিচয় এ পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। এই গিরিলিপি তাঁহার অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ হইলেও, ইহাতে তাঁহার অনেক বিবরণ উৎকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তিনি জৈনধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। অশোকের ন্যায় তিনিও ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গিরি-লিপিতে তিনি "ক্ষেমরাজ" বলিয়া উল্লিখিত।

খারবেল কৌমার-দশায় [ পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে ] যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, নয় বৎসর পরে [ চতুর্বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমে ] সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে রাজবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা কলিঙ্গ-রাজবংশ। তিনি তাহার তৃতীয় রাজা বলিয়া উল্লিখিত। তাঁহার রাজধানী কলিঙ্গনগরী নামে পরিচিত ছিল। খারবেলের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে তাহা ধ্বংসদশায় নিপতিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বিজয়রাজ্যের

(৫) গৌড়রাজমালা; ২ পৃষ্ঠা টীকা।

(৬) ডাক্তার লূডার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই গিরিলিপির সারাংশ Epigraphia Indica Vol x. pp. 160-161 দ্রষ্টব্য। ডাক্তার ভগবানলাল ইন্দ্রজী ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন।




মুখলিঙ্গমের সোমেশ্বর মন্দির।

Block and Printed by the Mohila Press, Calcutta.

প্রথম বৎসরেই রাজধানীর জীর্ণসংস্কার করিয়াছিলেন। সে কলিঙ্গনগরী কোথায় ছিল, এখনও তাহার তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত হয় নাই। খণ্ডাচল ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে জৈন প্রভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তজ্জন্য, কেহ কেহ অনুমানমূলে ভুবনেশ্বরকেই খারবেলের কলিঙ্গনগরী বলিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন।

খারবেল কলিঙ্গ লইয়াই পরিতৃপ্ত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। গিরিলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—তদীয় বিজয়রাজ্যের দ্বিতীয় বৎসরে, তিনি পশ্চিমাভিমুখে বিজয়যাত্রা করিয়াছিলেন; চতুর্থ বৎসরে "রাষ্ট্রীকগণে"র আনুগত্য লাভ করিয়া, তিনি উত্তরকালে মগধ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই দিগ্বিজয়ী নরপাল কি কলিঙ্গ-সীমা-সংলগ্ন বঙ্গভূমির প্রতি উদাসীন ছিলেন? তৎকালে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ যুক্তরাজ্যরূপে বর্ত্তমান থাকিলে, "রাষ্ট্রীকগণে"র আনুগত্যে অঙ্গ-বঙ্গেও তাঁহার প্রভাব স্বীকৃত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু অঙ্গ-বঙ্গে ইহার জনশ্রুতি বর্ত্তমান নাই। পক্ষান্তরে, কলিঙ্গে যে জৈনপ্রভাবের কীর্ত্তিচিহ্নের অপ্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, অঙ্গ-বঙ্গে তাহার নানা নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে। খারবেলের শাসন-সময় অশোকের পরবর্ত্তী কি না, তদ্বিষয়ে কেহ কেহ সংশয়প্রকাশ করিলেও, অধিকাংশ পণ্ডিত খারবেলকে অশোকের পরবর্ত্তী বলিয়াই অনুমান করিয়া আসিতেছেন।

খারবেলের বিজয়রাজ্যের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহার সন্ধানলাভের উপায় নাই। তাঁহার শাসন-সময়ের কলিঙ্গ শৌর্য্যে ও বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে ও কলানৈপুণ্যে সমুন্নত ছিল; গুহাবলীর মধ্যে এখনও তাহার স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার কলিঙ্গরাজ্য হয় ত কালক্রমে আবার স্বাতন্ত্র্যবিচ্যুত হইয়া, অন্য কোনও প্রবল সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে, অন্ধ্ররাজগণের আশ্রয়ে, নাগার্জ্জুন মহাযান-বৌদ্ধমতের প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ওড়িষায় বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় বৌদ্ধ-সাহিত্য-নিহিত এইরূপ একটি জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, কেহ কেহ মনে করেন, তৎকালের কলিঙ্গরাজ্য অন্ধ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং অঙ্গ-বঙ্গেও তাহার প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্যের পরিণামই

অন্ধকারের মধ্যে একখানিমাত্র শিলালিপির আকস্মিক আলোকপাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কলিঙ্গ কিয়ৎকালের জন্য গৌড়াধিপ শশাঙ্কের করতলগত হইয়াছিল। তখনও ইতিহাস-বিখ্যাত পালরাজগণের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই। তখনও প্রাচ্য-ভারতের ইতিহাসের মধ্যযুগের উষাকাল;—উষার অরুণ-কিরণের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল আশার অমৃতকিরণে প্রাচ্যভারত নবজাগরণের আয়োজন করিতে ব্যাপৃত হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের ছত্রভঙ্গ অবস্থায় কান্যকুব্জে ও বঙ্গ-দেশে এক উচ্চাভিলাষ যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাহা আর্য্যা-বর্ত্তব্যাপী সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের প্রশংসনীয় উচ্চাভিলাষ, কিন্তু পরিণামের পরিচয় অনুসারে তাহা এখন স্বপ্ন বলিয়াই অভিহিত। শশাঙ্কের স্বপ্ন সফল হয় নাই; কেবল অল্পকালের জন্য হর্ষবর্দ্ধনের স্বপ্ন সফল হইয়াছিল;—শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণের নাম ডুবিয়া গিয়াছিল; হর্ষবর্দ্ধনের কান্যকুব্জের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছিল। এই সময়ে চীন দেশের সুবিখ্যাত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ইয়ন্‌-চুয়ঙ্গ ভারত-ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার জীবন-কাহিনী ও ভ্রমণকাহিনী এই সময়ের একখানি চিত্রপট অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে;—বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুরাগের তূলিকাপাতে তাহাতে বৌদ্ধগৌরব কিছু উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইলেও, সমসাময়িক বিবিধ ব্যাপারও তাহাতে স্থানলাভ করিয়াছে; প্রাচ্যভারত যে তৎকালে জ্ঞানে ধর্ম্মে শিল্পে বাণিজ্যে একটি সমুন্নত প্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়,—অর্জ্জুনের তীর্থযাত্রাকালে কলিঙ্গে দেবায়তনের অভাব ছিল না। অশোকের শাসন-সময়েও অশোক-সাম্রা-জ্যের সকল স্থানেই অসংখ্য "ধর্ম্মরাজিকা" নির্ম্মিত হইয়াছিল। খার-বেল তাঁহার বিজয়-রাজ্যের চতুর্থ সংবৎসরে পূর্ব্বতন কলিঙ্গাধিপতিগণের আরাধ্য দেবায়তনের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইয়ন্‌-চুয়ঙ্গ অনেক বৌদ্ধমন্দির ও দেবমন্দির দর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি এখন আর কলিঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করে না। এখন খণ্ডাচলের গিরিগুহাবলীই কলিঙ্গের প্রাচীন যুগের প্রধান কীর্ত্তিচিহ্ন। তদ্ভিন্ন যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই মধ্যযুগের রচনারীতির পরিচয় প্রদান করে। যাহা কলিঙ্গে উদ্ভাবিত প্রাদেশিক শিল্পরীতি বলিয়া কথিত

এরূপ একটি প্রাদেশিক শিল্পরীতি উদ্ভাবিত হইতে পারিত, সেরূপ সম্ভাবনাও কলিঙ্গের ইতিহাসে অপরিচিত। যাহা উৎকল-শিল্পরীতি নামে কথিত হইতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে কোন্ শিল্পরীতি, ইতিহাসকেই তাহার একমাত্র মীমাংসক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা মধ্যযুগের কীর্ত্তিচিহ্ন। সুতরাং কলিঙ্গের মধ্যযুগের ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধান আবশ্যক।

হর্ষবর্দ্ধনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাম্রাজ্য-স্বপ্নও তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ আবার স্বস্ব স্বয়ং হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে প্রাচ্য ভারতে "মৎস্যন্যায়" পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত হইয়াছিল। কেহ কাহাকেও মানিত না;—কেহ কাহাকেও ছাড়িত না;—বাহুবলই সকল তর্কের মীমাংসাসাধন করিত। অশোকের ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন-চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছিল;—পরম্পরাগত শিক্ষা দীক্ষা বিফল হইয়া গিয়াছিল;—জনসমাজের নিকট পরলোক অপরিজ্ঞাত দূরবর্ত্তী সংশয়পূর্ণ প্রহেলিকারূপে প্রতিভাত হইয়াছিল;—ইহলোকের করতলগত সুখসৌভাগ্যসম্ভোগই সকল নরনারীর লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহার প্রভাবে আর্য্যাবর্ত্ত অবসন্ন, পূর্ব্বকীর্ত্তিকলাপ জরাজীর্ণ, এবং প্রাচ্যভারত এক প্রচণ্ড তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রাচ্যভারত হইতেই এক নবশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার প্রভাবে, আবার এক সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহার বিস্তৃত বিবরণ "গৌড়রাজমালা"য় দ্রষ্টব্য। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—প্রাচ্যভারতে যে স্বাতন্ত্র্যলিপ্সা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা শিল্পে, সাহিত্যে, লোকাচারে, ধর্ম্মাচরণেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাহার প্রভাব প্রাচ্যভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে অভিব্যক্ত। তাহার সহিত বাঙ্গালীর ইতিহাস এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে।

প্রাচ্যভারতের এই প্রবল সাম্রাজ্যের নাম গৌড়ীয় সাম্রাজ্য। তাহার প্রথম সম্রাট্ ইতিহাসে প্রথম গোপালদেব নামে পরিচিত। প্রকৃতিপুঞ্জ "মাৎস্যন্যায়" দূরীভূত করিবার জন্য তাঁহাকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছিল। তিনিও করুণারত্নোদ্ভাসিতবক্ষে প্রজাবর্গের মিত্রতা ধারণ করিয়া, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ স্বেচ্ছাচারিগণের

এরূপ একটি প্রাদেশিক শিল্পরীতি উদ্ভাবিত হইতে পারিত, সেরূপ সম্ভাবনাও কলিঙ্গের ইতিহাসে অপরিচিত। যাহা উৎকল-শিল্পরীতি নামে কথিত হইতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে কোন্ শিল্পরীতি, ইতিহাসকেই তাহার একমাত্র মীমাংসক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা মধ্যযুগের কীর্ত্তিচিহ্ন। সুতরাং কলিঙ্গের মধ্যযুগের ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধান আবশ্যক।

হর্ষবর্দ্ধনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাম্রাজ্য-স্বপ্নও তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল! আর্য্যাবর্ত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ আবার স্বস্ব স্বয়ং হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে প্রাচ্য ভারতে "মৎস্যন্যায়" পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত হইয়াছিল। কেহ কাহাকেও মানিত না;—কেহ কাহাকেও ছাড়িত না;—বাহুবলই সকল তর্কের মীমাংসাসাধন করিত! অশোকের ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন-চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছিল;—পরম্পরাগত শিক্ষা দীক্ষা বিফল হইয়া গিয়াছিল;—জনসমাজের নিকট পরলোক অপরিজ্ঞাত দূরবর্ত্তী সংশয়পূর্ণ প্রহেলিকারূপে প্রতিভাত হইয়াছিল;—ইহলোকের করতলগত সুখসৌভাগ্যসম্ভোগই সকল নরনারীর লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল! ইহার প্রভাবে আর্য্যাবর্ত্ত অবসন্ন, পূর্ব্বকীর্ত্তিকলাপ জরাজীর্ণ, এবং প্রাচ্যভারত এক প্রচণ্ড তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রাচ্যভারত হইতেই এক নবশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার প্রভাবে, আবার এক সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহার বিস্তৃত বিবরণ "গৌড়রাজমালা"য় দ্রষ্টব্য। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—প্রাচ্যভারতে যে স্বাতন্ত্র্যলিপ্সা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা শিল্পে, সাহিত্যে, লোকাচারে, ধর্ম্মাচরণেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাহার প্রভাব প্রাচ্যভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে অভিব্যক্ত! তাহার সহিত বাঙ্গালীর ইতিহাস এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে।

প্রাচ্যভারতের এই প্রবল সাম্রাজ্যের নাম গৌড়ীয় সাম্রাজ্য। তাহার প্রথম সম্রাট্ ইতিহাসে প্রথম গোপালদেব নামে পরিচিত। প্রকৃতিপুঞ্জ "মাৎস্যন্যায়" দূরীভূত করিবার জন্য তাঁহাকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছিল। তিনিও করুণারত্নোদ্ভাসিতবক্ষে প্রজাবর্গের মিত্রতা ধারণ করিয়া, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ স্বেচ্ছাচারিগণের পরাক্রমসঞ্জাত মাৎস্য-ন্যায়ের প্রভাব পরাভূত করিয়া, শান্তি-সংস্থাপনে

কৃতকার্য্য হইয়া, উত্তরকালে চিরকৃতজ্ঞ জনসমাজের নিকট বোধিসত্ব লোকনাথের অবতাররূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী ধর্ম্মপালদেবের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—পূর্ণিমারজনীর দিঙ্‌মণ্ডলপ্রধাবিত জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই গোপালদেবের স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত।

এই রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব দিগ্বিজয় সাধন করিয়া, সকল উত্তরাপথে সার্ব্বভৌমশ্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন। যাহা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আবার এক অখণ্ড শাসনশৃঙ্খলার অধীনে আনীত হইয়াছিল;—প্রাচ্য ভারত আবার শৌর্য্যে, বীর্য্যে, জ্ঞানগাম্ভীর্য্যে, শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

ধর্ম্মপালদেবের পুত্র দেবপালদেবের [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনের সপ্তম শ্লোকে (৭) দেখিতে পাওয়া যায়,—ধর্ম্মপালদেবের বিজয়-বাহিনী কেদারে, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে এবং গোকর্ণাদি তীর্থে, [দুষ্টদমন উপলক্ষে] ধর্ম্ম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের অবসরলাভ করিয়া, ইহলৌকিক সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারলৌকিক সিদ্ধিও হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যথা;—

কেদারে বিধিনোপযুক্তপয়সাং গঙ্গাসমেতাম্বুধৌ
গোকর্ণাদিষু চাপ্যনুষ্ঠিতবতাং তীর্থেষু ধর্ম্মাঃ ক্রিয়াঃ।
ভৃত্যানাং সুখমেব যস্য সকলানুদ্ধৃত্য দুষ্টানিমান্
লোকান্ সাধয়তোঽনুষঙ্গজনিতা সিদ্ধিঃ পরত্রাপ্যভূৎ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায়, পরলোকগত সুপণ্ডিত অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ গোকর্ণকে বোম্বাই-প্রদেশের সুপরিচিত তীর্থক্ষেত্র বলিয়া সূচিত করিয়া গিয়াছেন। (৮) বোম্বাই-প্রদেশে গৌড়ীয় বিজয়-বাহিনীর দিগ্বিজয়-কাহিনী অপরিচিত; এ দেশে তাহার স্মৃতিচিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি, অধ্যাপক কিল্‌হর্ণের ব্যাখ্যা-প্রভাবে, "গৌড়লেখমালা"-সম্পাদন-সময়ে, গোকর্ণ-সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভূত হয়

(৭) গৌড়লেখমালা; ৩৬ পৃষ্ঠা।

নাই। "গৌড়লেখমালা" প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই, তাহার তথ্যানুসন্ধানের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সুযোগে, [ কলিঙ্গ-ভ্রমণে ব্যাপৃত হইয়া ] জানিতে পারা গিয়াছে,—ধর্ম্মপালদেবের বিজয়-বাহিনী যে গোকর্ণতীর্থে উপনীত হইয়াছিল, তাহা বোম্বাই-প্রদেশের অন্তর্গত নহে,—কলিঙ্গের অন্তর্গত,—মহেন্দ্রাচলের শিখরদেশে অবস্থিত! সুতরাং ধর্ম্মপালদেব উৎকল অতিক্রম করিয়া, আধুনিক কলিঙ্গের শেষ-সীমা পর্য্যন্ত "দুষ্টদমন" করিয়াছেন বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

তৎকালে উৎকলে বা কলিঙ্গে কোন্ কোন্ নরপতি বিদ্যমান ছিলেন, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা হয় ত প্রজাপালক নামে কথিত হইবার যোগ্য ছিলেন না বলিয়াই, অবজ্ঞাসূচক "দুষ্টান্" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। ইহাতে মনে হয়,—তৎকালে অঙ্গ-বঙ্গের ন্যায় কলিঙ্গেও "মাৎস্যন্যায়" প্রচলিত ছিল। তারানাথের গ্রন্থেও (৯) সেইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্মপালদেব তাহা দূরীভূত করিয়া সকল কলিঙ্গেই সুশাসন সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

এইরূপে অঙ্গ-বঙ্গের সঙ্গে কলিঙ্গের যে সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত, নানা বিপ্লবের মধ্যেও, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের উন্নতিসাধন করিয়াছিল। ধর্ম্মপালের তিরোভাবের পর, উৎকল একবার স্বাতন্ত্র্য-অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছিল। সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ধর্ম্মপালদেবের পুত্র দেবপালদেবও দিগ্বিজয়ী ছিলেন; তাঁহার বীর ভ্রাতা বিজয়ী জয়পাল বসুন্ধরাকে "একাতপত্রা" করিয়াছিলেন। নারায়ণপাল-দেবের [ ভাগলপুরে আবিষ্কৃত ] তাম্রশাসনের ষষ্ঠ শ্লোকে (১০) দেখিতে পাওয়া যায়,—জয়পালের নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই, উৎকলাধীশ অবসন্ন হইয়া রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া, পলায়নপর হইয়াছিলেন। যথা,—

যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদ্দেশাদ্বলবতি পরিতঃ প্রাস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাদুৎকলানামধীশঃ।

(৯) Cunninghams' Archaeological Survey Reports; Vol. XV. P. 148.

(১০) গৌড়লেখমালা; ৫৮ পৃষ্ঠা।

ভট্ট গুরবের গরুড়স্তম্ভ-লিপিতেও ইহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে,—দেবপালদেব "উৎকল-কুলকে উৎকিলিত করিয়াছিলেন।" ধর্ম্মপালদেবের ও দেবপালদেবের প্রায় শতবর্ষব্যাপী শাসনকাল গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গৌরবের কাল। তৎকালেই প্রাচ্য ভারতে শিক্ষা দীক্ষা কলাকৌশল নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই দুই নরপালের সুদীর্ঘ শাসনকালে উৎকলে বা কলিঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বর্ত্তমান থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না;—স্বাতন্ত্র্যের সামান্য সূচনাও দণ্ডনীতি-প্রভাবে দূরীভূত হইত। তজ্জন্য এই সময়ে কোনও উৎকলাধীশের বা কলিঙ্গাধিপতির নামের বা কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এই যুগের কলিঙ্গের কথা অঙ্গ-বঙ্গ-কথার সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। গুর্জ্জর-কথার সঙ্গেও তাহার কিছু সম্বন্ধ ছিল। বৎসরাজপুত্র দ্বিতীয় নাগভটের কৌমারকালের প্রতাপাগ্নিতে কলিঙ্গাধিপতির পতঙ্গবৎ পতিত হইবার এক কাহিনী নাগভটের পৌত্র মিহিরভোজের [ গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত ] প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত আছে। (১১) কিন্তু বরেন্দ্রভূমির গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—গৌড়েশ্বর [ দেবপালদেব ] "দ্রবিড়-গুর্জ্জর-নাথ-দর্প খর্ব্বীকৃত" করিয়া, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রমেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবপালদেবের তাম্রশাসনেও (১২) দেখিতে পাওয়া যায়,—এক দিকে হিমালয়, অপর দিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিচিহ্ন সেতুবন্ধ;—এক দিকে বরুণ-নিকেতন, অপর দিকে লক্ষ্মীর জন্ম-নিকেতন,—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল সেই রাজা নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিয়াছিলেন। যথা,—

"আগঙ্গা-গম-মহিতাৎ সপত্নশূন্যা
মাসেতোঃ প্রথিত-দশাস্যকেতু-কীর্ত্তেঃ।
উর্ব্বী মাবরুণ-নিকেতনাচ্চ সিন্ধোঃ
রালক্ষ্মীকুলভবনাচ্চ যো বুভোজ॥"

এরূপ অবস্থায় নাগভটের কৌমারকালের প্রতাপবহ্নি যে অধিক দিন প্রজ্বলিত থাকিতে পারিয়াছিল, তাহার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়

(১১) গৌড়রাজমালা; ২৫ পৃষ্ঠা।

না। কলিঙ্গ অঙ্গ-বঙ্গেরই কণ্ঠলগ্ন ছিল; গৌড়েশ্বরগণের প্রবলপ্রতাপ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে তুল্যভাবেই বর্ত্তমান ছিল; এবং অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ তুল্যভাবেই এই গৌরবযুগের শিক্ষাদীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ভাষায়, সাহিত্যে, শিল্পে তাহার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; কলিঙ্গের শেষ সীমা পর্য্যন্ত এখনও বাণিজ্যকুশল গৌড়ীয় বৈশ্যগণের বংশধরগণ পূর্ব্বস্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিতেছে।

বাঙ্গালীর কলিঙ্গ-বিজয়ের জনশ্রুতি বঙ্গদেশে একেবারে অপরিচিত ছিল না। তাহা এক সময়ে পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের লাউসেনের আখ্যায়িকায় তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের রাজ্যসীমা চিরদিন এক স্থানে সংস্থাপিত ছিল না। কালক্রমে পশ্চিমাঞ্চলে সে সীমা অনেক দূর সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। বরেন্দ্রভূমিও কখনও কখনও কিয়ৎকালের জন্য পালরাজগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। কিন্তু অঙ্গদেশে পালরাজগণের অধিকারে দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণাবস্থায় বর্ত্তমান ছিল; কলিঙ্গের সঙ্গেও পুরাতন সম্পর্ক সহসা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই।

গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের শাসন-শক্তি কিছু শিথিল হইলে, ওড়িযায় কেশরী রাজগণের কীর্ত্তিকলাপ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মতে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষপাদ হইতে ইহার আরম্ভ। কিন্তু কোনও কোনও মনীষী কেশরী রাজবংশের অস্তিত্বমাত্রেও সংশয় প্রকাশিত করেন।

ওড়িষার গঙ্গাবংশীয় নরপালগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, কেশরী রাজগণ বর্ত্তমান ছিলেন, অনেক দিন হইতে এইরূপ একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। "মাদলা-পাঞ্জী"তে এবং [ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত ] "ভক্তিভাগবতমহাকাব্যম্" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই জনশ্রুতি উল্লিখিত আছে। তাহা পরবর্ত্তীকালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, উপেক্ষিত হইলেও, অন্য প্রমাণের অসদ্ভাব নাই।

ভুবনেশ্বর-তীর্থক্ষেত্রের ব্রহ্মেশ্বর-মন্দিরে যে প্রস্তরফলক সংযুক্ত ছিল, তাহাতে কেশরী রাজগণের কথা উল্লিখিত ছিল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল তাহার শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। এখন আর সে প্রস্তর-ফলকের

শ্লোকাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়,—উদ্যোতকেশরী নামক রাজার মাতা [ কোলাবতী ] ব্রহ্মেশ্বর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ( ১৩ ) নির্ম্মাণকাল এইরূপে উল্লিখিত ;—

"পরমমাহেশ্বর-মহারাজাধিরাজ-সোমবংশোদ্ভবত্রিকলিঙ্গাধিপতি-
কলিঙ্গাধিপতি-শ্রীমদুদ্দ্যোতকেশরীরাজদেবস্য বিজয়রাজ্যে
সংবৎ ১৮। ফাল্গুন শুদিত।"

এই প্রশস্তি বর্ত্তমান থাকিলে, অনেক তর্কবিতর্ক নিরস্ত করিতে পারিত। কিন্তু প্রস্তর-ফলক বর্ত্তমান না থাকিলেও তাহার শ্লোকাবলী যে ভাবে ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থে উদ্ধৃত রহিয়াছে, তৎপ্রতি সংশয়-প্রকাশের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রশস্তি কবিবর পুরুষোত্তম-বিরচিত। যথা,—

"বেদব্যাকরণার্থশাস্ত্রকবিতাতর্কাদি-বিদ্যাধরো
ব্রহ্মেবাবিতথ-প্রসন্নবিনয়োদ্বুদ্ধি বিশুদ্ধাশয়ঃ।
তারাধীশ্বর-বংশজাবনিভুজাং শুভ্রঃ যশস্তন্বতা-
স্তুষ্টঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ কবিবরোহকার্ষীদিমাং বর্ণনাম্ ॥"

ইহাতে কেশরী রাজবংশ "চন্দ্রবংশ"-সম্ভূত বলিয়া উল্লিখিত। সেই বংশের জনমেজয় নামক কলিঙ্গাধিপতি "কুন্তাগ্রে ওড্রপতিকে নিহত করিয়া, তদীয় রাজলক্ষ্মী আকর্ষণ করিয়াছিলেন।" এই বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়,—কলিঙ্গ ওড্র হইতে স্বতন্ত্র ছিল, কলিঙ্গরাজবংশ ওড্রদেশও অধিকার করিয়াছিল। এই কলিঙ্গ কোন্ কলিঙ্গ ? মুখলিঙ্গমের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও "সোমেশ্বর-মন্দির" নামে একটি জীর্ণমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার সহিত এই কেশরী রাজগণের সম্পর্ক থাকিলে, মুখলিঙ্গমের পার্শ্ববর্ত্তী কলিঙ্গনগরকেই তাঁহাদিগের আদিরাজধানী বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু তথায় সোমবংশীয় রাজাদিগের জনশ্রুতি আছে,—কেশরী বংশের জনশ্রুতি নাই। পুরুষোত্তম প্রশস্তিরচনাকালে উদ্যোত-কেশরীর পরিচয় দিয়াছেন,—

"বালক্রীড়াভিরেব প্রতিভটমখিলং সিংহলক্রোড়গৌড়ৌ
যুদ্ধে সন্নদ্ধযোধ-দ্বিরদবলঘটাসঙ্গরং যো বিজিত্য।
উদ্দৃপ্তাক্ষৌহিণীপদ্গুরুগতিবিনমদ্ভূভরাক্রান্ত-কূর্ম্মো
রাজ্ঞঃ কুর্ব্বন্নশেষানবনতশিরসো জিষ্ণু রুর্ব্বী মজৈষীৎ ॥"

---

( ১৩ ) Rajendralalas' Orissa and J. A. S. B. Vol. VII. P. 558.

যে বৎসরে এই প্রস্তর-লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, ঠিক সেই বৎসরেই খণ্ডাচলের নবমুনিগুহায় আচার্য্য শুভ্রচন্দ্র এক লিপিতে উদ্যোতকেশরীর নাম ও তদীয় বিজয়রাজ্যের ১৮ সম্বৎ উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। এই লিপি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সুতরাং উদ্যোতকেশরীর অস্তিত্বমাত্রে সংশয় প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কেশরী রাজগণের এইরূপ প্রমাণ ইতিহাসের পক্ষে প্রচুর না হইলেও, তাঁহাদিগের অস্তিত্ব-প্রতিপাদনের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। উদ্যোতকেশরীর সঙ্গে গৌড়ের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল ;—পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা অপরিজ্ঞাত।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে প্রাচ্যভারত বহু বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। সে বিপ্লবে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের পুরাতন সম্পর্ক সকল সময়ে পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণাবস্থায় বর্ত্তমান ছিল না। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-গিরিলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি প্রবলযুদ্ধে দুর্গম ওড্রবিষয় পদানত করিয়া, কোশলনাড়ু, তন্দবুত্তি, তক্কণ-লাড়ম্ ও বঙ্গালদেশ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল প্রদেশে চোল-রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইবার উল্লেখ নাই, তাহার জনশ্রুতিও অপরিচিত। এই অভিযান তৎকালসুলভ দেশলুণ্ঠন বলিয়াই কথিত হইবার যোগ্য।

ইহার পর [ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ] কলিঙ্গে যে রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাই ইতিহাসবিখ্যাত গঙ্গাবংশ। কলিঙ্গনগর এই রাজবংশের আদি রাজধানী বলিয়াই পরিচিত। মুখলিঙ্গমে ইঁহাদিগের অনেক প্রস্তরলিপি বর্ত্তমান আছে। ( ১৪ ) ইঁহারা দীর্ঘকাল কলিঙ্গের সঙ্গে উৎকল,—কখনও কখনও বঙ্গভূমির দক্ষিণপশ্চিমাংশ অধিকারভুক্ত করিয়া, প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের স্মৃতি শিল্পগৌরবে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

ভারতদ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে যে সকল ভারতীয় কীর্ত্তিচিহ্নের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমস্তই মধ্যযুগের কীর্ত্তিচিহ্ন ; তাহার সর্ব্বাঙ্গে ভারতীয় প্রভাব দৃঢ়মুদ্রিত। সে প্রভাব ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের প্রভাব, তাহার মূল প্রস্রবণ কোথায়, তাহাই সাগরিকার প্রধান কথা। তাহার

---

... বিবরণ "কলিঙ্গ ভ্রমণ" নামক পৃথক প্রবন্ধে বিবৃত হইবে।

অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে, মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্মরণ রাখা আবশ্যক বলিয়া, তাহা উল্লিখিত হইল।

এই ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্যযুগে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের চেষ্টা প্রচলিত হইয়াছিল। তাহা কেবল প্রাচ্যভারতেই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকালের জন্য সফল হইতে পারিয়াছিল। সে সাম্রাজ্য পাল-রাজগণের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য। তাহার প্রভাবই মধ্যযুগের ভারতীয় প্রভাব। মধ্যযুগের ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষা, ভারতীয় সাহিত্য-শিল্প, সেই প্রভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। সেই প্রভাব, ভারতবর্ষের বাহিরেও, জলে স্থলে তুল্যভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। স্থলপথে প্রভাব ব্যাপ্ত হইবার প্রস্রবণ বরেন্দ্রভূমিতে, এবং জলপথে প্রভাব ব্যাপ্ত হইবার প্রস্রবণ কলিঙ্গে অনুসন্ধান করিতে হইবে; এবং জলে স্থলে, [ সকল পথেই ] ভারতবর্ষের বাহিরে যে প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, পালরাজগণের গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলেই তাহার মূল প্রস্রবণের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই সকল স্থানে এখনও এ ভাবে তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত হয় নাই। সুতরাং সাগরিকার প্রধান কথা নূতন কথা বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। নূতন হইলেও ভিত্তিহীন নহে। তাহা অধুনা-অধঃপতিত বাঙ্গালী সমাজের পুরাতন দিগ্বিজয়ের কথা। সে কথা [ উপযুক্ত অনুসন্ধানপ্রণালীর অভাবে ] তর্ক বিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভারত-দ্বীপপুঞ্জের ভারতীয় উপনিবেশে ভারতবর্ষের প্রভাব সর্ব্বত্র সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত পুরাতন কথা। সে প্রভাব ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের, কোন্ যুগের, কোন্ সমাজের প্রভাব, তাহা এখনও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই। কোনও কোনও পাশ্চাত্য মনীষী এক্ষণে এতদ্বিষয়ক পূর্ব্বসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন,—এ বিষয়ে এখনও অনুসন্ধানের প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে, সুতরাং এ পর্যান্ত এ বিষয়ে কে কি লিখিয়াছেন, তাহাতে পথভ্রান্ত না হইয়া, স্বাধীনভাবে তথ্যানুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য। সাগরিকা তৎপ্রতি বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে, সকল শ্রম সফল হইবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

# শ্রীচন্দ্র-দেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন ।

[ রামপাল-লিপি । ]

## প্রশস্তি-পরিচয় ।

বঙ্গের বর্ম্মরাজবংশের ও সেনরাজবংশের রাজধানী বিক্রমপুর-অঞ্চলে মধ্যযুগের বঙ্গেতিহাস-সঙ্কলনোপযোগী তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি আমাকে [ বর্ত্তমান সালের গ্রীষ্মাবকাশে ] পূর্ব্ববঙ্গে পরিভ্রমণ করিতে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সেই উপদেশ-ক্রমে আমি রাজসাহী হইতে জন্মভূমি ঢাকা নগরীতে আসিয়া, বিগত ২৯শে এপ্রেল [ ১৬ই বৈশাখ ] তারিখে, কতিপয় বন্ধু সহ তথ্যানুসন্ধানে বহির্গত হই। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পঞ্চসার-গ্রামনিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তদীয় অনুজ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নিকট শুনিতে পাই যে, সেই গ্রামনিবাসী "যদুনাথ বণিক্যের বাড়ীতে বহুবৎসর যাবৎ একখণ্ড তাম্রশাসন যত্ন-সহকারে রক্ষিত হইতেছে,—এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই।" এই সন্ধান লাভ করিয়া, আমরা বণিক্য-বাড়ীতে গিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে তাম্র-ফলকখানি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। যদুনাথের নিকট শুনিয়াছি যে, প্রায় ৭৫।৭৬ বৎসর পূর্ব্বে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রামপাল-নামক স্থানে কোনও এক মোসলমান মৃত্তিকা খনন করিবার সময় এই তাম্রপট্ট প্রাপ্ত হইয়া, যদুনাথের পিতা স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু বণিক্যকে প্রদান করিয়াছিল। জগদ্বন্ধু প্রায় ৪৫।৪৬ বৎসর ইহা নিজ-গৃহে সযত্নে রক্ষা করিয়া, পরলোক-প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র যদুনাথ বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ পিতৃদেবের উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত এই তাম্রশাসনখানি ভক্তি-সহকারে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। ইহা এখন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

আবিষ্কার-কাহিনী।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি আমার উপর এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারের ভার ন্যস্ত করায়, মূল শাসন হইতে যেরূপ ভাবে পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ

পাঠোদ্ধার-কাহিনী। কাল-প্রভাবে তাম্রফলকের কোনও অনিষ্ট না হইয়া থাকিলেও, স্থানে স্থানে পাঠোদ্ধারে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, [ প্রায় ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে অক্ষর-পাঠের সুবিধা হইবে মনে করিয়া, ] যতুনাথ তাম্র-দ্রাব অর্থাৎ ( Nitric acid ) প্রয়োগপূর্ব্বক তাম্রফলকের উভয় পার্শ্ব সংঘর্ষণ করিয়া কোনও কোনও স্থানের অক্ষর-বিলোপের সহায়তা করিয়াছিল।

পাঠোদ্ধারসাধন করিয়া, আমাকে ব্যাখ্যা-কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। এই শাসনে রাজ-বংশ-বিবৃতি-বিজ্ঞাপক আটটি শ্লোক আছে। ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী ইদিলপুর-নিবাসী কোনও জমীদারের গৃহে অদ্যাপি একখানি তাম্রশাসন অপঠিত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর এম্. এ. তাহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা "ঢাকা-রিভিউ" পত্রিকায় [ ১৯১২ সালের অক্টোবর সংখ্যায় ] শ্রীযুত জে. টি. র‍্যাঙ্কিন্ মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। লস্কর মহাশয়ের ক্ষুদ্র টীকাকার প্রবন্ধ-পাঠে জানা গিয়াছে যে, তিনি ইদিলপুরের তাম্রশাসনখানির ছাপ-মাত্রই আনিতে পারিয়াছিলেন; মূল ফলকখণ্ড সত্বাধিকারীর নিকট হইতে কোনও প্রকারেই হস্তগত
ব্যাখ্যা-কাহিনী করিতে পারেন নাই। ইদিলপুর-শাসনের প্রতিগ্রহীতা ও উৎসৃষ্ট ভূমি পৃথক্। এই উভয় শাসনের লিপি-পংক্তিও সম-সংখ্যক নহে। শ্লোকাবলী যদি উভয়ত্র একরূপ হয়, তাহা হইলে, স্বর্গীয় গঙ্গামোহন ইদিলপুর-শাসনের শ্লোক-মর্ম্ম নিজ প্রবন্ধে যে ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাংশে শুদ্ধ হয় নাই। দানাদেশ-কারী রাজার নামোদ্ধারেও তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে। তিনি "শ্রীচন্দ্রদেব"কে "চন্দ্রদেব" বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান তাম্রশাসনে রাজার নাম "শ্রীচন্দ্র" বলিয়া তিনবার উল্লিখিত আছে,—এবং রাজার পিতা "ত্রৈলোক্যচন্দ্র," পিতামহ "সুবর্ণচন্দ্র" ও প্রপিতামহ "পূর্ণচন্দ্রে"র নামকরণ-প্রণালীর আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়,—রাজার নাম "চন্দ্রদেব" না হইয়া, অন্য কোনও শব্দ উপপদরূপে লইয়াই গঠিত হইয়া থাকিবে। এই তাম্রশাসনে যে সকল রাজপাদোপজীবীর নামোল্লেখ আছে, তাহাদের অধিকাংশের নিয়োগ "ভোজবর্ম্ম-দেবের বেলাব-লিপি" * ও "বল্লালসেন-

পাঠোদ্ধার-কাহিনী। কাল-প্রভাবে তাম্রফলকের কোনও অনিষ্ট না হইয়া থাকিলেও, স্থানে স্থানে পাঠোদ্ধারে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, [ প্রায় ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে অক্ষর-পাঠের সুবিধা হইবে মনে করিয়া, ] যদুনাথ তাম্র-দ্রাব অর্থাৎ ( Nitric acid ) প্রয়োগপূর্ব্বক তাম্রফলকের উভয় পার্শ্ব সংঘর্ষণ করিয়া কোনও কোনও স্থানের অক্ষর-বিলোপের সহায়তা করিয়াছিল।

পাঠোদ্ধারসাধন করিয়া, আমাকে ব্যাখ্যা-কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। এই শাসনে রাজ-বংশ-বিবৃতি-বিজ্ঞাপক আটটি শ্লোক আছে। ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী ইদিলপুর-নিবাসী কোনও জমীদারের গৃহে অদ্যাপি একখানি তাম্রশাসন অপঠিত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর এম্. এ. তাহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা "ঢাকা-রিভিউ" পত্রিকায় [ ১৯১২ সালের অক্টোবর সংখ্যায় ] শ্রীযুত জে. টি. র‍্যাঙ্কিন্ মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। লস্কর মহাশয়ের ক্ষুদ্র টীকাকার প্রবন্ধ-পাঠে জানা গিয়াছে যে, তিনি ইদিলপুরের তাম্রশাসনখানির ছাপ-মাত্রই আনিতে পারিয়াছিলেন; মূল ফলকখণ্ড সত্বাধিকারীর নিকট হইতে কোনও প্রকারেই হস্তগত করিতে পারেন নাই। ব্যাখ্যা-কাহিনী। ইদিলপুর-শাসনের প্রতিগ্রহীতা ও উৎসৃষ্ট ভূমি পৃথক্। এই উভয় শাসনের লিপি-পংক্তিও সম-সংখ্যক নহে। শ্লোকাবলী যদি উভয়ত্র একরূপ হয়, তাহা হইলে, স্বর্গীয় গঙ্গামোহন ইদিলপুর-শাসনের শ্লোক-মর্ম্ম নিজ প্রবন্ধে যে ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাংশে শুদ্ধ হয় নাই। দানাদেশ-কারী রাজার নামোদ্ধারেও তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে। তিনি "শ্রীচন্দ্রদেব"কে "চন্দ্রদেব" বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান তাম্রশাসনে রাজার নাম "শ্রীচন্দ্র" বলিয়া তিনবার উল্লিখিত আছে,—এবং রাজার পিতা "ত্রৈলোক্যচন্দ্র," পিতামহ "সুবর্ণচন্দ্র" ও প্রপিতামহ "পূর্ণচন্দ্রে"র নামকরণ-প্রণালীর আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়,—রাজার নাম "চন্দ্রদেব" না হইয়া, অন্য কোনও শব্দ উপপদরূপে লইয়াই গঠিত হইয়া থাকিবে। এই তাম্রশাসনে যে সকল রাজপাদোপজীবীর নামোল্লেখ আছে, তাহাদের অধিকাংশের নিয়োগ "ভোজবর্ম্ম-দেবের বেলাব-লিপি" * ও "বল্লালসেন-

* সাহিত্য, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

দেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন"* শীর্ষক প্রবন্ধ-দ্বয়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বঙ্গ-রাজগণের প্রদত্ত তাম্রশাসনে উল্লিখিত অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণের নামের সহিত তিনটি নূতন নামও পাওয়া গিয়াছে,—তন্মধ্যে "মণ্ডল-পতি" ও "সর্ব্বাধিকৃত" ‡ শব্দদ্বয় "মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষে"র ‡ এবং "হরিবর্ম্ম-দেবের তাম্রশাসনে"ও ‡ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এবং "শৌল্কিক" শব্দটিও পাল-পৃথ্বীপালগণের তাম্রশাসনে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। যে স্থানে ভূমি উৎসৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে, সেই স্থানটির কোনও সন্ধান লাভ করিতে পারি নাই; এবং প্রতিগৃহীতার কোনও বংশধর অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন কি না, তাহাও অবগত হইতে পারি নাই। ব্যাখ্যা-কার্য্যে যেখানে অন্যান্য শাসনাদির সাহায্য লইয়াছি, তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই তাম্রশাসনের আয়তন ৯॥ × ৮ ইঞ্চ। ইহার শীর্ষদেশে [ মধ্যস্থলে ] একটি রাজ-মুদ্রা সংযুক্ত আছে। তন্মধ্যে "শ্রী-শ্রীচন্দ্রদেবঃ" এই নামটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। রাজার নামের উপর বৌদ্ধ-মত-বিজ্ঞাপক "ধর্ম্ম-চক্র-মুদ্রা"; ধর্ম্মচক্রের উভয় পার্শ্বে সমাসীন দুইটি মৃগ-মূর্ত্তি। রাজার নামের নিম্নভাগে, [ মধ্যস্থলে ] অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্ন;—তাহার উভয়-পার্শ্বে ও নিম্নভাগে ফুল পাতার সাজ। এই রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ছিল বলিয়াই, রাজকীয় মুদ্রায় অর্দ্ধচন্দ্রমূর্ত্তির লাঞ্ছন সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য, পাল-রাজগণের তাম্রশাসনেও উভয় পার্শ্বে মৃগ-মূর্ত্তি-লাঞ্ছিত এই প্রকার "ধর্ম্ম-চক্র-মুদ্রা" সংযুক্ত আছে।

লিপি-পরিচয়।

এই তাম্র-শাসনে প্রথম পৃষ্ঠায় ২৮ পংক্তিতে এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তিতে পদ্য-গদ্য-ময় সংস্কৃত-ভাষা-রচিত দান-লিপি উৎকীর্ণ আছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ১৩ পংক্তি পর্য্যন্ত আটটি শ্লোকে রাজ-কবি নিজ প্রভুর বংশ-বর্ণনা করিয়াছেন;—তৎপর ৩৪ পংক্তি পর্যন্ত লিপির গদ্যাংশ, এবং সর্ব্বশেষে ধর্ম্মানুশংসী শ্লোক-পঞ্চক। তাম্রশাসন-সম্পাদন সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লিখিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে,—রাজা [ "স্ব-হস্ত-কাল-সম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্" ] তাম্রশাসনে নিজ-স্বাক্ষর ও সন-তারিখ সংযুক্ত করিবেন;—কিন্তু তাম্রশাসনে সন তারিখ

* সাহিত্য, অগ্রহায়ণ সংখ্যা। ১৩১৮ সন

† সাহিত্য, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

‡ "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", দ্বিতীয় ভাগ, ২১৫ পৃষ্ঠা।

সন্নিবিষ্ট হয় নাই, এবং রাজার কিংবা তাঁহার কোনও প্রধান কর্ম্মচারীর স্বাক্ষরও ইহাতে সংযুক্ত দেখা যায় না। লিপিকরের ও শিল্পীর নামোল্লেখের অভাবও পরিদৃষ্ট হইতেছে। যে অক্ষরে এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রথম ভাগের বঙ্গাক্ষর বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুকৌশলে উৎকীর্ণ হইলেও, স্থানে স্থানে লিপিকরের বা শিল্পীর অনবধানতায় কিছু কিছু ভ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে। সেইগুলি যথাস্থানে প্রশস্তি-পাঠের পাদ-টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহ-চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, [ ৪র্থ, ২১, ৩১, পংক্তি ] কোনও কোনও স্থানে হয় নাই [ ১ম, ৭ম, ৩০শ পংক্তি ] রেফ-সংযোগে য, হ প্রভৃতি কতিপয় বর্ণ ভিন্ন প্রায় অনেক ব্যঞ্জন-বর্ণেরই দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন রামপাল নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া, ইহা "রামপাল-লিপি" নামে অভিহিত হইল।

লিপি-বিবরণ

বিক্রমপুর-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে, ধর্ম্মচক্র-মুদ্রা-সংযুক্ত এই তাম্র-শাসন সম্পাদিত করাইয়া, চন্দ্রবংশীয় পরম-সৌগত, মহারাজাধিরাজ শ্রীমত্রৈলোক্যচন্দ্র দেব-পাদানুধ্যাত, পরমেশ্বর, পরম-ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেব [ ১৫—১৬ পংক্তি ] মক্কর গুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহ গুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গল গুপ্তের পুত্র, শান্তি-বারিক পীতবাস গুপ্ত শর্ম্মাকে, [ ভগবান্ বুদ্ধ-ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া ] মাতা-পিতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত [ ২৬—৩১ পংক্তি ] সমস্ত রাজ-পাদোপজীবী ও অন্যান্য প্রজাবর্গকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, যাবচ্চন্দ্রসূর্য্য ও ক্ষিতি-সমকাল পর্য্যন্ত, যথাবিধি উদক-স্পর্শ-পূর্ব্বক পৌণ্ড্র-ভুক্তির অন্তঃপাতী নান্য-মণ্ডল-স্থিত নেহকাষ্ঠি গ্রামে পাটক-পরিমিত ভূমি দান করিয়াছিলেন।

এই নবাবিষ্কৃত তাম্র-শাসন হইতে আমরা কি কি ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহার কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্যক। লিপি-প্রারম্ভে [ প্রথম শ্লোকে ] রাজ-কবি, বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ—এই "ত্রিরত্নে"র—উল্লেখ করিয়া, রাজ-বংশের বৌদ্ধমতানুরক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বংশ-বিবৃতি-বিজ্ঞাপক দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, চন্দ্রবংশে পূর্ণচন্দ্র নামক কোনও সুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্র-বংশে জন্ম বলিয়া, এই অভিনব রাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় ছিলেন,—এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। পূর্ণচন্দ্র কোনও স্থানের রাজা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ নাই;

তিনি এক জন বীর-মাত্র ছিলেন; ইহাই দ্বিতীয় শ্লোকের আভাস। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্রের উৎপত্তি ও নামকরণ-কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র অশেষ-গুণ-বিভূষিত বলিয়া ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন। তিনি 'হরিকেল'-রাজলক্ষ্মীর আধার-রূপে চন্দ্রদ্বীপে 'নৃপতি' হইয়াছিলেন। এই 'হরিকেল' শব্দটি বঙ্গ-দেশেরই নামান্তর। "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়াঃ"—হেমচন্দ্রের এই বাক্যই ইহার প্রমাণ। বর্ত্তমান খুলনা, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের অংশ-বিশেষ লইয়াই সেকালের 'চন্দ্রদ্বীপ' দক্ষিণে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই স্থানই আবার পরবর্ত্তী কালে [মোগল-সাম্রাজ্যে] বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ নামেও কথিত হইয়াছিল। "দিগ্বিজয়-প্রকাশ-বিবৃতি" নামক গ্রন্থে বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপের ভৌগোলিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চন্দ্রদ্বীপের কুলীন কায়স্থ বলিয়া এক শ্রেণীর কায়স্থ এখনও কৌলীন্য-মর্য্যাদা লাভ করিতেছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীকাঞ্চনা-নাম্নী পত্নীর গর্ভে রাজ-যোগ-মুহূর্ত্তে শ্রীচন্দ্রের জন্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ভার্য্যাকে রাজকবি 'প্রিয়া' মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, 'মহিষী' বলেন নাই। এই কারণে এবং ত্রৈলোক্যচন্দ্রের 'নৃপতি'-মাত্র উপাধি-দর্শনে, মনে হয়,—তিনি কোনও প্রবল-পরাক্রম-শালী রাজাধিরাজের সামন্ত-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া, 'নৃপতি' উপাধী লইয়াই চন্দ্রদ্বীপ শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র ভবিষ্যতে 'রাজা' হইবেন, ইহাই জ্যোতিষিক-গণ তাঁহার জন্ম-সময়ে সূচিত করিয়াছিলেন। অষ্টম শ্লোকেও আমরা কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারি। এই শ্রীচন্দ্র সতত বিবুধ-মণ্ডল-পরিবেষ্টিত থাকিয়া, এবং দেশকে একচ্ছত্রাপিপত্রো বিভূষিত করিয়া, অরাতি-কুলকে কারা-নিবদ্ধ করিয়া, আত্মযশে দিঙ্‌মণ্ডল সৌরভযুক্ত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরস্থিত রাজধানী হইতে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। সর্ব্ব-বর্ণের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি,—সে কালের রাজগণ ইহা বুঝিতেন, নচেৎ বৌদ্ধ-নরপতি শ্রীচন্দ্র ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবেন কেন? বিক্রমপুরেই শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহাতে তিনি বঙ্গপতি ছিলেন, এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রই মধ্যযুগের বৌদ্ধ-নরপতি বলিয়া

কি না, তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় [ অন্য কোনও প্রমাণ না থাকায় ] নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

এখন জিজ্ঞাস্য—কোন্ সময়ে, কিরূপ ঘটনা-চক্রে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপে 'নৃপতি' হইয়াছিলেন,—কোন্ সময়ে, কিরূপ ঘটনাচক্রে, তৎপুত্র শ্রীচন্দ্র বঙ্গে রাজ্যস্থাপন করিয়া বিক্রমপুর হইতে শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন,—এবং কোন্ সময়ে, কিরূপ ঘটনাচক্রেই বা এই অভিনব চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ-নরপতির [ বা নরপতিগণের ? ] রাজ্যপতন সংঘটিত হইয়াছিল ? এই সকল প্রশ্ন ঐতিহাসিক সমস্যার আধার। লিপিকাল-বিচার ও সমসাময়িক অন্যান্য ঘটনার সমালোচনা করিয়া এই সমস্যার যথাযোগ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। অক্ষর-হিসাবে এই লিপির স্থান দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে। এই শাসনের 'ত', 'ন' ও 'ম' বর্ম্মবংশীয় ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব-লিপি ও হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট-ভবদেবের প্রশস্তির 'ত', 'ন' ও 'ম',এর অনুরূপ। কিন্তু আলোচ্য শাসনে 'প' এবং 'য' কিছু বেশী আধুনিক। 'র' বিজয় সেনদেবের দেবপাড়া-লিপির অনুরূপ। বেলাবলিপিতে ও ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তিতে অবগ্রহ-চিহ্ন আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু শ্রীচন্দ্রের শাসনে কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও কোনও স্থানে হয় নাই। এই সমস্ত কারণে, এই লিপির কাল যেন বর্ম্মরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পরে, এবং সেনরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; অর্থাৎ, সেনরাজ বিজয়সেনদেবের বিক্রম-পুর-অধিকারের পূর্ব্বে এবং বর্ম্মরাজ হরিবর্ম্মদেবের পুত্রের রাজ্য-নাশের পরেই কোনও সুযোগে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন-পূর্ব্বক কিছুকালের জন্য এক অভিনব বৌদ্ধ-রাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিক্রমপুরে যে সমস্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা মধ্য-যুগের এই কালেরই পরিচয় প্রদান করে। গত বৎসর বেলাব-লিপির সাহায্যে আমরা বিক্রমপুরে বর্ম্মরাজগণের অভ্যুত্থানের কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, ভোজবর্ম্মদেব এবং তৎপরবর্ত্তী বর্ম্মরাজগণ শেষ-পাল-রাজগণের সময়েই বিক্রমপুর হইতে বঙ্গে রাজ্য-শাসন করিতেন। এ দিকে দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রথম-ভাগে রামপাল-দেবের তনুত্যাগের পর, তৎপুত্র * কুমারপাল-দেব বরেন্দ্র-ভূমিতে [ রামাবতী-নগর হইতে ] রাজ্য

শাসন করিতেছিলেন। কুমার-পালদেবের সময় হইতেই পাল-সাম্রাজ্যের বন্ধন বিঘট্টিত হইয়া আসিতেছিল। কুমারপালদেবের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁহার সচিব ও সেনাপতি বৈদ্যদেব। এই সময়ে রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, বৈদ্যদেবই "অনুত্তর-বঙ্গে" অর্থাৎ দক্ষিণ-বঙ্গে, নৌ-বল লইয়া বিদ্রোহ-দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক তথ্য আমরা তদীয় [ কমৌলিতে প্রাপ্ত ] * তাম্রশাসনে উল্লিখিত দেখিতে পাই। বৈদ্যদেব কর্ত্তৃক এই দক্ষিণ-বঙ্গের বিদ্রোহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইলেই হয় ত পাল-রাজ সর্ব্ব-গুণ-বিমণ্ডিত বৌদ্ধ ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, চন্দ্র-দ্বীপের সামন্ত-রূপে নিযুক্ত করিয়া, 'নৃপতি' উপাধিতে বিভূষিত করিয়া থাকিবেন। এই বিদ্রোহসময়েই হয় ত চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গ-রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; এবং এই সময় হইতেই হয় ত বর্ম্মরাজগণের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজকবি ত্রৈলোক্য-চন্দ্রকে হরিকেল-(বঙ্গ)-রাজলক্ষ্মীর আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়েই ভট্ট-ভবদেব-মন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত হরিবর্ম্মা বা তদাত্মজ [ অজ্ঞাত-নামা রাজার ] অধিকার হইতে বঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ হস্তচ্যুত হইয়াছে। তৎপর বৈদ্যদেব যেমন † কামরূপে তিগ্মদেবকে সিংহাসন-ভ্রষ্ট করিয়া স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপ, বোধ হয়, পালরাজগণের ও বর্ম্মরাজগণের দুর্ব্বলাবস্থা অবলোকন করিয়া, ত্রৈলোক্যচন্দ্র-পুত্র শ্রীচন্দ্রও বর্ম্মবংশীয় শেষ নরপতিকে কোনও কারণে সিংহাসন-ভ্রষ্ট করিয়া, স্বয়ং 'পরমেশ্বর-পরমভট্টারক মহারাজা-ধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গে সার্ব্বভৌম নরপতি সাজিয়া বসিয়াছিলেন অথবা, বর্ম্মরাজ্য অন্য কোনও কারণে উন্মূলিত হইলে, শ্রীচন্দ্রই বঙ্গে একচ্ছত্রা-ধিপত্য বিস্তৃত করিয়া, শত্রুকুলকে কারানিবদ্ধ করিয়া, বিক্রমপুর হইতে শাসন-পরিচালন করিয়াছিলেন। আলোচ্য শাসনের অষ্টম-শ্লোকে এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্য ইঙ্গিতে সূচিত হইয়া থাকিবে। অপর দিকে এই সময়েই বিজয়সেন পাল-সাম্রাজ্যের দুরবস্থা ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া, বরেন্দ্রীতে রাজ্য পাতিবার উপক্রম করিতেছিলেন; এবং পরে এই বিজয়সেন কর্ত্তৃকই হয় ত বৌদ্ধ-শ্রীচন্দ্রের সংস্থাপিত রাজ্যের বিনাশ সাধিত হইয়া থাকিবে। বিজয়সেন যে বিক্রমপুরের রাজধানী হইতে দানাদেশ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ বিশ্ব-

* গৌড়-লেখমালা—১৩০ পৃষ্ঠা। † গৌড়-লেখমালা, ১৩১ পৃষ্ঠা।

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয় এক প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। লিপিখানি বিজয়সেনদেবের একত্রিংশ বর্ষীয় লিপি বলিয়া শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যখন বরেন্দ্রীতে কুমার-পালদেব এবং বঙ্গে হরিবর্ম্মদেব ও তদীয় পুত্র সিংহাসনারূঢ় ছিলেন এবং বিজয়সেন গৌড়ে রাজ্যস্থাপনের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, এবং কুমার-পালদেবের দক্ষিণ-বাহু-রূপী প্রধান সচিব বৈদ্যদেব তিগ্মদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কামরূপে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখনই চন্দ্রদ্বীপ-নৃপতি ত্রৈলোক্য-চন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্রও বর্ম্মরাজকে বিতাড়িত করিয়া, অথবা অন্য কারণে বর্ম্ম-রাজের নাশ ঘটিলে পর, বঙ্গে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিক্রমপুর-রাজধানী হইতে দেশ-শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বাংশে সমর্থিত হইবে কি না, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে না। যত চিদন অনুকূল ও প্রবল প্রমাণ প্রাপ্ত না হওয়া যাইবে, ততদিন এই ভাবে অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত প্রচারিত না করিয়া উপায় নাই। পরবর্ত্তী প্রমাণ-বলে পূর্ব্ববর্ত্তী এইরূপ সিদ্ধান্তনিচয় পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবেই।

ক্রমশঃ।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

---

# উদ্ভিদের রহস্য।

'উদ্যানের রঙ্গ' প্রস্তাবে দেখাইয়াছি,—মানুষের কৌশলে ও চেষ্টায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলন-ফুলন কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখিব,—উদ্ভিদগণ আপনা হইতে কি উপায়ে নূতন জাতির সৃষ্টি করে। বিশিষ্ট জাতীয় উদ্ভিদের বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মানুষ কৌশলক্রমে গাছের কলম বাহির করিয়া লয়। এতদ্দ্বারা গাছের স্বকীয় পৈতৃকতা সংরক্ষিত হয়। আঁটী বা বীজ পুতিয়া চারা উৎপন্ন করিলে অনেক স্থলে সেই সকল চারা পৈতৃকতা হারাইয়া ফেলে। তাহার কারণ পরে বলিব। সচরাচর দেশবিশেষের আবহাওয়া ও মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বা উপকরণের ভেদে, কিংবা পাট-পরিচর্য্যার

সেই বৈষম্য হেতু উদ্ভিদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে কোষাণুরাশি (cells) থাকে, তাহাদিগের আকার ও কার্য্যপ্রণালীতে একটা বিপ্লব সংঘটিত হয়, ইহা আমরা সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারি। যে সকল কারণে উদ্ভিদের শরীরে এইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, সেই সকল কারণেই নবজাত উদ্ভিদ নূতন দেশে ও নূতন মৃত্তিকায় নিজের উপযোগী, প্রয়োজন ও পরিমাণ মত সমস্ত আহার্য্য হয় ত পায় না, অথবা কোনও কোনও জিনিস অধিক, কোনও কোনও জিনিস অল্প পায়। আবার হয় ত কোনও কোনও জিনিস আদৌ পায় না, পক্ষান্তরে হয় ত কোনও অপূর্ব্ব জিনিসও পাইয়া থাকে। এই জন্য উদ্ভিদান্তর্গত কোষাণুগণ স্ফীত বা আকুঞ্চিত হইতে পারে, ভূমি বা আকাশ হইতে কোনও পদার্থ অধিক বা অল্প-পরিমাণেও পাইতে পারে, আবার হয় ত কোনও আবশ্যক পদার্থের আহরণে অক্ষমও হইতে পারে। এই সকল ও আনুষঙ্গিক কারণে ফলপুষ্পেও যে বৈষম্য ঘটিবে, সে বিষয়ে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। যদি, এইরূপে বিভিন্ন-অবস্থাপন্ন চারা পৈতৃক ধর্ম্ম হইতে দূরে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে উদ্ভিদের পুষ্পমধ্যবর্ত্তী জননেন্দ্রিয়ে একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা সুতরাং তাহা হইতে জাত বীজ স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে না পারিয়া পৈতৃক ধর্ম্ম হইতে অল্পাধিক ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। আর যে চারার কথা বলিয়াছি, তাহাতেও বিভিন্ন প্রকারের ফল জন্মিবে,—ইহা অনেকটা নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারা যায়। কিন্তু ইহাতে বীজের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব নষ্ট না হইতে পারে। আর একটি কথা বলিয়া রাখি যে, কলম নানা প্রকারের আছে। কলমের দ্বারা সংখ্যা-বৃদ্ধি—কৃত্রিম প্রণালী; বীজ হইতে চারার উৎপাদনই স্বাভাবিক প্রণালী। কলম বাঁধিয়া যে সকল চারা উৎপন্ন করা যায়, প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে চারা না বলিয়া 'বিভক্ত-উদ্ভিদ' বা 'খণ্ডিত-উদ্ভিদ' বলিলেই সঙ্গত হয়। বাস্তবিক কলমের গাছ তাহা ভিন্ন আর কি? খণ্ডিত বলিয়াই ইহারা আসল গাছ (mother plant) হইতে নিজ নিজ বয়সের জের টানিয়া অল্প কালের মধ্যে ফল-ফুল প্রদান করিতে পারে; কিন্তু বীজ-জাত চারা তাহা পারে না। কারণ, বীজের অঙ্কুরোদ্গমের কাল হইতেই তাহার জন্মতিথি বা বয়সের নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই জন্য আমরা কলমের চারায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই ফল-ফুল দেখিতে পাই; উহাদিগকে রোপণ করিবার পর বৎসর, অথবা তৎপর বৎসর হইতেই তাহাদিগের অঙ্গে ফল-ফুলের শোভা দেখিয়া আনন্দে বিভোর হই। একটা দৃষ্টান্ত দিই। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন,—আম, লিচু বা লেবুর সদ্যোবদ্ধ বা

টাট্‌কা কলমে মুকুল বা ফল থাকে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় আদৌ নাই। ইহারা খণ্ডিত শাখামাত্র, এবং আসল গাছের বয়স ও শক্তির প্রভাবে ফলবান হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও হইবে। কিন্তু ইহারা বীজ-জাত চারার ন্যায় দীর্ঘজীবী হয় না। সুতরাং ইহাদিগের নিকট হইতে বীজ-জাত গাছের মত অধিক দিন ফল-ফুলের আশা করা যায় না। কেবল তাহাই নহে, বীজ-জাত গাছ যেরূপ সতেজ ও শাখাপল্লবী হয়, কলমের চারা তাহা হয় না। তবুও বীজের চারার একটা বিশেষত্ব আছে। সে কথাটা প্রসঙ্গক্রমে পরে আসিয়া পড়িবে। জীব হউক, বা উদ্ভিদ হউক, সকলেই স্ব স্ব বংশ বর্দ্ধিত করিবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। মানুষ হইতে মানুষই জন্মে; শৃগাল, কুকুর, বা বনমানুষ জন্মে না; এ সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। তবে যে কোনও কোনও স্থলে বিকৃত সন্তান জন্মে, তাহাকে Freaks of nature অর্থাৎ প্রকৃতির উদ্ভটতা বা প্রকৃতির রঙ্গ ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

অনেক স্থলে মানবসন্তানে পিতামাতার আকার বর্ণ গুণাগুণ উপেক্ষিত হইয়া তদূর্দ্ধ পিতৃপুরুষদিগের সমগ্র বা কতকগুলি গুণাগুণ প্রকাশ পায়। ইহাকে স্ববংশীয় বিবর্ত্তন বলিতে পারা যায়।

এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে গেলে ডারউইন প্রমুখ প্রতীচ্য বৈজিক-তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদিগের মতের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাহা অপ্রাসঙ্গিক। যাহা হউক, সহজজ্ঞানে ইহা আমরা বুঝিতে পারি যে, পিতৃপক্ষ ও মাতৃপক্ষ শারীরিক ও প্রাকৃতিক-উভয় বিষয়ে সমতুল্য হইলে, অপত্যে প্রায় কোনও স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় না; আর যদি কিছু দেখা যায়, তাহা পিতৃমাতৃ পক্ষের উচ্চতর স্থান হইতে নিম্নতর-বংশীয়গণ মধ্যে অকস্মাৎ বিকাশের ফলমাত্র। এই জন্যই ত আমরা উদ্বাহের জন্য উচ্চ বা ঘরোয়ানা বংশের অন্বেষণ করি। এক পুরুষের উচ্চতায় বা নিম্নতায় কোনও বংশ মহান্ বা হীন হয় না। আবার, এক-পুরুষ-সম্পর্কীয় ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। সেই জন্য যাহাতে পুরুষানুক্রমে বংশে উচ্চবংশের শোণিত সংক্রান্ত হয়, সে বিষয়ে হিন্দু-সমাজ আবহমানকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছে। এই কারণেই



উৎকণ্ঠিতা।

চিত্রকর—লর্ড লেটন।

Block and Printed by the Mohila Press, Calcutta.

ও সমাজগত 'নিজত্ব' অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছি,—রাশির মধ্যে মিশিয়া যাই নাই। পারিপার্শ্বিক কারণে চৈতন্যরূপী জীবাত্মা কখনও বিকাশ পায়, আবার কখনও তমসাচ্ছাদিতভাবে অবস্থান করে। পশু-পালক ও ঔদ্যানিকগণ এ তত্ত্ব বিশেষ বুঝেন। তাঁহারা ইহাও জানেন যে, কোনও রূপে একটি সঙ্কর-বৎস উৎপন্ন হইলে তাহা স্থায়ী হয় না; তবে সেই সঙ্করতাকে বজায় রাখিবার জন্য, সেই সঙ্করবৎসে পুনরায় বিভিন্ন শোণিতের সমাবেশ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপে দুই তিন পুরুষ অতিক্রান্ত হইলে, তবে তাহাকে একটা স্বতন্ত্র জাতি-পর্য্যায়ে পরিণত করা যায়। এরূপ দেখিয়াছি— কতকগুলি বীজ বপন করা গেল; যথাসময়ে চারা জন্মিল; কিন্তু তাহা-দিগের মধ্যে হয় ত একটি অপরাপর চারা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইল। বিচক্ষণ উদ্যানক সেই বিশিষ্ট চারাটিকে স্বতন্ত্র করিয়া স্বতন্ত্রভাবে তাহার লালনপালন করেন, এবং যত শীঘ্র সম্ভব, তাহা হইতে দুই চারিটি কলম বাহির করিয়া লয়েন। কলম বাহির করিয়া লইবার পর ভেদপ্রাপ্ত আসল চারাটির দশা যাহাই হউক, এই কলমটির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইবার বড় অধিক আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু যতদিন সেই চারা বা কলমের বীজ হইতে অন্য চারা উৎপন্ন না হয়, ততদিন তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় না।

এক্ষণে আমরা দেখিব যে, একই উদ্ভিদ-জাত বহু বীজের মধ্যে কোনও কোনটি হইতে বিভিন্ন গাছ জন্মে কেন, কিংবা কোনও গাছের ফল বা ফুলের গড়ন, বর্ণ, আকার, স্বাদ প্রভৃতিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় কেন? গৃহপালিত পশুপক্ষীর জীবোৎপাদনচেষ্টা মানব পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে। সুতরাং আমরা জানিতে পারি, কোন্ গাভী কোন্ বৃষের সহিত, অথবা কোন্ কপোত কোন্ কপোতীর সহিত সম্মিলিত হইল, এবং সেই সম্মিলনের ফলে, কিরূপ অপত্য উৎপন্ন হইবে, তাহাও আমরা পূর্ব্বেই কতকটা নির্দ্দেশ করিতে পারি। কিন্তু উদ্ভিদের গর্ভসঞ্চার সম্বন্ধে আমরা আজি পর্য্যন্ত বুঝিবার কোনও উপায় পাই নাই। উদ্ভিদ-জগতে কোন্ পুষ্পের সহিত কোন্ পুষ্পের, অথবা কোন্ উদ্ভিদের পুষ্পের সহিত কোন্ উদ্ভিদের পুষ্পের যৌন-সংঘটন হয়, তাহা আমরা জানি না। তবে ইহা আমরা জ্ঞাত আছি যে, পুংপুষ্পের রেণু বা পরাগ স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভাশয়ে সঞ্চারিত হইলে স্ত্রী-পুষ্প গর্ভধারণ করে। এটুকু জানা থাকিলেও, ইহার অন্তর্গত গুহ্য রহস্যটুকু জানা

হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দি। একটি বাগানে দুই দশটি বা বিশ-পঞ্চাশটি আম্র বৃক্ষ আছে। বসন্তকাল,—বৃক্ষরাজি মুকুলিত হইয়াছে। পুষ্পের সৌরভে চারিদিক আমোদিত। রাশি রাশি মক্ষিকা দলে দলে আসিয়া পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিতেছে; আবার এক বৃক্ষ হইতে উড়িয়া অপর বৃক্ষের পুষ্পে পূর্ব্ববৎ চুমুক দিতেছে; সেই সঙ্গে তাহার ষট্‌পদ পরাগে রঞ্জিত হইতেছে, এবং সেই পরাগ আবার বিভিন্ন পুষ্পে নীত হইতেছে। প্রবল বাতাসেও অগণিত পরাগরাশি স্থানীয় বায়ুমণ্ডলে ভাসিতে ভাসিতে যথা তথা পতিত হইতেছে। পরাগ-সঞ্চালন ব্যাপারে মক্ষিকা বা সমীরণের ইচ্ছাপ্রসূত কোনও ক্রিয়া নাই। সুতরাং পরাগগুলির কে কোথায় গিয়া পড়িতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? হয় ত কতক ভূপৃষ্ঠে বা নিকটস্থ ডোবায় কিংবা পুষ্করিণীতে বা নদী-নালায়, হয় ত বা কতক গাছপালার শাখায় পাতায়, গিয়া স্থান পাইতেছে; সেই সঙ্গে কতক স্ত্রীপুষ্পেও পড়িতেছে। চিরদিন ইহাই হইয়া আসিতেছে, এবং তাহাতেই মনে হয় যে, এই অনিশ্চয়তার মধ্যে নিশ্চিতই কিছু নিশ্চয়তা আছে। সমীরণ-বিতাড়িত বা মক্ষিকা বাহিত যে রেণুকণা দ্বারা স্ত্রীপুষ্পের গর্ভসঞ্চার হয়, সে রেণুকণা কোন্ গাছের, তাহা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। অথচ পুষ্পের গর্ভসঞ্চার হইল; ক্রমে বীজ জন্মিল। এই বীজ হইতে যে উদ্ভিদ জন্মিবে, তাহার মাতৃত্বগুণ-( maternal attributes )-সম্পন্ন হইবার যেরূপ সম্ভাবনা, না হইবারও সেইরূপ সম্ভাবনা। ফজ্‌লীর বীজজাত বৃক্ষ হইতে ঠিক ফজ্‌লী আম্র জন্মিবে কি না, এই জন্য তাহাতে সন্দেহ থাকে। ফজ্‌লীর গর্ভে লেংড়া বা ভূতো-বোম্বাই গাছের পরাগ আসিয়া পড়িবার পর ফজ্‌লীর ফলে কোনও বৈষম্য ঘটে না বটে, কিন্তু তাহার আঁটীর মধ্যে যে ভ্রূণ থাকে, তাহার প্রকৃতি যে উভপ্রকৃতিক হইবে, এবং তজ্জাত বৃক্ষ ও ফল তদনুরূপ উভ-প্রকৃতির হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। এইরূপে এক একটি জাতি ( Species ) হইতে অনেক অনেক 'রকম' ( variety ) উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা অনেক রকমের আম্র দেখিতে পাই। সেই সকল 'রকম' যে প্রথম সৃষ্টি-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা নহে। বিভিন্ন রকমের আম গাছের পরস্পর সম্মিলনের ফলই এই বৈচিত্র্যের মূল কারণ। আমাদিগের দেশে কৃষি বা উদ্যানবিষয়ে লোকের যত্ন বা উৎসাহ না থাকাতেই ফলফুল তরি-তরকারী প্রভৃতির এক এক 'জাতি'র বহু 'প্রকার' বড় একটা দেখা যায়

না। একটু চেষ্টা করিলে আমরা অনায়াসে এক এক জাতি হইতে বহু রকমের ফলফুল বা তরিতরকারী বা মেঠো ফসল উৎপন্ন করিতে পারি। ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে হইলে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন; (১) সূক্ষ্মদৃষ্টি, (২) তিতিক্ষা।

জাতি হইতে 'রকমে'র সংখ্যা বৰ্দ্ধিত করিবার অন্যতম উপায়—বীজ-নির্ব্বাচন। ইহা এত সহজ, তথাপি আমাদিগের উদাসীনতা হেতু কত নূতন জিনিস আমরা প্রতি বৎসর হারাইয়া ফেলিতেছি। একই গাছের সকল ফলই যে সমপ্রকারের হয়, তাহা নহে। তীক্ষ্নদৃষ্টিসহকারে দেখিলে, তাহাদিগের মধ্যে অল্পাধিক বৈষম্য বুঝিতে পারি। অতঃপর ইহাও দেখিতে পাই, একই ক্ষেতে ২০।২৫টী—মনে করা যাউক—বেগুন গাছ আছে। যথানিয়মে তাহাদিগের পরিচর্য্যা করা যাইতেছে। অথচ কতকগুলি গাছ-আকার বা বৃদ্ধিতে অপরাপর গাছ হইতে অল্পাধিক স্বতন্ত্র, আবার কোনও কোনও গাছের ফলের আকার বা গড়ন স্বতন্ত্র হইয়াছে। সাধারণ বৃক্ষ-সমূহ হইতে এইরূপ স্বতন্ত্রতা-প্রাপ্ত গাছগুলিকে, অন্য গাছের স্বতন্ত্রতাপ্রাপ্ত ফলগুলিকে চিহ্নিত করিয়া, বিশেষ যত্নসহকারে পাট-পরিচর্য্যা করিলে, যথাসময়ে ফলগুলি পাকিয়া উঠিবে। তখন ফলগুলিকে সংগ্রহ করিয়া বীজ বাহির করিয়া লইতে হয়। পরে বীজগুলিকে স্বতন্ত্র রাখিয়া পরবর্ত্তী ঋতুতে সেই নির্ব্বাচিত বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিলে, সেই বীজজাত বৃক্ষসমূহে যে ফল ফলিবে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী গাছের ফলের সদৃশ হইবে, ইহাই বিশেষ সম্ভব। এই ত গেল বাহ্যআকৃতি অনুসারে নির্ব্বাচন। স্বতন্ত্রীকৃত ফলগুলির গুণাগুণ পরীক্ষা করাও আবশ্যক। কারণ, কেবল আকৃতিতে সকল আশা মিটে না। এক্ষণে ফল হইতে বীজ পৃথক করিবার কালে ফলগুলিকে কাটিতে হয়। এই সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও ফল সমধিক শাঁসাল, অপেক্ষাকৃত অল্প-বীজ, ছাল-পাতলা ইত্যাদি। অতঃপর কৰ্ত্তিত ফল হইতে ছাল-পাতলা, অল্পবীজ ও শাঁসাল ফলের বীজ-গুলিকে যত্নসহকারে পৃথক করিয়া শুকাইয়া স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিতে হয়। পরবর্ত্তী আবাদকালে সেই বীজ হইতে গাছ উৎপন্ন করিলে অপেক্ষাকৃত উত্তম ফল জন্মিবে, ইহা নিশ্চিত।

ইউরোপ ও যুক্তরাজ্যের অনেক বীজের ব্যাপারী ও উদ্ভিদের ব্যবসায়ী

ফলফুলাদির নূতন নূতন 'রকম' উৎপন্ন করিয়া রাশি রাশি অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। ব্যবসায় হিসাবে ইহাকে ব্যক্তিগত লাভ বলিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা ব্যতীত তাঁহারা প্রতি বৎসর নূতন নূতন জিনিসের প্রবর্ত্তন করিয়া জগতের অশেষ কল্যানবিধান করিতেছেন, এবং এই জন্য সমগ্র মানব জাতি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বীজ-বপন ও কলম দ্বারা উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এতদুভয়বিধ গাছে অনেক বিষয়ে প্রভেদ ঘটে। বীজজাত চারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়তন হয়, অপেক্ষাকৃত বিলম্বে ফলফুল প্রদান করে, কিন্তু অধিক ফল দেয়, এবং দীর্ঘকাল ফল দেয়। এ সকল সত্ত্বেও বীজের গাছে একটা ভয় বা সন্দেহ থাকে যে, যে গাছের ফল, সে গাছের মতন ফলফুল প্রদান করিবে কি না? কতকগুলি ফলফুলের গাছে,—আম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি কতকগুলি ফলবৃক্ষের ও গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের—বীজের চারায় সে সন্দেহ বড়ই থাকে। এই জন্য এ সকল ফলের ও ফুলের গাছের কলমই লোকে রোপণ করে। কলমের চারায় সে আশঙ্কা থাকে না। কলমের চারায় শীঘ্র ফল দেখা দেয়। কেন এরূপ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহারা খণ্ডিত-উদ্ভিদ বলিয়া দৈর্ঘ্যে বেশী উচ্চ হয় না; কারণ, ইহারা নিজেই উদ্ভিদের এক একটি অঙ্গমাত্র। উক্ত খণ্ডিত অংশ হইতে শাখা প্রশাখা উদ্গত হয়; মূলকাণ্ড তাদৃশ স্থূল, সরল বা দীর্ঘ হয় না। বীজের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল; তদ্ব্যতীত বীজের চারা মৃত্তিকা ও আবহাওয়ার ইতরবিশেষে পৈতৃকতা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে; সময়ে সময়ে নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়। কলমের গাছ অন্য চারার অঙ্গে দণ্ডায়মান থাকে, মাটীর বা আবহাওয়ার সহিত তাহার কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

---

# উলা বা বীরনগর।

১

১৮৪৬ সালের ২৭ শে অগ্রহায়ণ চুঁচুড়ার বাটীতে আমার জন্ম হয়। সেই সালের ২৬ শে মে হইতে পিতৃদেব কৃষ্ণনগরে কর্ম্ম করিতেছিলেন। ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুন হইতে, তিনি উলার মুনসেফ হন। তখন উলায় মুন্‌সেফি আদালত ছিল। এখন সেই মুন্‌সেফিই রাণাঘাটে আছে। ১৮৫০ সালের মাঘ মাসেই আমরা উলায় যাই; অর্থাৎ পিতৃদেব উলায় পরিবার লইয়া যান। তাহার পর প্রতি বৎসরই আমরা চারি মাস চুঁচুড়ায় এবং আট মাস উলায় থাকিতাম। ১৮৫৬ সালে উলায় মহামারী পড়িল; ঠিক পূজার পূর্ব্বেই। সেইবার হইতে আর আমরা উলা বা রাণাঘাট যাই নাই। আমার বাল্যকালের ৭ বৎসর ঐ ভাবে উলায় কাটে অর্থাৎ প্রতিবৎসর ৭।৮ মাস করিয়া থাকিতাম। বাল্য অনুরাগবশত উলার উপর খানিকটা মমতা ছিল বা আছে।

পূরা দশ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই উলা ছাড়িয়া আসি, আর এই গত বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ৫৬ বৎসর পরে উলায় গিয়াছিলাম; বুঝুন আমার মমতার টান!! রাণাঘাটের শ্রীমান্ কুমুদনাথ মল্লিকের সহিত আজ কয় বৎসর যাবৎ আলাপ না হইলে, আর এবৎসর তিনি ঐ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ না দেখাইলে, বোধ হয় তাহাও হইত না! এই ৫৬ বৎসরের মাঝামাঝি অর্থাৎ ২৭।২৮ বৎসর পূর্ব্বে পিতৃদেব বৈশাখী পূর্ণিমায় একবার উলায় গিয়াছিলেন, আমি তখন যাইতে পারি নাই—উলার অবস্থা শুনিয়াছিলাম—এখন তাহা হইতেও হীনাবস্থা।

এই ৫৬ বৎসর উলায় একবারও যাই নাই, তা বলিয়া উলা দেখিবার ইচ্ছা ছিল না, এমন কথা বলি না; তবে এতকাল "অজরামরবৎ" মনে করিয়াই চলিয়াছিলাম, এখন বয়সের দোষে বা গুণে "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা" ভাবিয়া ধর্ম্মমাচরেৎ মত করিতে হইল।

এই দীর্ঘকাল উলার অধিবাসিগণের সহিত আমরা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়াছিলাম। গুটিকতক ভদ্রলোকের সহিত বেশ আত্মীয়তাই ছিল। উলার দুর্দ্দশার কথা প্রায়ই শুনিতাম। মহামারীতে উলা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, এটা ইতিহাসের কথা হইয়াছে। ইতিহাসের সহিত কিশোর বয়সে আমি কাব্য মিশাইয়াছিলাম। কাব্য আবার ইংরাজি কাব্য!

বিধির বিধানে ক্রমাগত তিন বৎসর ১৮৬০, ১৮৬১, ১৮৬২ সাল কবি গোল্‌ড্‌স্মিথের 'পরিত্যক্ত পল্লী' আমাদের পাঠ্য ছিল। কাজেই সমুদায় কাব্য আমার মুখস্থ হইয়াছিল। উলার কথা পড়িলেই--

Seats of my youth, when every sport could please,
* * *
These were thy charms —but all these charms are fled.
* * *
Near yonder copse, where once the garden smiled,
And still where many a garden fl ower grows wild.

—এই সকল পদ্য আওড়াইতাম। আর কত কি মাথামুণ্ড ভাবিতাম, তাহা এখন মনেও আনিতে পারি না। একবার রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর যাইবার হাঁটা পথে কামগাছীর মাঠে, আর একবার রেলপথে উলা ষ্টেশন হইয়া দেবগ্রাম যাইতে মনে বিষাদ বা প্রসাদ প্রবল হইয়াছিল তাহা ঠিক বলিতে পারি না- বিধ্বস্ত গ্রামের কথা ভাবিতে গেলে বিষাদ ত আসিতেই পারে, কিন্তু 'ওই গো আমার সেই উলা ছুঁইয়া যাইতেছি',—এ কথাতে একটু প্রসাদও যে আসে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না।

মহামারীর পূর্ব্বে অর্থাৎ বাট বৎসর পূর্ব্বে উলা অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন সভ্য জনপদ ছিল। তেমন সমৃদ্ধিসম্পন্ন পল্লীগ্রাম আমি আর কোথাও দেখি নাই। সমৃদ্ধি বলিতে যে খুব গাড়ী-ঘোড়ার আড়ম্বর, তাহা নহে ক্রিয়া-কর্ম্ম, গান বাজনা, আনন্দ উৎসবে ভোরপুর ছিল। আর লোকসংখ্যা বিপুল—বাঙ্গলার একটি পল্লীগ্রামে পঞ্চাশ হাজার লোক—সে কি কম কথা! আর সেই লোকই বা কিরূপ! কুলি-মজুর নহে—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী।

"উলার বামনদাস (মুখোপাধ্যায়) বাবুর তখন প্রবল প্রতাপ। প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। তিনি স্বয়ং অতিশয় ক্রিয়াবান্ পুরুষ ছিলেন। তেমন ক্রিয়াবান্ লোক এখন আর নাই। বার মাসে তের পার্ব্বণ এবং নিত্য নিয়মিত অতিথিশালাও ছিল। স্নানযাত্রা, রথ ও জগদ্ধাত্রী-পূজায় মহা ধূমধাম হইত। রথের আট দিন দিবারাত্র এক দিকে নাচ গাওনা যাত্রা কবি হইত, অন্য দিকে সেইরূপ মধ্যাহ্ন হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত দীয়তাং ভুজ্যতাম্ শব্দে ভূরি ভোজন চলিত। স্নানযাত্রার সময় সত্য সত্যই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় হইতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সমাগম হইত। তখন রেল হয় নাই, ষ্টীমার চলাচল

ছিল না; সেই সময়ে দূরদেশাগত এক এক জন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের জন্য কত যে পাথেয় ব্যয় হইত, তাহা অনুমান করাও দুঃসাধ্য।"

শান্তিপুরের মতিবাবু নাকি উত্তরসাধক হইয়া বামনদাস বাবুর বিরুদ্ধে একটি ঘরোয়া মোকদ্দামা বাধান; প্রিবিকৌন্সিল পর্য্যন্ত গড়ায়। সেই মোকদ্দামা 'জিত' হইবার যেদিন সংবাদ আসিল, সেই দিন উলাবাসীর উল্লাস দেখে কে? সমস্ত গ্রাম হলহলায় পূর্ণ; সকল বাড়ীতেই সিধা আসিল, আর রাত্রিতে বোমফাটার শব্দে উলা কম্পিত এবং ধধুপের আলোয় সমস্ত গ্রাম উজ্জ্বলীকৃত।

বহুপূর্ব্ব হইতেই উলায় সংস্কৃতচর্চ্চা, স্মৃতি-দর্শনের চর্চ্চা ছিল; আর অনেকগুলি পাঠশালা ছিল। বাঙ্গলায় আবার সমাস-কারক শিখাইতে হয়, তখন লোকের সে জ্ঞান সবেমাত্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পিতৃদেব গ্রামমধ্যে বিশেষ চেষ্টা করিয়া এবং কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্য লইয়া, তিনটি পাড়ায় তিনটি বাঙ্গালা স্কুল ও মাঝের পাড়ায় উপরন্তু একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠাপিত করেন। প্রায় ৬ শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত। হরিসঙ্কীর্ত্তন, সাধারণ সঙ্গীত এবং কালোয়াতি গানের চর্চ্চাও বিশেষ ছিল। আমি যখন ছিলাম, তখন প্রসিদ্ধ গানবিলাস মহাশয়ের পুত্র হরচন্দ্র বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। দুই জন ব্রজ মুখোপাধ্যায় পাখোয়াজি ছিলেন। ভাল ঢুলী ছিল, ভাল সানাইদার ছিল। বোধ হয়, তাহাদের নাম দীনে ও তিনকড়ি হইবে। ভাল চিত্রকর ছিল, তাহাদের হাতের চিত্র এখনও আমাদের বাড়ীতে আছে। তাহারা উত্তম পুত্তলিকাও তৈয়ার করিত। উলার আচার্য্যদের ডাকের সাজ প্রসিদ্ধ। ঠাকুর-গড়া কুমার খুব উত্তমই ছিল—বার-ইয়ারির ঠাকুরগুলি কলা-বিদ্যার চূড়ান্ত নিদর্শন। কাঁসারীরা বাসন তৈয়ার করিত, তাহারা দক্ষিণপাড়ায় থাকিত বলিয়া ভালরূপেই জানিতাম। উত্তম ময়রা ছিল; ভাল সন্দেশ হইত। সন্দেশের ঠোঙ্গায় ঘি গড়াইত। তরিতরকারী সমস্তই সুলভ; উত্তম ঘৃত সুলভে মিলিত।

পূর্ব্বে গঙ্গার খাদ উলার নীচেই ছিল, বর্ষায় সেই খাদে জল আসিয়া উলার তিন দিক প্লাবিত করিত। বৈকালে রাস্তার ধারে তিন চারি শত লোক ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিত; সেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! যে মুহূর্ত্তে যাইবে, তখনই দেখিবে, দশটা পাঁচটা ছিপে মাছ গাঁথিয়াছে।

সেকালের উলার কথা লিখিতে আমার শ্রান্তি বোধ হয় না; কিন্তু পাঠকের ত বিরক্তি আছে, কাজেই অদ্য আমাকে এইখানে থামিতে হইল।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

---

# ত্রয়োদশ শতাব্দে পশ্চিম কামরূপ।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের প্রাক্‌কালে মুসলমান তুরুষ্কগণ কর্ত্তৃক রাঢ় ও বরেন্দ্র-অধিকার, এবং তাহার কিয়ৎকাল পরে আহোমগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোত্তর কামরূপ-(এখনকার আসাম)-অধিকার। সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দের সূত্রপাত হইতেই পশ্চিম কামরূপের (জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর ও গোয়ালপাড়া জেলার) অধিবাসিগণকে তুইটি প্রবল পরাক্রান্ত পররাষ্ট্রলোলুপ প্রতিবেশীর সান্নিধ্যে বাস করিতে হইয়াছে। কিন্তু তুই দিকে এইরূপ তুইটি প্রবল শত্রুর সদা সম্মুখীন রহিয়াও পশ্চিমকামরূপবাসী যে ভাবে সুদীর্ঘকাল স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাসের আলোচনা করিলে, ইতিহাসজ্ঞের নিকট রাজপুত, মারাঠা ও শিখ যেরূপ পূজা পাইয়া আসিতেছেন, পশ্চিমকামরূপিগণকেও সেইরূপ পূজা দিতে প্রবৃত্তি হয়। পশ্চিম কামরূপের প্রাচীন অধিবাসিগণের মধ্যে খেন ও রাজবংশী, এই তুই জাতি প্রধান। খেন জাতি আকারে, আচারে ও ভাষায় বাঙ্গালী। রাজবংশী জাতি ভাষায় বাঙ্গালী; আচারেও অনেকটা বাঙ্গালী; আকারে কিঞ্চিৎ ভুটিয়া ঢঙ্গের—সম্ভবতঃ মেচ বাঙ্গালীর মিশ্রণজাত। পশ্চিম কামরূপের অধিকাংশ ভাগ এখন বাঙ্গালার অন্তর্গত, এবং উত্তর-বঙ্গের অংশরূপে গণ্য। সুতরাং পশ্চিমকামরূপবাসীর গৌরবে রাঢ় বরেন্দ্র ও বঙ্গদেশ-বাসীর গৌরবান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দে পশ্চিম কামরূপবাসী তুরুষ্ক আক্রমণ হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, এই প্রস্তাবে তাহা বিবৃত হইবে।

ত্রয়োদশ শতাব্দে রাঢ়বরেন্দ্র-বিজয়ী তুরুষ্কগণের সহিত কামরূপীদিগের তুইবার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমবার—১২০৬ খৃষ্টাব্দে, মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজের তিব্বত হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়। দ্বিতীয়বার—১২৫৭ খৃষ্টাব্দে, মালিক ইখ্‌তারুদ্দিন ইউজ্বক তুগিল খাঁ কর্ত্তৃক কামরূপ



শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব।

চিত্রকর—শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়। মহিলা প্রেসের স্বত্বাধিকারীর অনুমত্যানুসারে)

Blocks by G. N. Mukherji, Mohila Press, Calcutta.

আক্রমণের ফলে। উভয় ঘটনাই মওলানা মিনহাজুদ্দিন বিরচিত "তাবাকাত-ই-নাসিরী" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। "তাবাকাত-ই-নাসিরী" শেষোক্ত ঘটনার তিন বৎসর পরে, ১২৬০ খৃষ্টাব্দে, রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার তখন দিল্লীর প্রধান কাজির পদে অধিরূঢ় ছিলেন। মুতমদ্দৌলা নামক মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের এক জন অনুচরের মুখে শুনিয়া মিনহাজ প্রথমোক্ত ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মিনহাজের প্রদত্ত বিবরণ বিশেষ নির্ভরযোগ্য। অবশ্যই মিনহাজ যথাসাধ্য মুসলমানের দিক টানিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পক্ষপাতশূন্য ঐতিহাসিক আধুনিক কালেই বা কয় জন দেখা যায়! লর্ড মেকলের প্রসিদ্ধ ইতিহাস আদ্যোপান্ত হুইগ (whig) পক্ষ টানিয়া লেখা। সুতরাং একআধটুকু পক্ষপাতিতার জন্য কাজি মিনহাজকে দোষ দেওয়া যায় না। পক্ষপাতিতার ক্ষীণ আবরণ উন্মোচন করিয়া মিনহাজের বিবরণ হইতে সারসত্যের উদ্ধার কঠিন নহে।

মহম্মদ বখতিয়ার স্বয়ং বরেন্দ্র দেশের কতক অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ১২০৫ কি ১২০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মহম্মদ সেরান ও তাঁহার ভ্রাতাকে এক দল সেনা সহ রাঢ়ের প্রধান নগর লাখ্‌নোরের ও যাজনগরের (উড়িষ্যার) দিকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং দশ হাজার অশ্বারোহী লইয়া তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত আলি নামক মেচ সর্দ্দার তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। যে পথ অবলম্বন করিয়া মহম্মদ বখ্‌তিয়ার তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন, মিনহাজ তাহার যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক ভৌগোলিক তথ্য নিহিত আছে। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার হয় লক্ষ্মণাবতী (বর্ত্তমান গৌড়) আর না হয় দেবকোট (বাণ নগরের নিকটবর্ত্তী দমদমা) হইতে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন। আলি প্রথমতঃ তাঁহাকে বর্দ্ধন [কোট] নামক নগরের সন্নিধানে লইয়া গিয়াছিল। এই নগরের সম্মুখভাগ দিয়া [in front of that place] বেগবতী নামক আয়তনে গঙ্গার তিনগুণ একটি বৃহৎ নদী প্রবাহিত হইত। ব্লকমান মিনহাজের বর্দ্ধনকোটকে রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত গোবিন্দগঞ্জ থানার নিকটবর্ত্তী "বর্দ্ধনকুটী" গ্রাম ও "বেগবতী"কে করতোয়া নদী বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। * মিনহাজের "বেগবতী" যে করতোয়া, এ বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না। কেন না, মিনহাজ "বেগবতী" নদীকে বরেন্দ্র

* Raverty's Tabakat-i-Nasiri pp 560—573 pp 761—766

(বরিন্দ) ও কামরূপের সীমান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, * এবং কালিকাপুরাণে ও যোগিনীতন্ত্রে, করতোয়া নদীই কামরূপের পশ্চিম সীমা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বর্দ্ধনকুটীকে বর্দ্ধনকোট মনে করার বিশেষ অন্তরায় আছে। ব্লকমান বর্দ্ধনকুটীর ভগ্নাবশেষের [ ruins ] উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বর্দ্ধনকুটীতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি, তথায় কোনও ভগ্নাবশেষ নাই ; থাকার মধ্যে আছে এক ঘর প্রাচীন জমীদারের বাসভবন। করতোয়ার ঠিক তীরবর্ত্তী প্রাচীন নগরের একমাত্র ভগ্নস্তূপ বগুড়ার নিকবর্ত্তী মহাস্থানগড়। সুতরাং মিনহাজের বর্দ্ধনকোটকে মহাস্থানগড় মনে না করিয়া উপায় নাই। কানিংহামের অনুমান যদি সত্য হয়,—মহাস্থানই যদি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের ভগ্নাবশেষ হয়, তবে "বর্দ্ধন" নামেরও মূল পাওয়া যায়। "তাবাকাত-ই-নাসিরী"র ইংরেজী অনুবাদক রেভার্টি টীকায় লিখিয়াছেন, মূল "তাবাকাত-ই-নাসিরীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুঁথিনিচয়ে শুধু "বর্দ্ধন" পাঠ আছে ; কেবল দুইখানি পুঁথিতে "কোট" পদ যুক্ত হইয়াছে। মিনহাজ হয় ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের "বর্দ্ধন" পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। আলি মহম্মদ বখ্‌তিয়ারকে যে নগরের সন্নিকটে লইয়া গিয়াছিল, উহা প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী। পালরাজবংশের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের গৌরবরবি অস্তমিত হইয়াছিল। † সেনরাজগণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন উপেক্ষা করিয়া বরেন্দ্রভূমিতে বিজয়পুরী ও লক্ষণাবতী নামক দুইটি নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মিনহাজ যে ভাবে বর্দ্ধনকোটের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, ঐ নগর আদৌ মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের অধিকৃত প্রদেশের বহির্ভাগে অবস্থিত ছিল। তাই মহম্মদ বখ্‌তিয়ার ও তাঁহার অনুচরগণকে বর্দ্ধনকোট যাইবার জন্য পথপ্রদর্শকের সহায়তা লইতে হইয়াছিল।

বর্দ্ধন [ কোট ] হইতে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার করতোয়ার পশ্চিমতীর দিয়া উত্তর দিকে চলিলেন, এবং ক্রমান্বয়ে দশ দিন চলিয়া হিমালয় প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। এইখানে তাঁহাকে সসৈন্য নদীপার হইতে হইয়াছিল। এই

* Journal of the Asiatic Society of Bengal vol XLIV (1875) Part 1 pp 282—284

† "রামচরিত" কাব্যে সন্ধ্যাকর নন্দী এবং "রাজতরঙ্গিণী"তে কহ্লণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের উল্লেখ করিয়াছেন ইহার পর আর কোথাও এই প্রাচীন নগরের উল্লেখ দেখা যায় না।

নদী অবশ্যই তিস্তা ( ত্রিস্রোতা )। করতোয়ার উৎপত্তিস্থান বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল। তৎকালে ( ১৭৮৭ সালের বন্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ) তিস্তার জলরাশি করতোয়ার খাত দিয়া প্রবাহিত হইত। এই জন্যই করতোয়া আয়তনে এত বড় ছিল। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার তিস্তার উপর পাষাণে নির্ম্মিত একটি প্রাচীন সেতু দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই সেতুর বিংশতির অধিক খিলান ছিল [ a bridge of hewn stone and consisting of upwards of twenty arches ] ব্লকমান লিখিয়াছেন, এই পাষাণের সেতু নিশ্চয়ই দার্জ্জিলিংএর নিকটে ( neighbourhood ) অবস্থিত ছিল। * কিন্তু দার্জ্জিলিং হইতে তিস্তা অনেক ( ১৭ মাইল ) ব্যবধানে, † এবং তিস্তার যে অংশ দার্জ্জিলিংএর নিকবর্ত্তী, সেই অংশ হিমালয়ের পাদদেশ হইতে ২০ মাইল ব্যবধানে। আলি মেচ যে মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের সহিত পার্ব্বত্য প্রদেশে এত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, মিনহাজের গ্রন্থ-পাঠে এরূপ মনে হয় না। যদিও মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের তিব্বত-অভিমুখে গমনের বিবরণে মিনহাজ লিখিয়াছেন, আলি তাঁহাকে পার্ব্বত্য প্রদেশে এমন স্থানে লইয়া গেলেন, যেখানে পাষাণের সেতু ছিল, কিন্তু মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের তিব্বত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের বিবরণে লিখিয়াছেন, মুসলমান সৈন্য তিব্বত হইতে যাত্রা করিয়া পার্ব্বত্য পথে ১৫ দিন চলিয়া—

"until they dissuefrom the mountains into the country of Kamrup, and reached the head of that bridge."

"অবশেষে পর্ব্বত্য প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, কামরূপ দেশে, সেতুর নিকটে উপস্থিত হইলেন।"

এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, যে স্থানে তিস্তা নদী হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া কামরূপের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পতিত হইয়াছে, সেই স্থানে সেতু ছিল। যে স্থানে তিস্তা আসিয়া সমতল ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, সেই স্থান

---

* "The bridge must have been in the neighbourhood of Dorzhiling, or as we spell it, Darjeeling.

† "For a period of ten days, he [Ali the Mej] took the army up the river [Begmati] among the mountains, until he brought it to a place where, from remote times, they had built a bridge of hewn stone and consisting of upwards of twenty arches"

এখন শিবক নামে পরিচিত। অনুমান হয়, শিবকেই মিনহাজ-বর্ণিত পাষাণের সেতু অবস্থিত ছিল, এবং মহম্মদ বখ্‌তিয়ার এই সেতু পার হইয়া নিকটবর্ত্তী কোনও "দুয়ার" বা গিরিপথ দিয়া (হয় ত ডালিংকোট দুয়ার দিয়া) তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিস্তার স্রোত অত্যন্ত প্রবল, এবং জলও খুব গভীর। এই স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড গাঁথিয়া সেতুর নির্ম্মাণ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়। শিবকের নিকটেই তিস্তার মধ্যে সুবৃহৎ একখণ্ড প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। শিবকের উত্তরে, ৪॥ মাইল ব্যবধানে, কালিঝোরা নামক স্থানে তিস্তার মধ্যে এইরূপ আর একখণ্ড প্রস্তর দেখিয়াছি। শিবকের দক্ষিণেও এরূপ অনেক প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমান হয়, এইরূপ অনেকগুলি প্রস্তরখণ্ড পরস্পর সমসূত্রে স্থাপন করিয়া এবং তদুপরি শালকাঠ ফেলিয়া মিনহাজ-বর্ণিত সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। অন্যপ্রকারের পাষাণের সেতুর অস্তিত্ব এখানে অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়।*

এই সেতু কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। কামরূপের অধিপতি যখন শুনিতে পাইলেন, মুসলমান সেনা সেতু পার হইয়াছে, তখন দূত-মুখে মহম্মদ বখ্‌তিয়ারকে বলিয়া পাঠাইলেন, "এ সময় তিব্বতে যাত্রা করা উচিত নয়, ফিরিয়া যাওয়া এবং যথোপযুক্ত আয়োজন করা আবশ্যক। কামরূপের রাজা আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আগামী বৎসর আমার সেনাবল সংগ্রহ করিয়া, মুসলমান সেনার অগ্রে যাত্রা করিব, এবং তিব্বত অধিকার করিয়া দিব।" মহম্মদ বখ্‌তিয়ার কামরূপাধিপের সদুপদেশে কর্ণপাত না করিয়া তিব্বতে যাত্রা করিলেন। ১৫ দিন ক্রমান্বয়ে চলিয়া ষোল দিনের দিন তিব্বতের উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন, এবং একটি দুর্গ অবরোধ করিলেন,

* গত ৯ই বৈশাখ শ্রীযুক্ত কুমার জগদীন্দ্র দেব রায়কোট ও জলপাইগুড়ির উকীল শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্থানপতি ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কর্ম্মকারের সহিত শিলিগুড়ি হইয়া শিবক গিয়াছিলাম। শিলিগুড়ির উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও মোক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে আমাদের যান-বাহনাদির প্রতি সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীযুত কুমার জগদীন্দ্র দেব রায়কোট মিনহাজুদ্দীনের বর্ণনা শুনিয়া আমাকে শিবক যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। শিবকের দুই মাইল দক্ষিণে তিস্তার পারে "চুমুকডাঙ্গা" নামক স্থানে জলপাইগুড়ির উকীল শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর জোত আছে। এই জোতের আশে পাশে জলে ৫।৬ খানা বড় পাথর দৃষ্ট হয়।

কিন্তু পরদিনই পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হইলেন! পর্ব্বতের অধিবাসীরা পথের পার্শ্বের শুক্না কাঠ ও ঘাস আগুনে পোড়াইয়া দিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ফিরিবার সময় মুসলমান সেনা আহারাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিল, এবং ঘোড়ার মাংস খাইতে বাধ্য হইয়াছিল। পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া সেতুর নিকট আসিয়া মহম্মদ বখ্‌তিয়ার দেখিতে পাইলেন, তিনি যে দুই জন আমীরকে সেতু-রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা পরস্পরের সহিত কলহ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; এবং কামরূপের হিন্দুগণ আসিয়া সেতুর দুইটি খিলান্ (দুইখণ্ড পাথর) সরাইয়া দিয়া সেতুর ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং মহম্মদ বখ্‌তিয়ার নদী পার হইবার কোনও উপায় করিতে পারিলেন না, এবং নৌকাও জুটিল না। তখন নিকটবর্ত্তী একটি দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করা পরামর্শসিদ্ধ হইল। মিনহাজ লিখিয়াছেন, এই মন্দিরটি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত দৃঢ়, এবং অত্যন্ত সুন্দর ছিল, এবং ইহার অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক সোনার ও রূপার দেবমূর্ত্তি ছিল। তন্মধ্যে একটি সোনার মূর্ত্তি নাকি ওজনে দুই তিন হাজার মনেরও অধিক বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার এই মন্দিরে আশ্রয় লইলেন, এবং নদী পার হইবার উপায়-উদ্ভাবনে সচেষ্ট রহিলেন। কামরূপের রাজা এই সংবাদ পাইয়া বহুসৈন্য সহ আসিয়া মন্দির অবরোধ করিলেন, এবং মন্দিরের চারি দিকে বাঁশের বেড়া দেওয়াইতে লাগিলেন। বেগতিক দেখিয়া মহম্মদ বখ্‌তিয়ার সমুদয় সেনা লইয়া বেড়ার এক দিক ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া নদীর তীরের দিকে ছুটিলেন; কামরূপ-সেনা তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া মুসলমানগণ নদী পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জন কয়েক ঘোড়া লইয়া জলে নামিয়া পড়িল, এবং কিছু দূর পর্য্যন্ত (about an arrow-flight) ঘোড়া হাঁটিয়া যাইতে সমর্থ হইল। নদী হাঁটিয়া পার হওয়া যাইতে পারে, এরূপ স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মুসলমান সেনার মধ্যে কোলাহল উঠিল। তখন সকলেই জলে নামিয়া পড়িল, এবং হিন্দুরা আসিয়া নদীর পার দখল করিল। নদীর মধ্যভাগে অথৈ জল ছিল। সেইখানে উপস্থিত হইবামাত্র সমস্ত মুসলমান সেনা ডুবিয়া গেল। কেবল মহম্মদ বখ্‌তিয়ার ন্যূনাধিক শত অশ্বারোহী লইয়া অপর পারে পঁহুছিতে সমর্থ হইলেন।

মিনহাজের বিবরণে কামরূপী সৈন্যগণকে বেড়া দেওয়া, পশ্চাৎধাবন ও নদীর পার অধিকার ভিন্ন আর কোনও কার্য্যে লিপ্ত হইতে দেখা যায় না। তাঁহারা যদি এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, হাতিয়ার নাড়া-চাড়া না করিতেন, তবে আর মুসলমানগণ সদলবলে জলে নামিয়া পড়িতেন না, যোগাড়যন্ত্র করিবার অবসর পাইতেন। সুতরাং মুসলমানসেনার ধ্বংস কার্য্যে কামরূপী সেনার বাহুবল তিস্তার প্রবল স্রোতের সহায় হইয়াছিল, এরূপ মনে করিতে হইবে। তবে মিনহাজের বর্ণনা-পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়, কামরূপ-রাজ সেনাচালনে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং অযথ সেনাক্ষয় না করিয়া সুযোগমত কৌশলে শত্রুনাশ করিতে জানিতেন। মিনহাজ এই কামরূপ-রাজের নাম করেন নাই। আসামে প্রাপ্ত ১১০৭ শক সংবতের (১১৮৪--৮৫ খৃষ্টাব্দের) একখানি তাম্রশাসনে কামরূপের ভাস্কর-বংশীয় নৃপতিগণের পরিচয় পাওয়া যায়। * মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের অভি-যানের সময়ে এই ভাস্কর-বংশীয় কোনও নৃপতিই হয় ত পশ্চিম কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আসাম-বুরঞ্জির মতে, উত্তর কামরূপ তখন চুটিয়া জাতীয় নৃপতিগণের অধিকৃত।

মহম্মদ বখ্‌তিয়ারের প্রথম দুই জন উত্তরাধিকারী, সেরানের ও আলি-মর্দ্দনের সময় লক্ষ্মণাবতী মুলুকে গোলমাল ছিল, সুতরাং তাঁহারা কামরূপ-আক্রমণের অবসর পান নাই। কিন্তু হুসামুদ্দীন আইবজ (ঘিয়াসুদ্দীন), যিনি দেবকোট হইতে লাখনোর পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিয়া বরেন্দ্রে ও রাঢ়ে মুসলমান শাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি কামরূপে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তৃত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। মিনহাজ লিখিয়াছেন—

"The parts around adout the state of Lakhanawati, such as Jaj-nagar, countries of Bang Kamrup, and Tirhut all sent tribute to him; and the whole of that territory named Gaur passed under his control."

"উড়িষ্যা [যাজনগর], বঙ্গ, কামরূপ ও ত্রিহুত, লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ এই সকল খণ্ডরাজ্য তাঁহাকে কর প্রেরণ করিয়াছিল; এবং গৌড় নামক সমস্ত ভূভাগ তাঁহার অধীন হইয়াছিল।"

এখানে কর-প্রদানের অর্থ, বোধ হয়, উপহার-দ্রব্যের বিনিময়। কামরূপ ও বঙ্গ যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে হুসামুদ্দীনকে রীতিমত কর প্রদান করিত, তাহা হইলে তিনি আর কামরূপ ও বঙ্গ আক্রমণ করিতে গিয়া নিজের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিতেন না। মিনহাজ লিখিয়াছেন, হিজরী ৬২৪ সালে (১২২৭ খৃষ্টাব্দে) হুসামুদ্দীন লক্ষ্মণাবতী প্রহরিহীন করিয়া সসৈন্য কামরূপের ও বঙ্গের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। এমন সময় সুলতান ইয়াল্‌তিমিসের পুত্র নাসিরুদ্দীন মামুদ সাহ আসিয়া লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিলেন। সংবাদ পাইয়া হুসামুদ্দীন ফিরিয়া আসিলেন, এবং মামুদ সাহর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া ধৃত ও নিহিত হইয়াছিলেন।

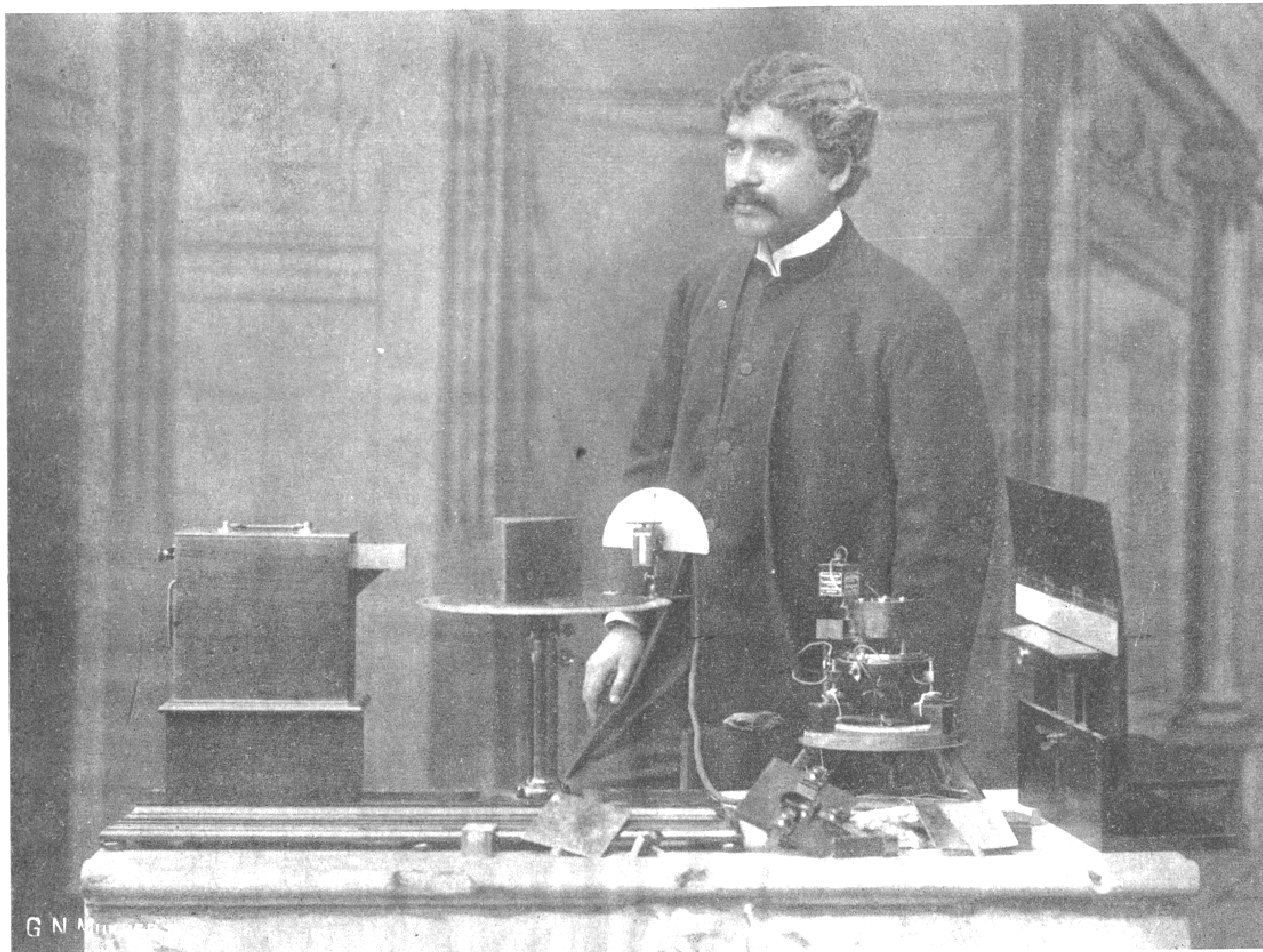
ইহার পর ৩০ বৎসর কাল লক্ষ্মণাবতীর আর কোনও শাসনকর্ত্তা কামরূপ আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই, বা অবসর পান নাই। ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মালিক ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন ইউজবক বিশাল বেগবতী [করতোয়া] পার হইয়া কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। † পশ্চিম কামরূপের অধীশ্বর পরাক্রান্ত রাঢ়-বরেন্দ্র-মগধাধীশের সুবিশাল সেনাবলের সম্মুখীন হওয়া সঙ্গত বোধ করিলেন না, রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। সুতরাং রাজধানী নির্ব্বিবাদে ইউজবকের হস্তগত হইল, এবং তিনি কামরূপ-রাজকোষের অপরিমেয় ধনরাশি লাভ করিলেন। ইউজবক নিজ নামে খোদ্‌বা পড়াইয়া কামরূপেশ্বর বলিয়া আত্মঘোষণা করিলেন। এ দিকে কামরূপের অধিপতি পুনঃপুনঃ দূতমুখে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, "আপনি এখন স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাউন; আমি প্রতিবৎসর আপনার নিকট কর-স্বরূপ নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সুবর্ণ ও হস্তী পাঠাইব, এবং আপনার নামে খোদ্‌বা ও আপনার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত রাখিব।" ইউজবক এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন কামরূপপতি তাঁহার অনুচরগণকে ইউজবকের অনুমতি লইয়া রাজধানীর ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের সঞ্চিত ধান্যাদি খরিদ করিতে আদেশ দিলেন। ইউজবক কিছুমাত্র ধান চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখেন নাই। যখন চৈতালী (ফসল) সংগ্রহ করিবার সময় উপস্থিত হইল, তখন কামরূপ-রাজ সেনাদল লইয়া আসিয়া রাজধানী অবরোধ করিলেন; চারি দিকের বাঁধ কাটিয়া দিয়া জলপ্লাবন ঘটাইলেন।

† Raverty's Tabaqat-i-N...

আহার-অভাবে মুসলমান-সেনা মৃতকল্প হইল; তখন পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়াই স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু সমতল ক্ষেত্রের পথ জলমগ্ন, এবং কামরূপের সেনার অধিকৃত ছিল। তখন ইউজবক এক জন পথপ্রদর্শকের সাহায্যে পর্ব্বতের পাদদেশে পঁহুছিবার জন্য যত্নবান হইলেন। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই পার্ব্বত্য সঙ্কীর্ণপথে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক হিন্দুসেনা ঘিরিয়া ফেলিল। উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইউজবক হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন। একটি তীর আসিয়া সহসা তাঁহার বুকে বিঁধিল। তিনি ভূপতিত ও ধৃত হইলেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণ ও অনুচরগণ সকলেই ধৃত হইল। আহত ইউজবক বিজয়ী কামরূপাধিপের নিকট নীত হইলে, স্বীয় পুত্রকে দেখিবার প্রার্থনা করিলেন, এবং পুত্র নিকটে আসিলে তাহার মুখে মুখ রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এ ক্ষেত্রেও মিনহাজ কামরূপাধিপতির নাম, এমন কি, পশ্চিম কামরূপের রাজধানীর নাম পর্য্যন্ত করেন নাই। এই কামরূপাধিপের নাম যাহাই হউক, ইনি যে এক জন অসাধারণ রণপণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না। যখন ইউজবক আসিয়া রাজধানীর দ্বারে উপনীত হইলেন, নগররক্ষিগণ রাজপুত হইলে তখন তাঁহারা হয় ত "জৌহার" বা আত্মনাশ করিতেন। কিন্তু কামরূপাধিপ ও কামরূপী সেনা যেমনই সাহসী, তেমনই কৌশলী ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে রুস সম্রাট যে সমরনীতি অবলম্বন করিয়া প্রথম নেপোলিয়নের হস্ত হইতে ইউরোপ রক্ষা করিয়াছিলেন, কামরূপরাজও সেই নীতি অবলম্বন করিয়া ইউজবককে সদলবলে নাশ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে, বোধ হয়, পশ্চিম কামরূপ প্রায় সার্দ্ধ দুই শতাব্দ কাল মুসলমানের আক্রমণ হইতে মুক্ত ছিল। কেন না, ইউজবকের পরে ও হুসেন সাহ কর্ত্তৃক ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কমতাপুর-অধিকারের পূর্ব্বে আর কখনও মুসলমান সেনা পশ্চিমকামরূপ আক্রমণ করিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না।

মিনহাজ ইউজবক-অধিকৃত কামরূপের রাজধানীর নাম না করিয়া থাকিলেও, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। পশ্চিম কামরূপের ধ্বংসাবশেষনিচয়ের মধ্যে কুচবিহারের অন্তর্গত কমতাপুরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রাচীন সমৃদ্ধির চিহ্নরাশিতে পরিপূর্ণ। ইহারই উপকণ্ঠে নরকাসুরতনয় ভগদত্তের তথাকথিত কবচ বা গোসানীমারীর মন্দির। এই নিমিত্ত



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র।

Block and Printed by the Mohila Press, Calcutta.

ভাবের উন্মেষ-সাধন আচার্য্যগণের কর্ত্তব্য। এই ব্যষ্টির ধর্ম্মকে, তন্ত্রের হিসাবে এবং ভক্তি-শাস্ত্রের হিসাবে সাধন-ধর্ম্ম বলিব। এই সাধন-ধর্ম্মের যাঁহারা ব্যাখ্যাতা, তাঁহারাই আচার্য্য-নামধেয়। শঙ্করাচার্য্য ভারতের প্রথম আচার্য্য। তাঁহার পূর্ব্বগামী কুমারিল, মণ্ডনমিশ্র প্রভৃতি মহাত্মগণ যতী মুনি প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতেন। এমন কি, রামানুজের পূর্ব্বগামী অশেষশাস্ত্রবিদ্ এবং সাধকচূড়ামণি যামুন, 'মুনি' বলিয়াই দাক্ষিণাত্যে বিখ্যাত। দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে সাধন-ধর্ম্মের প্রচার হইয়া থাকে; কাজেই শঙ্করাচার্য্যের কালের প্রচারিত ধর্ম্ম এবং রামানুজ আচার্য্যের কৈঙ্কর্য্য ও সেবার ধর্ম্ম তুলনায় সমালোচিত হইতে পারে না। আমে ও কাঁঠালে তুলনা হয় না; উভয়েই ফল বটে; কিন্তু উভয়ের মধ্যে অন্য সাদৃশ্য কিছু নাই। ইহা ছাড়া আর একটা কথা আছে। উভয়শ্রেণীর গুরুপরম্পরার ভিতর দিয়া এমন একটা একনিষ্ঠার ধারা বহিয়া আসিতেছে, যাহার প্রভাবে উভয়েই উভয়কে দূরে রাখিয়া থাকে; কাজেই এমন তুলনার সমালোচনায় উভয়পক্ষের অনেকেই শিহরিয়া উঠিবেই। প্রেমিক যেমন প্রণয়িনীকে প্রণয়ের দৃষ্টিতে অতি সুন্দর দেখে, জগতে তাহার তুল্য আর কাহাকেও তেমন সুন্দর দেখিতে পায় না; তেমনই সাধক স্বীয় সাধন-পদ্ধতিকে জগতে অতুল্য এবং অনুপম বলিয়া গ্রাহ্য করে। শঙ্কর-সম্প্রদায় অদ্বৈতবাদকে অপরাজেয় বলিয়া মনে করেন; শ্রী-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ রামানুজাচার্য্যের ব্যাখ্যানকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন,—বিশ্বাস করেন। উভয় পক্ষের এই বিশ্বাসের মূলে দৈববল নিহিত আছে। শঙ্কর-সম্প্রদায় বলেন,—

শঙ্করঃ শঙ্করো সাক্ষাৎ
ব্যাসো নারায়ণঃ ধ্রুবম্ ॥

শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্তগণ বলেন, রামানুজ রামানুজই বটেন---অনন্তের অবতার---সাক্ষাৎ লক্ষ্মণ! এমন বিশ্বাসের সম্মুখে তুলনার সমালোচনা কি সম্ভবপর?

এইবার যুগধর্ম্মের বিষয়টাও একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। শঙ্করাচার্য্যের কাল লইয়া এখনও অনেক গণ্ডগোল রহিয়াছে। মঠের অধিষ্ঠাতা সন্ন্যাসিমাত্রই শঙ্করাচার্য্য এই নামধারী। কেহ কেহ বলেন, দক্ষিণে এক নৃসিংহাচার্য্য খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন; তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহারও উপাধি শঙ্করাচার্য্য ছিল; এই শঙ্করাচার্য্যের কীর্ত্তিকলাপ পূর্ব্বগামী আসল শঙ্করাচার্য্যের কীর্ত্তির সহিত খিচুড়ী পাকাইয়া ইংরেজীনবীশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অত্যন্ত গোল ঘটাইয়াছেন। আসল ও প্রথম শঙ্করাচার্য্য নৃসিংহাচার্য্যের বহুপূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমান নিখিলনাথ রায় সারদা-মঠের শঙ্করাচার্য্যের নিকট হইতে এক গুরু-তালিকা পাইয়া, প্রথম শঙ্করাচার্য্যের কালনির্ণয় করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার সন্দর্ভ এই "সাহিত্য" পত্রে প্রকাশিত হয়। যাহা হউক, আমরা এই বিতণ্ডার মধ্যে প্রবেশ করিব না; কেবল ধরিয়া লইব যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত, এই তিন শত বৎসর কাল ভারতে অদ্বৈত-ধর্ম্ম-প্রচারের কাল। এ যুগটা বৌদ্ধতন্ত্রপ্রধান যুগ---বীরাচার, কুলাচার ও অঘোর পন্থের যুগ। নাস্তিকতা এই যুগের প্রধান ভূষণ; ধর্ম্মের নামে ষড়রিপুর সেবা, বিশেষতঃ

কামের সঙ্কুক্ষণ এই যুগের কর্ম্ম। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের প্রচার করিয়া জীবে-শিবে ঐক্য সপ্রমাণ করিলেন। জীব শিবের মতন নিত্যবুদ্ধসিদ্ধস্বভাব না হইতে পারিলে শিবত্ব লাভ করিতে পারিবে না। সে নিত্যবোধ বৈদিক আচার, সংযম-সন্ন্যাস, শম-দম উপরতি-তিতিক্ষার সাধন এবং অবলম্বন না করিতে পারিলে আয়ত্ত হইবে না। বৌদ্ধ—হীনযান ও বজ্রযান— উভয় সম্প্রদায়ই জ্ঞাবোধের আত্মা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, ইহা ছাড়া একটা পরমাত্মা আছেন। তিনি সাগর, আমরা বুদ্বুদ্; তিনি সমষ্টি, আমরা ব্যষ্টি। তবে অনন্তের অংশ যখন অনন্তই হয়, তখন তাঁহার অংশ আমরা সবাই অনন্ত। মায়া-উপহিত বলিয়া আমরা মনে করি যে, আমরা সান্ত ও সীমাবদ্ধ। সাধনার সাহায্যে এই মায়ার আবরণ ছিন্ন করিতে হইবে। এই সাধনায় যে সিদ্ধ হয়, সে বলে—

"অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপঃ
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তি র্ন ভীতিঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্॥

এই অদ্বৈতবাদের পথ দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া শঙ্কর বৌদ্ধ ভারতবাসীকে আস্তিক সংযমী ও সদাচারী করিয়াছিলেন—শূন্যবাদের শুষ্কতাকে পরিহার করিয়া ভক্তিভাবের মধুর রস তিনি ভারতবর্ষে ছড়াইতে পারিয়াছিলেন। তিনি ভারতবাসীর নয়নের সম্মুখে ভক্তির প্রথম স্তর খুলিয়া দিয়াছিলেন। বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ও কর্ম্মবাদ যখন ভারতবর্ষকে শুষ্ক করিয়া তুলিতেছিল, তখন বুদ্ধ অবতার-রূপে নীতি ধর্ম্মের প্রচার করিয়া, অন্তঃশুদ্ধির উপদেশ দিয়া, ভারতে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন এই অন্তঃশুদ্ধি নাস্তিকতায় পরিণত হইল, ধর্ম্মের নামে বিলাস সমাজ-শরীরে প্রবেশ লাভ করিল, পাপ ধর্ম্মের আবরণে সমাজে বিচরণ করিতে লাগিল, তখনই শঙ্করাচার্য্য শূন্যবাদের খণ্ডন করিয়া, অদ্বৈতবাদের প্রচার করেন; দেহী আত্মা ছাড়া একটা বিদেহ আত্মার অবস্থিতি যুক্তিজালের সাহায্যে তিনি প্রতিষ্ঠাপিত করেন। চারি শত বৎসর পরে যখন এই অদ্বৈতবাদ মলিন হইয়া গেল, উহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া অনেকে অবধারণ করিতে বাধ্য হইল; অথচ যখন এই অদ্বৈতবাদের প্রেরণায় নারদ ও শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিসূত্র সকলের পঠন-পাঠন সমাজে আরব্ধ হইয়াছিল, যখন পিপাসু সাধক অদ্বৈতবাদের চর্চ্চায় প্রবৃত্তির পিপাসা মিটাইতে পারিতেছিলেন না, তখন রামানুজাচার্য্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুপরম্পরার ইতিহাস জানিতে পারিলে বুঝা যাইবে, রামানুজ একাএক এই সংসারে অবতীর্ণ হন নাই; আসক্তির দ্বৈতবাদী ভক্ত সাধক তিনি গুরুপরম্পরার ভাবের ধারা রক্ষা করিয়া পূর্ব্বগামী সাধকগণের সাধনাসিদ্ধ সিদ্ধান্ত সকলের ব্যাখ্যাতা ছিলেন; এই হেতু তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিলেন—ভগবানের কিঙ্করতার মহিমা প্রচার করিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যাত কৈঙ্কর্য্য, সাধনধর্ম্মের দ্বিতীয় স্তর। তাহার পর বল্লভাচার্য্যের বাৎসল্যের স্ফুরণ—মাতৃভাবাসক্তির প্রচার—ভগবানকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার দুলালীর মহিমার বিকাশ; এবং শেষে শ্রীচৈতন্যের মধুর রসের

দ্বিভুজ মুরলীধরের সখিত্বের অপূর্ব্ব মহিমার প্রচার। যাহা মূল, তাহার সহিত পত্রপল্লব, পুষ্পফলের তুলনা হয় কি ?

ভারতবর্ষের সাধনকাণ্ডে তিনটি ধারা প্রবাহিত আছে—ভক্তি, প্রেম ও জ্ঞান। ভক্তি গঙ্গাপ্রবাহ, প্রেম যমুনা-তরঙ্গ, জ্ঞান গুপ্তসলিলা সরস্বতী। তান্ত্রিক ও রামসেবকগণ ভক্তি লইয়া মজিয়া আছেন ; ভগবানকে পিতামাতা গুরু রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। শঙ্করাচার্য্য এই খাঁটী ভক্তির প্রচারক ; জ্ঞানের আবরণে তিনি ভক্তি-সাধনা এ দেশে চালাইয়াছিলেন। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধগণ শুষ্ক জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া সামাজিক হিসাবে ঠকিয়াছিলেন। শুষ্ক নীতি ধর্ম্মের নবীনতা যখন কমিয়া গেল, নিরীশ্বর জ্ঞানচর্চ্চার মোহ যখন দূর হইল, তখন বৌদ্ধ সাধনার ধন খুঁজিয়া না পাইয়া বিলাসী হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য এই বিলাসের প্রভাব-সঙ্কোচ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। রামানুজাচার্য্যও ভক্ত এবং জ্ঞানী ; পরন্তু তাঁহার ভক্তির মূলে একটু প্রেম আছে, একটু মধুর রসের বিন্যাস আছে। প্রমাণ তাঁহার শ্রীবৈকুণ্ঠ গদ্য গ্রন্থ। এই প্রেমের ভাবকে শতদল-কমল-রূপে ফুটাইয়াছেন বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তিনিই ভগবদ্ভক্তিকে পূর্ণভাবে মধুর রসে পরিণত করিয়াছিলেন। গুরুপরম্পরা হিসাবে শ্রীচৈতন্য শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত, এবং সেই সম্প্রদায়ের ভাবপারম্পর্য্যের পরাকাষ্ঠা-সাধন তিনিই করিয়াছিলেন। হিন্দু-তান্ত্রিক ভক্তি ধর্ম্মের বিস্তারের কথা এখানে বলিব না, সে এক স্বতন্ত্র ব্যাপার। যে পারিজাতের মূল শঙ্করাচার্য্য, সেই পারিজাতের শাখা কাণ্ড পত্রপল্লব হইলেন রামানুজ সম্প্রদায় প্রমুখ ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সকল। উহার কুসুম হইল শ্রীচৈতন্যের ভাবমধুর দ্বিভুজমুরলীধর-সেবা। ভারতের এই ভক্তিপ্রধান সাধনা-পদ্ধতি উন্মেষের পদ্ধতি, বিরোধের নহে—বিভিন্নতার নহে—বিদ্বেষের নহে। আমাদের ভাগ্যদোষে—বুদ্ধির দোষে আমরা এই সকল পদ্ধতি হইতে কেবল বিরোধ-বিদ্বেষ-বিতণ্ডা বাহির করিয়াছি ; একনিষ্ঠার অবনতি ঘটাইয়া, উহারই দোহাই দিয়া হীনবৃত্তির পোষণ করিয়াছি। এ সমাচার, যদি কখনও অবসর হয় ত, পরে শুনাইব।

ইহাই আমাদের মাপ-কাঠী। এই মাপ-কাঠী অনুসারে শ্রীমান রাজেন্দ্রনাথের পুস্তকের পরিমাণ করিতে হইলে, মাপে কম পড়িবেই। তিনি ইংরেজী criticএর হিসাবে বেশ বহি লিখিয়াছেন। এ বহির ভাষা ভাল, বিষয়-বিন্যাস ভাল, বিচার-পদ্ধতি মন্দ নহে। অনুসন্ধিৎসুদিগের পক্ষে এ পুস্তক অনেক কাজে লাগিবে ; ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা একটা ঈক্ষণযন্ত্রস্বরূপ হইবে ; ইংরেজীভাববিহ্বল সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিবে। পরন্তু আমরা যে ভাবের ভাবী, সে ভাবের মাপ-কাঠীতে মাপিলে এ পুস্তকে অনেক ন্যূনতা রহিয়া গিয়াছে, বলিতে হইবে। অতি-প্রাকৃত ঘটনা সকল বাদ দিলে শঙ্কর এবং রামানুজের জীবনে থাকে কি ? থাকে কেবল ব্যাখ্যা, ভাষ্য, এবং টীকা। সেই ব্যাখ্যা, ভাষ্য ও টীকার বিনিয়োগ প্রভাব বুঝিতে হইলে অতি-প্রাকৃত ঘটনা সকলের ইঙ্গিত বুঝিতে হইবে। সে ইঙ্গিত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

ওজনে, পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাই তাঁহার পুস্তকের আমরা ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। লেখক শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ যদি সাধনতত্ত্ব বুঝিতেন, বা সে দিকটা খুলিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি আরও একটু পটুতার সহিত তুলনায় সমালোচনা করিতে পারিতেন। তিনি গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের কৃত গীতার "সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা-প্রচার-ব্যপদেশে ছয়টি বিরোধ-পরিত্যাগের কথার উল্লেখ করিয়াছেন; অথচ এই বিরোধের মাপ-কাঠীতে উভয়ের কর্ম্ম ও জীবন মাপিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই। পারিলে তুলনায় সমা-লোচনার কালে উভয় পক্ষের চতুরতা, ভয়, রোগ, মূর্খতা প্রভৃতির উল্লেখ এই পুস্তকে সম্ভবপর হইত না —পারিলে, সম্প্রদায়-বিন্যাসের বিষয়টা খুব বিস্তীর্ণভাবে লিখিতে পারিতেন। ভক্তি ও প্রেম মজার ব্যাপার; শঠতা, কপটতা, চতুরতা, ভয়, মৈত্রী, ভোগ, ত্রাস, শঙ্কা, চপলতা—সর্ব্বস্বই শ্রীকৃষ্ণে বা শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে হয়। যখন আমি তোমার—তোমার দাসানুদাস, কিঙ্কর, কৃতদাস, সখাসহচর, তখন আমার সর্ব্বস্ব তোমার। ভাল হউক, মন্দ হউক, পাপ হউক, পুণ্য হউক, আমার যাহা কিছু আছে, তাহা তোমার; সে সকলই তোমার কার্য্যে বিনিযুক্ত হইবে। শঙ্করের অদ্বৈতবাদে, সন্ন্যাস-সংযমে এ সকলের বিকাশ-অবসর নাই। তাই তাঁহার জীবনে এ সকলের স্ফুরণও নাই। রামানুজ দাসানুদাস হইয়া সর্ব্বস্ব শ্রীভগবানকে সমর্পণ করিয়াছিলেন; তাই ভগবৎ-কার্য্যে সে সকলের তিনি প্রয়োগ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহার জীবনে অনেক ব্যাপার ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রামানুজের ভক্তি-ব্যাখ্যায় ও উপাসনাতত্ত্বে ঐ সকলের ত পূর্ণ প্রাঞ্জল বিবরণ আছে। শঙ্করের সময়ে প্রবৃত্তিমূলক আত্মনিবেদনের ভক্তি ফুটিয়া উঠে নাই। তিনি নিষ্কাম ধর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন, নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। উভয়ের কৃত গীতার ভাষ্যের তুলনায় সমালোচনা করিলে এই কথাটা বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইবে। গ্রন্থকার এই দিক্ দিয়া উভয়ের মতের বিচার করিতে পারিতেন। আর এক কথা; এত বড় পুঁথিতে চরিতের সমালোচনা আছে, কর্ম্মের তুলনা নাই কেন? বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের বিচার নাই কেন? শ্রীভাষ্য ও শঙ্কর-ভাষ্যের উৎকর্ষাপকর্ষের আলোচনা দেখিলাম না কেন? চরিত আছে; অথচ ভক্তি শাস্ত্রের মানদণ্ডে অতিপ্রাকৃত বা দৈবাধীন ঘটনা সকলের বিশ্লেষণ নাই; উভয়ের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের সাম্য ও বৈষম্যের বিচার নাই; সম্প্রদায়-বিন্যাস হেতু ভারত-বর্ষের হিন্দু সমাজের উপর উহাদের প্রভাবের তুলনায় সমালোচনা নাই। আর নাই Comparative history--শঙ্কর যুগের ও রামানুজ যুগের ভারতের সামাজিক ইতিহাসের বিচার। কোন্ শক্তির প্রেরণায় শঙ্করের উদ্ভব, কোন্ কোন্ শক্তির সমবায়ে রামানুজ অবতার, তাহা ত এত বড় পুঁথি পড়িয়া জানিতে পারিলাম না। আশা করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ইতিহাস-কথা দেখিতে পাইব। যাহা হউক, তথাপি বলিব যে, রাজেন্দ্র-নাথের এই পুঁথিখানি সুন্দর হইয়াছে। বিদ্বজ্জনসমাজে ইহা প্রচারিত হইলে, অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করিবে, সদ্ভাবের দিকে বাঙ্গালীকে পরিচালিত করিবে। এই হেতু আমরা

গ্রন্থকারকে ধন্য ধন্য করিতেছি। তিনি উদ্‌যোগী ও অনুসন্ধিৎসু পুরুষ; তিনি সু-লেখক ও সত্যপরায়ণ। আমরা তাঁহার পুস্তকখানি আগাগোড়া পড়িয়াছি। পড়িয়া একহিসাবে সুখবোধ করিয়াছি। তবে আমরা যে গুরুমুখ করিয়া শাস্ত্র পাঠ করিয়াছি, তিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই সম্প্রদায়ের ছাপ আমাদের মন হইতে মুছিয়া যাইবার নহে। তাই রাজেন্দ্রনাথের পুস্তক অবলম্বনে আমরা গোটাকয়েক কথা ইঙ্গিতে বলিয়া লইলাম। তিনি আমাদের প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# পত্র।

শ্রীযুক্ত "সাহিত্য" সম্পাদক মহাশয়

সুকরকমলেষু

১

বলি শুন বন্ধুবর, ঘুণ-ধরা বাঁশে ভর
দেয়া তব মিছে।
জীবনের তিন ভাগ, তার সুর তার রাগ
পড়ে' আছে পিছে॥
সিকি যাহা আছে বাকি, দিতে নাহি চাহি ফাঁকি,
—অথচ নাচার।
যার অর্থ আমি খুঁজি, ভাল ক'রে নাহি বুঝি,—
কি করি প্রচার?
এ হেন লেখক নিয়ে পত্রিকা চালাতে গিয়ে,
ঠেকে যাবে দায়ে।
কল্পনা কাম্বোজ ঘোড়া, বয়েসে হয়েছে খোঁড়া,
চলে তিন পায়ে॥
ভোঁতা হল পঞ্চবাণ, প্রেমের উজান বান
নাহি ডাকে মনে।
সমাজের পোষা পাখী, সমাজ খাঁচায় থাকি,
ভুলে গেছি বনে॥
এখন দখিনে বায় শুধু মিষ্ট লাগে গায়,
হাড়েতে লাগে না।
মলয়ের মন্দ ফুঁয়ে হৃদয় গেলেও ছুঁয়ে,—
হৃদয় জাগে না॥

পাপিয়ার কলতান, আজো শুনি পাতি কান—
করিনু স্বীকার।
অশরীরী তার গানে আজিকে আনে না প্রাণে
তরুণ বিকার॥
বসন্তে কুসুম ফোটে, নিশ্চয় ভ্রমর ছোটে
তার গন্ধ পেয়ে।
মুখ দিয়ে ফুলে ফুলে, কি যে করে অলিকুলে—
দেখিনাকো চেয়ে॥
আজিও পূর্ণিমানিশি ঢেলে দেয় দিশি দিশি
কিরণ শীতল।
কিন্তু তার দিব্যবর্ণ পারে না করিতে স্বর্ণ
মর্ত্ত্যের পিতল॥

২

কপালেতে ছিল লেখা, তাই আজ লিখি লেখা,
অবসর পেলে।
কথার নেশায় মাতি, কথায় কথায় গাঁথি,
স্মৃতি-বাতি জেলে॥
লেখাপড়া মোর পেশা, লেখাপড়া মোর নেশা,
কাজ আর খেলা।
সেই কাজ, সেই খেলা, করিয়াছি অবহেলা,
যবে ছিল বেলা॥
এখন চারিটি দিকে রঙ যবে হল ফিকে,
রচি গদ্য পদ্য।
তাহার পোনেরো আনা, সবাকারি আছে জানা,
মোটে নয় সদ্য॥
যে কথা হয়েছে বলা, সেই কথা সেধে গলা,
বলি আর বার।
মনের পুরোণো মাল, মেজে ঘসে করি লাল,
করি কারবার॥
হয় ত বা পুরোপুরি, না জেনে করেছি চুরি,
পর-মনোভাব
অথবা জাওর কাটি, খেয়ে আমি পরিপাটী
সাহিত্যের জাব॥

৩

শুনিতে আমার কথা, কার হবে মাথা-ব্যথা,
ভাবিয়া না পাই।
মানুষে কাব্যের গায় আগুন পোয়াতে চায়,
—নাহি চায় ছাই॥
আমি চাহি সত্য বলি, সত্য মোরে যায় ছলি,
মিথ্যা রেখে হাতে।
কাব্যে চলে মিছে কথা,— কাব্যের এ মিছে কথা
লেখা পাতে পাতে॥
ভাবকে তরল করা, ভাষাকে সরল করা,
নয় সোজা কাজ।
মনকে উলঙ্গ করি, এত না সাহস ধরি,
সেটা জানি আজ॥
তাইতে বাহিরে আনি, ঢেকে তার দেহখানি
বাক্য-কিংখাবে।
বলি, হের পেশোয়াজ, হেন চারু কারুকাজ
আর কোথা পাবে?
আঁটসাঁট ছন্দোবন্ধ দিয়ে রচি কটিবন্ধ
মোর কবিতার।
দেখিলে পরখ করি, দেখিবে হয় ত জরি
ঝুঁটো সবি তার॥
কবি চাহে নব ধাঁচে মনের পুতুল নাচে,
সাহিত্য-আসরে।
বাহবা পরের কাছে নর্ত্তকীর মত যাচে,
প্রমোদ-বাসরে॥
ভাষা ভাব এলো করা, কবিতাকে খেলো করা
হয় তাহে জানি।
তাই বলে শুধু রঙ্গ, কাব্যে করা অঙ্গভঙ্গ,
ভাল নাহি মানি॥
হলে ভাবেতে ফতুর, হই ভাষায় চতুর—
এটি নাহি ভুলি।
কেহ দেয় করতালি, কেহ দেয় খর গালি,
কানে নাহি তুলি॥

৪

এবে চাই গলা খুলে, ছলাকলা গিয়ে ভুলে,
সাদা কথা বলি।
ত্যজি সব অহঙ্কার, খুলি বস্ত্র অলঙ্কার,
রাজপথে চলি॥
কিন্তু সে হবার নয়, চলিতে পাই গো ভয়
সেই পথ ধরে'।
সে পথের কোথা শেষ, নাহি জানি সবিশেষ,—
না জানে অপরে॥
যা না দেখি, যা না জানি, তাই নিয়ে হানাহানি,
গুরুতে গুরুতে।
সৃষ্টির আসল মানে, কেহ কিছু নাহি জানে,
শেখায় পুরুতে॥
জলো ধর্ম্ম, জলো নীতি, বেচা কেনা হয় নিতি,
সাহিত্য-বাজারে।
তত্ত্ব, তথ্য, তন্ত্র মন্ত্র, জন্ম দেয় মুদ্রাযন্ত্র,
হাজারে হাজারে॥
হয় জ্ঞানী কাটা ঘুড়ি, নয় দেয় হামাগুড়ি,
ভুঁয়ে মুখ গুঁজে।
মুখে বলে "আবি আবি", অন্ধকারে খায় খাবি,
ভয়ে চোখ বুঁজে॥
অথবা টানিয়ে কল্কি বলে বিশ্ব মহা ভেল্কি,
জ্ঞানে যাবে উড়ে।
এ দিকে কান্নার রোল, উঠিতেছে অবিরল,
দশ দিক জুড়ে॥
মানবের অশ্রুবারি যাহে না মুছাতে পারি,
সেই জ্ঞান ফাঁকি;
দর্শন বিজ্ঞান তাই, উড়িয়ে কথার ছাই,
কানা করে আঁখি॥
তাই কথা বড় বড় একত্র করিতে জড়,
ভাল নাহি বাসি;
নাহি লাগে কারও কাজে,— বড় কথা বড় বাজে,
নয় বড় বাসি॥

ঢের ভাল তার চেয়ে চলে' যাওয়া গান গেয়ে
আপনার মনে।
পলে পলে যাহা ফুটে', দলে দলে যায় টুটে,
হৃদয়ের বনে॥

৫

মানুষেতে কিবা চায়, কেন করে হায় হায়,
কি তার অভাব?
কেবা জানে, কেবা বলে, —এইমাত্র বলা চলে,
এ তার স্বভাব॥
রমণী ধরিলে ক্রোড়ে, সব বুক নাহি জোড়ে,
ফাঁক থেকে যায়!
শূন্য মনে বুঝাইতে, শূন্য হিয়া বুজাইতে,
আনে দেবতায়॥
সে শুধু অনন্ত ধোঁয়া, নাহি দেয় ধরা ছোঁয়া,
নাহি যায় সরি।
সেই ভয়, সেই আশা, নাহি কোন জানা-ভাষা,
যাহে রাখি ধরি॥
অতৃপ্ত হৃদয় কাঁদে, পড়িতে প্রেমের ফাঁদে,
ফিরে বার বার।
এইমাত্র আমি জানি, এইমাত্র আমি মানি
জগতের সার॥
"জানি মোরা খাঁটী সত্য, ছোট বড় গূঢ় তত্ত্ব,
সকল সৃষ্টির।"
বলে' যারা করে সোর, জানে তারা কত জোর
কথার বৃষ্টির॥
আমি চাহি শুধু আলো, ভাল নাহি বাসি কালো,
অন্তরের ঘরে।
আর জানি এক খাঁটী, পায়ের নীচেতে মাটী
আছে সবে ধরে'॥
মাটী আর আলো নিয়ে, দিতে চাই ছুয়ে বিয়ে,
সসীমে অসীম!
যত কিছু লেখা পড়া, তার অর্থ শুধু গড়া
মাটীর পিদীম॥

আর নাহি জোটে মিল, হাতে লেগে আসে খিল,
চলে না কলম;
মস্তিষ্ক কাতরে চায়, এড়াতে চিন্তার দায়,
ঘুমের মলম॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

---

# বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষায় যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। শেষ বয়সেও তাঁহার এ আগ্রহ দেখিয়াছিলাম। একদা তিনি কিছু শিখিবার জন্য আচার্য্য ৺সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন; সঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেববাবু ছিলেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যের নাম অনেকেই হয় ত শুনিয়া থাকিবেন। এ দেশের লোক তাঁহাকে যতটা না চিনিত, বিদ্যার লীলাভূমি য়ুরোপ তাঁহাকে তদধিক চিনিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় ছিল না। পরে উভয়ের মধ্যে একটু কুটুম্বিতা সংস্থাপিত হয়। সেই সূত্র ধরিয়া পরস্পর যাতায়াত আরম্ভ করেন। যে দিনের ঘটনা বলিতেছি, সেদিনের পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র বা ভূদেব বাবু কেহই আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে আসেন নাই।

বাড়ীটি ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ—কলিকাতার একটি গলির মধ্যে অবস্থিত। দুই জনে—বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেবচন্দ্র—দ্বারে দাঁড়াইয়া দ্বিতলের সিঁড়ির পানে চাহিয়া দেখিয়া আচার্য্য মহাশয়ের সহিত আলাপ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। সিঁড়িটি কাঠের—একটা মই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্মানিত অতিথিদ্বয় দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন শুনিয়া পূজনীয় আচার্য্য মহাশয় সিঁড়ির মাথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন; এবং উভয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ভূদেববাবু ও বঙ্কিমবাবু উভয়েই বিষণ্ণবদনে উর্দ্ধদৃষ্টিতে আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আচার্য্য তখন নামিয়া আসিয়া উভয়কে উপরে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেববাবুর পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ভয় সংক্রামক। ভূদেববাবুর যে-টুকু সাহস ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। তিনি কাতরভাবে বলিলেন, "আচার্য্য মহাশয়, এ টোঙ্গায় ত উঠিতে পারিব না।" পূজ্যপাদ আচার্য্য মহাশয়

সিঁড়িতে কিরূপে উঠিতে নামিতে হয়, তাহার একটু মহলা দিলেন; কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোনও ফল হইল না।

আর একদিন বঙ্কিমচন্দ্র, মহারথী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া, আচার্য্য-দর্শনে আসিয়াছিলেন। সে দিন বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ়সংকল্প—বুকের ভিতর কি হইতেছিল, জানি না; কিন্তু গাড়ী ছাড়িয়া গলির ভিতর আসিতে না আসিতে তিনি রমেশবাবুর হাত জড়াইয়া ধরিলেন। বুঝিলাম, সাহসটুকু লোপ পাইয়াছে। অতঃপর সিঁড়ির নীচে যখন উভয়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বদনে ভয়ের চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছে। তিনি কেঁচো, কেন্নো, আশুর্লা প্রভৃতিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন, জানিতাম। কিন্তু যিনি উত্তালতরঙ্গমধ্যে, দস্যুসম্মুখে নির্ভীকচিত্ত, তিনি যে একটা সিঁড়িতে উঠিতে এতটা ভীত হইবেন, তাহা কখনও ভাবি নাই। অবশেষে নির্ভীকহৃদয় বলিষ্ঠদেহ রমেশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার তখনকার কাতর মুখ আমার কিছুদিন মনে ছিল। রমেশবাবু কোনও গতিকে বঙ্কিমচন্দ্রকে টানিয়া উপরে তুলিলেন! বঙ্কিমচন্দ্র নিরাপদ স্থানে পঁহুছিয়া চক্ষু খুলিলেন, এবং বলিলেন, "ভাই রমেশ, উপরে তুল্‌বার সময় এই রকম করে আমায় তুলো।"

বঙ্কিমচন্দ্র আরও কয়েকবার সামশ্রমী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তখন তিনি "ধর্ম্মতত্ত্ব" লিখিতেছিলেন। শেষ আসিয়াছিলেন, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। সেবার শিক্ষার জন্য নয়—আচার্য্য মহাশয়ের চতুষ্পাঠী পরিদর্শন করিবার জন্য।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

# আনন্দ-মিলন।

'রথ দেখা ও কলাবেচা'—এই উভয় উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া বিগত অক্ষয়-তৃতীয়ার পূর্ব্ব দিন কুমারখালী গিয়াছিলাম। বঙ্গ-সাহিত্যে আজকাল 'চীন-ভ্রমণ' 'জাপান-ভ্রমণ' প্রভৃতি প্রকাশিত হইতেছে; আমার কুমারখালী-ভ্রমণ কি এ বাজারে বিকাইবে?

অক্ষয়তৃতীয়ায় কুমারখালীতে কাঙ্গালের বন্ধু সাধকপ্রবর স্বর্গীয়

হরিনাথ মজুমদার মহাশয় নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সে আজ সতের বৎসরের কথা। এবার এই সপ্তদশ বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। নিমন্ত্রণকর্ত্তা আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও কাঙ্গালের পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার। সাহিত্য-সেবায় জলধর বাবু কাঙ্গালের শিষ্য; কাঙ্গালের সুপবিত্র স্মৃতির প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য তিনি প্রতিবৎসর এই সময় কুমারখালীতে গমন করিয়া থাকেন; আমিও ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, কিন্তু "বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি"—ইহাই এখন আমার মূল মন্ত্র; এ পর্য্যন্ত গৃহ-বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কাঙ্গালের উৎসবে যোগদান করিতে পারি নাই। কিন্তু এবার যখন শুনিলাম—এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে কয়েক জন সাহিত্যিক বন্ধু কুমারখালীতে পদার্পণ করিবেন,—তখন তাঁহাদের সহিত মিলনের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সমাজপতি মহাশয়কে লিখিলাম, আমি কুমারখালী যাইতেছি, তিনি যেন পদবেদনায় উপেক্ষা করিয়া খোঁড়া পা লইয়াই কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। ইহাতে তাঁহার পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই,—কুমারখালী ষ্টেশনে অনেক পাল্কী পাওয়া যায়। তবে সেই সকল 'ডিক্‌স্' এডিসনের পাল্‌কী তিন চারিখানি যোড়া না দিলে সমাজপতি মহাশয়ের বর বপুর স্থান সঙ্কুলান হইবার সম্ভাবনা নাই! সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের সহিতও অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই। এই উপলক্ষে তাঁহারও দর্শনলাভ ঘটিতে পারে—জলধর বাবুর পত্রে এ আশা পাইয়াও যথেষ্ট উৎফুল্ল হইয়াছিলাম। বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম রথী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের সুপবিত্র সম্মার্জ্জনীর আক্রমণ হইতে কবিশ্রেষ্ঠ দাশরথী রায়কে উদ্ধার করিয়া চন্দ্রশেখর বাবু আমাদের ন্যায় অকৃতী সাহিত্য-সেবকগণের যেরূপ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, সেই কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের জন্যও তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবল হইয়াছিল।

আমাদের বাসগ্রাম মেহেরপুর হইতে কুমারখালী যাইতে হইলে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে ট্রেণে চড়িতে হয়। মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনের নয় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত; এই দীর্ঘ পথ সাধারণতঃ সনাতন গরুর গাড়ীতেই 'পাড়ী' দিতে হয়; ঘোড়ার গাড়ীও দুই এক-

খানা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু 'ঢাকের কড়িতে মনসা বিকায়!'—তবে যাঁহারা এই নয় ক্রোশ পথ যাতায়াতে দশ টাকা খরচ করিতে কষ্ট বোধ না করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

গরুর গাড়ীতে নয় ক্রোশ যাইতে হয়, শুনিয়া সহর অঞ্চলের পল্লী-ভ্রমণবিমুখ যান-বিলাসী পাঠকসমাজের হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে; কিন্তু আমরা পল্লীগ্রামের লোক, গো-যান আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে বেশ খাপ খায়। গরুর গাড়ীর 'ছৈ' দেখিতে মন্দ নয়। বাখারীর সাজের উপর ফরাসী ছিট্ বা সালু বিস্তৃত; তাহার উপর ডু পুরু চাটাই; তাহার উপর চট, আলকাতরায় অনুরঞ্জিত;—'ছৈ'-এর মধ্যে বসিয়া রৌদ্রে পুড়িবার বা বৃষ্টিতে ভিজিবার আশঙ্কা নাই। তাহার পর ছৈএর মধ্যে পুরু করিয়া বিচালী বিছাইয়া, তুস্থক পাতিয়া, বালিশে মাথা রাখিয়া, লম্বা হইয়া শয়ন করিলে, এই নয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে কোনও কষ্ট হয় না! শয়নের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাকর্ষণ হয়; চুয়াডাঙ্গার প্রান্ত-বাহিনী পূর্ণা নদীর তীরে আসিয়া গাড়ী থামিবার পূর্ব্বে নিদ্রাভঙ্গের সম্ভাবনা অল্প। তবে রাত্রিকালে যাত্রা করিয়া কখনও কখনও ট্রেণ ধরা কঠিন হয় বটে; কারণ, গাড়ীতে উঠিয়া শয়ন করিবার পরই আরোহীর নাসিকাগর্জ্জন আরম্ভ হয়; তাহার পর দুই এক ক্রোশ যাইতে না যাইতে 'ছৈ'-এর সম্মুখে উপবিষ্ট গাড়োয়ান মহাশয়ের তৈলচর্চ্চিত মস্তক বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে, শিথিল মুষ্টি হইতে 'পাচন' খসিয়া পড়ে; তখন বলদ দুটিও 'জোঁয়াল' ঘাড়ে লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুমায়! কিন্তু বাষ্পীয় শকটের চক্ষুতে ঘুম নাই; সে বায়ুবেগে যথাসময়ে ষ্টেশনে আসে, এবং পাঁচ মিনিট থামিয়া বাঁশী বাজাইয়া গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলে। নিদ্রাভঙ্গে গাড়োয়ান বলদদ্বয়ের লেজ মলিয়া 'উড়ে চ, বাবা-ধন ডা!' বলিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিয়াও ট্রেণ ধরিতে পারে না! অগত্যা নিদ্রোত্থিত ক্রুদ্ধ আরোহী গাড়োয়ান বেচা-রাকে মনের সুখে গালি দিয়া শান্তিলাভ করে।

নদীয়ার পোষ্টাল সুপারিণ্টেনডেণ্ট সহৃদয় শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয়ের অনুগ্রহে এই অসুবিধা কতকটা দূর হইয়াছে। তিনি মেহেরপুর হইতে চুয়াডাঙ্গা পর্য্যন্ত ডাকগাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া স্থানীয় জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ডাকগাড়ী প্রত্যহ রাত্রে

চুয়াডাঙ্গা পর্য্যন্ত একবার ডাক লইয়া যাতায়াত করে। গাড়ীর ছাদে ডাকের ব্যাগ, কোচবক্সে' বিউগিল-ধারী কোচম্যান, তাহার এক হস্তে পক্ষিরাজের রজ্জু-নির্ম্মিত লাগাম, অন্য হস্তে বিউগিল। গাড়ীর ভিতর চারি জন আরোহীর স্থান। প্রত্যেক আরোহীর টিকিটের মূল্য এক টাকা চারি আনা। আরোহিগণকে লট্‌বহর লইয়া স্থানীয় ডাক-ঘরের বারান্দায় ছারপোকা-কণ্টকিত আমকাঠের বেঞ্চিতে বসিয়া ঝিমাইতে হয়, এবং কদাচিৎ ডাকমুন্সী মহাশয়ের গড়গড়ার শীর্ষস্থিত অম্বুরী তামাকের মিষ্টগন্ধ তাহাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে। যে দিন চারি জন আরোহী না জোটে, সে দিন কোচম্যান ঘন ঘন বিউগিল ধ্বনি করে; অভিপ্রায় এই যে, 'চুয়াডাঙ্গায় যানেওয়ালা কেহ থাকো তো ছুটিয়া এস, ডাক-গাড়ী ছাড়িবার আর বড় দেরী নাই।'—পথের ধারে যাহাদের বাড়ী, তাহাদের ডাকঘর পর্য্যন্ত গিয়া ধরণা দিবার প্রয়োজন হয় না; তাহারা পথ হইতেই গাড়ীতে উঠে।

আমার বাড়ী পথের ধারে হইলেও সন্ধ্যার পর আহারাদি শেষ করিয়া ডাকঘরে উপস্থিত হইলাম। ডাক বাঁধিবার অধিক বিলম্ব ছিল না; গাড়ীতে উঠিয়া দেখিলাম—আমিই একমেবাদ্বিতীয়ম্; সেদিন অন্য আরোহী জোটে নাই।—রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় বিউগিল বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।—বাড়ীর কাছে আসিয়া আমি একবার সতৃষ্ণনয়নে আমার ঘরের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, আমার তিন বৎসরের ছেলেটি তাহার দিদির হাত ধরিয়া পৈঠায় দাঁড়াইয়া আছে; আমি গাড়ীতে আছি বুঝিয়া সে দুই হাত তুলিয়া করুণস্বরে 'বাবা বাবা' বলিয়া ডাকিল। বাবা যে তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতীত। অন্যদিন এতক্ষণ সে শয়ন করে—আজ অন্ধকার রাত্রে গাড়ীখানি দেখিবার জন্য সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাত্রার পূর্ব্বে সে কতবার বলিয়াছিল, "তোমাকে যেতে দেবনা বাবা!"—কিন্তু "তবু যেতে দিতে হয়।"

আকাশে মেঘ করিয়াছিল; অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে সেই বৃষ্টি বড় তৃপ্তিকর বোধ হইল। গাড়ী ক্রমে গ্রাম্য-পথ অতিক্রম করিয়া মাঠে পড়িল। কোচম্যানের সঘন তূর্য্যনাদ ব্যর্থ হইল, আর কোনও যাত্রী জুটিল না।—চুয়াডাঙ্গা পর্য্যন্ত পথ ইষ্টক-বদ্ধ, পথের কোনও স্থানে গর্ত, কোনও স্থানে ইষ্টকের পঞ্জর বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

অসমান পথে গাড়ী ভয়ানক দুলিতে লাগিল; আমি নির্ব্বিকারচিত্তে গাড়ীর ভিতর বসিয়া পল্লী-প্রকৃতির নৈশ শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। মাঠের পর মাঠ, লোকালয়ের চিহ্ন নাই, চষা মাঠের মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা কুল, বাবলা বা খেজুর গাছ দাঁড়াইয়া আছে; পথের দুই পাশে সেগুণ, কাঁঠাল ও জাম গাছের সারি; তাহাদের পত্রান্তরালে লক্ষ লক্ষ জোনাকী মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে; গর্ত্তের মধ্যে ঝিঁঝিঁর দল অবিশ্রান্ত ঝঙ্কার করিতেছে। একটি মাঠে এক জন রাখাল গরু চরাইতেছিল; দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্রে গরু চরাইতে পারে নাই; রাত্রে মাঠের মধ্যে গরুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া পথের প্রান্তবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র সাঁকোর পিল্‌পার উপর বসিয়া সে মেঠো সুরে গায়িতেছিল,—

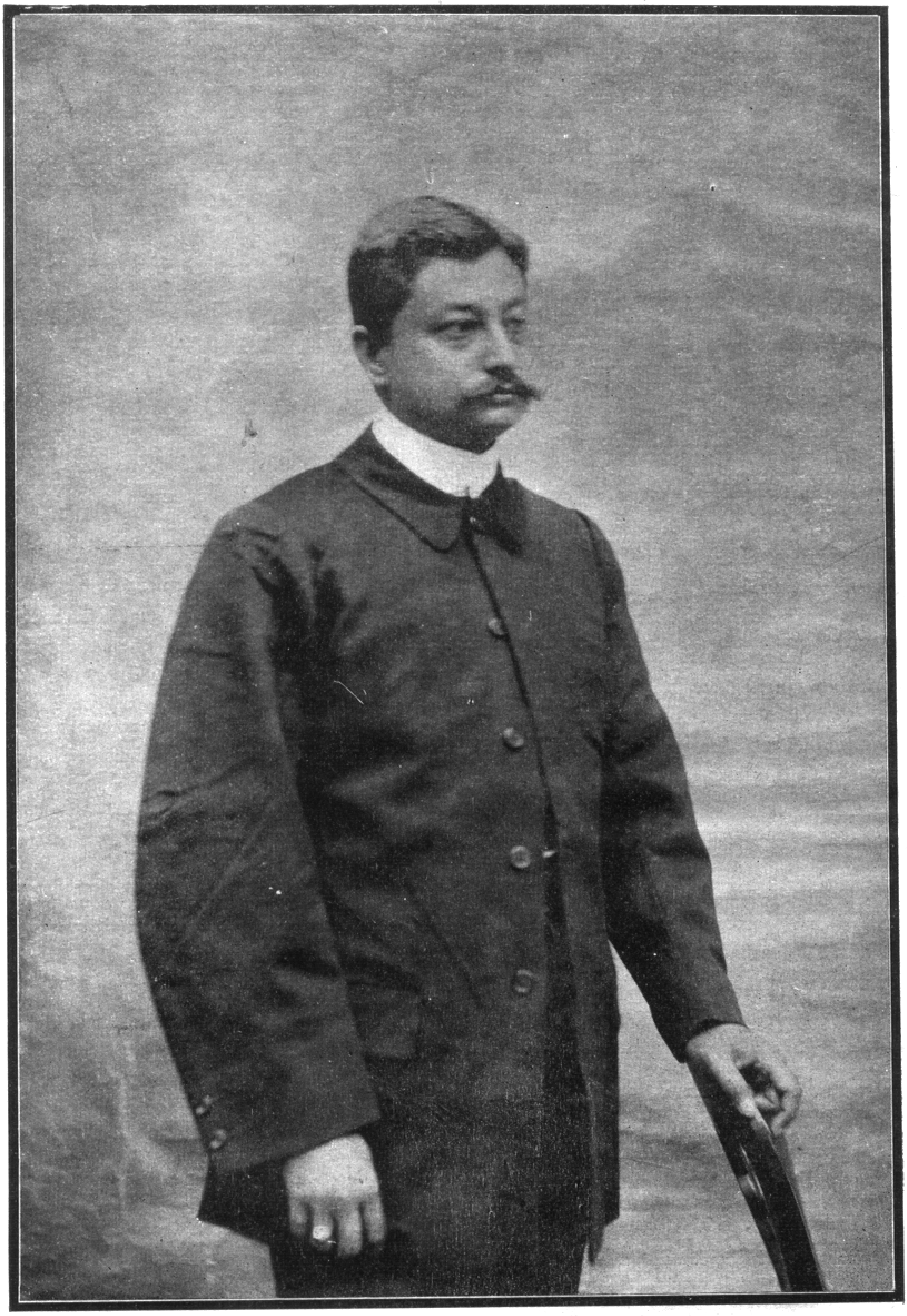
"আর ত 'ব্রেজে' যাবো না ভাই, যেতে মন নাহি চায়,
ব্রেজের খ্যালা ফুরিয়েছে রে, তাই এসেছি মথুরায়।"

এমন মথুরায় সে প্রত্যহ আসে, এবং গরু চরাইয়া 'ব্রেজে' ফিরিয়া যায়। কিন্তু তাহার শামলী ধবলী তখন কাহার ক্ষেতে পড়িয়া ফসল খাইতেছিল, সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না।

গাড়ী ক্রমে কাজলা নদীর ক্ষুদ্র পুল অতিক্রম করিয়া আমঝুপির ডাকঘরের কাছে থামিল। পথের দুই ধারে কয়েকখানি দোকান। কোনও দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, ভিতরে কেরোসিনের ডিবা হইতে অল্প আলো ও প্রচুর ধূম নির্গত হইতেছিল। দোকানী দোকানে বসিয়া নিম্নস্বরে কাহার সহিত গল্প করিতেছিল। কোনও দোকানে তখনও ক্রয় বিক্রয় চলিতেছিল। আবার কোনও দোকানে 'টাটে'র পাশে একখানি জলচৌকীর উপর বসিয়া এক জন লোক সুর করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করিতেছিল; আর এক দল শ্রোতা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া সেই সুধাময় পুণ্যগাথা শুনিতেছিল, এবং দোকানী অদূরে টুলের উপর বসিয়া গম্ভীরভাবে হুঁকা টানিতেছিল।

ডাকগাড়ীর বিউগিল শুনিয়া এক জন হরকরা একটা ব্যাগ আনিয়া কোচম্যানের হাতে দিল। কোচম্যান তাহা যথাস্থানে রাখিয়া ঘোড়ার পিঠে চাবুক দিল; পক্ষিরাজদ্বয় আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল।

মিনিট পনেরো পরে আমরা দীনদত্তের ঘাটে আসিয়া 'ইন্জিকেল ব্রিজ্' দিয়া নদী পার হইলাম। জেলাবোর্ডের ঘাট, পারাণী না দিলে



শ্রীযুত ভবানীচরণ লাহা।

Block and Printed by the Mohila Press, Calcutta.

সাঁকো পার হইবার উপায় নাই! সাধারণে এই সাঁকো-নির্ম্মাণের জন্য কতক টাকা চাঁদা দিয়াছিল; জেলাবোর্ড কতক টাকা দিয়াছিলেন। কথা ছিল—ঘাটের ডাক যদি নিলামে হাজার টাকার উর্দ্ধে না উঠে, তাহা হইলে পারপণ্য না লইয়া লোক জনকে সাঁকো পার হইতে দেওয়া হইবে। কিন্তু কয়েক জন 'ফড়ে' জিদ্ করিয়া ডাক চড়াইতে লাগিল, বার'শ টাকায় ঘাট ডাক হইল। কাজেই যাত্রীদের পারাণী লাগিতেছে! স্থানীয় জনসাধারণ ভূতপূর্ব্ব কালেক্টরকে ধরিয়া বসিলেন, "আমরা চাঁদা দিয়াছি; এখন আবার পারাণী দিব কেন?—ঘাট যখন নিলাম করা হইয়াছে, তখন আমাদের চাঁদার টাকা ফেরত দেওয়া হউক।"—কালেক্টর বলিলেন, "তোমরা খেয়ার কড়ি দিয়া ভাঙ্গা নৌকায় ডুবিয়া পার হইতেছিলে, সাঁকো করিয়া দিলাম, এখন চাঁদা ফেরত চাও!" সুতরাং আমরা এখন গরুর গাড়ীর যাতায়াতে নয় পয়সা ও ঘোড়ার গাড়ীর যাতায়াতে পাঁচ সিকা পারাণী দিতেছি। গরুর গাড়ীর পারাণী নয় পয়সা হইলে যে ঘোড়ার গাড়ীর পারাণী পাঁচ সিকা হয়, জেলাবোর্ডের কোন্ শুভঙ্করের মস্তকে এই ত্রৈরাশিকের উদ্ভব হইয়াছিল? সুখের বিষয়, ডাকগাড়ীর পারাণী নাই, ডাকগাড়ীর আরোহিগণের পারাণী নগদ এক পয়সা।

পাছে কেহ চুরী করিয়া সাঁকো পার হয়, এই ভয়ে ঘাটের (বা পুলের) 'ইজারদার' পুলের মধ্যস্থলে একটি বাঁশের বেড়া দিয়া তালাবন্দী করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দর লৌহসেতুর উপর বাঁশের বেড়া—যেন সুদৃশ্য তেতা-লার ছাদে গোলপাতার 'টাটি'!—পুল পার হইয়া গাড়ী খন্-খন্ ঝন্-ঝন্ শব্দে চুয়াডাঙ্গার দিকে ছুটিল। নিকটে কোনও গ্রাম নাই, মাঠের পর মাঠ, কর্ষিত কৃষিক্ষেত্র। নিশীথিনীর কৃষ্ণ অন্ধকার অবগুণ্ঠনে সমস্ত প্রকৃতি সমাচ্ছন্ন। নিকটে কোনও দিকে মনুষ্যের সাড়াশব্দ নাই; মধ্যে মধ্যে বহু-দূরবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসিগণের হরিনাম-সংকীর্ত্তন ও মৃদঙ্গধ্বনি অব্যাহত সমীরণ-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল। পথের দুই ধারে ডোবা, গর্ত্ত, নয়ঞ্জুলি। পূর্ব্বদিন প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছিল; সেই সকল ডোবা ও গর্ত্তে যথেষ্টপরিমাণ জল সঞ্চিত হইয়াছে; আর ভেকের দল নানাস্বরে সঙ্গীতালাপ করিতেছে। একটা গর্ত্তের উপর বাঁশবনের মধ্যে বসিয়া একটা ডাহুক বিদীর্ণকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে। এই মেঘমণ্ডিত অন্ধকার রাত্রি, লক্ষ লক্ষ ভেকের মকধ্বনি, ডাহুকের হতাশ আর্ত্তনাদ, আর্দ্র বায়ুর

তীব্রপ্রবাহ, আর ফিস্ ফিস্ বৃষ্টি—সকলে মিলিয়া আমার চারি দিকে ঘনঘোরা শ্রাবণনিশার স্বরূপ ঘনাইয়া তুলিল। আমি মুগ্ধনেত্রে নৈশ-প্রকৃতির উন্মাদিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময় একটা আমবাগানের ভিতরে দলবদ্ধ হইয়া কতকগুলি শৃগাল 'হুয়া হুয়া' করিয়া উঠিল। বোধ হয় ঘোষণা করিল, একপ্রহর রাত্রি হুয়া!

একপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত ডাকগাড়ীর বাতি জ্বলিবে, ইহা আশা করা বাতুলতামাত্র। ডাকগাড়ীর এক দিকে একটি লণ্ঠন, তিনখানা কাচের দেড়খানা নাই, মধুঅভাবে গুড়ের মত কাগজের পটী দিয়া কাচের অভাব দূর করা হইয়াছে!—এই এক লণ্ঠন জ্বালাইয়া একচক্ষু ভূতের মত গাড়ীখানি এতক্ষণ ঘণ্টায় ছয় মাইল বেগে ছুটিতেছিল। এখন বাতিটি নিবিয়া গিয়াছে। 'কুলপালা'র অরণ্যের কাছে আসিয়া ভয় হইল, যদি এক দল ডাকাত হঠাৎ গাড়ী ঘেরাও করিয়া আমার ঘড়ী-চেন ও পাথেয় তিন টাকা সাড়ে তের আনা কাড়িয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আনন্দ-মিলন বিষম ব্যসনে পরিণত হইবে। কিন্তু ইংরাজের ডাকগাড়ীর উপর চড়াও করে, এত সাহস এ অঞ্চলের দস্যুদের নাই। ধন্য বৃটীশ-মহিমা, একটিমাত্র কোচ্‌ম্যান হাজার হাজার টাকার নোট-বোঝাই ডাকের ব্যাগ লইয়া এই অরণ্যসমাচ্ছন্ন নির্জ্জন পথে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিতেছে—অস্ত্রের মধ্যে তাহার হাতে এক বিউগিল, আর আমার হাতে এক ছড়ি!

রাত্রি দশটার সময় গাড়ী গোকুলখালী গ্রামের ডাকঘরের সম্মুখে আসিয়া 'বিউগিল্' দিল। ডাকঘরটি জেলাবোর্ডের রাস্তা হইতে পঁচিশ ত্রিশ হাত দূরে, খড়ের ঘর। ডাকঘরের বাবুর তখন মধ্যরাত্রি। পাঁচ সাত বার বিউগিল-ধ্বনির পর এক জন পিয়ন ডাকের ব্যাগ আনিয়া কোচ্‌ম্যানের হাতে দিল। পিয়নের চক্ষু নিদ্রাভারাবনত; নিতান্ত দায়ে পড়িয়া সে ব্যাগটা গাড়ীতে দিতে আসিয়াছিল; পাছে ঘুমের নেশা ছুটিয়া যায়, এই ভয়ে সে চক্ষু মেলিতে সাহস করিতেছিল না। কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া কোচ্‌ম্যানের দয়া হইল না, সে বলিল, "একটু তামাক খাওয়াতে পারিস্ ভাই, ঠাণ্ডিতে হা পা 'কালিয়ে' দিলে!" পিয়ন হাঁই তুলিয়া তুড়ি দিয়া বলিল, "আঁধারে কল্‌কে খুঁজে পাব না।" কোচ্‌ম্যান বলিল, "কোল্‌কে আমার কাছেই আছে, মেচবাক্সও আছে।" পিয়ন বলিল, "তবে তামাক সেজে খাও।" কোচ্‌ম্যান বলিল, "তামাকই যে

নেই।” পিয়ন বলিল, “তবেই হয়েছে! আমাদের যে তামাক্‌টুকু ছিল, তা মথুর হালদার সাঁজের বেলা ‘সাবাড়’ করে গিয়েছে।” কোচ্‌ম্যান বিরক্ত হইয়া বলিল, “দূর মিন্‌সে! তামাক রাখে না, ডাকঘরে চাকরী করে!” পিয়ন হাসিল। ডাকঘরে চাকরী করিয়া টেবিলের দেরাজে তামাক না রাখা গুরুতর অপরাধ! সে অপরাধীর মত অবনতমস্তকে সরিয়া পড়িল। কিন্তু কোচ্‌ম্যান নিরুৎসাহ হইবার পাত্র নহে, নতুবা সাত টাকা বেতনে সে কি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ডাকের গাড়ী চালায়? সে কলিকা লইয়া তাম্রকূট নামক মহাদ্রব্যের সন্ধানে মুদীর দোকানের দিকে চলিল। ঘোড়া দুটি বল্‌গার লৌহদণ্ড চর্ব্বণ করিয়া ক্ষুন্নিবারণ করিতে লাগিল। আমি পথপ্রান্তবর্ত্তী দোকানগুলির দিকে চাহিয়া রহিলাম।

আমার সম্মুখেই একটা ময়রার দোকান। দোকানী উনানের কাছে বসিয়া তখনও খোলায় ‘তাড়ু’ নাড়িতেছিল। বোধ হয়, বাঙ্গালী-চিত্তহারী রসগোল্লার ভিয়েন করিতেছিল। আহা রসগোল্লা! তোমার রসে যাহারা বঞ্চিত, তাহাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই। তুমি এই শ্রীভ্রষ্টা বাঙ্গলায় অতিথির মান রাখিয়াছ। তোমার কৃপায় শ্যালক-সম্প্রদায় ভগিনী-পতির গৃহে এখনও সসম্মানে বিরাজ করিতেছে। তোমার কত গুণ হে অখণ্ডমণ্ডলাকার!—

এই প্রকার রসগোল্লার ধ্যানে নিমগ্ন আছি, এমন সময় অন্য দিকে একটি স্বর্ণকারের দোকানে হাতুড়ীর শব্দ হইল, আমারও ধ্যানভঙ্গ হইল; চাহিয়া দেখি—স্বর্ণকার মৃৎপ্রদীপের আলোকে হাতুড়ীর সাহায্যে স্বর্ণ বা রৌপ্যের ঘাতসহত্ব পরীক্ষা করিতেছে। তাহার অদূরে কয়েক জন লোক বসিয়া জটলা করিতেছে। তাহারা গল্প করিতেছিল, গল্পে রাজা বাদশা মারিতেছিল, আর এক জন একটা ‘থেলো’ হুঁকায় তামাক টানিতেছিল। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সে পুরুষ নহে, স্ত্রীলোক; বর্ষীয়সীর কথায় বুঝিলাম, সে অনেক পুরুষের অভিভাবক হইবার যোগ্য। সে এখানকার হোটেলওয়ালী। সে চাল ডাল তেল নুন কাঠ দেয়, পথিকেরা তাহার ঘরে ভাত রাঁধিয়া খায়, ঘরভাড়া দিয়া যায়, তাহাতেই তাহার চলে। কথায় বোধ হইল, সে পুরুষজাতিকে ভেড়ার সমান মনে করে!—হোটেলওয়ালী হুঁকাটা একটি যুবকের হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, “উম্‌সো, তুই যে ভারি ‘মগরা’ হয়ে গেলি, বয়স ত দু' কুড়ি তিন কুড়ি হলো, বিয়ে থাওয়া করবি নে নাকি?”

এই উমেশ জমীদারের গোমস্তা মহাশয়ের পত্নীর ভগিনীপতির ভ্রাতুষ্পুত্র। সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট; সে গোমস্তা মহাশয়ের গোরুবাছুর রাখে ও তামাক সাজে।—এমন যোগ্য ব্যক্তিকে এত বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে না দেখিয়া হোটেলওয়ালী দুঃখিতা।—উমেশ তামাকে দম্ দিয়া হতাশভাবে বলিল, "হুঁ, নিজের পেটের ভাত জোটে না, তা আবার বিয়ে!" হোটেলওয়ালী বলিল, "বাপঠাকুবাবা জলগণ্ডূষের 'পিত্যেশ' রাখে তো। বিয়ে করবি নে কি 'নিব্বংশ' হবি?"

উমেশ বলিল, "বিয়ে করব যে, খেতে দেব কি?"

হোটেলওয়ালী হাত নাড়িয়া বলিল, "যে খেতে দিতে পারে, সে ত বিয়ে করবেই; যে খেতে দিতে না পারে, তারই ত বিয়ে করা সার্থক। তা, তোর এ কথা বল্‌তে লজ্জা হচ্ছে না? আমি এই বুড়ো মাগী, এখনও মাস্ গেলে দশ টাকা রোজগার করি।—আর তুই জোয়ান মরদ মিন্‌সে, দুবেলা দেড় সের চালের ভাত মারিস্, তুই কাজ দেখে ডরাস্!"

উমেশ বলিল, "তোমার যদি এত সখ হয়ে থাকে, তবে তুমিই একটা বিয়ে করে ফেল। আমি খেতেও দিতে পারব না, বিয়েও করবো না।—খাট্‌তে যে বল্‌ছো,—এখানে কাজ কোথায়?"

হোটেলওয়ালী বলিল, "কাজের অভাব কি? এখানে কাজ না মেলে, কল্‌কাতায় যা।"

উমেশ কাতরস্বরে বলিল, "দিদি বলেছে, আমি কলকাতায় গেলে হারিয়ে যাব।"

"মরণ আর কি!" হোটেলওয়ালীর এই ধিক্কারবাণী শুনিয়া উমেশ উৎসাহের সহিত তামাক টানিতে লাগিল। কোচ্‌ম্যানও গাড়ী ছাড়িয়া দিল।—আর আড়াই ক্রোশ দূরে চুয়াডাঙ্গার ঘাট।

মেঘ কাটিয়া গেল। আকাশে নক্ষত্র দেখা দিল। নক্ষত্রের অস্ফুট আলোকে পথের দুই ধারের বটগাছ, বাঁশ-ঝাড়, শ্যাওড়ার জঙ্গল নিস্তব্ধ ভূতের মত দেখাইতে লাগিল। পথের ধারে 'সমুদ্দিয়া' গ্রাম। গ্রাম্যপথের ধারে কৃষকের কুটীর, কলুদের ঘানিঘর। ঘানিঘরে বলদ পঞ্চানন চোখে 'ঠুলি' আঁটিয়া ঘানিগাছের চারি দিকে ঘুরিতেছে, অবিশ্রান্ত ক্যাঁ-কোঁ শব্দ হইতেছে, আর কলু ঘানিগাছের 'পিঁড়ে'র উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে গাহিতেছে—"মা, আমায় ঘুরাবি কত,—চোকঢাকা বলদের মত,

সংসার-ঘানিতে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত!" বেচারার অবস্থা অতি সঙ্কটজনক। আসল ঘানিতে উঠিয়া যুরপাক খাইতে তাহার কষ্ট নাই, সংসার-ঘানির পাকটাই তাহার দুঃসহ বোধ হইতেছে।

দুই ধারের কুটীরগুলি অন্ধকারে গাছের ছায়ায় ঘুমাইতেছে। অশ্বত্থ গাছের ডালে বাদুড় ঝট্‌-পট্‌ করিয়া উঠিল। একটা কুকুর পথের পাশে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়াছিল, সে গাড়ী দেখিয়া উঠিয়া সোরগোল আরম্ভ করিল; সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অনেক কুকুর গৃহস্থের বাড়ীর ভিতর হইতে তাহার সঙ্গীতে 'কোরাস' দিতে লাগিল। ঘোড়া দুটি ঘর্ম্মাপ্লুতদেহে ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। একটা ঘোড়া কিছু দুষ্ট ছিল, সে ক্ষেপিয়া গাড়ীখানি নয়ঞ্জুলির দিকে টানিয়া লইয়া গেল। কোচ্‌ম্যান বেগতিক দেখিয়া 'বাবু নামুন' বলিয়াই ঝুপ করিয়া নামিয়া পড়িল, এবং ঘোড়ার মুখরজ্জু ধরিয়া নয়ঞ্জুলির দিক হইতে গাড়ী টানিয়া আনিল; তাহার পর ঘোড়াটাকে ধরিয়া রীতিমত চাব্‌কাইয়া দিল।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় গাড়ী চুয়াডাঙ্গার নীচে চূর্ণী নদীর ঘাটের ধারে আসিয়া থামিল। মাঝি নৌকায় পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। নৌকার এক পাশে গরুর গাড়ীর ছাউনীর মত একটু 'ছই', তাহার ভিতর একখানা ছেঁড়া কাঁথা; সেই কাঁথায় শয়ন করিয়া পাটনী লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিতেছিল। বিউগিলের শব্দে তাহার স্বপ্ন ছুটিয়া গেল, ডাক আসিয়াছে বুঝিয়া সে তীরে নৌকা বাঁধিল। কোচ্‌ম্যান ডাকের বোঝা দুই তিন বারে নৌকায় আনিয়া ফেলিল। আমি নৌকায় উঠিয়া কয়েক মিনিটেই নদী পার হইলাম।

অপর পারে আর একখানি গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। কোচ্‌ম্যান তাহার ছাদে ডাক তুলিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম।—ডাক-গাড়ীর মালিক আমার টিকিট লইয়া গেল; যাইবার সময় গাড়ীর ভিতরের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ মোটে এক জন সোয়ার!—বেশী বিগল্‌ দিস্‌নি বুঝি?" কোচম্যান রাগ করিয়া বলিল, "তোমার সুবিধে বুঝে ত আর সোয়ার আস্‌বে না।"

ষ্টেশনে আসিয়াই দেখি—প্লাটফর্ম্মে ট্রেণ!—কি সর্ব্বনাশ! স'এগারটা বাজিয়াছে। তাড়াতাড়ি টিকিট লইয়া প্লাটফর্ম্মে পা দিয়াছি, এমন সময় বংশীধ্বনি করিয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।—সম্মুখে যে গাড়ী পাইলাম, তাহাতেই উঠিয়া পড়িলাম

—দেখিলাম, একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়াছি।—উপরে দুই ধারে দুটি আলো জ্বলিতেছে, আর ষাট জনের স্থানে জন কুড়ি যাত্রী বেঞ্চিগুলি দখল করিয়া কেহ নিদ্রা যাইতেছে; কেহ বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে; কেহ তামাক টানিতেছে, কেহ বা শ্যামা-বিষয়ক গান করিতেছে। এক জন গাড়ীর জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সিগারেট, এ ষ্টেশনে সিগারেট পাওয়া যায় না?"—এক জন খালাসী চলন্ত গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া বলিল,—"যায়, আগে।"

ধূলিধূসরিত ময়লা বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলাম। ট্রেণ মাঠের উপর দিয়া ছুটিল।—যে লোকটা হুঁকা টানিতেছিল, সে এক মুখ ধূম উদ্গিরণ করিয়া কলকেটা হাত হইতে নামাইয়া আমার দিকে প্রসারিত করিল, বলিল, "আজ্ঞে তামাক ইচ্ছে করবেন কি?" আমি "তামাক ইচ্ছে" করিলাম না দেখিয়া সে পুনর্ব্বার তাহা হুঁকায় চড়াইয়া নিরুদ্বেগে টানিতে লাগিল। তামাক খাওয়া শেষ হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে, কত দূর যাবেন।" আমি বলিলাম, "কুমারখালী; তুমি?" তামাক-ইচ্ছে বলিল, "আজ্ঞে আমি কুষ্টে যাব, সেখানে আমার জামাইবাড়ী,—আমার জামাই"—সে এক প্রকাণ্ড গল্প ফাঁদিল। কিন্তু গল্প শেষ হইল না; কারণ, পাশের বেঞ্চিতে এক জন শুইয়া, আর এক জন বসিয়া ছিল; যে শুইয়াছিল, সে নিদ্রাঘোরে তাহার ধূলিধূসরিত শ্রীচরণকমল প্রসারিত করিল; যে বসিয়াছিল, তাহার অঙ্গে শ্রীপদস্পর্শ হইল। আর কোথায় যাবে!—সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "বাহারে মজা! তুমি হাত গিল্‌তে গিল্‌তে যে বাহু গিলে ফেল্লে? ছিলে বসে, তার পর কাত হ'লে, এখন একেবারে লম্বা? আমার গায়ে পা? ওঠ্, বেটা বৈরাগী!" যে শয়ন করিয়াছিল, সে যে এক জন পরম বৈরাগী—তাহা জানিতাম না। বৈরাগী প্রভু গালি খাইয়া উঠিলে তাঁহার স্থূল চৈতন্য দর্শন করিয়া চক্ষু সফল করিলাম। শক্তি ও চৈতন্যে তখন মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইতিমধ্যে ট্রেণ মুন্সীগঞ্জে থামিল। বাবাজীও তাহার ঝুলি ও লাঠী লইয়া নামিয়া পড়িলেন। নামিবার সময় বলিলেন, "বেটার চৌদ্দ পুরুষের গাড়ী! শুতে দেবেন না, ভাড়া দিয়ে গাড়ীতে উঠে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে।"

পোড়াদহে আসিয়া দেখি, এক ভদ্রলোক সজীব নির্জীব অনেকগুলি

পুঁটুলি লইয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন। দুইটি অবগুণ্ঠনবতীর পশ্চাতে চারি পাঁচটি ছেলে মেয়ে, তিন চারিটি ট্রঙ্ক, দুইটি বিছানার মোট। গাড়ী বোঝাই হইয়া গেল। আমি কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! পা দুখানি কোথায় রাখি!" ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আমার এই বিছানার বাণ্ডিলের উপর রাখুন। মেয়েদের কম্পার্টমেণ্ট অনেক দূরে—আর এই রাত্রিকাল, সকলকে নিয়ে এই গাড়ীতেই উঠ্‌ছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত দূর যাবেন?" ভদ্রলোকটি একটি তিন বৎসরের ছেলেকে বেঞ্চির উপর শয়ন করাইয়া বলিলেন, "যাব গোয়ালন্দ।"

আগন্তুকের সঙ্গে এক আঁটী আখ্ ছিল। এক একখানি ইক্ষু যেন নিরেট বাঁশ! এত মোটা আখ কখনও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। আমি ভদ্রলোককে বলিলাম, "এতগুলি মারাত্মক অস্ত্র ( Deadly weapons ) লইয়া যাইতেছেন, পাশ লইয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "আমি রেলের কর্ম্মচারী, আমার পাশ আছে।" আমি বলিলাম, "সে পাশ নয়, অস্ত্রের পাশ লইয়াছেন?" ভদ্রলোক সবিস্ময়ে বলিলেন, "অস্ত্র কোথায়?" আমি বলিলাম, "ঐ আখ্, এক একখানি আখ যে বংশলোচন! পাকা বাঁশের লাঠী উহার কাছে হারি মানে। মারাত্মক অস্ত্র নয় কি?" ভদ্রলোকটি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তাহার পর তিনি এক অদ্ভুত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সেই রাত্রি একটার সময় গোটাকত কমলা লেবু ভাঙ্গিয়া খাইতে লাগিলেন। ছেলে মেয়ের হাতেও দুই একখানা দিলেন। লেবু-ভক্ষণের পর একখানি ছুরি বাহির করিয়া ইক্ষুদণ্ড-কর্ত্তনে মনঃসংযোগ করিলেন। কিন্তু সে আখ কাটিতে কুঠার আবশ্যক; ছুরিতে তাহা কাটিল না। কিন্তু ভদ্রলোকটির উৎসাহ বালকের অপেক্ষাও অধিক; তিনি একটি মোট খুলিয়া পানের বাটার ভিতর হইতে একখানি অর্দ্ধহস্ত দীর্ঘ জাঁতি বাহির করিলেন, এবং তাহার সাহায্যে ইক্ষুদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া কতক স্বয়ং চর্ব্বণ করিলেন, কতক বিতরণ করিলেন; আমাকেও কয়েক খণ্ড দিতে আসিলেন, আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলাম। তখন তিনি রুলের মত লম্বা একখানি আখ আমাকে দিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে ত মোটা লাঠী নাই, কাছে রাখুন, রাত্রে লাঠীর কাজ করিবে।"

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় ট্রেণ কুমারখালী ষ্টেশনে থামিলে আমি

সেই ইক্ষুদণ্ড লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে নামিলাম। কথা ছিল, আমার আত্মীয় আলো পাঠাইবেন, কিন্তু "কা কস্য পরিবেদনা!"

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া একাকী অন্ধকারপূর্ণ পথ দিয়া বাজার অতিক্রম করিলাম। তত রাত্রেও এক জন লোক একটা দোকানের খোলা বারান্দায় শুইয়া উচ্চকণ্ঠে একটা দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গান গাহিতেছিল। ইহা ভিন্ন কোনও দিকে অন্য কোনও শব্দ ছিল না।—প্রায় এক মাইল দূরে গৌরী নদীর চরের উপর আমার আত্মীয়ের বাড়ী।—আমি কোনও রকমে সেখানে উপস্থিত হইয়া মশারীর ভিতর আশ্রয় লইলাম।

পর দিন বেলা নয়টার সময় কলিকাতার বন্ধুগণ কুমারখালী ষ্টেশনে নামিলেন। আমি জলধর বাবুর সঙ্গে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলাম। ভগ্নপদ সমাজপতি মহাশয়ের জন্য একখানি পাল্কী-সংগ্রহের চেষ্টা হইল। কিন্তু সে বিরাট দেহ বালখিল্যগণের উপযোগী পাল্কীতে ধরিবে কেন?—অগত্যা তাঁহাকে পদব্রজেই জলধর-ভবনাভিমুখে যাত্রা করিতে হইল। জলধর বাবু তৎপূর্ব্বে সাড়ে পাঁচ টাকা মূল্যের এক বিরাট রোহিত মৎস্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে আহারের আয়োজন কিরূপ গুরুতর, তাহা তখনই বুঝিতে পারিলাম।

মধ্যাহ্নে স্নানান্তে বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইলাম। জলধরবাবু জলযোগের বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। এমন আয়োজনে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় যোগদান করিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এ যাত্রা তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। অগত্যা ঘোলের সরবতে আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম। আধখানা ইটের মত চতুষ্কোণ একটি মিষ্ট পদার্থ ভক্ষণ করিয়া কলিকাতার বন্ধুগণ বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন; এই মিষ্টান্নের নাম 'চমচম্ বরফী'। একখানির পর আর একখানি, অগত্যা আমাদের সকলকে রণেভঙ্গ দিতে হইল, কিন্তু গল্প-লেখক শ্রীযুক্ত ফকীরবাবু আর 'না' বলেন না! আমরা বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম; সমাজপতি মহাশয় বলিলেন, "ফকীরে কখনও না বলে না।" একটি রসিক বন্ধু ফকীরবাবুর চাদরে কিছু মিষ্টান্ন বাঁধিয়া দিলেন। শুনিলাম, কলিকাতার বন্ধুগণ পোড়াদহ ষ্টেশনে বালিসের মত স্থূল লম্বা পাঁউরুটী

এই রকম ক্ষুধা! কলিকাতার লোক, বিশেষতঃ সাহিত্যসেবীরা অল্পভোজী, এ দুর্নামের কারণ কি?

সাড়ে পাঁচ টাকা মূল্যের রোহিত মৎস্য পাকে তিনটা বাজিয়া গেল। গানে, খোসগল্পে সময় কাটিতে লাগিল। স্বর্গীয় বাবু পূর্ণানন্দ সাহার প্রকাণ্ড দ্বিতল বৈঠকখানায় অতিথিগণের বাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সুবিস্তৃত ফরাসে আমরা গড়াইতে লাগিলাম। জলযোগের পর মানসীর কবিবর শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের অবস্থা নিতান্ত সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। রাত্রে ট্রেণে ভাল নিদ্রা হয় নাই। তাহার উপর এই জলযোগ। তিনি উপাধানে মাথা রাখিয়া নাসিকাগর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। সুরসিক এটর্ণী জ্ঞানপ্রিয়বাবু সমাজপতি মহাশয়ের নস্যদানী হইতে খানিক নস্য একটি কাগজের ঠোঙ্গায় রাখিয়া ঠোঙ্গাটি বাগচী কবির নাসারন্ধ্রের কাছে ধরিলেন, ঠোঙ্গার নস্য একটানে কবিবরের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল! তাঁহাকে সুনিদ্রার আশা পরিত্যাগ করিতে হইল।

বেলা চারিটার পর আমাদের আহারাদি শেষ হইল। জ্ঞানপ্রিয়বাবু তখন লাউর ঘণ্টের তৃতীয় সংস্করণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমরা বাগচী কবিকে মাথায় তুলিয়া বৈঠকখানায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম, কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না। এই গুরুতর ভোজনের পর তিনি আর লজ্জার মাথা খাইতে পারিলেন না, অগত্যা অতিকষ্টে লাঠীতে ভর দিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন।

পাঁচটার সময় কাঙ্গাল হরিনাথের গৃহপ্রাঙ্গণে সভা বসিল। জ্ঞানপ্রিয় বাবুর সঙ্গীতে ও সভাপতি মহাশয়ের হৃদয়স্পর্শিনী বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সাড়ে পাঁচটার সময় বৃষ্টি আসিয়া সভার কার্য্যে একটু বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছিল। অগত্যা আমরা এক জন ভদ্রলোকের খড়ের ঘরে আশ্রয় লইলাম। অদূরে একটি ডাব গাছ দেখিয়া বাগচী কবির পিপাসার উদ্রেক হইল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে হাঁকিলেন, 'ডাব আনো'। তৎক্ষণাৎ দুটি ডাব আসিল, কিন্তু তাহার জল গরম, কবিবর তাহা স্পর্শ করিতে পারিলেন না। অল্পক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিলে আবার সভার কার্য্য আরব্ধ হইল। শ্রীযুত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় কাঙ্গালের গুণকীর্ত্তন করিলেন; তাঁহার মুখে কাঙ্গালের কথা সকলেরই প্রীতিকর হইয়াছিল।

গোধূলির সময় কলিকাতার ফটোগ্রাফার হপসিং কোম্পানীর অধ্যক্ষ

মহাশয় সভাস্থলে ক্যামেরা খাটাইয়া সভার ফটো তুলিলেন। কাঙ্গালের অয়েলপেণ্টিং-এরও একখানি ফটো লওয়া হইল। সন্ধ্যার পর দলে দলে সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইল। সঙ্কীর্ত্তনকারীরা কাঙ্গালের ছবি স্কন্ধে লইয়া নাচিতে নাচিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। পল্লীবধূরা গৃহবাতায়ন হইতে সেই মধুর দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের পথ উৎসবমুখর হইয়া উঠিল। আমরা বৈঠকখানায় ফিরিলাম। সেখানে আবার গান গল্প আরম্ভ হইল। দেখিলাম, সুকণ্ঠ জ্ঞানপ্রিয় বাবুর নিকট সঙ্গীতে তাঁহার ওস্তাদকেও হারি মানিতে হয়!—রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গীত চলিল। দেখিতে দেখিতে ট্রেণের সময় হইয়া আসিল।

জলধরবাবু অতিথিসৎকারের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। রাত্রে আবার গুরুতর ভোজন। এবার 'অখণ্ডমণ্ডলাকার' লুচি, তাহার উপর নানা উপকরণ! বন্ধুগণ প্রমাদ গণিলেন। মেলট্রেণে ঢাকাই আরোহিগণের ভিড়ে স্থানাভাবের আশঙ্কায় বন্ধুগণ মিক্সড্‌ট্রেণে কলিকাতা-যাত্রাই সঙ্গত মনে করিলেন। আশা করিলেন, তাঁহারা হাত পা মেলিয়া শুইয়া যাইতে পারিবেন।

আমার আর সে রাত্রে যাওয়া হইল না। মধ্যপথে বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া ক্ষুণ্নমনে আত্মীয়ের গৃহে ফিরিলাম। এই কয়েক ঘণ্টার আনন্দ-মিলন বহুকাল স্মরণ থাকিবে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

---

# সনেট-পঞ্চাশৎ। *

আজ আমরা এক জন নূতন কবির পরিচয় পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীর নাম বাঙ্গালা সাহিত্যে একেবারে অপরিচিত না হইলেও, তিনি যে প্রকৃত কবি, তাহা আজ আমরা তাঁহার এই অভিনব "সনেট-পঞ্চাশৎ" পুস্তিকা-পাঠে জানিলাম। প্রকৃত কাব্যানুরাগীর পক্ষে আর একটি আনন্দের বিষয় এই যে, প্রমথবাবুর কবি-প্রতিভা যে শ্রেণীরই হউক না কেন, তাঁহার এই প্রথম পুস্তকেই তিনি নিজের বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য বা

* শ্রীপ্রমথ চৌধুরী বিরচিত।

মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। ইহার কণ্ঠ নূতন, ভঙ্গীও নূতন। পূর্ব্বপরিচিত কোনও কবির কণ্ঠ ও ভঙ্গীর প্রতিধ্বনি বা ছায়া তাঁহার কবিতার মধ্যে দেখিলাম না। সাহিত্যে এই স্বাতন্ত্র্য অমূল্য—বৈচিত্র্যের কারণ এবং ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তির মূল। প্রকৃত কবির স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা থাকিবেই। তাঁহার শক্তি যেরূপই হউক না কেন, তাঁহার নিজের বলিবার কথাও আছে, বলিবার ভঙ্গীও আছে। ইহা অনিবার্য্য। এই অনন্যসাধারণতাতেই তাঁহার মর্য্যাদা—এমন কি, তাঁহার অমরত্ব। তুমি তাঁহার কবিতায় যে রস—যে মাধুর্য্য বা সৌন্দর্য্য অনুভব করিবে, অপর কোনও কবির কাব্যে ঠিক তাহা পাইবে না। এবং সে রস মনে পড়িলেই সেই কবিকেও মনে পড়িবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটি বুঝাইতে হইলে ইংরেজী সাহিত্য হইতে প্রভূত উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। "আমরা বড়লোক" হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরেজী সাহিত্যে যেরূপ পুঞ্জ পুঞ্জ প্রকৃত কবি আছে, সংস্কৃত বা আধুনিক ভারতীয় কোনও সাহিত্যে তেমন নাই। ইংরেজী কবিদিগের মধ্যে Mathew Proiorকে কেহ কোন দিন প্রথম শ্রেণীর কবি বলে নাই। কিন্তু তাঁহার বিশেষত্ব সকলেই স্বীকার করিয়াছে। তাঁহার কবিতার মধ্যে এমন একটি অনন্যসাধারণ অমায়িক সরল হাস্য পরিহাসের মধুর বিকাশ আছে, যাহা Praiorএর অপেক্ষা উচ্চ বা নিম্ন শ্রেণীর কোনও কবির রচনায় দেখিতে পাইবে না। ভাষা এবং ভাবে কোনও অভাবও উপলক্ষিত হইবে না। পাঠে তোমার রসানুভববৃত্তি চরিতার্থ হইবে। এবং যখনই সেই রসের কথা মনে পড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে Priorকেও মনে পড়িবে। ছোট কবি হইলেও Priorএর নিজের মর্য্যাদা আছে। Prior অমর। আমার বিবেচনায় আমাদের সমালোচ্য কবি প্রমথ চৌধুরীরও নিজের মর্য্যাদা আছে, এবং এই প্রবন্ধে সেই মর্য্যাদা যে কি, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রমথবাবু তাঁহার কবি-কল্পনা ও চিন্তা সনেট্-আকারে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং "স্বদেশী"র ভয় না রাখিয়া পুস্তকের নাম "সনেট্-পঞ্চাশৎ" দিয়াছেন। এই কবির একটি বিশেষ ও প্রধান গুণ—স্বাধীনতা ও নির্ভীকতা। গ্রন্থের নামকরণেই তাহার পরিচয়। সনেট্ জিনিসটাই যখন বিদেশী, তখন তাহার বিদেশী নাম বাঙ্গালায় চালাইলে ক্ষতি কি?

ইউরোপীয় সাহিত্যে সনেট্ কবির ভাবপ্রকাশের একটি সুপরিচিত এবং

বিশেষ মর্য্যাদাপ্রাপ্ত প্রণালী। সম্ভবতঃ ইতালী ইহার জন্মস্থান। অন্ততঃ ইতালীয় কবিদিগের হস্তেই সনেট্ যে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকল সাহিত্যেই ভাবপ্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে ঢালা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে। ইউরোপীয় সাহিত্য সনেট্ ছাড়া Ode, Ballad প্রভৃতি; পারসীক সাহিত্যে "রুবাই", "গজল" ইত্যাদি। কেহ যেন মনে না করেন, এই গঠন-প্রণালীর ভিত্তি রচয়িতার খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাবপ্রকাশের কোনও প্রণালী যখন বিশেষ একটি আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, সেই আকার তৎপক্ষে বিশেষ উপ-যোগী। সনেটের ইতিহাস-পাঠে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ইহার আয়তন, আকার ও মিলনপদ্ধতি শ্রেণীবিশেষের ভাবপ্রকাশে বিশেষ উপযোগী বলিয়াই সাহিত্যে ইহার প্রতিষ্ঠা।

এখন দেখা যাক্, কোন শ্রেণীর ভাবপ্রকাশে সনেটের পটুতা। আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে প্রসিদ্ধ কবি Dante Gabriel Rossetti সনেট-রচনায় সিদ্ধহস্ত, এমন কি, কোনও হিসাবে তাঁহার সমকক্ষ নাই। তিনি সনেট্ সম্বন্ধে যে অতুলনীয় সনেট্ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সনে-টের ভাবগত প্রকৃতি, তাহার প্রাণ যে কি—তাহা বিশদ ও মনোজ্ঞ ভাষায় বুঝাইয়াছেন। সেই সুন্দর কবিতাটি একাধারে সনেটের বিজ্ঞান ও আদর্শ। অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে অনুপম ভাব ও ভাষার মন্ত্রশক্তিতে, কবি যেন সনেটের অধিষ্ঠাত্রী বাণীকে তাঁহার রচিত এই কবিতাটির ছন্দোময় মন্দির-মধ্যে প্রতি-ষ্ঠিত করিয়াছেন। পাঠককে আমরা এই সুন্দর কবিতাটির পরিচয় লইতে অনুরোধ করি—

> A sonnet is a moment's monument
> Memorial from the soul's eternity
> To one deathless hour.

যখন কোনও মুহূর্ত্তে প্রবল ভাবের আবেশে সমাচ্ছন্ন কবিহৃদয় সৌন্দর্য্যের দৈব আবির্ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে, সনেট্ ভাষায় ও ছন্দে সেই দুর্ল্লভ মুহূর্ত্তের চিত্র। ইহা হইতে বুঝা যায়, সনেটের রচনার মূলে প্রবল ভাবের প্রণোদনা চাই। সেই ভাব যেন আবার বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত বিস্তা-রিত হইয়া তাহার ঘনীভূত আবেশ না হারায়। কোনও কোনও সনেট আবার গভীর চিন্তাশক্তি-প্রসূত—Shakespeare যাহাকে "deep-brained"

সনেট বলিয়াছেন। সুতরাং ভাব ও রসের একাগ্রতা ও সমগ্রতাই সনেটের জীবন। তৎপক্ষে ভাষা ও ছন্দের যুগপৎ সংযম ও স্ফূর্ত্তি আবশ্যক। বাহুল্যহীন পরিমিত কথায় ভাবকে পরিপূর্ণ, পরিণত অবয়ব দিবার জন্য, ভাষার প্রকাশ-শক্তির উপর নিরবচ্ছিন্ন জোরজবরদস্তি হুকুম তামিল করিতে হইবে, অথচ ভাষা-শিল্পের সূক্ষ্মতম সৌন্দর্য্য-বিকাশেও দৃষ্টি থাকিবে; ইহাতে গীতিকবিতার উন্মাদনা থাকিবে, অথচ মিত্রাক্ষর-প্রাচুর্য্য জন্য যে ঝঙ্কার-বাহুল্য ও আড়ম্বর গীতিকবিতার গৌরব, তাহা হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। এক দিকে দেখিতে হইবে, ইহা যেন চতুষ্পদী, ষট্‌পদী, বা অষ্টপদীর ন্যায় চুট্‌কি ভাষার বলে নিতান্ত স্বল্পায়তন হইয়া না পড়ে—অপর দিকে গীতিকবিতার ভাবপ্রবাহের উচ্ছ্বাসে অনির্দ্ধারিত সীমায় বিস্তারিত না হয়। খুব সম্ভব, কলাপ্রবীণ ইতালীয় ও অপরদেশীয় কবিরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, পূর্ণরসাভিব্যক্তির পক্ষে চতুর্দ্দশ-পদই সমীচীন, এবং তাহাই সাহিত্য-সংসারে চলিয়া আসিয়াছে।

এ দিকে আবার এই চতুর্দ্দশপদ আদৌ, অন্ততঃ ইতালীয় সনেটে, দুই পৃথক ভাগে বিভক্ত;—প্রথম, আট পদ—Octavo—অষ্টক; অবশিষ্ট ছয় পদ—Sestet—ষষ্ঠক। এই বিভাগও রচয়িতার খেয়াল-প্রসূত নহে। জীবিত ইংরেজ সমালোচকদিগের অগ্রগণ্য, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ সনেট-রচয়িতা Watts-Duntan এই সনেট্-বিভাগের নিগূঢ় রহস্যের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইনি বলেন—সমুদ্রতরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও পতন যেমন তাললয়ব্যবচ্ছিন্ন, সনেটের ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও পতনও সেইরূপ তাললয়-ব্যবচ্ছিন্ন। ফেনিলোচ্ছল সাগর-তরঙ্গ যেমন ক্রমশঃ স্ফীত ও বর্দ্ধিতকায় হইয়া বেলাভূমির উপর উৎপাতিত হয়, এবং নিমেষমাত্র স্থির থাকিয়া আবার উজান-বেগে সাগর-গর্ভে অপসারিত হয়, সেইরূপ ভাবের তরঙ্গ ছন্দোময়ী শব্দধারায় অষ্টকে উচ্ছলিত হইয়া বিপরীত আবর্ত্তনে ষষ্ঠকে অবসান প্রাপ্ত হয়। যে সুন্দর সনেটে কবি, দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল এবং চন্দ্রালোকের ন্যায় মধুর ভাষায়, এই কথাটি বুঝাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাঠক যে কেবল উল্লিখিত সনেট-বিভাগের বিজ্ঞান বুঝিতে পারিবেন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যজগতের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা-পাঠের আনন্দ উপভোগ করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই চতুর্দ্দশপদমাত্রাত্মক রচনায় গীতিকবিতার শব্দ-

বাহুল্য ও ঝঙ্কার-প্রাচুর্য্য পরিহর্ত্তব্য—তাহাতে ভাব ও ভাষায় শিথিলতা আসিতে পারে। সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মধ্যে রুদ্ধ-স্রোতস্বিনীর ন্যায় ভাবপ্রবাহ যাহাতে গভীর ও প্রখর-গতি হয়, তজ্জন্য ইহার আয়তন চৌদ্দটিমাত্র পদে পরিমিত। ইহার মিত্রাক্ষর-বিধানও—সংখ্যায় ও স্থাপনায়—সেইরূপ দৃঢ় নিয়মে আবদ্ধ। অষ্টকের আটটি পদে দুইটিমাত্র বিভিন্ন স্বরাত্মক মিল নিম্নলিখিতরূপে বিন্যস্ত হইবে :—প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম পদের মিল একস্বরাত্মক। দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম পদের মিল আর এক স্বরাত্মক। যথা :—ক—খ—খ—ক—ক খ—খ—ক।

ষষ্ঠকে মিলের একটু স্বাধীনতা আছে।—তিনটি বিভিন্ন স্বরাত্মক মিলও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাই হইতেছে আদিম ইতালীয় সনেটের নিয়ম, এবং আধুনিক কালের অধিকাংশ ইংরেজী সনেট-লেখকেরা এই নিয়মেই লিখিয়া থাকেন। কিন্তু Shakespeareএর সময় এবং তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন ইতালীয় সাহিত্য হইতে ইংরেজী সাহিত্যে সনেট প্রথম আনীত হয়, তখন Wyatt, Surrey এবং Spenser প্রভৃতি কবিগণ কি আকারে ইংরেজী ভাষায় ইহা বেশ খাপ খাইতে পারে, তৎবিষয়ে নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের হাতে এবং পরবর্ত্তী কালে Shakespeare প্রমুখ কবিদিগের হাতে সনেট যে আকৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহাই সাহিত্যে সেক্সপীরীয়-সনেট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা পেত্রার্কীয় সনেটের ন্যায় বাঁধাবাঁধি নিয়মে অষ্টক এবং ষষ্ঠকে বিভক্ত নয়—যদিও অষ্টম চরণে প্রায়ই ভাবের বিরাম দেখা যায়। ইহার প্রথম দ্বাদশ চরণে তিনটি চতুষ্পদী গঠিত। উহাদের মিল বা মিত্রাক্ষর-সংস্থান একচ্ছত্রান্তর-পর্য্যায়ে বিন্যস্ত, এবং প্রত্যেক চতুষ্পদীতে দুইটি বিভিন্ন স্বরাত্মক মিল থাকে—শেষ দুটি চরণ মিত্রাক্ষর পয়ার, এবং এই শেষ দুই চরণেই সেক্সপীরীয় সনেটের বিশেষত্ব। হয় এ দুটি পদে পূর্ব্বগত তিনটি চতুষ্পদীর সমুদয় ভাব ও রস সমষ্টি-আকারে চরমমাত্রা লাভ করিবে—না হয় বিপরীত ভাবের সমাবেশ-সংঘর্ষণে পদ দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে।

Milton সেক্সপীরীয় সনেটের মিত্রাক্ষর-সংস্থাপন-বিধির পরিবর্ত্তে পেত্রার্কার বিধির পুনঃপ্রচলন এবং অনুসরণ করিয়া[ছি]লেন, কিন্তু পেত্রার্কার অষ্টক ও ষষ্ঠক বিধান রক্ষা করেন নাই। কোনও কোনও সমালোচকের মতে Milton এ বিষয়ে পেত্রার্কীয় পদ্ধতির অর্থ ও উদ্দেশ্য

আদৌ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই তাহা অবলম্বন করেন নাই, এবং তজ্জন্য তাঁহার সনেটগুলিও চরমোৎকর্ষ লাভ করে নাই।

সনেট সম্বন্ধে আরও অবশ্য-জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে। তাহাদের উল্লেখ বা আলোচনা এ প্রবন্ধে অনাবশ্যক। যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রমথবাবুর পুস্তকের সমালোচনার প্রয়োজনীয় উপক্রমণিকা-স্বরূপ।

এখন আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া উপক্রমণিকার শেষ করিব। আমরা দেখাইয়াছি, সনেট-রচনা কঠিন নিয়মে আবদ্ধ। অনেকেই বলিতে পারেন যে, এমন একটি ক্ষুদ্র রচনায় এত কঠোর নিয়ম কেন? তাঁহারা বিস্মিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করেন, যখন ভাব লইয়াই আমাদের কার্য্য, তখন ভাব-প্রকাশে পারিভাষিক কোনও নিয়মের ব্যতিক্রমে কি আসিয়া যায়? যখন কবিতা-পাঠে কবির ভাব স্পষ্ট জানা গেল, তখন ভাষা বা ভঙ্গীতে, ছন্দ বা মিত্রাক্ষর-বিন্যাসে, আকার বা আয়তনে যদি কোনও ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়, "তাহা ধর্ত্তব্য নহে"। তাঁহারা বুঝেন না যে, সাহিত্যে —এবং কেবলমাত্র সাহিত্যেই বা কেন?—ললিত কলার সমস্ত বিভাগেই—ভাব ও ভাবপ্রকাশের উপকরণ তুটি পৃথক বা পরস্পর স্বাধীন বস্তু নয়, পরন্তু এক—অন্ততঃ একাঙ্গ। চিত্রকলায় দেখ না—বর্ণ-বিকাশ, রেখাপাত, বস্তু-সংস্থান প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে চিত্রকরের প্রধান উপকরণ—এবং যে পরিমাণে এই উপকরণে দোষ বা অভাব থাকিবে, সেই পরিমাণেই ভাবেও দোষ ও অভাব পরিলক্ষিত হইবে। ভাষা ও ভঙ্গী ছাড়িয়া ভাবের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। ভাব ও ভঙ্গী, বাক্য ও অর্থ, হর-পার্ব্বতী মূর্ত্তির ন্যায় পরস্পর "সম্পৃক্ত"।

সাহিত্য-কলায় আবার গঠনের স্থান (যাহাকে ইংরেজীতে Form বলে) মৌলিক। গঠন ভিন্ন ভাবগৌরব প্রকাশিত হয় না। ইহা বাহির হইতে আমদানী করা পদার্থ নয়, ভাবের নিজেরই অঙ্গ। গঠনের অভাবে কত কবিতা ও কাব্য সাহিত্যে স্থান পায় নাই। উচ্চশ্রেণীর কবিদিগের রচনায় কিন্তু গঠন ও উপকরণের উৎকর্ষ জাজ্জ্বল্যমান। তাঁহাদের ভাব ও ভঙ্গী, কল্পনা ও গঠন-রচনা এক সূত্রে গ্রথিত, এবং সমান উৎকর্ষ-প্রাপ্ত। নিয়মের কাঠিন্য নিপুণ শিল্পীর পক্ষে বন্ধন বা বিঘ্ন নয়, বরং উৎকর্ষ-প্রকাশের সহায়। সমালোচ্য পুস্তকে প্রমথবাবু নিজেই লিখি-

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।

যেখানে প্রতিভার বল ও তেজ আছে, নিয়মের শৃঙ্খল যতই তাহাকে বাঁধিতে যাইবে, ততই তাহার বল ও তেজ স্ফূর্ত্তি পাইবে; চালন-নিপুণ উপযুক্ত আরোহী বিক্রমশালী দুর্দ্দমনীয় অশ্বই চায়।

সনেট-রচনায় সিদ্ধহস্ত বিখ্যাত ফরাসী কবি Soulare সনেট সম্বন্ধে যে একটি অপূর্ব্ব সনেট লিখিয়াছেন, তাহাতে সনেটের স্বরূপ ও কঠিন বিধিবাহুল্য সত্ত্বেও, সনেটের ভাবপ্রকাশ-পটুতা কবিসুলভ-কল্পনা-কৌশলে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। ফরাসী-অনভিজ্ঞ পাঠকদিগের জন্য আমাকে তাহার একটি নিতান্ত অনুপযুক্ত অনুবাদ করিয়া দিবার ধৃষ্টতা স্বীকার করিতে হইল,—

"ঢুকিবে না কায়া" বলে মুগ্ধা হাসি-মুখ
"ছিঁড়িবে যে ছোট জামা দেহপরিসর
বাকাইয়া কটিতট—ফুলাইয়া বুক,
বাড়াইল প্রতিকূল পথে রম্য কর।
ধীর আমি, ভালবাসি এ মিষ্ট সংগ্রাম—
সুস্ববাসে সাজাইনু দেহযষ্টি তার
কোথাও বাঁধন দিয়া—কোথাও বিরাম—
শির-স্কন্ধ-বক্ষ পরে ক'রে দিনু পার।
উদ্ভিন্ন দেখ বাসে—কলার কৌশলে
উচ্ছল দেহলতা—প্রতি অঙ্গ-রেখা
হাসিছে লক্ষ্মীটি বাহু সামান্য সম্বলে,
ঠিক বসিয়াছে বাস ! শোভা তাহে লেখা।
হৃদয়ে অভাব নাই—বাহুল্য শরীরে,
এমনি নারীরে চাই, এমনি বাণীরে।

বাঙ্গালা ভাষায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্ব্বপ্রথমে সনেট রচনা করেন, এবং তাঁহার "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-স্বরূপে যে উপক্রম লিখিয়াছেন, তাহাতে পেত্রার্কার যশোগান গায়িয়াছেন। প্রমথবাবুও তাঁহার পুস্তকের মুখবন্ধে পেত্রার্কাকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পেত্রার্কার আদর্শে সনেট রচনা করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন।—

"পেত্রার্কা-চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,
যাঁহার প্রতিভা মর্ত্ত্যে সনেটে সাকার।

একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,
গুরুশিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।"

সুতরাং তাঁহার রচিত সনেটগুলি আদর্শের অনুরূপ হইয়াছে কি না, ইহার পরীক্ষা লইবার অধিকার তিনি তাঁহার পাঠকবর্গকে নিজেই দিয়াছেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি ও রচনা-শিল্পের বহুবিধ উচ্চতর গুণে মুগ্ধ হইলেও আমাকে বলিতে হইবে যে, এক বিষয়ে তিনি তাঁহার গুরুর শাসন আদৌ মানিয়া চলেন নাই। তাঁহার অনেকগুলি সনেটে পেত্রার্কার অষ্টক ও ষষ্ঠক বিভাগ রক্ষিত হয় নাই। একাধিক সনেটের দশম চরণে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার ভাবতরঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বিরাম লাভ করিয়াছে। প্রায়ই তাঁহার প্রত্যেক সনেটে নবম ও দশম চরণ একটি সম্পূর্ণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকার-প্রাপ্ত, এবং অনেক স্থলে সেক্সপীরীয় সনেটের অন্তিম পয়ারেরই অনুরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ "পত্রলেখা" নামক - অপরপক্ষে সুন্দর সনেটটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদিও কোনও কোনও ফরাসী কবির রচিত সনেটে নবম দশম চরণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকার-প্রাপ্ত, কিন্তু দশম চরণে ভাবের ছেদ কোথাও দেখি নাই। ইহার তুল্য বা ইহার অপেক্ষা আরও গুরুতর বিশৃঙ্খলা আমরা Milton-রচিত একটি ইংরেজী সনেটে দেখিতে পাই। 'Nightingale' নামক সুন্দর সনেটে Milton সপ্তম চরণের মধ্যাংশেই ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও যতি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু Milton অপরাপর বিষয়ে পেত্রার্কার অনুযাত্রী হইলেও, যে কারণেই হউক, সনেটের ভাবপ্রবাহের বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার রচিত অপর সকল সনেটেই আমরা দেখিতে পাই, ভাবস্রোত কোনও স্থানে বিভক্ত না হইয়া নিরবচ্ছিন্ন গতিতে পূর্ণ গোলকের আকার ও পরিণতি লাভ করিয়াছে।

Verlaine নামক এক জন আধুনিক প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি অনিয়ন্ত্রিততার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচিত দু একটি সনেটে ষষ্ঠকাষ্টক বিভাগ একেবারে বিপরীত। ষষ্ঠক আরম্ভে—অষ্টক শেষে।

প্রমথবাবুর এই "পত্রলেখা" সনেটে আরও গুরুতর দোষ দেখা যায়। ইহার অষ্টকের শেষ চরণে ভাবের বৈধ বিরাম হইলেও, নবম চরণে নবপ্রবর্ত্তিত ভাবতরঙ্গ সনেটের অবশিষ্ট অংশে ব্যাপ্ত না হইয়া দশম চরণেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া শেষ হইয়াছে। একাদশ চরণে আবার ভাবের নূতন

আবর্ত্তন। ইহাতে ভাবস্রোত ত্রিধা বিভক্ত হইয়া প্রখরতা ও গভীরতা হারাইয়াছে। সনেটটিও তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া না মিলটনীয় সনেটের পূর্ণ নিটোল গোলকত্ব লাভ করিয়াছে—না পেত্রার্কীয় সনেটের তাললয়-ব্যবচ্ছিন্ন উত্থান-পতনের বিচিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া মিত্রাক্ষর-বিন্যাসে কতকগুলি দোষ দেখা যায়। কোনও কোনও সনেটে একই কথা একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন চরণের অন্তে স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও শব্দের মিল, সমধ্বনি দুটি ভিন্ন শব্দের সহিত নিষ্পন্ন না হইয়া, সেই শব্দেরই পুনরুক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ দোষ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পরিহর্ত্তব্য—বিশেষতঃ সনেটে। 'রজনীগন্ধা' নামক সনেটে রজনীগন্ধা কথার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি সনেটের ভাব ও রচনা-গৌরবের উপযুক্ত নয়—গীতিকবিতাতেই ইহা শোভা পায়। বস্তুতঃ না ভাবের সমাবেশে, না গঠন-ভঙ্গীতে, এই কবিতাটিকে সনেট বলা যাইতে পারে।

এখানে একটি কথা উঠিতে পারে—কবিতার উৎকর্ষই সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য, নিয়মপরতন্ত্রতা পরে। রচনার নিয়ম ত আর আগে হইতে উদ্ভূত হয় না। কবিতা-বিশেষের সুন্দর গঠন-প্রণালী, ও শিল্প-সৌষ্ঠবের আলোচনা হইতেই রচনার নিয়মাবলী নিরূপিত ও নির্দ্দিষ্ট হয়। এবং নির্দ্দিষ্ট কোনও একটি নিয়মের ব্যতিক্রম সত্ত্বেও যদি কোনও কবিতা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমরা সে নিয়মের মর্য্যাদা রাখিতে বাধ্য নই। বরং সে নিয়মের ব্যতিক্রমই নূতন নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। প্রমথ বাবুর কিন্তু এ কথা বলিবার অধিকার নাই। কারণ, তিনি গোড়া হইতেই পেত্রার্কার আদর্শ ও নিয়মের অনুসরণ করিবার প্রকাশ্য সঙ্কল্পে সনেট্ লিখিতে বসিয়াছেন। এবং যেখানেই তিনি তাঁহার আদর্শ ও নিয়ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন—সেইখানেই তাঁহার সঙ্কল্প নষ্ট হইয়াছে, এবং রচনায় ও নানা দোষ দেখা দিয়াছে।

এইখানেই সমালোচ্য পুস্তকের ত্রুটীর তালিকা শেষ হইল। এখন আমরা পাঠকের সহিত প্রমথবাবুর কবিতা-পাঠের আনন্দ উপভোগ করিব।

প্রবন্ধের গোড়াতেই আমরা প্রমথবাবুর স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াছি। প্রধানতঃ এই বিশেষত্ব তাঁহার মানসিক দৃষ্টিতে। তিনি যে কোনও বিষয়ের আলোচনা করেন, তাহার বর্ণনায় বা রহস্য-উদ্ঘাটনে যতই কেন চিন্তার গভীরতা বা প্রগাঢ়তা থাক্, তাহার ভিতর হাসির একটু আভাস,

পরিহাসের একটু জ্বালা দেখা যায়।—তিনি জীবনের কোনও বিষয়কেই এত বড় মনে করেন না—এত প্রাধান্য দেন না যে, তাহার খাতিরে জীবনের অপর সকল বিষয়কে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। সমাজ-সংসার, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, সকলই জীবনের অংশমাত্র, কোনটাই সমগ্র জীবন নয়। একের জন্য অপর কোনটিকে তুমি উড়াইয়া দিতে পার না। তুমি যাহাকে এত বড় করিয়া দেখিতেছ, তাহার ভিতরেও ক্ষুদ্রত্বের উপাদান আছে। তাই তাঁহার অনেক সনেটেই তিনি গুরু বিষয় সকলকে লঘুভাবে এবং লঘু বিষয় সকলকে গুরুভাবে দেখিয়াছেন, এবং তাঁহার লেখনীর স্পর্শ এমনই লঘু—তাঁহার ভাব ও ভাষার এমন একটি স্পর্শাতীত অনির্দ্দেশ-ভঙ্গী আছে যে, তুমি ঠিক বুঝিতে পারিবে না, কোন কথাটি তিনি প্রশংসাকল্পে এবং কোন কথাটিই বা অপ্রশংসাকল্পে বলিতেছেন। বিখ্যাত সমসাময়িক ফরাসী-লেখক Anatole Franceএর মনের প্রকৃতি অনেকটা এই ধরণের।

এই ভাব ও মনোভঙ্গীর উপযুক্ত সহায় তদুপযোগিনী ভাষা! প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমরা প্রমথবাবুর স্বাধীনতা এবং নির্ভীকতার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছি। উপরের কথিত মনোদৃষ্টি তাঁহার স্পষ্ট এবং যথেষ্ট প্রমাণ। সমাজ ও ধর্ম্মমন্দিরের "আপনি-মোড়ল" প্রহরীদিগের ভয় তাঁহার হৃদয়ে কিছুমাত্র থাকিলেও তিনি তাহাদের অন্ততঃ মুখে স্বীকৃত, অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিষয় সকল সম্বন্ধে তীব্র বিদ্রূপের সহিত লঘুভাবে লিখিতে সাহস করিতেন না। এবং সাহিত্যের ঐ শ্রেণীরই অনুরূপ রথীদিগের "দরকারী ভাব আর সরকারী ভাষা"র উপর তাঁহার সামান্যমাত্র শ্রদ্ধা থাকিলে, তাঁহার অভিধান ও শব্দভাণ্ডার এত উদার ও বিস্তৃত হইত না। তিনি কোনও শ্রেণীর শব্দকেই নির্ব্বাসিত করেন নাই। অভঙ্গকুলীন "সাধু" শব্দের সঙ্গে তিনি জাতিহীন "ইতর" শব্দকেও এক পংক্তিতে বসাইয়াছেন। তাহাতে যে ভাষার শক্তি বাড়িয়াছে, কে তাহা অস্বীকার করিবে?—ভাষার জীবন শব্দে। যখন দেখিবে, শব্দ-সংখ্যার গণ্ডী পড়িয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে, ভাষার জীবনীশক্তিরও হ্রাস হইতেছে।

কবির যে মনোধর্ম্মের কথা আমি উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা তাঁহার "বিশ্বরূপ", "বিশ্বকোষ", "বিশ্বব্যাকরণ" ও "আত্মপ্রকাশ" নামক কয়েকটি সনেটে বেশ সুপ্রকাশ। বিশ্বরহস্য লইয়া এক শ্রেণীর লোক এত উন্মত্ত যে, তাহারা জীবনকে জীবন বলিয়া উপভোগ করিতে পারে না—তাহারা

অনুক্ষণ তর্ক বিতর্কে মত্ত। কবি কিন্তু বিজ্ঞের ন্যায় কল্পনা-সুখে তাঁহার গুম্ফপ্রান্তে লঘু আকর্ষণ দিয়া ঈষৎ হাস্য-রঞ্জিত-অপাঙ্গে বলিতেছেন,—

"বিশ্ব সনে দিনরাত শুধু বোঝা পড়া,
সে ত নয় ঘর করা, করা সে ঝগড়া!"

"তার চেয়ে" এস এই বিপুল বিশ্বে ছড়ান প্রক্ষিপ্ত সকল টানিয়া লইয়া,

"প্রতীক রচনা করি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত,
চতুর্দ্দশ পদে বদ্ধ চতুর্দ্দশ লোক!

কিন্তু মানব-প্রকৃতি এমন নয় যে, গোলকধাঁধার ভিতর মানুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে। "অন্বেষণ" নামক সুন্দর সনেটে কবি বলিতেছেন:—

আজিও জানিনে আমি হেথায় কি চাই!
কখনো রূপেতে খুঁজি নয়ন-উৎসব,
পিপাসা মিটাতে চাই ফুলের আসব,
কভু বসি যোগাসনে, অঙ্গে মেখে ছাই॥
কখনো বিজ্ঞানে করি প্রকৃতি যাচাই,
খুঁজি তারে যার গর্ভে জগৎপ্রসব,
পুজা করি নির্ব্বিচারে শিব কি কেশব,—
আজিও জানিনে আমি তাহে কিবা পাই॥
রূপের মাঝারে চাহি অরূপ দর্শন;
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গস্পর্শন॥
খোঁজা জানি নষ্ট করা সময় বৃথায়,
দূর তবে কাছে আসে, কাছে যবে দূর।
বিশ্রাম পায় না মন পরের কথায়,
অবিশ্রান্ত খুঁজি তাই অনাহত-সুর॥

নবম দশম চরণে সহজ অথচ অর্থপূর্ণ স্বল্পকথায় ভাবপ্রকাশে কবির অসামান্য ক্ষমতা পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন। "অনাহত-সুর" Keatsএর "unheard melodies" অপেক্ষা সুন্দর।

নিম্নে উদ্ধৃত "শিব" নামক সনেটে দেখিবেন, কবির "অন্বেষণ" ব্যর্থ হয় নাই:—

রজতগিরিতে হেরি তব শুভ্রকায়া,
চন্দ্র তব ললাটের চারু আভরণ,
তব কণ্ঠে ঘনীভূত সিন্ধুর বরণ,—
বিশ্বরূপ জানি আমি তব দৃশ্যমায়া॥

যার স্ফূর্ত্তি চরাচর, সে ত তব জায়া ;
নিজদেহে করিয়াছ বিশ্ব আহরণ,
তাই হেরি কৃত্তি তব চিত্র-আবরণ,—
জীবনের আলোশ্লিষ্ট মরণের ছায়া !
তোমার দর্শন পাই মূর্ত্তিমান মন্ত্রে,
যজ্ঞসূত্রে বাঁধা যাহা হৃদয়ের তন্ত্রে ॥
সেইরূপ রেখো দেব ভরিয়া নয়নে,—
শিবমূর্ত্তি হেরি বিশ্বে, দেহ এ ক্ষমতা ;
ধরিতে পারি না আমি নেত্রে কিংবা মনে,
আকারবিহীন কোন বিশ্বের দেবতা ॥

যে দেশের শাস্ত্র-শিক্ষা হইতেছে—

"যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয় সমশ্নুতে।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈ্রিদং ধর্ম্মং সনাতনম্।"

সে দেশের কবি যে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি-বিশাল বিরাট শিবমূর্ত্তি বিশ্বময় দেখিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নয়—না দেখাই আশ্চর্য্য।

"মুস্কিল-আসান" সনেটে কবি দেখাইয়াছেন, শিবদর্শন সার্থক হইয়াছে :—

আজিও নিরাশা বুকে চাপালে পাষাণ
কানেতে না পশে মোর দুনিয়ার হাল্লা
হৃদয়ে ফকির জপে "লা-আল্লা-ইলাল্লা",
আকাশেতে শুনি বাণী "মুস্কিল-আসান" !

কিন্তু লগ্ন হারাইলে ভক্তিও জন্মিবে না, এবং দেবদর্শনের ফললাভও হইবে না।

"কতদিন, কত দেশে, কত শত ভোরে,
অসংখ্য ফুলেতে ভরা কত ফুলবনে
ফিরেছি অলসভাবে—একা আনমনে,—
তুলিনি পূজার লাগি কিন্তু সাজি ভরে' ॥
কতদিন, কত দেশে—সারা নিশি ধরে'
থেকেছি বসিয়া আমি মন্দিরের কোণে,
স্নিগ্ধ দৃষ্টি কত শত দেবতার সনে,—
করিনি প্রণাম কিন্তু জুড়ি' দুই করে ॥
আগে শুধু ক'রে গেছি এই সব ভুল।
এখন দেবতা কোথা, কোথা সেই ফুল !

নিম্নলিখিত সনেট্‌ মানব-জীবনের একটি পরিচিত নিষ্ঠুর বিড়ম্বনার মর্ম্মস্পর্শী করুণ চিত্র ঃ—

"প্রতিমা গড়েছি আমি প্রাণপণ করি ;
আঁধারে আবৃত কত খুঁজে গুপ্ত খনি,
এনেছি তারার মত জ্যোতির্ম্ময় মণি ;—
রত্ন দিয়ে দেবীমূর্ত্তি গড়িবার তরে।
স্ফটিকে গড়েছি অঙ্গ নিশিদিন ধরে,
পরায়েছি শ্যাম শাটী মরকতে বুনি,
রক্তবিন্দু পারা দুটি সুলোহিত চুনি,
বিন্যস্ত করেছি আমি দেবীর অধরে॥
প্রজ্বলিত ইন্দ্রনীলে খচিত নয়ন,
প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ,
মুক্তা-নির্ম্মিত যুগ্ম ঘন-পীন-স্তন,
সুকঠিন পদ্মরাগে গঠিত চরণ ;
অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি কিন্তু অচেতন,—
না পারি পূজিতে কিংবা দিতে বিসর্জ্জন !

আমরা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব দিয়া, দেহপাত প্রাণপাত করিয়া, কত যত্ন ও আদরে আমাদের সাধ ও আশাকে গড়িয়া তুলি—কিন্তু হায়! যখন চেষ্টার শেষ অঙ্কে উপস্থিত হই, তখন যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা কোথায়? যে জন বা যে বস্তু পাইবার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াসে—জীবনসর্ব্বস্বদান, তাহাকে ত পাইলাম না—অথচ যাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছি, তাহার চিন্তাই বা কি করিয়া ত্যাগ করি।

প্রায় সমস্ত সনেটগুলি এমন সুন্দর যে, উদ্ধৃত করিতে গেলে সমস্ত পুস্তক উদ্ধৃত করিতে হয়। ইহাতে কেবল একমাত্র আপত্তি, স্থানাভাব। সনেট্‌গুলি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। আমরা তাহাদের শ্রেণী-নির্দ্দেশ করিয়া এবং অল্পবিস্তর পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হইব।

গ্রন্থের প্রারম্ভে চারিটি সনেট্‌ সংস্কৃত সাহিত্যের চারি জন খ্যাতনামা কবির উপর লিখিত। যদিও তাহাদের অর্থসংগ্রহ এবং সৌন্দর্য্য-উপভোগের জন্য সেই সকল কবিদের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে পাঠকের পূর্ব্বপরিচয় কিয়ৎ-পরিমাণে আবশ্যক, কিন্তু তাহারা এমন সরল সাধারণভাবে লিখিত যে, পাঠে সকলেই তাহাতে মুগ্ধ হইবেন। "ভাস" ও "জয়দেবে"র উপর দুটি সনেটে

পরস্পরের কাব্য-প্রকৃতির বিভিন্নতা দেখান হইয়াছে। এতদিন আমরা ভাসের নামমাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম, সম্প্রতি তাঁহার কাব্যাবলী আবিষ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভাস সম্বন্ধে কবি বলেন ঃ—

শুদ্ধ সুরে গেয়েছিলে প্রসন্ন বিভাস,
পরিষদ ছিল তব মহাপ্রাণ আর্য্য;
সে যুগের কবিমুখে ছিল না উচ্চার্য্য
বৃন্দাবনী প্রণয়ের গদগদ ভাষ॥
স্বাধ্যায়-পবিত্র তব শূর-মুখ-বাণী;
সরাঙ্গিণী অরোগিণী তব বীণাপাণি॥

"চোর কবি" নামক সনেট্‌টি সমুদয় না তুলিলে গ্রন্থকারের উপর অন্যায় করা হয়। কিন্তু স্থানাভাবে ষষ্ঠকটিমাত্র উদ্ধৃত হইল ঃ—

সেই রক্তপুষ্পে করি শক্তি-আরাধনা,
করেছিলে শ্মশানেতে নায়িকা-সাধনা;
দিয়েছিল দেখা বিশ্ব বিদ্যা-রূপ ধরি;
কনকচম্পকদামে সর্ব্বাঙ্গ আবরি,
সুপ্তোত্থিতা, শিথিলাঙ্গী, বিলোলকবরী,
প্রমাদের রাশি সম অবিদ্যা-সুন্দরী!

কোনও চিত্রকরের তূলিকায় এমন সুন্দর লেখা কি সম্ভবপর? তুমি সুপ্তোত্থিতা, শিথিলাঙ্গী, বিলোলকবরীর ছবি ফলাইতে পার। কিন্তু কোন বর্ণের অজানিত মহিমা দ্বারা—কোন দেহভঙ্গী এবং দৃষ্টিভঙ্গীর নাট্য-কৌশলময় রেখাপাতে "প্রমাদের রাশি সম অবিদ্যা-সুন্দরী"কে আঁকিবে? মিল্টনের "Darkness Visible" মনশ্চক্ষে যে ছবি আঁকিয়া দেয়, কোন্ বর্ণে তাহা প্রতিফলিত করিবে?—বর্ণ ও রেখার অপেক্ষা শব্দের ব্যঞ্জনা-শক্তি অশেষ গুণে অধিক। শব্দের শক্তি অসীম। "শব্দ ব্রহ্ম"। "বসন্ত-সেনা" ও "পত্রলেখা"র পূর্ণ রসাস্বাদনের পক্ষে, পূর্ব্বে "মৃচ্ছকটিক" এবং "কাদম্বরী"র পরিচয় আবশ্যক। এই দুই সনেটে উক্ত দুইটি সুন্দর কাব্যের মধুময়ী দুটি পাত্রী, কবির স্মৃতিময়ী কল্পনাস্পর্শে মধুরতররূপে প্রতিভাত। "বসন্তসেনা"য় কিন্তু সনেটের কোনও নিয়মই রক্ষিত হয় নাই। "পত্র-লেখা" আরম্ভেই চিত্ত আকর্ষণ করে।

"অষ্টাদশ বর্ষদেশে আছে। পত্রলেখা"—

আমরা যখন তাহাকে প্রথম দেখি, তখন তাহার অষ্টাদশবর্ষপরিমিত

যৌবন। তার পর আর কোনও সংবাদই পাই না। সুতরাং যখনই তাহাকে মনে পড়ে, তখনই তাহার সেই অষ্টাদশ বর্ষের উজ্জ্বল যৌবন-মাধুরী হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। যে ভূভাগে অষ্টাদশবর্ষ নিত্য বিরাজিত—"যৌবনান্তং বয়ো যস্মিন্"—"পত্রলেখা" সেই দেশের নিত্য অধিবাসিনী।

"রজনী-গন্ধা" ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ফুলের উপর লিখিত সনেট্গুলি বিচিত্র কল্পনার বর্ণগৌরবে এবং অভিনব ভাবের অকৃত্রিম সৌরভে ফুলেরই মত সুন্দর। সকলগুলিই কবির সূক্ষ্ম রসানুভবশক্তির পরিচায়ক—তা "ফুলের নবাব" এবং "নবাবের ফুল" গোলাপেরই উপর, বা "রতিভর তনু" কাঠ-মল্লিকারই উপর লিখিত হউক! তন্মধ্যে "ধুতুরার ফুল" বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এমন অনেক বস্তু বা বিষয় আছে, যাহাদের ভিতর আমরা সাধারণতঃ উপভোগ্য কিছুই দেখিতে পাই না, কেবল বিশেষ মনোধর্ম্ম-বিশিষ্ট কবিগণ—Poe বা Baudelaire অসাধারণ কল্পনাবলে এবং সূক্ষ্ম অনুভবশক্তির প্রভাবে তাহাদের প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, এবং সেই সকল বস্তু বা বিষয়কে আমাদের পরিচিত উপভোগ্য বস্তু বা বিষয়ের সহিত অচিন্ত্যপূর্ব্ব ভাবসূত্রে গাঁথিয়া দিয়া সাধারণ মানবচ'ক্ষে এই লুকান সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করিয়া দেন, এবং একটি অভিনব আনন্দের সৃষ্টি করেন। ধুতুরার ফুলের "গন্ধ হলাহল" নূতন উপভোগের বিষয়।

রাগরাগিণীর উপর লিখিত সনেট্গুলিও ফুলের সনেট্সমূহের ন্যায় সমান উৎকর্ষপ্রাপ্ত। তন্মধ্যে "পুরবী', বিশেষত্বে "ধুতুরার ফুলে"র তুল্য-প্রকৃতি।

"পরিচয়ে" প্রকৃত প্রেমের একটি বিশেষ ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমের গভীর এবং প্রগাঢ় অনুভব হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে পূর্ব্বস্মৃতি আহরণ করিয়া প্রেমপাত্রকে পূর্ব্বজন্মের সহিত গাঁথিয়া দেয়। প্রেমিক কোনও মতেই বিশ্বাস করিতে পারে না যে, প্রেমের পাত্রের সহিত এই জন্মেই তাহার প্রথম পরিচয়। যে প্রেম এখন সমস্ত জীবন—সমস্ত অস্তিত্বকে ব্যাপ্ত এবং পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে পূর্ব্বে একেবারে ছিল না, তাহার কল্পনাই অসম্ভব। প্রেমিক হৃদয় তাই গভীর এবং প্রগাঢ় অনুভবের উন্মাদনায় গাহিয়া উঠিয়াছে—

তোমা সনে ছিল জানি পূর্ব্বপরিচয়—
মন কিন্তু যুগস্মৃতি করে না সঞ্চয়।

রবীন্দ্রনাথ গায়িয়াছেন—

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

এবং পূর্ব্বজন্মে অবিশ্বাসী খ্রীষ্টান কবিও গায়িয়াছেন :—

Has this been thus before ?
And shall not thus time's eddying flight
Still with our lives and love restore
In deaths' despite,
And day and night yield one delight once more.

"উপদেশ" নামক সনেটে প্রমথবাবু "প্রিয়কবি" এবং "বড়কবি" হইবার দুরাশায় "উদ্বাহু-বামন"দিগকে তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাতে চিহ্নিত-পৃষ্ঠ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন :—

কবিতার জন্মস্থান কল্পনার দেশ,
সে দেশ জানে না কিন্তু মোদের ভূগোল,—
সত্যের সেখানে নেই কোন গণ্ডগোল,—
দেহ নেই সেই দেশে, শুধু আছে বেশ।

পরবর্ত্তী সনেটের বর্ণিত "স্বর্ণলঙ্কা" সেইরূপ একটি কল্পনার দেশ। সেইখানে,

লীন হ'য়ে প্রিয়া-অঙ্কে, স্বর্ণ পালঙ্কে,
কলঙ্কের মত রই জড়ায়ে শশাঙ্কে।

"ব্যর্থজীবন" নামক বিদ্রূপাত্মক সনেট্‌টি সাধারণ বাঙ্গালীবাবুর সুন্দর ছায়া-চিত্র, Silhouette.

আমরা "রজনীগন্ধা" সনেটের অপ্রশংসা করিয়াছি। অনেকটা সেইরূপ ভঙ্গী এবং ধরণে লিখিত হইলেও "ভুল" নামক সনেটটি ভাব ও রসের মহিমা ও মোহিনীতে অতুলনীয় :—

ভাল তোমা বেসেছিনু, মিছে কথা নয়।
যে দিন একেলা তুমি ছিলে মোর সাথী,
বকুলের তলে বসি, মনে মন গাঁথি।—
বকুলের গন্ধ বল কতদিন রয় ?
সে দিন পৃথিবী ছিল অন্ধকারময়,
মন মেঘে ঢেকেছিল নক্ষত্রের বাতি.
সে তিমির চিরেছিল বিদ্যুৎ-করাতি।—
বিদ্যুতের আলো কিন্তু কতক্ষণ রয় ?

স্বপ্ন মোরা ভুলে যাই নিদ্রা গেলে টুটে,
সাদা চোখে সব দেখি নেশা গেলে ছুটে॥
নিভানো আগুন জানি জ্বলিবে না আর,
মনে কিন্তু থেকে যায় স্মৃতিরেখা তার,—
হৃদিলগ্ন আমরণ পারিজাত-হার।
হৃদয়ের ভুল শুধু জীবনের সার!

প্রবন্ধ নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। এখন মোটের উপর প্রমথ-বাবুর কবিতা ও রচনা-শক্তির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া সমালোচনার উপসংহার করিব। তৎপূর্ব্বে আমাদের একটি নিবেদন আছে। এই প্রবন্ধে অনেক সনেটের বিশেষ উল্লেখ হইল না, তাহাতে পাঠকগণ এমন ভাবিবেন না, তাহারা কোনও অংশে উদ্ধৃতগুলির অপেক্ষা হীনগৌরব।

কবিতার যে তিনটি লক্ষণ মহাকবি Milton চিরকালের জন্য অভ্রান্ত-রূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন—Simple (সরল)—Sensuous (বস্তুতন্ত্র) এবং impassioned (আবেগময়), এই তিনটি লক্ষণই প্রমথ বাবুর সনেট-গুলির মধ্যে দেখিতে পাই। তাঁহার ভাষা এবং ভঙ্গী যারপরনাই সরল এবং সহজ। তাঁহার ভাব যেমন অকৃত্রিম, পূর্ণ এবং পরিণত, তাঁহার ভাষাও সেইরূপ সরল, প্রাঞ্জল, এবং বাহুল্যহীন। তাঁহার সনেটগুলির ভিতর অস্পষ্ট বা জটিল কিছুই নাই। দিবালোকের ন্যায় সকলই স্পষ্ট—প্রত্যক্ষ। তাঁহার কবিতা Sensuous অর্থাৎ শরীরী, রূপ-রস-বিশিষ্ট, ধরিবার এবং ছুঁই-বার—কেবল অপরিণত ভাবের কুজ্ঝটিকা নয়। এবং impassioned—সমস্তই প্রবল ভাবের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত। পাঠক দেখিবেন, প্রমথবাবুর এমন কোনও কবিতা নাই—তিনি এমন কোনও শব্দই ব্যবহার করেন নাই, যাহা রূপ-রস-হীন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন:—

হৃদয়ে জন্মিলে মোর ভাবের অঙ্কুর
উঠে না তাহার ফুল শূন্যেতে দুলিয়ে।"
"নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন।"
"বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার
তাহার কবিতা শুধু মনের বিকার।
এ কথা পণ্ডিতে বুঝে, মূর্খে লাগে ধন্ধ।"

শুধু পণ্ডিতে নয়—উল্লেখযোগ্য সকল-কবিই—Homer হইতে Swinburn পর্য্যন্ত এবং বাল্মীকি হইতে অক্ষয়কুমার পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ তাঁহাদের কাব্যে

এ কথার সমর্থন করিয়াছেন। এই "অশরীরী মনঃস্পন্দনে"র আতিশয্য হেতুই রূপ-রস অর্থাৎ Sensuousnessএর অভাবে Emersonএর কবিতা সাহিত্যে আদর পায় নাই। রহস্যের বিষয় এই যে, সম্প্রতি আমাদের দেশে এমন এক সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা এতই নিরাকার-পরায়ণ এবং অরূপের পক্ষপাতী যে, তাঁহারা সাহিত্যে sensusousness কেন, senseএর গন্ধ পাইলেই ক্ষেপিয়া উঠেন। বোধ হয়, এই সাধু-সম্প্রদায় sensuous এবং Sensual, এই দুই কথার অর্থ-বিভিন্নতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কবির কার্য্য শব্দ এবং বাক্য লইয়া। এখন দেখা যাক, প্রমথবাবুর এ বিষয়ে সৌভাগ্য কিরূপ। অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন কবি এবং মনীষী Coleridge বলেন,—"Good Prose is proper words in their proper places; good verse is—the most proper words in their proper places.—উপযোগী শব্দের যথাস্থানে সংস্থানই ভাল গদ্য—সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী শব্দের যথাস্থানে সংস্থানই ভাল পদ্য। এখন শব্দ এবং শব্দ-সমষ্টি, বাক্যের উপযোগিতা কিসে?—ব্যঞ্জনায়। অর্থাৎ, শব্দ এবং বাক্যের আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত আভাসে। গদ্যের পক্ষে ইহা অতি-মাত্রা। পদ্যে আমরা চাই প্রাঞ্জল বিবৃতি। তৎপক্ষে পরিমিতার্থ শব্দ এবং বাক্য আবশ্যক। আমি এমন বলিতেছি না যে, গদ্যে ব্যঞ্জনা-শক্তি-বিশিষ্ট শব্দ এবং বাক্যের প্রবেশ-নিষেধ। ইহার বাহুল্যই গদ্যের হীনতা-জনক। তাহাতে গদ্যের প্রাঞ্জলতা নষ্ট হইতে পারে। তবে যে গদ্য প্রবল ভাবের আবেগে উদ্দীপ্ত—অর্থাৎ যে গদ্য নিজের সীমানা অতিক্রম করিয়া পদ্যের সীমানা আক্রমণ করে, সে গদ্যে ব্যঞ্জনা-শক্তি-বিশিষ্ট শব্দ এবং বাক্য আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে। শব্দের আর একটি শক্তি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে যে অব্যক্ত ইন্দ্রজাল বা মোহিনী আছে, তাহাকে প্রতিফলিত করা। এই অব্যক্ত ইন্দ্রজালকে ভাষায় আয়ত্ত এবং ব্যক্ত করাই কবির কার্য্য। একটি ভাবের জন্য—একটি বিষয়ের অঙ্কন-উপযোগী—একটিমাত্র অদ্বিতীয় কথাই আছে—যাহার সংস্পর্শে প্রণয়িনীর চুম্বনের ন্যায় (the very kiss of the beloved) ভাব জাগিয়া উঠে। এইরূপ কথা-নির্ব্বাচনে অদ্ভুত ক্ষমতা আমরা দেখিতে পাই—বিদ্যাপতি এবং অপর দুই একটি বৈষ্ণব কবিতে—ভারতচন্দ্রে এবং রবীন্দ্রনাথে। প্রমথবাবুর অনেক-গুলি সনেটেও এই শব্দসম্পদের নিদর্শন পাই।

আবার শব্দ অপেক্ষা সুরের ব্যঞ্জনা-শক্তি অনেকগুণে অধিক। ভাব বা অনুভবের আবেগ ও গভীরতা, যাহা ভাষায় অপ্রাপ্য—সুরের অপৌরুষেয় মহিমায় তাহা অনায়াসলভ্য। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের সুর-সম্পদ আশ্চর্য্য। বিদ্যাপতির "সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়"—এই কয়টি সামান্য কথার প্রকাশ-শক্তি সামান্য,—কিন্তু ইহাদের ভিতর যে সুরের অসামান্য আবেগ আছে—তাহাতে অনুভবের আবেগ পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। কয়টি কথার আকুল স্বরে আমরা প্রেমবিহ্বল-হৃদয়ের অশ্রুময়ী আকুলতা আমাদের নিজ হৃদয়ে অনুভব করি। যে প্রেম জীবন মরণকে আত্মসাৎ করিয়া রহিয়াছে—যাহার উল্লেখমাত্র হৃদয় বিবশ—নয়নপত্র আদ্র হয়,—সেই প্রেমের করুণ-চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠে। পাঁচটিমাত্র কথা। কিন্তু এমন অশ্রুসিক্ত পদ আর দ্বিতীয় কোথায়?

প্রমথবাবুর রচনার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার কবিতায় এমন অনেক কথা পাওয়া যায়, যাহা প্রবাদ-বচনের ন্যায় শাণিত—সংক্ষিপ্ত এবং জীবনের অনেক বিষয়ে লাগাইবার উপযোগী—যাহাকে Mathew Arnold—Criticism of life—জীবন-ঘটিত ব্যাপারের আলোচনা বলেন, এবং প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে সেক্ষপীয়ার এবং কালিদাসের অসাধারণ সৌভাগ্য। তাঁহাদের নীচেই পোপের নাম করা যাইতে পারে। প্রমথবাবু নিজেই বলিয়াছেন, ভাষার এই চুট্‌কি সম্পত্তির দিকে তাঁহার আন্তরিক টান:—

> আজ তাই ছাড়ি যত ধ্রুপদ ধামার,
> চুট্‌কিতে রাখি যত আশা ভালবাসা।

প্রমথবাবুর পুস্তকে আমরা উচ্চ প্রতিভার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ এবং বিস্তারিত সাহিত্যানুশীলনের পরিচয় পাই। প্রতিভার প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার এবং ললিতকলাচর্চ্চার প্রণোদনা দেখি। তিনি স্বভাব-কবি—তাঁহার নিজের খাঁটী বাঙ্গালায় "জাতকবি"—হইলেও কেবলমাত্র বাগ্‌দেবীর "ভর" লইয়া না থাকিয়া নিজের স্বাভাবিক শক্তিসমূহকে বিস্তর অনুশীলনে কর্ষিত করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার সুন্দর কলাসৌষ্ঠব এই অনুশীলনের ফল। তিনি কবি এবং—Artist—কলানিপুণ। এবং উহারই বলে "সনেট্-পঞ্চাশৎ" তাঁহার প্রথম পুস্তক হইলেও, তাহাতে আমরা শিক্ষা-নবীশের অনুচিকীর্ষা, অসম্পূর্ণতা, বা অক্ষমতা কোথাও দেখিলাম না।

সমস্তই পাকা হাতের লেখা। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের রচনার সঙ্গে বহু এবং বহুকালব্যাপী পরিচয় থাকার দরুণ ললিতকলার সকল অঙ্গই তাঁহার সুপরিচিত। লিখিতে বসিয়া তাঁহাকে আদর্শহীন হইতে বা আদর্শের জন্য হাতড়াইতে হয় নাই। বিস্তারিত সাহিত্যচর্চ্চার ফলে যে কলাসৌন্দর্য্য অতর্কিতভাবে তাঁহার হৃদয়ে গভীর অঙ্কপাত করিয়াছে, তাহাকে তাঁহার সাহিত্যিক "সংস্কার" বলা যাইতে পারে। এই সংস্কারপুষ্ট প্রতিভাবলে তাঁহার সনেট্‌গুলি, কল্পনাসম্পদে—ভাবপ্রকাশে—ভাষা ও ভঙ্গীগৌরবে এবং শ্রুতিমাধুর্য্যে এক রবিবাবু ছাড়া সমসময়িক কোনও কবির রচনা অপেক্ষা হীনশ্রী নহে।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

---

# সহযোগী সাহিত্য।

## মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

আর্থার এভালন্ (Arthur Avalon) নাম দিয়া কলিকাতার এক জন বিচার-পতি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। তন্ত্র-তত্ত্ব নাম দিয়া ইনি আরও একখানি উপাদেয় গ্রন্থ বাহির করিতেছেন। গ্রন্থকার যখন স্ব-পরিচয় প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক, তখন আমরাও তাঁহার বি-নামার অবগুণ্ঠন মোচন করিব না। তবে তিনি যে এক জন যশস্বী ও মনীষী ইংরেজ, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিবই। তাঁহার অনূদিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ইংরেজী ভাষায় রচিত হইয়াছে, বিলাতের এক জন প্রসিদ্ধ প্রকাশকের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, অতঃপর তাঁহার এই দুইখানি পুস্তক বিলাতের বিদ্বজ্জনসমাজে একটা ভাব-বিপ্লব ঘটাইবে। ইউ-রোপের বিদ্বদ্বর্গ তন্ত্রের আদর করিতে আরম্ভ করিলে, হয় ত পরে তন্ত্রের সাধন-স্থান এই বঙ্গদেশেও উহার আবার আদর বাড়িতে পারে।

লেখক মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের যে ভূমিকাটি লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া সত্যই আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। আমরা পূর্ব্বে কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, আধুনিক খ্রীষ্টান ইংরেজ তন্ত্রের সাধন-তত্ত্ব, মন্ত্র-মহিমা, ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি ব্যাপার সকল এতটা বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ তন্ত্রের সাধনতত্ত্ব, বুঝা বড়ই কঠোর তপস্যা-সাধ্য। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে আমরা তন্ত্রতত্ত্বের যত-টুকু ধারণা করিতে পারিয়াছি, তাহারই বলে ইহা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, মান্যবর আর্থার এভালন্ তন্ত্রের অনেক গোপ্য ও গুহ্য তত্ত্ব অনেকটা বুঝিতে পারিয়া-ছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ভূমিকায় যে সকল কথা তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিতে

পারেন নাই, তাহার জন্য তন্ত্রতত্ত্বের বরাত দিয়াছেন ; কাজেই মনে করিতে হয় যে, তাঁহার রচিত, এখনও অপ্রকাশিত, তন্ত্রতত্ত্বে তন্ত্রের সকল ব্যাখ্যান-যোগ্য বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা থাকিবে ; সুতরাং আমরা লেখকের নিকট তন্ত্রের পূর্ণব্যাখ্যান প্রত্যাশা করিতে পারি। যাহা হউক, তিনি যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ইংরেজী সংস্করণ বাহির করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে শত ধন্যবাদ করিতেছি।

এক সময়ে বাঙ্গালা দেশে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের একটু প্রচলন হইয়াছিল। কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজ ছাপাখানা হইতে, পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সম্পাদনে, মহানির্ব্বাণতন্ত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। রাজা রামমোহন স্বয়ং তান্ত্রিক ছিলেন, নিজে শৈব বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং তন্ত্র-উপাসনা করিতেন। তাঁহার গুরু স্বামী হরিহরানন্দ এক জন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রকে ব্রাহ্মসমজের ধর্ম্মগ্রন্থরূপে প্রচলিত করিতে তিনি চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের মন্ত্র ও পদ্ধতি এই তন্ত্রের ব্রহ্ম-দীক্ষা হইতে গৃহীত। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অনুচিকীর্ষা-বশে কতকটা আত্মহারা হইয়া রাজা রাম-মোহন প্রদর্শিত পন্থা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তবে মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মস্তোত্র তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখনও আবৃত্তি করিয়া থাকেন। ইংরেজী সভ্যতা এবং শিক্ষার অতিবিস্তারের প্রথম যুগে তন্ত্রের নিন্দায় বাঙ্গালা দেশ পূর্ণ হইয়াছিল। বাঙ্গালার সুধী-সমাজে তন্ত্রের সুখ্যাতি কেহ করিতে পারিত না। এমন কি, যাঁহারা হিন্দু বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন, তাঁহারাও প্রকাশ্যতঃ তন্ত্র-সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে পারিতেন না। তখনও বাঙ্গালায় বড় বড় তান্ত্রিক সাধক ও পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহা-দের সাহায্যে তন্ত্র-তত্ত্ব সাধারণে ব্যাখ্যাত হইতে পারিত। কিন্তু তখন শিক্ষিত বাঙ্গালী খ্রীষ্টানী সভ্যতায় বিমূঢ়, নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তির কি আছে, কি নাই, সে অনুসন্ধান করিবার অবসর কাহারও ছিল না ; বিশেষতঃ তন্ত্রের আলোচনা করিতে হইলে তখন বিদ্বজ্জনসমাজে নিন্দাহ্ হইতে হইত ! কেবল পুণ্যশ্লোক মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর বৃদ্ধ পণ্ডিত জগন্মোহনের সাহায্যে দুই তিনখানি বহি প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃনামে প্রকাশিত হর-তত্ত্ব-দীধীতি বঙ্গীয় পণ্ডিতবর্গের মনীষা-জাত অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বলিয়া এখনও পরিচিত। বৃদ্ধ পণ্ডিত জগন্মোহন মহানির্ব্বাণতন্ত্রেরও একখানি ব্যাখ্যা-পুস্তক বাহির করিয়াছিলেন। তন্ত্রের এবংবিধ আলোচনা তখনও বাঙ্গা-লার বিদ্বজ্জনসমাজের অংশবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। বামা ক্ষেপা, কড়েডর ন্যাংটা বাবা, স্বামী সদানন্দ প্রভৃতির পরিচয় একা মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ বিশে পাগলা, বিন্দু চাঁড়ালনী প্রমুখ সাধকগণের প্রতি উপেক্ষা এবং অবহেলাই প্রদর্শন করিতেন। বাঙ্গালা এখনও তন্ত্র শাসিত ; এখনও বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবচন্দ্রের আমলে তন্ত্রের যে জাঁক ছিল, যে মহিমা প্রকট ছিল, এখন আর তাহা নাই। তাই অধুনা বঙ্গদেশে তন্ত্রসাধকগণ তেমন প্রকট নহেন। বোধ [illegible] আবার ইচ্ছা হইয়াছে—আবার ঐশ্বর্য্য-বিকাশের বাসনা হইয়াছে, তাই

আর্থার এভেলন্ তন্ত্রের চর্চা করিতেছেন, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এমন সুন্দর একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। এইবার বোধ হয় ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী তন্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিবেন।

তন্ত্রের বিশিষ্টতা উহার সাধন-পদ্ধতিতে। উহা উপাসনা বা প্রার্থনা নহে; উহা দেবতার নিকট রোদন, অনুতাপ, বা অনুশোচনা নহে। উহা পুরুষ প্রকৃতির সম্মিলন-সাধনা, দেহস্থ পুংত্ব ও মাতৃত্বের যোগ-সাধনা মাত্র—সোপাধিককে নিরুপাধিক করিবার আয়াস-মাত্র। আমার দেহে যিনি আছেন, যাঁহার জন্য আমি আছি—এই বোধ আমাতে নিত্য বিদ্যমান; তিনি দুগ্ধে নবনীতবৎ সৃষ্টির চরাচরে, স্থূলে সূক্ষ্মে, জড়ে চিতে—সর্ব্বস্থে পরিব্যাপ্ত। সেই স্বরাটকে বিরাটে মিশানই তন্ত্রের সাধনা। দেহজ শক্তির উন্মেষ দ্বারা এই সাধনা করিতে হয়; কুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া ষট্চক্রভেদ করিতে পারিলেই এই সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায়। ইহা কেবল ফিল্সফি নহে, বচনের তুষ চূর্ণ করিবার চেষ্টা নহে, "হাতে হেতেরে" করিয়া কর্ম্মিয়া দেখিবার বিষয়। তন্ত্র বলিতেছেন, সদ্-গুরুর আশ্রয় লইয়া সাধনা কর, যদি হাতে হাতে ফল না পাও, তাহা হইলে উহাকে পরিহার করিতে পার। এমন স্পর্দ্ধার কথা পৃথিবীর আর কোনও ধর্ম্ম-পদ্ধতিতে কেহ বলিতে পারে নাই। মনে হয়, মুসলমানদের সাধনা, রোমান-কাথলিক ও গ্রীকচর্চ্চের খ্রীষ্টান-দিগের Esoteric Reliion বা গুপ্ত ধর্ম্ম-সাধনা ইহা তন্ত্রের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে সাধনা আছে, সেইখানেই তন্ত্র-পদ্ধতি আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পূর্ব্বে একবার "সাহিত্যে" তন্ত্রের আলোচনা করিতে যাইয়া আমি এই সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। লেখক আর্থার এভেলন যে ইহার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, আমি এমন কথা বলিতে পারি না। রোমান-কাথলিকদিগের সাধন-পদ্ধতির সহিত তন্ত্র-সাধন-পদ্ধতির সামঞ্জস্য আছে দেখিয়া তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তন্ত্র পতঞ্জলির যোগপদ্ধতিকে কতকটা আয়াসসাধ্য করিয়া তান্ত্রিক কর্ম্মকাণ্ডের সহিত উহাকে সমসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। তাই তন্ত্রের সাধন-পদ্ধতি ভারতের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অবলম্বন করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের এই অনুমান যদি ঠিক হয় যে, তন্ত্র চাল্ডিয়া বা শাকদ্বীপ হইতে এই ভারতবর্ষে আমদানী করা হইয়াছে, তাহা হইলে ইহাও ত অনুমান করা যাইতে পারে যে, চালডিয়া (Chaldœa) হইতে তন্ত্র ইউরোপেও রপ্তানী করা হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্তরে স্তরে তন্ত্র, কন্ফুস্ ধর্ম্মে তন্ত্র-সাধন প্রকট, সিন্তো ধর্ম্ম তন্ত্র ধর্ম্মের নামান্তরমাত্র। মিশর দেশে পুরাকাল হইতে যে শক্তি-আরাধনা প্রচলিত ছিল, সে শক্তি-পূজা বা তন্ত্র-সাধনা ফিনিক ও গ্রীসে প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা বহু ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। কাজেই অনুমান করিতে হয় যে, প্রাথমিক খৃষ্টান ধর্ম্মেও তন্ত্রের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল।

খৃষ্টান পাদ্রীদের মুখের কথা ধরিয়া আমরা অধুনা যে উপাসনাকে প্রতিমা-পূজা বা Idolatory বলিয়া থাকি, তন্ত্রে তেমন প্রতিমা-পূজা বা পুঁতুল-পূজা নাই। এই সত্য কথাটা লেখক আর্থার এভেলন তাঁহার লিখিত ভূমিকায় অনেকটা পরিষ্কার

করিয়া দিয়াছেন। তন্ত্র বার বার বলিতেছেন যে, দেবতা হইয়া দেবতার পূজা করিতে হয়; ইষ্টদেবতা আত্মস্বরূপ; তিনি স্বতন্ত্র নহেন; তিনি সর্ব্বাধার, নিরাধার, সাক্ষীভূত, সনাতন পুরুষ! তন্ত্রের আসল পূজা—মানস পূজা, উহার মোটা পূজা যন্ত্রের পূজা। সেই যন্ত্র হইতেই রূপের উদ্ভব; জপে রূপের বিকাশ, মন্ত্রশক্তি দ্বারা রূপের উন্মেষ। সিদ্ধ পুরুষের হৃদয়াকাশে মায়ের কোটীরূপ কোটীভাবে ফুটিয়া উঠে, নিম্নাধিকারিগণ, গুরুর উপদেশ অনুসারে ধ্যানগম্য নানা রূপের একটা রূপ প্রকট করিয়া মহামায়ার পূজা করিয়া থাকে। উহা প্রতিমার পূজা নহে। প্রতিমার পূজা হইলে উহার বিসর্জ্জন হইত না; উহার ঘাড়ে চাপিয়া মৃণ্ময়ীকে জলে ডুবাইত না। ভাবে, ধ্যানে, জপে ও ষট্‌চক্রভেদের দ্বারা আত্মা শক্তির উদ্বোধন করিতে হয়! ইচ্ছাময়ী তিনি, কখন কোন সাধককে কেমনভাবে দেখা দেন, তাহা ত বলা যায় না। জানি কেবল যে, তিনি আছেন, আর তাঁহার নাম ও রূপ আছে। সে রূপ অপরূপ—বাক্যমনের অগোচর। তাই বাঙ্গালী ভক্ত খেদের গান করিয়া গিয়াছেন—

"রূপ সাগরে যাওয়া নাওয়া কঠিন হ'ল।
এবার বা আসা হয় বিফল।"

তন্ত্রের আর একটা বিশিষ্টতা আছে; তাহা মন্ত্র-শক্তি। লেখক আর্থার এভেলন মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ভূমিকায় মন্ত্র-শক্তির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তেমন বিশদ ব্যাখ্যা আমরা কোনও বাঙ্গালী পণ্ডিতের মুখে শুনি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমরা জানিতাম, মন্ত্র-শক্তি উপলব্ধি করিতে হয়, উহা বুঝাইবার বিষয় নহে। কিন্তু লেখক স্বীয় মনীষা-প্রভাবে, ইংরেজী ভাষায় যতটুকু সম্ভবপর, ততটুকু ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল বচনপরম্পরায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। তন্ত্র বলেন যে, দেহস্থ আত্মা বর্ণাত্মিকা—ধ্বনিরূপা। এই পঞ্চাশৎবর্ণরূপিণী মা, চক্রে চক্রে নানা বর্ণে বিগ্রমান; বীণার তারে আঘাত করিলে যেমন ধ্বনি হয়, ষট্‌চক্রবিহারিণী বর্ণরূপিণী মায়ের বর্ণতন্তুতে যথাপদ্ধতি আঘাত করিতে পারিলে তিনি ঝঙ্কার দিয়া জাগিয়া উঠেন! তিনি জাগিলেই সিদ্ধি করামলকবৎ সাধকের লভ্য হয়। তাই সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ "জননী জাগৃহি" বলিয়া মাকে জাগাইয়াছিলেন! তাই ভক্ত গান করিয়াছিলেন,—

"আর কত ঘুমাবি মা গো কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারে।"

পূজার বোধন আর কিছুই নহে—মাতৃশক্তির জাগরণ, কুণ্ডলিনীর উন্মেষগতিমাত্র। এই উদ্বোধন মন্ত্র-শক্তি দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। মন্ত্র দেহজ বাঁশীর ঝঙ্কারমাত্র। সুর জমিলেই জগন্ময়ী জাগিয়া উঠিয়া বসেন। তিনি জাগিলে শিব-শক্তির সমন্বয়-সাধনে আর বিলম্ব ঘটে না। একবার জপ করিয়া দেখ না, গুরুমুখ করিয়া যথা-পদ্ধতি জপ করিয়া দেখ না—তন্ত্রে যে জপের ফলশ্রুতি আছে, তাহা পদে পদে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। তখন বুঝিবে, তন্ত্র বুজরুকী নহে, মিথ্যাবচন-বিন্যাস নহে। চাই সদ্‌গুরু, সিদ্ধ মন্ত্র ও সাধনা। এই দুরধিগম্য মন্ত্র-তত্ত্ব আর্থার এভেলন বুঝিতে পারিয়াছেন! নিশ্চয় বলিব, তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারবশতঃ তিনি এমন অঘটন ঘটাইয়াছেন।

তন্ত্র জন্মান্তরবাদ গ্রাহ্য করে। কেবল যুক্তির হিসাবে গ্রাহ্য করে না, ভূগোলের মানচিত্র দেখানর মত সাধকের অনন্ত অতীত জীবন সকলকে ফুটাইয়া দেখাইয়া দেয়। তন্ত্রের দুই শাখা—সমাজ-ধর্ম্ম এবং সাধন ধর্ম্ম। সমাজ ধর্ম্মের অনুশাসন অনুসারে জাতি ও বর্ণের বিচার আছে। সাধন-ধর্ম্মে জাতিবিচার নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, স্ত্রীপুরুষ নাই, কেবল সাধন ও সিদ্ধির অনুপাত অনুসারে উচ্চ নীচের বিচার করিতে হয়। তন্ত্রে আছে কেবল অধিকার-তত্ত্ব। জন্মজন্মান্তরের সংস্কার লইয়া অধিকার নির্ণীত হইয়া থাকে; তাই চণ্ডাল পূর্ণানন্দ ব্রাহ্মণ ও কৃপাসিদ্ধ সাধক সর্ব্বানন্দের সমকক্ষ। তাই বৈদ্য রামপ্রসাদ ব্রাহ্মণেরও নমস্য। গুরুমুখ করিয়া তন্ত্র পড়িতে হয়; তাই তন্ত্রের ভাষা অপূর্ব্ব, উহার ব্যাখ্যা সাধারণ ধাতুপ্রত্যয়াদির সাহায্যে হয় না। তন্ত্র শক্তি-সাধনার পদ্ধতিমাত্র, সৃষ্ট সকল পদার্থ হইতে শক্তি-সংহরণের ব্যবস্থা উহাতে আছে। উহাতে হেয় ও প্রেয় নাই; যাহা সাধনার উপযোগী, তাহাই উহার প্রেয়। এই সাধনা অধিকারি-অনুসারে নির্ণীত হইয়া থাকে। যাহার যাহাতে অধিকার, সে তাহাই অবলম্বন করিবে। শক্তি সর্ব্বব্যাপিনী, স্থাবর জঙ্গম, পশু পক্ষী, নর নারী—সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বস্বে পরিব্যাপ্তা। জীবদেহ তথা নরদেহে নিবদ্ধ শক্তির বিকাশ দেহগত আসক্তিনিচয়ের সহায়তায় হইয়া থাকে; এই আসক্তি অবলম্বনে সাধন-পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয়। সাধনা মানেই শক্তির উন্মেষ—উদ্বোধন—জাগরণ। তাই শাক্ত জগতের সকল ব্যাপার হইতে শক্তি আহরণ করিয়া থাকেন। তোমার আমার সামাজিক ভালমন্দের মাপকাঠী দিয়া তন্ত্রের সাধনা মাপিতে নাই। উহা "তুমি বুঝ আর আমি বুঝি মন;—আর যেন কেউ না বুঝে।" লেখক আর্থার এভেলন ইহা বেশ বুঝিয়াছেন, তথাপি তিনি আজ কালকার স্থূলবাদী সভ্য সমাজের বুদ্ধির অনুকূল করিয়া প্রায় সকল কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টা জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

তন্ত্রে বাহিরের দেবতার কল্পনা নাই, জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর স্বর্গে বসিয়া বিশ্ব শাসন করিতেছেন, এমন কথা তন্ত্রে নাই। তন্ত্রের দৃষ্টিতে সাধকের দেহই ব্রহ্মাণ্ড, সেই দেহগত আত্ম-শক্তিই সাধকের ইষ্ট ও সাধ্য দেবতা। সাধনার সাহায্যে এই আত্মশক্তির বিকাশ ঘটাইতে হয়—আত্মদর্শন করিতে হয়। যাহার আত্মদর্শন ঘটে, সেই মুক্তি লাভ করে। লেখক আর্থার এভেলন তাঁহার রচিত তন্ত্র-তত্ত্ব পুস্তকে এই সকল সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছেন। বহিখানি ভাল করিয়া পাঠ না করিলে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনেক কথা হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। তন্ত্র-তত্ত্ব নূতন করিয়া আবার বাঙ্গালীকে শুনাইতে হইবে। আর্থার এভেলন মহোদয়ের অনূদিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের প্রচার বাড়িলে, বাঙ্গালী আবার শুশ্রূষু হইলে সে চেষ্টা করা যাইতে পারে।

আমাদের বাঙ্গালা দেশ সারদাতিলক, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, প্রাণতোষিণী, তন্ত্রসার প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থের দ্বারা শাসিত ছিল। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের প্রভাব পূর্ব্বে এ দেশে তেমন ছিল না। এখন ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে বাঙ্গালীর মন ও বুদ্ধি যে আকারে আকারিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, মহানির্ব্বাণতন্ত্র এখনকার উপযোগী তন্ত্র। রাজা রামমোহন রায় এইটুকু

বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মহানির্ব্বাণের আদর বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর্থার এভেলনের সম্পাদিত ইংরেজী ভাবান্তরিত মহানির্ব্বাণতন্ত্রখানি যদি বাঙ্গালার সুধীসমাজে আদর লাভ করে, তাহা হইলে ধীরে ধীরে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের পঠন-পাঠন পরে চলিতে পারে। এইটুকু আশা আমরা করিতে পারি। বাস্তবিক, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজ এখন ধর্ম্ম-কর্ম্ম-শূন্য; জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-বিচার-রহিত; এখন মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্রই দেশের ও জাতির উপযোগী মনে হয়, তেমনই একটা অঘটন ঘটিবে বলিয়াই, আর্থার এভেলনের মত বিদ্বান, পদস্থ, রাজসম্মানে সম্মানিত, ধনী ইংরেজ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন; তাঁহার তন্ত্র-তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে আমরা তখন আরও অনেক কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিব। আপাততঃ বাঙ্গালার বিদ্বজ্জনসমাজকে এই অপূর্ব্ব মহানির্ব্বাণতন্ত্রখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উহার মূল্য আট টাকা, গ্রন্থও বিশাল; কিন্তু যাহারা বিলাসে এত অপব্যয় করিতে পারে, তাহারা এমন একখানি গ্রন্থ আট টাকা খরচ করিয়া কিনিতে পারে না কি? ইচ্ছা থাকিলে অবশ্যই পারে। এতটা অনুরোধ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, আর্থার এভেলন একটিও মনগড়া কথা—খোস্‌খেয়ালের ব্যাখ্যা করেন নাই শাস্ত্র যুক্তি অনুসারে যাহা সৎসিদ্ধান্ত, উনি কেবল তাহারই অবতারণা করিয়াছেন। ইংরেজীনবীশের পক্ষে তন্ত্র বুঝিবার শুভ অবসর উপস্থিত। এই তন্ত্রেরই উপদেশ আছে যে, যাহা কিছু পরিহার করিতে চাও, তাহার পূর্ণ পরিচয় লইয়া পরিহার করিবে; যাহা কিছু নূতন অবলম্বন করিতে চাও, তাহারও পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করিয়া তবে অবলম্বন করিবে। তন্ত্র বাঙ্গালার পুরাতন ধর্ম্ম; উহাকে যদি চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন করিতে হয়, তবে উহার পরিচয় লইয়া বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। অথবা আবার যদি উহার শীতল আশ্রয়ে যাইতে হয়, তাহা হইলেও উহার পরিচয়-গ্রহণ আবশ্যক বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এক জন পদস্থ, সুধী, মনস্বী ইংরেজ সে পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, এই পরিচয়-প্রদান ব্যাপারে তিনি তিলমাত্র ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেন নাই,—কল্পনা-প্রসূত ব্যাখ্যানের ঝাঁকে শাস্ত্রসিদ্ধান্তের অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন নাই। ভাল হউক, মন্দ হউক, যাহা আছে, তাহাই তিনি পাঠকগণের বুদ্ধিগোচর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিদেশীয় ভক্তের এমন পূর্ণার্ঘ্য বাঙ্গালী কি সাদরে গ্রহণ করিবে না?

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# পরাজয়।

১

"যোগেন! বাবা! তোমাকে এ কাজটি করতেই হবে—" এই বলিয়া বৃদ্ধা যোগেন্দ্রের মস্তকে ধীরে ধীরে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বৈশাখ মাস। নবপত্রকিশলয়ে, নবীন শ্যামলতায় প্রকৃতিদেবীর নীলাঞ্চল অরুণ-অলোকে ঝলমল করিতেছে। পল্লীপথে বটের ছায়ায় বসিয়া সূর্য্যের

খরকর হইতে রাখালবালকেরা আত্মরক্ষা করিতেছে। ক্বচিৎ দুই একটা কাক বা ফিঙ্গের চীৎকারে মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। পথের ধূলা তাতিয়া আগুন হইয়াছে। তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বৃদ্ধা শঙ্করী যোগেন্দ্রের গৃহে আসিয়াছেন। সে সময়ে যোগেন্দ্র পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে বসিয়াছিল। বৃদ্ধা তাহাকে ধরিয়া বসিলেন, "তোমাকে বাবা! কমলকে তার শ্বশুরবাড়ীতে রেখে আস্‌তে হবে।"

কমল বৃদ্ধার একমাত্র কন্যা—পূর্ণযৌবনা। সে পিতৃগৃহে অবস্থান করে, ইহা কোনও ক্রমেই আর সঙ্গত বোধ হইতেছিল না; তাই বৃদ্ধা যোগেন্দ্রকে অনুনয় করিতেছিলেন।

যোগেন্দ্র বলিল, "মাসীমা, তুমি কেন তাহাকে আপনা হইতে পাঠাইয়া দিতেছ?" বৃদ্ধা যোগেন্দ্রের কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে অঞ্চলে চোখের জল মুছিলেন। তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যেমন অদৃষ্ট করে এসেছি, তেমনই ভোগ ত করতে হবে বাবা।"

শৈশবে কমলের সহিত যোগেন খেলা করিয়াছে। কতদিন খেলাঘরে তার বর সাজিয়াছে। কমলও কতদিন গৃহিণীর অভিনয় করিতে গিয়া বহুমূল্য অলঙ্কার চাহিয়া যোগেনকে বিপন্ন করিয়া অভিমান করিতে ছাড়ে নাই। সেই কমলাকে আজ তার শ্বশুরালয়ে উপযাচক হইয়া রাখিয়া আসিবার ভার পড়িল কি না যোগেনের উপর! সে অন্যমনস্ক হইয়া অনেকক্ষণ কত কি চিন্তা করিল। কমলের জননী গ্রাম-সম্পর্কে যোগেন্দ্রের মাসী হন। যোগেন্দ্র এখন বড় হইয়াছে—সংসারের ভালমন্দ অনেকটা বুঝিতে শিখিয়াছে। এরূপ ভাবে কমলকে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে দিয়া আসিবার কোনও বিশেষ কারণ সে দেখিতে পাইল না; সে এই প্রস্তাবে একটা অমর্য্যাদার ভাব অনুভব করিল। সে দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, "না মাসীমা, তা কিছুতেই হতে পারে না। আমরা আপনা হ'তে কখনই কমলকে তার শ্বশুরবাড়ী রেখে আস্‌তে যাব না।" বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "না বাবা, তুমি বুঝ না। আমি বাকী দিন কটা কাশী গিয়া বাবা বিশ্বনাথের চরণসেবা করে কাটিয়ে দেব। কমলের শাশুড়ী যখন তাঁহার বৌয়ের কোনও সংবাদই নিলেন না, আর কমল কিছু ছেলেমানুষটি নেই, তখন তাকে না পাঠাইয়া কি করি, বল? যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "মাসীমা, না হয় তুমি আর

দিন কতক থাকিয়া যাও না। কমলকে দু' মাস ছ' মাস, পরে ত তাঁহারা আপনারাই লইয়া যাইবেন।"

বৃদ্ধা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সে আশা বৃথা; আজ সাত বৎসর বিবাহ হয়েছে, এর মধ্যে সেই বিবাহের পর যা দুইবার অভাগীর ভাগ্যে শ্বশুর-ঘর ঘটিয়াছে।"

"তারা কমলকে নিয়ে যেতে চায় না কেন?"

"তাঁরা বলেন, জামাই যখন বাড়ী এসে থাক্‌বে, তখন বউ লইয়া যাইবেন।"

"জামাই কি বাড়ী আসে না?"

"কি জানি বাবা? অনেকবার চিঠি দিয়েছি, কিন্তু একখানিরও উত্তর পাই নাই। এক বৎসর পূর্ব্বে একবার লিখেছিল, এবার বাড়ী যাইবার সময় আমাদের এখান হইতে কমলকে লইয়া যাইবে। তার পর আর কোনও সংবাদ পাঠায় নাই।"

২

বুধবার প্রাতঃকালেই নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকাখানি "দুচালা"। ভিতরে রহিলেন কমল, তাহার জননী শঙ্করী ও আর এক জন প্রতিবেশিনী। ইনি বৃদ্ধার সহিত কাশীবাস করিতে যাইতেছেন। তাহাদের গ্রাম হইতে কমলের শ্বশুরালয় প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূর—সমস্ত পথ নৌকায় যাইতে হয়। নৌকা নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। যোগেন্দ্র নৌকার ছাদের উপর বসিয়া উষার কনকরশ্মি-উদ্ভাসিত নদীতীরবর্ত্তী শ্যামল বনরাজির শোভা দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছে। কখনও বা তাহার মনে হইতেছে, কমলকে তাহার শ্বশুরগৃহে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কখনও বা ভাবিতেছে, যদি তাঁহারা কমলকে প্রত্যাখান করেন? কমল কি তাহার বিধবা দরিদ্রা জননীর অপমান সহ্য করিয়া সেখানে থাকিতে চাহিবে? আবার মনে হইতেছিল, নিজের অধিকারে কেন সে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে? যাঁহারা একদিন তাহাকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছেন, তাঁহার আজ কোন্ অপরাধে তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিবেন?

মধ্যাহ্নে গঞ্জের ঘাটে গিয়া নৌকা লাগিল। ঘাটের উপর দুইটি মন্দির। দূরে সারি সারি ছোট বড় দোকান। এইখানে আহারাদির ব্যবস্থা হইল। অপরাহ্নে মাঝিরা আবার নৌকা খুলিয়া দিল। তখন

মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছে। নদীবক্ষে অস্তমিত সূর্য্যের ক্ষীণরশ্মি ঝিকমিক করিতেছে। মাঝিরা মনের সুখে সারি-গান গায়িতেছে। যোগেন্দ্র বাহিরে আসিয়া নৌকার ছাদের উপর উপবেশন করিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বাতাস থামিয়া গেল। তখন অন্ধকার জমাট বাঁধিতেছিল। আকাশের পশ্চিম-প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র কৃষ্ণমেঘ জনিতেছিল—ক্রমে সেখানি ধীরে ধীরে বিদ্রোহীর দলের মত বাড়িয়া উঠিল। অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল। যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মাঝি, এখান হইতে কাঞ্চনপুর কত দূর ?" কাঞ্চন-পুরে কমলের শ্বশুর-বাড়ী। মাঝি উত্তর করিল, "এখনও বিশ কোশ—মোটে দশ কোশ আসিয়াছি।"

নিমেষের মধ্যে প্রবল ঝড় উঠিল। বাতাস সোঁ সোঁ শব্দে দিগন্ত প্রকম্পিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরব্ধ হইল। ক্রমে ঝড় আরও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই ঝড়ে নৌকা তীরবেগে কোথায় ছুটিয়া চলিল। শঙ্করী মর্ম্মভেদিস্বরে বলিয়া উঠিলেন, ঠাকুর! আর যন্ত্রণা দিও না। আজ নদীর গর্ভে টানিয়া লও, সকল অপমান, সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দাও। কমলকে বুকে করিয়া মরিতে পারিলে আজ আমার সুখের সীমা থাকিবে না।" তার পর মনে হইল, "না তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। পরের বাছা যোগেন এই নৌকায় রহিয়াছে—সে কেন মরিবে ? আমার এমন সুখের প্রয়োজন নাই। নারায়ণ! রক্ষা কর।"

নৌকা সহসা একটি দম্‌কা বাতাসে জলের দিকে খুব হেলিয়া পড়িল। নৌকার উপর জল উঠিল।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে নৌকা তীরের সন্নিহিত হইল। এক জন দাঁড়ী নৌকার দড়ী লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি গাছের গোড়ায় নৌকা বাঁধিল। দড়ি কড়কড় করিয়া উঠিল—নৌকা তীরে ভিড়িল। কমলকে লইয়া শঙ্করী কিনারায় উঠিয়া একটি বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যোগেন্দ্র ধীরে ধীরে আসিয়া সেখানে উপবেশন করিল। দিগন্তপ্রসারিত মাঠ—নিবিড় অন্ধকার—প্রবল বাতাস—অজস্র বৃষ্টিপাত। এই দুর্য্যোগে চারিটি প্রাণী নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে কথা নাই। —কেহ কাহাকেও ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছে না। বিদ্যুৎস্ফুরণ কেবল অন্ধকার বাড়াইয়া দিতেছিল। কমল বলিল, "মা!"

"কেন মা ? এই যে আমি—ভয় করছে ?"

"না।"

"তবে কি?"

"তোরঙ্গটা নৌকায় রয়েছে।"

শঙ্করীর মনে হইল, খানকতক কাপড়, গোটাকতক পুতুল ভিন্ন এমন কিছু মূল্যবান দ্রব্য ত তাহাতে নাই! কমল গায়ে-হলুদের দিন শ্বশুরালয় হইতে কতগুলি পুতুল পাইয়াছিল—তার পর একবার জামাতা সখ করিয়া কলিকাতা হইতে একখানি কাপড় ডাকে পাঠাইয়াছিলেন। সেইগুলি তোরঙ্গের ভিতর আছে। কাপড়খানি কমল বড় যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল। সেখানি সে পরিত না। অনেক টাকার জিনিস না থাকিলেও তোরঙ্গের জন্য মন চঞ্চল হইয়াছিল। কমলের কথা শুনিয়া যোগেন্দ্র তোরঙ্গটি আনিয়া সেখানে রাখিল। কমল সানন্দে বলিয়া উঠিল, "তুমি নিয়ে এলে যোগেন দাদা?"

ঝড় বৃষ্টি থামিল। নৌকা আবার চলিল। পরদিন বেলা পাঁচটার সময় সকলে কাঞ্চনপুরে পঁহুছিলেন। কমলের শাশুড়ী আসিয়া কমলকে সাদরে গৃহে লইলেন। কমলের জননী সেখানে যান নাই। কমল আপনার ঘরে স্থান পাইয়া যতটা আনন্দিত হইল, জননীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তাহার অধিক দুঃখিত হইল। যোগেন্দ্র সে দিন সেখানে রহিল। পরদিন প্রভাতে কমল আসিয়া যোগেন্দ্রের সহিত দেখা করিল। যোগেন্দ্র বলিল, "কমল! আমি কলিকাতায় গিয়া তোমার স্বামীকে পাঠাইয়া দিব।" কমলের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে যেন সঙ্কোচে মরিয়া গেল। বিদায়ের সময় কমল ধীরে ধীরে বলিল, "যোগেন দাদা, এঁদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়; সে সময় কি আস্‌বে?" যোগেন বলিল, "আস্‌ব।"

৩

শঙ্করী কাশীবাস করিতেছেন। তিনি কাশীবাসে কমলের ভাবনা ভুলিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা বিশ্বেশ্বরই বলিতে পারেন। যোগেন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে পূর্ব্বের ন্যায় পড়াশুনায় মন দিতে পারিতেছে না। কেবলই তাহার মনে হইতেছিল—কেন আমি কমলের স্বামীকে পাঠাইয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম? এরূপ বলিবার আমার কি অধিকার আছে? আমি কমলের স্বামী শশাঙ্কবাবুর নামমাত্র

শুনিয়াছি, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই, তবে কোন সাহসে এমন আশ্বাস দিলাম? কমলকে দেখিলে বড় দুঃখ হয়। আমি যেমন করিয়া পারি, শশাঙ্ক বাবুর অনুসন্ধান করিব।

অনেক চেষ্টা করিয়াও সে কমলের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিল না। ত্যাগ করিবার জন্য যতই সে চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই তাহার মন বেশী করিয়া সেই দিকে ঝুঁকিল। এইরূপ অবস্থায় দুই মাস কাটিয়া গেল। যোগেন্দ্র কোনও কারণে বর্ত্তমান বাসা ত্যাগ করিয়া আর একটি নূতন মেসে গিয়া উঠিল। সে সময় আষাঢ় মাস। প্রায় বৃষ্টি হইতেছে। শনিবার অনেকেই বাড়ী গিয়াছেন। দুই তিন জন লোক বাসায় আছেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে হরিহর বাবু ডাকিলেন, "ও শশাঙ্ক বাবু! বেলা পড়ে এল, কখন থিয়েটারে যাবেন?"

"বড় বাদলা, কেমন করে যাই বল? ভাল কথা, তুমি যে নীহারিকা কেমন প্লে করে দেখতে যাবে বলেছিলে, চল না?"

"বাবা! যে বৃষ্টি!"

"না না, আজ চল। নীহারিকার প্লে দেখ্‌লে—আর ফিরে আস্‌তে ইচ্ছা হবে না।"

"তবে কাজ নেই ভাই, শেষ কি তোমার মত থিয়েটারে থেকে যাব, আর তার নাম ইষ্টমন্ত্র হ'য়ে পড়বে।"

শশাঙ্ক থিয়েটারী সুর করিয়া বলিল, "দুর্গের ভিতরে অবস্থান করে' অনেকেই যুদ্ধকৌশল ও বীরত্ব দেখিয়ে থাকে, কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করে, ফিরে আসাকেই বীরত্ব বলে।"

শশাঙ্কের নাম শুনিয়া যোগেন্দ্র মন্ত্রাক্রান্তের ন্যায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধীরে ধীরে বলিল, "আপনারা কি থিয়েটারে যাবেন, বাসায় তা হ'লে আমি একাই থাক্‌ব?" শশাঙ্ক খুব আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল, "না, না, আপনি একা থাক্‌বেন কেন? আপনিও চলুন না।"

শশাঙ্কের মুখে অভিনেত্রীর প্রশংসাবাদ শুনিয়া যোগেন্দ্র স্তম্ভিত হইল। বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে সে শশাঙ্কবাবুকে দেখিতে লাগিল; তাঁহার মুখে বিন্দুমাত্র লজ্জার চিহ্নও দেখিতে পাইল না। অম্লানবদনে শশাঙ্ক পুনরায় বলিল, "টিকিট কিন্‌তে হবে না, আমি আপনাকে পাস দিব—কি বলেন?"

"আজ আমার শরীর তত ভাল নাই।"

শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি বেশভূষা শেষ করিল। জুতা পরিতে পরিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এ বাসায় কতদিন এসেছেন ?"

"দশ বারো দিন—আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সময় পাই না—আপনাকে প্রায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না "

"সে কথা সত্য, অনেক কাজ, বাসায় ফিরতে রাত্রি হয়ে যায়।"

"আপনি শনিবারে বাড়ী যান, বোধ হয় ?"

"না—আমাদের বাড়ী অনেক দূর—শনিবারে যাওয়া চলে না।"

"কোন্ গ্রাম ?"

"কাঞ্চনপুর।"

কাঞ্চনপুর শুনিয়া যোগেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কাঞ্চনপুর চেনেন ?"

"একবার গিয়াছিলাম।"

"বটে, তবে ত আপনি আমাদের দেশ দেখেছেন।" শশাঙ্ক একাকী থিয়েটারে চলিয়া গেল।

৪

যোগেন্দ্র নিজের ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ এই হতভাগ্যের কথা চিন্তা করিল। কমল পত্র লিখিয়া যে কেন উত্তর পায় না, তাহাও সে বুঝিতে পারিল।

ইহার কিছুদিন পরে, অনেক চেষ্টার পর একদিন সুযোগ পাইয়া সে শশাঙ্কের নিকট৷ কমলের কথা উত্থাপন করিল। কিন্তু প্রবল বন্যার মুখে ক্ষুদ্র বাঁধের মত, তাহার কথা কোথায় ভাসিয়া গেল। শশাঙ্ক মুহুর্মুহু হাসিল; তাচ্ছীল্য করিয়া বলিল, "কই, আপনি থিয়েটারে যাবেন বল্লেন, গেলেন না ?"

যোগেন্দ্র কোনও উত্তর না দিয়া নিজের ঘরে গিয়া বই খুলিয়া বসিল। কমলের কথা ভাবিয়া দুঃখে তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল—সে দোয়াত কলম লইয়া পত্র লিখিতে বসিল। আধ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া লিখিল—"কমল! কথা রাখিতে পারিলাম না। ক্ষমা করিও। তোমার স্বামীর সন্ধান করিয়াছি।"

যোগেন্দ্র এই অসমাপ্ত পত্রখানি ডাকে পাঠাইয়া দিল। তাহার পর ভাবিল, এরূপ পত্র লেখা ভাল হইল কি ? শশাঙ্কের প্রতি তাহার

অত্যন্ত ঘৃণা হইল। সেই দিন হইতে সে শশাঙ্কের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিল।

৫

তাহার পর অনেক দিন অতীত হইয়াছে। একদিন প্রভাতে যোগেন্দ্র একটি সংকীর্ণ গলির ভিতর দিয়া ছেলে পড়াইতে যাইতেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি প্রতিদিনের অভ্যাসমত চাকরের কোলে চড়িয়া, খাবারের দোকানের দিকে লইয়া যাইবার জন্য ঠেলিতেছে। দুই একটা বড় বাড়ীর দ্বারে কাকাতুয়া চীৎকার করিতে করিতে দাঁড়ে দুলিতেছে। দরোয়ানগুলা দুলিতে দুলিতে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়িতেছে। উড়ে বামুনগুলা গামছা স্কন্ধে ফেলিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে মেসের দিকে ছুটিয়াছে। যোগেন্দ্র দেখিল, একটি বড় বাড়ীর দ্বারদেশে অনেক গুলি ফুটফুটে বালকবালিকা সমবেত হইয়াছে। কেহ করতালি দিতেছে, কেহ হাসিতেছে,—সেখানে যেন আনন্দের স্রোত বহিতেছে। সে দেখিল, দুই পার্শ্বে দুইটি ঘটের উপর পূর্ণশীর্ষ সিন্দূর-চর্চ্চিত নারিকেল ও দুই ধারে দুইটি কদলীবৃক্ষ সংস্থাপিত। বালকেরা ঠাকুরের নাম লইয়া তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে। কেহ বলিতেছে, কাল ঠাকুর আস্‌বে। কেহ আপত্তি করিয়া বলিতেছে, না, পরশু আসিবে। আগামী পরশ্ব যে জগদ্ধাত্রীপূজা তাহা যোগেনের মনে ছিল না। তাহার বৈশাখ মাসের কথা মনে পড়িল—তখনই যোগেন্দ্র বাসায় ফিরিল। সে যথাসময়ে কাঞ্চনপুরে যাত্রা করিল।

খুব সকালে নৌকা আসিয়া কাঞ্চনপুরের ঘাটে পঁহুছিল। সেদিন জগদ্ধাত্রীপূজা। তখন উষা। নদীর জল ছল্ ছল্ করিয়া গ্রামের তটে প্রতিহত হইতেছে। প্রভাতে পল্লীগ্রামখানি যেন লজ্জানম্র নব-বধূর মত অবগুণ্ঠন দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যোগেন্দ্রের মনে পড়িল সেই দিনের কথা—কি ভয়ানক উদ্বেগ ও আকুলতা লইয়া কাঞ্চনপুরে কমলকে রাখিতে আসিয়াছিল। আজ সে ব্যাকুলতা নাই; কিন্তু আজ অন্য চিন্তায় তাহার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে।

যোগেন্দ্র মাঝির পাওনা চুকাইয়া দিয়া হর্ষ-বিষাদ-জড়িত হৃদয়ে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল।

যোগেন্দ্র প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দেবীকে প্রণাম করিল। কমলের

সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে, কমল তাহাকে বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "দেরী দেখিয়া মনে হইল, বুঝি ভুলিয়া গিয়াছ।"

৬

এই সময়ে একটি অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন থিয়েটারের ফেরত শশাঙ্ক নীহারিকার বাড়ীতে গিয়া অত্যন্ত সুরা পান করিল। পরদিন নীহারিকার নেকলেসটি খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। নীহারিকা অম্লান-বদনে শশাঙ্ককে বলিল—"কি দেখ্‌ছ? মরণ আর কি? ভাল চাও ত হার ফেরত দাও।"

"আমি কি তোমার হার নিয়েছি, এ কথা তুমি মনে ভাবতে পার?"

"তুমি নিতে পার, আর আমি ভাব্‌তে পারি না? ভাব্‌লেই বুঝি যত দোষ?

"তবে আমি চোর?"

নীহারিকা বলিল "আমি ত আর চোর বলিনি, তুমি নিজেই গায়ে পড়ে সে কথা বল্‌ছ। হার নিয়েছ, ফিরিয়ে দাও।"

"বেশ, আমায় দুদিন সময় দাও—আমি তোমার নেকলেস দিয়ে যাব।" শশাঙ্ক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া নীহারিকার গৃহ ত্যাগ করিল। দুঃখে, ক্ষোভে, ক্রোধে তখন তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছিল।

জগদ্ধাত্রীপূজার ছুটীতে প্রায় সকলেই বাড়ী গিয়াছেন। বাসায় কেহই ছিল না। শশাঙ্ক আসিয়া শয্যা পাতিয়া শুইয়া পড়িল। আজিকার ঘটনা তাহার হৃদয়ে নির্দ্দয় ভাবে আঘাত করিল। মরুভূমে মরীচিকার অনুসরণ করিয়া অবসন্নদেহে সে যেন তপ্ত বালুকায় বসিয়া পড়িল। সে "যোগেন্দ্রবাবু!" বলিয়া দুইবার চীৎকার করিয়া ডাকিল। কোনও উত্তর পাইল না। উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া দেখিল, যোগেন্দ্রের গৃহদ্বার রুদ্ধ। আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শয্যার উপর বসিয়া পড়িল। চিন্তা আর তাহার ভাল লাগিল না। অন্যমনস্ক হইয়া হইয়া বাক্স খুলিয়া কমলের লেখা পত্রগুলি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। এখন বুঝিতে পারিল, সেগুলির ভিতর কি সরলতা —কি দীনতা—কি প্রাণস্পর্শী নিবেদন। এই সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া হাঁকিল—"বাবু! চিঠি নিয়ে যান।" শশাঙ্কের প্রাণ অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল। আজ কি কমলের চিঠির প্রত্যাশা করা করা যায় না? অনমনস্কভাবে সে

হইল। চিঠির উপর যোগেনবাবুর নাম। শিরোনামে ঠিক কমলের হাতের অক্ষর ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে যোগেনবাবুর স্ত্রী কমলের মত লেখেন! স্ত্রী হইলেই বুঝি কমলের মত হইতে হয়। কমল যেমন মিনতি করিয়া পত্র লেখে, ইনিও বোধ হয় তেমনই করিয়া লিখিয়াছেন। একটু সহানুভূতির জন্য—একটি করুণ আহ্বানের নিমিত্ত তখন তাহার মন ব্যাকুল হইয়াছে। একবার চিঠিখানি খুলিয়া দেখি, তারপর যেমন পত্র তেমনই করিয়া রাখিব। না, না, পরের চিঠি কোনও মতেই খোলা উচিত নয়; কিন্তু আমি ত ডুবিতে বসিয়াছি—আমার আর উচিত অনুচিত কি? আমি পায়ে ধরিয়া যোগেন্দ্র বাবুর নিকট এই নীচ প্রবৃত্তির নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিব। এ চিঠি না পড়িলে আমি মরিয়া যাইব।

পত্র পড়িয়া শশাঙ্ক স্তম্ভিত হইয়া গেল। পত্রে লেখা ছিল—

"তোমার পত্র অনেক দিন পাইয়াছি। আমাকে পত্র দিবার প্রয়োজন ছিল না। স্বামী দেবতা—তিনি যেদিন ভাল বুঝিবেন, সেই দিন আসিবেন। আমার জন্য তুমি কষ্ট করিও না।—কমলা। কাঞ্চনপুর।"

পত্রখানি বুকে করিয়া শশাঙ্ক শয্যায় শুইয়া পড়িল। বিশ্বসংসারের সকল সৌন্দর্য্যে, সকল মধুরতায়, সকল কমনীয়তায় বিভূষিতা হইয়া, পদদলিতা, অপমানিতা, উপেক্ষিতা কমল তাহার নয়নপটে ফুটিয়া উঠিল। এত রূপ, এত মধুরতা, এমন বিনয়নম্রমূর্ত্তি শশাঙ্ক আর কখনও দেখে নাই। একবার, দুইবার করিয়া সে বহুবার কমলের পত্রখানি পড়িল, নানারূপ চিন্তায় সে কেমন হইয়া গেল। কমল যোগেন্দ্রকে লিখিয়াছে, "স্বামী দেবতা, যখন ইচ্ছা হইবে আসিবেন।" আর আমি অসম্পূর্ণ জীবন লইয়া মাতার স্নেহে—স্ত্রীর প্রণয়ে বঞ্চিত! শশাঙ্ক ধীরে ধীরে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। একদৃষ্টে আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। সে ভাবিল, কমলের নিকট গিয়া শাস্তি না লইলে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। সেই রাত্রেই সে কাঞ্চনপুর রওনা হইল।

৭

শশাঙ্ক পথে যাইতে যাইতে কত কি ভাবিতে লাগিল। কতদিন পরে সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে—কত অখ্যাতি, কত দুর্নাম মস্তকে লইয়া সেই নির্জ্জন পল্লীপথে চিরপরিচিত গৃহে অপরিচিতের মত সে আবার

তখন গোধূলির সন্ধ্যা মেঘহীন আকাশের প্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে ধরায় অবতীর্ণ হইতেছিল। গ্রামের বালকবালিকাগণ পূজাবাড়ীর দিকে চলিয়াছে। ধূপধুনার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। কমল আরতির নৈবেদ্য সাজাইতেছে। শশাঙ্ক চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিল। সমবেত প্রতিবেশিমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে তাহাকে চিনিতে পারিল; কিন্তু কেহ কিছু বলিল না। আরতির বাজনা যেমন বাজিতেছিল, তেমনই বাজিতে লাগিল।

আরতি শেষ হইল। বাজনা থামিল। একে একে সকলে ভক্তিভরে দেবীকে প্রণাম করিল। শশাঙ্কের মা দেবীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার হারানিধি ঘরে ফিরিয়াছে। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি আসিয়া পুত্রের হাত ধরিলেন, তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। শশাঙ্ক জননীর পদধূলি গ্রহণ করিল। উপেক্ষিতা কমল তাহাকে প্রণাম করিল। শশাঙ্ক লজ্জায় কমলের দিকে চাহিতে পারিল না।

দালানের অপর প্রান্তে স্তম্ভের ঈষৎ অন্তরালে দাঁড়াইয়া যোগেন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই মিলন-উৎসব দেখিতেছিল। সে এতদিন যাহাদের জন্য দেবতার প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছে, আজ সেই কমল তাহার স্বামীর সহিত মিলিত হইতেছে দেখিয়া যোগেন্দ্রের মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত সকল অসম্ভব নিমেষের মধ্যে সম্ভব হইল; কিন্তু এত আনন্দেও যেন কি অভাব তাহাকে অভিভূত করিল। আজ যখন দেখিল, আর তাহার সহানুভূতির প্রয়োজন নাই, তখন ধীরে ধীরে একটা গভীর বিষাদের ছায়া তাহার অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। যোগেন্দ্র নিঃশব্দে দালান হইতে নামিয়া আসিল, এবং ধীরে ধীরে রজনীর অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

## ভ্রম-সংশোধন।

গত আষাঢ় মাসের "সাহিত্যে" ২২৩ পৃষ্ঠায় "দ্বিজু" নামক কবিতার চতুর্থ পংক্তির পর

আশৈশব মাতৃভক্ত, কিশোর বয়সে

এই পংক্তিটি ভ্রমক্রমে মুদ্রিত হয় নাই। ২৬ পংক্তির পর

শৈশবের সুদর্শন ভ্রাতা দ্বিজ বর,
যৌবনে বান্ধব রূপে চিত্ত আলো কর;

এই দুই পংক্তি ছাপা হয় নাই। পাঠকবর্গ এই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।— সাহিত্য-সম্পাদক।

# দ্বিজেন্দ্রলাল। *

সভ্য মহোদয়গণ,—কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যে দেশকে উদ্দেশ করিয়া "আমার দেশ" গান রচনা করিয়াছিলেন, যে ভূমিকে লক্ষ্য করিয়া "আমার জন্মভূমি" গান করিয়াছিলেন, যে ভাষার উপাসনা-কল্পে "আমার ভাষা" এই গীতের প্রচার করিয়াছিলেন,—সেই দেশ আমাদেরই দেশ, সেই ভূমি আমাদেরই জন্মভূমি, সেই ভাষা আমাদেরই ভাব-জননী মাতৃভাষা। আমা-হেন অকিঞ্চনকে সেই কবির স্মৃতিরক্ষার সভায় সভাপতির আসন দান করিয়া, আপনারা আমার বার্দ্ধক্যের আকিঞ্চন পূর্ণ করিয়াছেন।

দাওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়, এককালে বাঙ্গালার ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নমস্য ছিলেন। দীনবন্ধুর বন্ধু, বিদ্যাসাগরের সহচর, আমাদের সকলের অশেষশ্রদ্ধাভাজন দাওয়ানজী স্বীয় চরিত্রবলে ও মনীষা-প্রভাবে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের নব্যশিক্ষিত সমাজের এক জন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তিনি পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের আত্মীয় ও কুটুম্ব ছিলেন; রামতনু বাবু দাওয়ানজীর উৎসাহ ও সু-পরামর্শের উপর অনেকটা নির্ভর করিতেন। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, মহারাজ সতীশচন্দ্র ও মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র,—নবদ্বীপের এই তিন মহারাজের অধীনে কার্য্য করিয়া দাওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র যে অসামান্য সামঞ্জস্য-বুদ্ধির, তেজস্বিতার ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সেই সময়ের বাঙ্গালীমাত্রই জানিতেন। এই দাওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র কবি দ্বিজেন্দ্রলালের জনক। দ্বিজেন্দ্রলাল সাত ভাইয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ; ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রের পরে দাওয়ানজীর এক কন্যা হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্রলাল আমার অতি পরিচিত ও মিত্র ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রের তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলাল বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত। ইঁহাদের জননী শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য্যের বংশের কন্যা ছিলেন—সতী, সাধ্বী, লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন। কাজেই বলিতে হয়, মাতৃ ও পিতৃ উভয় ধারার প্রভাবেই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিভাশালী হইয়াছিলেন। একটা ঘটনার কথা আজ মনে পড়িয়া গেল। যে দিন দাওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সেই দিন কৃষ্ণনগরের সে সময়কার প্রসিদ্ধ ডাক্তার কালী লাহিড়ী মহাশয়

---

* গত ৯ই শ্রাবণ কলিকাতার টাউন-হলে দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি-সভায় সভাপতি শ্রীযুত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় কর্তৃক পঠিত।

জিজ্ঞাসা করেন,—"দাওয়ানজী, আপনার কিছু মনের কথা বলিবার আছে ? কোনও অপূর্ণ সাধ, অপূর্ণ বাসনা ব্যক্ত করিবার আছে কি ?" মৃত্যুশীর্ণ মুখে একটু তৃপ্তির হাসি ফুটাইয়া দাওয়ানজী উত্তর করিলেন, "আমার মনে কোনও ক্ষোভ নাই। আমার সাত পুত্রই জীবিত; সর্ব্বকনিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্র বিলাতে গিয়াছে, সেখানে ভাল লেখাপড়া করিতেছে। একমাত্র কন্যা সৎপাত্রে পড়িয়াছে। আমার সকল সাধ মিটিয়াছে। এখন যাঁহার আহ্বানে লোকান্তরে যাইতেছি. তাঁহার দরবারে গিয়া হাজির হইতে পারিলেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়।" এমন জনকের আত্মজ বলিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল আজ বাঙ্গালার কবিকুলশিরোমণি; ভাবসম্পদে তিনি বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষাকেও উন্নত করিয়াছেন।

১২৭০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ, কৃষ্ণনগরে, দাওয়ানবাটীতে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগরের Anglo-Vernacular School হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রশংসার সহিত এফ. এ. ও বি. এ. পাশ করিয়া,১৮৮৪খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং গবর্মেণ্টের কৃষিবৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি পাইয়া তিনি বিলাতে যান, এবং সিসেষ্টার (Cirencester) কলেজে কৃষিবিদ্যা অর্জ্জন করেন। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি বিলাতী বা ইউরোপীয় সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনা করেন; অভ্যাসগুণে পরে তিনি এক জন সুগায়ক হইয়াছিলেন। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, দ্বিজেন্দ্রলাল এক জন সিদ্ধ কবি ছিলেন। বিলাতে বসিয়া, ইংরেজী ভাষায় তিনি একখানি কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। উহার নাম Lyrics of Ind। ইংলণ্ডের মনস্বী কবি ও লেখক স্যর এডুইন আর্ণল্ড মহোদয়ের নামে এই কবিতা-পুস্তক উৎসর্গ করা হইয়াছিল। স্যর এডুইন দ্বিজেন্দ্রলালকে স্নেহ করিতেন, তাঁহার কাব্যশক্তির প্রশংসা করিতেন। বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যা ও সঙ্গীত-বিদ্যা শিখিয়া, চরিত্র ও মনীষার উন্মেষ ঘটাইয়া যখন দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন স্যর চার্লস্ এলিয়ট বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে দ্বিজেন্দ্রলাল ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টরের চাকরী প্রাপ্ত হন। প্রথমে তিনি সেট্‌লমেণ্ট-বিভাগে কর্ম্ম করেন; পরে আবকারী বিভাগে উন্নীত হন; শেষ অবস্থায় হাকিম হইয়া ফৌজদারী বিচার করেন। অথচ যে বিদ্যা অর্জ্জন করিবার জন্য গবর্মেণ্ট নিজ

চাকরী-জীবনে করিতে হয় নাই। শুনিয়াছি, তিনি নিজে সখ করিয়া ইংরেজী ভাষায় দুইখানি বহি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই ভারতীয় কৃষিতত্ত্বের একটু পরিচয় পাওয়া যায়। বিহার ও উড়িষ্যা যখন স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয়, তখন দ্বিজেন্দ্রলালকে, মুঙ্গেরে বদলী করিয়া দেওয়া হয়। বাঁকুড়া হইতে কলিকাতায় আসিবার পরই তাঁহাতে সন্ন্যাস রোগের লক্ষণ প্রকট হয়; দ্বিজেন্দ্রলাল এক বৎসরের ছুটী লইতে বাধ্য হন। সে ছুটী ফুরাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার শরীর আরও অসুস্থ হয়, চিকিৎসকের পরামর্শমত তিনি পেন্সনের জন্য দরখাস্ত করেন। সে প্রার্থনা গবর্মেণ্ট মঞ্জুর করেন। কিন্তু নিয়তির এমনই বিধান, পেন্সনের টাকা হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে মহাপ্রস্থান করিতে হইয়াছে।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীকে দ্বিজেন্দ্রলাল বিবাহ করেন। আজ দশ বৎসর হইল, একটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া সুরবালা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনের শেষ দশ বৎসর বিপত্নীক অবস্থায় অতিবাহন করিয়াছিলেন; শিশু-পুত্র-কন্যাদের প্রতিপালনভার স্কন্ধে লইয়া তিনি পত্নী-শোক ভুলিয়াছিলেন। এতদিনে সে জ্বালা জুড়াইয়াছে, দেবতার চরণছায়ায় আবার দম্পতীর মিলন ঘটিয়াছে। ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন-কাহিনী। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন আধুনিক উচ্চশিক্ষার মধুময় ফলস্বরূপ। তিনি মেধাবী মনস্বী ছিলেন, সচ্চরিত্র সজ্জন ছিলেন, তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। তিনি চাকরী করিতেন বটে, পরন্তু কখনও মোসাহেবী করিতে পারেন নাই। আমি যতটুকু জানি, তাহাতে ইহা স্পষ্ট বলিতে পারি যে, দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজী সাহিত্য —সভ্যতা— মনুষ্যত্ব, এই তিনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান ছিলেন্। তাঁহার রচিত গদ্যে, পদ্যে, সন্দর্ভে, নাটকে এই শ্রদ্ধার ভাব নানা রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই দ্বিজেন্দ্রলালকে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি বাঙ্গালী জাতিকে ও বঙ্গভূমিকে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, বহুজন্ম সাধনা না করিলে তেমন দান কেহ করিতে পারে না। মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু, ভূদেব, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র,—ইঁহাদের পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল। ইঁহাদের ভাব-পরম্পরার পরিসমাপ্তি যেন দ্বিজেন্দ্রলালেই ঘটিয়াছে। মাইকেলের "শ্যামা, জন্মদে" উক্তির নানা ভাবে ক্রমবিকাশ হইয়াছে।

দেশ” ও “আমার জন্মভূমি”, এই দুই গানে উহার পর্য্যবসান ঘটে। দেশাত্মবোধের এমন গাল-পোরা ও বুকভরা গান পূর্ব্বে কখনও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয় নাই। শিশু যেমন জোর করিয়া, আব্দার করিয়া, মায়ের গলা জড়াইয়া ‘আমার মা’ বলিয়া নিজের দখল বজায় রাখে, দ্বিজেন্দ্রলালও তেমনই শিশুজনোচিত নির্ম্মল, নিরাবিল, সরল ও সহজ ভাষায়,—যেন তাহাতে প্রাণমন সব ঢালিয়া, “আমার দেশ” ও “আমার জন্মভূমি” গান করিয়া গিয়াছেন। মমত্বের এমন অপূর্ব্ব বিকাশ রামপ্রসাদ, দাওয়ান মহাশয় প্রভৃতি মাতৃভক্ত সাধকগণের ভক্তি-সাধনায় হইয়াছে বটে, পরন্তু দেশমাতৃকার পূজায় বাঙ্গালা দেশে এমন আর কখনও হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম, দ্বিজেন্দ্রলালের দানের তুলনা হয় না।

আমি দ্বিজেন্দ্রলালকে ভাল করিয়াই চিনিতাম ও জানিতাম। পূর্ব্বে প্রায়ই কৃষ্ণনগরে যাইয়া দীর্ঘ-অবকাশ যাপন করিতাম। সেই সময়ে বন্ধুবর রাজেন্দ্রলালের মুখে অনেক খবর শুনিতাম ও জানিতাম। দ্বিজেন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, যখন হাসির গানের গায়ক-রূপে সমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখে অনেকবার অনেক গান শুনিয়াছি। তিনি সুগায়ক ছিলেন বলিলে অধিক কিছু বলা হইল না। দ্বিজেন্দ্র তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটা ভাব ফুটাইতে পারিতেন, তাঁহার সুরের যেন একটা স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। সেকালের বড় বড় কীর্ত্তনীয়া যেমন কীর্ত্তনের সুরে রসোদ্‌গার করিতে পারিতেন, একটা ভাবের অবতারণা ঘটাইতেন, দ্বিজেন্দ্রলালও তেমনই কণ্ঠস্বরের প্রভাবে গীতটিকে সজীব করিয়া তুলিতে পারিতেন। দ্বিজেন্দ্রের পিতা দাওয়ানজী এক জন প্রসিদ্ধ ও দেশমান্য কলাবৎ ছিলেন। বংশানুক্রম-অনুসারে দ্বিজেন্দ্রলাল জনকের সঙ্গীতপাণ্ডিত্যটুকু লাভ করিতে না পারিলেও কণ্ঠস্বরের সজীবতা-সম্পাদন করিতে পারিতেন। ইহার উপর তিনি স্বয়ং সুকবি ছিলেন, রচনাচাতুর্য্যে সুপটু ছিলেন। তিনি কবিতা লিখিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করিতেন না; সুরের মহাপ্রাণ নির্দ্দেশ করিয়া তদনুসারে এক একটি গীত রচনা করিতেন। যে ভাবের অভিব্যঞ্জনার জন্য তিনি মনোমত বাঙ্গালা সুর পাইতেন না, তাহার বিকাশ হেতু ইংরেজী সুর আমদানী করিতেন। এমন ভাবে আমদানী করিতেন যে, সে বিলাতী সুর আমাদের কানে বাজিত না। এই “আমার দেশ” গানের সুর খাঁটী বিলাতী, কিন্তু উহাকে এমন বাঙ্গালী ভাব মাখাইয়া ফুটান হইয়াছে যে, এখন হাটে-মাঠে-বাটে উহা গীত হইতেছে—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সবাই ঐ গান করিতেছে। ইহাই দ্বিজে-



শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, সি. আই. ই.

Bijoya Press, Calcutta.

ন্দ্রের বিশিষ্টতা; এই বিশিষ্টতা লইয়া তিনি হাসির গান রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সকল হাসির গানের অন্তর্নিহিত শ্লেষ-বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ-রঙ্গটুকু গানের সুরের মুখে আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠে। উদ্ভট ভাষা যেন উদ্ভট সুরের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া গিয়াছে। কাজেই তাঁহার হাসির গান গায়িলেই শ্রোতার মনে আপনা-আপনি হাসি যেন জাগিয়া উঠে, হাসাইবার জন্য অন্য কোনও চেষ্টা করিতে হয় না। তাঁহার রচিত হাসির গান শুনিয়া হাসিতে হয় বটে, আমরা অনেকেই অনেকবার সে গান শুনিয়া হো-হো হাসিয়াছিও বটে, পরন্তু সেগুলি কি সত্যই হাসির গান? সে যে জাতির চরিত্রের মুকুর! শিথিল-শ্লথ সমাজের প্রতিচ্ছবি! যখন হাসিয়াছি, তখন আমরা কেহ ভাবি নাই, এ মুকুরে আমাদের প্রত্যেকের মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। যখন সে ভাবনা আসিয়াছে, তখন গোপনে চোখের জলে অনেকের বুক ভাসিয়া গিয়াছে—তখন অনেককে অনু-শোচনায় অধীর হইতে হইয়াছে। তাঁহার রচিত হাসির গানের প্রতেক গীতটির বিশ্লেষণ করিয়া দেখ-দেখি;—দেখিতে পাইবে, এক একটি গান যেন চরিত্র-মুকুর। তাহাতে অতিরঞ্জন নাই, উৎকটতা উদ্ভটতা নাই; কাচবক্ষ সরল ও সম-তল, যেন ঋজু ভাবে সত্যের প্রতিচ্ছায়া দেখাইতেছে! যিনি এ চিত্র দেখাইতে-ছেন, তিনি মুকুরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকেন না, তিনিও সকলের সঙ্গে সমান ভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন। এমন অনুকম্পা, এতটা সমবেদনা আমি আর কোনও সভ্যদেশের ব্যঙ্গাত্মক কবিতে দেখিতে পাই নাই! তাই দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান শুনিয়া কেহ কখনও ব্যথা পায় না, কেহ কখনও কাতরমুখে সরিয়া দাঁড়ায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল "ন্যাকামী"র বিরোধী ছিলেন। তাঁহার হাসির গানের প্রভাবে বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে ন্যাকামীর সঙ্কোচ ঘটিয়াছে কি না, বলিতে পারি না; তবে "ন্যাকামী"র যে পূর্ণ নির্দ্দেশ হইয়াছে, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। জাতি-সৃষ্টি ও জাতি-পুষ্টির ব্যাপারে ইহা একটা বড় কাজ। বাঙ্গালার সমাজ যখন সজীব ছিল, তখন গম্ভীরার গানে, পাঁচালীর ছড়ায়, যাত্রার সং-এ, কবিওয়ালার উতোর-চাপানে এই ন্যাকামীর অনেকটা সঙ্কোচ ঘটান হইত; দাশ-রথি রায় অনেক রকমের ন্যাকামীর উপর চাবুক চালাইয়াছিলেন। ইংরেজী-শিক্ষার আমলে প্রথমে হুতোম, সঙ্গে সঙ্গে দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী", পরে মার্জ্জিত ভাবে কমলাকান্ত ও হেমচন্দ্র, তাহার পরে কঠোর ভাবে ভারত-উদ্ধারে ইন্দ্রনাথ, শেষে মধুর ভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল বিদ্রূপের কশা চালাইয়াছিলেন। ইহার কোনটিই ভাষা হইতে খসিয়া যাইবে না; তবে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান চির-

দিন জাঁকের সামগ্রী হইয়া থাকিবে, মজলিসে ও বৈঠকখানায় উহা গীত হইবেই। উহার মধ্যে বাঙ্গালার এই সময়কার ইতিহাস-কথা নিবদ্ধ রহিল। আগামিগণ যখন এই সকল গান করিবে, তখন বায়স্কোপে ছায়া-চিত্র-দর্শনের মত বর্ত্তমান সমাজের অনেকগুলি চিত্র তাহারা দেখিতে পাইবে। সাহিত্যের হিসাবে ইহা একটা বড় কীর্তি; এ কীর্ত্তি অক্ষয় হয়ই; এমন কীর্ত্তিমান্ কবি জাতির স্মৃতিপটে অমর হইয়া থাকেনই।

পুরাকালে প্রধানতঃ লোকশিক্ষার জন্যই ভারতের প্রাদেশিক ভাষা সকল ব্যবহৃত হইত। এ দেশে লোকশিক্ষা বলিলেই ধর্ম্মশিক্ষা বুঝায়। সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত যাহাতে সদ্ধর্ম্মের শিক্ষা প্রসারিত হইতে পারে, সকলেই যাহার সাহায্যে অনায়াসে ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত সকল হৃদ্‌গত করিতে পারে,—তাহারই সৃষ্টি ও পুষ্টির উদ্দেশ্যে বৌদ্ধগণ প্রাদেশিক ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন; বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম-পুস্তক সকল প্রাকৃত ও পালি ভাষায় রচিত হইয়াছে। এই উদার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী হিন্দুগণ প্রাদেশিক ভাষায় বহু ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভারতের অন্যত্র যাহা হইয়াছে, আমাদের বাঙ্গালা দেশেও তাহাই ঘটিয়াছে। বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক কবিগণই আমাদের বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিবিধান করিয়াছেন। পূর্ব্বে খাঁটী কাব্যের হিসাবে কোনও কবিই বঙ্গভাষায় কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া যান নাই। কোনও পুরাণের অনুবাদ, দেবতার লীলা-কীর্ত্তন, ভক্তি ও প্রেমের মহিম-কীর্ত্তন বা দেবতা-বিশেষের পূজা-পদ্ধতির প্রচলন-উদ্দেশ্যেই বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য-গ্রন্থ সকল রচিত হইত। এমন যে "বিদ্যাসুন্দর", তাহাকেও অন্নদামঙ্গলের সহিত জুড়িয়া দিতে হইয়াছে, তবে উহা বাঁচিয়া আছে; অন্নদামঙ্গলের চাট্‌নীর হিসাবে উহার জীবন, স্বতন্ত্রভাবে নহে। রামপ্রসাদের স্বতন্ত্র "বিদ্যাসুন্দর" তাই পরিত্যক্ত—উপেক্ষিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে ধর্ম্মের কথা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত, পুরাণের কাহিনী সকল পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে প্রসারিত। ইংরেজের আমলে, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবকালে আমরা স্বতন্ত্রভাবে কাব্য শাস্ত্রের আলোচনা করিতে ইচ্ছুক হইলেও, আমাদের মাইকেল মধুসূদনকে মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা লিখিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল; হেমচন্দ্র "বৃত্রসংহার" লিখিয়া যশস্বী; নবীনচন্দ্র "রৈবতক" "কুরুক্ষেত্র" প্রভৃতি লিখিয়া মহাকবি। যেন মনে হয়, এখনও সেই পুরাণের ও ধর্ম্মের গণ্ডী কাটাইয়া আমরা বাহিরে যাইতে পারি না। ভাবের কথা কহিতে

সমুদ্র মন্থন করিতে হয়; সদ্ধর্ম্মের উপদেশ দিতে হইলে গীতা ভাগবতাদি সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের আলোড়ন করিতে হয়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ঠিক এই পথে চলেন নাই। তিনি ভারতের আদিম যুগের, গৌরব ও শ্লাঘার কালের কাহিনী অবলম্বনে নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেও,—সীতা ও পাষাণী লিখিয়া খ্যাতিযুক্ত হইলেও,—তাঁহার প্রধান নাটকগুলি ভারতের "নৈশ যুগে"র ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ভারতের মুসলমান প্রাধান্যের কাল ধরিয়া তিনি যে কয়খানি নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই কয়খানিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক নাটক—কৃষ্ণকুমারী মধুসূদনই রচনা করেন। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক এক সময়ে বাঙ্গালীর কাছে আদর পাইয়াছিল। পরে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি নাটকাকারে পরিণত হইয়া ঐতিহাসিক নাটকের অভাব অনেকটা দূর করে; গিরিশচন্দ্রও এই সময়ে কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-ভাঙ্গা নাটক কয়খানি ছাড়া আর কোনও ঐতিহাসিক নাটকে একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিত না—রকম করিয়া একটা নূতন কিছু শিখাইবার প্রকট চেষ্টা থাকিত না। দ্বিজেন্দ্রলাল এই অভাব দূর করিয়াছেন; তিনি ইতিহাসের চিত্র, পুরাণের আকারে, লোক-লোচনের গোচর করিয়াছেন। তাঁহাকে ভারতের মোগল-যুগের পুরাণকার বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার রচিত "রাণা প্রতাপ", "দুর্গাদাস", "মেবার-পতন", "নূরজাহান", "শাহ্-জাহান" প্রভৃতি প্রত্যেক নাটকেই একটা উদ্দেশ্য ( Purpose ) প্রকট রহিয়াছে। সে উদ্দেশ্য লোক-শিক্ষার বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত; সে উদ্দেশ্য সমাজ-সৃষ্টির পুণ্য-ভূমির ব্রতের সঙ্কল্পস্বরূপ; সে উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব-সাধনার মহৎ আসন-স্বরূপ। এই হেতুই আমি বলিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস-গাথাকে পুরাণে উন্নত করিয়া গিয়াছেন। ভাল করিয়াছেন, কি মন্দ করিয়াছেন, তাহার বিচার আগামিগণ করিবেন; কিন্তু যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রতিভার ও মনীষার পরিচয় আছে, কবি-হৃদয়ের ও কবি-চিত্তের প্রকাশ আছে, মনুষ্যত্বের ও দেবত্বের পরিস্ফুরণ আছে। এই কয়খানি নাটক বাঙ্গালা ভাষার সম্পদ ও কবিত্বের আকর। ইউরোপীয় সাহিত্যের অনেক মধুময় ভাব, অনেক অপরাজেয় আদর্শ, অনেক অভিনব রসবিন্যাস, এই কয়খানি নাটকের সাহায্যে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীকে উপঢৌকন দিয়াছেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহা

আমাদের দুঃখ এই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, এ দুঃখের মধ্যে একটু যেন ঈর্ষ্যার ভাব লুকান আছে। যে দেশে শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্য অল্পজীবনের মধ্যে একটা দেশব্যাপী ভাববিপ্লব ঘটাইয়া গিয়াছেন, সে দেশে পরমায়ুর দীর্ঘতা বা অল্পতা লইয়া বিচার করিলে চলিবে না। দেখিতে হইবে, যিনি চলিয়া গেলেন, তিনি আমাদের জন্য কি রাখিয়া গেলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অল্পবিস্তর পরিচয় আপনাদের অনেকের আছে।—আছে, বলিয়াই এমন শোক-সভার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার আয়োজন হইতেছে। শোক করি তাঁহারই জন্য, যিনি আমার আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ পুরুষ। কবি দেশের ও সমাজের আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ,—কেন না, দেশের ও সমাজের মর্ম্মের, ব্যথার ও সুখের কথা কবি টানিয়া বাহির করেন—মনের মতন ভাষায় তাহার প্রকাশ করেন; এই হেতু কবি ও ভাবুক সমাজের সকলের আত্মীয়, বন্ধু ও সখা। বিশেষতঃ যে কবি "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" রচনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি ত বাঙ্গালীর সহোদর-সহচর-তুল্য। তাঁহার মৃত্যুতে শোক যেন পৌষের কুয়াসার মতন আমাদের মন-বুদ্ধিকে ঢাকিয়া ফেলে। এক একবার মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল যেন বাঙ্গালার বর্ত্তমান যুগের রামপ্রসাদ। তিনি যে অভিনব শ্যামা-সঙ্গীতের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যে "মালসীর" আদর বাড়াইয়া গিয়াছেন,তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে ও সমাজে অমর হইবেই; সুতরাং তাঁহার স্মৃতি, তাঁহার নাম, এ দেশে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তিনি বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে, চরিত্রে ও মনের বলে, প্রতিভায় ও মনীষায় বাঙ্গালীর মধ্যে এক জন প্রধান ছিলেন; ভাবুকতায় ও কাব্যগাথা-রচনায় তিনি একটা নূতন যুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। যতকাল এই যুগ থাকিবে, ততকাল তাঁহার নাম ও তাঁহার কীর্ত্তি আমাদের আগামিগণ ভুলিতে পারিবে না।

শ্রীরাসবিহারী ঘোষ।

---

# আদরিণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাড়ার নগেন ডাক্তার ও জুনিয়ার উকীল কুঞ্জবিহারী বাবু বিকালে পান

আসিয়া বলিলেন—"মুখুর্য্যে মশায়, পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়ী থেকে আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েছি, এই সোমবার দিন মেঝ বাবুর মেয়ের বিয়ে। শুনছি নাকি ভারি ধুমধাম হবে। বেনারস থেকে বাই আসছে, কলকাতা থেকে খেমটা আসছে। আপনি নিমন্ত্রণ পেয়েছেন কি?"

মোক্তার মহাশয় তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া হুঁকা হাতে করিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আগন্তুকগণের এই প্রশ্ন শুনিয়া, হুঁকাটি নামাইয়া ধরিয়া, একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"কি রকম? আমি নিমন্ত্রণ পাব না কি রকম? জান, আমি আজ বিশ বচ্ছর ধরে তাদের এষ্টেটের বাঁধা মোক্তার?—আমাকে বাদ দিয়ে তারা তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে, এইটে কি সম্ভব মনে কর?"

জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে ইহাঁরা বেশ চিনিতেন—সকলেই চিনে। অতি অল্প কারণে তাঁহার তীব্র-অভিমান উপস্থিত হয়—অথচ হৃদয়খানি স্নেহে, বন্ধুবাৎসল্যে কুসুমের মত কোমল, ইহা যে তাঁহার সঙ্গে কিছুদিনও ব্যবহার করিয়াছে, সেই জানিয়াছে। উকীল বাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না—না—সে কথা নয়—সে কথা নয়। আপনি রাগ করলেন মুখুয্যে মশায়? আমরা কি সে ভাবে বলেছি? এ জেলার মধ্যে এমন কে বিষয়ী লোক আছে, যে আপনার কাছে উপকৃত নয়—আপনার খাতির না করে? আমাদের জিজ্ঞাসা করবার তাৎপর্য্য এই ছিল যে, আপনি সেদিন পীরগঞ্জে যাবেন কি?"

মুখোপাধ্যায় নরম হইলেন। বলিলেন "ভায়ারা, বস।"—বলিয়া সম্মুখস্থ আর একখানি বেঞ্চি দেখাইয়া দিলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে বলিলেন—"পীরগঞ্জে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে একটু কঠিন বটে। সোম মঙ্গল দুটো দিন কাছারী কামাই হয়। অথচ না গেলে, তারা মনে ভারি দুঃখিত হবে। তোঁমরা যাচ্ছ?"

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন "যাবার ত খুবই ইচ্ছে—কিন্তু অত দূর যাওয়া ত সোজা নয়! ঘোড়ার গাড়ীর পথ নেই। গোরুর গাড়ী করে যেতে হলে, যেতে দুদিন, আসতে দুদিন। পাল্কী করে যাওয়া, সেও যোগাড় হওয়া মুস্কিল। আমরা দুজনে তাই পরামর্শ করলাম, যাই মুখুয্যে মশায়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যদি যান, নিশ্চয়ই রাজবাড়ী থেকে একটা হাতী টাতী আনিয়ে নেবেন এখন, আমরা দুজনেও তাঁর সঙ্গে সেই হাতীতে দিব্যি আরামে যেতে পারব।"

কি ভাই ?—মহারাজ নরেশচন্দ্র ত আমার আজকের মক্কেল নয়—ওঁর বাপের আমল থেকে আমি ওঁদের মোক্তার। আমি কাল সকালেই রাজবাড়ীতে চিঠি, লিখে পাঠাচ্ছি—সন্ধ্যা নাগাদ হাতী এসে যাবে এখন।"

কুঞ্জবাবু বলিলেন—"দেখলে হে ডাক্তার, আমি ত বলেইছিলাম—অত ভাবছ কেন,-মুখুয্যে মশায়ের কাছে গেলেই একটা উপায় হয়ে যাবে। তা মুখুয্যে মশায়, আপনাকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। না গেলে ছাড়ছিনে।"

"যাব বৈ কি ভায়া—আমিও যাব। তবে আমার ত বাই খেমটা শোনবার বয়স নেই—তোমরা শুনো। আমি মাথায় এক পগ্‌গ বেঁধে, একটি থেলো হুঁকো হাতে করে, লোকজনের অভ্যর্থনা করব, কে খেলে কে না খেলে দেখব—তদারক করে বেড়াব। আর তোমরা বসে শুনবে—'পেয়ালা মুঝে ভর দে'—কেমন ?"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন রবিবার। এ দিন প্রভাতে আহ্নিক পূজাটা মুখুয্যে মহাশয় একটু ঘটা করিয়াই করিতেন। বেলা ৯টার সময় পূজা-সমাপন করিয়া, জলযোগান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। অনেকগুলি মক্কেল উপস্থিত ছিল, তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ সেই হাতীর কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন কাগজ কলম লইয়া, চশমাটি পরিয়া, "প্রবলপ্রতাপান্বিত শ্রীলশ্রীমন্মহারাজ শ্রীনরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর আশ্রিতজনপ্রতিপালকেষু" পাঠ লিখিয়া, দুই তিন দিনের জন্য একটি সুশীল ও সুবোধ হস্তী প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। পূর্ব্বেও আবশ্যক হইলে কতবার এইরূপে মহারাজের হস্তী আনাইয়া লইয়াছেন। এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া পত্রখানি লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়া, মোক্তার মহাশয় আবার মক্কেলগণের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বয়স এখন পঞ্চাশৎ পার হইয়াছে। মানুষটি লম্বা ছাঁদের—রঙ্গটি আর একটু পরিষ্কার হইলেই গৌরবর্ণ বলা যাইতে পারিত। গোঁফগুলি মোটা মোটা—কাঁচায় পাকায় মিশ্রিত। মাথার সম্মুখভাগে টাক আছে। চক্ষু দুইটি বড় বড়, ভাসা ভাসা। তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা যেন হৃদয় ছাপাইয়া, এই চক্ষু দুইটি দিয়া উছলিয়া পড়িতেছে।

ইহাঁর আদিবাস যশোর জেলায়। এখানে যখন প্রথম মোক্তারী করিতে আসেন, তখন এ দিকে রেল খোলে নাই। পদ্মা পার হইয়া, কতক নৌকাপথে,

একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ এবং একটি পিতলের ঘটী ছিল। সহায় সম্পত্তি কিছুই ছিল না। মাসিক তেরো সিকায় একটি বাসা ভাড়া লইয়া, নিজ হাতে রাঁধিয়া খাইয়া, মোক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেন। এখন সেই জয়রাম মুখোপাধ্যায় পাকা দালান কোঠা করিয়াছেন, বাগান করিয়াছেন, পুকুর কিনিয়াছেন, অনেকগুলি কোম্পানীর কাগজও কিনিয়াছেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এ জেলায় ইংরাজিওয়ালা মোক্তারের আবির্ভাব হইয়াছে বটে—কিন্তু জয়রাম মুখুয্যেকে তাহারা কেহই হটাইতে পারে নাই। এখনও ইনি এ জেলার প্রধান মোক্তার বলিয়া গণ্য।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয়খানি অত্যন্ত কোমল ও স্নেহপ্রবণ হইলেও, মেজাজটা কিছু রুক্ষ। যৌবনকালে ইনি রীতিমত বদরাগী ছিলেন—এখন রক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। সে কালে, হাকিমেরা একটু অবিচার অত্যাচার করিলেই মুখুর্য্যে মহাশয় রাগিয়া চেঁচাইয়া অনর্থপাত করিয়া তুলিতেন। একদিন এজলাসে এক ডেপুটীর সহিত ইহাঁর বিলক্ষণ বচসা হইয়া যায়। বিকালে বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মঙ্গলা গাই একটি এঁড়ে বাছুর প্রসব করিয়াছে। তখনই আদর করিয়া উক্ত ডেপুটীবাবুর নামে বাছুরটির নামকরণ করিলেন। ডেপুটীবাবু লোকপরম্পরায় ক্রমে এ কথা শুনিয়াছিলেন, এবং বলা বাহুল্য, নিতান্ত প্রীতিলাভ করেন নাই। আর একবার, এক ডেপুটীর সম্মুখে মুখুর্য্যে মহাশয় আইনের তর্ক করিতেছিলেন, কিন্তু হাকিম কিছুতেই ইহার কথায় সায় দিতেছিলেন না। অবশেষে রাগের মাথায় জয়রাম বলিয়া বসিলেন—"আমার স্ত্রীর যতটুকু আইন-জ্ঞান আছে, হুজুরের তাও নেই দেখছি।" সেদিন, আদালত-অবমাননার জন্য মোক্তার মহাশয়ের পাঁচ টাকা জরিমানা হইয়াছিল। এই আদেশের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্ট অবধি লড়িয়াছিলেন। সর্ব্বসুদ্ধ ১৭০০৲ ব্যয় করিয়া এই পাঁচটি টাকা জরিমানার হুকুম রহিত করাইয়াছিলেন।

মুখোপাধ্যায় যেমন অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন—তেমনই তাঁহার ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল। তিনি অকাতরে অন্নদান করিতেন। অত্যাচরিত, উৎপীড়িত গরীব লোকের মোকর্দ্দমা তিনি কত সময় বিনা ফিসে, এমন কি, নিজে অর্থব্যয় পর্য্যন্ত করিয়া, চালাইয়া দিয়াছেন।

প্রতি রবিবার অপরাহ্নকালে পাড়ার যুবক বৃদ্ধগণ মোক্তার মহাশয়ের বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া তাস পাশা প্রভৃতি খেলিয়া থাকেন। অদ্যও সেইরূপ অনেকে আগমন করিয়াছেন—পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারবাবু ও উকীলবাবুও আছেন।

হাতীকে বাঁধিবার জন্য বাগানে খানিকটা স্থান পরিষ্কৃত করা হইতেছে; হাতী রাত্রে খাইবে বলিয়া বড় বড় পাতাসুদ্ধ কয়েকটা কলার গাছ ও অন্যান্য বৃক্ষের ডাল কাটাইয়া রাখা হইতেছে—মোক্তার মহাশয় সেই সমস্ত তদারুক করিতেছেন। মাঝে মাঝে বৈঠকখানায় আসিয়া, কোনও ব্রাহ্মণের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুই চারি টান দিয়া আবার বাহির হইয়া যাইতেছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জয়রাম বৈঠকখানায় বসিয়া পাশা খেলা দেখিতেছিলেন। এমন সময় সেই পত্রবাহক ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"হাতী পাওয়া গেল না।"

কুঞ্জবাবু নিরাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"অ্যাঁ!—পাওয়া গেল না?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তাই ত? সব মাটী?"

মোক্তার মহাশয় বলিলেন—"কেন রে, হাতী পাওয়া গেল না কেন? চিঠির জবাব এনেছিস?"

ভৃত্য বলিল—"আজ্ঞে না। দেওয়ানজীকে গিয়ে চিঠি দিলাম। তিনি চিঠি নিয়ে মহারাজের কাছে গেলেন। খানিক বাদে ফিরে এসে বল্লেন, বিয়ের নেমন্তন্ন হয়েছে তার জন্য হাতী কেন? গোরুর গাড়ীতেযেতে বোলো।"

এই কথা শুনিবামাত্র জয়রাম ক্ষোভে, লজ্জায়, রোষে যেন একবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই চক্ষু দিয়া যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। মুখমণ্ডলের শিরা-উপশিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। কম্পিত স্বরে, ঘাড় বাঁকাইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন—"হাতী দিলে না! হাতী দিলে না!"

সমবেত ভদ্রলোকগণ ক্রীড়া বন্ধ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিলেন। কেহ কেহ বলিলেন—"তার আর কি করবেন মুখুয্যে মশায়! পরের জিনিস, জোর ত নেই। একখানা ভাল দেখে গোরুর গাড়ী ভাড়া করে নিয়ে, রাত্রি দশটা এগারটার সময় বেরিয়ে পড়ুন, ঠিক সময় পৌঁছে যাবেন। ঐ ইমামদ্দি শেখ একযোড়া নূতন বলদ কিনে এনেছে - খুব দ্রুত যায়।"

জয়রাম বক্তার দিকে দৃষ্টিমাত্র না করিয়া বলিলেন—"না। গোরুর গাড়ীতে চড়ে আমি যাব না। যদি হাতী চড়ে যেতে পারি, তবেই যাব, নৈলে এ বিবাহে আমার যাওয়াই হবে না।"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সহর হইতে দুই তিন ক্রোশের মধ্যে দুই তিন জন জমিদারের হাতী ছিল।

সেই রাত্রেই জয়রাম্ তত্তৎ স্থানে লোক পাঠাইয়াছিলেন, যদি কেহ হস্তী বিক্রয় করে, তবে কিনিবেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় এক জন ফিরিয়া আসিয়া বলিল —"বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর একটি মেনা-হাতী আছে—এখনও বাচ্ছা—বিক্রী করবে, কিন্তু বিস্তর দাম চায়।"

"কত ?"

"দু' হাজার টাকা।"

"খুব বাচ্ছা ?"

"না—সওয়ারি দিতে পারবে।"

"কুছ পরোয়া নেই। তাই কিনব। এখনি তুমি যাও। কাল সকালেই যেন হাতী আসে। লাহিড়ী মহাশয়কে আমার নমস্কার জানিয়ে বোলো, হাতীর সঙ্গে যেন কোনও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী পাঠিয়ে দেন, হাতী দিয়ে টাকা নিয়ে যাবে।"

পরদিন বেলা সাতটার সময় হস্তিনী আসিল। তাহার নাম—আদরিণী। লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ম্মচারী রীতিমত ষ্ট্যাম্প-কাগজে রসীদ লিখিয়া দিয়া দুই হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

বাড়ীতে হাতী আসিবামাত্র পাড়ার তাবৎ বালক বালিকা আসিয়া বৈঠকখানার উঠানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। দুই এক জন অশিষ্ট বালক সুর করিয়া বলিতে লাগিল—"হাতী, তোর গোদা পায়ে নাতি।" বাড়ীর বালকেরা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, এবং অপমান করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

হস্তিনী গিয়া অন্তঃপুরদ্বারের নিকট দাঁড়াইল। মুখুয্যে মহাশয় বিপত্নীক —তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ একটি ঘটীতে জল লইয়া সভয়-পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিলেন। কম্পিত হস্তে তাহার পদচতুষ্টয়ে সেই জল একটু একটু ঢালিয়া দিলেন। মাহুতের ইঙ্গিতানুসারে আদরিণী তখন জানু পাতিয়া বসিল। বড় বধূ তৈল ও সিন্দূরে তাহার ললাট রঞ্জিত করিয়া দিলেন। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। আবার দাঁড়াইয়া উঠিলে, একটা ধামায় ভরিয়া আলোচাল, কলা ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে রক্ষিত হইল—শুঁড় দিয়া তুলিয়া তুলিয়া কতক সে খাইল, অধিকাংশই ছিটাইয়া দিল। এইরূপে বরণ সম্পন্ন হইলে, রাজহস্তীর জন্য পরিষ্কৃত সেই স্থানে লইয়া গিয়া তাহাকে বাঁধা হইল। রাজহস্তীর জন্য সংগৃহীত সেই কদলীকাণ্ড ও বৃক্ষশাখা আদরিণী ভোজন করিতে লাগিল।

* * * *

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পীরগঞ্জ হইতে ফিরিবার পরদিন বিকালেই মহারাজ নরেশচন্দ্রের সহিত মুখোপাধ্যায়মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বলা বাহুল্য, হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই গেলেন।

মহারাজের দ্বিতল বৈঠকখানার নিম্নে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের অপর-প্রান্তে প্রবেশের সিংহদ্বার। বৈঠকখানায় বসিয়া সমস্ত প্রাঙ্গণ ও সিংহ-দ্বারের বাহিরেও অনেক দূর অবধি মহারাজের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

রাজসমীপে উপনীত হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মোকদ্দমা ও বিষয়-সংক্রান্ত দুই চারি কথার পর মহা-রাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুখুয্যে মশায়, ও হাতীটি কার?"

মুখুর্য্যে মহাশয় বিনীতভাবে বলিলেন—"আজ্ঞে, হুজুর বাহাদুরেরই হাতী।"

মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আমার হাতী! কৈ, ও হাতী ত কোনও দিন আমি দেখিনি। কোথা থেকে এল?"

"আজ্ঞে, বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে কিনেছি।"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া রাজা বলিলেন—"আপনি কিনেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে বল্লেন আমার হাতী?"

বিনয় কিংবা শ্লেষসূচক—ঠিক বোঝা গেল না—একটু মৃদু হাস্য করিয়া জয়রাম বলিলেন—"যখন হুজুর বাহাদুরের দ্বারাই প্রতিপালন হচ্ছি—আমিই যখন আপনার—তখন ও হাতী আপানার বৈ আর কার?"

সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া, বৈঠকখানায় বসিয়া, সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর নিকট মুখোপাধ্যায় এই কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষোভ ও লজ্জা আজ তাঁহার মুছিয়া গেল। কয়েক দিন পরে আজ তাঁহার সুনিদ্রা হইল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উল্লিখিত ঘটনার পর সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতীত হইয়াছে—এই পাঁচ বৎসরে মোক্তার মহাশয়ের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

নূতন নিয়মে পাশ করা শিক্ষিত মোক্তারে জেলাকোর্ট ভরিয়া গিয়াছে।

মহাশয়ের আয় কমিতে লাগিল। পূর্ব্বে যত উপার্জ্জন করিতেন, এখন তাহার অর্দ্ধেক হয় কি না সন্দেহ। অথচ ব্যয় প্রতিবৎসর বর্দ্ধিতই হইতেছে। তাঁহার তিনটি পুত্র। প্রথম দুইটি মূর্খ—বংশবৃদ্ধি ছাড়া আর কোনও কাযকর্ম্ম করিবার যোগ্য নহে। কনিষ্ঠ পুত্রটি কলিকাতায় পড়িতেছে—সেটি যদি কালে ক্রমে মানুষ হয়, এইমাত্র ভরসা।

ব্যবসায়ের প্রতি মুখোপাধ্যায়ের আর সে অনুরাগ নাই—বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ছোকরা মোক্তারগণ, যাহাদিগকে এক সময় উলঙ্গাবস্থায় পথে খেলা করিতে দেখিয়াছেন, তাহারা এখন শামলা মাথায় দিয়া (মুখোপাধ্যায় মাথায় পাগড়ী বাঁধিতেন, সেকালে মোক্তারগণ শামলা ব্যবহার করিতেন না) তাঁহার প্রতিপক্ষে দাঁড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া ফর্ ফর্ করিয়া ইংরাজিতে হাকিমকে কি বলিতে থাকে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। পার্শ্বস্থিত ইংরেজি-জানা জুনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করেন, "উনি কি বলছেন?" জুনিয়ার তর্জ্জমা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে অন্য প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, মুখের জবাব মুখেই রহিয়া যায়—নিষ্ফল রোষে তিনি ফুলিতে থাকেন। তাহা ছাড়া, পূর্ব্বে হাকিমগণ মুখুর্য্যে মহাশয়কে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, এখনকার নব্য হাকিমগণ আর তাহা করেন না। ইহাদের যেন বিশ্বাস, যে ইংরাজী জানে না, সে মনুষ্যপদ-বাচ্যই নহে। এই সকল কারণে মুখোপাধ্যায় স্থির করিয়াছেন, কর্ম্ম হইতে এখন অবসর গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। তিনি যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার সুদ হইতে কোনও রকমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। প্রায় যাট বৎসর বয়স হইল—চিরকালই কি খাটিবেন? বিশ্রামের সময় কি হয় নাই? বড় ছেলেটি যদি মানুষ হইত—দুই টাকা যদি রোজগার করিতে পারিত—তাহা হইলে এতদিন কোন কালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবসর লইতেন, বাড়ীতে বসিয়া হরিনাম করিতেন। কিন্তু আর বেশী দিন চলে না। তথাপি আজি কালি করিয়া আরও এক বৎসর কাটিল।

এই সময় দায়রায় একটি খুনী মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইল। সেই মোকর্দ্দমার আসামী জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে নিজ মোক্তার নিযুক্ত করিল। এক জন নূতন ইংরাজ জজ আসিয়াছেন—তাঁহারই এজলাসে বিচার।

তিন দিন যাবৎ মোকর্দ্দমা চলিল। অবশেষে মোক্তার মহাশয় উঠিয়া "জজসাহেব বাহাদুর ও এসেসার মহোদয়গণ" বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতা-শেষে, এসেসারগণ মুখোপাধ্যায়ের মক্কেলকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিলেন—

জজ সাহেবও তাঁহাদের অভিমত স্বীকার করিয়া আসামীকে অব্যাহতি দিলেন।

জজ সাহেবকে সেলাম করিয়া, মোক্তার মহাশয় নিজ কাগজপত্র বাঁধিতেছেন, এমন সময় জজ সাহেব পেস্কারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ উকীলটির নাম কি ?"

পেস্কার বলিল—"উহাঁর নাম জয়রাম মুখার্জ্জি। উনি উকীল নহেন, মোক্তার।"

প্রসন্নহাস্যের সহিত জজসাহেব জয়রামের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"আপনি মোক্তার ?"

জয়রাম বলিলেন—"হাঁ হুজুর, আপনার তাঁবেদার।"

জজ সাহেব পূর্ব্ববৎ বলিলেন—"আপনি মোক্তার! আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি উকীল। যেরূপ দক্ষতার সহিত আপনি মোকর্দ্দমা চালাইয়াছেন, আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি এখানকার এক জন ভাল উকীল।"

এই কথাগুলি শুনিয়া, মুখোপাধ্যায়ের সেই ডাগর চক্ষু দুইটি জলে পূর্ণ হইয়া গেল। হাত দুটি যোড় করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"না হুজুর, আমি উকীল নহি—আমি এক জন মোক্তারমাত্র। তাও সেকালের শিথিল নিয়মের এক জন মূর্খ মোক্তার। আমি ইংরাজি জানি না হুজুর। আপনি আজ আমার যে প্রশংসা করিলেন, আমি আমরণ তাহা ভুলিতে পারিব না। এই বুড়া ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিতেছে, হুজুর হাইকোর্টের জজ হউন।"—বলিয়া, ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া মোক্তার মহাশয় এজলাস হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

ইহার পর আর তিনি কাছারী যান নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্যবসায় ছাড়িয়া কায়ক্লেশে মুখোপাধ্যায়ের সংসার চলিতে লাগিল। ব্যয় যে পরিমাণ সঙ্কোচ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা শত চেষ্টাতেও হইয়া উঠে না। সুদে সঙ্কুলান হয় না, মূলধনে হাত পড়িতে লাগিল। কোম্পানীর কাগজের সংখ্যা কমিতে লাগিল।

একদিন প্রভাতে মোক্তার মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া নিজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মাহুত, আদরিণীকে লইয়া নদীতে স্নান করাইতে গেল। অনেক দিন হইতেই লোকে ইহাঁকে বলিতেছিল, "হাতীটি



রুথ।

চিত্রকর—রাইল্যাণ্ড।

Blocks by G, N. Mukherji, Pro. Mohila Press. Cal

আর কেন, ওকে বিক্রী করে ফেলুন। মাসে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা খরচ বেঁচে যাবে।" কিন্তু মুখুর্য্যে মহাশয় উত্তর করিয়া থাকেন—"তার চেয়ে বল না, তোমার এই ছেলেপিলে নাতিপুতিদের খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে—ওদের একে একে বিক্রী করে ফেল।"—এরূপ উক্তির পর আর কথা চলে না।

হাতীটিকে দেখিয়া মুখোপাধ্যায়ের মনে হইল, ইহাকে যদি মধ্যে মধ্যে ভাড়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ত কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতে পারে। তখনই কাগজ কলম লইয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুসাবিদা করিলেন :—

হস্তীভাড়ার বিজ্ঞাপন।

বিবাহের শোভাযাত্রা, দূরদূরান্তে গমনাগমন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর আদরিণী নাম্নী হস্তিনী ভাড়া দেওয়া যাইবে। ভাড়া প্রতিরোজ ৩৲ মাত্র, হস্তিনীর খোরাকী ১৲ এবং মাহুতের খোরাকী ॥০ একুনে ৪॥০ ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন ঠিকানায় তত্ত্ব লইবেন।

শ্রীজয়রাম মুখোপাধ্যায় (মোক্তার) চৌধুরীপাড়া।

এই বিজ্ঞাপনটি ছাপাইয়া, সহরের প্রত্যেক ল্যাম্পপোষ্টে, পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষকাণ্ডে, এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দেওয়া হইল।

বিজ্ঞাপনের ফলে, মাঝে মাঝে লোকে হস্তী ভাড়া লইতে লাগিল বটে—কিন্তু তাহাতে মাসে ৮৲।১০৲ টাকার বেশী আয় হইল না।

মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্রটি পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার জন্য ডাক্তারখরচ, ঔষধ-পথ্যাদির খরচ, প্রতিদিন ৫৲।৭৲ টাকার কমে নির্ব্বাহ হয় না। মাস খানেক পরে বালকটি কথঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিল।

মেঝবধূ, ছোটবধূ, উভয়েই অন্তঃসত্ত্বা। কয়েক মাস পরেই আর দুইটি জীবের অন্নসংস্থান করিতে হইবে।

এ দিকে জ্যেষ্ঠা পৌত্রী কল্যাণী দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে যেরূপ ডাগর হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্রই তাহার বিবাহ না দিলে নয়। নানা স্থান হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিতেছে বটে—কিন্তু ঘর-বর মনের মত হয় না। যদি ঘর-বর মনের মত হইল, তবে তাহাদের খাঁই শুনিয়া চক্ষুঃস্থির হইয়া যায়। কন্যার পিতা এ সম্বন্ধে একেবারে নির্লিপ্ত। সে নেশাভাঙ করিয়া, তাস পাশা খেলিয়া বেড়াইতেছে। যত দায়, এই ষাট বৎসরের বুড়ারই ঘাড়ে।

অবশেষে এক স্থানে বিবাহ স্থির হইল। পাত্রটি রাজসাহী কলেজে এল্. এ. পড়িতেছে—খাইবার পরিবার সংস্থানও আছে। তাহারা দুই হাজার টাকা চাহে—নিজেদের খরচ পাঁচ শত—আড়াই হাজার টাকা হইলেই বিবাহটি হয়।

কোম্পানীর কাগজের বাণ্ডিল দিন দিন যেরূপ ক্ষীণ হইতেছে—তাহা হইতে আবার আড়াই হাজার বাহির করা বড়ই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। আর, শুধু ত এই একটি নহে—আরও নাতিনীরা রহিয়াছে। তাহাদের বেলায় কি উপায় হইবে?

এই সকল ভাবনা চিন্তার মধ্যে পড়িয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর ক্রমে ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। একদিন সংবাদ আসিল, কনিষ্ঠ পুত্রটি বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছিল, সেও ফেল হইয়াছে।

বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন—"মুখুয্যে মশায়, হাতীটিকে বিক্রী করে ফেলুন—করে নাতিনীর বিবাহ দিন। কি করবেন, বলুন। অবস্থা বুঝে ত কাজ করতে হয়। আপনি জ্ঞানী লোক, মায়া পরিত্যাগ করুন।"

মুখোপাধ্যায় আর কোনও উত্তর দেন না। মাটীর পানে চাহিয়া ম্লানমুখে বসিয়া কেবল চিন্তা করেন, এবং মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

চৈত্র-সংক্রান্তিতে বামুনহাটে একটি বড় মেলা হয়। সেখানে বিস্তর গোরু বাছুর ঘোড়া হাতী উট বিক্রয়ার্থ আসে। বন্ধুগণ বলিলেন—"হাতীটিকে মেলায় পাঠিয়ে দিন—বিক্রী হয়ে যাবে এখন। দু হাজারে কিনেছিলেন, এখন হাতী বড় হয়েছে—তিন হাজার টাকা অনায়াসে পেতে পারবেন।"

কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"কি করে তোমরা এমন কথা বলছ?"

বন্ধুরা বুঝাইলেন—"আপনি বলেন, ও আমার মেয়ের মত। তা, মেয়েকেই কি চিরদিন ঘরে রাখা যায়? মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে যায়, তার আর উপায় কি? তবে পোষা জানোয়ার, অনেক দিন ঘরে রয়েছে—মায়া হয়ে গেছে—একটু দেখে শুনে কোনও ভাল লোকের হাতে বিক্রী করলেই হল। যে বেশ আদর যত্নে রাখবে—কোনও কষ্ট দেবে না—এমন লোককে বিক্রী করবেন।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া জয়রাম বলিলেন—"তোমরা সবাই যখন বলছ—তখন তাই হোক। দাও, মেলায় পাঠিয়ে দাও। এক জন ভাল খদ্দের ঠিক কর—তাতে দামে যদি দু-পাঁচশো টাকা কমও হয়, সেও স্বীকার।"

মেলাটি চৈত্র-সংক্রান্তির প্রায় পনেরো দিন পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। তবে শেষের চারি পাঁচ দিনই বেশী জমজমাট। সংক্রান্তির এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যাত্রা স্থির হইয়াছে। মাহুত ত যাইবেই—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্রটিও সঙ্গে যাইবে।

যাত্রার দিন অতি প্রত্যূষে মুখোপাধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে হস্তী ভোজন করিতেছে। বাটীর মেয়েরা, বালকবালিকাগণ সজলনেত্রে বাগানে হস্তীর কাছে দাঁড়াইয়া। খড়ম পায়ে দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বদিন দুই টাকার রসগোল্লা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন, ভৃত্য সেই হাঁড়ি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ডালপালা প্রভৃতি মামুলী খাদ্য শেষ হইলে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বহস্তে মুঠা মুঠা করিয়া সেই রসগোল্লা হস্তিনীকে খাওয়াইলেন। শেষে, তাহার গলার নিম্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—"আদর, যাও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এস"। —প্রাণ ধরিয়া বিদায়বাণী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। উদ্বেল দুঃখে—এই ছলনাটুকুর আশ্রয় লইলেন।

হাতী চলিয়া গেল। মুখোপাধ্যায় শূন্যমনে বৈঠকখানার ফরাস বিছানার উপর গিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। অনেক বেলা হইলে, অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া বধূরা তাঁহাকে স্নান করাইলেন। স্নানান্তে আহারে বসিলেন বটে, কিন্তু পাতের অন্ন-ব্যঞ্জন অধিকাংশই অভুক্ত পড়িয়া রহিল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কল্যাণীর বিবাহের সমস্ত কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুভকার্য্যের দিন স্থির হইয়াছে। বৈশাখ পড়িলেই উভয় পক্ষের আশীর্ব্বাদ হইবে। হস্তি-বিক্রয়ের টাকাটা আসিলেই গহনা গড়াইতে দেওয়া হয়।

কিন্তু ১লা বৈশাখ সন্ধ্যাবেলা মস্ মস্ করিয়া আদরিণী ঘরে ফিরিয়া আসিল বিক্রয় হয় নাই— উপযুক্ত মূল্য দিবার খরিদ্দার জোটে নাই।

আদরিণীকে ফিরিতে দেখিয়া বাড়ীতে আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। বিক্রয় হয় নাই বলিয়া কাহারও কোনও খেদের চিহ্ন সে সময় দেখা গেল না। যেন হারাধন ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে—সকলের আচরণে এইরূপ মনে হইতে লাগিল।

বাড়ীর লোকে বলিতে লাগিল—"আহা, আদর রোগা হয়ে গেছে। বোধ হয়, এ ক'দিন সেখানে ভাল করে' খেতে পায় নি। ওকে দিন কতক এখন বেশ করে খাওয়াতে হবে।"

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস অপনীত হইলে, পরদিন সকলের মনে হইল—কল্যাণীর বিবাহের এখন কি উপায় হইবে ?

প্রতিবেশী বন্ধুগণ আবার বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন। অত বড় মেলায় এমন ভাল হাতীর খরিদ্দার কেন জুটিল না, তাহা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। এক জন বলিলেন---"ঐ যে যাবার সময় মুখুয্যে মশায় বল্লেন—'আদর, যাও মা, মেলা দেখে এস'---তাই বিক্রী হল না। উনি ত আর আজকালকার মুর্গীখোর ব্রাহ্মণ নন—ওঁর মুখ দিয়ে যে ব্রহ্মবাক্য বেরিয়েছে, সে কথা কি নিষ্ফল হবার যো আছে ! কথায় বলে—ব্রহ্মবাক্য বেদ-বাক্য।"

বামুনহাটের মেলা ভাঙ্গিয়া, সেখান হইতে আরও দশ ক্রোশ উত্তরে রসুল-গঞ্জে সপ্তাহব্যাপী আর এক মেলা হয়। যে সকল গো-মহিষাদি বামুনহাটে বিক্রয় হয় না—সে সব রসুলগঞ্জে গিয়া জমে। সেইখানেই আদরিণীকে পাঠা-ইবার পরামর্শ হইল।

আজ আবার আদরিণী মেলায় যাইবে। আজ আর বৃদ্ধ তাহার কাছে গিয়া বিদায়সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। রীতিমত আহারাদির পর আদরিণী বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী আসিয়া বলিল, "দাদা মশায়, আদর যাবার সময় কাঁদছিল।"

মুখোপাধ্যায় শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—"কি বল্লি ? কাঁদছিল ?"

"হাঁ দাদা মশায়। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়-ছিল।" বলিতে বলিতে কল্যাণীর চক্ষু দিয়াও ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ আবার ভূমিতে পড়িয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিলেন—"জানতে পেরেছে। ওরা অন্তর্যামী কি না। এ বাড়ীতে যে আর ফিরে আসবে না, তা জানতে পেরেছে।"

নাতিনী চলিয়া গেলে বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"যাবার সময় আমি যে তোর সঙ্গে দেখাও করলাম না—সে কি তোকে অনাদর করে ? না মা, তা নয়। তুই ত অন্তর্যামী—তুই কি আমার মনের কথা বুঝতে পারিস্ নি ?—খুকীর বিয়েটা হয়ে যাক। তার পর, তুই যার ঘরে যাবি, তাদের বাড়ী গিয়ে আমি তোকে দেখে আসব। তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে যাব—

মাঝে মাঝে গিয়ে তোকে দেখে আসব। তুই মনে কোনও অভিমান করিস্‌নে মা।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন বিকালে একটি চাষীলোক একখানি পত্র আনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে দিল।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মধ্যমপুত্র লিখিয়াছে,—"বাটী হইতে সাত ক্রোশ দূরে আসিয়া কল্য বৈকালে আদরিণী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। সে আর পথ চলিতে পারে না। রাস্তার পার্শ্বে একটা আমবাগানে শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার পেটে বোধ হয় কোনও বেদনা হইয়াছে।—শুঁড়টি উঠাইয়া মাঝে মাঝে কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। মাহুত যথাবিদ্যা সমস্ত রাত্রি তাহার চিকিৎসা করিয়াছে—বোধ হয় আদরিণী আর বাঁচিবে না। যদি মরিয়া যায়, তবে নিকটেই একটু জমী বন্দোবস্ত লইয়া তাহার শবদেহ প্রোথিত করিতে হইবে। সুতরাং কর্ত্তা মহাশয়ের অবিলম্বে আসা প্রয়োজন।"

বাড়ীর মধ্যে গিয়া, উঠানে পাগলের মত পায়চারি করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"আমায় গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দাও। আমি এখনি বেরুব। আদরের অসুখ—যাতনায় সে ছটফট্‌ করছে। আমাকে না দেখতে পেলে সে সুস্থ হবে না। আমি আর দেরী করতে পারব না।"

তখনই ঘোড়ার গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে লোক ছুটিল। বধূরা অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে একটু দুগ্ধমাত্র পান করাইতে সমর্থ হইলেন। রাত্রি দশটার সময় গাড়ী ছাড়িল। জ্যেষ্ঠ পুত্রও সঙ্গে গেলেন। পত্রবাহক সেই চাষীলোকটি কোচবাক্সে বসিল।

পরদিন প্রভাতে গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া, বৃদ্ধ দেখিলেন—সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আদরিণীর সেই নবজলধরবর্ণ বিশাল দেহখানি আম্রবনের ভিতর পতিত রহিয়াছে—তাহা আজ নিশ্চল—নিঃস্পন্দ।

বৃদ্ধ তখন হস্তিনীর শবদেহের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া, তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "অভিমান করে' চলে' গেলি মা? তোকে বিক্রী করতে পাঠিয়েছিলাম বলে—তুই অভিমান করে চলে

ইহার পর দুইটি মাস মাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত ছিলেন। স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে, আদরিণী যাঁর ঘরে গিয়াছিল, তিনিও তাঁহারই ঘরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুত সন্দেশ ও রসগোল্লা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই। আশা করি, সে রাজ্যে সন্দেশ ও রসগোল্লা অপেক্ষা লক্ষগুণে মিষ্টতর উৎকৃষ্টতর কোনও কিছুর অক্ষয় স্রোত প্রবাহিত আছে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

---

# শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন।

## প্রশস্তি-পাঠ।*

[ সম্মুখের পৃষ্ঠা। ]

১। ওঁ স্বস্তি

বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান্ করুণৈ-[ক]-পাত্রং

ধর্ম্মোপ্য সৌ

২। বিজয়তে জগদেক-দীপঃ।

যৎ-সেবয়া সকল এব মহানুভাবঃ

সং-

৩। সার-পারমুপগচ্ছতি ভিক্ষু-সঙ্ঘঃ ॥ [ ১ ॥ ]

চন্দ্রাণামিহ রোহিতা- [ ] শি(?)-ভুজাম্বংশে

৪। বিশাল-শ্রিয়া

স্বিখ্যাতো ভুবি পূর্ণ চন্দ্র-সদৃশঃ শ্রীপূর্ণ চন্দ্রোঽভবৎ।

অর্চ্চা

৫। নাস্পদ-পীঠিকাসু পঠিতঃ সন্তানিনামগ্রত-

---

* শিল্পীর অনবধানতায় যে সকল অক্ষর তাম্রপট্টে ক্ষোদিত হয় নাই, এবং উৎকীর্ণ হইলেও যে সকল অক্ষর কাল-প্রভাবে বা অন্য কারণে বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে, তাহা [ ] প্রকার বন্ধনী-মধ্যে প্রদর্শিত হইল। বর্ণাশুদ্ধি ও অতিরিক্ত অক্ষর ( ) এইরূপ বন্ধনীমধ্যে সংশোধিত হইয়াছে।

১। বসন্ত-তিলক : এই শ্লোকের প্রথম চরণে 'এক পাত্রং' পদের (ক) অক্ষরটি উৎকীর্ণ হয়

স্টঙ্কোৎকীর্ণ-নবপ্রশস্তিষু জয়-স্তম্ভেষু তাম্রেষু চ ॥ [ ২॥ ]

৬। বুদ্ধস্য যঃ শ-

শক-জাতক-মঙ্কসংস্থং

ভক্ত্যা বিভর্ত্তি ভগবানমৃতাকরাংশুঃ।

চন্দ্রস্য তস্য কুল-জাত ইতীব বৌদ্ধ [ ঃ ]

পুত্রঃ

৭। শ্রুতো জগতি তস্য সুবর্ণচন্দ্রঃ ॥ [ ৩॥ ]

[ দর্শে ] স্য মাতা কিল দোহদেন

দিদৃক্ষমাণোদয়িচন্দ্র-বিম্বং।

৮। সুবর্ণ-চন্দ্রেণ হি তোষিতেতি

সুবর্ণচন্দ্রং সমুদাহরন্তি ॥ [৪॥ ]

পুত্রস্তস্য পবিত্রিতোভয়-কুলঃ কৌলীন-

৯। ভীতাশয়ৈ-

স্ত্রৈলোক্যে বিদিতো দিশামতিথিভি স্ত্রৈলোক্যচন্দ্রো গুণৈঃ

আধারো হরিকেল—রা-

১০। জ-ককুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াং

যশ্চন্দ্রোপপদে বভূব নৃপতি র্দ্বীপে দিলীপোপমঃ ॥ [ ৫ ॥ ]

জ্যোৎস্নেব চন্দ্রসা

১১। শচীব জিষ্ণো-

---

২। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত। এই শ্লোকে প্রথম পাদে 'রোহিতা'-অক্ষর-ত্রয়ের পর একটি অক্ষর উৎকীর্ণ হয় নাই, এবং তাহার পরবর্ত্তী যে অক্ষরটি পরিদৃষ্ট হয়,তাহা 'খি' বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এই পাঁচটি অক্ষর 'ভুজাং' অক্ষর-দ্বয়ের সঙ্গে সমাসাবদ্ধ থাকিয়া 'চন্দ্রাণাং' পদের বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। "রোহিতাবনিভুজাং" অথবা ঐরূপ কোনও জনপদ-ভোগের কথা উৎকীর্ণ কর্ম্মে সূচিত হইয়াছে কি না, সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

৩। বসন্ত-তিলক। এই শ্লোকে তৃতীয় পাদে 'বৌদ্ধ' শব্দের পর বিসর্গ-চিহ্নের অভাব দৃষ্ট হয়। তদভাবেও অর্থ-সংগতি রক্ষিত হইতে পারে।

৪। উপজাতি। এই শ্লোকের 'দর্শে' অক্ষরদ্বয় একটু অস্পষ্ট।

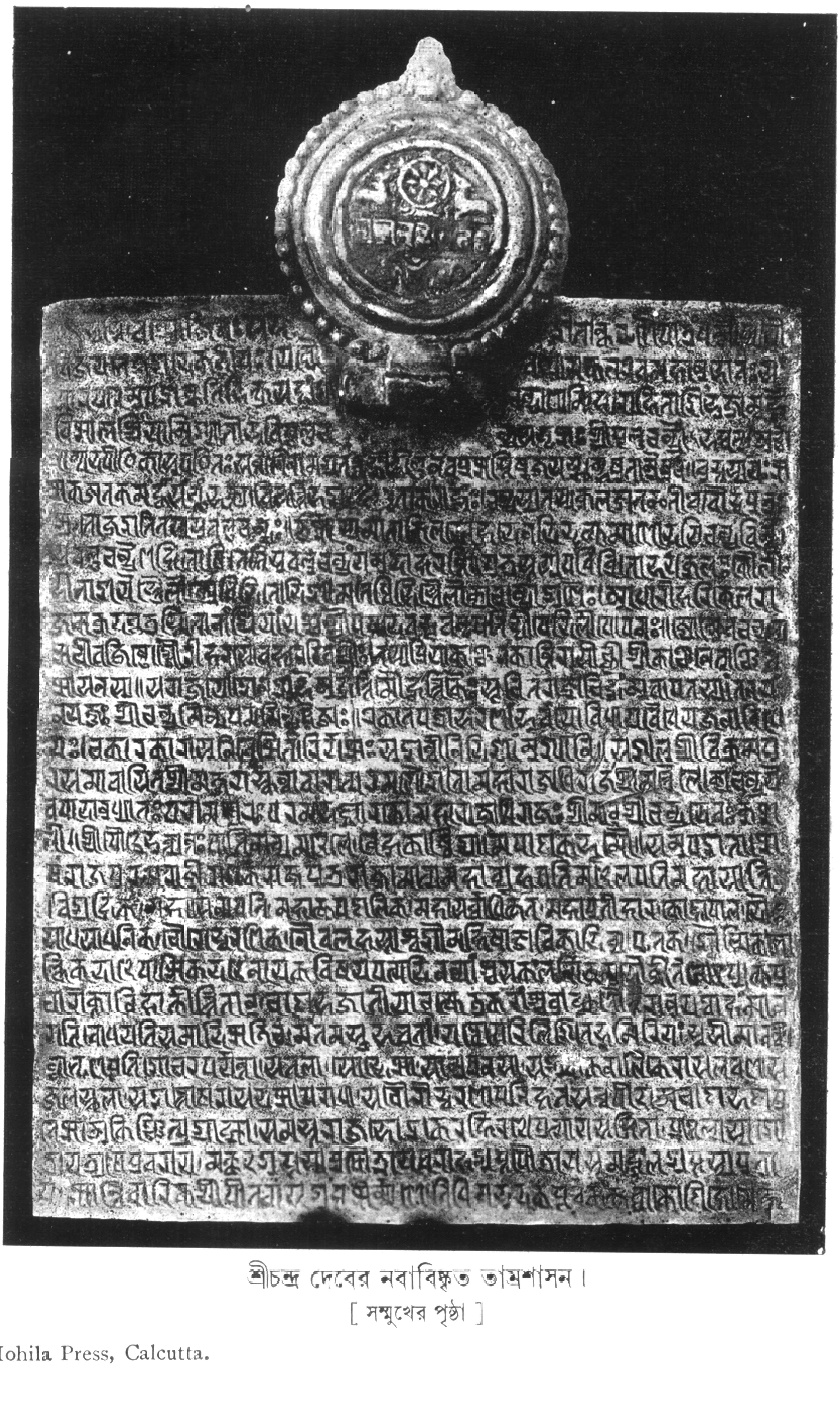
৫। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত।

গের্গৌরী হরস্যেব হরেরিব শ্রীঃ।
তস্য প্রিয়া কাঞ্চন-কান্তি রাসী-
চ্ছ্রী (শ্রী) কাঞ্চনেত্যঙ্কিত-
১২। শাসনস্য ॥ [৬ ॥ ]
স রাজ-যোগেন শুভে মুহূর্ত্তে
মৌহূর্ত্তিকৈঃ সূচিত রাজ-চিহ্নং।
অবাপ তস্যাং তনয়ং
১৩। নয়জ্ঞঃ
শ্রীচন্দ্রমিন্দ (ন্দূ) পমমিন্দ্র-তেজাঃ ॥ [৭ ॥ ]
একাতপত্রাভরণাং ভুবং যো
বিধায় বৈধেয়-জনাবিধে-
১৪। য়ঃ
চকার কারাসু নিবেশিতারি-
র্যশঃ-সুগন্ধীনি দিশাং মুখানি ॥ [৮ ॥ ]
স খলু শ্রীবিক্রমপু
১৫। র-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ পরম-সৌগতো
মহারাজাধিরাজ-শ্রীমত্ত্রৈলোক্যচন্দ্রদে-
১৬। ব-পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরম-ভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ
শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেবঃ কুশ-
১৭। লী ॥ শ্রীপৌণ্ড্র-ভুক্ত্যন্তঃপাতি-নান্যমণ্ডলে।
নেহকাষ্ঠি-গ্রামে পাটক-ভূমৌ ॥ সমুপগতাশে-
১৮। ষ-রাজপুরুষ-রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-
-মহাব্যূহপতি-মণ্ডলপতি-মহাসান্ধি-
১৯। বিগ্রহিক। মহাসেনাপতি। মহাক্ষপটলিক।

---

৬। ইন্দ্রবজ্রা। এই শ্লোকের চতুর্থ চরণে 'শ্রী' শব্দ দুইবার উৎকীর্ণ হওয়াতে ছন্দোভঙ্গ দোষ ঘটিয়াছে। একটিকে অতিরিক্ত ধরিতে হইবে।

৭-৮। উপজাতি।



শ্রীচন্দ্র দেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন।

[ সম্মুখের পৃষ্ঠা ]

Mohila Press, Calcutta.



শ্রীচন্দ্র দেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন।

[ পশ্চাতের পৃষ্ঠা ]

Mohila Press, Calcutta.

মহাসর্ব্বাধিকৃত। মহাপ্রতীহার। কোট্টপাল। দৌঃ-

২০। সাধ-সাধনিক। চৌরোদ্ধরণিক। নৌবল হস্ত্যশ্ব-গো-

মহিষাজাবিকাদি-ব্যাপৃতক। গৌল্মিক শৌ-

২১। ল্কিক-দাণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়পত্যদি (ত্যাদী)

নন্যাংশ্চ সকল-রাজ-পাদো[ প[1] ]জীবিনোঽধ্যক্ষ-প্র-

২২। চারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান্। চাট-ভ [ ট[2] ] জাতীয়ান্

ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মান-

২৩। য়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। মতমস্তু ভতাং।

যথোপরি-লিখিতা ভূমিরিয়ং। স্ব-সীমাবচ্ছী (চ্ছি)-

২৪। ন্না। তৃণ-পূতি-গোচর-পর্য্যন্তা। সতলা।

সোদ্দেশা। সাম্র-পনসা। সগুবাক-নালিকেরা সলবণা স-

২৫। জল-স্থলা। সগর্ত্তোষরা সদশাপরাধা। সচৌরোদ্ধরণা

পরিহৃত-সর্ব্বপীড়া অচাট-ভট-প্র-

২৬। বেশা অকিঞ্চিৎপ্রগাহ্যা। সমস্ত-রাজভোগ-

কর-হিরণ্য-প্রত্যায়-সহিতা। শথল্য[3] (শাণ্ডিল্য) স্য (স)-গো-

২৭। ত্রায় ত্র্যার্ষ-প্রবরায়। মঙ্করগুপ্তস্য প্রপৌত্রায়

বরাহগুপ্ত-পৌত্রায়

স্বমঙ্গলগুপ্তস্য পুত্রা-

২৮। য়। শান্তি-বারিক-শ্রীপীতবাসগুপ্তশর্ম্মণে।

বিধিবদুদক-পূর্ব্বকং কৃত্বা

[4] কোটিহোমি (?) ঙ্গ (ঙ্গ)

১। এই স্থলের 'প' অক্ষরটি তাম্র-পট্টে ক্ষোদিত দেখা যায় না।

২। এই স্থলের 'ট' অক্ষরটিও উৎকীর্ণ নাই।

৩। 'শথলা' কোনও ঋষির নাম বলিয়া বোধ হয় না; এই নিমিত্ত 'শাণ্ডিল্য' পাঠ শুদ্ধ হইবে বলিয়া গৃহীত হইল।

৪। এই স্থলে অর্থ-সঙ্গতির জন্য "কোটি-হোমিঙ্গতবতে" পাঠ ধৃত হইল। তাম্রপট্টে

[ পশ্চাতের পৃষ্ঠা। ]

২৯। তবতে ভগবন্তং বুদ্ধভট্টা[৫] [ র ] কমুদ্দিশ্য
মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ

৩০। পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে[৬] আচন্দ্রার্ক ং। ক্ষিতিসমকালং
যাবৎ ভূমি[৭] [চ্ছি]-

৩১। দ্র-ন্যায়েন। শ্রীমদ্ধর্ম্ম[৮] [চ] ক্র-মুদ্রয়া
তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাঽস্মাভিঃ অতো ভবদ্ভিঃ সর্বৈ-

৩২। রনুমন্তব্যং। ভাবিভিরপি ভূপতিভির্ভূমের্দ্দান-ফল-
গৌরবাদপহরণে মহা-নরক-পা-

৩৩। ত-ভয়াচ্চ দানমিদমনুমোদ্যানুপালনীয়ম্[৯] [ প্র ]
তিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরাং (রৈ) শ্চাজ্ঞাশ্রবণ-বিধে-

৩৪। [১০]য়ী-ভূ[য়] যথোচিত-প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি ॥
ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ ॥
ভূমিং যঃ

৩৫। প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি [।]
উভৌ তৌ পুণ্য-কর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গ-গামিনৌ ॥
ষষ্টিম্বর্ষ-সহস্রা-

---

'হোনেন্দ্য' পরিদৃষ্ট হয়। 'হোমি'র ইকারের উপরের টানটি এবং 'ঙ'-র শূন্য-চিহ্নটি বিলুপ্ত বলা যাইতে পারে।

৫। এই স্থলের 'র' অক্ষর তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ নাই।

৬। এই শব্দটি তাম্রপট্টে '-চিহ্ন-বিহীন।

৭। এই শব্দের 'চ্ছি' অক্ষরটি তাম্র-ফলকে ক্ষোদিত নাই।

৮। 'চক্রে'র 'চ' অনুৎকীর্ণ।

৯। এই স্থলের 'প্র' অক্ষরটি ক্ষোদিত নাই।

১০। এই স্থলের 'য়' টি উৎকীর্ণ হয় নাই।

৩৬। ণি স্বগর্গে মোদতি ভূমিদঃ।

আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকং ( কে )[11] বসেৎ ॥

স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হ-

৩৭। রেত বসুন্ধরাম্।

স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূর্ত্বা পিতৃভিঃ [ সহ পচ্যতে ][12] ॥

বহুভি র্ব[ সু ][13]ধা দত্তা রাজভিঃ সগ-

৩৮। রাদিভিঃ [ । ]

যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্ ॥

ইতি কমল-দা (দ)[14] [লা] ম্বু-বিন্দুলোলাং

৩৯। শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।

সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা

ন হি পুরুষৈঃ পর-

৪০। কীর্ত্তয়ো বি [লো][15]প্যাঃ ॥ ❊ ॥

---

১১। 'নরকে' হওয়া উচিত ছিল।

১২। এই শব্দ-দ্বয় অস্পষ্ট।

১৩। 'বসুধা' শব্দের 'সু' ক্ষোদিত নাই।

১৪। 'দলাম্বু'র 'লা' অক্ষর উৎকীর্ণ দেখা যায় না।

১৫। 'বিলোপ্যা' শব্দের 'লো' ক্ষোদিত হয় নাই।

১৬। এই স্থলের ০ এই চিহ্নটি টীকাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

## বঙ্গানুবাদ।

( ১ )

করুণার একমাত্র আধার, বন্দনার্হ সেই ভগবান্ ( ১ ) জিন [ বুদ্ধদেব ] এবং জগতের একমাত্র দীপ-সদৃশ তাঁহার ধর্ম্ম [ উভয়েই ] বিজয়-লাভ করুন। সকল মহানুভব ভিক্ষু-সংঘই তাঁহাদের [ বুদ্ধ ও ধর্ম্মের ] সেবা করিয়া সংসার-[ সাগর ]-পারে উপস্থিত হন।

( ২ )

বিপুল-লক্ষ্মীক, রোহিত······ভোগকারী, চন্দ্রদিগের বংশে, পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ পূর্ণচন্দ্র-নামক [ ব্যক্তি ] পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রতিমার পাদ-পীঠিকাতে সন্তানির অগ্রভাগে এবং টঙ্কোৎকীর্ণ-(২)নব-প্রশস্তি-সমন্বিত জয়স্তম্ভে ও তাম্রপট্টে তাঁহার নাম পঠিত হইত।

(৩)

যে ভগবান্ অমৃত-রশ্মি [ চন্দ্রমা ] ভক্তিবশতঃ [ বুদ্ধস্য ] বুদ্ধরূপী শশক-শিশুকে (৩) অঙ্কে ধারণ করিতেছেন,—সেই [ চন্দ্রমার ] কুল-জাত বলিয়াই যেন তাঁহার [ পূর্ণচন্দ্রের ] পুত্র সুবর্ণচন্দ্র জগতে (৪) "বৌদ্ধ" বলিয়া বিশ্রুত ছিলেন।

(৪)

(৫) জনশ্রুতি এইরূপ যে, এক (৬) অমাবস্যা-রজনীতে তাঁহার [সুবর্ণচন্দ্রের]

---

(১) জিনঃ—"সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।

সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিৎ লোকজিৎ জিনঃ॥" ইত্যমরঃ।

এই শ্লোকে রাজকবি বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘাখ্য ত্রিরত্নের উল্লেখ করিয়া নিজ প্রভুকে বৌদ্ধমতাবলম্বী বলিয়া সূচিত করিয়াছেন।

(২) অর্চ্চা—প্রতিমা "টঙ্কঃ পাষাণ-দারণঃ" ইত্যমরঃ। "টঙ্কৈর্মনঃশিলগুহেব বিদার্য্য-মাণা" ইতি মৃচ্ছকটিকে ১.২০। "পীঠমাসনম্" ইতি চামরঃ। সন্তানি-শব্দ পারিভাষিক বলিয়া বোধ হয়।

(৩) বুদ্ধদেব শশক-রূপে একবার ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এইরূপ এক পৌরাণিক কাহিনী বৌদ্ধ-জাতকমালায় বর্ণিত আছে। যব-দ্বীপের বোর-বুদুরের স্থাপত্য-শিল্পে বুদ্ধদেবের "শশক-জাতক" উৎকীর্ণ রহিয়াছে। "Monumental Java" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৪) সুবর্ণচন্দ্রচন্দ্রকুল-জাত, এবং চন্দ্রের সঙ্গে বুদ্ধদেবের [ উপর্য্যুক্ত টীকাতে উল্লিখিতরূপ ] সম্বন্ধ আছে—এই নিমিত্তই লোকে সুবর্ণচন্দ্রকে "বৌদ্ধ" বলিত।

(৫) কিল—ঐতিহ্যে।

(৬) দর্শ—"অমাবাস্যাত্বমাবস্যা দর্শঃ সূর্য্যেন্দুসঙ্গমঃ" ইত্যমরঃ। একত্র-স্থিত-চন্দ্রার্ক-দর্শনাদ্দর্শ

মাতা [ গর্ভাবস্থায় ] (৭) স্পৃহা-বশতঃ উদয়ি-চন্দ্র বিম্ব-দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, [ স্বামী কর্ত্তৃক ] সুবর্ণ-নির্ম্মিত চন্দ্র দ্বারা পরিতোষিতা হইয়াছিলেন,—এই নিমিত্ত লোকে [ তাঁহার পুত্রকে ] সুবর্ণ-চন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিত।

(৫)

[ মাতৃ-পিতৃ ] উভয়-কুল-পাবন, [ সুবর্ণ-চন্দ্রের ] পুত্রের অপবাদ-ভীরু ( ৮ ) গুণাবলী চতুর্দ্দিকে অতিথিরূপে ভ্রমণ করিত বলিয়া, সেই পুত্র ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র-নামে বিদিত হইয়াছিলেন। হরিকেল-রাজ্যের (৯) রাজচিহ্নসূচক পুত্র যে রাজ্য-লক্ষ্মীর হাস্যরূপে উদ্ভাসিত হইত, সেই রাজলক্ষ্মীর আধার, দিলীপোপম এই পুত্র চন্দ্রদ্বীপে (১০) 'নৃপতি' হইয়াছিলেন।

(৬)

চন্দ্রের কান্তা জ্যোৎস্না, ( ১১ ) ইন্দ্রের কান্তা শচী, হরের কান্তা গৌরী, এবং

(৭) দোহদ—"অথ দোহদং ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা-স্পৃহেহা-তৃড্‌বাঞ্ছা-লিপ্সা-মনোরথঃ, কামোহভিলাষস্তর্ষশ্চ"—ইত্যমরঃ। গর্ভাবস্থার স্পৃহার্থেই 'দোহদ' শব্দের প্রয়োগ। যথা, "প্রজাবতী দোহদ-শংসিনী তে"—রঘু, ১৪।৪৫। কিঞ্চ,—"যঃ কশ্চিদ্ গর্ভদোহদোঽস্যাঃ সোঽবশ্যমচিরাৎ সম্পাদয়িতব্য ইতি"—উত্তর-চরিতে ১ম অঙ্ক।

(৮) "স্যাৎ কৌলীনং লোকবাদে" ইত্যমরঃ। যথা, [ রঘু, ১৪।৮৪ ] "কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ"। নিন্দা-অর্থে প্রয়োগ—[ রঘু, ১৪।৩৬ ] "কৌলীনমাত্মাশ্রয়মাচচক্ষে তেভ্যঃ পুনশ্চেদমুবাচ বাক্যম্।"

(৯) হরিকেল—বঙ্গের প্রাচীন নাম। "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়া অঙ্গাশ্চম্পোপলক্ষিতাঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র পরে বঙ্গরাজ হইয়াছিলেন বলিয়াই রাজকবি তাঁহার পিতাকে "হরিকেলরাজ-ককুদচ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াং আধারঃ" রূপে বর্ণনা করিয়া থাকিতে পারেন।

(১০) চন্দ্রদ্বীপ—মধ্য-যুগে এই প্রদেশ বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ, খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশ-বিশেষ লইয়াই সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগল-সাম্রাজ্যে এই চন্দ্রদ্বীপই 'বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ' পরগণা নামে অভিহিত হইত। বিশ্বকোষে [ ষষ্ঠভাগ, ১৪৫ পৃঃ ] ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত "চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ" নামক গ্রন্থের প্রমাণে লিখিত হইয়াছে,—"বিক্রমপুর হইতে সমাগত দনুজমর্দ্দনদেবই চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা।" বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

(১১) জিষ্ণু—এই স্থলে ইন্দ্র-সমানার্থক। যথা, "জিষ্ণুর্লেখর্ষভঃ শক্রঃ শতমন্যুর্দিবস্পতিঃ" ইতি ইন্দ্র-পর্য্যায়ে অমরঃ। পুরুষোত্তম, সূর্য্য ও অর্জ্জুন অর্থেও 'জিষ্ণু' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

হরির কান্তা শ্রীর ন্যায়, পূজিত-শাসন এই নৃপতিরও শ্রীকাঞ্চনা-নাম্নী কাঞ্চন-কান্তি কান্তা ছিলেন।

(৭)

ইন্দ্রতেজাঃ নীতিজ্ঞ এই নৃপতি [ ত্রৈলোক্যচন্দ্র ] (১২) রাজযোগোপলক্ষিত শুভ-মুহূর্ত্তে প্রিয়ার [ শ্রীকাঞ্চনার ] গর্ভে (১৩) জ্যোতিষিক-সূচিত-রাজচিহ্নধারী ইন্দুপম তনয় শ্রীচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৮)

মূর্খ-জনের অবাধ্য (১৪) এই [ শ্রীচন্দ্র ] রাজ্যকে একাতপত্র-সুশোভিতা করিয়া এবং (১৫) অরিগণকে কারা-নিবদ্ধ করিয়া দিঙ্‌মণ্ডল যশঃ-সৌরভে আমোদিত করিয়াছিলেন।

শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত ( সংস্থাপিত ) জয়স্কন্ধাবার হইতে, মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেব পাদানুধ্যাত, পরমসৌগত ( বৌদ্ধ ), পরমেশ্বর, পরম-ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ, কুশলময়, সেই শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেব,—শ্রীপৌণ্ড্ভুক্ত্যন্তঃ-পাতী নান্য-মণ্ডলে, নেহকাষ্টিগ্রামে পাটক-পরিমিত ভূমিতে,—সমুপগত ( সংবিদিত ) সমস্ত (১৬) রাজপুরুষদিগকে, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য,

---

(১২) রাজযোগ—গ্রহ-নক্ষত্রাদির যে শুভযোগ-সময়ে জন্ম-গ্রহণ করিলে ভূমিষ্ঠ শিশু কালে 'রাজা' হইবে বলিয়া সূচিত হয়, সেই যোগকে 'রাজযোগ' বলে। 'শ্রীচন্দ্র' বঙ্গের 'রাজা' হইবেন, ইহাই এই শ্লোকে ইঙ্গিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আপ্তের অভিধানে এই শব্দটি এই ভাবে ব্যাখ্যাত,—"a configuration of planets, asterisms etc, at the birth of a man, which indicates that he is destined to be a king."

(১৩) মৌহূর্ত্তিক—"সাংবৎসরো জ্যোতিষিকো দৈবজ্ঞ-গণকাবপি ;
মুহূর্ত্তমৌহূর্ত্তিক-মৌহূর্ত্ত-জ্ঞানি-কার্ত্তান্তিকা অপি ॥" ইত্যমরঃ।

(১৪) বৈধেয়—"অজ্ঞ-মূঢ়-যথাজাত-মূর্খ-বৈধেয়-বালিশাঃ" ইত্যমরঃ। শ্রীচন্দ্র সর্ব্বদাই পণ্ডিত-মণ্ডল-পরিবেষ্টিত থাকিতেন, এবং তাঁহাদেরই 'বিধেয়' ছিলেন।

(১৫) এ স্থলে কোন 'অরি' সূচিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। হয় ত বর্ম্ম-বংশের শেষ-রাজাই শ্রীচন্দ্র-কর্ত্তৃক কারা-নিবদ্ধ হইয়া থাকিবেন ; এবং বৌদ্ধ শ্রীচন্দ্র এই ঘটনার পরেই বঙ্গের রাজ-সিংহাসন বর্ম্ম-রাজের হস্ত-ভ্রষ্ট করিয়া বিক্রমপুর-রাজধানী হইতে রাজ্যশাসন-পরিচালন আরম্ভ করিয়া থাকিবেন।

(১৬) নিম্নলিখিত শব্দ কয়টি ব্যতীত অন্যান্য রাজপাদোপজীবি-বিজ্ঞাপক শব্দগুলি ও প্রদত্ত ভূমির বিশেষণসমূহ "বল্লালসেনদেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন" ও "ভোজবর্ম্ম-দেবের বেলাব-লিপি" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ের টীকাতে দ্রষ্টব্য। [সাহিত্য, ১৩১৮ সনের অগ্রহায়ণ, ও ১৩১৯ সনের ভাদ্র সংখ্যা ]।

(১৭) মহাব্যূহপতি, (১৮) মণ্ডলপতি, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহাক্ষপটলিক ( লেখ্য-রক্ষক ), (১৯) মহা-সর্ব্বাধিকৃত, মহাপ্রতীহার (দৌবারিকশ্রেষ্ঠ), (২০) কোট্ট-পাল ( দুর্গ-রক্ষক ), দৌঃসাধ-সাধনিক (দ্বারপাল বা গ্রামপরিদর্শক), চৌরোদ্ধরণিক ( দস্যু-তস্করাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক পুলিস কর্ম্মচারিবিশেষ ), নৌবল-ব্যাপৃতক ( নৌ-সেনাধিকৃত পুরুষ ) হস্তিব্যাপৃতক ( গজাধ্যক্ষ ), অশ্ব-ব্যাপৃতক ( অশ্বাধ্যক্ষ ), গো-ব্যাপৃতক (গবাধ্যক্ষ), মহিষ-ব্যাপৃতক (মহিষাধ্যক্ষ), অজ-ব্যাপৃত ( ছাগাধ্যক্ষ ), অবিকাদি-ব্যাপৃতক (মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ), গৌল্মিক ( 'গুল্ম'-নামক সেনামণ্ডলীর অধিনায়ক ), (২১) শৌল্কিক ( শুল্ক-সংগ্রহকারী ), দাণ্ডপাশিক ( বধাধিকৃতক পুরুষ ), দণ্ড-নায়ক ( চতুরঙ্গ-বলাধ্যক্ষ ) বিষয়পতি ( জেলাধিপতি ) প্রভৃতি [ রাজকর্ম্মচারীদিগকে ] এবং অধ্যক্ষ-প্রচারোক্ত (অধ্যক্ষ-তালিকাভুক্ত) কিন্তু বর্ত্তমান-শাসনে [ পৃথক্ ভাবে ] অনুল্লিখিত অন্যান্য সমস্ত রাজপাদোপজীবীদিগকে,—চাট-ভট-জাতীয়-গণকে, ক্ষেত্রকরদিগকে এবং ব্রাহ্মণোত্তমদিগকে, যথাযোগ্য সম্মানপ্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন, এবং আজ্ঞা করিতেছেন। [ নিম্নোলিখিত বিষয়ে ] আপনাদের সকলের অভিমত হউক ; যথা, স্বসীমাবচ্ছিন্ন, তৃণপূতিগোচরপর্য্যন্ত, সতল, সোদ্দেশ আম্র-পনস-গুবাক-নারিকেল-বৃক্ষ-সমেত, (২২) লবণোৎপাদক ভূমি সহ, জল-স্থল-গর্ত্ত-উষর-ভূমির সহিত, যাহার ( অর্থাৎ যে ভূমি সম্বন্ধে প্রতিগ্রহীতার ) দশটি অপরাধ ( রাজার ) সহ্য হইবে, সচৌরোদ্ধরণা, সর্ব্বপ্রকার উৎপীড়ন-রহিত, চাট-ভট জাতির প্রবেশাধিকার-বিরহিত, যাহা হইতে কোনও প্রকার করাদি

(১৭) 'মহাব্যূহপতি'—শব্দটি বেলাব-লিপিতে ও হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনেও পাওয়া গিয়াছে।

(১৮) 'মণ্ডলপতি' শব্দটি অশেষ-শ্রদ্ধা-ভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের "মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। [ সাহিত্য, ১৩২০ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ]

(১৯) 'মহাসর্ব্বাধিকৃত'—শব্দটিও হরিবর্ম্মার ও ঈশ্বর ঘোষের তাম্র-শাসনে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধির সৃষ্টি, বোধ হয়, এই শব্দ হইতেই সাধিত হইয়া থাকিবে।

(২০) 'কোট্টপাল' শব্দটি পাল-পৃথ্বীপালগণের তাম্র-শাসনে বহুবার পাওয়া গিয়াছে।

(২১) 'শৌল্কিক' শব্দটি আধুনিক 'Custom officer'এর পদ-বিজ্ঞাপক বলিয়া প্রতিভাত হয়।

(২২) 'সলবণা'—ভূমির এই বিশেষণটি বেলাব-লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উৎসৃষ্ট ভূমিখণ্ড সমুদ্র-তীরবর্ত্তী ছিল, ইহাই কি এই বিশেষণের সার্থকতা ?

গৃহীত হইবে না (অর্থাৎ নিষ্কর করিয়া), রাজ-প্রাপ্য কর ও হিরণ্যাদি [ সর্ব্বপ্রকার ] আয়ের সহিত, উপরি-লিখিত এই ভূমি—মঙ্কর গুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহগুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গলগুপ্তের পুত্র, শাণ্ডিল্য (?) সগোত্র, ত্র্যর্ষিপ্রবর, (২৩) শান্তি-বারিক, (২৪) কোটি-হোম-সম্পাদনকারী (?) শ্রীপীতবাসগুপ্ত-শর্ম্মাকে —যথাবিধি উদক-স্পর্শ-পূর্ব্বক ভগবান্ বুদ্ধ-ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া, পিতামাতার এবং নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য, যাবৎ-সূর্য্যচন্দ্র, এবং ক্ষিতিসমকাল-পর্য্যন্ত, ভূমিচ্ছিদ্র-ন্যায়ানুসারে শ্রীমদ্-ধর্ম্মচক্র-মুদ্রা দ্বারা তাম্রশাসন করিয়া প্রদান করিলাম। অতএব, আপনারা সকলেই ইহার অনুমোদন করুন। ভাবি-ভূপতিগণও ভূমি-দান-ফল-গৌরব ও তদপহরণে মহানরক-পাত-ভয় [ স্মরণ-করিয়া ] এই দান অনুমোদন-পূর্ব্বক পরিপালন করিবেন, এবং প্রতিবাসী ক্ষেত্রকরগণও এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া যথোচিত প্রত্যায় [ প্রতিগ্রহীতার নিকট ] উপস্থিত করিবে। এই অভিপ্রায়ে ধর্ম্মানুশাসনের শ্লোকও আছে [ যথা ]—

১। যিনি ভূমির প্রতিগ্রহ করেন, এবং যিনি ভূমি-দান করেন, তাঁহারা উভয়েই পুণ্যকর্ম্মা এবং উভয়েই নিয়ত স্বর্গগামী হন।

২। ভূমিদাতা ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গ-ভোগ করেন, এবং ভূমির অপহর্ত্তা ও [ অপহরণের ] অনুমোদনকারী তৎপরিমিত কাল নরকে বাস করেন।

৩। ভূমি স্বদত্তই হউক, আর পরদত্তই হউক, যিনিই ইহা হরণ করিবেন, তিনিই বিষ্ঠার (২৫) কৃমি হইয়া পিতৃগণ সহ পচিতে থাকিবেন।

৪। সগরাদি অনেক নৃপতিগণ ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যখন যাঁহার ( যে নৃপতির ) ভূমি, তখন [ ভূমিদানের ] ফল তাঁহারই হইয়া থাকে।

৫। লক্ষ্মীকে এবং মনুষ্য-জীবনকে পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুবৎ চঞ্চল মনে করিয়া, এবং [ উপরি ] উদাহৃত সমস্ত বিষয় স্মরণ রাখিয়া, কোনও ব্যক্তিরই পরকীর্ত্তির লোপ-সাধন কর্ত্তব্য নয় (২৬) ॥ ০ ॥

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

---

(২৩) 'শান্তি-বারিক'—যজ্ঞের শান্তি-জলাধিকৃত ব্রাহ্মণকে লক্ষিত করিয়া থাকিবে।

(২৪) 'হোমি'—এই শব্দটি ঘৃত, জল, বহ্নি ও চিত্রক-বৃক্ষ অর্থে প্রযুক্ত। এই স্থলে ইহার অনলার্থ গ্রহণ করিয়া 'কোটি-হোমি'কে 'কোটি-হোম'-সমানার্থক ধরা যাইতে পারে।

(২৫) 'ক্রিমি'—'কৃমি' রূপেও পঠিত হয়।

(২৬) এই ০ কেন্দ্র-চিহ্নটি কি সূচিত করিতেছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। লিপি-শেষ-বিজ্ঞাপক চিহ্নও হইতে পারে; ইহা দ্বারা বৌদ্ধদিগের শূন্য-বাদও সূচিত হইয়া থাকিতে পারে। ইহা তাম্রশাসন সম্পাদন-বিজ্ঞাপক শ্রীচন্দ্রের সাঙ্কেতিক স্বাক্ষর বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে।



খ্রীষ্ট ও সেণ্ট জন।

চিত্রকর—বুশার।



ভেনস্ ও কিউপিড্।

Mohila Press, Calcutta.

# বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতি।

## প্রীতি, বিশ্বাস, আশা।

যখন কোনও উৎকৃষ্ট চিন্তা মনে আইসে, কোনও সুন্দর ভাব হৃদয়ে উদিত হয়, তখন আনন্দ হয়। নিজে যে আনন্দ ভোগ করিয়াছে, তাহা অন্যকে দিবার ইচ্ছা হয়। মনুষ্যের এমনই একটা প্রবৃত্তি আছে যে, সে নিজে যে ঐশ্বর্য্য পায়, তাহা সে একক ভোগ করিতে পারে না; তাহা বিতরণ করিতে না পারিলে ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ সফলতা হয় না। মনুষ্য অন্যকে সুখী না করিয়া নিজে সুখী হইতে পারে না। নিজের উত্তম চিন্তা ও উদার ভাব দ্বারা সমাজকে সুখী করিবার চেষ্টা হইতে সাহিত্যের উদ্ভব হয়। সুতরাং সাহিত্যের মূল সমাজ-প্রীতি। যেমন পুণ্যসলিলা ভাগীরথী গিরিশৃঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া, দুই পার্শ্বে বসুন্ধরাকে শস্যশালিনী প্রাণদায়িনী করিয়া সাগরসঙ্গমে উপনীত হয়, তেমনই সাহিত্যধারা উন্নত হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া, সমাজকে সুচিন্তা ও সুভাব দ্বারা উন্নত, পবিত্র ও আনন্দময় করিয়া, অমরত্বের দিকে প্রধাবিত হয়। সাহিত্য জাতীয়-জীবনের জননী। দেশে যে সকল উচ্চ প্রবৃত্তির লোক জন্ম-গ্রহণ করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের উচ্চচিন্তা ও মহদ্ভাব সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত করেন; সাধারণ লোক, সেই উচ্চচিন্তায়, সেই উচ্চ ভাবে উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া, মহত্তর জীবন লাভ করে। তখন চিন্তাশক্তি ও ভাবশক্তি কার্য্যশক্তিতে পরিণত হয়। তখন গ্রন্থকারের নির্জ্জন কক্ষে লিখিত নীরব ভাষা সমাজে ধ্বনিত হয়; তখন তাহা দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় গুরুতর ঘটনার বড় বড় অক্ষরে অঙ্কিত ও শব্দিত হয়। তখন প্রতিভা চপলা জাতীয়-জীবন-গগনে চমকিতে থাকে, বজ্রনাদে বসুমতী কাঁপিতে থাকে। তখন সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়। সাহিত্য জাতীয়-হৃদয় উর্ব্বর করে, সুচিন্তার বীজ বপন করে, জাতীয় চরিত্রের গঠন করে। মহৎ ও মঙ্গলজনক বিষয়ের দিকে সমাজে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেওয়া সাহিত্যের অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য।

সাহিত্য যেমন জাতীয় ঘটনা পরিচালিত করে, তেমনই আবার জাতীয় ঘটনার দ্বারা, সমাজের অবস্থা দ্বারা, সাহিত্য নিজে পরিচালিত হয়। সাহিত্য ও সমাজ, এই উভয়ের মধ্যে নিয়ত ঘাত ও প্রতিঘাত চলিতেছে। যে জাতির

কার্য্য যে প্রকার, তাহার সাহিত্যও সেইরূপ হয়। যখন জাতীয় জীবনে কার্য্যের উদ্যম হইবে, ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস হইবে, তখন তাহা জাতীয় সাহিত্যে নিশ্চিতই প্রতিফলিত হইবে। তাই বিচক্ষণ সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন যে, রাজ্ঞী এলিজেবেথের সময়ের গৌরবময় কার্য্যাবলীর ফল সেক্ষপীয়ার। সুতরাং কর্ম্মিগণ পরোক্ষে সাহিত্যের সাধক ও উৎপাদক। কোনও জাতির জীবন ও চরিত্র ভাল হইলে, তাহার সাহিত্যও ভাল হইবে। আবার, তাহার সাহিত্য ভাল হইলে, তাহার জীবনও ভাল হইবে। আর সমীচীন সমালোচনা, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, দোষগুণবিচারক্ষম সমালোচনা, নিরপেক্ষ উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা প্রস্তুত করে। উত্তম সাহিত্যের বিকাশের জন্য দক্ষ ও নিপুণ সমালোচনার বড়ই প্রয়োজন। সভাতে সমজদার না থাকিলে গায়কের গান করিবার উৎসাহ থাকে না। তবে সমাজে সাহিত্যের সমজদার না থাকিলে সাহিত্যসেবীদিগের উৎসাহ থাকে না। উচ্চদরের প্রতিভা কালপ্রতীক্ষা করিতে পারে। ভবভূতির ন্যায় সে বলিতে পারে, "কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।"

সাহিত্যসেবীর নিজের চিন্তার ও ভাবের উপর বিশ্বাস চাহি। তাহা যে বর্ত্তমান কালেই হউক বা ভবিষ্যতে হউক, সমাজের আনন্দ ও মঙ্গলজনক হইবে, সে বিষয়ে তাহার দৃঢ় প্রতীতি চাহি। আর সমাজ বা মনুষ্য যে ক্রমেই উন্নত হইবে, সে বিষয়েও সাহিত্যসেবীর অচলা আশা থাকা চাহি। যেমন ধর্ম্মপ্রচারকের প্রীতি, বিশ্বাস ও আশা না থাকিলে তিনি প্রচার কার্য্য করিতে পারেন না, তেমনই সাহিত্যসেবীর প্রীতি, বিশ্বাস ও আশা না থাকিলে, তিনি সাহিত্যে প্রচার কার্য্য করিতে পারেন না। বিশ্বাস অর্থে অন্ধবিশ্বাস নহে। যে সাহিত্য-ভাণ্ডার জগতে এতকাল ধরিয়া সঞ্চিত হইয়াছে, যত দূর সম্ভব, সাহিত্যসেবীর তাহা অধিকার করা আবশ্যক। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারদিগের সুচিন্তা নূতন সুচিন্তা প্রসব করে; নিজের কোনও বিষয়ে ভ্রম থাকিলে তাহা সংশোধিত হয়, যে সকল রত্ন সাহিত্য-ভাণ্ডারে রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে বৃথা কালব্যয় হয় না। যাহা জগতে ঘটিয়াছে, যে সকল সুগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, কেবল তাহারই আলোচনা করিলে চলিবে না। সমাজে চতুর্দ্দিকে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা, সমাজের অভাব, সুখ, দুঃখ গভীর ভাবে অনুভব করিতে হইবে; সমাজের দুঃখের ও সুখের সহিত নিজের হৃদয় এক করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে অকৃত্রিম সাহিত্য, মৌলিক সাহিত্য

যুদ্ধ হইতেছে, পাপ ও পুণ্যের, সুমতি ও কুমতির সমর চলিতেছে, সমাজে তাহারই অনুরূপ ক্রিয়া চলিতেছে। সমাজে ধর্ম্মের দেবকন্যাকে অধর্ম্মের রাক্ষস সতত ধরিবার ও নিপীড়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই রাক্ষসের হস্ত হইতে দেবকন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য, সমাজের অবিরাম চেষ্টা চলিতেছে।

সমাজে ক্ষুদ্র বলবান সম্প্রদায় বৃহৎ দুর্ব্বল সম্প্রদায়ের নিগ্রহ করিয়া, অবৈধরূপে আত্মসুখ বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা ও চক্রান্ত করিতেছে। তাহা হইতে দুর্ব্বল সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার প্রয়াস ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে এ কাল পর্য্যন্ত চলিতেছে। এই বিগ্রহে, সাহিত্য, দেবকন্যার সহায়; দুর্ব্বল নিপীড়িত-সম্প্রদায়ের ভরসা; নিপীড়িত জনসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য, সুচিন্তা ও সুভাব অস্ত্র ধারণ করিয়া, সাহিত্য নিপীড়কদিগকে নিরস্ত করে; শান্তির পথে আনয়ন করে; পীড়ক ও পীড়িতের মধ্যে সদ্ভাব ও সন্ধি স্থাপিত করে; পরস্পরের সুখে পরস্পরকে সুখী হইতে শিখায়; সংক্ষেপে সাহিত্য মানুষকে পশুভাব হইতে দেবভাবে লইয়া যায়। আবার, জড়জগৎ নিষ্ঠুরভাবে মনুষ্যকে নিষ্পিষ্ট করিবার, ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে। সাহিত্য সমাজকে ঐ আততায়ী জড়প্রকৃতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত, আত্মরক্ষার জন্য জাগরিত করে। দুঃখের বিষয়, আজিও আমাদের দেশে লোকে ইহাকে "ধান ভানিতে শিবের গান" বিবেচনা করেন। তজ্জন্য কি কি বিষয় সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহা একটু বিস্তৃতভাবে লেখা আবশ্যক।

অনেকে বলিবেন, মোকর্দ্দমা সাহিত্যের অন্তর্গত নহে। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নামে যে মোকদ্দমা হইয়াছিল, তাহাতে বর্ক যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা কি উচ্চ-অঙ্গ সাহিত্যের অন্তর্গত নহে? বর্ক দেবী সিংহের অত্যাচার তাঁহার যে জ্বালাময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে অদ্যাপি পাঠকের হৃদয় কখনও বা করুণ-রসে দ্রবীভূত হয়; কখনও বা ক্রোধে থর-থর কাঁপিতে থাকে; কখনও বা দুঃখে বুক যেন ফাটিয়া যায়। এই বক্তৃতা কি সাহিত্য নহে? ইতিহাস-পাঠে জানিতে পারি যে, অযোধ্যার বেগমদিগের উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল, সেরিডান তদ্বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রোতৃবর্গ দুঃখ ও করুণ ও রৌদ্র ভাবের উচ্ছ্বাসে এমন অধীর ও অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তখন তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিচারকার্য্যে অক্ষম হইয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই বক্তৃতার যে অংশ রক্ষিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া কে বলিবেন—তাহা সাহিত্য নহে?

ন্যায়কে রক্ষা করিবার জন্য, অত্যাচারীকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য, রক্তচক্ষু ন্যায়পরায়ণ সাহিত্য দণ্ড হস্তে উত্থিত হইয়াছিল। লর্ড ব্রুম ইংলণ্ডের রাজ্ঞী ক্যারোলাইনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রকোপে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, যে সুন্যস্ত বাক্যপরম্পরায় ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্য। লর্ড আর্স্কাইন একটা পরিনিন্দার অপরাধের মোকদ্দমায় আমেরিকার এক আদিমনিবাসী অসভ্য জাতির স্বাধীনতা-প্রিয়তা সম্বন্ধে এমন একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, লর্ড ব্রুম লিখিয়াছেন যে, তাহা কেবল সাহিত্য নহে, সেই গদ্যের মধুর শব্দ-বিন্যাসে এমন লয় আছে যে, তাহা ভাগ করিয়া পড়িলে অমিত্রাক্ষর কবিতা হইয়া যায়। সুতরাং তাহা উচ্চদরের সাহিত্য। কলিকাতার হাইকোর্টে আমীর খাঁর পক্ষে ব্যারিষ্টার ইংগ্রাম যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে সুন্দর ভাব ও ললিত ভাষার এমন সমন্বয় হইয়াছিল যে, তাহাও সাহিত্যের অন্তর্গত।

জগতে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে প্রজাগণের দুরবস্থা সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়। প্রজাদিগের উপর এ দেশে এক সময় নীলকরগণ যে অত্যাচার করিত, সেই অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য, স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহোদয় কি চমৎকার সাহিত্যের রচনা করিয়াছিলেন! সে অত্যাচার চলিয়া গিয়াছে, তথাপি "নীলদর্পণে"র মনোহারিতা কমিয়া যায় নাই। তাহা স্থায়ী সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

"বঙ্গদেশের কৃষক" সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু যে প্রবন্ধাবলী লিখিয়াছেন, তাহা সাহিত্য। স্বদেশপ্রীতি বা মানবপ্রীতি হইতে তাহার উদ্ভব হইয়াছে। তাহার মূলে ধর্ম্মজ্ঞান বিদ্যমান। তাহা পাঠে রসের সঞ্চার হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায়, মনুষ্যমধ্যে নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন, এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজমধ্যে জানাইতে জানে না। যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে। * * * যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্ত্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক।" এইটুকু লেখার মধ্যে বঙ্কিম বাবু বঙ্গীয় কৃষকদিগের জন্য যে এক বিন্দু অশ্রুপাত করিয়াছেন, তাহাতে "সাহিত্য-পরিষদে"রও "সাহিত্য-সম্মিলনে"র প্রবন্ধরাশি ভাসিয়া যায়; এবং সাহিত্য যে কি, বঙ্গীয় লেখকদিগের যে কি কর্ত্তব্য, তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। ফলতঃ সমাজের সুখ দুঃখ লইয়া এক্ষণে আমাদের সাহিত্য

গঠিত হইবে। প্রকৃত সাহিত্য প্রীতিমূলক দৃঢ় বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, তাহা সঞ্জীবনী আশার সঞ্চার করে। বঙ্গদেশ এখন সেই সাহিত্য চাহে।

ক্রমশঃ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

---

# বংশানুক্রম।

শেষ।

বংশানুক্রম ও সমাজ।

বংশানুক্রম যে সকল নিয়মানুসারে পরিচালিত হয়, তন্মধ্যে গুরুতর নিয়ম কয়েকটি সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে, কতিপয় সামাজিক অনুষ্ঠানের উপর ঐ সকল নিয়মের প্রভাব কিরূপ, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব।

কিন্তু প্রথমেই একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বংশানুক্রম শাস্ত্র জীবতত্ত্বের অন্তর্গত; জীবতত্ত্বের, সুতরাং বংশানুক্রমের কোনও নিয়ম জীবের হিসাবে নির্দ্দোষ হইলেই যে সমাজের হিসাবেও নির্দ্দোষ হইবে, তাহা নহে। অপরিণীতার সন্তান জীবের হিসাবে নির্দ্দোষ হইতে পারে; কিন্তু সমাজের হিসাবে সদোষ, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। শ্যালীকে বিবাহ করিলে জীবতত্ত্ব কোনও দোষ দেখিবে বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু সমাজ কখনও তাহাকে অপকারী বিবেচনায় দোষাবহ গণ্য করে, কখনও বা করে না। যাহা হউক, কোনও বিধান জীবতত্ত্বানুসারে নির্দ্দোষ গণ্য হইলেও, সমাজতত্ত্বানুসারে সদোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, ইহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

আমরা এ স্থলে কতিপয় আচার অথবা অনুষ্ঠানের আলোচনা করিব। এ আলোচনায় জীবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব, উভয়ের তুলনা আবশ্যক। কারণ, সমাজতত্ত্বও এক অংশে জীবতত্ত্বের অধীন।

বিবাহ।

বংশানুক্রমের সহিত সহিত বিবাহ-সংস্কার এক সূত্রে আবদ্ধ; কারণ, বিবাহই সমাজমধ্যে বংশানুক্রমের প্রবর্ত্তক কারণ। যদিও বিবাহ ব্যতীত পরবংশ গঠিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সভ্য-সমাজে নানাবিধ অমঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ব্যভিচার ও বন্ধ্যাত্ব, অসংযম ও নৈতিক অবনতির

নিত্য সহচর। উহার ফলে ব্যক্তির দেহের ও মনের অবনতি ঘটে, সমাজও অধঃপতিত হয়। যাহা হউক, বিবাহই যখন বংশানুক্রম-প্রবর্ত্তনের বৈধ কারণ, তখন পরবংশ উন্নত ও যোগ্য দেখিতে ইচ্ছা করিলে বিবেচনামত যোগ্য নরনারীদিগকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা আবশ্যক। (১) যাঁহারা সুস্থ, গুণ-বান ও কৃতী, তাঁহারা পরবংশ গঠন করিলে সমাজ যোগ্যতায় উন্নীত হয়; কিন্তু যাহারা অসুস্থ, সমাজদ্রোহী ও অকৃতী, তাহারা পরবংশ গঠন করিলে সমাজ অযোগ্যতাবশতঃ অধঃপতিত হইয়া যায়। সুতরাং যোগ্য ব্যক্তিগণই পরবংশ গঠন করিবেন। কিন্তু অযোগ্যগণও ত সন্তান-উৎপাদন করে; তাহা নিবারণ করা অসম্ভব। এরূপ স্থলে দেখিতে হয় যে, অযোগ্যগণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি না পায়। যোগ্য বংশে যে অনুপাতে অপত্য জাত হয়, তাহার অনেক অল্প অনুপাতে অযোগ্য বংশের বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। শুধু বংশ-বৃদ্ধি নহে, সামাজিক অথবা রাজনীতিক যে কোনও কারণে অযোগ্যগণ অতিরিক্ত অনু-পাতে বংশবৃদ্ধি করিয়া ধনে ও গৌরবে সমাজমধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, সেই কারণেই সমাজের অমঙ্গলজনক অযোগ্যগণের অন্নসংস্থান ও গৌরব রাজা অথবা সমাজের অগ্রণী ব্যক্তিগণ অনেক সময় নানা কারণে বর্দ্ধিত করিয়া দেন। ইহাতে তাহাদিগের বংশধরগণের দারপরিগ্রহ কার্য্যে অনেক সুবিধা ঘটে; সুতরাং অযোগ্য অপত্যের সংখ্যা সমাজে বাড়িয়া যায়; তাহার ফলে সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (২) এ দেশে বর্ত্তমান সময়ে বিবাহকার্য্য যেরূপ ভাবে সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ হইতেছে, ইহাতে যোগ্যা-যোগ্য বিবেচনা করিবার অবকাশ নাই। সুতরাং নিশ্চয়ই বহু অযোগ্য কর্ত্তৃক পরবংশ অতিমাত্রায় গঠিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে জাতীয় অধঃপতন অনিবার্য্য। যাহারা দেহে ও মনে অসুস্থ, এবং অকৃতী, তাহাদিগের

---

(১) The offspring of worthy parents are, on the whole, more highly gifted by nature with faculties that conduce to worthiness than the offspring of less worthy persons. Galton's Essays in Eugenics P. 106.

(২) If any social opinions or class prejudices tamper with the fertility of the better stock, then the national character will take but a few generations to be seriously modified.—Pearson's National Life p 45.

আধিক্য অপেক্ষা সমাজধ্বংসকর ব্যাপার আর কিছুই নাই। (৩) সুতরাং সমাজ-স্থিতির ও সামাজিক উন্নতির প্রথম কথাই,—যোগ্যে যোগ্যে বিবাহ।

এ স্থলে বিবাহ-ক্ষেত্রের কথাও বিবেচনা করিতে হয়। বিবাহ-ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ না থাকিলে যোগ্য অযোগ্য বাছিয়া লইবার সুবিধাই থাকে না; এবং দীর্ঘ-কাল ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকিলে অপত্যে একটা জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং যে সমাজে বিবাহ-ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, তাহাদিগের মধ্যে স্বীয় গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করাও আবশ্যক হইতে পারে; এবং স্ব-সমাজে পাওয়া অসম্ভব হইলে, অন্য সমাজ হইতেও বর-কন্যা গ্রহণ করা আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু ঐ অন্য সমাজ নিতান্ত বি-সম না হয়। কারণ, নিতান্ত বি-সম -ধাতু নরনারীদিগের অপত্য [ ফিরিঙ্গীদিগের ন্যায় ] আরও অধঃপতিত হয়। শুক্রশোণিতগত যে সকল দানার উপর বংশানুক্রম নির্ভর করে, তাহারা চিরা-গত সংস্থান অপেক্ষা নিতান্ত বি-সম সংস্থান সহ্য করিতে পারে না।

আর একটি কথা এই আলোচনার সহিত আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি বংশানুক্রমের নিয়ম সকল নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং বীজ-গত লক্ষণই প্রবল হইল, পারিপার্থিক অবস্থা প্রবল হইল না, তবে আমরা শিক্ষা ও সংসর্গ ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর যত মনোযোগ দিয়া থাকি, বংশ-সংশোধনে তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত; নচেৎ সমাজ উন্নত থাকিতে পারে না। শুক্র ও শোণিত (৪) এই দ্বিবিজ বীজ-কোষের উপর বংশানুক্রম নির্ভর করে; তাহাদিগের সংমিশ্রণের পর ঐ যুক্ত-কোষের মধ্য হইতে কিছুই বাহির করিয়া লওয়া যায় না, এবং উহার মধ্যে কিছুই প্রবেশ করাইয়া দেওয়াও যায় না। এ সকল কার্য্য মানবের সাধ্যাতীত। (৫) তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বীজগত লক্ষণকে প্রকাশিত অথবা অপ্রকাশিত করিতে পারে, এইমাত্র। বীজ-মধ্যে যাহা নাই, তাহা দিতে পারে না। সুতরাং শিক্ষা ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপেক্ষা বংশ-সংশোধনে অনেক অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। চরিত্র

শিক্ষা।

---

(৩) The dearth of brains and dearth of physique are the worst misfortunes that can befall a nation. I bid p 56.

(৪) স্ত্রী-কোষ এবং পুং-কোষ।—

(৫) We have no experience of any means by which transmission may be made to deviate from its course; nor from the moment

বংশানুক্রমের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে; যোগ্যতাও তাহাই। স্পেন্সার বলেন, "Inherited constitution must ever be the chief factor in determining character অর্থাৎ, স্বভাব, পূর্ব্বপুরুষাগত ধাতুর উপর মুখ্যভাবে নির্ভর করে। বিষ্ণুশর্ম্মা বহুদিন পূর্ব্বে ঐ কথাই বলিয়াছেন,—

ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।
স্ব-ভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ॥

কিন্তু তাই বলিয়া "বেদাধ্যয়নের" আবশ্যকতা নাই, এমন নহে। সকল বিষয়েই অধিকারি-ভেদ অছে। শিক্ষা সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। যাহা হউক, শিক্ষা না হইলে যখন বীজ-গত লক্ষণের ঈপ্সিত বিকাশ হয় না, তখন বীজ-গত লক্ষণের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষা করিয়া আবশ্যক শিক্ষার বিধান কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে প্রতিভাত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির বংশানুক্রমিক বীজ-গত লক্ষণ বিভিন্ন; সুতরাং তাহাদিগের শিক্ষাও বিভিন্ন প্রকার হওয়া আবশ্যক। যাহার সমাজের হস্ত পদ, অর্থাৎ, যাহারা ভিন্ন সামাজিক কর্ম্ম এবং গুরুতর ও বহু-বিস্তৃত কর্ম্ম হইতেই পারে না, যাহারা স্বয়ং ঐ সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করে তাহা-দিগের শিক্ষা কর্ম্মমূলক হইবে; এবং যাহারা সমাজের মস্তিষ্ক-স্বরূপ, যাহাদিগের চিন্তার ফলে সমাজ উত্তরোত্তর উন্নত ও গৌরবান্বিত হয়, তাহাদিগের শিক্ষা জ্ঞানমূলক হওয়া উচিত। কিন্তু এতদুভয়ে বিরোধ ও ব্যবধান থাকা উচিত নহে। এই দুই শ্রেণী পরস্পর পরস্পরের সহায়। জ্ঞান ও কর্ম্ম, উভয় উভয়কে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করে। তাহা হইলেও সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, শিক্ষা ও সংসর্গ অপেক্ষা বংশ-সংশোধনেরই বহুগুণ অধিক প্রযত্নে নিয়োগ আবশ্যক। (৬) শিক্ষার ফল বংশগত নহে; প্রত্যেক পর-পর-বংশীয়

---

of fertilization can teaching or hygiene or exhortation pick out the particles of evil in that zygote or put in one particle of good. From seeds in the same pod come sweet peas climbing five feet high, while their own brothers lie prone upon the ground. The stick will not make the dwarf peas climb, though without it the tall can never rise. Batason.

(৬) Nurture and Education may immensely aid the social machine, but they must be repeated generation by generation they will not in themselves reduce the bad stock.—National Life

ব্যক্তিগণকেই নূতন করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। নচেৎ সুফল স্থায়ী হয় না। শিক্ষা ইত্যাদি বীজগত অধঃপতনের সংশোধন করিতেও সমর্থ হয় না। তবে, বীজগত উত্তম লক্ষণকে যথাসাধ্য বিকশিত করিয়া সমাজের বহু উপকার সিদ্ধ করিতে পারে।

চক্রবর্ত্ত এবং আকস্মিক উন্নতি।

মানব-সমাজের উন্নতি অবনতির পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যেন সমাজ কোনও সময়ে উন্নত হইতেছে, এবং অন্য সময়ে অবনত হইতেছে। কিন্তু উন্নতি অবনতি কিছুই স্থায়ী হইতেছে না। জীব-বিবর্ত্তনেও তাহাই দেখা যায়। ইতর জীবগণের মধ্যেও দেখা যায় যে, কোনও জীব দেহবিধানে উন্নত হইতে হইতে অকস্মাৎ অবনত হইয়া গেল; হয় ত সম্পূর্ণরূপে তাহার ধ্বংসই হইয়া গেল। মানব-সমাজেরও ধ্বংস হইতে পারে। যে সকল মানবসমাজের ধ্বংস হইয়াছে, তাহারা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার উপর জয়ী হইতে পারে নাই। ইতর জীবগণের ধ্বংস হইবারও প্রধান কারণ তাহাই। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থা যখন জীবের উপর, অথবা সমাজের উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার করে, তখন সে জীব অথবা সমাজ ধ্বংসাভিমুখ। এই অবস্থার উপর জয়ী হইলে রক্ষা, নচেৎ ধ্বংস অনিবার্য্য। ধ্বংসের সর্ব্বপ্রধান কারণ,—জনন-হীনতা। এই দুরবস্থা উৎপন্ন হইলে ব্যক্তিও যেমন, সমাজও তেমনই, আজি হউক, কালি হউক, ধ্বসপ্রাপ্ত হইবেই।

সমাজের উন্নতি, অবনতি ও ধ্বংস, তিনই সাধারণতঃ মৃদুগতি; অর্থাৎ, ক্রমশঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে। জীববিবর্ত্তনও ক্রমিক বলিয়া অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করেন। কিন্তু ডি. ভ্রিজ, মর্গান, টম্‌সন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন যে, জীববিবর্ত্তন ক্রমিক নহে; উহা আকস্মিক ব্যাপার। ডি. ভ্রিস্ বলেন, কোনও জীব এক দিকে, অথবা একাধিক দিকে অকস্মাৎ অল্পবিস্তর এরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, যাহা বংশানুক্রমে স্থায়ী হয়। তখন এক জীব অকস্মাৎ অন্য জীবে বিবর্ত্তিত হইয়া যায়। (৭) এই মত এখন পণ্ডিতসমাজে ক্রমে অধিকতর আদৃত

(৭) The current belief assumes that species are slowly changed into new types. In contradistinction to this conception, the theory of mutation assumes that new species and varieties are produced from existing forms by sudden leaps......Varieties and species.

হইতেছে। এই অকস্মাৎ-বিবর্ত্তনের মূল বীজ-গত। এই মত স্মরণ রাখিলে সমাজের অনেক বীজ-গত আকস্মিক পরিবর্ত্তন বুঝা কঠিন হয় না। এইরূপ পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইয়া সমাজকে এক রূপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ রূপে বিবর্ত্তিত করে। যে সমাজ সর্ব্বদা বনে বনে ঘুরিয়া পশু শিকার করে, তাহা অত্যল্প কালমধ্যে নির্দ্দিষ্ট গ্রামবাসী ও কৃষিজীবী হইতে পারে। যে সমাজে ব্যবসায়মূলক জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত, তাহাতেও অনতিবিলম্বে এক জাতি অন্য জাতির ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে। যে সমাজে সকল বস্তুই এজমালী, স্ত্রী পর্য্যন্ত এজমালী, তাহাতে অত্যল্পকালমধ্যে ব্যক্তিগত অধিকার প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। যে সমাজ রাজতন্ত্রমূলক, তাহাও অনতিবিলম্বে (রাজার শির-শ্ছেদ করিয়াই হউক, অথবা না করিয়াই হউক,) প্রজাতন্ত্রমূলক হইয়া উঠিতে পারে। এই সকল বীজগত পরিবর্ত্তন প্রায়ঃই অকস্মাৎ (by sudden leaps) সিদ্ধ হয়, ক্রমশঃ হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অস্থায়ী বাহ্য পরিবর্ত্তন অনেক স্থলেই ক্রমশঃ হয়। কখনও বা অত্যল্পকালেই হইয়া উঠে; যেমন, বিবাহ বিষয়ে জাতিভেদ। যাহা হউক, সামাজিক স্থায়ী ও বংশগত পরিবর্ত্তন সমা-জের মূলকে, বীজকে পরিবর্ত্তিত করে; কিন্তু অস্থায়ী পরিবর্ত্তন কেবল বাহ্য। বাহ্য পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ অনুকরণ দ্বারা সিদ্ধ হয়; তাহার সহিত উপ-কারবোধও কিঞ্চিৎ জড়িত থাকিতে পারে; যেমন, আমরা প্রধানতঃ অনুকরণ-বশতঃই হেট্ কোট্ পরিধান করি; কিন্তু তাহাতে কখনও যে রেল-পথে ভ্রমণকালে কোনও উপকার হয় না; এমন নহে! পক্ষান্তরে, সামাজিক বীজগত পরিবর্ত্তন জ্ঞানমূলক; উপকারবোধই অগ্রণীদিগকে প্রবর্ত্তিত করে; তাঁহারা বংশানুক্রমে সেই ভাবের অধিকারী অথবা উপযোগী হইলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারেন! তৎপর ইতর সাধারণ সেই অগ্রণী, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অনুকরণ দ্বারা ঐ পরিবর্ত্তনকে সমাজমধ্যে বিস্তৃত ও স্থায়িত্ব প্রদান করে। বীজগত পরি-বর্ত্তন কেহ নষ্ট করিতে পারে না। উহা নষ্ট করিতে হইলে সমাজের ধ্বংস করিতে হয়। কিন্তু বাহ্য পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই অস্থায়ী। কোনও পরিবর্ত্তন বাহ্য ভাবে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে সমাজের বীজগত, ধাতুগত হইতে পারে; এবং কোনও পরিবর্ত্তন কিয়দংশে বীজগত ও অপরাংশে বাহ্য হইতে পারে। (৮) যাহারা বংশানুক্রমে দেহে ও মনে যে পরিবর্ত্তনের উপযোগী, সেই পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্যবিধ

(৮) বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন বোধ হয় এই শ্রেণীর।

পরিবর্ত্তন স্থায়ী হয় না ; কিন্তু অন্যবিধ পরিবর্ত্তন ঐ পরিবর্ত্তনের সহিত অবান্তর ফলরূপে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে।

এক্ষণে সমাজের ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ শ্রেণীর অবস্থার সহিত বংশানুক্রমের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কোনও সমাজে ধন দ্বারাই সামাজিক উচ্চ নীচ শ্রেণী সূচিত হয় ; অন্য সমাজে জাতিভেদ দ্বারা উচ্চ-নীচ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানব সকলেই সমান নহে ; মানুষে মানুষে দৈহিক ও মানসিক প্রভেদ চিরন্তন। অতি অসভ্য সময় হইতে বর্ত্তমান সভ্য সময় পর্য্যন্ত, মানুষে মানুষে প্রভেদ চিরদিনই জন্ম-গত, সুতরাং বীজ-গত। অসভ্য-সমাজে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী, সাহসী, কৌশলী ও প্রতিভাসম্পন্ন, সেই দলপতি হয় ; অন্যে তাহার অনুসরণ করে। জন্মগত ভেদ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তাই, যে সময়ের উপযোগী যে সকল লক্ষণ, তাহা অধিক থাকিলে মানুষ সমাজমধ্যে প্রধান ও গৌরবান্বিত হয়, অল্প থাকিলে অপ্রধান হয়। এইরূপে কালক্রমে প্রধান ও অপ্রধান—ইত্যাকার সামাজিক শ্রেণীর বিভাগ স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়। প্রধানগণের গুণ সকল বংশানুগত হওয়ায়, অনুরূপ-গুণ-বিশিষ্ট অপত্য জাত হইয়া সেই প্রাধান্য উহাদিগের বংশেই স্থায়ী রাখে। যে পর্য্যন্ত অধিকতর উপযোগী ব্যক্তি সেই প্রাধান্য ঐ বংশের হস্ত হইতে না লইতে পারে, সে পর্য্যন্ত উহাদিগের প্রাধান্য কেহই অস্বীকার করে না। তৎকালে ও তৎসমাজে যে সকল উপকরণ জয়যুক্ত হয়, প্রধানগণ বিশিষ্ট মাত্রায় তাহার অধিকারী। এইরূপ লক্ষণযুক্ত অপত্য এই সকল পিতৃমাতৃ-সংস্রবে যে পরিমাণ জাত হইবার সম্ভাবনা, অন্য বংশে তাদৃশ সম্ভব নহে। যোগ্য বংশে যোগ্য, ও অনুপযুক্ত বংশে অনুপযুক্ত জাত হইবারাই অধিক সম্ভাবনা ; কারণ, ইহাই সাধারণ নিয়ম। এ স্থলে যোগ্য বলিতে সাধারণতঃ "উত্তম"ই যে বুঝিতে হইবে, এমন নহে। "উপযোগী" "অথবা "উপযুক্ত"-মাত্র বুঝিতে হইবে। অনেক স্থলে, উত্তম হইলে, কোনও বিশেষ সময়ে বিশেষ সমাজের অনুপযুক্ত হইতে পারে। বংশানুক্রম শাস্ত্রের ও জীবতত্ত্বের যে অংশের নাম Eugenics অর্থাৎ "জাতীয় উৎকর্ষবিধান", সেই শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই এই যে, যাহা উপযোগী, তাহা কিরূপে সর্ব্বস্থলেই "উত্তম" হইতে পারে, তাহারা নিয়ম সকল জ্ঞাত হওয়া। যোগ্যই জয়ী হয়, কিন্তু যোগ্য উত্তম নাও হইতে পারে। চোরের সমাজে যে বড় চোর, সে-ই জয়ী হয় ; কিন্তু তাহাকে উত্তম বলা যায় না। যে সাধু, তাহাকেই উত্তম বলা যায়। বংশানুক্রম শাস্ত্রের ও

জাতীয়-উৎকর্ষ-বিধান-তত্ত্বের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি বা সমাজ উত্তম, সে-ই জয়ী হইবে, অন্যে নহে। যোগ্যতমের জয় হয়; কিন্তু সেই যোগ্যতম উত্তম হউক, ইহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু বংশ-সংশোধন ব্যতীত ব্যক্তি অথবা জাতিকে উত্তম করা যায় না। উত্তম পিতা মাতা না হইলে উত্তম অপত্য [সাধারণতঃ] জাত হয় না। এই নিমিত্তই বংশানুক্রম শাস্ত্রের অলোচনা এত প্রয়োজনীয়।

মৃত মহাত্মা গ্যাল্টন্ অনেক অনুসন্ধানের পর অবধারণ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডীয় সমাজে ৩৫ জন যোগ্য পিতা মাতা হইতে ৬ জন যোগ্য অপত্য জাত হইয়া থাকে। কিন্তু ২৫০০ সহস্র যোগ্যতাহীন ব্যক্তি ৩ জন মাত্র যোগ্য অপত্য লাভ করিয়া থাকেন। (৯) এতদ্দেশে এইরূপ সংখ্যা-গণনা করা হয় নাই; তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যোগ্য অপত্যলাভ যোগ্য পিতামাতার ভাগ্যে যে পরিমাণ ঘটে অন্যের ভাগ্যে সে পরিমাণ হয় না। সুতরাং যোগ্যবংশীয় অপত্যগণ জয়যুক্ত হওয়াই সাধারণ নিয়ম। যাহারা অযোগ্য, (১০) তাহারা জয়-যুক্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প। এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইলে বুঝা যাইবে যে, যাহারা চিরাতীত কাল হইতে সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে, তাহারা প্রকৃতই দেহে মনে জয়-যুক্ত হইবার অনুপযোগী। সেই সুদূরবর্ত্তী অসভ্য-সময় হইতে তাহাদিগকে কেহ চাপিয়া নীচে নামাইয়া রাখে নাই। বরং এ কালে চাপিয়া রাখা যদিও বা সম্ভব হয়, সেই বিপদসঙ্কুল প্রাথমিক অসভ্য-সমাজে যখন যুদ্ধ বিগ্রহ ও আহার্য্যের অভাব সর্ব্বদাই হইত, তখন গুণী অথবা যোগ্য ব্যক্তির প্রধান-পদ-লাভ স্বভাবতঃই একরূপ নিশ্চিত ছিল। তখন হইতেই যাহারা সুদীর্ঘকাল সমাজমধ্যে, [ ধনে হউক, কর্ম্মে হউক, কৌশলে হউক, প্রতিভায় হউক, ] প্রাধান্য লাভ করিতে অক্ষম হইয়া নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই যোগ্য অথবা উপযুক্ত বলা যায় না। তাহা হইলেও, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, উহাদিগের মধ্যেও অত্যল্পসংখ্যক যোগ্য ব্যক্তি নানাবিধ অবান্তর কারণবশতঃ উন্নত হইতে পারে নাই। ইহারাই গ্যাল্টন্-প্রদর্শিত ২৫০০ সহস্রের মধ্যে ৩টি। ইহাদিগের উন্নত হইবার ব্যবস্থা সমাজমধ্যে প্রতিষ্ঠিত

---

(৯) While 35 V–class ( যোগ্য শ্রেণী ) purents suffice to produce 6 sons of the V—class, it takes 2500 R—class (তত যোগ্য নহে) fathers to produce 3 of them— Essays in Engenics p 17–18.

(১০) সামাজিক প্রসঙ্গে যোগ্য অর্থে—সুস্থ, সবল, কৃতী ইত্যাদি।

থাকিলে সমাজ লাভবান হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কার্য্য অত্যন্ত দুরূহ, সহজসাধ্য নহে। এক দিকে ভাল করিতে গিয়া অন্য দিকে মন্দ উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু, মন্দের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ভালর আরও উৎকর্ষসাধন করিবার জন্য যে বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তন আবশ্যক, বুদ্ধিপূর্ব্বক সমাজের অগ্রণীগণ তাহা করিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়; সুতরাং তাহা সর্ব্বপ্রযত্নেই কর্ত্তব্য। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশকেই কোনও উপায়ে উন্নত করিবার চেষ্টা করিলে, সে উন্নতি স্থায়ী হয় না। বর্ত্তমান নিম্নশ্রেণীগণকে ভবিষ্যতে উন্নত করা সম্ভব হইলে, এবং স্থায়ী ভাবে সম্ভব হইলেও, সেই ভবিষ্যৎ সমাজেও কি নিম্নশ্রেণী থাকিবে না? আমরা বলিয়াছি, যে সময়ে যে সমাজে যে সকল উপকরণ অধিকমাত্রায় থাকিলে উন্নতি হয়, সেই উপকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় একই উপকরণ জয়ী হয় না। সুতরাং বিভিন্ন ধাতুর ও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বিভিন্ন সময়ে প্রাধান্য লাভ করে। তখন তাহারাই উচ্চশ্রেণী, অন্যে নিম্নশ্রেণী। তার পর,—বর্ত্তমান নিম্ন শ্রেণীতে যে সকল ব্যক্তি যোগ্য আছেন, তাঁহারা সুযোগপ্রাপ্ত হইলে, উন্নত হইতে পারেন; এবং বর্ত্তমান উচ্চ-শ্রেণী হইতেও কতিপয় ব্যক্তি বাহ্য ও আন্তরিক কারণবশতঃ নিম্ন শ্রেণীতে অবনত হইতে পারে। এইরূপে শ্রেণীগুলির মধ্যে ওঠা-নামা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালেই হইতেছে। প্রাচীন কালে জাতিভেদের অধিক কাঠিন্য থাকা সত্বেও, এইরূপ বিভিন্ন জাতির উঠা-পড়া হইত। এইরূপ নিম্নশ্রেণীর অল্পাংশই উঠিতে পারে; তাহাদিগের উর্দ্ধগতি সাধারণতঃ দীর্ঘকাল নিবৃত্ত থাকিবার নহে।

উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একটা একত্ব-বোধ থাকা আবশ্যক। সমাজের বিভিন্ন কার্য্য, যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ন্যায়, পরস্পর-সম্বদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হওয়া আবশ্যক। ইহারা সকলেই অনুভব করিবে,—"আমরা এক উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিতেছি"। সকল শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ অধিক যে সমাজে যত কার্য্য অনুষ্ঠিত ও সম্পন্ন হয়, সে সমাজ তত এক-ভাবাপন্ন হয়। এ নিমিত্ত সকল শ্রেণীর জনগণের সম্মিলিত প্রযত্নসাধ্য কর্ম্ম সমাজে অধিকসংখ্যায় প্রচলিত থাকা আবশ্যক। ইহা হইতেই সামাজিক একতা উৎপন্ন হয়। ভেদ-জ্ঞান ত থাকিবেই; তথাপি সেই ভেদের মধ্যেই একত্ব অনুভূত হইবে। ইহারই নাম সমাজপ্রীতি। দেশপ্রীতি পৃথক পদার্থ। দেশপ্রীতি না থাকিলেও সমাজ চলিতে পারে। যেমন ইহুদীসমাজ। কিন্তু সমাজপ্রীতি না থাকিলে

সমাজপ্রীতি। কোনও সমাজই টিকিতে পারে না। ইহুদী জাতির আর এখন কোনও নির্দ্দিষ্ট দেশ নাই। "এই আমার মাতৃভূমি", এ কথা এখন অনেক ইহুদীই বলিতে পারে না ; তাহারা প্রত্যেক দেশেই বৃত্তি বা কর্ম্ম উপলক্ষে বাস করিতেছে। কিন্তু সেই সকল দেশে ইহাদিগের সামাজিক একতা এত প্রবল যে, এক জন অভাব অনটনে পড়িলে, অথবা বাণিজ্যাদিতে অকৃত-কার্য্য হইলে, অনেকেই তাহাকে সাহায্য করে ও আশ্রয় দেয়। সমাজপ্রীতি এইরূপই হওয়া আবশ্যক। যেমন দেহের এক স্থানে পীড়া হইলে সমস্ত দেহ অসুস্থ হয়, এবং সেই পীড়া অনুভব করে, তেমন-ই সমাজেরও একাংশে আঘাত লাগিলে সর্ব্বত্র দুঃখ অনুভূত হয়, এমন সমবেদনা থাকা চাই। তাহা না হইলেই সে সমাজ বিকল হইল। সমাজ-প্রীতি না থাকিলে সামাজিক উন্নতি অসম্ভব; যদিও বা কিছু উন্নত হউক, সে উন্নতি স্থায়ী হইবে না। যাহারা বংশানুক্রমে সমাজ-প্রিয়, তাহারাই সামাজিক উন্নতিসাধনের উচ্চ অধিকারী। যাঁহারা একটা নকল দেশপ্রীতি লইয়া উন্মত্ত, কিন্তু একেবারেই সমাজপ্রীতিশূন্য, অথবা সমা-জের প্রতি ঘৃণা বা তাচ্ছীল্যের ভাব পোষণ করেন, তাঁহাদিগের প্রযত্নে সামাজিক উন্নতি অসম্ভব। সমাজে বংশানুক্রমে অকৃতিগণের অপেক্ষা সুস্থ, সবল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শ্রমসহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী—এক কথায় কৃতী ব্যক্তি অধিকসংখ্যায় উদ্ভব এবং তাহাদের জীবিত থাকিয়া অনুরূপ অপত্য উৎপাদন করা, সামাজিক উন্নতির প্রথম ও শেষ কথা। এই ব্যক্তিগণ সমাজের যে পরিমাণ উপকার করেন, অপরে অর্থাৎ অযোগ্যগণ অনুরূপ সন্তান-প্রজনন দ্বারা তদপেক্ষা অধিক অপকার না করে, সে দিকেও অগ্রণীগণের সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকা আবশ্যক ; নচেৎ অনতিবিলম্বেই সমাজ অধঃপতিত হইবে। এই কারণে অনেক প্রাচীন সমাজ অবনত হইয়াছে। এই পরম শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতেই হইবে।

শ্রীশশধর রায়।

সমাপ্ত।

---

# উলা বা বীরনগর।

২

উলা অতি প্রাচীন জনপদ। পূর্ব্বে ভাগীরথী গঙ্গা উলার নীচে দিয়া, খিস্‌মের পাশ দিয়া প্রবাহিত ছিলেন। তাহা কবিকঙ্কণের লেখা দেখিয়া

বেশ বুঝা যায়। সে হইল তিন শত ছত্রিশ বৎসরের কথা। ইহার শতবর্ষ পূর্ব্বে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মেল-বন্ধন হয়। ফুলিয়া মেলের 'ফুলিয়া' প্রসিদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। সেই ফুলিয়া মেলের বিস্তর স্বভাব ও ভঙ্গ কুলীনের উলায় বসবাস ছিল। কথিত আছে যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় উলায় ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের পঁচিশ শত ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। আমি বালক, এ সকল এমন করিয়া তখন বুঝিতাম না, তবে আড়াই হাজার, তিন হাজার ব্রাহ্মণ পংক্তিভোজনে আহার করেন, এমন কথা সর্ব্বদাই শুনিতাম।

বামনদাস বাবুর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; উঁহাদিগকে উলার 'বাবুরা' বলা হইত। আর এক ঘর বিশিষ্ট ব্রাহ্মণবংশ ছিলেন, তাঁহারাও মুখুটী বটেন, দেওয়ান মহাশয়েরা। ইহারা কন্যার বিবাহে পাত্রের ভাল পাঁচটা গুণের সঙ্গে দৈহিক শৌর্য্য বীর্য্য বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইতেন। সুতরাং ইঁহাদের বংশে রুগ্ন ভগ্ন দুর্ব্বল লোক দেখিতে পাওয়া যাইত না। ইঁহারা পরম ভাগবত বৈষ্ণব ছিলেন। বার মাস বাড়ীতে হরিসঙ্কীর্ত্তন হইত, আর মাঘ মাসে নগর-সঙ্কীর্ত্তন রাত্রিতে বাহির করিতেন। অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে বর্ষৈক পূর্ব্বে উপ-নীত বালক পর্য্যন্ত, সেই গোষ্ঠীর সকলে একত্র সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। মধ্যে শুভ্র-লোমাবৃত-বিশালবক্ষ "রঙ্গিব মহাশয়" মোহাড়া ধরিয়া দিতেছেন, আর তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া পঞ্চাশ ষাট জন বালক, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, হরিনামের তান তুলিতেছে। সেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, অপূর্ব্ব গীতি—সেই যে বালক-কালে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, সে কি ভুলিবার বিষয়!

একঘর কায়স্থ উলায় খুব নামজাদা ছিলেন। উলার মুস্তোফীরা। তাঁহারা মিত্র—নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া মুস্তোফী উপাধি লাভ করেন। আমি যখন উলায় থাকি, তখন ইঁহাদের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নাম আছে, আর তখন ইঁহা-দের প্রসিদ্ধ 'চণ্ডীমণ্ডপ' আছে। চণ্ডীমণ্ডপ 'বাঙ্গলা' চালের,—'খড়ো', কিন্তু সেই এক বিচিত্র কাণ্ড। বাঙ্গলা দোচালা—তিন দিকে প্রাচীর; ভিতর দিকে প্রাচীর-গাত্রে সমস্ত দেবদেবীর লীলা-মূর্ত্তি খোদাই করা। দক্ষিণমুখ চণ্ডীমণ্ডপ, দক্ষিণ দিকে দুচালার জোড়ের কাছে, এবং দক্ষিণ দিকের ছাঁচের কাছে, কাষ্ঠের খুটী। ময়ূর-পুচ্ছের চন্দ্রক দিয়া ঢাকা। খুটীও যেমন, আড়া তীর বাম্‌না সকলই তেমনই—কাষ্ঠের, ও ময়ূরপুচ্ছের চাঁদ দিয়া ঢাকা। চালের শলাগুলি বাঁশের, তারের মত সরু ও সুগোল,—এবং যন্ত্রীর ছিদ্র-মধ্য দিয়া টানা। এই সব শলা ছিলেটের ভাল

বিচিত্র রঙ্গকরা ; লাল রঙ্গগুলি গালার, আর মধ্যে মধ্যে সেই ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রক দিয়া পদ্মের মত নক্সা। চালের উপরপীঠের কোনও বৈচিত্র্য থাকিত না, সাদা সিধা একটা বাঙ্গলা চাল। কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে দাঁড়াইলে, দাঁড়াইয়া উপরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, আর নয়ন মন ফিরাইয়া আনা ভার হইত। আমি বালক সৌন্দর্য্য-প্রিয়—আমার আর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, শেষে আমার রক্ষকেরা আমাকে যৎকিঞ্চিৎ বলপূর্ব্বক লইয়া চলিল—মুস্তৌকী মহাশয়দের সদর বাড়ী দেখিতে গেলাম। বাড়ীর তখন ভাঙ্গা অবস্থা। সুবৃহৎ কাষ্ঠের স্তম্ভ সারি সারি, মৃত্তিকা হইতে দোতালার ছাদ পর্য্যন্ত নানা কারুকার্য্য ভগ্নঅঙ্গে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। তাহার উপরে সুপ্রশস্ত কাঠের কার্ণিস্। রঙ্গ নাই, বাহার নাই, জলুস্ নাই, খোদকারী সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কোথাও বা কার্ণিস্‌ই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

বালককালেই 'সোণেকি শুক্তি, গিধড়কি জাড়া'র গল্প শুনিয়াছিলাম। এক পাতশাহ অত্যন্ত উদার ছিলেন, নিজ কর্ম্মচারীদের চুরি জানিতে পারিয়াও ধরিতেন না। তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে, তিনি কর্ম্মচারীদের ডাকাইয়া বলিলেন, দেখ, আমার আমলে যা করিবার তাহা করিয়াছ, আমার উত্তরাধিকারীর আমলে আর সোণার শুক্তি বাদ দিও না, আর শৃগালের শীতনিবারণের জন্য কম্বলের ব্যবস্থা করিও না।

মুস্তৌফীদের সদর বাড়ীর একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া আমার সঙ্গীরা বলিল, এই ঘরে বিস্তর ভাল ভাল ঝাড় লণ্ঠন ছিল, সমস্তই উইয়ে কাটিয়া মাটী করিয়াছে। কেবল পিতলের সাপিগুলা পাওয়া গিয়াছিল। আর এক জন বলিল, 'সোণেকি শুক্তি—গিধড়কি জাড়া' এ কালেও হয়। আমি বুঝিলাম, ঝাড় লণ্ঠন অপহৃত হইয়াছে।

নবশাখদের মধ্যে কয়েক ঘর গন্ধবণিক ও কাংসবণিক আমাদের দক্ষিণ পাড়াতেই ছিল ; তাহারা গৃহস্থ লোক ; আর উত্তরপাড়ায় ছিলেন খাঁ বাবুরা ; তাঁহারা তিলি। কলিকাতায় বিপুল ব্যাবসায় করেন ; তাঁহারা এখনও বর্ত্তমান ; আমরা গত বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁহাদের আশ্রয়ে ৪।৫ ঘণ্টা সুখে কাটাইয়া আসিয়াছি। সে কথা পরে বলিব।

পিতৃদেবও বৈশাখী-পূর্ণিমায় উলায় গিয়াছিলেন, আমরাও গত বৈশাখী-পূর্ণিমার দিন গিয়াছিলাম—কেন ঐ পূর্ণিমায় কিছু বিশিষ্টতা আছে ?

আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় উলায় উলুইচণ্ডীর জাত হয় এবং তিন পাড়ায় বারইয়ারি পূজা হইত, এখন দুই পাড়ায় হয়।

এই কথা বলিলেই দিনের বিশিষ্টতা বুঝান গেল না। অতি বড় দীনদরিদ্র হইতে ধন-কুবেরগণ পর্য্যন্ত সকলেরই বাড়ীতে মহা উৎসব হয়। সকলেই চণ্ডী-মায়ের পূজা দেন বা করেন—সকলেরই বাড়ীতে ভূরি পরিমাণে অতিথি-কুটুম্বের সমাগম হয়।

উলায় থাকাতে পল্লীগ্রামের আতিথ্য জিনিসটা কি, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কাছারীর কাছে আমাদের দোতালা বাসা-বাড়ী ছিল, সেই বাসা হইতেই একটি দরিদ্র প্রতিবাসীর ঘর, দুয়ার, উঠান বেশ দেখিতে পাওয়া যাইত। একটি বাঁশ ঝাড়ের পার্শ্বেই তাহাদের ঘর—একখানি মেটে ঘর, তাহারই দাওয়া, আর বাঁশতলাও যা, উঠানও তাই। ৩।৪ দিন পূর্ব্বে গৃহস্থের পরিবার সেই ঘর দুয়ার বাঁশতলা ঝক্ ঝকে করিয়া নিকাইয়া রাখিত। আর সেই পূর্ণিমার দিনই মেলা হইতে গোটা দুই মাজুরি ও ৩।৪ টা কলিকা ও খানিকটা তামাক কিনিয়া আনিত, আর সেই উঠানের এককোণে বাঁশের গোড়া কাটার আগুণ গর্ত্ত করিয়া রাখিয়া দিত। সেই মাজুরিতে বসিয়া, সেই কলিকায় তামাকু খাইয়া কুটুম্ব-অতিথিরা আনন্দে ভোরপূর হইয়া কতই না গল্প করিত। চণ্ডীমার প্রসাদ নামিলে, এক হাঁড়ী বা দুই হাঁড়ী ভাত চড়াইয়া দিত; ৫টা ৬টার সময় সেই প্রসাদান্ন খাইয়া, চাদর বা গামছাখানা কুণ্ডলী করিয়া মাথায় দিয়া লম্বা শুইয়া পড়িত। বলিহারী বাঙ্গলার দীন-দরিদ্র ও বলিহারী বাঙ্গলার আতিথ্য।

বৈশাখী পূর্ণিমা ৺গন্ধেশ্বরী পূজার দিন। ৺গন্ধেশ্বরী পূজা গন্ধ-বণিকগণ প্রায়ই করিয়া থাকেন। প্রবাদ যে উলার চণ্ডী-গন্ধেশ্বরীই বটেন। শ্রীমন্ত সিংহল যাত্রার সময় যখন উলার পার্শ্ব দিয়া যান, তখন গন্ধেশ্বরী পূজার দিন, নদীতীরস্থ বটমূলে গন্ধেশ্বরী স্থাপন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন; "নদীয়া কাহিনী"তে ত্রিপদীর তিন চরণ উদ্ধৃতও হইয়াছে :—

"বটমূলে ভগবতী, যথায় করেন স্থিতি, উপনীত সেই উলা-ধামে।"

এই কথাগুলি কোথা হইতে আসিল, তাহা আমরা জানিনা। বিশেষ উহা হইতে গন্ধেশ্বরী স্থাপনা বুঝা যায় না, বটমূলে ভগবতী স্থাপিত ছিলেন—ইহাই বুঝা যায়। বিশেষ ধনপতি যে ঐ রূপে চণ্ডীপূজা করিবেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে। তিনি তখনও তেমন শক্তি-ভক্ত হন নাই। আর শ্রীমন্তেও সম্ভব নহে।

কেন তাহা বলিতেছেন ঃ—যখন শ্রীমন্তের নৌকা ভাগীরথীতে আসিয়া পড়িল তখন কবিকঙ্কণ বলিতেছেন,

"বাহিয়া অজয়নদী, পাইল ইন্দ্রাণী।"

ইহার পর 'গঙ্গার উৎপত্তি কথন' আছে, তাহার শেষে আছে ;—

"শুনি গঙ্গা অবতার, সুখী হৈলা কর্ণধার,
স্নান কৈল নতিল তর্পণে।
আচ্ছাদিয়া ধৌত পটে, লইল নূতন ঘাটে,
শ্রীকবি কঙ্কণ রসভণে।"

ইহার বহু পূর্ব্বে যখন বহর অজয়েই রহিয়াছে, তখন ঃ—

"বারেন্দা বাহিল সাধু বেণের নন্দন।
সোনায়ার ঘাটে ডিঙ্গি দিল দরশন॥
সুবর্ণের চণ্ডী করিল পূজা দান।
প্রণমিয়া সদাগর করিল পয়ান॥"

আবার উলায় আসিয়া চণ্ডী বা গন্ধেশ্বরী স্থাপনা করিলেন, তাহা বোধ হয় না। তাহার পর মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের যুক্তি আছে। যখন হাড়ীরা এখনও রাত্রি থাকিতে প্রথম পূজা করে, তখন ঐ চণ্ডী বৌদ্ধের রূপান্তর মাত্র।

উলার বারইয়ারীপূজা---সেই এক বিষম কাণ্ড। পৌত্তলিক পীড়নকারীদিগের শত লাঞ্ছনাতেও এখনও বারইয়ারী জীবিত আছে। বাঙ্গালার যে সকল জনপদে, হাট, গোলা, গঞ্জ বা বাজারের সমৃদ্ধি আছে, সেই সকল স্থানে সহজে মুনাফার উপর 'ঈশ্বর বৃত্তি' আদায় হয় এবং ঈশ্বরীর পূজা সমারোহে হইয়া থাকে। আজিকালি কলিকাতায় বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি, কাজেই কলিকাতার সূতাপটি, লোহাপটি, হাটখোলা, পাথুরিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানে জাঁকজমকে, অথচ দান-ধ্যানে, বারইয়ারী পূজা হইয়া থাকে। জঙ্গীপুর, কাটোয়া, কালনা, শান্তিপুর, মগরা প্রভৃতি পল্লীগ্রামের বহুতর স্থানে ঐরূপ বারইয়ারী হইয়া থাকে।

গঞ্জ-গোলা না থাকিলেও, দেশে দেশে চাঁদা আদায় করিয়া স্থানে স্থানে বিশেষ ধুমধামে বারইয়ারী পূজা হইত। ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান, গুপ্তীপাড়া, উলা প্রভৃতি গ্রামে এইরূপেই বারইয়ারী হইত। এই সকল বারইয়ারীর বাঁধা পাণ্ডা ছিল। ভাল ভাল কুলীনের ছেলে, মোটা মোটা পৈতা কাঁধে, মাথায় কোকড়া কোকড়া চুল, প্রায়ই মালকোচা মারা, গ্রামের মধ্যে, বারইয়ারির দুই তিন মাস থাকিতে, চাঁদা আদায় করিত। দুই একজন বর্ষীয়ান আমুদে লোক সঙ্গে লইয়া,

তাহাদিগকে মুরুব্বি বানাইয়া, যেখানে অর্থসম্পন্ন, বিশুদ্ধ বাঙ্গালী আছে, সেই সেইখানে প্রায় সুম্বৎসর ঘুরিত। চাঁদা অবশ্য "রক্ষণ ভক্ষণ" দুইই হইত। এখনকার টেরিকাটা বাবুরা কমিশন লন, তখন ভক্ষণই কমিশন। আমি উলার ভালটুকু বলিয়াছি, এখন মন্দটুকু বলি,—৪।৫ জন ঐরূপ গুণ্ডা পড়িয়া দুপর বেলা গৃহস্থের ঘটি বাটি বারইয়ারীর চাঁদার জন্য উঠাইয়া লইয়া গেল, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। বারইয়ারীর এইরূপ অত্যাচার আমার বাল-বুদ্ধিতেও ভাল লাগিত না। দুইজন দশজনকে এই জন্য কাঁদিতেও দেখিয়াছি।

বিদেশে পাণ্ডাদের চাঁদা আদায়ের নানারূপ বিচিত্র গল্প আছে। কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ কৃপণ বড় মানুষের বাড়ীতে বীরনগরের বীর পাণ্ডারা যাইতে উদ্যত; সকলে নিষেধ করিল, বলিল "উহার মুখ-দর্শন করিলেও পাপ আছে; একে, একচক্ষু নাই—কাণা, তাহাতে বাপের শ্রাদ্ধ, মায়ের শ্রাদ্ধ করে না, অতিথি ব্রাহ্মণকে কিছু দেয় না, উহার নিকট তোমরা যাইও না।" পাণ্ডারা কিন্তু নাছোড়-বন্দা; তাঁহার বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি মনে ক'রে আসিয়াছেন?" উত্তর হইল, "আমরা উলার বারইয়ারী পাণ্ডা, মায়ের পূজার জন্য আপনার নিকট কিছু ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" আবার উত্তর হইল, "আপনারা কি শুনেন নাই, বাপের শ্রাদ্ধ, মায়ের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কোন বাজে খরচ আমার নাই, আমার কাছে আপনাদের কিছু হবে না।" "না দেন, নাই দিবেন, কিছু আপনার বাজে খরচ নাই—এমন মিথ্যে কথাটা বলবার কি প্রয়োজন?" "আমার বাজে খরচ কিসে দেখিলেন?" "আপনার একটি বই চোখ নাই, দুখানি পরকলা দেওয়া চস্‌মা ব্যবহার করিতেছেন কেন?" কৃপণ হাসিয়া ফেলিল, বলিল "আপনারা ধরিয়া ফেলিয়াছেন বটে, আমি আপনাদিগকে ১০টি টাকা দিতেছি, মায়ের পূজা দিবেন।" ব্রাহ্মণগণ টাকা লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আর একদিন কলিকাতার এক উগ্রস্বভাব বড় মানুষের বাড়ী পাণ্ডারা প্রবেশ করিবার উদ্যোগেই তিনি "এখানে কেন, এখানে কেন, এখানে কিছু হবে না, আবার কি দরয়ান ডাকিতে হইবে না কি?" বলিয়া মহা রাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ ধীরে সুস্থে গিয়া ভিন্ন আসনে বসিলেন, বাবু আরও রাগত হইলেন। পাণ্ডারা বলিলেন, "আমরা ব্রাহ্মণ, আপনি কায়স্থ; আমাদিগের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতেছেন কেন?" উত্তর "ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ—তোমাদের ব্রাহ্মণত্ব কি আছে?" "কেন সকলই আছে, উপবীত হইয়াছে, নিষ্ঠা আছে,

গায়ত্রী জপ করিয়া থাকি, নাই কি?" উত্তর, "ব্রাহ্মণ হইলে সাগ্নিক হইতেন, তোমাদের মুখে আগুণ থাকিত।" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "এইজন্য আপনি এত রাগ করিতেছেন? ওটা আপনার ভুল। মুখে আগুণ থাকিলে, হা করিতে হইবে, ফু দিতে হইবে, তবে আগুণ বাহির হইবে,—এইত; আর দেখুন দেখি—আমরা পঞ্চাশ হাত দূরে থাকিতেই, আপনি আমাদের দেখা মাত্রই জ্বলিয়া উঠিয়াছেন; কোনটা বেশী হইল মহাশয়?" কায়স্থ একেবারে নরম হইলেন, কুড়ি টাকা তাঁহাদিগকে দিতে হুকুম দিলেন; আর সাধ্য-সাধনা করিয়া তাঁহাদিগকে পাকাহার করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ আপনাদের স্বপাক মাছের ঝোল অন্ন এবং বিপাক ক্ষীর সন্দেশ উদর পূরিয়া আহার করিয়া, দক্ষিণা এবং কুড়ি টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন।

লাট হেষ্টিংশের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে উলার পাণ্ডারা দড়ীদড়া লইয়া গিয়া বলে, "মায়ের ইচ্ছা তোমার কাঁধে চাপিয়া আসেন, তাই তোমাকে লইতে আসিয়াছি।" গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বড় চতুর লোক ছিলেন, সেবারকার মায়ের পূজার সমস্ত ভার তিনি গ্রহণ করেন।

এইরূপ উলার বারইয়ারী পূজার গল্প বহু প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। কিন্তু আজি এই পর্য্যন্ত।

কদমতলা, চুঁচুড়া। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।
১২ই শ্রাবণ।

---

# স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্রের রোজনামচার এক পৃষ্ঠা।

৯ই জুন; ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।—বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত (যিনি রাজা রামমোহনের সহিত ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন) সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত রামমোহনের জীবন সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলোচনা হইল। তিনি তাঁহার উপকারকের প্রতি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ। * * * কলিকাতায় আগমন করিয়া তিনি ঠনঠনিয়ায় "নবাব বাড়ী" নামে একটি বাটীভাড়া করেন। তথায় ১৮ মাস অবস্থান করেন। পরে তাঁহার অসুবিধা হইতে লাগিল। এই তাঁহার যশঃব্যাপ্ত হইল। বহুদিন মফঃস্বলে ছিলেন বলিয়া

তিনি পল্লীগ্রামের বায়ু সেবন করিতে অভিলাষ করিলেন। তিনি সাকুলার রোডে ( বাহির সিমলায় ) একটী উদ্যানবাটিকা ক্রয় করিলেন,—যে বাটী পরে তৎকালীন মহাত্মাগণের সমাগমস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি জে, বি, র নিকট হইতে ঐ বাটি ৪০০০৲ টাকায় ক্রয় করেন কিন্তু পরে ঐ বাটী ও উদ্যানের অনেক পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করাইয়াছিলেন। উহা প্রথমে একতল বাটী ছিল; তিনি ২২০০ টাকা ব্যয় করিয়া উহাকে দ্বিতল বিশিষ্ট করেন। তিনি ঐ বাটীর সংস্কার কার্য্য কাপ্তেন সিরম নামে এক জন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন কিন্তু তিনি ১২০০ লইয়া পলায়ন করেন। রামমোহন নিজে স্থপতির কার্য্য জানিতেন না এবং প্রথমে উক্ত ব্যক্তিকে এবং পরে রামরতন মুখোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করেন কিন্তু উদ্যানকর্ম্মে তাঁহার স্বভাবজাত রুচি ছিল। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার উদ্যান সংস্কারের জন্য যত্ন করিতে ভালবাসিতেন এবং যখন তাঁহার পুত্র রাধানাথ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন তখন প্রায় সব সময়েই ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই সময়ে তিনি সাহিত্যসেবা আরম্ভ করেন। তিনি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন, বিশেষতঃ শীতকালে। তিনি কোনও না কোনও বন্ধুর সহিত বহুদূর পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। তিনি কদাচিৎ একাকী ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, প্রায়ই কেহ না কেহ সঙ্গে থাকিতেন। তিনি তাঁহার পরিচিতগণকে শিক্ষা দিবার সুযোগ কখনও হারাইতেন না। গ্রীষ্মকালে তিনি মস্‌লিন্ কাব্বা এবং শীতকালে সাটীন কাব্বা ও ইজের পরিধান করিতেন। প্রাতঃকালে একটী টুপী পরিতেন। প্রাতর্ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি এক পেয়ালা চা ( শীতকালে কাফি ) পান করিতেন। চা-পানের পরে তিনি তাঁহার পাঠগৃহে প্রবেশ করিতেন তথায় তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভালবাসিতেন না। যদি কোনও বন্ধু প্রাতঃকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেন যে তাঁহার কার্য্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিল। তিনি প্রায় বেলা ১০টা পর্য্যন্ত লেখা পড়া করিতেন। কখনও কখনও তিনি পাঠে এত আবিষ্ট থাকিতেন যে সময় চলিয়া যাইত তিনি জানিতে পারিতেন না। প্রায় ১১ টার সময় তিনি ভাত, তরকারী, মৎস্য, ডাল, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্বারা মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করিতেন। তিনি মুগের ডাল এবং রোহিত মৎস্য অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। একজন ধীবর প্রায় প্রত্যহ একটী বড় রোহিত মৎস্য দিয়া যাইত

পান করিতেন ( কারণ তাঁহার—রোগ ছিল ) কিন্তু একটা বাটা হরিতকী খাইতেন। তিনি হরিতকী অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং মাতৃস্তন্যের সহিত উহার তুলনা করিতেন। আহারান্তে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল তিনি বৈঠকখানা বা বারাণ্ডায় পায়চারী করিতেন। তৎপরে তিনি তাঁহার ক্লিওপেট্রা কৌচে ( তখনও 'ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট' কৌচ আবিষ্কৃত হয় নাই। একখানি পুস্তক লইয়া শয়ন করিতেন। কখনও কখনও তিনি এই সময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু এই নিদ্রা অতি অল্পক্ষণের জন্য। ও "সজাগ"। * * * বেলা ১টার সময় তিনি লুচি, মৎস্যের তরকারী এবং ফল মূলাদি দ্বারা জলযোগ করিতেন। জলযোগের পর তিনি পুনরায় পাঠগৃহে প্রবেশ করিতেন, এবং তথায় ৪টা অথবা ৫টা পর্যন্ত কাজ করিতেন। বৈকালে তাঁহার বন্ধু ও পরিচিতগণ সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এই সময়ে তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন। এই সময়ে যাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে এই কয় জনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রজমোহন মজুমদার, রামচন্দ্র পালিত এবং হরচন্দ্র পালিত, কাশীর রাজার উকীল মীর মহম্মদ, মুন্সী মসনাল্লা ( যিনি আসামে অনেককাল ছিলেন, ) ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, বেলুড়ের রামশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং পুলিশ অফিসের দরখাস্তলেখক (Pitition writer) [ ইনি ইংরাজীতে দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন এবং ।৹ হিসাবে পারিশ্রমিক লইতেন। তিনি একপ্রকার সরকারের জানিত লেখক। পুলিস আফিসে তাঁহার একটী স্বতন্ত্র ঘর ছিল। তিনি দরখাস্ত লিখিয়া প্রায় তিনলক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ]

কলিকাতায় আগমনের দুই বৎসর পরে রামমোহন শুঁড়ী পাড়ায় একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহাই এই নগরীর মধ্যে প্রথম দাতব্য এবং বে সরকারী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে প্রায় দুইশত ছাত্র ছিল। শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল। একজন প্রধান শিক্ষক ও একজন সহকারী দ্বারা এই বিদ্যালয় পরিচালিত হইত। গোলক মিস্ত্রী ( জাতিতে নাপিত ) ইহার প্রথম হেড্‌মাষ্টার এবং দেবনারায়ণ দত্ত ( কায়স্থ ) তাঁহার সহকারী ছিলেন। রামমোহন রায় বিদ্যালয়ের সমস্ত খরচ প্রদান করিতেন। প্রধান খরচ বাটীভাড়া ১০০,

প্রধান শিক্ষকের বেতন ১৬৲এবং সহকারী শিক্ষকের বেতন ৮৲মাত্র। পরে তিনি তাঁহার উদ্যান বাটীতে ঐ স্কুলের সহিত সংশ্লিষ্ট একটী ইংরাজী শ্রেণী খুলিয়াছিলেন। এই শ্রেণীতে ঐ স্কুলের খ্যাতনামা ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদত্ত হইত। ইহা মিষ্টার মারক্রফটের অধীনে ছিল। মারক্রফ্‌ট্‌কে তিনি ১০০৲ বেতন প্রদান করিতেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, নলিনী মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বর সরকার, রজনী গুপ্ত প্রভৃতি এই ক্লাশে পাঠ গ্রহণ করিতেন। ৺নন্দকুমার বসু এই ক্লাশে পড়িতেন না কিন্তু রামমোহনের নিকট বাটীতে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮—খৃষ্টাব্দে তিনি সিমলায় কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের নিকট একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন এবং সেইখানে একটী বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করেন। মেসার্স গ্যাস এবং শ্যাড্‌ওয়েল ঐ বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ।

---

# শতাধিক বর্ষপূর্ব্বে বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।*

দাসত্ব-প্রথা ও দাস-ব্যবসায়ের কথা উঠিলেই আমাদের মনে মার্কিণ দেশীয় দাসত্ব-প্রথা ও দাস-ব্যবসায়ের কথা মনে হয়। তদ্দেশীয় দাসত্ব-প্রথার নিবারণের জন্য যে আন্তর্জাতিক সমরানল প্রজ্জলিত ও যে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারই কথা মনে পড়ে। "পেনাল কোড্" বা দণ্ডবিধির কৃপায় আমাদের বালক ও যুবকগণ, এ দেশে যে ঐ জঘন্য ও নৃশংস প্রথা কখনও বর্ত্তমান ছিল তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। তাহারা চারিদিকেই "সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতা"র বিজয়-ডঙ্কার নিনাদ শুনিতে পায়, জাতিভেদের বৈষম্যটুকু সহ্য করিতে পারে না। "নিম্ন জাতির উন্নতির প্রচেষ্টা' "Depressed classes mission"; "প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের আবেদন" "শ্রমজীবিগণের সমবায়" প্রভৃতির কলরবে, সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাসের ধারা পর্য্যবেক্ষণ অনেক পরিমাণে দুরূহ হইয়া পড়ে।

ইতিহাস, সংস্কার-বিরোধী নহে, সংস্কারেরই পক্ষপাতী; বরং তথাকথিত সংস্কারকগণ ইতিহাসের শিক্ষাকে অবহেলা ও পদদলিত করিয়া, সংস্কারকে সংহা-

রের প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে উপস্থিত করিয়া সংস্কারের পথে কণ্টক রোপণ করেন। ঐতিহাসিক ক্রমই সংস্কারের ও উন্নতির ক্রম, ইতিহাসের পথই, ক্রম-বিকাশ ও বিবর্ত্তনের পথ। সংস্কারের অন্য পথ নাই। সমাজের কোনও প্রথাই আকস্মিক বা ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞতা, নিষ্ঠুরতা বা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রবর্ত্তিত বা পরিকল্পিত হয় নাই। প্রত্যেক প্রথাই মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কতকগুলি মূল-সত্য-প্রসূতা কারণ-শৃঙ্খলার ফল। সেই শৃঙ্খলা স্ফুটভাবে দেখাইয়া দেওয়াই ঐতিহাসিকের কার্য্য। অতীতের ধারা নির্ণীত হইলেই, আমরা বর্ত্তমানকে ঠিক ধরিতে পারি ও ভবিষ্যতের গন্তব্য পথ আবিষ্কার করিতে পারি, নচেৎ, গোলক ধাঁধাঁয় পড়িয়া পথ হারাই।

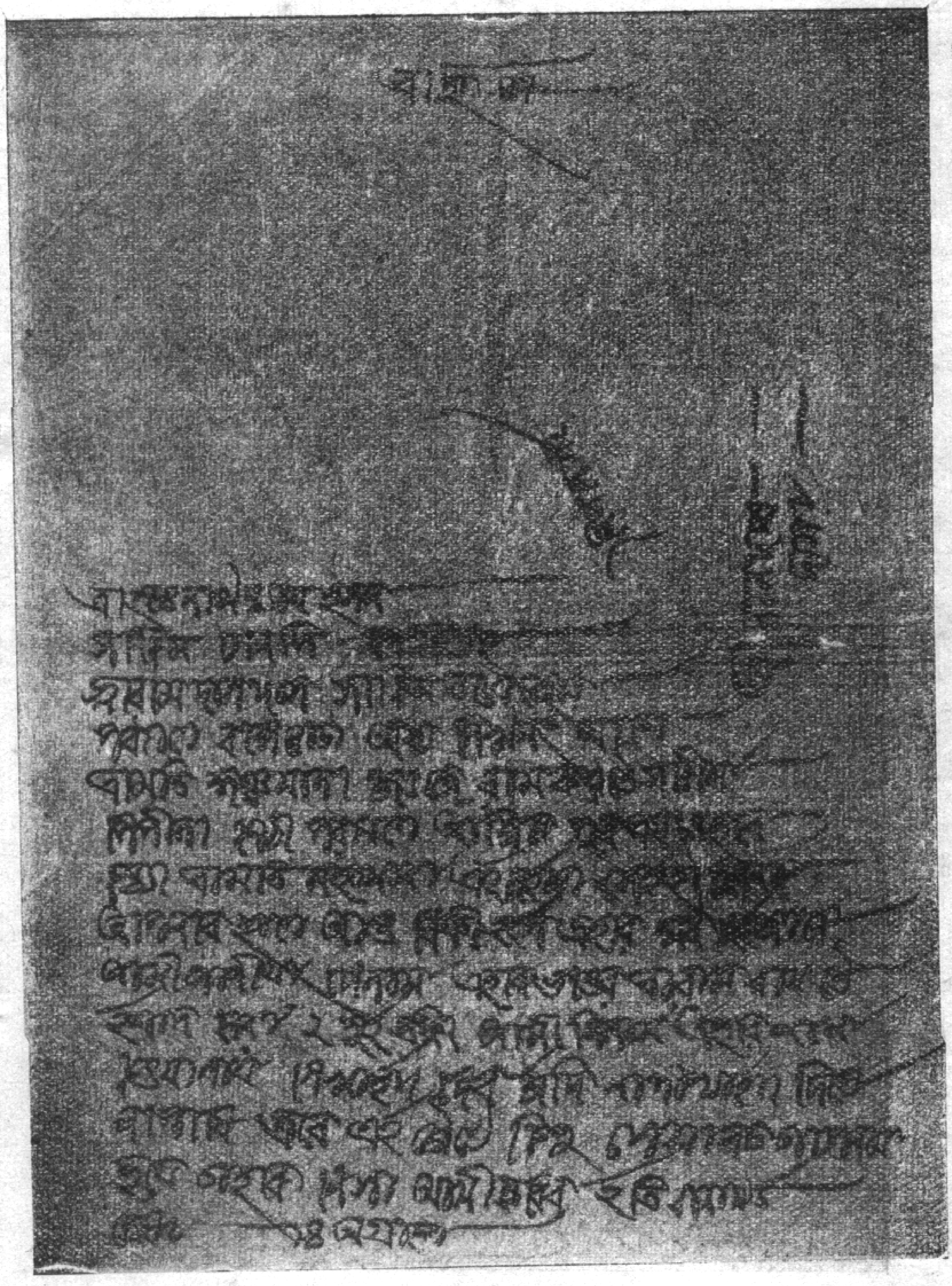
দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। সমাজ-তত্ত্ববিদের "যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা"ও ( Survival of the fittest ) কিয়ৎ পরিমাণে সেই সবলেরই অত্যাচার। তবে, মানবসমাজে পাশব বা দৈহিক বলই একমাত্র বল নয় ; পরন্তু ইহা নিম্নশ্রেণীর বল। ধর্ম্মবল বা আধ্যাত্মিক বলই বল। যাহাকে আজ দুর্ব্বল বলিতেছি, মানব-সমাজ আধ্যাত্মিকতায় তাহাই সবল হয়।

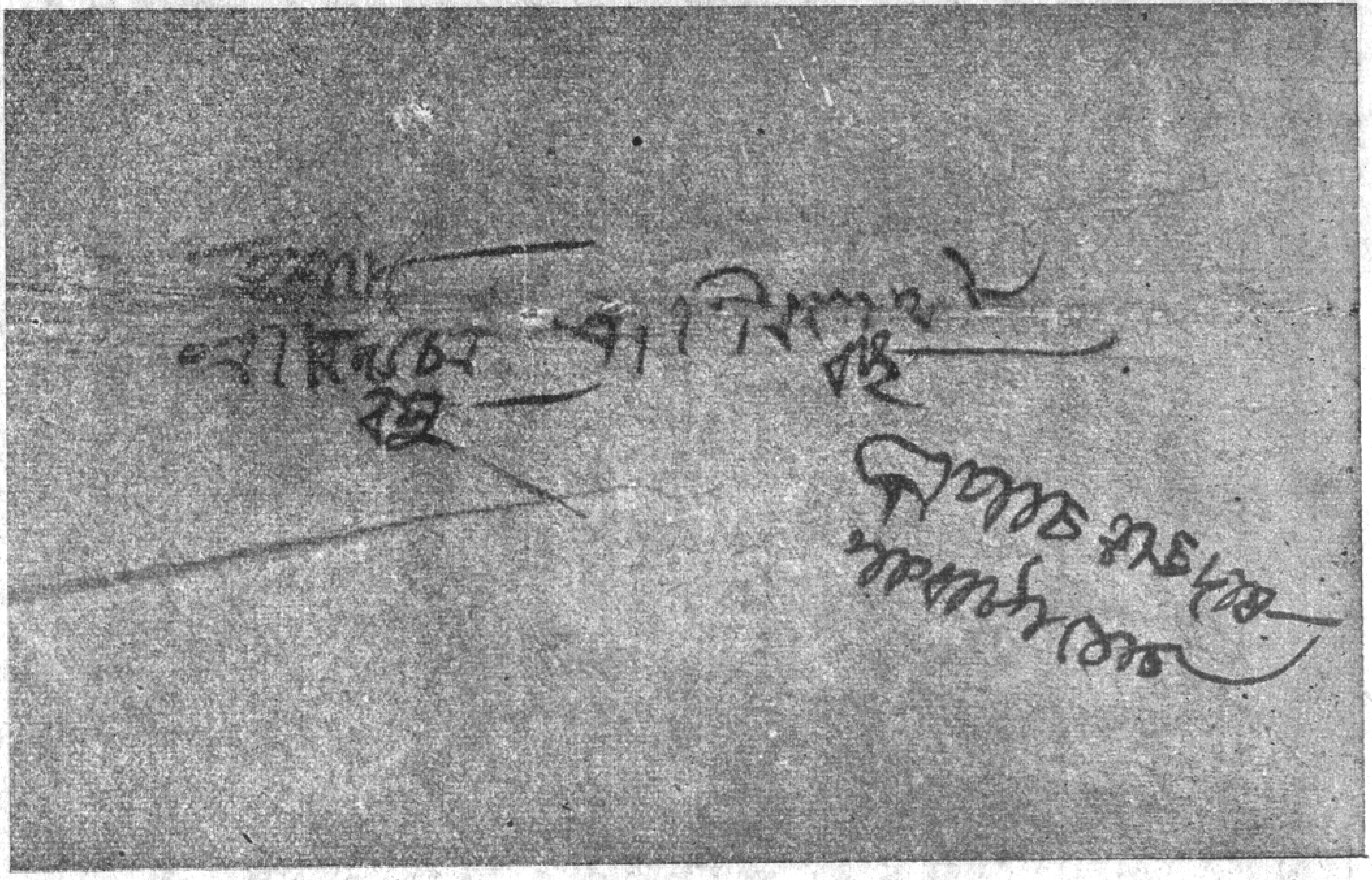
সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সমাজের কোন না কোন স্তরে দাসত্ব-প্রথার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইবে। ভূতত্ত্ববিদেরা যেমন ভূখণ্ডের স্তরে স্তরে ধরা হইতে বিলুপ্ত জীবজন্তুর কঙ্কাল অথবা তরু-লতার প্রস্তরীভূত আকৃতি ( Fossils ) দর্শন করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সেই সেই জীবজন্তুর ও তরুলতার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন, ঐতিহাসিকেরাও সেই প্রকার প্রাচীন গ্রন্থ, লিপি, প্রস্তর-ফলক, তাম্রফলক, ইত্যাদি দর্শন করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের সামাজিক রীতি-নীতির অস্তিত্ব ও অভাব প্রতিপন্ন করেন।

আমাদের জাতিভেদ-প্রথার ভিতরেই যে দাসত্ব-প্রথার চিহ্ন বর্ত্তমান, প্রাচীন শাস্ত্রাদির আলোচনা করিলেই তাহা বোধগম্য হইয়া থাকে। নারদ-স্মৃতিতে আমরা পঞ্চদশ প্রকারের দাসের উল্লেখ পাই ;—

দাসঃ পঞ্চদশবিধঃ।

গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধো দায়াছপাগতঃ।
অন্নকাল ভৃতস্তদ্বৎ আহিতঃ স্বামিনা চ যঃ।
মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাৎ যুদ্ধোপ্রাপ্তঃ পণেজিতঃ।
তবাহমিত্যুপাগতঃ প্রব্রজ্যাবাসিতঃ কৃতঃ।





সেই দলীলখানা এই :—

শ্রীদুর্গা :—

শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়ভুষণ—
সাকিন চান্দসি সুচরিতেষু—
শ্রীরামদাস দাস সাকিম বটোযোড়—
পরগণে বাঙ্গরোড়া অস্য লিখনং আগে

শ্রীরামদাস দাস
নিশানী

শ্রীমতী কুঞ্জমালা জওজে রামরুদ্রতে সাকিন পিপীলাকাঠী পরগণে আজিমপুর এবং ওহার কন্যা শ্রীমতী মহামায়া এই দুইজন সেইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার স্থানে আত্ত বিক্রী হইল এহার দুর দুইজনকে আমী আনিয়া দিলাম এহার ভাসুর শ্রীরাম রামতে ইসাদী করেন, দুই তঙ্কা আমি নিলাম এহার নাম কওলায় লিখাইয়া দিব যদি না লিখাইয়া দিতে পারি তবে এই জৈন্তে কিছু খেসারত আপনার হয়ে তাহার নিসা আমি করিব ইতি সন ১১৯৫ তেরিখ ১৪ অগ্রহায়ণ।"

এইটি দলিলের রসীদ, কুঞ্জমালা যে তিনটাকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা হইতেই কি এই দালাল দুই টাকা পাইল! তবে আর এই রসীদের প্রয়োজন কি ছিল? অথচ কুঞ্জমালা এই বহায়ের তিনটি টাকার কি ব্যবহার করিল, তাহা বুঝাযাইতেছে না।

এই স্বীকার-পত্রী বা রসীদ-পাঠে ইহাও বুঝা যায় যে, এই প্রকার আত্ম-বিক্রয়, বা দাস-দাসী-ক্রয়-বিক্রয় তৎকালে সমাজে প্রচলিত ছিল; সমাজে ঘৃণিত হইবার বা রাজদ্বারে কি ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডের আশঙ্কা থাকিলে এই প্রকার দলীল-সম্পাদন সম্ভবপর হইত না। তবে, দালালি বা আড়কাঠির কৃপায় কোন রমণী কাহারও গৃহে দাস-বৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হইলে, পরে যদি তাহার আত্মীয় কেহ অভিভাবকস্বরূপে সেই রমণীর উদ্ধারের জন্য রাজদ্বারে বা সমাজে প্রার্থী হইত তবে তাহাকে মুক্তি প্রদান করিতে হইত। নচেৎ ক্রেতা ন্যায়ভূষণ মহাশয়, কুঞ্জমালার ভাসুর রাম রামতের সম্মতির জন্য এত ব্যগ্র হইবেন কেন? এবং দালাল রাম রাম দাসই বা কেন "খেসারত নিশা" করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে?

খৃঃ ১৮৩০ অব্দে দণ্ডবিধি বিধিবদ্ধ হয়, দণ্ডবিধির পূর্ব্বে এই প্রথা অব্যাহত-ভাবে প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্যদেশের দাসত্ব ও আলোচনা কালে এ দেশের দাসত্বপ্রথার বিলক্ষণ পার্থক্য আছে।

A slave is a creature without any right or status whatever, who is, or may become, the property of another as a mere chattel, the owner having absolute power of disposal by sale, gift or otherwise

over the slave without being responsible to any legal authority. In *the east there is a modified kind of slavery*, for children are purchased from their parents or strangers and are brought up as domestic servants, having little or no personal liberty conceded to them and though they are not ordinarily sold, yet they are transferred from one member of a family to another, by way of gift.

Sec. 370l. P. C. 39 and 40 Vict. Ch. 46.

পাশ্চাত্য দেশে দাসের সংজ্ঞা এই :—

দাসের কোন প্রকারের স্বত্ব বা অধিকার নাই, জড়পদার্থ ও পশ্বাদির ন্যায় দাস-স্বামীর সম্পত্তি ? স্বামীর ইচ্ছানুসারে দাস দান-বিক্রয় ইত্যাদি দ্বারা হস্তান্তরিত হইতে পারে, এবং স্বামী তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন (এক সময়ে দাসকে হত্যা করিলেও স্বামী রাজদ্বারে দণ্ডিত হইত না)।

প্রাচ্যে দাসত্বের আকৃতি অন্য প্রকারের। পিতামাতা কি অপর অপর কোন ব্যক্তি হইতে শিশু ক্রীত হইয়া গৃহকার্য্যে নিয়োজিত হইত, এবং ক্রীত ব্যক্তিদিগের কোন প্রকারের স্বাধীনতা ছিল না। যদিও সচরাচর দাস-দাসী বিক্রয় হইত না, কিন্তু পরিবারস্থ এক ব্যক্তি অপরকে কি আত্মীয়-স্বজনকে দাস-দাসী দান করিতে পারিত। দণ্ডবিধি আইনের ৩৭০ ধারার নিয়ম এই :—

Whoever imports, exports, removes, buys, sells or disposes of any person as a slave or accepts, receives or detains against his will, any person as a slave, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

"যে ব্যক্তি অপর কেহকে দাসস্বরূপে আমদানী রপ্তানি, স্থানান্তর, ক্রয়-বিক্রয় অথবা অন্য প্রকারে হস্তান্তর করে অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহকে দাসস্বরূপে গ্রহণ বা আবদ্ধ করে, তাহার ৭ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কি বিনাশ্রমে কারাবাস এবং অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।"

এই বিধানই অস্মদ্দেশে দাসত্বপ্রথার মূলোৎপাটন জন্য বিহিত হইয়াছিল।

বিশ্বপ্রেমিক টমাস্ ক্লার্কসন ও উইলিয়াম উইলবারফোর্ডের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে দাস-ব্যবসায় নিবারণ জন্য এক সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্রায় বিশ বৎসর পরে উক্ত মহানুভবদিগের আন্দোলনে ও চেষ্টায় ১৮০৭ খৃঃ অব্দে পার্লমেণ্টে দাসব্যবসায় রহিত জন্য আইন বিধিবদ্ধ হয়। সুসভ্য



[illegible]

শ্রীহরিশ্চন্দ্র
দেব শর্ম্মা

[illegible]

স্বাধীনতার লীলাভূমি ইংলণ্ডেই বিশ বৎসরের বৈধ আন্দোলনে, এই জঘন্য দাস-ব্যবসায় উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে রহিত হইল; আর এই দেশে এবম্বিধ কুপ্রথা নিবারণ জন্য কত বৎসরের আন্দোলন প্রয়োজন, তাহা আপনারা ভাবিয় দেখিবেন।

তারপর, ক্রীতদাসগণকে স্বাধীনতা-প্রদানের চেষ্টা। কেবল সেইদিন অর্থাৎ ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে "মুক্তি আইন" ( Emancipation Act. ) দ্বারা ব্রিটিস সাম্রাজ্যের দাসগণ স্বাধীনতা লাভ করে, এবং দাস-স্বামীদিগকে ২০,০০০,০০০, পাউণ্ড মুদ্রা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

ইয়ুরোপের ও এসিয়ার কোনও কোনও দেশে, প্রকাশ্য বাজারে, অপরাপর পণ্য-দ্রব্যের ন্যায় দাস-দাসী-ক্রয়বিক্রয় হইত, যৌবন ও রূপলাবণ্যসম্পন্না দাসীগণ ভাগ্যবশতঃ কখন কখন ক্রেতার পত্নীত্বে বা উপপত্নীত্বেও পরিগৃহীতা হইত, ক্রীতদাসীর ভাগ্যে কখন রাজসম্মানও ঘটিয়াছে এবং ক্রীতদাসগণ রাজ-সভায় সম্মান ও খ্যাতি লাভ করিত, ইহার সাক্ষ্য ইতিহাসে দুর্লভ নহে।

আলোচ্য দলীল-সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রথমে অর্থনীতির কথা। আমরা দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি। জীবন-সংগ্রাম কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে। কিন্তু, একশত কি একশত পঁচিশবৎসর পূর্ব্বে তিন টাকা পাইয়া মা ও কন্যা আত্মবিক্রীতা হইল, সোয়ামণ হলধি সিধা দিতে পারিলে সত্তর বৎসরের দাসত্ব বিমোচন হইবে, এ প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

প্রায় ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে এই দলীল লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং ইংরেজ অধিকারে, অবাধ বাণিজ্য ও বৈদেশিক শাসননিবন্ধন অর্থের বহির্ম্মুখিনী গতি সত্ত্বেও ভারতবাসী দরিদ্র হইতেছে কিনা, অর্থনীতিবিদ্ এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

দ্বিতীয় ভাষার কথা :—

ধর্ম্মাধিকরণে ও ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত সাহিত্যে যদিও অদ্যাপি বহু পারসিক ও উর্দ্দু শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে, আজকালকার দলীল পত্রের ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে শব্দ বিবর্জ্জিত।

'ওলদে', 'ওমর', 'জওজে', 'আজিজ', 'রাজিরকবতে', 'আক্লে', 'বহালতবিয়তে', 'বহায়', 'সহমানী', 'দস্তবদস্ত', 'লওয়াজিমা', 'মুদ্দত', 'সিধা', 'করার'; ইত্যাদি শব্দ অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তবে, হয়ত একখানি সামান্য দলিলে এতা-

ধিক অন্য ভাষোৎপন্ন শব্দ আজকাল পরিলক্ষিত হইবে না। তখন যে বাঙ্গালা ভাষার কোন ব্যাকরণ সংকলিত বা তাহার শাসন সুপ্রতিষ্ঠ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত।

"এত না আছে" "যদি না লিখাইয়া দিতে না পারি" ইত্যাদি কথা যে ব্যাকরণ শাসনাতীত, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বাঙ্গলা অক্ষরের ক্রমবিকাশের পর্য্যায় এই দুইখানি দলীলে বিশেষভাবে দেখিতে পাইবেন। সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সভ্য, পণ্ডিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত থাকিলে তাঁহার গবেষণার ফল আমরা উপভোগ করিতে পারিতাম; দেবনাগর ও প্রাকৃত অক্ষর হইতে বর্ত্তমান বঙ্গের বর্ণমালার বিবর্ত্তনও বুঝিতে পারিতাম। একশত কি সোয়াশত বৎসর পূর্ব্বের লিখিত একখানি সামান্য লিপির পাঠোদ্ধার করিতে আমরা এই শাখা-পরিষদের সভ্যগণ সমর্থ হই নাই। আমাদের সম্পাদক মহাশয়ের একজন প্রাচীন কর্ম্মচারী, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাসগুপ্ত মহাশয়ের সাহায্যে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছি। একশত বৎসরে বঙ্গাক্ষরেরইবা কত পরির্ত্তন।

আ, কু, ক্র, ঙ্ক, ত্ম, শ্রী, দ্ধ, স্থ, জ, ষ্ট, মু, মো, ঞ্চ, ন্দ প্রভৃতি লিখন-প্রণালী বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য।

কীটপতঙ্গ ও সাধারণতঃ জীব-বাহুল্য গ্রীষ্মপ্রধানদেশের একটি বিশেষ লক্ষণ; কীটপতঙ্গের কৃপায় ও জলবায়ুর গুণে, এই ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন লিপি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ভারতেতিহাস ক্রমশঃ যে তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঠিক ইতিহাস বেশী না থাকিলেও, ইতিহাস-সঙ্কলনোপযোগী দ্রব্যসম্ভারের অভাব ছিল না। কত প্রাচীন দলীল, পুঁথি ইত্যাদি যে কীটপতঙ্গ কর্ত্তৃক বিনষ্ট ও বায়ুর আর্দ্রতায় ( humidity ) ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? যদিও অতি প্রাচীনকাল হইতে কাগজের ব্যবহার এদেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহার স্থায়িত্বে সন্দিহান হইয়া কি প্রাচীনেরা তাম্রফলক, প্রস্তরফলক ও শিলালিপি প্রভৃতির আশ্রয় লইয়াছিলেন? আর সেই "কাগজ" দৃঢ় ও বহুকালস্থায়ী করিবার জন্যইবা কত আয়োজন! কাগজ "তুলোট" করার প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইতেছে; কিন্তু, এই তুলোট করার নিয়ম পিতৃপিতামহগণ অবগত ছিলেন বলিয়াই আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের মনস্বিতা ও চিন্তাশীলতার ফল উপভোগ করিতেছি; নচেৎ আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য কলজাত কাগজ ব্যবহৃত

টিকিতে পারিত না।. এই দলীল দুইখানি তুলোট কাগজে লিখিত না হইলেও এই ,বাথরগঞ্জোৎপন্ন নারকুলি বা পেসি কাগজে লিখিত বলিয়া এতদিনেও নষ্ট হইয়া যায় নাই।

উপসংহারে পরিষদের সভ্য ও অন্যান্য সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের নিকট আমার এই অনুরোধ যে, প্রাচীন দলিল ও ফলকাদি আপনাদের নয়নপথের পথিক হইলে কদাচ যেন উপেক্ষিত না হয়। তাহাদের মধ্যে ভারতের ইতিহাসের উপাদান নানাভাবে বিক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, এবং সেই সমস্ত উপাদান সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইলে, এই ইতিহাস-শূন্যদেশেও ইতিহাসের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত।

---

# তন্ত্র-পরিচয়।

## তারাতন্ত্রম্।

তন্ত্র-সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য। তাহা যথাক্রমে মূল-গ্রন্থ, নিবন্ধ-পুস্তক ও টীকাটিপ্পনী নামে কথিত হইতে পারে। অনেক গ্রন্থ আধুনিক হইলেও, সকল গ্রন্থ আধুনিক নহে। যাহা পুরাতন, তাহা নানা ঐতিহাসিক তথ্যের আধার।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, পুরাতন সংস্কৃত পুঁথীর বিবরণে (১) তন্ত্র-সাহিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—"শিবকেই সকল স্থলে তন্ত্র-গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। তিনি তাঁহার প্রিয়তমার [ পার্ব্বতীর ] প্রশ্নে অল্পে অল্পে গুপ্ত-সাধন-রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। ক্বচিৎ হর-পার্ব্বতীর স্থলে শিবানুচর ভৈরবের ও তাঁহার প্রিয়তমা ভৈরবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।"

সর্ব্বত্রই এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কোনও কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—পার্ব্বতী বলিয়াছেন, শিব শ্রবণ করিয়াছেন। কোনও কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—ভৈরবী বলিয়াছেন, ভৈরব শ্রবণ করিয়াছেন। আবার কোনও কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—

(১) Notices of Sanskrita Manuscripts. Second Series, Vol. I.

শিব বলিয়াছেন, আর শ্রবণ করিয়াছেন হয় নারদ, না হয় কার্ত্তিকেয়, না হয় ব্রহ্ম-ভৈরব।

পুরাণের ন্যায় তন্ত্রেরও কতকগুলি "লক্ষণ" সুপরিচিত ছিল। তন্ত্রের বর্ণনীয় বিষয় কি কি ছিল, "লক্ষণে"র সাহায্যে তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এখন আর সম্পূর্ণ-লক্ষণাক্রান্ত তন্ত্র-গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। লক্ষণগুলি বারাহী-তন্ত্রে উল্লিখিত আছে। (২)

মূলগ্রন্থের সংখ্যা চতুঃষষ্টি বলিয়া [ সময়াচার-তন্ত্রে ] উল্লিখিত। তদ্ভিন্ন আটখানি "যামল", তিনখানি "ডামর" ও অসংখ্য "উপতন্ত্র"ও মূল-গ্রন্থের অন্তর্গত। এখন অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা আছে, তাহাও সমগ্র গ্রন্থ কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়ের অভাব নাই। এখন যে সকল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একটি বিপুল সাহিত্যের একাংশমাত্র।

বেদমন্ত্রের ন্যায় তন্ত্রও এক সময়ে শ্রুতি-রূপেই প্রচলিত ছিল। বেদ-মন্ত্রের ন্যায় তন্ত্রও উত্তরকালে গ্রন্থনিবদ্ধ হইয়াছিল। এই জনশ্রুতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। কুল্লূকভট্ট ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"শ্রুতি হি দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।"

এখন যে সকল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ভাষা ও রচনা-রীতি সমধিক পুরাকালের পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। তন্ত্র-সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃত হইলেও, বহু পুরাকালের ভাষা বলিয়া কথিত হইতে পারে না। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রি মহাশয় লিখিয়াছেন,—"তন্ত্রের ভাষা ব্যাকরণ-দুষ্ট; কোনও কোনও স্থলে বিলক্ষণ উদ্বেগজনক"। কিন্তু রাঘবভট্ট, গদসিংহ প্রভৃতি টীকাকারগণের টীকাটিপ্পনীতে দেখিতে পাওয়া যায়,—তন্ত্রের ভাষা ব্যাকরণ-দুষ্ট ছিল না। উত্তরকালের অল্পশিক্ষিত লিপিকরের অত্যাচারে অনেক ভ্রমপ্রমাদ প্রবেশলাভ করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

ক্রিয়া-কর্ম্মের উপদেশ মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইলে, অনায়াসলভ্য হইতে পারে। কিন্তু জন-সাধারণের বিশ্বাস, তাহাতে গ্রন্থ মাহাত্ম্য-বিচ্যুত হয়। তজ্জন্য মুদ্রিত তন্ত্রগ্রন্থ শ্রদ্ধালাভ করিতে পারে নাই। অধিকাংশ মুদ্রিত গ্রন্থ যে ভাবে মুদ্রিত, তাহাতে তাহা বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া খ্যাতিলাভ

(২) শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ অনুগ্রহ করিয়া বারাহীতন্ত্রের এক পুথী পাঠাইয়া দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

করিতে পারে না। অগত্যা হস্তলিখিত গ্রন্থের সমাদর ক্ষুণ্ণ নাই। কিন্তু উত্তরকালের হস্তলিখিত গ্রন্থের অবস্থাও মুদ্রিত গ্রন্থের অনুরূপ। সুতরাং পুরাতন গ্রন্থ না পাইলে, এবং এক গ্রন্থের একাধিক পুঁথী না পাইলে, তন্ত্র-সাহিত্যের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চেষ্টায় অনেক পুরাতন তন্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। তাহা প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালীর ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব রহস্য প্রকাশিত হইতে পারিবে। "গৌড়গ্রন্থমালা"র প্রথম সংখ্যারূপে তারাতন্ত্রের মুদ্রাঙ্কন আরব্ধ হইয়াছে। তাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থের মূল ও পাঠান্তর অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক সযত্নে সঙ্কলিত হইয়াছে।

তারা মহাবিদ্যা। তারাতন্ত্রে তাঁহারই উপাসনা-পদ্ধতি বিবৃত রহিয়াছে। তাহা অদীক্ষিতের নিকট অবক্তব্য গুহ্যতত্ত্বে পরিপূর্ণ বলিয়া, মূলগ্রন্থ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। অনুসন্ধান-সমিতি চারিখানি পুঁথীর উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থমুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহার শ্লোক-সংখ্যা ১৫০ মাত্র। কিন্তু বারাহী-তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,—তারাতন্ত্র মহাতন্ত্র,—তাহার শ্লোক-সংখ্যা দ্বাদশ সহস্রেরও অধিক ছিল! এখন আর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের সন্ধানলাভের সম্ভাবনা নাই। যে পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, এখন তাহাই অবলম্বনীয়।

প্রথম পটলে ভৈরবীর প্রথম প্রশ্নে জানিতে পারা যায়,—মহেশ্বর তাঁহার প্রিয়তমার নিকটেও সহসা সকল রহস্য ব্যক্ত করেন নাই। একবার মহেশ্বর কেবল প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন,—বুদ্ধ ও বশিষ্ঠও "কুলভৈরব" ছিলেন। বুদ্ধ এবং বশিষ্ঠও তান্ত্রিক সাধক ছিলেন শুনিয়া, পার্ব্বতী কৌতূহলাবিষ্টা হইয়াছিলেন। সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার আশায়, [ তারাতন্ত্রের আরম্ভে ] পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—বুদ্ধ এবং বশিষ্ঠ যে "কুলভৈরব" ছিলেন, তাহা শুনিয়াছি ; তাঁহারা কোন্ মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাই এখন শুনিতে ইচ্ছা করি। এইরূপে তারাতন্ত্রের আরম্ভ।

সেই গুপ্তমন্ত্রের উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, ভৈরব যথাযোগ্য সাবধানতার সহিত বলিয়াছেন,—"সে মন্ত্র তারার মন্ত্র। তাহা বুদ্ধের বহুপূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল। তাহার সাধনা করিয়া সদাশিব সর্ব্বেশ হইয়াছিলেন ; দুর্ব্বাসা এবং ব্যাস-বাল্মীকি-ভারদ্বাজাদি কবি হইয়াছিলেন ; ভীমসেন এবং অর্জ্জুনাদি রণজয়ী হইয়াছিলেন।"

হয় ত যে অংশ লুপ্ত হইয়া গয়াছে, তাহাতেই বিস্তৃত উপদেশ সন্নিবিষ্ট ছিল। এখন যাহা আছে, তাহা বুঝিতে হইলে, নানা গ্রন্থের ও গুরূপদেশের শরণাপন্ন হইতে হয়। এই মন্ত্রের সাধনা এখনও প্রচলিত আছে। তারা-সাধনার বহু গ্রন্থের সন্ধান লাভ করা যায়। তাহাতেই মনে হয়, পুরাকালে তারার আরাধনা এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে সর্ব্বলোকপ্রিয় বলিয়া দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ তুল্যভাবেই তারার আরাধনা করিতেন। বৌদ্ধ উপাসক এখন আর এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না।

লম্বোদরের পৌত্র, কমলাকরের পুত্র, শঙ্কর নামক আচার্য্য "বাসনাতত্ত্ব-বোধিনী" নাম্নী পুস্তিকার রচনা করিয়া, তারা-পূজার অনেক উপদেশ একত্র সঙ্কলিত করিয়া গিয়াছেন। তাহা "তারারহস্যবৃত্তিকা" নামেই সুপরিচিত। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে ভগবৎপাদশ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও তন্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া উল্লিখিত। "প্রপঞ্চসার" নামক গ্রন্থ তাঁহারই লেখনীপ্রসূত বলিয়া পরিচিত। (৩)

মহাযান-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ তারার আরাধনা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ মূর্ত্তির পূজা করিতেন, এবং হিন্দুগণ যেরূপ মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন, এতদুভয়ের মধ্যে মূল বিষয়েও বিলক্ষণ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ সময় হইতে পার্থক্য প্রচলিত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করিবার উপায় নাই। অনেক কারণে মনে হয়,—এই পার্থক্য উত্তরকালে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। আজকাল হিন্দুগণ তারার মূর্ত্তি যে ভাবে নির্ম্মাণ করাইয়া আসিতেছেন, সেরূপ প্রাচীন মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। তারার যে সকল প্রাচীন মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়াই কথিত হইতেছে। কিন্তু সকল মূর্ত্তি বৌদ্ধমূর্ত্তি কি না, তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই।

তারাতন্ত্রের যে ছয়টিমাত্র পটল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তারার ধ্যান উল্লিখিত নাই। অথচ পরবর্ত্তী গ্রন্থে তারার ধ্যান উল্লিখিত আছে। তাহার সহিত বুদ্ধোপাসিতা তারামূর্ত্তির সামঞ্জস্য নাই। হিন্দু উপাসক-সমাজে যে ধ্যান প্রচলিত আছে, তদনুসারে তারা প্রত্যালীঢ়পদা, মুণ্ডমালা-বিভূষিতা, ব্যাঘ্রচর্ম্মা-বৃতা, চতুর্ভুজা, খর্ব্বা, লম্বোদরী। এই ধ্যান রুদ্রযামলে উল্লিখিত আছে ; বাসনা-তত্ত্ব-বোধিনীতে তদনুরূপ ধ্যেয়-রূপের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু

(৩) এই দুর্ল্লভ গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। যিনি মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাঁহার উদ্যোগেই "প্রপঞ্চসারে"র মূল মুদ্রিত হইতেছে।

তাহাতে কয়েকটি অতিরিক্ত বর্ণনাও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে সর্পালঙ্কারের কথা আছে, অস্থিমালার কথা আছে, ললাট-পট্টিকার কথা আছে।

বুদ্ধোপাসিতা তারামূর্ত্তির মস্তকে অক্ষোভ্য-মূর্ত্তি যোগাসনে উপবিষ্ট। তারা-তন্ত্রেও অক্ষোভ্যের উল্লেখ আছে। রুদ্রযামলোক্ত ধ্যানে মৌলিমধ্যে অক্ষোভ্যরও ধ্যান করিবার উপদেশ আছে। হিন্দুগণ এখন যে মূর্ত্তির উপাসনা করেন, তাহার মস্তকে অক্ষোভ্যমূর্ত্তি নাই ;—তৎপরিবর্ত্তে সর্প বিরাজমান। "মহানীল-তন্ত্রে" অক্ষোভ্য "নাগরূপধরং" বলিয়া উল্লিখিত। কোন্ সময় হইতে কি কারণে মূর্ত্তিনির্ম্মাণে এই সকল পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতির একটি জটিল প্রশ্ন।

আরও একটি জটিল প্রশ্ন আছে। তারার উপাসকগণকে বিষ্ণুরও উপাসনা করিতে হইত। এখন যে সকল পুরাতন বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা অনেক সময়ে তারামূর্ত্তির সঙ্গে এক স্থানে আবিষ্কৃত হইলেও, বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলি হিন্দুমূর্ত্তি এবং তারামূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়াই কথিত হইতেছে। যাতুঘরে আসিয়া, মূর্ত্তিগুলিও বিভিন্ন কক্ষে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে। সকল বিষ্ণুমূর্ত্তিই হিন্দুমূর্ত্তি কি না, এবং সকল তারামূর্ত্তিই বৌদ্ধমূর্ত্তি কি না, তাহার তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন এখনও অনুভূত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করায়, আমাদের অনুসন্ধান-চেষ্টা পরপদক্ষুণ্ণ পুরাতন পথেই প্রধাবিত হইতেছে।

তারা-পূজা কিরূপে প্রচলিত হইয়াছিল, "তারাতন্ত্রে" তাহার উল্লেখ না থাকিলেও, "রুদ্রযামলে" ও "ব্রহ্মযামলে" তাহা উল্লিখিত আছে। সে আখ্যায়িকা কৌতূহলপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। তাহা এইরূপ :—

ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ বহু সহস্র বৎসর যোগসাধন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, পিতার নিকট আসিয়া অন্য মন্ত্র-গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে মন্ত্রত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। "রুদ্রযামলে" দেখিতে পাওয়া যায়,—ব্রহ্মা আরও বলিয়াছিলেন যে, তারা সংসারার্ণবতারিণী,—শক্তিচক্রপ্রবর্ত্তিকা,—শুদ্ধচীনাচাররতা —অথর্ব্ববেদশাখিনী,—বুদ্ধেশ্বরী। যথা,—

শুদ্ধচীনাচাররতা শক্তিচক্রপ্রবর্ত্তিকা।<br>
অনন্তানন্তমহিমা সংসারার্ণবতারিণী।<br>
বুদ্ধেশ্বরী বুদ্ধিরূপা অথর্ব্ববেদশাখিনী।

তারা বুদ্ধেশ্বরী—তারা অথর্ব্ববেদশাখিনী—এই দুইটি কথা "ব্রহ্মযামলে"

দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উভয় "যামলেই" দেখিতে পাওয়া যায়,—পিতার উপদেশে বশিষ্ঠ পুনরায় যোগমার্গে সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বশিষ্ঠ কোথায় যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে উভয় "যামলে" কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। "রুদ্রযামলে"র মতে, বশিষ্ঠ যোগসাধনের জন্য সমুদ্রতীরে গমন করিয়াছিলেন। যথা,—

এতচ্ছ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
জগাম উদধেস্তীরে বশী বেদান্তবিৎ শুচী॥

"ব্রহ্মযামলে" সমুদ্রতীরের উল্লেখ নাই; তাহাতে "কামাখ্যা"র নাম উল্লিখিত আছে। যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার অভীষ্ট দেবতা তারাকে অভিশাপ প্রদান করায়, দেবী আবির্ভূতা হইয়া, মহাচীনে গিয়া বুদ্ধদেবের নিকট উপদেশ-গ্রহণের আদেশ দিয়া, অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। মহাচীন হিমালয়ের পার্শ্বদেশে। তথায় গিয়া বশিষ্ঠ দেখিলেন,—

রণজ্জ্বঘনরাবেণ রূপযৌবনশালিনা।
মদিরামোদচিত্তেন বিলাসোল্লসিতেন চ॥
শৃঙ্গারসারবেশেন জগন্মোহনকারিণা।
ভয়লজ্জাবিহীনেন দেব্যা ধ্যানপরেণ চ॥
কামিনীনাং সহস্রেণ পরিবারিতমীশ্বরম্।
মদিরাপানসঞ্জাত-মন্দমন্দাবলোকনম্॥

বিস্ময়ে সংশয়ে অভিভূত হইয়া, বশিষ্ঠ দেখিলেন,—ভগবান্ বুদ্ধদেব কামিনী-সহস্র-পরিবৃত,—মদিরাপান-সঞ্জাত-মন্দমন্দাবলোকন,—পঞ্চমকার-সাধনতৎপর। ক্রমে বুদ্ধদেবের কৃপায়, পঞ্চতত্ত্বের উপাসনায় দীক্ষিত হইয়া, বশিষ্ঠও তারামন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিলেন।

বৌদ্ধাচার ভিন্ন তারামন্ত্রে সিদ্ধিলাভের উপায় নাই, ইহা সর্ব্বতন্ত্রেই স্বীকৃত। সুতরাং তারাপূজার সঙ্গে বৌদ্ধাচার ও বৌদ্ধপ্রভাব মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তারাপূজার কোনও কোনও স্তোত্রে হিন্দুগণও তারাকে "প্রজ্ঞাপারমিতা" বলিয়া স্তবস্তুতি করিয়া আসিতেছেন। ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর ইতিহাসের যে সকল তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহা এখনও যথাযোগ্যভাবে আলোচিত হয় নাই। সুতরাং, যাঁহারা বাঙ্গালীর ইতিহাস লিখিবেন, তাঁহাদিগকে তন্ত্র-সাহিত্যের আলোচনায় লিপ্ত হইতে হইবে। তাহার প্রধান অন্তরায়—গ্রন্থাভাব। এখনও বহু গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে; কিন্তু এখন আর তাহার অধ্যয়ন-অধ্যা-

পনা পূর্ব্ববৎ প্রচলিত নাই। তাহাতেই বিশুদ্ধ পাঠ নানা প্রকারে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। বহুসংখ্যক হস্তলিখিত পুস্তকের সাহায্যে উপযুক্ত ব্যক্তির চেষ্টায় মূল গ্রন্থাদি প্রকাশিত না হইলে, ঐতিহাসিক আলোচনা পরিচালিত হইতে পারে না। তাহার অভাবে মূর্ত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালীর গ্রন্থে ও প্রবন্ধে কত কল্পনা জল্পনা প্রশ্রয় লাভ করিতেছে, কখনও কখনও কোনও কোনও লেখকের অনধিকার-চর্চ্চা কত কুতর্কজাল বিস্তৃত করিতেছে! বাঙ্গালীকে বুঝিতে হইলে, তন্ত্র সাহিত্য বুঝিতে হইবে;—বাঙ্গালীর ইতিহাস রচনা করিবার পূর্ব্বে, তন্ত্রসাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলিত করিতে হইবে। তাহা শ্রমসাধ্য,—ব্যয়সাধ্য,—অধ্যবসায়সাধ্য।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

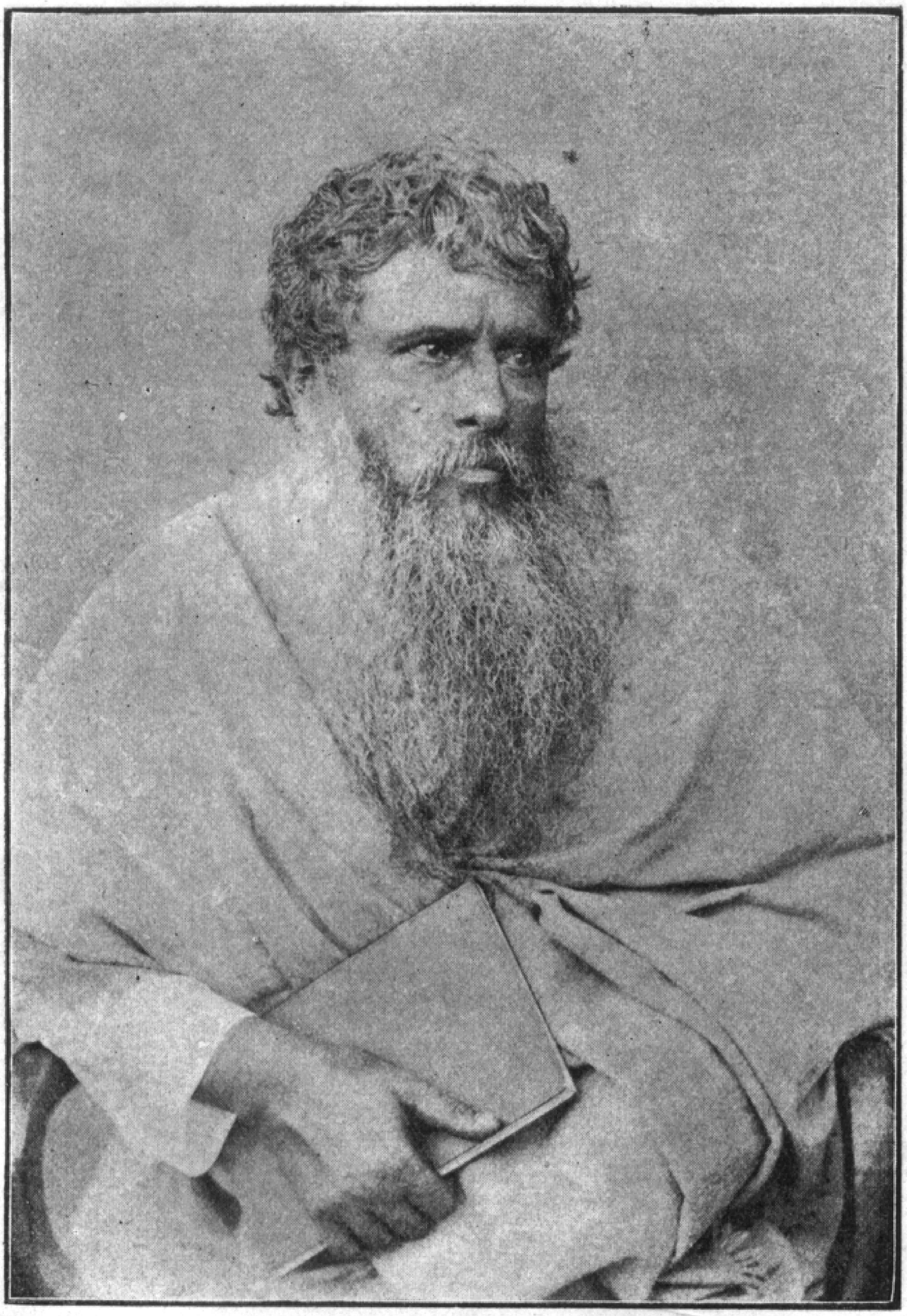
# স্মৃতি-পূজা।

আপনাদের কাছে যে প্রস্তাবটি সমর্থন করবার ভার আমার প্রতি অর্পিত হয়েছে, তা আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম যদিও আমার মনে হয় যে ইহা যোগ্যতর হস্তে সমর্পিত হইলে ভাল হইত। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার যে আলাপ পরিচয় ছিল না, তা' নয়। সভাসমিতি ও অন্যত্র মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইত—তাঁহার সঙ্গীত তাঁর নিজের কণ্ঠ হতে শুনে অনেক সময় মেতে উঠেছি। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ হয়; সে সময় তাঁকে ভালই দেখেছিলুম—তিনি তখন তাঁহার ভারতবর্ষ-প্রকাশের আয়োজনে উৎসাহিত ছিলেন। সে সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হল—কে মনে করেছিল যে, এই অল্পদিনের মধ্যে নিষ্ঠুর কাল এসে আমাদের কাছ থেকে তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাবে? তাঁর সঙ্গে আমার যে পরিচয়, সে এই রকম ভাসা ভাসা, —তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার জানা ছিল না। তাঁর বাল্য-জীবন প্রৌঢ়-জীবনের বৃত্তান্ত সকল আমি অল্পই জানি—আর যা কিছু জানি, সে সব শোনা কথা; আর আপনারা জানেন যে, শোনা কথা আদালতে গ্রাহ্য নয়। এই সকল কারণে আমি তাঁর জীবন-চিত্র আপনাদের সম্মুখে জলন্তভাবে ধারণ করতে পারব না—তাঁর জীবন-কাহিনীর নব নব ঘটনা ব'লে আপনাদের মনস্তুষ্টিসাধন করতে পারব না। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে —তাঁর জীবনের মূল্য শুধু ব্যক্তিগত নয়। তিনি যে তাঁর পরিবারের কিংবা

বন্ধুবর্গের নিজস্ব সম্পত্তি ছিলেন, তা নয়—তিনি আমাদের জাতীয় সম্পত্তি—তাতে আমাদের সাধারণ সকলেরই অধিকার—আমরা সকলেই সে সম্পত্তি উপভোগ করছি। তিনি আমাদের সাহিত্য-জগতের রাজা ছিলেন, আমরা তাঁর করদ প্রজা। তাঁর প্রতি যে কর্ত্তব্য-ভার, তা আমাদের সকলকেই অল্প বিস্তর বহন করতে হবে। তাই আমি আগ্রহসহকারে এই শোক-সভায় উপস্থিত হয়েছি, এবং উল্লিখিত প্রস্তাবটি এই সভায় উত্থাপন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

সেই মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষা কি উপায়ে হতে পারে—তার প্রকৃষ্ট উপায় কি, তাই আলোচনা করতে আমরা অদ্য এখানে সমবেত হয়েছি। তিনি আমাদের সকলকে যে অমূল্য দান দিয়ে গিয়েছেন, তার জন্য আমরা তাঁর নিকট চিরঋণী—সে ঋণ কখনই আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে পারব না। তাঁর অতুলনীয় হাসির গানে আমরা কত মজলিসে কত আমে পেয়েছি—তাঁর 'নন্দলাল', তাঁর Reformed Hindu শুনে অনেকে হয় তো মর্ম্মাহত হয়ে থাক্‌বেন; কেন না, ইংরেজী প্রবচনের কথায় এই টুপিটি তাঁদের মাথায় ঠিক বসে। কিন্তু সে কশাঘাতে কারও গায়ে দাগ পড়ে না—তাহা মধুমাখা হাস্য-রসোদ্দীপক। সে কবিরাজের তিক্তবড়ী—পীড়ার উপশমই তার উদ্দেশ্য। তা ছাড়া তাঁর জাতীয় সঙ্গীত—'আমার জন্মভূমি', 'আমার দেশ' আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের শিরোভূষণ—বাঙ্গালীদের চিরসম্পদ! তাঁর কাছ থেকে আমরা যে এত উপকার পেয়েছি, তার প্রত্যুপকারের জন্য কি আমরা কিছুই করব না? যে জাতি তার বড়লোকদের মর্য্যাদা রক্ষা করতে জানে না, সে জাতি কখনই মহত্ত্ব-শিখরে পৌঁছিতে পারে না।

তাঁর স্মৃতিরক্ষার কি উপায়? তা ঠিক করবার আগে কত টাকা ওঠে, তা জানা আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ের ভুক্তভোগী, আমরা বেশ জানি,—স্মৃতিসভায় যে সকল লম্বা চৌড়া বক্তৃতা হয়, তা প্রায়ই হাওয়ায় উড়ে যায়, কাজে তার ফল কিছুই হয় না। অতএব আমাদের আশা-রশ্মিকে সংযত করা উচিত। ধরে নিতে হবে, আমাদের পুঁজি অল্পই, বড় জোর ১০০০০, তার বেশী প্রত্যাশা করা যায় না। দেখতে হবে, তার মধ্যে কি করা যেতে পারে? একটা কোনও স্থায়ী কাজ; এমন কাজ যা মনে করা যেতে পারে—দ্বিজেন্দ্রলাল উপস্থিত থাকলে তিনি নিজে সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন কর্‌-



৺নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

Bijoya Press, Calcutta.

ব্রত, তার উন্নতিসাধনে যাতে সহায়তা হয়—বাঙ্গলা সাহিত্য-চর্চ্চার উত্তেজনা, বাঙ্গলা লেখকের পুরস্কার—এই রকম যা হয়, আপনারা স্থির করুন। এইরূপ একটা কোনও বিষয়ে আমাদের চাঁদার টাকা নিয়োগ করা তৈল-চিত্র বা মর্ম্মর-মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের চেয়ে আমার মতে শতগুণে প্রার্থনীয়।

এই বিষয় স্থির করবার জন্যে একটা কমিটী নিযুক্ত হোক্। কিন্তু আগে টাকাটা তোলবার জন্যে আপনারা সকলে সচেষ্ট হোন্। যিনি ধনী, তিনি মুক্তহস্তে আপনার ধনকোষ উন্মোচন করুন—যিনি নির্ধন, তিনিও যথাসাধ্য দান করে' এই ভাণ্ডার পূর্ণ করুন—নিশ্চয় আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এইরূপ কিছু করতে পারলে আমাদের ঋণ অল্প-মাত্রায়ও পরিশোধিত হতে পারবে। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানেই থাকুন, আমাদের এই সাধু চেষ্টা দেখে প্রীত হবেন।

আসলে দেখতে গেলে এই সকল মহাত্মার স্মৃতিরক্ষণে কোনও বাহ্য আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। তাঁরা মৃত্যুঞ্জয় হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা যে সকল কীর্ত্তি রেখে গিয়েছেন, তাই তাঁদের জীবন, তাতেই পরবর্ত্তী লোক-দিগের হৃদয়ে তাঁদের স্মৃতি জাগ্রত থাকবে। রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম—এঁদের কি কোনও পাষাণমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছে? অথচ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কি এঁদের নাম ধ্বনিত হয় না? আরও বলা যেতে পারে, মহাপুরুষদের সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণই তাঁদের স্মৃতিরক্ষা। দ্বিজেন্দ্রলাল যে চোখে স্বদেশকে দেখতেন, আমরাও যদি সেই চোখে দেখতে পারি—আমার জন্মভূমিকে 'আমার দেশ' জেনে দেশের কার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করতে পারি—সেই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রকৃষ্ট সাধন।

আমি আরম্ভে বলেছি, দ্বিজুবাবুর জীবনবৃত্ত আমার অপরিজ্ঞাত। কিন্তু উপসংহারে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে' থাকতে পারছিনে। ঘটনাটি এই :—তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি দু একখানি পত্র লিখতে ব্যস্ত ছিলেন—তার মধ্যে আমার ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের নামে একটি পত্র। সেই লেখা সমাপ্ত হবার পরক্ষণেই যেন হঠাৎ তাঁর উপর বজ্রপাত হল—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—সেই তাঁর পীড়ার শেষ প্রকোপ, কাছে ভৃত্যবর্গ ছাড়া আর জনপ্রাণী ছিল না। তাঁর প্রিয়পুত্র মণ্টু—মণ্টু বলে তাকে না কি একবার ডেকেছিলেন, কিন্তু মণ্টু কোথায়! হায়, তিনি তাঁর শেষ দেখা দেখতে

জল ঢালতে লাগল—জায়গাটা জলে জলময় হয়ে গেল—তাতে তাঁর প্রাণ রক্ষা হল না, শুধু ফল এই হল যে, তিনি যে লেখাগুলি লিখে গিয়েছিলেন, সব নষ্ট হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছিলেন, তার নামটি কেবল পড়বার মত ছিল—ভিতরকার কথাগুলো আর পাওয়া গেল না। এই দুই কবির মধ্যে কিছুকাল মতান্তর মনান্তর ঘটেছিল—এই পত্রই বুঝি বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলনের চেষ্টা—বিগ্রহের পর এই সন্ধিপত্র। কিন্তু তাঁর বাল্যবন্ধুর প্রতি উদ্দিষ্ট এই শেষ কথাগুলি চিরদিনের জন্যে কালসাগরে বিলীন হয়ে গেল, কি আপশোষ !*

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# দ্বিজেন্দ্রলাল।

উদার আঁধার মাঝে বিদ্যুতের মত
উঠেছিল ফুটে তব ক্ষিপ্র তীব্র হাসি
ঘনঘোর মেঘে ঘেরা দিগন্ত উদ্ভাসি'।
দেখায়েছ বাহিরের উদারতা কত ॥
গভীর অরণ্য মাঝে ক্রন্দনের মত
উঠেছিল বেজে তব মন্ত্র—মন্দ্র বাঁশী
রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্বরে স্বরে বেদনা উচ্ছ্বাসি'।
বুঝায়েছ অন্তরের গভীরতা কত ॥
সে আলো হারিয়ে গেছে এ দৃশ্য ভুবনে,
সে স্বর চারিয়ে গেছে এ স্পৃশ্য পবনে।
যে আলো দিয়েছ তুমি সহাস্যে বিলিয়ে,
যে স্বরে দিয়েছ তুমি ছায়াময়ী কায়া,
মনের আকাশে কভু যাবে না মিলিয়ে—
রহিবে সেথায় চির তার ধূপছায়া।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

---

* গত ৯ই শ্রাবণ কলিতার টাউন-হলে দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতিসভায় পঠিত।

# ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ইউরোপে ফরাসী বিপ্লব-বাদের যুগ নাশের যুগ। যাহা কিছু পুরাতন, যাহা কিছু আদিম, তাহা নষ্ট করিবার জন্য,—নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিবার জন্যই—যেন ফরাসী বিপ্লববাদের যুগের অবতারণা হইয়াছিল। এই বিপ্লববাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞান বা পদার্থ-বিদ্যা বিশ্লেষণের বিদ্যা; সকল সামগ্রী, প্রাকৃত সকল ঘটনা ছানিয়া ছাঁকিয়া, ঝাড়িয়া বাছিয়া, কাটিয়া খুলিয়া দেখিবার বিদ্যা। এই পদার্থ-বিদ্যা বা আধুনিক বিজ্ঞান বা সায়ান্সের দৃষ্টিতে পবিত্র বা অপবিত্র নাই; উচ্চ, নীচ, হেয়, মান্য—কোনও বিচারই নাই। কোথায় কি হইতেছে, কেমন করিয়া কোন ঘটনা ঘটিতেছে, কোন নিয়মে পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি হইতেছে, তাহাই দেখাইয়া এবং বুঝাইয়া দিবার জন্যই যেন আধুনিক 'সায়ান্সে'র উদ্ভব হইয়াছে। ফরাসী বিপ্লব-বাদ বিজ্ঞানের এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইউরোপের পুরাতন সমাজ-শরীরকে নষ্ট করিয়াছিল। Encyclopædist বা বিদ্যাবাগীশের দল এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রভাবে সামাজিক সকল ব্যাপারে মানুষের শ্রদ্ধা-বুদ্ধি নষ্ট করিয়াছিল। ডিডেরো (Diderot), ভল্‌টেয়ার, আবে সিয়ে (Abbe Syies) প্রমুখ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী মনীষিগণ বিজ্ঞানের এই কঠোর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ফরাসী দেশে নাস্তিকতার প্রাধান্য প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই অশ্রদ্ধা বা নাস্তিকতার বেদীর উপরে ফরাসী বিপ্লব-বাদ প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্গদেশে, ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠার পরে যে ইংরেজী শিক্ষা ও বিদ্যার প্রচলন হইয়াছিল, তাহা ফরাসী বিপ্লব-বাদের সকল-সিদ্ধান্ত-সমন্বিত বিদ্যা ও শিক্ষা। ইংরেজ বাহুবলে ফরাসী বিপ্লববাদীদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন বটে, বিপ্লব-বাদের অবতার নেপোলিয়নকে ওয়াটারলুর যুদ্ধে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন বটে, পরন্তু ঐ বিপ্লববাদের প্রভাব হইতে ইংলণ্ডের সাহিত্য এবং সমাজকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। ফক্স, গ্রে, উইগুহ্যাম হইতে কাউপার, বায়রণ, কোল্‌রিজ, ডি-কুইন্সী, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ পর্য্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগের ইংরেজ কবি ও লেখকমাত্রই ফরাসী বিপ্লববাদের সিদ্ধান্ত সকলের দ্বারা যেন বিমূঢ় আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত গদ্যে পদ্যে, কাব্যে নাট্যে, সাহিত্যের সকল বিষয়ে ফরাসী

বিপ্লববাদের সিদ্ধান্ত সকল ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্যমান। ঐ যুগের ইংরেজও ফরাসী বিপ্লববাদের প্রভাবে উদার ও প্রসন্নচেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে প্রসন্নতার ফলে ইংরেজ-অধিকারের মধ্যে দাস-প্রথা উঠাইয়া দিতে হইয়াছিল; দণ্ডবিধির কঠোরতাকে কোমল করিতে হইয়াছিল; সামাজিক বিধি নিষেধ সকলকে শিথিল করিতে হইয়াছিল। সে প্রসন্নতার ফলে, ইংরেজ পরাজিত কাফ্রি, নিগ্রো, ভারতবাসীদিগের প্রতি উদার ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। সে প্রসন্নতার ফলে বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল; বাঙ্গালীকে ইংরেজী শিখাইয়া ইংরেজের আদর্শে গড়িয়া তুলিয়া সম অধিকারে অধিকারী করিবার সাধ ইংরেজ শাসনকর্ত্তা ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এই প্রসন্নতার বেদীর উপর বাঙ্গালার ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত।

মূলের যাহা গুণ, ফলেরও প্রায়শঃ সেই গুণ হয়। ফরাসী বিপ্লববাদ নাশের—ধ্বংসের বাদ; ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই নাশের বাদ বাঙ্গালায় আমদানী হইয়া

"ভাঙ্গিল চূর্ণিল উলটি-পালটি,
লুটি নিল যা ছিল সার ও।"

সমাজ ভাঙ্গিল, ধর্ম্ম ভাঙ্গিল; জাতির পারম্পর্য্য নষ্ট করিল, অতীতের পুণ্যস্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল; পবিত্র অপবিত্র বিচার না করিয়া দেশের যাহা কিছু মধুর ছিল; সে সকলকে অবহেলায়—অবজ্ঞায় ছাইয়া ফেলিল। প্রজার দৃষ্টিতে রাজার জাতির আচার ব্যবহার, রীতি পদ্ধতি, অশন বসন আদর্শ বলিয়া মনে হয়; প্রজা রাজার সর্ব্বস্ব অনুকরণ করিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রজা গোড়ায় তাহাই মনে করিয়াছিল; নিজের দেশের ও জাতির সকল মাধুরী পরিহার করিয়া ইউরোপের সভ্যতা-অবলম্বনে অগ্রসর হইল। জাতি যায়, সমাজ যায় দেখিয়া মনীষী ও বহুদর্শী রাজা রামমোহন রায় মহোদয় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মে Iconoclasm বা দেশের পুরাতন রীতির নাশ করিবার চেষ্টা ছিল না। তিনি দেশাত্মবোধের বা পেটরিয়টিজমের বেদীর উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালীকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন—"এই দেখ, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী, তোমার দেশে, তোমার ধর্ম্মে, তোমার শাস্ত্রে যাহা নাই, ভাবিয়া বিহ্বলভাবে তুমি যাহা ইউ-

রোপের নিকট ভিক্ষা করিতে যাইতেছ, তাহা তোমারই আছে। সেই একেশ্বরবাদ, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা, সর্ব্বজাতি-সমন্বয়ের ব্যবস্থা তোমারই শাস্ত্রে আছে। তোমার উপনিষদ সকল, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, বেদ-বেদান্ত এই ইউরোপকথিত একেশ্বরবাদেরই গ্রন্থনিচয়। খৃষ্টান হইবার পূর্ব্বে জাতি কুল হারাইবার পূর্ব্বে, নিজেদের যাহা আছে, যাহা ছিল, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।" এই ভাবে বাঙ্গালীকে উপদেশ দিয়া তিনি এক দিকে যেমন শাস্ত্র-প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন অন্য দিকে তেমনি ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এ দেশে ইউরোপীয় শিক্ষার বিস্তার যত ঘটিবে, ততই দেশাত্মবোধের ভাব পুষ্ট হইবে। পেটরিয়টিজিয়মে পরিপুষ্ট হইলে ইংরেজী-শিক্ষিত, ইউরোপ-অনুচিকীর্ষু বিহ্বল বাঙ্গালী পরে নিজ নিকেতনের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেনই। রাজা রামমোহন এইটুকু বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরেজী-শিক্ষা-প্রচলনের পক্ষপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দেশাত্মবোধের বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই তিনি ভাঙ্গেন নাই, গড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রে এক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার আশ্রিত আদি-ব্রাহ্ম-সমাজ বাঙ্গালায় পুরাতন হিন্দু সমাজের সহিত বিবাদ ঘটায় নাই। সে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিতে রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

কিন্তু মূলের গুণ ত ফলে প্রকট হইবেই। যাহা নাশের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত, বাঙ্গালা দেশে তাহার প্রচার হওয়াতে তাহাতে নাশের ফল ফলিল। কেশবচন্দ্র প্রমুখ ইংরেজী-শিক্ষিত, বাইবেল-ভাব-প্রমত্ত বাঙ্গালী প্রধানগণ আদি-ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা আদি-ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডী কাটিয়া, যজ্ঞোপবীত দূরে ফেলিয়া, জাতিবিচারকে অবহেলা করিয়া স্বতন্ত্র হইলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এইবার Iconoclasm বা নাশ-চিকীর্ষা ব্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র হইল। সমাজ-রক্ষার জন্য যাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাই অভিনব শিক্ষার প্রভাবে সমাজ নাশের জন্য প্রযুক্ত হইল। মনে হয়, আদিব্রাহ্মসমাজ অক্ষুণ্ণ থাকিলে, কেশবচন্দ্রের ন্যায় অতি-মানুষপ্রকৃতিক বাঙ্গালী রাজা রামমোহনের মন্ত্রে এক-নিষ্ঠ থাকিলে, আজ বাঙ্গালার ইংরেজী-শিক্ষিতমাত্রই হয় ত ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে

পারিয়াছিলেন, তাই নববিধানের প্রচার করিয়া দেশাত্মবোধের বেদীর উপর ব্রাহ্মধর্ম্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠাপিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করিলে তিনি পরিণামে কোন পথে যাইতেন, কে বলিতে পারে ?

কেশবচন্দ্রের সহিত যাঁহারা Iconoclast বা নাশচিকীর্ষু হইয়া অভিনব ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। কেশবচন্দ্রের সঙ্গীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ জাতিভুক্ত ছিলেন, এবং ভাগীরথীর উভয় তীরের উন্নত হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত ছিলেন। ইঁহারা সবাই ব্রাহ্মসমাজের জন্য যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন। ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঁশবেড়িয়ার চট্টোপাধ্যায়-বংশের বংশধর ছিলেন। বাঁশবেড়িয়ার চট্টোপাধ্যায়গণ বৰ্দ্ধমানের রাজবাটীর দ্বার-পণ্ডিত, ব্যবস্থাদাতা, সমাজ-শাসক ছিলেন। অর্থ সম্পত্তি ইঁহাদের কম ছিল না। সমাজে মান সম্ভ্রম পর্য্যাপ্ত ছিল। নগেন্দ্রনাথ সে সকল উপেক্ষা করিয়া কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মের জন্য, নব-প্রতিষ্ঠিত সমাজের জন্য কঠোর দারিদ্র্যকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করিয়া-ছিলেন। বলা বাহুল্য, নগেন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত, সুরসিক, সুলেখক এবং সুবক্তা ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া কি কলঙ্কের বোঝা তাঁহাকে মাথায় করিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল, তাহা আজকালকার যুবকগণ অনুমানেও আনিতে পারিবেন না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ কেমন কঠোর-নিগড়-বদ্ধ ছিল, তাহার শাসন কতটা দুরন্ত ছিল, তাহা এখন বুঝান কঠিন। নগেন্দ্রনাথের ন্যায় এক দল মনীষী Iconoclast জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহারা আমরণ সমাজের কঠোর বন্ধন শিথিল করিবার জন্য দুশ্চর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই, আজ বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ এতটা শিথিল হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তথা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখিতে হইলে, এই Iconoclasmএর ইতিহাস লিখিতে হইবে। কেমন করিয়া সমাজের গজগিরি গাঁথা পদ্ধতির পোস্তা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহারই ইতিহাস লিখিতে হইবে। সে ইতিহাস রীতিমত লিখিতে হইলে ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনকাহিনী আমূল তাহাতে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। কেন না, নগেন্দ্রনাথ বাঙ্গালার এক জন প্রধান Iconoclast ; তিনি গড়েন নাই, কেবল ভাঙ্গিয়া গিয়াছেন।

যে শিক্ষার ফলে নগেন্দ্রনাথের তুল্য নরশ্রেষ্ঠের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল, সে শিক্ষায় Constructive element—বা গড়িয়া তুলিবার ভাব ছিল না;—সে শিক্ষা ফরাসী বিপ্লববাদের সিদ্ধান্তজাত শিক্ষা—সে শিক্ষার ঋষি-মুনি রুসো, ভল্‌টেয়ার, বেণ, বেন্থাম, হক্‌স্‌লী, স্পেন্সার;—সে শিক্ষার কবি বায়রণ, কীট্‌স্‌, শেলী কোল্‌রীজ। ফলে নগেন্দ্রনাথ যাহা গড়িয়াছিলেন, তাহাকে নাশের অস্ত্ররূপেই গড়িয়াছিলেন; তাঁহার অবলম্বিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বাঙ্গালার হিন্দু সমাজকে খণ্ড বিখণ্ডিত করিবার শাণিত তরবারি স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি কেবল হিন্দুসমাজকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন—জাতিভেদ, বর্ণবিচার, প্রতিমা-পূজা, অবরোধ প্রথা, বালিকাবিবাহ, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য—প্রভৃতি সামাজিক ব্যবহার-পদ্ধতি সকলকে তিনি বারংবার পদাঘাতে চূর্ণ করিবার চেষ্টা স্বতঃ পরতঃ করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, হিন্দুসমাজকে ভাঙ্গিতে পারিলেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুষ্টি আপনা-আপনি হইবে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তিনি হিন্দুসমাজপদ্ধতি সকলকে দেখেন নাই; কেন এমন আচার-ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কোন অবস্থায় পড়িয়া বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ এমন ভাবে গঠিত হইয়াছে, কোন কারণপরম্পরায় বাঙ্গালার তথা ভারতের হিন্দুসমাজের এমন দশা ঘটিয়াছে, এ সকল চিন্তা করিবার অবসর তাঁহার ছিল না। ফরাসী বিপ্লববাদের তিন মূল-মন্ত্র, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, এই তিনের কষ্টিপাথরে কষিয়া তিনি যাহাকে মন্দ ভাবিয়াছেন—নিরেস্‌ ঠাওরাইয়াছেন—তাহারই বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিয়াছেন। পুরুষ-শার্দ্দূলের মত নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে নির্ব্বিমহৃদয়ে তিনি সমাজের সহিত বিরোধ করিয়াছেন; এ কার্য্যে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই, কখনও আপোষ করিতে চেষ্টা পান নাই।

নগেন্দ্রনাথের মধ্যে যে Constructive element ছিল না, অন্ততঃ তাঁহার যৌবনে ও প্রৌঢ়ে যে সে বুদ্ধি ফুটিয়া উঠে নাই, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। তিনি যখন কোচবিহার বিবাহ-ব্যাপার লইয়া কেশবচন্দ্রের সহিত পৃথক হন, তখনই বুঝিয়াছিলাম যে, ইহারা গড়িতে আসে নাই, কেবলই ভাঙ্গিতে আসিয়াছে। কেশবচন্দ্র কোচবিহার মহারাজের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া ব্রাহ্মসমাজকে একটা ভিত্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—একটা স্থান, একটা আয়তন গড়িয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে বিবাহে কেবলই নীচ পারিবারিক স্বার্থ নিবদ্ধ ছিল

না। কোচবিহার-রাজ ব্রাহ্ম হইলে, ব্রাহ্মসমাজের একটা আশ্রয় হয়; কেবল Personal Religion বা ব্যক্তিগত ধর্ম্মপদ্ধতি না হইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা হইলে দেশগত ও সমাজগত ধর্ম্ম হইতে পারে। এই উচ্চাশায় কোচবিহার বিবাহ। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার মর্ম্ম নগেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় ছাড়িয়া, বিরাট হিন্দু সমাজের গণ্ডী কাটিয়া, দেশাত্মবোধের ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া কেশবচন্দ্র যে প্রমাদে পড়িয়াছিলেন, তাহাই সামলাইবার উদ্দেশ্যে তিনি কোচবিহার মহারাজের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তখনকার শাসক-সম্প্রদায়গত ইংরেজ প্রধানগণ কেশবচন্দ্রের এ গূঢ় উদ্দেশ্য প্রথমে ধরিতে পারেন নাই; পরে তাঁহারা এটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই বোধ-জন্য পরে বিবাহকালে কেশবচন্দ্রের লাঞ্ছনা হইয়াছিল; সেই বোধ-জন্য কেশবচন্দ্রের অন্য কন্যার সহিত অন্য একটি সামন্ত-রাজের বিবাহ তখন হইতে পারে নাই। নগেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহচরগণ এইটুকু বুঝেন নাই। তাই কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহারা বিষম বিরোধ উপস্থাপিত করেন। যে সমাজ বাঙ্গালাকে এক করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছিল, ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসরের মধ্যে সেই সমাজ তিন টুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। Iconoclasm বা নাশচিকীর্ষার জয় হইল বটে; পরন্তু রাজা রামমোহন যে উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; যে উদ্দেশ্যের মর্ম্ম বুঝিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আদি সমাজকে আঁকড়াইয়া—দুশ্ছেদ্য আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন; কেশবচন্দ্র যে মহৎ উদ্দেশ্যের মর্ম্ম বুঝিয়া পরে কোচবিহার বিবাহে রত হইয়াছিলেন, নব বিধানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। আত্মদ্রোহের ফলে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বাঙ্গালী বুদ্ধির কাছে দিনে দিনে হেয় হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মসমাজে কাঞ্চন-কৌলীন্য প্রচলিত হইল। ভাবুকমাত্রেরই মন সমাজের প্রতি উদাস হইয়া পড়িল।

মানুষ কেবলই নাশ চাহে না—কেবলই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মানুষের তৃপ্তি হয় না। Iconoclasmএর প্রয়োজন আছে বটে, পরন্তু সে প্রয়োজন জীবনব্যাপী হইতে পারে না। তাই কেশবচন্দ্র এক পক্ষে নববিধানের সৃষ্টি করিলেন। অন্য পক্ষে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ৺রামকুমার বিদ্যারত্ন

heredity বা বংশানুক্রম ফুটিয়া উঠিল—ব্রাহ্মণ আবার ব্রাহ্মণ হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে অন্য রকমের ভাঙ্গন ধরিল। যদি ব্রাহ্মসমাজ গোড়া হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে থাকিতে পারিত, অথবা নববিধানের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিত, তাহা হইলে এ ভাঙ্গন ধরিত না। এখন দেখিতে পাই, চিন্তাশীল ব্রাহ্মমাত্রই হয় বৈষ্ণব, নহে ত তান্ত্রিক গুরুবাদী, নতুবা Spiritualist বা ভূতযোনিতে বিশ্বাসী। যাহা ভাঙ্গিবার, তাহা ত ভাঙ্গিয়াছে, আর ত ভাঙ্গিবার কিছু নাই; ব্রাহ্মসমাজকে এখন নূতন কিছু দিতে হইবে। নূতন না পাইলে মানুষ পুরাতনকে আলিঙ্গন করিবে, পুনরায় অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গলায় যে ভাবে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন হইয়াছে, তাহাতে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী এখন আর খ্রীষ্টান হইতে পারে না। খ্রীষ্টান হইলে জাতিকুল সব মুছিয়া যায়, দেশের অতীত গৌরব-গাথার সহিত সকল সম্বন্ধ নষ্ট হয়—আমার দেশ আমার সমাজ বলিয়া জ্ঞান থাকে না—তাই বাঙ্গালী আর খ্রীষ্টান হয় না। যাহারা খ্রীষ্টান হইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে হিন্দু-খ্রীষ্টান হইতেছে। এমন অবস্থার গতিকেই বাঙ্গালীকে পুরাতনের অনুসন্ধান করিতে হইতেছে। তাই শিক্ষিত বাঙ্গালী এখন ভগবান রামকৃষ্ণের দলভুক্ত, গোস্বামী-বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যশ্রেণীভুক্ত, থিওসফিষ্ট, শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের বিলাতী সংস্করণের বৈষ্ণব—অথবা Spiritualist বা ভূতযোনি-বিশ্বাসী। ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শেষ জীবনে spiritualist হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি গুরুবাদীও হইয়াছিলেন। প্রৌঢ়তার শেষে Iconaclasmএর শ্রান্তি যখন তাঁহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল, তখন হৃদয়ের শূন্যতাকে নাশবাদের ব্যর্থচেষ্টায় তিনি পূর্ণ করিতে পারিলেন না; তখন তিনি spiritualist হইয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধ সন্ন্যাসী গুরু পাইলে হয় ত গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের বা স্বামী রামানন্দের পন্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। তাঁহার সে সৌভাগ্যোদয় হয় নাই, ভূতযোনির সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া আত্মার পিপাসা তাঁহাকে তাই মিটাইতে হইয়াছিল। ইহাতে দোষের কিছুই নাই,—নিন্দার অবসর নাই; কেন না, যখন যাহা ঘটিবার, তাহাই ত ঘটিয়াছে, একটা উদ্ভট কিছুত হয় নাই।

কার্দ্দিন্যাল্ নিউম্যান (Cardinal Newman) নাশবাদীদিগকে ছুটো

ঘোড়ার সহিত তুলনা করিয়াছেন। ভীত-উত্তেজিত ঘোড়া যেমন ছাড়া পাইলে, বাজারের মধ্যে আরোহীর বল্গা-শাসন হইতে নিষ্কৃতি পাইলে পা-ছুড়িয়া—লাতাড়্ মারিয়া সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলে, সে চেষ্টায় সে যেমন পরকে মারিয়া নিজেও অবসন্ন ও আহত হয়—হয়ত কদাচিৎ খানায় ডোবায় পড়িয়া প্রাণ হারায়—তেমনই নাশবাদী স্থায়ী সমাজের সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত করিয়া নিজেও অবসন্ন হয়, একটা নূতন কিছু রচিয়া রাখিয়া যাইতে পারে না। নগেন্দ্রনাথও তেমনই রুদ্র অবতারের ন্যায় সংহারের দৃষ্টিতে বাঙ্গালার সর্ব্বস্ব সনাতন দেখিয়া ও দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। তিনিই সর্ব্বাগ্রে ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে চরিত্রের রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত রামমোহন-চরিত বাঙ্গালা সাহিত্যে চরিতাখ্যান গ্রন্থ সকলের আদর্শস্বরূপ। উহার যেমন ভাষা, যেমন লিখনপদ্ধতি, তেমনই পটুতার সহিত বিষয়-বিন্যাসের ব্যবস্থা। কিন্তু হইলে কি হয়; উহার আগাগোড়া destructive criticism বা ধ্বংসবুদ্ধি-প্রণোদিত সমালোচনায় পূর্ণ। রাজা রামমোহন রায় ভাঙ্গিতে আসেন নাই, গড়িতে আসিয়াছিলেন—ইউরোপের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া বাঙ্গালার হিন্দু সমাজকে এক নূতন আকার দিতে আসিয়াছিলেন। আজ কাল ব্রাহ্ম বলিলে যাহা বুঝি ও যেমন দেখিতে পাই, রাজা রামমোহন তেমন ব্রাহ্ম—তেমন বাঙ্গালী ছিলেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয়, জাতি-প্রীতি-উদ্বুদ্ধ মনীষী বাঙ্গালী হিন্দু জাতিকে সভ্যতার সমসূত্রে ইউরোপের সহিত গাঁথিতে প্রমত্ত। বিধির বিধানে রাজা রামমোহন বিদেশে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, ধর্ম্মের প্রচারে ও সমাজ-সৃষ্টির কার্য্যে তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহন করিতে পারেন নাই। সূত্রাকারে তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যাতা থাকিলে আজ রাজা রামমোহনের স্বতন্ত্র চিত্র বাঙ্গালার লোকলোচনের গোচর হইত। নগেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনের জীবনচরিত লিখিয়াছেন বটে, পরন্তু রাজা রামমোহনের চরিত্রের constructive fine side গড়িবার অংশটুকু তেমন ভাল করিয়া ফুটাইতে পারেন নাই। নগেন্দ্রনাথ নিজে ত কখনও কিছু গড়েন নাই; গড়িবার পদ্ধতি তিনি জানিতেন না। তিনি ধ্বংসের ভাবে বিভোর ছিলেন, তাই রাজা রামমোহনকেও তিনি Iconoclast রূপে খাড়া করিয়াছেন। রাজা

বলিতে পারি না; তবে সেটা গৌণ লক্ষণমাত্র,—তাঁহার চরিত্রের ভিত্তি নহে।

নগেন্দ্রনাথের অন্য সকল লেখাও এই নাশবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া লেখা,—কেবল আক্রমণ, কেবল নিষ্ঠুর গোলন্দাজী। তিনি খাঁটী বাঙ্গালা গদ্য রচনা করিতে পারিতেন বটে, তাঁহার ভাষা মিঠে ছিল, তাঁহার লেখার আদর বঙ্কিমচন্দ্রও করিতেন; কিন্তু সে লেখায় destructve element বা ধ্বংসের উপাদান অধিক ছিল। তাই সে লেখা সমাজে টিকে নাই, এখন তাহার সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় নাই। যখন ভাঙ্গিবার প্রয়োজন হইয়াছে, তখন সে রুদ্র মূর্ত্তির ভঙ্গী দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছি বটে, পরন্তু নাশের সঙ্গে সঙ্গে সে চেষ্টার বাহার বিস্মৃতির গহ্বরে ডুবিয়া গিয়াছে। পদ্মার যে স্রোতে গ্রাম পল্লী ভাঙ্গে, সে স্রোত ত দাঁড়ায় না, ছুটিয়া চলিয়া যায়; যতক্ষণ ভাঙ্গন চলে, ততক্ষণ নানাবিধ আবর্ত্তে ভীম-ভৈরব সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া লীলা-বিকাশ করে। তাহার পর যে একটানা স্রোত, সেই একটানা স্রোত ছুটিয়া নাচিয়া চলিয়া যায়। নগেন্দ্রনাথের লেখার ভঙ্গী ভাদ্রের পদ্মার একটানা স্রোতের মতন—সুগভীর, তরঙ্গভঙ্গমুখর, আবর্ত্ত-বিবর্ত্তে-উচ্ছ্বসিত, কল্লোল কোলাহলে পূর্ণ; আবেগময় ও আবেশপূর্ণ। কিন্তু তাহা টিকে না, থাকে না--এক স্থানে দাঁড়াইয়া রহে না; যখন ছিল, তখন সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ছিল না—এখন নাই।

নগেন্দ্রনাথের জীবন-কাহিনী বাঙ্গালার একটা যুগের ইতিহাস-কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইংরেজী শিক্ষার ও সভ্যতার অবলম্বনের মধ্যযুগে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে, নগেন্দ্রনাথের ন্যায় কর্ম্মবীর প্রচারকের জীবন-কাহিনী পাঠ করিলেই জানা যায়। তাহা জানিবার প্রয়োজন আছে; কেন না, বাঙ্গালায় এখন নূতন সৃষ্টির যুগ আসিয়াছে। গড়িবার পূর্ব্বে কেমন করিয়া কি ভাঙ্গা হইয়াছিল, তাহা জানা চাই। নাশের সমাচার পাইলে, সৃষ্টির পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইতে পারে। এই হেতু বলিতেছি যে, নগেন্দ্রনাথের প্রকৃত জীবন-কথার প্রয়োজন আছে। এক পক্ষে নগেন্দ্রনাথের জীবন-কাহিনী, অন্য দিকে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের চরিত রীতিমত পড়িতে পাইলে বাঙ্গালী ভাঙ্গা ও গড়ার মূলতত্ত্ব অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

আর এক কথা। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে সকল উপাদানে গঠিত হইয়াছিলেন, অধুনা সে সকল উপাদানের অত্যন্তাভাব ঘটিতেছে। সে নির্ভীকতা, সে তেজস্বিতা, সে ত্যাগ, সে দারিদ্র্যের প্রতি উপেক্ষা, সে স্বাব-

লম্বন ও স্বাধীনতা এখন ত আর দেখা যায় না। যে সকল গুণের প্রভাবে নগেন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজকে ভাঙ্গিতে পারিয়াছিলেন, সেই সকল গুণের প্রাবল্য না ঘটিলে ভাঙ্গা সমাজকে আবার গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইবে না। তাই নগেন্দ্রনাথকে বুঝিবার চেষ্টা বাঙ্গালীমাত্রেরই করা কর্ত্তব্য। বুঝিলে হয় ত সে তেজ, সে দৃঢ়তা, বিলাসে উপেক্ষা, মতের জন্য সর্ব্বত্যাগের ভাব আবার আমাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারে। সনাতন কাল হইতে এ দেশে সন্ন্যাসীই সমাজ ভাঙ্গিয়াছেন, সন্ন্যাসীই সমাজ গড়িয়াছেন। বুদ্ধদেব হইতে শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর দল সমাজকে লইয়া গড়াপেটা করিয়াছেন। এক হিসাবে নগেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী ছিলেন; তাঁহার সন্ন্যাস দারিদ্র্যের আলিঙ্গনে পরিস্ফুট হইয়াছিল। তেমনই কঠোর সন্ন্যাস আবার চাই, সন্ন্যাসের প্রতি মর্য্যাদাবোধ আবার জাগাইয়া তোলা চাই, তবে সমাজ রক্ষা পাইবে। বিক্ষিপ্ত ও শিথিল সমাজ এখন নগেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পারেন, বিলাসের মোহে সে ত্যাগ ও দারিদ্র্যের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন, কিন্তু এমন দিন আসিতেছে, যখন নগেন্দ্রনাথের মত পুরুষ-শার্দ্দূলের অভাবে আমাদিগকে রোদন করিতে হইবে। যাহাতে সে রোদনটা শীঘ্র শীঘ্র ফুটিয়া উঠে, সেই দুরাশায় এত কথা কহিলাম। দেখা যাউক, লীলাময়ীর লীলা কেমন ভাবে প্রকট হয়।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# সহযোগী সাহিত্য।

## বাল্‌জাক্।

বাল্‌জাক্ ফরাসী ঔপন্যাসিক। কেবল ঔপন্যাসিক বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে না; বাল্‌জাক্ উপন্যাসের আবরণে ফরাসী সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; সংসার-রঙ্গশালার বহু অঙ্কের যবনিকা উন্মোচন করিয়া জীবন-নাটের বহু দুর্ব্বোধ বিষয় বাল্‌জাক্ সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে তিন জন মহারথ উপন্যাস লেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম, বাল্‌জাক্; দ্বিতীয়, ভিকটর হিউগো; তৃতীয়, এমীল জোলা; তিন জন তিন প্রকারের লেখক। এই তিন জনের লেখার প্রভাবে উপন্যাস সাহিত্যে তিনটি শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে; যথা—Realist, Idealist এবং Romanticist। এখন বুঝা যাউক, এই তিনটি শব্দের তাৎপর্য্য কি?

Realist—সংসারে যাহা নিত্য যেমন ভাবে ঘটিতেছে, ঠিক তেমনই ভাবে যে লেখক তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তিনিই Realist। বলিতে পার যে, তাহা হইলে উপন্যাস-

লেখক ত ইতিহাস-লেখকে পরিণত হইলেন। কতকটা তাহাই বটে; পরন্তু ইতিহাস-লেখক ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের নাম ধাম উল্লেখ করিয়া বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। ঔপন্যাসিক কোনও পরিচিত বা জ্ঞাত ব্যক্তি বা বাষ্টির নাম ধামেরও প্রকৃত উল্লেখ করিয়া বিবরণ লেখেন না। তিনি যাহা নিত্য দেখেন, শুনেন ও বুঝেন, তাহাই কতকটা নাটকের আকারে এমন ভাবে ফুটাইয়া তোলেন, যাহা দেখিলে বা পাঠ করিলে মনে হয়, এমন বুঝি কোথায় দেখিয়াছি। এমন কি, উপন্যাস পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে এমন সকল পরিচিত লোকের নাম বা জীবনকথা মনে পড়ে, যে সকল মানুষকে বা সম্প্রদায়ের লোককে অনেকেই দেখিয়াছেন, অনেকেই তাহাদের রীতি পদ্ধতির, আচার ব্যবহারের বিশিষ্টতার কথা জানেন। যাহার উপন্যাস পাঠ করিলে এমন সকল বাস্তব ঘটনার বাস্তব চিত্রের প্রতিচ্ছবি মানস-পটে অঙ্কিত হয়, তাঁহারই উপন্যাস সকলকে Realistic বা বস্তুগতিক বলা যায়। এমীল জোলা এই শ্রেণীর প্রধান লেখক। আমাদের রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর বস্তুগতিক লেখকশ্রেণীর প্রধান।

Idealist—সংসারে প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছে; সেই সকল ঘটনার এমন ভাবে সমাবেশ করিবে, যাহার ফলে একটা নূতন অপূর্ব্ব চিত্র স্বতঃএব ফুটিয়া উঠিবে; এবং এই চিত্র অনেকের রুচিকর ও আদর্শ-অনুসারী হইবে। যিনি এইরূপে উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যাস করিতে পারেন, এবং সেই বিন্যাসের ফলে মনোমত একটা অভিনব আদর্শ চিত্রের উদ্ভাবন করিতে পারেন, তাঁহাকেই Idealist বা ভাবুক লেখক বলা হয়। ইঁহারা সত্যের অপহ্নব ঘটান না, যাহা ঘটে, যাহা বটে, তাহাই লিপিবদ্ধ করেন; পরন্তু বাস্তবের এমন বিন্যাস করেন, যাহার ফলে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হয়,যে অবস্থাকে পরিস্ফুট করিয়া লেখক লোকলোচনের গোচর করিতে চাহেন। বাল্‌জাক্ এই শ্রেণীর লেখক হইলেও, ভিকটর হিউগো এই শ্রেণীর প্রধান লেখক। ভিকটর হিউগোর উপন্যাস সকল পড়িলে কখনই মনে হয় না যে, একটা কাল্পনিক ঘটনার কথা পড়িতেছি; মনে হয়, এমন ত নিতাই দেখি, নিতাই শুনি; পরন্তু এই বস্তুগতিক বিবরণের ভিতর দিয়া স্বতঃএব এমন একটা অভিনব ভাবের উদ্ভব হয়, এমন একটা অভিনব চরিত্রের উন্মেষ ঘটে, যাহা জীবনে কখনও না দেখিলেও, কখনও কাহারও মুখে স্বতন্ত্র ভাবে তেমন চরিত্রের বিবরণ না শুনিলেও, যাহাতে অতিপ্রাকৃত কিছু দেখিতে পাই না, অস্বাভাবিক কিছু বুঝিতে পারি না; সরল ও স্বাভাবিক বলিয়া যাহা মনে হইলেও, যাহার দ্বারা মন পবিত্র হয়, জীবন ধন্য হয়, হৃদয় উন্নত হয়। বাল্‌জাকের উপন্যাস সকলে এই গুণ থাকিলেও, এ বিষয়ে তিনি ভিকটর হিউগোর নিকট পরাজিত; বুঝি বা ইহার জন্য ভিক্টর হিউগো সভ্যজগতের সাহিত্যে অদ্বিতীয় ও অপরাজেয়।

Romanticist—কল্পনার সাহায্যে, অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশে যে সকল উপন্যাস রচিত হয়, তাহাই এই শ্রেণীভুক্ত। ইহাকেই সংস্কৃতে উপাখ্যান বলে। কিন্তু অধুনা সভ্য ইউরোপের সাহিত্যে এই উপাখ্যানকে কতকটা বাস্তবের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলা

হইবে, যাহাতে পাঠক বুঝিতে না পারে যে, এমন ঘটনার সমাবেশ সংসারে সম্ভবপর নহে; বাস্তবতার আবরণে কল্পনাকে অনেকটা বাস্তবগতিক করিয়া ফেলা হয়। রাইডার হ্যাগার্ড এই শ্রেণীর প্রধান লেখক; মারী করেলীও এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া দুই তিন-খানি উচ্চাঙ্গের উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। বাল্‌জাক্ এই শ্রেণীভুক্ত না হইলেও, এই শ্রেণীর লেখকের পদ্ধতির তিনি অনেকটা অনুসরণ করিয়াছেন। বালজাক্ যেন তিন শ্রেণীর সমবায়ে উদ্ভূত। তাঁহাতে বাস্তবতা আছে, ভাবুকতা আছে, কল্পনার লীলাও আছে। তবে তিনি বাস্তবতার বেদীর উপর কল্পনার ও ভাবুকতার লীলা-বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই বিশিষ্টতার জন্য বাল্‌জাকের এত আদর।

গত ২০শে জুনের সাহিত্যবিষয়ক "টাইম্‌স্" পত্রে বাল্‌জাকের একটি উপাদেয় ও গম্ভীর সমালোচনা বাহির হইয়াছে। পূর্ব্বে একবার এই "সাহিত্য" পত্রে বলিয়া রাখিয়াছি যে, ইউরোপের মনীষা দিনে দিনে স্থবিরতা লাভ করিতেছে; আর ভিক্টর হিউগো, বাল্‌জাক্, গেটে, শীলার, লেসিঙ্গ, টেনিসন্, ব্রাউনিং, ডিকেন্স, থ্যাকারে প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিতেছেন না; ইয়োরোপের সাহিত্যে নূতন ভাবের আমদানী হইতেছে না। তাই ইউরোপের বিদ্বজ্জনসমাজ এখন কেবল গৃহিণীপনায়, সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিবার চেষ্টায়, ব্যস্ত আছেন। এখন বিশ্লেষণের যুগ আসিয়াছে। কে কেমন ছিলেন, কে কিসের ব্যাখ্যান করিয়া গিয়াছেন, তাহারই নির্দ্দেশ করিতে সকলেই ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার ফলে বাল্‌জাকের সমালোচনা বাহির হইতেছে। বাল্‌-জাকের তিন জন প্রধান সমালোচক—Taine ( টেন ) Brunetiere ( ব্রুনেতিয়ে ) M. Faguet ( মসিয়ে ফাজে )। তিন জনই বিশ্লেষণ কার্য্যে বিশেষ পটু, প্রগাঢ় পণ্ডিত ও ভাবুক। তিন জনই বাল্‌জাকের সমালোচনায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী সমাজের বিশ্লেষণ করিয়া সমাজ-তত্ত্বের অনেক নূতন কথা বাহির করিয়াছেন।

বাল্‌জাক্ উপন্যাসে চিত্রকর ছিলেন; তিনি বাক্যবিন্যাসের বর্ণচ্ছটায় এমন এক একটি চিত্র পাঠকের মানস-পটে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাহা বাস্তবতার বেদীর উপর কল্পনার সপ্তবর্ণের আভা পূর্ণাঙ্গে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের চিত্র তিনি সজীব ও চিরস্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখার সর্ব্বত্র চিত্রকরের আকাঙ্ক্ষা দেদীপ্যমান। তাই ইংরেজ লেখক বলিতেছেন—

"It is thus the painter's aspiring and rejoicing consciousness of the great square swarming picture, the picture of France from side to side, from top to bottom, which he proposes to copy —unless we see the collective quantity rather as the vast primary model or sitter that he is unprecedently to portray—it is this that rendering him enviable in proportion to his audacity and his presumtion, gives a dignity to everything that makes the consciousness whole.

ফরাসী সমাজের এক দিক হইতে অপর দিক পর্য্যন্ত, উচ্চতম হইতে নিম্নতম স্তর

পর্য্যন্ত আমূল সকলের চিত্রপূর্ণ বিরাট আলেখ্যখানি দেখিয়া চিত্রকরের আকাঙ্ক্ষার ও উল্লাসের সহিত বালজাক অনুকম্পাবশে যাহার অনুলিপি লোকলোচনের গোচর করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—যাহার এক একটি চিত্র তিনি নিখুঁৎভাবে অনুকরণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন—তাহাই তাহার অহমিকা ও স্পর্দ্ধাকে ঈপ্সিত করিয়া তুলিয়াছে এবং এই চিত্রণের সমবায় ভাবকে পূর্ণাঙ্গে মুখর করিয়াছে। চিত্রকর যেমন সুন্দরীর রূপ লিখিবার সময়ে একটি সুন্দরী নারীকে সম্মুখে বসাইয়া তাহার অনুলিপি তুলিয়া রাখেন, বাস্তববাদী লেখক যেমন সমাজের উদ্ভট ও উৎকট অংশকে চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে উদ্ভট ও উৎকট চরিত্রের লোক সকলকে ধরিয়া তাহাদের জীবনকাহিনী ও চরিত্রকথা লিখিয়া রাখেন, ঠিক তেমনই ব্যষ্টিভাবে লোকচরিত্রের অঙ্কনে বাল্‌জাক্ অনুচিকীর্ষার পরিচয় সম্যকরূপে না দিলেও, সমবায়ে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র পূর্ণাবয়ব—সাকল্যে তিনি অপরাজেয়। কেবল গালগল্প লিখিলে উপন্যাস লেখা হয় না, কেবল "রূপকথা" বলিলে উপন্যাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। উপন্যাসে সমাজের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হওয়া চাই। যাহা ছিল, তাহা কেমন ছিল, যাহা হইয়াছে, তাহা কেমন হইয়াছে, পূর্ব্বাবস্থার পারম্পর্য্য বর্ত্তমানে বিদ্যমান আছে কি না, ইহাই দেখাইবার জন্য নভেল বা উপন্যাসের প্রবর্ত্তন। বাল্‌জাক্ এ পক্ষে পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

অনেকে বলেন যে, বাল্‌জাক্ অশ্লীল বা কুৎসিত ভাবের লেখক ছিলেন। তাঁহাতে কৌৎসিত্য যে ছিল না, এমন কথা ত বলিতে পারি না; তবে সে কৌৎসিত্য বাস্তবতার বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মনুষ্য-জীবন কৌৎসিত্যের পরম্পরামাত্র; কেন না, মানুষ অনেকটা পশু; বাল্‌জাক্ বলেন, মানুষ সাড়ে পনর আনা পশু। মানুষকে ঠিক-মত দেখাইতে হইলে তাহার সাড়ে পনর আনা পশুত্বটুকু ফুটাইয়া দেখাইতেই হইবে। যে আধ আনা মনুষ্যত্ব মানুষে আছে, তাহাই মানুষের দীপ্তি—পশুত্বের অন্ধকারে দীপশিখাবৎ। এই মনুষ্যত্বের দীপশিখা জ্বলিলেই পশুত্ব স্বতঃএব ফুটিয়া উঠিবে।

"The vulgarity was at any rate a force that simply got nearer than any other could have done to the whole detail, the whole intimate and evidenced story, of submission and perversion, and as such it could but prove itself immensely human."

যে গুপ্ত অথচ ব্যক্ত মানবজীবনকথা লিখিতে বাল্‌জাক্ ব্যস্ত ছিলেন, যাহাতে মনুষ্য পশুর বিবৃতি ও আনুগত্য কথা যেন প্রমাণপ্রয়োগ সহ লিখিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবয়ব-সম্পাদনের জন্য এই কৌৎসিত্য একটা অনুকূল শক্তির মত কাজ করিয়াছিল; সকল খুঁটীনাটী ঘটনাপরম্পরা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং এ কৌৎসিত্য মানবতার গণ্ডীর বাহিরে নহে। যাহা কাম-সন্ধুক্ষণের জন্য প্রযুক্ত, সেই কৌৎসিত্যই দোষের, যাহা মনুষ্য-চরিত্রের গুপ্ত ভিত্তি খুলিয়া দেখায়, যাহার সাহায্যে মানুষকে চিনা জানা বুঝা যায়, তাহা দোষের নহে। ব্যক্তির রোগে যেমন লজ্জা নাই, রোগ-বর্ণনায় যেমন সঙ্কোচ

নাই, তেমনই সমাজের রোগে লজ্জা থাকিবে না, সামাজিক রোগ-বর্ণনায় সঙ্কোচবোধ হইবে না। কিন্তু চিকিৎসক যেমন নির্ব্বিকার ভাবে রোগের বর্ণনা করিয়া থাকেন, ঔপন্যাসিককেও তেমনই নির্ব্বিকার ভাবে সামাজিক রোগের বর্ণনা করিতে হইবে। বাল্‌জাক আগাগোড়া নির্ব্বিকার ; ভাল মন্দ, কুৎসিত কদর্য্য, সুন্দর মনোহর, পবিত্র পাপজ— কোনও কিছুরই প্রতি বাল্‌জাকের সমবেদনা ফুটিয়া উঠে নাই। বাল্‌জাক্ চিত্রকরের মতন, ফটোগ্রাফারের মতন, নির্ব্বিকার ভাবে সর্ব্বস্বই দেখাইয়াছেন। দেখাইবার সময়ে তিনি যেন বলিয়াছেন, এই দেখ তোমার সভ্যতা, এই দেখ তোমার মনুষ্যত্বের শ্লাঘা! দেখ, দেখিয়া শিক্ষা কর, এবং পার যদি, তবে উন্নত পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর। এই-টুকু আছে বলিয়াই বাল্‌জাক্ এখনও টিকিয়া আছেন। যত দিন ইউরোপের সমাজ এই ভাবে থাকিবে, তত দিন বাল্‌জাকও অজর ও অমর হইয়া থাকিবেন।

---

# মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

**উদ্বোধন।** শ্রাবণ।— 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' শ্রীযুত স্বামী সারদানন্দ এবার 'মধুর ভাবে'র পরিচয় দিয়াছেন। 'মধুর ভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর উহাতে কি অপূর্ব্ব চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন', তাহা বুঝাইবার পূর্ব্বে, স্বামীজী সূচনা-স্বরূপ এই দার্শনিক নিবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি এই উপাদেয় সন্দর্ভে যেরূপ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, অসাধারণ বিচারবুদ্ধি ও অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই প্রবন্ধে যে সকল দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা কেবল শাস্ত্রানুশীলনের ফল নয় ; মনে হয়, সাধকের সাধনাসিদ্ধ অনুভব-লব্ধ সত্যের বিবৃতি। তাহা অধিকারীর উপভোগ্য, অনধিকারীর অধিগম্য নহে। প্রবন্ধের ভাষা একটু দুরূহ হইয়াছে। বিস্তৃতিভয়ে লেখক সূত্রাকারে অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলে প্রবন্ধটি আমাদের মত অনধিকারী বামনের পক্ষে 'প্রাংশুলভ্য ফলে' পরিণত হইয়াছে। অবশ্য, ভাষা সহজ হইলেই সকল তত্ত্ব সকলের অধিগম্য হয় না, 'অরসিকেষু রহস্যনিবেদনম্' কখনও সফল হয় না, তাহা জানি। কিন্তু শক্তিশালী লেখক ইচ্ছা করিলে, জিজ্ঞাসুকে—শিক্ষার্থীকে তৃপ্ত করিতে পারিতেন না, তাহা ত মনে হয় না। তাঁহার বহু রচনায় সে শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। দর্শন শাস্ত্রের সহিত যাঁহাদের আদৌ পরিচয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে মূল-তত্ত্বের উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে না। 'মধুর ভাবে'র স্বরূপবোধ জ্ঞানসাপেক্ষ। তাহার অনুভব সাধনা-সাধ্য। শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের চরিতে এই মধুর ভাবের যে বিকাশ হইয়াছিল, তাহা ভাবগম্য,—সাধারণ ভক্তের উপজীব্য। আলোচ্য নিবন্ধ জ্ঞানীর জন্য। কিন্তু জ্ঞান কি চিরদিন বিদ্বৎ-পরিষদেই

সাধনা-লব্ধ রত্ন মুক্তহস্তে সমভাবে জ্ঞানী ও মূর্খকে বিতরণ করিবেন না? 'স্বামী বিবেকানন্দের পত্র' উপাদেয়; তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিব,—'আমার মনে হয়, জগতের সব্বাইকে—সব জিনিসকে আশীর্ব্বাদ করি—সব জিনিসকে ভালবাসি—আলিঙ্গন করি। * * * আমার প্রতি তোমাদের কত দয়া, তাই ভেবে আনন্দাশ্রু বর্ষণ কচ্ছি। আমি যেদিন এই পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করেছি, সেই দিনটাকে ভেবে তাকে ধন্য ধন্য করছি।' পত্রখানি পড়িলে বাঙ্গালী উপকৃত হইবেন। মানবের মন এই ভাবের কিরণে শতদলের মত বিকশিত হইতে পারে। ভারতের ঋষি সে সাধনার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের দেশবাসীর ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে প্রতীচীর রুদ্ধ দ্বারে বিশ্বপ্রেম ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের মনে সেই ভাবের লহরী উঠিয়াছিল, প্রাচীন ভারতের ঋষি—

'ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ'

——ইত্যাদি মন্ত্রে যে ভাবের ছবি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ইউরোপের 'উদারতা' নহে, ভারতের আত্মজ্ঞান। সেই 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' ভারতে কি আর জাগিবে না? 'অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজাচার্য্যের আপত্তিখণ্ডন'—নবম প্রস্তাব চলিতেছে। 'মধুর ভাব' ও 'খণ্ডন' প্রভৃতি গুরুতর প্রবন্ধের পর শ্রীমতী—র 'কাশীতে শঙ্কর' মুখরোচক চাটনী বলিয়া মনে হয়!—'উদ্বোধনে' পূর্ব্বে যেরূপ তীর্থভ্রমণ, সাধুদর্শন প্রভৃতি সুখপাঠ্য অথচ শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, এখন আর তেমন হয় না কেন? 'সংবাদ ও মন্তব্যে' দেখিতেছি,—'মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ-মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শর্ব্বানন্দ মালয় উপনিবেশের অন্তর্গত কুয়ালা লামপুর নামক স্থানে "বিবেকানন্দ-আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। ঐ স্থানে বহুদিন হইতে "বিবেকানন্দ-পাঠাগার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবার তথাকার সভ্যগণের উদ্যোগে স্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি বিগত ২৫শে এপ্রিল তথায় উপস্থিত হন। * * * ২রা মে ঐ স্থান হইতে কিয়দ্দূরবর্ত্তী সেরাম্বান নামক স্থানে যাইয়া, তথাকার বিবেকানন্দ-আশ্রমের প্রস্তাবিত বাটীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, এবং ৩রা ও ৪ঠা মে ঐ স্থানে "ধর্ম্মের আবশ্যকতা"ও "হিন্দুধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৫ই মে নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামী সিঙ্গাপুরে গমন করেন। ১১ মে কুয়ালা লামপুর বিবেকানন্দ-আশ্রমে হোম পূজা বেদপাঠ প্রভৃতি সহকারে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ফটো প্রতিষ্ঠিত হয় ও প্রায় ১৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। পরদিন সর্ব্বসাধারণের জন্য উৎসব হয়। ঐদিন তথায় ইউরোপীয়, ইউরেশীয়, চীনা ও ভারতবাসী—সর্ব্বপ্রকার জাতির ভদ্রমহোদয়গণের সমাগম হইয়াছিল। এই আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের ইচ্ছা—রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া উক্ত আশ্রমে থাকিয়া মালয় উপনিবেশে বেদান্ত-প্রচারের চেষ্টা করেন। ইহা একটী বেদান্তের উপযুক্ত কার্য্য-ক্ষেত্র, সন্দেহ নাই—চীনেদের মধ্যেও নাকি বেদান্তের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ আছে।' সুসংবাদ, সন্দেহ নাই। অতীত যুগে বাঙ্গালী মালয় দ্বীপপুঞ্জে হিন্দু সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।—'তে হি

নো দিবসা গতাঃ!' আজ সেই উপনিবিষ্ট হিন্দুদিগের বংশধরগণ পূর্ব্বগৌরব ভুলিয়াছে;—স্বধর্ম্ম ভুলিয়া 'ভয়াবহ পরধর্ম্ম' গ্রহণ করিতেছে। বিবেকানন্দের পথচারী, সন্ন্যাসী, সেই হিন্দু-উপনিবেশ পুনরায় অধিকার কর—বর-বুদরের মন্দির-পার্শ্বে বেদান্ত-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হউক।

**অর্চ্চনা।** শ্রাবণ।—সম্পাদকের 'লক্ষ্ণৌর নবাবে' নূতন কথা নাই। ছবির খাতিরে নবাবদের নামের মালা গাঁথা হইয়া থাকিবে। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে' বঙ্কিম-চন্দ্রের বহুমূল্য অভিমতগুলি সঙ্কলিত করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ বাঙ্গালা বহি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—আজি কালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্যবৃদ্ধির সীমা নাই, এবং উভয়েরই সন্তান সন্ততি কদর্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য, সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না।'—বঙ্কিমের কথা বাসী হইয়াছে; কিন্তু এখনও মিষ্ট লাগিতেছে।—অধুনা বাঙ্গালা ছাপাখানা এখন ছারপোকার অপেক্ষা উচ্চ জীবে পরিণত হইয়া থাকিবে। অনেক ছাপাখানা শূকরীর মত মাসিক প্রসব করিতেছে। সুতরাং সাহিত্যক্ষেত্র শঙ্কার-জনক হইয়া উঠিতেছে।—তবে ছাপাখানায় পর্য্যায়ে সুরুচি ও সুনীতি নাই, এমন বলিতে পারি না। কালে কল্যাণের আশা করিব না? শ্রীমতী রাণী রাধাপিয়ারীর 'মিলনে' বিশেষত্ব নাই। 'মিলন-তরণীখানি যেন চিরসুখে বহে' নূতন বটে, কিন্তু নিমে দত্ত থাকিলে বলিত, মিলন যদি তরণী হয়, তাহা হইলে মানে হয় না বটে, কিন্তু মজা হয়! শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্যের 'পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ উল্লেখযোগ্য। লেখক এই প্রবন্ধে রসগঙ্গাধর ভামিনীবিলাস ও অমৃতলহরীর রচয়িতা তৈলঙ্গকবি পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের যথাসম্ভব পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীহৃষীকেশ মল্লিকের 'চুম্বনে' শৃঙ্খলা আছে। কবি চুম্বনকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—'তুষার' ও 'তপত'। কোনটা কি, তাহা মূল দৃষ্টে অবধান করুন। বিদ্যাসাগরের ভাষায় দেশাচারকে 'চুম্বন' করিয়া অনায়াসে বলা যায়,—'ধন্য রে চুম্বন! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা!' কেশবের অর্চ্চনাতেও চুম্বন চলিল। সম্পাদকের 'জীবনসংগ্রামে স্বাভাবিক নির্ব্বাচনে' দেখিতেছি, 'সেই মৃগই আপনার পরিবেষ্টনীর মধ্যে আপনাকে 'খাপ' খাওয়াইতে পারে!' 'পরিবেষ্টনী' কি পারিপার্শ্বিক অবস্থা? শ্রীঅমূল্যচরণ সেনের 'জুতার মান' বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি। যাহারা জুতা হজম করিতে পারে, তাহাদের জুতার মান কাজেই নিরাশ্রয় ও নিরুপায় হইয়া অক্কালাভ করে। মান রাখিলে থাকে; রাখিতে না জানিলে অতি সহজে উপিয়া যায়। অতএব দুঃখ করিয়া ফল নাই। সম্পাদকের 'নসুর মা' নামক সুলিখিত ক্ষুদ্র গল্পটি পড়িয়া অজ্ঞাত-সারে চোখের পাতা ভিজিয়া যায়। শ্রাবণের প্রথমে লেখক কল্পনা-নয়নে দামোদরের ভীষণ বানে নসুর মাকে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া গল্পের খাতায় অশ্রুজলে তাহার রেখাচিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রাবণের শেষে সেই কল্পনা সত্যে পরিণত হই-য়াছে; দামোদর বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালায় ভীষণ শ্মশানের সৃষ্টি করিয়াছে। কত নসু,

কত নম্বর মা ইহলোক হইতে অতর্কিতে অপসৃত হইয়াছে। 'নম্বর মা' যেন ভাবী সত্যের পূর্ব্বাভাস! বাঙ্গালী, 'নম্বর মা' পড়; বর্দ্ধমানের বন্যাবিধ্বস্ত নর-নারীর দুঃখ কল্পনা কর; অনুভব কর; যদি মানুষ হও, সমবেদনা জাগিবে।

**গৃহস্থ।** শ্রাবণ। 'গৃহস্থের' নবজীবন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 'আলোচনা' দেশের ও দশের কথায় পূর্ণ;—ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ আছে। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহার 'ভারতীয় মুসলমান সম্রাটগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার' নামক ঐতিহাসিক সন্দর্ভে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে। যাঁহাদের বিশ্বাস,—ভারতে মসলেম রাজশক্তি কেবল বিলাস-বাসনেই মগ্ন থাকিত, এই প্রবন্ধ 'জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া' তাঁহাদিগকে দিব্য দৃষ্টি দান করিবে। শ্রীহর্ষনাথ মজুমদারের 'রামায়ণে লোকশিক্ষা' উল্লেখযোগ্য। এই সংখ্যায় 'সামাজিক তথ্যসংগ্রহে'র সূচনা হইয়াছে। শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ কয়েক জন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুগ্ধের উপাদান' শিক্ষাপ্রদ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সরকার 'সেকশুভোদয়া' হইতে 'গৌড়রাষ্ট্রে পদাতিক মদনের মন্ত্রিত্বলাভ' নামক মনোজ্ঞ কাহিনীর সঙ্কলন করিয়াছেন। শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ীর 'মালদহের কবি ও গায়কগণ' উপাদেয়। এই শ্রেণীর উপাদানে বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায় পূর্ণ হইতে পারে। 'মফস্বলের বাণী' আলোচনার অঙ্গীভূত হইলে ক্ষতি ছিল না। 'গৃহস্থে' নূতন লেখক, নূতন বিষয়, নূতন উদ্যম ও নূতন অধ্যবসায়ের সূচনা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি, আশান্বিত হইয়াছি।

**ভারতী।** শ্রাবণ।—প্রথমেই 'কমলমনোহারী'—একখানি পট। কমলের মন হরণ করিতে পারিবে, কিন্তু মানবের মনকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চিত্রকর শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্রের প্রতিপাদ্য কি, তাহা আমরা বহু অনুধাবন করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না। পূর্ব্ববঙ্গের সেই ছড়াটি মনে পড়িতেছে,—'হাতে নি পদ্ম, পায়ে নি পদ্ম, পদ্ম হকল গায়!' অবশ্য, শুভ্র বর্ণানুলেপকেই পদ্ম বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নবাবিষ্কৃত কবি-ভাসের গ্রন্থাবলী' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; তথাও অত্যন্ত অল্প। আশা করি, ঠাকুর মহাশয় ভাসের উৎকৃষ্ট নাটকগুলির অনুবাদে প্রবৃত্ত হইবেন। শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদের 'মুসলমান কোর্টে বাঙ্গালী সেনাপতি' সুখপাঠ্য। কিন্তু 'কোর্টে'র কি প্রতিশব্দ নাই? 'বাগ্‌দত্তা'য় দেখিতেছি,—'পাড়া নিবন্ত', ও 'জঙ্গলমরুস্থানে'। মুখরোচক বটে। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বোম্বাই প্রবাস' সুখপাঠ্য। ডাক্তার নিশিকান্তের তড়িদ্বৎ ক্ষণপ্রকাশ জীবনের বিফলতার পরিচয় দিয়া উপসংহারে সত্যেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, 'of the dead nothing but good!' কিন্তু এই উক্তির পর মৃতের আর কোনও good ত দেখিলাম না। শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাবণের চিতা' চলনসই গল্প। এই রাবিশের পোহাবারোর কালে রাবণের চিতাও উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়। 'জাপানের ঝরণা' মন্দ নহে। কিন্তু 'অধিষ্ঠাত্রী দেবতা' প্রভৃতির অভাব নাই। শ্রীকালিদাস রায়ের 'বিরহ-তপনে' শেষে দেখিলাম,—

'নাই লাবণ্যের থালা—বরিব কেমনে ?'

সৌন্দর্য্যের সিঁদুরচুপড়ী, জোছনার বারকোশ, মলয়ার রেকাবী,—অন্ততঃ কাব্যির মধুপর্কের বাটী,—কিছুই কি ঘরে ছিল না ? নিরাকার উপচারে বরণ চলে না, কিন্তু কবিতার চরণ চলে,—লেখাও চলে। লেখকের শব্দ-সম্পদ মন্দ নয়, কিন্তু শক্তি-সঞ্চয় করিবার ধৈর্য্য নাই। শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' অত্যল্প সংক্ষিপ্ত, আমাদের সাধ মিটিল না। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভুক্তভোগীর পত্রে' সে কালের সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন। শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন-চরিতের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—'তাঁহার সে সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনার প্রবল চাপে শশধর প্রমুখ দলের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত।' না, এ তথ্য আমাদের বিদিত ছিল না। প্রত্যেক চেষ্টাই দীর্ঘ শৃঙ্খলের একটা অংশমাত্র। কোনও চেষ্টাই বিফল হয় না। 'শশধর প্রমুখে'র চেষ্টাও বিফল হয় নাই। প্রমাণ,—নগেন্দ্রনাথের শেষ জীবন। প্রমাণ,—বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ। তবে সে চেষ্টার বিফলতা কল্পনা করিয়া কোনও পক্ষ যদি সুখী হন ত সে সুখে আমরা বাদ সাধিব না। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সনেট-পঞ্চাশৎ'—সমালোচনা পড়িয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। তবে, ভারতচন্দ্র যদি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হইতেন, তাহা হইলে এম্নি ভাষাতেই কাব্য লিখিতেন' কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু ভারতচন্দ্র যদি বর্ত্তমানে কালের নকল-নবীশ হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দাগা বুলাইয়া যশস্বী হইবার চেষ্টা করিতেন। সত্যেন্দ্র-নাথের পদ্যের ভাষা জাহান্নমে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে,—কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধের গদ্য 'বেশ 'ঝর্‌ঝরে'।

---

# ভ্রম-সংশোধন।

শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাগরিকা'র মুদ্রণকার্য্যে অনেক ভ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছিল। নিম্নে শুদ্ধিপত্র প্রদত্ত হইল।

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ২৮০ | ১ | ইতিহাস | ইতিহাসে |
| ২৮১ | ১২ | যোগাভা | যোগাড়া |
| ২৮৪ | ১ | শিলালিপির | তাম্রলিপির |
| ২৮৫ | ৯ | মৎস্যন্যায় | মাৎস্যন্যায় |
| ২৮৭ | ২৫ | নির্দ্দেশাদ্বলবতি | নির্দ্দেশাদ্বলবতি |
| ২৮৮ | ২৫ | সিন্ধোঃ | সিন্ধো |

---

কলিকাতা, ২০নং পটুয়াটোলা লেন, বিজয়া-প্রেসে—শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# আধুনিক সমাজে সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের স্থান।

বর্ত্তমান কালে বঙ্গ-সাহিত্য ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল আলোচনা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে দেখা যায় যে, চিন্তাশীল ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন সমাজনেতৃগণের মধ্যে অনেকেই বলিতেছেন যে, বাঙ্গালী কিছু অধিকমাত্রায় সুকুমার সাহিত্য ও ললিতকলার চর্চ্চা করিয়াছে; এখন কিছুদিন কাব্য, উপন্যাস, সঙ্গীতের চর্চ্চা বন্ধ রাখিয়া ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ব্যাবহারিক শিল্পের চর্চ্চা করিলেই দেশের ও সমাজের কল্যাণ। সাধারণ বাঙ্গালীসমাজের মধ্যে, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সমাজনেতৃগণের এই কথায় যে অল্পাধিকপরিমাণে সায় দিতেছেন, তাহাও নিঃসন্দেহ। শিল্প ও সাহিত্য এখন ক্রমশঃই একপ্রকার সৌখীন চিত্তবিলাসের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের যে কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা ক্রমশঃই অস্বীকৃত হইতেছে। যে কারণেই হউক, সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যে সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রতিপত্তি যে অনেক-পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যিক জীবনে এই যে অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছে, তাহা ধীরভাবে আলোচনার যোগ্য। কেবল আমাদের বাঙ্গালা দেশে নয়, বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে সর্ব্বত্রই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে—জাতীয় জীবনে সুকুমার সাহিত্য ও শিল্পের স্থান আছে কি না, ও যদি থাকে ত সে কোথায়? এটি কেবল বাঙ্গালী-জীবনের বিশেষ সমস্যা নয়, এটি বর্ত্তমান যুগের সমস্যা; বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম যেখানে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে, আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল সেই ইউরোপে এই বিশেষ সমস্যাটি বেশ স্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। সেখানে দেখিতে পাই যে, যদিও সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ নিজেদের বৃত্তি সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, যদিও তাঁহারা সমাজনেতা, সমাজ-শিক্ষক ও বর্ত্তমানকালোপযোগী যুগ-ধর্ম্মের পুরোহিত বলিয়াই পরিচিত হইতে চাহেন, তথাপি ইউরোপীয় জন-সাধারণেরমধ্যে উচ্চ অঙ্গের শিল্প ও সাহিত্যের প্রসার প্রতিপত্তি খুবই

প্রসার লাভ করিয়াছিল। সাধু-মহাপুরুষ-অবতারদিগের লীলাচিত্রশোভিত গির্জ্জাঘর ও মঠ, ধর্ম্মকথা-সংবলিত মিষ্টিরী (Mystery) ও মিরাকল (Miracle) নাট্যাভিনয় সাধুসন্তদিগের চরিত্র, বাইবেল-বর্ণিত ঘটনাবলী ও খ্রীষ্টলীলা-সংবলিত কাব্যসমূহের পাঠ, আবৃত্তি ও কীর্ত্তন, ক্যাথলিক ধর্ম্মপন্থার নানা পর্ব্ব ও উৎসব—এই সকলের দ্বারা ইউরোপের মধ্যযুগে সাধারণ জনসমাজের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম যে জীবনীশক্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে নাই। অন্য দিকে সেই যুদ্ধবিগ্রহ-অশান্তির যুগে যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে নানা রোম্যান্স কাব্যের মধ্য দিয়া আর একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এক কথায় তাহার নাম দেওয়া হয় Chivalry বা বীরধর্ম্ম। যুদ্ধে ন্যায়-ধর্ম্ম-পালন, সবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলের উদ্ধার, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ও জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনা—এইরূপ কয়েকটি আদর্শ লইয়া এই রোম্যান্স সাহিত্যের সৃষ্টি। এই সকল আদর্শ কেবল কাব্য ও সঙ্গীতের রাজ্যেই আবদ্ধ ছিল না, সেকালের যোদ্ধসমাজের জীবনেও এই আদর্শগুলি অল্পাধিকপরিমাণে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত শিল্প ও সাহিত্য সামাজিক জীবনে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশে যাত্রা, কথকতা, পাঠ, আবৃত্তি, পাঁচালী, কীর্ত্তন প্রভৃতি নানা উপায়ে সাহিত্যের আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী, মনসার ভাসান প্রভৃতি গ্রন্থের আদর্শই আমাদের সমাজে গার্হস্থ্য ও ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শ স্বরূপ স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। অন্য দিকে চিত্র ভাস্কর্য্য স্থাপত্য প্রভৃতি কলাশিল্পও এই কার্য্যে সহায়তা করিয়া আসিয়াছে। মন্দিরাদির গাত্রে দেবদেবী ও অবতারের লীলাচিত্র ও রামায়ণ মহাভারত পুরাণোক্ত কাহিনী এবং বৌদ্ধবিহারাদিতে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও লীলাচিত্র তারতসমাজের সর্ব্বোচ্চ আদর্শগুলিকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদা জীবন্ত করিয়া রাখিত। আদর্শ পুত্র, আদর্শ পত্নী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পরিবার, আদর্শ রাজা, আদর্শ ক্ষত্রিয়, আদর্শ বণিক্, আদর্শ ভৃত্য, আদর্শগৃহী, আদর্শ ত্যাগী ও ভক্ত;—সামাজিক

সাহায্যেই সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ভারতীয় রাজদরবারে কবি, শিল্পী, পুরাণপাঠক ও সঙ্গীতাচার্য্যদিগের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ দিতেছেন, তন্মধ্যে অমাত্য-সভাগঠন-প্রসঙ্গে ব্যবস্থা দিতেছেন যে, রাজার অমাত্য-সভায় ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্র অমাত্যের পার্শ্বে এক জন করিয়া সূত বা পুরাণপাঠককে স্থান দিতে হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন সভ্যসমাজমাত্রেই শিল্প ও সাহিত্যের শক্তি ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্রের গঠনে নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছে, এবং সমাজনেতৃগণ এইগুলিকে সমাজ-ব্যবস্থার সুপরিচালন কার্য্যে প্রধান সহায়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান-কালে কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে আধুনিক পাশ্চাত্যসভ্যতা যেখানেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, সেইখানেই ইহাদিগকে আর সেরূপ সহায় মনে করা হয় না। যাঁহারা সমাজের মধ্যে সংসারের নানাবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, যাঁহারা বিশেষভাবে সাহিত্য-রসচর্চ্চায় নিযুক্ত নহেন, এক কথায় সমাজের বার আনা লোকের কাছে সাহিত্য ও শিল্পের এই যে প্রতিপত্তির হ্রাস হইয়াছে, তাহার কারণ কি? এরূপ বলা যায় না যে, সাহিত্য ও শিল্প-সৃষ্টির অভাবই ইহার কারণ। এই মুদ্রাযন্ত্রের যুগে সপ্তাহে সপ্তাহে কত শত শত কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি নানাবিধ সাহিত্য-সম্ভার বহন করিয়া গ্রন্থপ্রকাশকগণ জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতিভাবান্ দৈবশক্তিসম্পন্ন গ্রন্থকার ও শিল্পীর যে অসদ্ভাব আছে, তাহাও বলা যায় না। আমাদের দেশের মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, আধুনিক ইউরোপের গেটে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন, শেলী, ব্রাউনিং, বার্ণ্‌জোন্স্‌, রোদ্যাঁ প্রভৃতি সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ যে কোনও যুগের সাহিত্য ও শিল্পদরবারে উচ্চাসন পাইবার যোগ্য।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসঙ্গে যাঁহারা এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার-হীনতার মোটা-মুটি এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, অধিকাংশ বাঙ্গালী ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, অথচ অধিকাংশ বাঙ্গালী গ্রন্থকার ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, এবং কি ভাবে, কি ভাষায় ইংরাজী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

সুতরাং তাঁহাদের এই "ইংরাজী-গন্ধী" সাহিত্য সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট হয় একেবারে দুর্ব্বোধ্য, অথবা বোধগম্য হইলেও তেমন প্রাণস্পর্শী হয় না। কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য নিহিত আছে, কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে। কারণ, শুধু যে বাঙ্গালাদেশেই সাহিত্য ও শিল্প সামাজিক হিসাবে পঙ্গু ও শক্তিহীন হইয়াছে, তাহা নহে, আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যকেও এই ব্যাধি প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছে। সুতরাং ব্যাধির মূল নিরূপণ করিতে হইলে সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র ছাড়িয়া বর্ত্তমান যুগের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর যে বিশেষ ধর্ম্ম, তাহার মধ্যেই ইহার সন্ধান করিতে হইবে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে যাঁহারা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, এটি বিশেষভাবে ব্যবসা-দারীর যুগ। এ পর্য্যন্ত যে সকল নানা বিচিত্র মানব-সম্বন্ধ ব্যাবহারিক জীবনের শুষ্কতা অপহরণ করিয়া নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সামাজিক জীবনে রস সঞ্চার করিত, বর্ত্তমানকালে সেই সকল সম্বন্ধ ক্রমশঃই অস্বীকৃত হই-তেছে, এবং আইন আদালত, চুক্তি ও ব্যবসাদারী তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। রাজার সহিত প্রজা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, প্রভুর সহিত ভৃত্য, বণিকের সহিত গৃহস্থ, স্বজাতীয়ের সহিত স্বজাতীয়, গ্রামবাসীর সহিত গ্রামবাসী, এমন কি, এক পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি এখন আর সেরূপ পরস্পর আত্মীয়-সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া, ক্রমশঃ কেবল চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছেন। বৈষয়িক সম্বন্ধমাত্রই এখন পূরাপূরি বৈষয়িক, তাহার সহিত ধর্ম্ম বা অন্য কোন প্রকার স্বাভাবিক ভাববন্ধনের সংস্রব নাই। কাহারও সম্বন্ধে কাহারও দায়িত্ববোধ নাই, সমাজের ব্যক্তি-মাত্রই এখন এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। যে দায়িত্ব আইন আদালতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সে দায়িত্ব ভিন্ন অন্য প্রকার দায়িত্ব এখন আর সেরূপ স্বীকৃত হয় না। এই বাঙ্গালাদেশে প্রাচীন সমাজে দেখা যায় যে, সরকারের বিশেষ বিধিব্যবস্থা ব্যতিরেকেও বৃক্ষজলাশয়দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, পাঠশালা-চতুষ্পাঠী পরিচালন, অন্নসত্র জলসত্র স্থাপন, দরিদ্র আতুরদিগের ভরণপোষণ, এমন কি অক্ষম বা ব্যাধিগ্রস্ত গোপশ্বাদির চিকিৎসা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা প্রভৃতি সমাজ-হিতকর নানা অনুষ্ঠান অতি সুচারুরূপে ও স্বাভাবিক

শক্তি নিয়োজিত না হইলে সামাজিক কোনও অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। একটা ছোট কথা দিয়াই ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে সকলেই অল্পাধিকপরিমাণে ভুক্তভোগী যে, এই সভ্যতার যুগে সাধারণ লোকের পক্ষে উপযুক্ত মূল্য দিয়াও আহার্য্যই হউক আর পরিধেয়ই হউক, খাঁটী বা আসল দ্রব্য পাওয়া ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। অথচ এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ আধুনিক ; মিউনিসিপালিটির আইনের কোনই কড়াকড়ি ছিল না, অথচ প্রাচীন সমাজে খাঁটী দ্রব্যের অভাব ঘটিত না। কারণ সমাজের মধ্যে একটা মোটামুটি রকমের সামাজিক ধর্ম্মবোধ জাগ্রত ছিল—বণিক্ সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেই ধর্ম্মবোধ বা ভাবপ্রবণতা সমানভাবেই কাজ করিত। বণিক্ কখনও নিজকে সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট, সকলসম্বন্ধমুক্ত স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে ভাবিতে পারিতেন না। সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে ধর্ম্মের অবতার ছিলেন, এ কথা কেহই বলিবেন না, কিন্তু সমাজের মধ্যে যে সকল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সমাজের সেই জীবন্ত জাগ্রত অবস্থায় কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সেই সমাজধর্ম্ম লঙ্ঘন অপেক্ষা পালনই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। আমরা এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে এই সমাজানুগত্যকে দাসত্ব বলিতে শিখিয়াছি ও নানাপ্রকার আন্দোলন ও বিপ্লবের দ্বারা সমাজের নানা বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়া, মজ্জাগত সমাজবোধের যে সংস্কার এখনও ক্ষীণভাবে লোকের মনে জাগিয়া আছে, তাহা নানা যুক্তি ও প্রলোভনের দ্বারা উৎপাটিত করিয়া সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি। সুতরাং বর্ত্তমান-কালের সভ্য মানব-সমাজ ক্রমশঃ যে আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে সমাজ বলিলে আমরা এ দেশে যাহা বুঝি, সে বস্তুর কোনও স্থান নাই। রাষ্ট্রশক্তিই এখন যথাসম্ভব সমাজধর্ম্মের স্থান অধিকার করিতেছে।

শক্তি রাষ্ট্রেরই হউক বা ব্যক্তিবিশেষেরই হউক, তাহার ধর্ম্মই এই যে, তাহার সহিত ভাবের কোনও সংস্রব নাই। যেখানে কেবল শক্তি দ্বারা কাজ চালান হয়, সেখানে ভাব জাগাইয়া রাখার কোনও আবশ্যকতা অনুভূত হয় না। সকলেই জানেন যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে ষ্টেট অর্থাৎ রাজ-সরকারকে দরিদ্রের ভরণপোষণের ভার লইতে হইয়াছে।

তজ্জন্য সরকারের আইন অনুসারে প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট কর আদায় করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে কোনও গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করা সেখানে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, দরিদ্রের প্রতি যে স্বাভাবিক করুণা ও সমবেদনার ভাব, তাহা থাকুক আর নাই থাকুক, প্রত্যেক গৃহস্থকে রাজশক্তির তাড়নে এই দরিদ্র-পোষণের জন্য অর্থব্যয় করিতে হয়। ফলে যে পরিমাণে এই দরিদ্রভরণের দায়িত্ব গৃহস্থের স্কন্ধ হইতে অপসারিত হইয়া রাজশক্তির উপর ন্যস্ত হইয়াছে, সেই পরিমাণে গৃহস্থের অন্তঃকরণে দুঃস্থলোকের প্রতি যে স্বাভাবিক করুণার ভাব ছিল, তাহা চর্চ্চার অভাবে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ সামাজিক সর্ব্ববিধ কার্য্যের মধ্যে যে পরিমাণে যন্ত্রশক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যে পরিমাণে কলের নিয়মে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই পরিমাণে সামাজিক জীবনে ভাব বা ধর্ম্মবোধের স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

অথচ এই ভাব লইয়াই শিল্প ও সাহিত্যের কারবার। বাস্তব জগতের মধ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতিষ্ঠা, কাজের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠা, ইহাই শিল্প ও সাহিত্যের কার্য্য। সুতরাং যে সমাজে ভাবের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, সেখানে শিল্প ও সাহিত্যের শক্তি ও প্রসার যে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যে সাহিত্য ও শিল্প সমাজ-ব্যবস্থার অপরিহার্য্য অঙ্গ-স্বরূপ বিবেচিত হইত, এখন তাহা সামাজিক হিসাবে অনাবশ্যক অথবা সৌখীনতা ও বিলাসের সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

তাহা হইলেই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, এই যন্ত্রশক্তির যুগে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার হিসাবে শিল্প ও সাহিত্যের কোনও উপযোগিতা আছে কি না? যদি কলেই সব কাজ সুসম্পন্ন হয়, সে রাজশক্তি-পরিচালিত আইনের কলই হউক, আর বাষ্পশক্তি-পরিচালিত কারখানার কলই হউক,—কলেই যদি সব কাজ সুনিয়মে ও সুব্যবস্থায় সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সমাজের মধ্যে অনিশ্চিত ও অনির্দ্দিষ্টরূপে পরিব্যাপ্ত ভাবপ্রবণতা ও ধর্ম্মবোধের উপর নির্ভর করিয়া থাকার আবশ্যকতা কি? সাহিত্য ও শিল্পকে এখন সমাজের কার্য্য হইতে অবসর দিলে ক্ষতি কি? তাহাতে সমাজেরও ক্ষতি নাই, বরং শিল্প ও সাহিত্য স্বাধীনতা লাভ

করিয়া অভিনবভাবে নানা বিচিত্র সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিবে। শিল্পসাহিত্যের সহিত সমাজের এই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদে শিল্পসাহিত্যের কোনও ক্ষতি আছে কি না, তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন প্রথমে দেখা যাউক, ইহাতে সমাজের কোনও ক্ষতি আছে কি না। ইতিপূর্ব্বে আধুনিক সমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে যে, রাজশক্তি যে পরিমাণে সামাজিক কার্য্য-পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে, সেই পরিমাণে সমাজের মধ্য হইতে স্বাভাবিক ভাবগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে। এই ভাব-দারিদ্র্য ও ধর্ম্মহীনতা কখনই কোনও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। ভাব লইয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব। ভাবের অসদ্ভাবে মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ কোথায়? এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন ( এবং পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে ইহা শতাধিকবৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে ) যে, কি সমাজ-ব্যবস্থায় কি জড় জগতে যন্ত্রশক্তি যতই কার্য্যকুশল ও সুনিয়ন্ত্রিত হউক তাহা কখনই সম্পূর্ণভাবে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি, সৌন্দর্য্যবোধ বা ভাব-প্রবণতার স্থান পূরণ করিতে পারে না। মানুষের স্বার্থপরতা ও ভোগবাসনাকে ধর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া যথেচ্ছভাবে একবার কাজ করিতে দিলে তাহাকে আবার আইনের কল দিয়া বাঁধিয়া ব্যবস্থা রক্ষা করা যে কত কঠিন, পাশ্চাত্য জগতের সমাজনেতৃগণ ও শাসকবৃন্দ তাহা এখন বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। ধনীর সহিত নির্ধনের দ্বন্দ্ব, ক্রেতার সহিত বিক্রেতার দ্বন্দ্ব, ব্যবসায়ীর সহিত ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্ব, দেশের সহিত দেশের দ্বন্দ্ব —পাশ্চাত্য জগতের এই দ্বন্দ্বপ্রতিদ্বন্দ্বের অগ্নি সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া ফেলিতেছে, এবং সমাজব্যবস্থাপকদিগের নিকট সমস্যার পর সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। এ দিকে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবগ্রন্থি শিথিল হওয়ায় পরিবার ও সমাজের অনেক কার্য্যের ভার এখন ষ্টেটকে লইতে হইয়াছে। বয়ঃস্থ ও অক্ষম আত্মীয় কুটুম্বের, এমন কি, পিতামাতার প্রতি যে স্বাভাবিক ভক্তি, শ্রদ্ধা বা প্রীতির ভাব, তাহা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং রাজ-সরকার হইতে Old Age Pensions Act পাশ করিয়া তাহাদিগের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। শ্রমজীবী মজুরের সহিত কারখানার মালিকের ঠিকাচুক্তির বন্ধন ভিন্ন অন্য কোনও সম্বন্ধ নাই, সুতরাং বাণিজ্যব্যাপারের সামান্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শ্রমজীবী

কাজ না পাইয়া জীবিকাহীন হইয়া পড়ে। শেষে ষ্টেট হইতে ইনসিউরান্স আইন ( Insurance Act ) পাশ করিয়া তাহাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হয়; ষ্টেট হইতে Minimum Wages Act পাশ করিয়া ন্যায্য মজুরীর হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হয়। এমন কি, যে দাম্পত্য সম্বন্ধ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ, তাহাও শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পাশ্চাত্যজগতের নারীসমাজ এখন পুরুষ হইতে স্বতন্ত্রভাবে রাজনীতিক ভোটের অধিকার, এমন কি, মাতৃত্ব ও সন্তানপালন প্রভৃতি গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট মজুরীর দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং সমাজের ছোট বড় যাবতীয় কর্ম্ম ক্রমশঃ ষ্টেটের স্কন্ধে ন্যস্ত হওয়ায়, ব্যবস্থাপক-দিগের দায়িত্বভার অসম্ভব রকম বাড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যহ নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে, নূতন নূতন বিপদ ও বিপ্লবের সম্ভাবনা আসিয়া সমাজকে অনবরত শঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে, এবং আইনের পর আইন পাশ করিয়া সেই সকল সমস্যার আপাতরম্য সমাধান করা হইতেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অনেকে এই নূতন নূতন আইন পাশ করাকেই উন্নতির লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লন। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, আইন-যন্ত্রের এই অতিরিক্ত পরিচালন, সমাজশরীরে এই অহরহঃ ঔষধ প্রয়োগ ও অস্ত্রচালনা, সমাজের ব্যাধিরই পরিচয়, উন্নতির নহে। পাশ্চাত্য মনীষীদিগের মধ্যে অনেকেই এ কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, সমাজের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইলে সমাজশরীরে পুনরায় ভাবরসের সঞ্চার করিতে হইবে।

সুতরাং সমাজের দিক দিয়া দেখা গেল যে, শিল্প-সাহিত্যের সহিত সমাজের সম্বন্ধচ্ছেদ সমাজের পক্ষে কখনই কল্যাণকর নহে। এখন দেখা যাউক, এই সম্পর্কচ্ছেদে সাহিত্যের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি আছে কি না। প্রশ্নটি গুরুতর, এবং এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে ইহার সম্যক্‌ ও বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর নহে। তথাপি মোটামোটি ভাবে বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য ও শিল্পের যে বিশেষ প্রকৃতি, প্রাচীন শিল্প-সাহিত্যের সহিত তুলনায় তাহার আলোচনা করিলে এই লাভ ক্ষতি হিসাবের দিকে কিছু দূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, যে ভাবরস ও সৌন্দর্য্য-বোধ শিল্প-সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ, তাহা এখন সমাজ অর্থাৎ লোক-সমষ্টির জীবন হইতে একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে। সাহিত্য

ও শিল্প এখন তাই সমষ্টিকে ছাড়িয়া, সমাজকে ছাড়িয়া এক একটি স্বতন্ত্র মানবকে অবলম্বন করিয়াছে। কারণ, ভাবপ্রবণতা ও সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; তাহা যদিও সমাজ হইতে ক্রমশঃ বিতাড়িত হইয়াছে, তথাপি এখনও তাহা অনেক স্বতন্ত্র মানুষের অন্তঃকরণে জাগিয়া আছে। তাই আজকাল, ব্যষ্টিভাবে এক একটি স্বতন্ত্র মানবের মনে যে সকল ভাব ফুটিয়া উঠে, এক একটি স্বতন্ত্র মানবের মনশ্চক্ষে সৌন্দর্য্যের যে যে বিশেষ মূর্ত্তি প্রকটিত হয়, এক একটি স্বতন্ত্র মানবের চরিত্র জীবনের নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত হয়, সেই বিচিত্র মানব-কাহিনীই আধুনিক শিল্প ও সাহিত্যের উপকরণ। সাহিত্যের ইতিহাসে বর্ত্তমান যুগকে বিশেষভাবে ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ লীরিক্ (lyric) বা গীতিকাব্য ও ব্যক্তিগত চরিত্রবিশ্লেষণপূর্ণ উপন্যাসের যুগ বলা যাইতে পারে। কাব্য-চিত্র-সঙ্গীত প্রভৃতি কলাশিল্প এখন সমাজের সিংহাসন হইতে স্থানচ্যুত হইয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নিভৃত অন্তরের কোণে আশ্রয় লইয়া চারি দিকের শুষ্কতা ও শ্রীহীনতার মধ্যেও কোনরূপে প্রাণধারণ করিতেছে। কবি, শিল্পী বা কাব্যরসিক কোনরূপে সাংসারিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অবসরকালে একটি কাল্পনিক সৌন্দর্য্য-জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়া কাব্য ও কলাশিল্পের রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান ইংলণ্ডের এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক জি. কে. চেষ্টারটন্ (G. K Chesterton) কীট্স্ প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের কবিদিগের উল্লেখ করিয়া এক স্থলে বলিয়াছেন—"It was an age of inspired office-boys"—সাহিত্যের ইতিহাসে এটা দিব্যোন্মাদ-গ্রস্ত আফিসের কেরাণীর যুগ। অর্থাৎ, কবি ও শিল্পী এখন সমস্ত দিন ধরিয়া আধুনিক আফিসের শুষ্কতার মধ্যে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দিয়া অবসরকালে আপন আপন নির্জ্জন কামরায় বসিয়া কল্পনার সাহায্যে এক দিব্য-সৌন্দর্য্যজগৎ রচনা পূর্ব্বক কাব্য বা শিল্প চর্চ্চা করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় যে বিশেষ ছাঁচের শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাহাকে "ব্যক্তিগত শিল্প-সাহিত্য" এবং প্রাচীন ছাঁচের শিল্প-সাহিত্যকে "সামাজিকশিল্প-সাহিত্য" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন দিক হইতে এই দুই ছাঁচের শিল্প-সাহিত্যের তুলনা করিলে ইহাদিগের বিশেষ প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও একটু স্পষ্ট ধারণা হইতে পারে।

প্রথমে ভাবের দিক দিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে সকল ভাব অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কাব্যচিত্রাদি রচিত হইত, তাহা সমাজের

সাধারণ জন-মণ্ডলীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল। প্রাচীনকালের সামাজিক আদর্শের সহিত এই সকল ভাবের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সে কালে সমাজের ক্ষেত্র হইতে স্বাভাবিক ভাবে যে সকল বড় বড় ভাব ও আদর্শ উদ্ভূত হইত, শিল্প ও সাহিত্য তাহারই সেবায় নিযুক্ত ছিল। লোক-সমষ্টির হৃদয়ে সেই সকল ভাব সহজেই সহানুভূতি লাভ করিত, এবং এই জন্যই তাহাদের প্রেরণাশক্তিও ব্যক্তি-গত ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা সমধিক প্রবল ছিল। সহজে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিত বলিয়া শিল্পিগণের ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীও অপেক্ষাকৃত সরল, অনাড়ম্বর ও নিঃসঙ্কোচ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে শিল্পী স্বীয় রচনামধ্যে যে সকল ভাবের অবতারণা করেন, তাহা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত না হইয়া পারে না। তাহা সাধারণতঃ ভাবুকহৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরের কথা, নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক সমভাবাপন্ন ভাবুক ও কাব্যরসিক ব্যক্তির চিত্তেই তাহা প্রসারলাভ করিতে পারে। এমন অবস্থায় শিল্প-রচনার মধ্যে স্বভাবতঃই একটা সঙ্কোচের ভাব আসিয়া পড়ে। শিল্পীর মনে এখন সর্ব্বদাই এই সন্দেহ জাগিয়া থাকে যে, হয় ত তাঁহার অন্তরের গভীর ভাবগুলি অধিকাংশ লোকের নিকট সহানুভূতি পাইবে না; সেই জন্য তাঁহাদের রচনায় হয় ভাবপ্রকাশের জটিলতা, না হয় একটা বিদ্রোহের সুর লক্ষ্য করা যায়। সহজ সরল ভঙ্গীতে ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা এখন তাই অধিকাংশ শিল্পীর অনায়ত্ত। প্রাচীন সাহিত্যে গভীর ও নিবিড় ভাবের অভাবই যে সেই সাহিত্যের সরলতার কারণ, তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব মহাজনদিগের পদাবলী, পারস্য দেশের সুফী কাব্য ও সঙ্গীত, প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য, প্রাচীন চীনের প্রাকৃতিক চিত্র, ইউরোপের মধ্যযুগের ম্যাডোন্না চিত্রগুলি, আধুনিক শিল্প ও সাহিত্যের অপেক্ষা যে ভাবের গভীরতার হিসাবে ন্যূন, তাহা অবশ্য কেহই বলিবেন না। তথাপি এই সকল প্রাচীন কাব্য চিত্রাদি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজে অধিগম্য ছিল, এবং আপামরসাধারণের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইত। আধুনিক কবি ও শিল্পীদিগের রচনা কিন্তু কখনও অধ্যয়ন-কক্ষ ও আর্টগ্যালারীর বাহিরে জীবনের ক্ষেত্রে নামিতে পারে না। ইহার একটা কারণ এই যে, প্রাচীন কালে ভাব সাধন বলিয়া একটি বস্তু ছিল, এখন তাহার একান্ত অসদ্ভাব। চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, এঞ্জেলিকোর ( Fra Angelico ) রচনা কেবল ক্ষণিক ভাবের উচ্ছ্বাসমাত্র নহে। তাঁহারা যে কয়টি ভাব অবলম্বন করিয়া শিল্প রচনা করিতেন, তাহা সংখ্যায়

অল্প ও সুনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু সেই কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ভাব তাঁহারা জীবনব্যাপিনী সাধনায় পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেমন এক দিকে শিল্পী, তেমনই অপর দিকে ভাবসাধক। সেই জন্য তাঁহাদের ভাব বস্তু-তন্ত্র ও শক্তিশালী হইত। তাঁহারা নিজেদের সাধনার ধন শিল্পের সাহায্যে সমাজের সাধারণ সম্পত্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষপরম্পরাক্রমে একই ভাবের সাধনার দ্বারা যে সঞ্চিত-শক্তির উদ্ভব হয়, তাহাই কেবল বাস্তব সংসারে অতীন্দ্রিয় ভাবপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ। স্থাপত্য-শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ স্থাপত্যবিদ্ লেথাবী (W. R. Lethaby) তাঁহার প্রণীত Architecture নামক গ্রন্থে এক স্থলে লিখিতেছেন যে, যে শিল্প কেবল ব্যক্তি-বিশেষের কল্পনা-শক্তি হইতে উদ্ভূত না হইয়া সহস্র-শিল্পীর সাধনার ফলস্বরূপ (The Art which is not one man deep, but a thousand men deep) তাহাই মহৎ শিল্প বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। আধুনিক শিল্প-সাহিত্যে যে সকল ভাবের অবতারণা হয়, তাহা সংখ্যায় অসীম ও অনির্দ্দিষ্ট। ব্যক্তিবিশেষের মনে বিভিন্ন বিভিন্ন অবস্থায় যে সকল বিচিত্র ভাবের স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহা যতই সূক্ষ্ম ও অসাধারণ হউক না, সমস্তই এখন শিল্পের বিষয়ীভূত। ভাব এখন সাধনার বস্তু নয়, সেইজন্য প্রত্যহ অভিনব ভাব ও অভিনব মানসিক অবস্থার চিত্রণেই শিল্পী নিযুক্ত। নূতনত্বের সন্ধান, পুরাতন ভাবের সাধনার স্থান অধিকার করিয়াছে। সেই জন্য অনেক স্থলে দেখা যায়, এই সকল সাময়িক ও অস্থায়িভাব শিল্পী বা শিল্পামোদোর জীবনে সেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। শিল্প-সাহিত্য এখন মানুষের মনোরাজ্যের প্রচ্ছন্ন কোণসমূহে নূতন নূতন প্রদেশ আবিষ্কার-কার্য্যে নিয়োজিত, এখনও কোথাও ঘরবাড়ী বাঁধিবার কোনও উদ্যম নাই। ফলে আধুনিক শিল্প বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্তু ভাবের গভীরতা ও বস্তু-তন্ত্রতার হিসাবে প্রাচীন-শিল্পের তুলনায় দীন ও শক্তি-হীন হইয়া রহিয়াছে।

ভাবের সম্বন্ধে যে কথা, শিল্পের বিষয়নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। প্রাচীন-শিল্পের বক্তব্য বিষয় ও আখ্যানাবলীও সংখ্যায় অল্প ও সুনির্দ্দিষ্ট। পুরুষ-পরম্পরা ধরিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত একই আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন শিল্পী শিল্প রচনা করিতেন। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। এক মহাভারতের

রামেশ্বর নন্দী প্রভৃতি বহু বাঙ্গালী কবি বঙ্গভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন। সেইরূপ বেহুলার উপাখ্যান লইয়া কাণা হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস প্রভৃতি কবি, কালকেতু ও শ্রীমন্তের আখ্যান অবলম্বন করিয়া জনার্দ্দন, মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবি, রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা অবলম্বন করিয়া বহুতর বৈষ্ণবকবি ও মহাজন আপন আপন কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইউরোপের মধ্যযুগেও দেখা যায় যে, আর্থার, লন্সেলট, পার্সিভ্যাল, আলেকজন্দার, সার্লমেন প্রভৃতি বীরগণের কাহিনী লইয়াই ইউরোপের বিভিন্নদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বহুতর রোম্যান্স্ কাব্য গদ্যে-পদ্যে রচিত হইয়াছিল। সে কালের কবি ও শিল্পিগণ আখ্যানবস্তুর মৌলিকতা লইয়া চিন্তা করিতেন না। পুরাতন ও লোকপ্রচলিত আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া কতকগুলি বিশেষ ভাবের উদ্রেক করিয়া দেওয়ার দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। কোনও আখ্যানবস্তু কাহারও একচেটিয়া* সম্পত্তি ছিল না—সেগুলি সমাজেরই সম্পত্তি। এইরূপ অবস্থায় একটি সুবিধা এই ছিল যে, সমাজে কাব্য বা শিল্পের আখ্যানবস্তু সুপরিচিত থাকায় অতি সহজেই শিল্পীর বক্তব্য জন-সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত। তদ্ভিন্ন শ্রোতৃবর্গের এক একটি ভাবতন্ত্রীতে পুনঃ পুনঃ আঘাত পড়ায় সমাজে কতকগুলি বিশেষ ভাবের অনুশীলন হইত। যখন ভাবরসাস্বাদ অপেক্ষা কৌতূহলপরিতৃপ্তি ও মানসিক উত্তেজনাই শিল্পচর্চ্চার উদ্দেশ্য হইয়া পড়িল, সেই লঘুচিত্ততার যুগেই শিল্পিগণকে নিত্য নূতন আখ্যানবস্তু-রচনার জন্য নানা কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে হইল।

আখ্যান-বস্তু ও ভাব সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, রচনাভঙ্গী ও অলঙ্কারের দিক্ দিয়াও সেই কথা বলা যাইতে পারে। এখানেও দেখা যায় যে, কতকগুলি বিশেষ রচনাভঙ্গী শিল্পিসমাজের সাধারণ সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইত। "বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের"* প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থমধ্যে বাঙ্গালী কবির অনুকরণপ্রিয়তার উল্লেখ করিয়া অনেকগুলি দৃষ্টান্ত একত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের সেই অংশ এ স্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইতে পারে:—

"কেবল বড় বড় কাব্যে নহে, কাব্যের অংশগুলিতেও সেই অনুকরণবৃত্তির পরিচয় লক্ষিত হয়। একটি উৎকৃষ্ট ভাব পাইয়া কবিকে প্রশংসা করিবার পথ নাই; কোন্ কবি সেই ভাবের আদি প্রণেতা, সে প্রশ্ন

খুলনার 'বারমাস্যা' পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে পদ্মাবতীর বারমাস্যা, পদকল্পতরুতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা, বিদ্যাসুন্দরগুলিতে বিদ্যার 'বারমাস্যা', সৈয়দ আলওয়াল কবির পদ্মাবতীতে নাগমতীর বারমাস্যা, মুরারি ওঝার নাতি শ্রীধর প্রণীত রাধার বারমাস্যা, সেক জালাল প্রণীত সখীর বারমাস্যা এইরূপ রাশি রাশি বারমাস্যার সঙ্গে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ঘাটে পথে সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। বিদ্যাপতির 'না পুড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাও জলে। মরিলে রাখিও বাঁধি তমালের ডালে॥ কবহুঁ সোপিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে। পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে॥' এ কবিতাটির ভাব রাধামোহন ঠাকুর—'এ সখি করতহুঁ পর উপকার। ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব মৃত তনু রাখবি হামার॥ কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পাওব, তবহুঁ মনোরথ পূর॥' যদুনন্দন দাস—'উত্তরকালে এক করিহ সহায়। এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়॥ তমালের কাঁধে মোর ভুজলতা দিয়া। নিশ্চয় করিয়া তুমি রাখিবা বাঁধিয়া॥' ইত্যাদি পদে এবং এতদ্ব্যতীত নরহরি, কৃষ্ণকমল, কবিশেখর প্রভৃতি বহুকবি স্বরচিত পদে নকল করিয়াছেন।" শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের এই বিশেষত্বটুকুকে বিশেষ ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং ইহাকে বাঙ্গালীসুলভ অনুকরণপ্রিয়তা বা পুচ্ছগ্রাহিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এটি বাঙ্গালা সাহিত্যের বা বাঙ্গালী চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ নহে, ইহা প্রাচীন সামাজিক শিল্পমাত্রেরই লক্ষণ। মধ্যযুগের ইংরাজী, ফরাসী, বা জর্ম্মাণ সাহিত্যেও এই ভাব সাদৃশ্য ও রচনা-সাদৃশ্যের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগেও এই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সাহিত্যের অবনতির যুগে এই ভাবভঙ্গী ও অলঙ্কার-সাদৃশ্য বিকার প্রাপ্ত হইয়া নির্জ্জীবতা ও নীরসতার সৃষ্টি করে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু সাহিত্যের জীবন্ত অবস্থায় এই সকল পর-পরাগত ভাব ও উপমা নানা অপ্রত্যক্ষ ভাব ও দৃশ্যের ব্যঞ্জনাদ্বারা, নানাপ্রকার স্মৃতির উদ্রেক করাইয়া দিয়া, জনসাধারণের মনে যে ঘনরসের সৃষ্টি করে, তাহা অপূর্ব্ব। বিশেষ করিয়া চিত্র বা ভাস্কর্য্যশিল্পে এই বাঁধা রচনাপদ্ধতির একটা সুবিধা এই যে, ইহাতে শিল্পিগণের বক্তব্য জনসাধারণের পক্ষে সহজে অধিগম্য হয়। শিল্পব্যাখ্যা ও শিল্পসমালোচক বলিয়া এক শ্রেণী মধ্যস্থের আবশ্যকতা থাকে না। আজকাল

শিল্পের রাজ্যে নানা অভিনব প্রণালী প্রত্যহ অবলম্বিত হইতেছে, তাহাতে একটা এই ফল দাঁড়াইয়াছে যে, বিশেষজ্ঞ শিল্পসমালোচকের ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে শিল্পের বক্তব্য বিষয় সহজে সকলের অধিগম্য হয় না।

এইবার চরিত্রচিত্রণের দিক্ দিয়া এই উভয়বিধ সাহিত্যের তুলনা করা যাইতে পারে। উপন্যাসই আধুনিক সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। আধুনিক উপন্যাসের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে স্বতন্ত্র মানব-চরিত্রের বিচিত্র বিকাশ চিত্রিত ও বিশ্লেষিত হয়। প্রাচীন সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ ব্যক্তি-চরিত্র অপেক্ষা আদর্শচরিত্র চিত্রণেই বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। জনসাধারণের সম্মুখে সামাজিক গার্হস্থ্য ও ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শগুলি স্থাপন করাই এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যে কত প্রভেদ, আধুনিক উপন্যাস পাঠে আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি কিন্তু প্রাচীন কাব্য কথা কাহিনীতে মানুষ কোন্ কোন্ আদর্শও উচ্চ ভাবের সম্মুখে নতমস্তকে একত্র হইয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে, তাহারই বার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত উপায়ে সমাজমধ্যে যে ভ্রাতৃত্বভাব বা সৌভ্রাত্রের উদ্ভব হয়, তাহা নানা সামাজিক বৈষম্য সত্ত্বেও রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, প্রভু, ভৃত্য, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, উচ্চ, নীচ, সকলকেই এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দেয়। চেষ্টারটন্ সাহেব তাঁহার Victorian Age in Literature গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে চসারের ক্যাণ্টারবেরী কাহিনী (Canterbury Tales) এবং থ্যাকারের উপন্যাসের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, চসারের কাব্যে নাইট্, স্কোয়্যার, ময়দাওয়ালা, কৃষক, ছাত্র,, পুরোহিত, মঠের মোহন্ত প্রভৃতি সমাজের বিভিন্নস্তর হইতে যে সকল চরিত্র একত্রিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত বৈষম্য প্রচুর; অপর দিকে থ্যাকারের উপন্যাসের চরিত্রগুলিও বিভিন্ন পর্য্যায়ের লোক। চসারের কাব্যে ধনী নির্ধন, উচ্চনীচ সকলে মিলিয়া পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়িয়া কাহিনী বলিতে বলিতে ক্যাণ্টারবেরীর সেণ্ট টমাসের সমাধি উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রায় চলিয়াছে। তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সকলে মিলিয়া যে আদর্শের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহার তুলনায় সামাজিক সমস্ত বৈষম্য তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু থ্যাকারের উপন্যাসে ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ একত্র মিলিয়া পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারেন, এরূপ কল্পনা স্বপ্নেও কাহারও মনে উদিত হইবে না।

চেষ্টারটন সাহেব বলেন, তাহার কারণ এই যে, আধুনিক সমাজের মাথার উপরে ধর্ম্ম বা তত্তুল্য অন্য কোনও উচ্চ আদর্শ বর্ত্তমান নাই। চসারের সমাজ ও থ্যাকারের সমাজ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, আমাদের দেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে চিত্রিত সমাজ সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই বলা যাইতে পারে।

এইবার শিল্প ও সাহিত্য প্রচারের দিকটা দেখা যাউক। আধুনিক সাহিত্য মুদ্রিত গ্রন্থাকারে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়, সুতরাং ইহা অনেক পরিমাণে অধ্যয়নকক্ষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। প্রাচীন সাহিত্য কিন্তু কেবল গ্রন্থমধ্যে আবদ্ধ থাকিত না। অধিকাংশ প্রাচীন কাব্যই গানের জন্য রচিত হইত, এবং গান, আবৃত্তি, কথা প্রভৃতির দ্বারা পণ্ডিত হইতে নিরক্ষর পর্য্যন্ত সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচারিত হইত। সামাজিক জীবনের নানা পর্ব্ব ও উৎসব উপলক্ষে এই সকল কাব্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গীত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের দেশের মনসার গান, চণ্ডীর গান, শিবের গান প্রভৃতি ও মধ্যযুগের ইউরোপের রোমান্স কাব্য গুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধুনিক সমাজে যে পরিমাণে ভাবরসচর্চ্চা উঠিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, সেই পরিমাণে সামাজিক জীবনে যে সকল আনন্দমিলনের ক্ষেত্র ছিল, তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। বর্ত্তমান যুগের ডেমোক্রেশী Democracy বা প্রজাতন্ত্রের যে আদর্শ, তাহাতে প্রীতি অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যের ভাবই প্রবল। সুতরাং এই ডেমোক্রেশির আদর্শ অবলম্বন করিয়া কোনও সামাজিক মিলনক্ষেত্র বা সামাজিক শিল্প সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাই সাহিত্য এখন ক্রমশঃ বিশেষভাবে কেবল কলারসাভিজ্ঞ পণ্ডিতসমাজেরই উপভোগ্য হইয়া উঠিতেছে, নিরক্ষর অশিক্ষিত জনসমাজের সহিত তাহার আরও কোন সম্পর্ক নাই। সাহিত্য সম্বন্ধে যে কথা, শিল্প সম্বন্ধেও সেই কথা। আধুনিক চিত্র ও মূর্ত্তি প্রভৃতি আর্টগ্যালারীর কাচের আলমারীতে শোভা পাইয়া বিশেষজ্ঞের আনন্দসম্পাদন করিয়া থাকে। প্রাচীন শিল্প ঘটী বাটী সাজ সরঞ্জাম হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দিরাদির প্রাচারগাত্রে চিত্রিত বা ক্ষোদিত কাহিনী পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই সামাজিক সৌন্দর্য্যবোধ ও ভাবুকতার পরিচয় প্রদান করিত।

অবশেষে শিল্পী ও শিল্প-সৃষ্টির দিক হইতে একবার উভয়বিধ শিল্পের প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করা যাউক। প্রাচীন শিল্পে শিল্পী সামাজিক ভাব বা আদর্শের

ভৃত্য বা সেবকমাত্র। বিষয় ও ভাব নির্ব্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া রচনাভঙ্গী পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই শিল্পীকে প্রচলিত বাঁধা পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইত। কেহ কেহ মনে করেন, এ অবস্থায় শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ সম্ভবপর নহে। কিন্তু বাঁধা পদ্ধতি প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পক্ষে বাধাস্বরূপ না হইয়া সহায়রূপেই পরিণত হয়। কারণ, কবিকে নিজের ভাষা, নিজের মালমশলা নিজে সৃষ্টি করিয়া লইবার জন্য বৃথা শক্তিক্ষয় করিতে হয় না। প্রচলিত ছাঁচের মধ্যে রসপ্রতিষ্ঠাই তাঁহার প্রধান কার্য্যের মধ্যে গণ্য হয়। সুতরাং প্রাচীন শিল্পের একটা গুণ এই দেখা যায় যে, তাহা অতি সহজেই শ্রোতা বা দ্রষ্টার অন্তঃকরণে বিশেষ বিশেষ ভাবের উদ্রেক করিতে সমর্থ হয়। অপর দিকে যে সকল শিল্পী প্রতিভা হিসাবে নিকৃষ্ট, তাঁহাদিগকেও একটি সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিতে হইত বলিয়া তাঁহাদের শিল্প-রচনা-চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইতে পারিত না। বৈষ্ণব পদকর্ত্তৃদিগের মধ্যে সকলেই কিছু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমকক্ষ ছিলেন না—তথাপি এক নির্দ্দিষ্ট পন্থা ও রচনাভঙ্গী অবলম্বন করার দরুণ সকলেরই রচনা বেশ সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আধুনিক শিল্পী যদি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হন, তাহা হইলে তাঁহার শিল্প-রচনা-চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থতায় পরিণত হয়।

আর এক দিকেও প্রাচীন শিল্পীর সুবিধা ছিল। প্রাচীনকালে যে ভাবের আবহাওয়ার মধ্যে জনসমাজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত, তাহা শিল্প-রচনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। শিল্পী সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যেই শিল্পের উপকরণ পাইতেন। এখন সামাজিক জীবনে ভাবের হাওয়া বহে না, সুতরাং শিল্পীকে কষ্ট-কল্পনা করিয়া প্রায়ই প্রাচীন সমাজের চিত্রপট কল্পনার সাহায্যে সম্মুখে ধরিয়া শিল্প রচনা করিতে হয়। কারণ, আধুনিক জীবনের শুষ্কতার মধ্যে শিল্পের মালমশলা বড় বেশী পাওয়া যায় না। এই জন্যই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে প্রাচীন গ্রীস ও মধ্যযুগের আখ্যানাদি ও সেই সেই যুগের জীবনযাত্রা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাব্যরচনার একটা চেষ্টা দেখা যায়। এই সকল কারণে পাশ্চাত্যজগতে ভাবপ্রাণ শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ অনুকূল বেষ্টনীর অভাবে হাঁফাইয়া উঠিয়াছেন। সে দিন বর্ত্তমান ইংলণ্ডের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি ইয়েট্স্ (W. B. Yeats) কবিবর রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলির ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে কবি ও শিল্পীদিগের ভাবপ্রবণ প্রকৃতি ও উহার বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের সহিত সংগ্রামেই

ব্যয়িত হয়। শিল্পীর সমস্ত শক্তি এখন আর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে নিয়োজিত হইতে পারে না। প্রমাণ-স্বরূপ রস্কিন ও মরিসের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যব্যাখ্যাই স্ব স্ব জীবনের মুখ্য সাধনা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন, বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা শিল্প-সৃষ্টির অনুকূল নহে, অথচ বর্ত্তমান জীবন্ত সমাজের মধ্য হইতে অনুপ্রাণনা না পাইলে কি শিল্পসৃষ্টি হইতে পারে? কষ্টকল্পনা করিয়া প্রাচীন যুগের স্বপ্ন রচনা আর কতদিন করা যায়? তাঁহারা দেখিলেন, আধুনিক সমাজের এই শুষ্কতার মধ্যে পুনরায় ভাবরসের সঞ্চার করিতে না পারিলে শিল্পের উৎস একেবারে শুকাইয়া যাইবে। তাই তাঁহারা আধুনিক সমাজব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদিগের সেই আকাঙ্ক্ষার বাণী এখন পাশ্চাত্যজগতের নানা স্থান হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ভাবুকমাত্রই এখন প্রাচীন সমাজের মত একটা কোনও ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

এতক্ষণ আমরা আমাদের মূল বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে বেশীর ভাগ পাশ্চাত্য সমাজের কথাই আলোচনা করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, বর্ত্তমান যুগের জীবনযাত্রা-প্রণালীর যে সকল বিশেষ ধর্ম্ম আমাদের সমাজে ক্রমশঃ সংক্রামিত হইতেছে, তাহার পূর্ণপরিণতির চিত্র দেখিতে হইলে পাশ্চাত্য সমাজেই দেখিতে হইবে। আমাদের সমাজে আধুনিক সভ্যতার পূর্ণপরিণত স্বরূপ বেশ স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয় নাই। এখনও আমরা অন্ততঃ সমাজের বারো আনা লোক যাত্রা কীর্ত্তন কথকতায় রস পাই, এখনও আমাদের দেশে পারিবারিক ও সামাজিক সকল প্রকার বন্ধন শিথিল হইলেও ছিন্ন হয় নাই। Old Age Pensionএর আইন শীঘ্র পাশ করিতে হইবে, কি আশু নারীসমাজকে রাজনীতিক ভোটযুদ্ধে নামাইয়া দিতে হইবে, এরূপ আশঙ্কা এখনও আমাদের মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের তুলনায় আমাদের সামাজিক বন্ধনগুলি যে অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। এখন আর সেরূপ স্বাভাবিকভাবে মন্দির জলাশয় বৃক্ষ পান্থশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় না, অন্ততঃ ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে ও যে যে সমাজে ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী আদর্শের প্রবল প্রতাপ, সেই সেই সমাজে ও প্রদেশে এই সমাজধর্ম্মপালন একরূপ বন্ধ হইয়াছে। এ অবস্থায় দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য ও সমাজব্যাপারে দেশীয় ভাব রক্ষার জন্য যে এক

তন আকাঙ্ক্ষাও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা সমাজের পক্ষে ও শিল্প-সাহিত্যের পক্ষে শুভ-লক্ষণ মনে করিতে হইবে। কিছুদিন হইল, চিত্রশিল্পের রাজ্যে এই বাঙ্গালা দেশে এইরূপ একটা ভারতীয়ভাব ফুটাইবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সাহিত্যেও এই চেষ্টার অল্পাধিকপরিমাণে পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কেবল শিল্প ও সাহিত্যের রাজ্যে ভারতীয়ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিলেই চলিবে না। সমাজের চারি দিকে যদি বিদেশী ভাবের, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হাওয়া বহিতে থাকে, শিল্পী ও সাহিত্যিককে যদি প্রাত্যহিক সংসারের কার্য্যে পাশ্চাত্য স্বাতন্ত্র্যের আদর্শই অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে চিত্র বা কাব্যের বিষয় বা রচনাভঙ্গী ভারতীয় হইলেও, ভাবের আন্তরিকতার অভাবে সেই শিল্প একপ্রকার সৌখীনতা বা স্বপ্নবিলাসের মত হইয়া পড়িবে। সেই জন্য এখন দেশীভাবে দেশী ছাঁদের শিল্পচর্চ্চা করিতে হইলে সমাজের মধ্যেও সেই সকল দেশীভাব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। আমাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে সময়ে আমাদের এই চৈতন্যোদয় হইয়াছে, সে সময়ে আমাদের পুরাতন সামাজিক জীবনের প্রাণ-শক্তি একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। গার্হস্থ্য পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যে সকল দেশী আদর্শ, তাহা এখনও অনেক পরিমাণে বজায় আছে। এখনও পুরাতন আনন্দ-মিলনের ক্ষেত্রগুলি বর্ত্তমান। যাঁহারা দেশী শিল্প ও দেশী সাহিত্য চান, তাঁহাদিগের এই জীবন্ত সমাজকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। এই ক্ষীণপ্রাণ সমাজ-শরীরে প্রাণ-শক্তির সঞ্চার করিয়া ইহাকে পুনরায় সবল করিতে না পারিলে শিল্পের রাজ্যে ভারতশিল্প ও সাহিত্য সেই Pre-Raphaelite দের শিল্পের মত অতীত যুগের স্বপ্ন লইয়া খেলায় মাতিয়া থাকিবে। তাহা সামাজিক জীবনে, জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।

সমাজের ক্ষেত্র হইতে শিল্প-সাহিত্য যেমন জীবনীরস সংগ্রহ করে, অপর দিকে তেমনই সমাজের পুনরুজ্জীবন কার্য্যেও শিল্প-সাহিত্য সহায়তা করিতে পারে। শিল্পিগণ যদি জীবন্ত সমাজের অনুপ্রাণনায় ধন্য হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এখন কিছুদিন এই সামাজিক জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহাদিগের শিল্প-চেষ্টা পরিচালিত করিতে হইবে। তাঁহারা আদর্শ সমাজের জীবন্ত উজ্জ্বল চিত্র লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করুন ও ভাবরসসৌন্দর্য্যহীন মানবসম্বন্ধলেশ শূন্য আধুনিক সমাজের যে বীভৎসতা, তাহাও যথাযথরূপে অঙ্কিত করিয়া দেখান। পাশ্চাত্য জীবনপ্রণালীর যে মোহিনী-শক্তি আমাদের

উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করিতেছে, পাশ্চাত্য সমাজের পূর্ণপরিণত সার্ব্বাঙ্গীন চিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা সংস্কারের অভাব তাহার একটা কারণ। এই কৃত্রিম ঐন্দ্রজালিক মোহ নষ্ট করিয়া দিয়া আমাদের মনশ্চক্ষুর স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইতে হইলে পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সেইরূপ, প্রাচীন সমাজের যে লোভনীয়তা, তাহাও পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবেই আমাদের সম্মুখে সেরূপ প্রতিভাত হইতেছে না। সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ কিছুদিন এই সমাজচিত্রকেই নিজ নিজ রচনার বিষয়ীভূত করিয়া লউন। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুপ্ত সমাজবোধ এইরূপে জাগ্রত করিয়া দিন। যেন আমাদের এই সনাতন সমাজকে কখনও Old Age Pensions Act বা Insurance Act এর দ্বারা বিড়ম্বিত ও অপমানিত হইতে না হয়। যেন পুনরায় আমরা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলে মিলিয়া পুনরায় সাংসারিক জীবনে ভাবের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, বৃহৎ সামাজিক ভাবের মধ্যে আপন আপনব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ডুবাইয়া দিয়া যেন আবার সামাজিক সাহিত্য ও শিল্পের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হই। *

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

# বৈদিক যুগের বেশ-ভূষা।

মানসিক ও নৈতিক উন্নতির প্রকৃতি দেখিয়াই মানবের যথার্থ সভ্যতার বিচার হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতা, সাহিত্য-রচনায় কৃতিত্ব ও সামাজিক বিধানের পবিত্রতা যে যথার্থ উন্নতির ও মনুষ্যত্ববিকাশের সাক্ষী, তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই; কিন্তু জাতির বাহ্য সম্পদের পরিচয় হইতেও সভ্যতার প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। পরিধেয় বসন-ভূষণের বিবরণে, পরিচ্ছদ ও বেশ-বিন্যাসের পদ্ধতির কথায় প্রাচীনকালের সভ্যতার প্রকৃতি কথঞ্চিৎ অনুমিত হইতে পারে। প্রাচীনকালের যথার্থ ইতিহাসের অর্থ যখন প্রাচীনকালের একটি খাঁটী ছবি তুলিয়া লওয়া, তখন অতীত কালের বেশ-ভূষার বিবরণ পাঠকদিগের প্রীতিপ্রদ হইতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে খুঁজিয়া পাতিয়া সে যুগের বেশ-ভূষার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাই পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

কেশ-বৃদ্ধি ও কেশ-রচনার প্রতি ঋষি ও ঋষি-পত্নীদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাহাতে মাথায় টাক না পড়ে, এবং চুল খুব ঘন ও বড় হয়, ঋষিরা তাহার জন্য দেবতার কাছে মন্ত্রপাঠ করিতেন ( অথর্ব্ব ৬,—১৩৬-

৩৭)। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই দীর্ঘ কেশ রাখিবার প্রথা ছিল; কারণ, বশিষ্ঠ-বংশের বিশেষ পরিচয়ে অনেকবার উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঐ বংশের পুরুষেরা মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে চূড়া বাঁধিতেন। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের মত দীর্ঘকেশ ধারণ হয় ত সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল; কেন না, শতপথ-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে (৫,—১, ২, ১৪) যে পুরুষের পক্ষে দীর্ঘ কেশধারণ শোভন নহে, এবং উহাতে স্ত্রীজাতিসুলভ কমনীয়তা ও দুর্ব্বলতা সূচিত হয়।

ঠিক্ যাহাকে শিখা-ধারণ বলে, বৈদিক যুগে তাহা ছিল কি না, সন্দেহ। কেশ দীর্ঘ হইলেও শিখা হয় না; কেন না, শিখা করিতে হইলে চারি দিকের কেশ ছেদন করিতে হয়। শিখা শব্দটি এবং শিখাধারণের পদ্ধতির কথা শতপথ ব্রাহ্মণের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও সাহিত্যে নাই। এই গ্রন্থে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, ঐ শিখা মস্তকের মধ্যভাগে গ্রথিত হইত, এবং কেবল মরণাশৌচ পালন করিবার সময়েই ঐরূপ ভাবে শিখাবন্ধনের প্রথা ছিল। পুরুষের পক্ষে অন্য সময়ে শিখা উন্মুক্ত রাখাই রীতি ছিল। অন্য পক্ষে, স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অশৌচ-পালনের সময়ে এবং বিরহের অবস্থায় নারীরা মুক্তকেশা থাকিতেন। অন্য কোনও অবস্থায় কেশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইত।

পুরুষের পক্ষে যখন দীর্ঘ-কেশধারণের প্রথা ছিল, তখন অংশতঃ স্ত্রী-লোকের মত কেশ-বিন্যাসের প্রথাও ছিল। চুলের এক প্রকার বিনুনির নাম ছিল "কপর্দ"। ঐ প্রকার বিনুনি-করা চুল বা কপর্দ দেবতাদিগের মধ্যে রুদ্র ও পূষন্ নাকি বশিষ্ঠ ঋষির মত খোঁপা করিয়া পরিতেন। বশিষ্ঠ যে "দক্ষিণতঃ কপর্দ" ধারণ করিতেন, তাহার অনেক উল্লেখ আছে। যে চুলে কোনও রকম বিনুনি থাকিত না, এবং স্বাভাবিকভাবেই লম্বিত হইত, তাহার নাম ছিল "পুলস্তি।" অধিকসংখ্যক লোকেই এই পুলস্তি ধারণ করিত, মনে হয়।

অবিবাহিতা নারীদিগের কেশ-রচনায় একটু নূতনত্ব ছিল। পৃষ্ঠভাগের সমগ্র লম্বিত কেশরাশি চারিটি গুচ্ছে বিভক্ত করিয়া লইয়া চারিটি সূক্ষ্ম বেণীর সংযোগে একটি বড় বেণী বা কপর্দ রচিত হইত; এই কপর্দের নাম ছিল "চতুষ্‌কপর্দ"। চতুষ্‌কপর্দ্দ পশ্চাদ্‌ভাগে দুলিত, এবং উহা কবরী-রূপে গ্রথিত হইত না।

মাথার মাঝখানে সিঁথি করিয়া, কেশের কোনও প্রকার বিনুনি না করিয়া, সমস্ত কেশগুচ্ছ জড়াইয়া নারীরা যে প্রকার খোঁপা বাঁধিতেন, তাহার নাম ছিল "ওপশ"। এই ওপশের উল্লেখ ঋক্ ও অথর্ব বেদে পাওয়া যায়। দেবতাদিগের মধ্যে সিনিবালী এই প্রকারের কেশরচনা করিতেন বলিয়া তাঁহার নামের বিশেষণ হইয়াছিল "স্বৌপশা"। সাধারণ বিনুনি করিয়া যদি খোঁপা বাঁধা না হইত, তাহা হইলে সেই প্রকারের কেশরচনার নাম হইত "পৃথুষ্টুক", এবং "বিষিতষ্টুক"। এই শ্রেণীর কেশরচনা চতুষ্কপর্দ হইতে অল্পমাত্র ভিন্ন। মাথার সিঁথির নাম ছিল "সীমন্" (সীমা); কিন্তু ঠিক "সামন্ত" নহে।

কেশ-রচনা করিয়া মাথায় ফুল পরিবার প্রথা ছিল, এবং কবরী যাহাতে শিথিল না হয়, তাহার জন্য "কুরীর" নামক এক শ্রেণীর অলঙ্কার পরিহিত হইত। "কুরীর" না জুটিলে "শল্লী" বা শজারুর কাঁটা ব্যবহৃত হইত।

ধুতি হউক, শাড়ী হউক, পরিধেয় বসনের সাধারণ নাম ছিল "পরিধান"; তবে যেখানে কৌপীন পরিয়া পরে বহির্বেশ পরিহিত হইত, সেখানে সেই বহির্বেশের নাম হইত "প্রবর" বা "প্রবার"।

যুগপৎ কৌপীন ও বহির্বেশ পরিধান স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল; এবং পরিহিত কৌপীনের নাম ছিল "নীবি"। পরবর্ত্তী সময়ের সংস্কৃত সাহিত্যে দেখিতে পাই যে, "নীবি" অর্থ বস্ত্রের গ্রন্থি বা কোমরের খোঁট। এখন ছত্রিশগড় ও ছোট নাগপুর ভিন্ন অন্য কোথাও নীবি (বৈদিক অর্থে) ব্যবহৃত হয় বলিয়া জানি না।

পরিবার কাপড় যেন সেকালে একালে একই ভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, মনে হয়। কাপড়ের খাসা পাড় থাকিত, এবং ঐ পাড়ের নাম ছিল "তূষ"; দুইদিকের শেষভাগেই ছিলে থাকিত, এবং ঐ ছিলের নাম ছিল "দশা"। "দশা", এবং কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতরূপে "দশি" শব্দ এখনও অনেক স্থানে ব্যবহৃত আছে।

রমণীরা বস্ত্রার্দ্ধে অঙ্গ আবৃত করিলেও, অনেক সময়ে "দ্রাপি" ও "তার্প্য" ব্যবহার করিতেন। "দ্রাপি" অর্থ সেলাই-করা cloak; এবং "তার্প্য" গরদের অঙ্গ-আবরণ বলিয়া মনে হয়।

কাপড় বুনিবার তাঁতের নাম ছিল "বেমন্"; "তানার" নাম ছিল তন্তু। "তন্তু", "তন্ত্র" এবং "পড়েন"-এর নাম ছিল "ওতু"। "মাকু"র নাম

ছিল "তসর"; এখন কিন্তু তসর বলিলে এক রকমের মোটা রেসমের কাপড় বুঝায়।

পশমের প্রচুর ব্যবহার ছিল। কোন প্রকার রঙ্ না করা পশমের চাদরের নাম ছিল "পাণ্ড্ব" (পাণ্ডু-অ); কিন্তু উহা শেলাই করিয়া, ব্যবহার করিলে উহার নাম হইত "শামুলয়"। "শামুলয়" নামক পরিচ্ছদের ধারগুলি মুড়িয়া শেলাই করা হইত, এবং এই মুড়িভাঙ্গা শেলাইএর বৈদিক নাম ছিল "সিচ্"। শামুলয় কথাটি হইতেই "শাল" শব্দের উৎপত্তি কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। শামুলয় বস্ত্রকে যদি ঢিলা পিরানের মত শেলাই করিয়া লওয়া হইত, তবে তাহার নাম হইত "সামূল"। এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত "সামূল"কে woollen shirt বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।

যাহারা বস্ত্র বুনিত, তাহাদের দুইটি নাম পাওয়া যায়, যথা—"বায়' ও "সিরী"। বায় শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "বয়িত্রী" পদ পাওয়া যায়।

কাপড়ের উপরে ফুল-তোলা কিংবা অন্য রকমের সূচের বাহারের কাজ করা স্ত্রী-পরিচ্ছদের নাম ছিল "পেশস্"। এই Embroidered বস্ত্র স্ত্রীলোকেরা কেবল নাচিবার সময়েই পরিতেন বলিয়া অনুমিত হয় (ঋ ১, ৯২, ৪-৫। দেবী উষা যেন উজ্জ্বল বর্ণের "পেশস্" পরিয়া "নৃত্যন্তী যোষিদিব" শোভা পাইতেছেন, এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। যে সকল স্ত্রী কাপড়ের উপর এইরূপ সূচীকার্য্য করিত, তাহাদিগকে "পেশঃকারী" বলিত। অনেক দিন হইতেই ভদ্ররমণীর নৃত্য উঠিয়া গিয়াছে, এবং যাহারা এ কালে নৃত্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাদের সুখ্যাতি নাই। এই কারণেই পূর্ব্ববঙ্গে "নটী" শব্দ পতিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের "পেশাকার" শব্দও উদাহৃত বৈদিক শব্দের সহিত সম্পর্কিত কি না, বলিতে পারি না।

গরম কাপড়ের জন্য মেষের লোম ("অবি") ও "অজিন" ব্যতীত অন্য কিছু ব্যবহৃত হইত কি না, জানিতে পারা যায় না। "অজিন" প্রথমতঃ অজ বা ছাগের চর্ম্ম অর্থে, এবং পরে হরিণের চর্ম্ম অর্থে ঋগ্বেদ, অথর্ব্ব বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। অনেক পরবর্ত্তী সময়ে ব্যাঘ্রাদির চর্ম্মও অজিন বলিয়া অভিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। গান্ধা-

আর্য্যদিগের প্রদেশবিশেষে উষ্ণীষের ব্যবহার স্ত্রীপুরুষের উভয়ের মধ্যেই ছিল বলিয়া ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে বিশেষ উল্লেখ আছে। অথর্ব্ব বেদে (১৫, ২, ১৩) ইন্দ্রাণীর মস্তকেও উষ্ণীষ থাকার কথা পাওয়া যায়। অনেক বৈদিক উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, আর্য্যদিগের মধ্যে যাঁহারা পঞ্জাব-সীমান্তে কিংবা আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে বাস করিতেন, তাঁহারাই বিশেষ ভাবে উষ্ণীষ ধারণ করিতেন; এবং ইঁহারা ব্রাত্য অর্থাৎ হীন বা নিন্দিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ মধ্যদেশের উষ্ণীষ ধারণ না করিবার প্রথা আর্য্যপদ্ধতি বলিয়া, উহা পরবর্ত্তী যুগেও পূর্ব্ব দেশে অনুকৃত হইয়াছিল; এবং তাহারই ফলে বঙ্গে ও ওড়িশায় কদাচ উষ্ণীষ ব্যবহৃত হয় নাই। যজুর্ব্বেদে দেখিতে পাই যে, রাজারা যখন যজ্ঞ করিতে বসিতেন, তখনই মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করিতেন।

বস্ত্রাদি ময়লা হইলেই সেই ময়লা কাপড় চোপড়কেই "মল" বলিত; এবং ধোবার নাম ছিল "মলগ"। পরবর্ত্তী সময়ের "রজক" শব্দ ধোবা অর্থে ব্যবহৃত হইত না; কারণ রজকের কাজ ছিল বস্ত্রাদি রঙ্ করা। ধাতুগত অর্থ হইতেও উহাই সূচিত হয়। আমরাই একালে ভুল করিয়া ধোবার সাধু ভাষা রজক করিয়া তুলিয়াছি, নহিলে রজক আমাদের রঙ্ রেজ।

বৈদিক যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর "উপানহ্" বা পাদুকা ব্যবহৃত হইত। কাষ্ঠ-পাদুকা ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর চর্ম্মেও পাদুকা নির্ম্মিত হইত। শূকরের চর্ম্মে উপানহ্ প্রস্তুত হইত বলিয়া শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে।

কেশ-সংস্কারাদি কার্য্যের জন্য যাহারা নিযুক্ত হইত, তাহাদের নাম ছিল "বপ্তা"; বপ্ অর্থ ঠিক ক্ষৌরী করা। বপ্তা বা নাপিত (নাপিত শব্দটি অত্যন্ত অর্ব্বাচীন) "ক্ষুর" ব্যবহার করিত, এবং ঐ ক্ষুর খুব ভাল লোহায় প্রস্তুত হইত।

সাজ সজ্জা প্রভৃতির সময়ে মুখ দেখিবার জন্য আয়না ব্যবহৃত হইত, এবং আয়নার নাম ছিল "প্রাকাশ"। বৈদিক যুগের পূর্ব্বেও যে ভারতবর্ষে কাচের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহা প্রাগৈতিহাসিক কালের ব্যবহৃত কাচের সামগ্রীর আবিষ্কার হইতে জানা গিয়াছে। এরূপ স্থলে উল্লিখিত ঋগ্বেদীয় "প্রাকাশ"কে কেবলমাত্র glazed metal used for mirror বলিয়া সুপণ্ডিত মেক্‌ডনেল যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে পারি না।

বস্ত্রাদি ব্যতীত যে সকল অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত, তাহার সকলগুলির গড়ন

জানিতে পারা যায়; কোন্ অঙ্গে ব্যবহৃত হইত, তাহাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না। যাহা হউক, অলঙ্কার গুলির কথঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি।

নারীরা তাঁহাদের ওপশ বা খোঁপার উপর (সম্ভবতঃ খোঁপার উপরিভাগ ঢাকিয়া) "কুম্ব" নামক স্বর্ণালঙ্কার পরিতেন। উহা কি ঠিক দক্ষিণ দেশে ব্যবহৃত মাথার চাঁদের মত ছিল? "কুরীর" চুলের কাঁটার মত ব্যবহৃত হইলেও অলঙ্কারবিশেষই ছিল।

"কর্ণশোভন" বা ইয়ারিং স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করিতেন; তবে পুরুষের পক্ষে গোলাকৃতি "প্রবর্ত্ত" পরাই নিয়ম ছিল। এই প্রবর্ত্তেরই ক্রমবিকাশে দক্ষিণদেশের কুণ্ডলের সৃষ্টি।

বিবাহের সময় কন্যাকে "ন্যোচনী" নামক অলঙ্কার পরিতে হইত। ন্যোচনী যে মুখের সম্মুখভাগে ঝুলিত, তাহা কতকটা বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু উহার গড়ন কিরূপ ছিল, তাহা জানা যায় না। ন্যোচনী হইতে প্রাকৃত ভাষায় "ন্যোতনী"হইয়াছিল, মনে হয়। কিন্তু এই বৈদিক ন্যোচনী সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না। ন্যোচনীর ন্যোতনী রূপ হইতে আমাদের "নত্" হইয়াছে কি না, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারিব না; তবে শব্দ-সাদৃশ্যে যাহা মনে হইল, তাহাইবলিলাম। পাঠকেরা এ কথাও স্মরণ রাখিবেন যে, অনেক বৈদিক শব্দ প্রাকৃতের পথ বাহিয়া আসিয়া আমাদের প্রচলিত ভাষায় রহিয়াছে; অথচ সংস্কৃতে ঐ সকল শব্দ অজ্ঞাত।

"মনা" নামক একটি অলঙ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। টীকাকারেরা অর্থ করিয়াছেন যে, ঐ, অলঙ্কার-প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত অভিলাষ বা মন হয় বলিয়া অলঙ্কারটির মনা নাম হইয়াছিল; কিন্তু উহা কি অলঙ্কার, কোথায় পরিত, এ সকল কথা কোনও টীকায় নাই।

"খাদি" নামক একটি অলঙ্কারের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে হিরণ্যখাদির অনেক উল্লেখ আছে। এই চক্রাকার খাদি হাতে (মণিবন্ধে) ও পায়ের নিম্ন প্রদেশে পরিহিত হইত; কাজেই খাদি বলয়ও বটে, anklet ও বটে। ঋগ্বেদের খাদি অনেক পরবর্ত্তী সময়ের প্রাকৃতে "খাডি" হইয়াছিল, এবং সেই "খাডি" হইতেই আমাদের "খাড়ু"র উৎপত্তি বলিয়া অনুমান হয়।

"নিষ্ক" শব্দটি মুদ্রা অর্থে পাওয়া যায়, এবং গলার মালা অর্থেও পাওয়া যায়। এই কারণে অনেকেই অনুমান করিয়া থাকেন যে, স্বর্ণ ও রৌপ্য, নিষ্ক মুদ্রারূপেই ব্যবহৃত ছিল, এবং ঐ মুদ্রাই সূতায় গাঁথিয়া গলার মালা করা হইত।

"রুক্ম" নামক স্বর্ণ-অলঙ্কারটি যে প্রকার অর্দ্ধগোলাকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে উহা ঠিক হাঁস্থলি ছিল, বলিতে পারা যায়।

ঋগ্বেদে যে "মণি"র উল্লেখ আছে, উহা হীরক বলিয়া স্বদেশ বিদেশের সকল পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই মণিতে যে ছিদ্র করিতে পারা যাইত, এবং অনেক মণি ছিদ্র করিয়া সূতায় গাঁথিয়া হার করিয়া পরিয়া যে বড়মানুষেরা "মণিগ্রীব" হইতেন, তাহা সুস্পষ্ট জানিতে পারা যায়।

আমরা যাহাকে মুক্তা বলি, তাহার বৈদিক নাম "বিমুক্তা"। এই মুক্তা কোথায় সংগৃহীত হইত, বৈদিক উল্লেখ হইতে তাহা ধরিতে পারা যায় না। মণির ব্যবহারের মত মুক্তার ব্যবহারও বড়মানুষদিগের মধ্যেই চলিত ছিল।

শঙ্খ হইতে নানা শ্রেণীর অলঙ্কার প্রস্তুত হইত। সম্ভবতঃ একালে হাতে পরা ভিন্ন উহার অন্য কোনও ব্যবহার প্রচলিত নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

---

# দ্বিজেন্দ্র-প্রসঙ্গ।*

সে আজ বহুবর্ষের কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বৃদ্ধপ্রপৌত্রীর বিবাহোপলক্ষে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে আমি কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে সর্ব্বপ্রথম দর্শন করি। যত দূর স্মরণ হয়—সে দিন সে গৃহে নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্র, কবিবর রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র, বিচারপতি আশুতোষ প্রভৃতি বহু সাহিত্য-রসজ্ঞ ব্যক্তি ফরাসের উপরে উপবিষ্ট ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত-স্রোতে সেদিন হাস্য-লহরীর যে বিচিত্র মোহন লীলা-বিভঙ্গ লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা এ জীবনে বিস্মৃত হইতে পারি নাই, বুঝি কখনও পারিবও না। "নন্দলালে"র স্বদেশপ্রীতি হইতে আরম্ভ করিয়া, "কিন্তু"-পরাহত "হ'তে পার্‌তাম" দলের বিচিত্র কাহিনী সকল তিনি অকুণ্ঠ কণ্ঠে গায়িতেছিলেন; আর, ফরাসের উপরে ভারতের শিরোভূষণগুলি সরল হাস্য-বিভায় গৃহতল সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিলেন। কেবলমাত্র কর-স্পর্শ-সুখে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াই সেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট

---

* গত জ্যৈষ্ঠ মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার উদ্যোগে এক বিরাটজন-সাধারণ-সভা আহূত হয়। এই বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক এই চরিত-প্রসঙ্গ পঠিত হইয়াছিল।

হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ইহার অনেক পরে একদিন কবি প্রমথনাথের সঙ্গে কলিকাতার, ঝামাপুকুরে একটি ক্ষুদ্র আলয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত আমি প্রথম সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কবি-সন্দর্শনে ও তাঁহার সহিত সরস আলাপনে সেই অম্লান প্রভাতে আমার যে কত আনন্দই হইয়াছিল, তাহা বলিয়া বুঝানো অসম্ভব। দ্বিজেন্দ্রলাল সেদিন আমাকে—সেই প্রথম—তাঁহার রচিত পুস্তকগুলি উপহার দিলেন। আমি সেই "সাদরোপহার" প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম।

সারল্য ও বন্ধু-বাৎসল্য।

প্রথম হইতেই দ্বিজেন্দ্রলালের অকৃত্রিম কাপট্যলেশহীন ব্যবহারে আমি বিস্মিত ও আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। Convention বা সামাজিক-লৌকিকতা-শূন্য কবির হৃদয়-ক্ষেত্রে একেবারে অসঙ্কোচেই আমি প্রবেশলাভ করিয়াছিলাম। এ জীবনে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় কত শত গণ্য ও নগণ্য ব্যক্তির সংসর্গে আসিতে হইয়াছে; কিন্তু এমন শিশুসুলভ সারল্য আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

প্রথম পরিচয়ের পর হইতেই উদার-মতি দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ-আত্মীয়তায় পরিণত হইল। বেশ মনে পড়ে—তাঁহার তৎকালে প্রকাশিত "তারাবাই" নাট্য-কাব্যের আমি একটি সমালোচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে সমালোচনাতে প্রচুর পরিমাণে আমার স্পর্দ্ধা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন সন্ধ্যা-কালে আমার নিকটে আসিয়া, সহসা প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আমাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন, এবং আমার প্রদর্শিত ত্রুটীগুলি অম্লানমুখেই স্বীকার করিয়া, অপ্রত্যাশিত প্রীতির সুখ-বেদনায় আমাকে "ভাই, ভাই" বলিয়া কতই না কাঁদাইয়াছিলেন! দ্বিজেন্দ্রলালের বিনয়-বর্জ্জিত ব্যবহারের অন্তরালে তাঁহার যে বিরাট্ হৃদয় ছিল, তাহার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া যাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারা এ কথা আজ অকপটেই স্বীকার করিবেন যে, অমন শিশুর ন্যায় সরল ও কোমল, আকাশের ন্যায় প্রশান্ত ও উদার, মেঘের ন্যায় গম্ভীর ও অমিয়-বর্ষী হৃদয় এ সংসারে বস্তুতই পরম দুর্লভ সামগ্রী। অপ্রতিহত নির্ভীকতা ও সারল্য-সঞ্জাত, স্বভাব-সুলভ স্পষ্টবাদিতার দরুণ যাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলালকে 'অহঙ্কারী' 'দাম্ভিক' প্রভৃতি আখ্যায় অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই অবগতির উদ্দেশ্যে আমি এই ব্যক্তিগত ঘটনাটির উল্লেখ আবশ্যক বোধ করিলাম আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত এ সংসারে কেহ কোনও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে

না। দ্বিজেন্দ্রলালেরও আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস চিরদিনই ভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। যে অদম্য প্রতিভার অপার্থিব প্রভায় আজ এই হতভাগ্য বঙ্গভূমি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে, সে দিব্যশক্তির স্পন্দন দ্বিজেন্দ্রলাল আজীবন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন, এবং অত্যধিক সারল্যবশতঃ অনেক সময়ে তাঁহার সে বিশ্বাস 'দম্ভ' বা 'অহঙ্কারে'র ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে অণুমাত্রও সঙ্কুচিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের মহান্ চরিত্রের এই নিগূঢ় সত্যটুকু সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে যাঁহারা ধারণা করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই তাঁহাকে 'অসামাজিক' ও 'অহঙ্কারী' প্রভৃতি বলিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন না।

পত্নী-বিয়োগ ও সংযম।

এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সহধর্ম্মিণী একটি বালক ও এক শিশু-কন্যার ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিয়া সহসা পরলোকে প্রয়াণ করেন। দলে দলে দ্বিজেন্দ্রলালের গুণ-মুগ্ধ কত ব্যক্তি তৎকালে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, তাঁহার শোক-তপ্তচিত্তে সান্ত্বনা দান করিবার প্রয়াস পাইতেন ; কিন্তু অতুল প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল সান্ত্বনা-দানের ব্যর্থ চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য অনেক সময়ে একান্তই অশোভনভাবে হাস্যালাপ করিতে থাকিতেন ; কখনও বা সঙ্গীত-সুধায় সকলকে অভিনন্দিত করিয়া বিদায় দিতেন। এই সময়ে একদা দ্বিপ্রহরে একাকী পাইয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"আপনি এমন করিয়া এ সময়ে কি করিয়া অত হাস্যালাপ করেন, বুঝিতে পারি না।" তদুত্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল গলদশ্রুলোচনে আমাকে বলিয়াছিলেন—"সবই পারি ; কিন্তু, তার প্রসঙ্গ বা এই সকল নিয়ম-নির্দ্দিষ্ট, মৌখিক সান্ত্বনা-বাক্য আমার সহ্য হয় না। সে যে আমার কি ছিল, তাহা তোমরা কি বুঝিবে !" এই কথা বলিয়া কবিবর পুত্র-কন্যা দু'টির দু' হাত ধরিয়া, গৃহান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার অর্গল-রুদ্ধ করিলেন। আমি একাকী কিছুক্ষণ সেই শূন্য গৃহতলে অপেক্ষা করিয়া, এই মহাজনের অতুল প্রণয়ের অপরিমেয় গভীরতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলাম। বলা বাহুল্য, পত্নী-হারা দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার লোকান্তরিতা প্রেমময়ী দেবীর সম্বন্ধে কোনও প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত শুনিতে বা বলিতে পারিতেন না। বহু প্রলোভন ও অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন নাই। স্ত্রীর প্রতি তাঁহার প্রেম কি প্রকার নিবিড় ও অচপল ছিল, তাহা 'আলেখ্য' কাব্যের "বিপত্নীক", "আত্মহারা" "বিধবা" ও "হতভাগ্য" কবিতাগুলি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন

তাঁহারা কথঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারিবেন। একবার মনে পড়ে,—তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ায় তিনি আমাকে ভয় দেখাইবার ছলে লিখিয়াছিলেন—"আমি তো আবার বিবাহ করিতেছি। বেশ কথা,—না?" আমি তদুত্তরে তাঁহার সে কথা অবিশ্বাস্য বলিয়া, যখন প্রকৃত ঘটনা কি, জানিতে চাহিয়াছিলাম, তখন প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে জানাইয়াছিলেন, —"বিবাহ সম্বন্ধে তোমার ধারণাই ঠিক। কাম-পরিণয় সমাজের দিক্ দিয়ে সমর্থিত হ'লেও হৃদয় তা'কে বাধা দেয়। সমাজকে জীবনে অনেক ঠকিয়েছি; কিন্তু, নিজেকে— হৃদয়কে ঠকিয়ে কেমন করে' বাঁচব ভাই? 'বিয়ে লোকের আর ক'বার হয়'—এ তোমার লাখ কথার এক কথা।" দ্বিজেন্দ্রলাল বিবাহ করিলেন না। চিরজীবন অসীম সংযমে তিনি মোটা কাপড় ও সাধাসিধা চালই বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন—আদর্শ বিপত্নীক জীবনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গত দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কেহ তৈল বা সাবান ব্যবহার করিতে দেখে নাই। রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ, নগ্ন গাত্র, নগ্ন পদ বিলাত-ফেরত দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের বাড়ীতে "তুপ তুপ" করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—আজও সে দৃশ্য যেন স্পষ্ট চোখেই দেখিতে পাইতেছি। তিনি যে শুধু দ্বিতীয়বার বিবাহ না করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে;— বিপত্নীক দ্বিজেন্দ্রলাল আচারে, ব্যবহারে, জ্ঞানে, কর্ম্মে ও চিন্তায় যথার্থ বিধবারই ন্যায় অসীম সংযম—অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতার ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর গলিতে কবিবর প্রাসাদসদৃশ সুদৃশ্য এক দ্বিতল হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া সে ভবনের নাম রাখিয়াছিলেন—'সুর-ধাম'। আমি সে নামের সার্থকতা না বুঝিয়া একদিন এই কবিত্বহীন নাম-করণ লইয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলে, আমার নিকটে আসিয়া, কবিবর জনান্তিকে বলিলেন—"জান না? এ বাড়ী যে তাহার। আমি এখানে তাহারই স্মৃতির অন্তরালে ডুবিয়া থাকিব। তারই নাম ছিল—সুরবালা!" রহস্য উদ্ঘাটিত হইলে আমি এ প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার দরুণ প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম। তখন, কেন জানি না, সীতা-বিরহিত রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা আমার মনে পড়িয়াছিল।

সংসারের নানা কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াও তিনি নিতান্ত নির্লিপ্তের ন্যায়— আলু-থালু ভাবে—সন্ন্যাসীরই মত জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। লোক-

চরিত্র লোকের মধ্যে গুণের সন্ধান পাইলে তিনি তাহার সহিত অসঙ্কোচে মিশিয়াছেন।—আগুন লইয়াও তাঁহাকে খেলা করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু কখনও হাত পোড়ান নাই। শত বাসনার বিবিধ ও বিচিত্র প্রলোভন অতি সহজেই উপেক্ষা করিয়া,—

প্রলোভন হ'তে দূরে, বিজনে, অরণ্য-কোণে,
যোগী কি বৈরাগী
সম্বরিতে আত্ম-মন, যে সাধন-সিদ্ধিতরে
নিত্য রহে জাগি'—

তিনি সে সাধনে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিতই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলালকে একদিন "নীতিবাদী" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে সাহস করিয়াছিলেন, নিষ্প্রয়োজন হইলেও, আমি তাঁহাদেরই অবগতির জন্য এই কথাটা আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিলাম।

স্বদেশ-প্রেম

আর একদিনের একটা ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। তখন কবিবর ৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। রবিবার; প্রাতঃকালে আমরা অনেকে তাঁহার বসিবার ঘরে গল্প-গুজব করিতেছি; সহসা দূর হইতে একটা সুর আমাদের কাণে ভাসিয়া আসিল। তখন স্বদেশী-আন্দোলনের প্রবল বন্যায় দেশ পরিপ্লাবিত;—ঘরে বাহিরে পথে ঘাটে নগরে প্রান্তরে সর্ব্বত্র নব-জীবনের বিপুল বন্যা অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবহমান। আমরা তড়িৎবেগে সে কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম—কতকগুলি যুবক দল-বদ্ধ হইয়া মাতৃনাম গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন, সঙ্গে শত শত লোকমন্ত্রমোহিত চিত্তে সে সঙ্গীত-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহ-সমক্ষে আসিয়া সেই বিপুল জন-স্রোত সহসা সংক্ষুব্ধ ও গতিহীন হইয়া পড়িল। তখন সেই ভাব-তরঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং সে গানে যোগদান করিলেন, এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তিন চারিবার জলদ-নির্ঘোষে "বন্দে মাতরম্"-মন্ত্রে গগন প্লাবিত করিয়া দিলেন। সেইদিন তাঁহার রক্তিম মুখ-মণ্ডলে মহাসমারোহের যে জ্বলন্ত জ্যোতির্ব্বিভা দেখিয়াছিলাম, তাহা এ দগ্ধ হৃদয়-পটে চিরজীবন স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়াইয়া মাতৃভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল যে সঙ্গীত ও যে মন্ত্র বারংবার গায়িয়া উঠিয়াছিলেন, আজ এ হতভাগ্য দেশ সে গান আর শুনিতে পাইবে

না! আজ সে গভীর-গম্ভীর স্বর-তরঙ্গ একেবারেই অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে! স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় আমাকে একদিন কবিবর বলিয়াছিলেন—"এ দেশ আজ যদি পর-প্রসঙ্গ ও বিজাতি-বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রকৃত কল্যাণ-সাধনে তৎপর হয়, তবে এ জগতে এমন কোনও শক্তিই নাই যে, তাহার সে বলদৃপ্ত গতির রোধ করিতে পারে। কিন্তু অযথা এ অশোভন আস্ফালন ও যাহারা আমাদের শিক্ষা-গুরু—যাহাদের কৃপায় ও পুণ্যবলে আমাদের আজ এই যা' কিছু উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাদের প্রতি আমাদের এ অন্ধ বিদ্বেষ যতদিন সম্যক্ তিরোহিত না হইবে, ততদিন আমাদের উদ্ধারের কোনও উপায়ই আমি দেখি না।" আজ দূরদর্শী রাজ-নীতিক দ্বিজেন্দ্রলালের সেই ভবিষ্যদ্বাণী আমার মানসশ্রবণে এখনও ঝঙ্কৃত হইতেছে। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল "প্রতাপসিংহ" নাটক প্রকাশিত করেন, এবং ভারত-গৌরব দুর্গাদাসের অমূল্য জীবন অবলম্বনে নাটকপ্রণয়নে রত হন। দুর্গাদাসের অনিন্দ্য আদর্শ চরিত যাঁহারা রাজস্থানে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কবিবরের "দুর্গাদাস" পাঠ করিলে বুঝিবেন,—যোগ্য কবির হাতে সে চিত্র কিরূপ বিচিত্র নৈপুণ্য সহকারে প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কি ব্যক্তি-গত জীবনের আচার-ব্যবহারে—কি সাহিত্য-সাধনার অবকাশে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশের ও স্বজাতির প্রকৃত কল্যাণকল্পে যে অনুপম সাহস ও অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এ দেশে যদি কখনও যথার্থ স্বাস্থ্য সঞ্চারিত হয়, তবে সেইদিন দেশবাসী সকলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কৃতজ্ঞহৃদয়ে নেত্র-জলে এই স্বদেশ-প্রাণ কর্ম্মবীরকে অকৃত্রিম প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পূজা করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

একবার পূজাবকাশে আমি গয়ায় গিয়া কয়েকদিন আমার নমস্য ও প্রাণ-প্রিয় সুহৃত্তমের অতিথি হইয়াছিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল তৎকালে গয়ার অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলেন। এই সময়ে এই অযোগ্য লেখক সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত একত্র বসবাস করিবার শুভ অবসর পাইয়াছিল। একদিন দুপুরবেলা আহারান্তে বসিয়া আছি; কবিবর বলিলেন—"দেখ, আমার মাথায় একটা গানের কতকগুলো লাইন আসিয়া ভারি জ্বালাতন করিতেছে, তুমি একটু বোসো;—আমি সেগুলো গেঁথে নিয়ে আসি।" অর্দ্ধঘণ্টা বা তাহারও কিছু অধিক কাল একাকী বসিয়া রহিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল দূর হইতে করতালি দিতে দিতে গায়িতে গায়িতে আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন, এবং আমাকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়া কহিলেন,—"উঃ! কি চমৎকার গানই লিখেছি। শুন্‌বে? শুন্‌বে না কি? আচ্ছা, তবে শোন"—এই বলিয়া গায়িয়া উঠিলেন,—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার,
ধাত্রী আমার, আমার দেশ।"

গানটা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম; তখন, বলিতে লজ্জা হয়—পাষণ্ড আমি, আমারও চক্ষে জল আসিয়াছিল; আমি নীরবে, নতশিরে একটা অপার্থিব অনুভূতির আবেগে ক্ষণকালের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বন্ধুবর বলিলেন—"কি? কেমন লাগল?" আমি বলিলাম—"ধন্য আপনি!" বাল-স্বভাব দ্বিজেন্দ্রলাল একবার শুধু আমার মুখের দিকে হাসিয়া চাহিলেন; পরে আর কিছু না কহিয়া, হাতে তাল দিতে দিতে নাচিয়া নাচিয়া গায়িলেন—

"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা,
কিসের ক্লেশ?
সপ্ত কোটী মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন
আমার দেশ!"

সে রাত্রে যথারীতি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের আবাসে আসিয়া এই অগ্নি-গর্ভ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া উৎসাহে, গর্ব্বে, আনন্দে, বিস্ময়ে ও ভক্তির প্রাবল্যে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। শ্রীযুক্ত লোকেন পালিত মহাশয় তৎকালে গয়ার জজ ছিলেন—প্রত্যহই সন্ধ্যার সময়ে বন্ধু-বৎসল পালিত মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহে আসিতেন, এবং সাহিত্যিক বিতর্ক-বিচারে রাত্রি প্রায় একটা দুইটা পর্য্যন্ত যাপন করিতেন। "আমার দেশ" গানটি শুনিয়া লোকেন্দ্রনাথের যে অপূর্ব্ব উৎসাহ দেখিয়াছিলাম তাহা এ জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক "নূরজাহান" মুদ্রিত করিয়া "মেবার-পতনের" রচনায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। মেবারের গৌরব-ভাস্কর যখন ভারতাম্বরে প্রদীপ্ত, মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর যখন সে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ-তাপে প্রপীড়িত ও ম্রিয়মাণ—রাজপুত-শৌর্য্যের সেই সৌভাগ্য দিনের মেবারের মহিমা ও গর্ব্বের স্মৃতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া কবিবর "মেবার পাহাড়, উড়িছে যাহার রক্ত-পতাকা উর্দ্ধশির" ইত্যাদি যে গানটি লেখেন, এই হতভাগ্য তখন তাঁহারই পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল। সঙ্গীতটি গ্রথিত হইলে আমি

মেবারের পতন বিষয়ে আর একটি যোগ্য গান রচনা করিতে বলিলাম। সেই দিনই সন্ধ্যার সময়ে আর একটি গান লিখিত হইল—

"মেবার পাহাড় শিখরে যাহার
রক্ত নিশান ওড়ে না আর !"

সুর-সংযোগ করিয়া সঙ্গীত দুইটি আমায় গাইয়া শুনাইলেন। আর এ জীবনে সে কণ্ঠ শুনিব না !—হায়, বুঝি তেমন গানও আর রচিত হইবে না।

এই সময়ে কোনও সুবিখ্যাত কবি ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী সরকারী কোনও কার্য্যোপলক্ষে গয়ায় আসিয়া কতিপয় দিবস দ্বিজেন্দ্র-সহবাসী হইয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার ও লোকেন্দ্র পালিত মহোদয়ের অনুরোধক্রমে বন্ধু আমার এই তিনটি গান গায়িয়া শুনাইতেছিলেন, বিমুগ্ধ শ্রোতা আমরা সে অতুল সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দে, বিস্ময়ে ও দেশভক্তিতে সত্য সত্যই অভিষিক্ত হইয়া গিয়াছিলাম। সে নিশায় ক্ষণজন্মা দ্বিজেন্দ্রলালের যে দুর্দ্দম উৎসাহ দেখিয়াছিলাম, এ জীবনে তাহা কি কখনও ভুলিবার! দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতির অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনা আমার এ স্মৃতিপটে আজিও সুস্পষ্ট মুদ্রিত রহিয়াছে; বিধাতা যদি দিন দেন, তবে সে সকল কথা পরে বলিব।

কবিবরের "প্রতাপ সিংহ", "দুর্গাদাস" ও "মেবার পতন" যাঁহারা অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিবেন, তাঁহারাই কবির ঐকান্তিক স্বদেশ-প্রেমের পুণ্য প্লাবনে পরিপ্লুত ও প্রবুদ্ধ হইতে পারিবেন, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহার 'আমার দেশ' ও 'আমার জন্মভূমি' বঙ্গ দেশের অবিনশ্বর সম্পত্তি।

ক্রমশঃ।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

# পূর্ব্বতন কায়স্থ-সমাজ।

গত বৈশাখের "সাহিত্যে" 'মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে'র সংবাদ প্রকাশ করিয়া সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কায়স্থসমাজের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তির ভ্রম দেখাইয়া মৈত্রেয় মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনুধাবনযোগ্য। মৈত্রেয় মহাশয় যথার্থই লিখিয়া-

ছেন যে, "ইংরেজী শিক্ষার স্পর্শমণিসংস্পর্শে আমাদের পাল-সরকার-দাস-ঘোষ-বসু-মিত্র মহোদয়গণ হঠাৎ সুবর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিলে রচনা-লালিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর পুরাতত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।" "তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন অবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক রচনায় যে কথা অবলীলাক্রমে উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন অপবাদ, সমগ্র হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ। ঈশ্বরঘোষের তাম্র-শাসন তাহার কথঞ্চিৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিবে; এবং গৌড়-গৌরব-যুগের যে সকল লিপিপ্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্থানলাভ করিতে পারিবে।" (১) মৈত্রেয় মহাশয়ের উক্তির সমর্থন করিবার জন্যই আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা। এই প্রবন্ধের উপসংহারে দেখাইয়াছি যে, কেবল গৌড়বঙ্গ বলিয়া নহে, মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের ন্যায় এখানকার বহু ঘোষাদি কায়স্থসন্তান ভিন্ন দেশে ও ভিন্নরাজ্যে গিয়া দূর অতীতকালে উচ্চ রাজকীয় পদলাভের সঙ্গে স্ব স্ব প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন এবং গৌরবজনক প্রতিপত্তির নিদর্শন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে গুপ্তসম্রাটগণের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসিলে তাঁহাদের প্রতিনিধি ও রাজকর্ম্মচারী কায়স্থগণ পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এ সময়ের কতকগুলি তাম্রশাসন অল্পদিন হইল ফরিদপুর জেলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে প্রমাণ পাইতেছি যে, খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শত বর্ষ পুর্ব্বে ঘোষ, পালিত, সেন, দত্ত, গুপ্ত, কুণ্ড, আদিত্য প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থগণ পূর্ব্ববঙ্গের সকল শাসনবিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। (২) পূর্ব্ববঙ্গে খড়্গ, পাল ও বর্ম্মবংশের অভ্যুদয়ে তাঁহাদের বংশধরগণের পূর্ব্বাধিপত্য কতকটা হ্রাস হইলেও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানাগমন-কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতাপ হ্রাস হয় নাই। কায়স্থ শূরবংশের রাজত্বকালে তাঁহারাই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়ের নানা স্থানে তাঁহারাই কোথাও স্বাধীনভাবে, কোথাও বা অর্দ্ধস্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতেও বহু কায়স্থ সময়ে সময়ে আসিয়া

---

(১) সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ১৩২০, বৈশাখ, ৪২—৪৩ পৃষ্ঠা।

(২) Journal of the Asiatic society of Bengal 1612. PP 449—502; Inbian Antiquary, Vol. XXXIX. P 206.

এখানকার কায়স্থসমাজের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সময়েই গঙ্গাতট-বর্ত্তী সিংহেশ্বর নামক স্থানে কায়স্থ শূরবংশীয় মহারাজ আদিত্যশূরের সভায় পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের বীজিপুরুষ বাৎস্যগোত্রীয় অনাদিবর সিংহ, সৌকালীন গোত্রীয় সোম ঘোষ, মৌদ্গল্য-গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত, বিশ্বামিত্র-গোত্রজ স্থদর্শন মিত্র ও কাশ্যপ-গোত্রীয় দেবদত্ত, এই পঞ্চ মহাজন আগমন করেন। ইহারই কছুকাল পরে পালবংশ উত্তররাঢ় অধিকার করেন। দক্ষিণরাঢ়ে শূরবংশের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ইহারই অত্যল্পকাল পরে প্রবলপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোড়ের গৌড়-মণ্ডল-আক্রমণ। এই সময়েই তাঁহাদের সঙ্গে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় দত্ত-বংশের অপর বীজপুরুষ পুরুষোত্তম দত্ত কাঞ্চীপুর হইতে দক্ষিণরাঢ়ে আগমন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের সুপ্রাচীন কুলপঞ্জীতে বিবৃত হইয়াছে—

"বীজী পুরুষোত্তম দত্ত, সদাশিব অনুরক্ত
কাঞ্চীপুর হইতে আইলা গৌড়।"

তাহারই কিছুকাল পরে আর্য্যাবর্ত্তে চেদিপতি কর্ণদেবের অভ্যুদয়। সেই চেদিপতি কর্ণদেবের অভ্যুদয়কালেই গৌতম-গোত্রজ বসুবংশের বীজপুরুষ বীরনাথ দশরথ ও সিন্ধুনাথ এই দুই পুত্র সহ গৌড়দেশে আগমন করেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বসুবংশধরগণ বীরনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দশরথের সন্তান। আমাদের সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থেও লিখিত আছে—

"বীরনাথ বসু হইল দুই শিশু
দশরথ সিন্ধু নামে।"

দশরথের পূর্ব্বপুরুষগণ চন্দ্রবংশোদ্ভব চেদি বা হৈহয়বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাই দশরথ বসুর কুলপরিচয় প্রসঙ্গেও আমাদের কুলপঞ্জিকায় পাইতেছি—

"স চ চৈদ্যকুলাম্বুজঃ সোমসমঃ গৌতম গোত্রতন্ত্রী।"

পূর্ব্ববঙ্গে বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক চেদিপতি কর্ণদেবের দৌহিত্র মহারাজ শ্যামল বর্ম্মা অবন্তী ও গুর্জ্জরের পরমার, সোলঙ্কী প্রভৃতি অগ্নিকুলের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তৎপুত্র ভোজবর্ম্মার নবাবিষ্কৃত তাম্র-লেখ হইতে আমরা সেই পরিচয় পাইয়াছি। সেই বঙ্গাধিপ শ্যামল বর্ম্মার সময়েই রাজাদেশে গুহবংশীয় ত্রিবিক্রমপুত্র দশরথ গৌড়দেশে আগমন করেন। তাঁহার পরিচয়-প্রসঙ্গেও আমাদের কুলপঞ্জিকায় রহিয়াছে—

"গুহ ত্রিবিক্রমে. তিন পুত্র ক্রমে
শুন সভে সভাজন।
দশরথ জ্যেষ্ঠ, দয়াবন্ত শ্রেষ্ঠ
শুচিরথ সর্ব্বশেষে।
রাজ আজ্ঞা পাইয়া ইষ্ট স্মরণ লইয়া
চলিলেন গৌড়দেশে॥

দশরথ গুহ উত্তররাঢ় বা দক্ষিণ রাঢ়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। তিনি অগ্নিকুলের আত্মীয়তা-সূত্রে যাদববংশীয় পূর্ব্বাবলাধিপ শ্যামলবর্ম্মার অধিকারেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া পূজ্য হইয়াছিলেন। তিনি অগ্নিকুলোৎপন্ন ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—

"অয়মগ্নিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্।"

আমাদের বঙ্গীয় চারি শ্রেণীর সামাজিক কায়স্থগণের বীজ পুরুষগণ আর্য্যাবর্ত্তের বিশুদ্ধ আর্য্যশোণিত লইয়া এ দেশে উপনিবেশী। অনেকেই অবগত আছেন যে, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণ এক পিতামাতার সন্তান। আমি যে বহুসংখ্যক প্রাচীন কুলপঞ্জিকা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে, চারি শ্রেণীর মধ্যেই একগোত্রজ ও একপদ্ধতিযুক্ত আমাদের সামাজিক কায়স্থবর্গ এক পিতার সন্তান। আমি পূর্ব্বে অযোধ্যা হইতে সমাগত যে সৌকালিন-গোত্রজ সোম ঘোষের নাম করিয়াছি, তিনি উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ, এই তিন সৌকালীন ঘোষ-বংশের আদিপুরুষ। এই সোম ঘোষের পরিচয়-প্রসঙ্গে উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে আছে—

"অযোধ্যা হইতে আইল সোম।
বিপ্র সাথে করি হোম॥
তস্য সুত অরবিন্দ।
সুত মহেশ মকরন্দ॥
মকরন্দ সপ্তগ্রামে।
পূজিত পিতার নামে॥
দক্ষিণে বাড়িল মান।
কক্ষায় কৈল কন্যাদান॥

আমাদের দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতেও পাইতেছি—

"সোম ঘোষবংশ গুণাবতংস মকরন্দ সুভাজন।"

এইরূপ মায়াপুরী বা হরিদ্বার হইতে সমাগত বিশ্বামিত্র-গোত্রজ সুদর্শন

মিত্র উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ, এই তিন শ্রেণীর মিত্রবংশের বীজপুরুষ হইতেছেন। উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে এইরূপ বংশপরিচয় আছে—

সুদর্শন সুতঃসোম স্তৎসুত শম্ভুমিত্রকঃ।
শ্রীকণ্ঠস্তৎসুতো জাত স্তৎসুত বাসমিত্রকঃ॥
পুরুষোত্তম স্তস্য পুত্রশ্চত্বার স্তস্য নন্দনাঃ।
জ্যেষ্ঠো বাচস্পতিরজ্ঞো বটমিত্রশ্চ মধ্যমঃ॥
কনিষ্ঠাখ্যো নরপতিশ্চত্বার সোদরা ইমে।
বল্লালপূজিতো ভূত্বা বটো হভূম্মগধেশ্বরঃ॥
সুদর্শনবংশকোহপি কালিদাসাখ্যমিত্রকঃ।
গতবান্ দক্ষিণরাঢ়ে তত্রৈব খ্যাত মাপ্তবান্॥

আমাদের দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতেও পাইতেছি—

শম্ভুমিত্র নাম সুত অনুপাম কালী আদি তিন জন।

এখন উভয় শ্রেণীর প্রাচীন কুলগ্রন্থের সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি—

মথুরা হইতে সমাগত মৌদ্‌গল্য-গোত্রীয় পুরুষোত্তমই উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র, এই চারি শ্রেণীর আদি মৌদ্গল্য দত্তবংশের বীজপুরুষ। শেষোক্ত তিন শ্রেণীতে তাঁহার বংশধরগণ বটগ্রামী দত্ত বলিয়া পরিচিত। এখন উত্তররাঢ়ীয় সমাজে তাঁহার বংশধরগণ 'দাস' উপাধিতে অভিহিত হইলেও, পুরুষোত্তমের কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত 'দত্ত' উপাধি ধারণ করিতেন। তাহা অমরা উত্তররাঢ়ীয় প্রাচীন কুলপঞ্জী হইতে পাইয়াছি—

"মৌদ্গল্যবীজো পুরুষোত্তমাখ্যো তস্মাৎ কবীন্দ্রো কুলকারদত্তঃ।
তস্মাৎ দত্তঃ বিক্রমনামধারী তস্মাচ্চ বিশ্বম্ভর দত্তজারী।
তস্মাৎ গদাধরো নৈকষ্যকক্ষঃ তস্মাদ্দত্তদাস-দামোদরাখ্যঃ।
তস্যাত্মজো কবিরামদাসঃ সরস্বতীখ্যাতি ভুবিপ্রকাশঃ।

উদ্ধৃত প্রমাণ অনুসারে জানিতে পারিতেছি যে, মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম দত্ত হইতে অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষে দামোদর দত্ত 'দাস' উপাধি গ্রহণ করেন। এই 'দাস' উপাধি সম্বন্ধে উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"হরিতে ভকতি বড় মৌদ্গল্য-নন্দন
দাস বলি ডাকে তারে শুন সর্ব্বজন।"

এইরূপে এখানকার চারি শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে বাৎস্য-গোত্রীয় সিংহবংশ, কাশ্যপ দত্তবংশ ও ভরদ্বাজ কর প্রভৃতি বহু সামাজিক কায়স্থবংশই এক পিতার

সন্তান হইতেছেন। প্রাচ্য ভারতের নানা বর্ণধর্ম্মের লীলাস্থল গৌড়মণ্ডল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইতে মুসলমান ও ব্রিটীশ শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কখনও একচ্ছত্রাধীন হয় নাই। পুনঃপুনঃ বৈদেশিক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি নানা খণ্ড বিখণ্ডে বিভক্ত ও সেই সকল খণ্ডিত জনপদ আবার বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিগণের শাসনাধীন হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গাগত কায়স্থগণ বহু পূর্ব্বকাল হইতে এখানকার রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ পুণ্যশ্লোক এক পিতার সন্তান হইলেও একই সময়ে শূর, দেব, পাল, খড়্গ, বর্ম্ম, সেন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম ও মতাবলম্বী নৃপতিগণের সংস্রবে ভিন্ন ভিন্ন আচার ও ধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন নৃপতির অধিকারে বসবাস হেতু তাঁহারা শ্রেণী-চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া হইয়া পড়িয়াছেন।

আমাদের কুলপঞ্জী হইতে জানা গিয়াছে,—বসু, ঘোষ, দত্ত, মিত্র প্রভৃতি সামাজিক কায়স্থগণ শ্রীবাস্তব, সূর্য্যধ্বজ, মাথুর, শকসেন, গৌড় প্রভৃতির মূল কায়স্থ-শাখা হইতেই সমুদ্ভূত। এক্ষণে উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-ভারতে চৈত্রগুপ্ত কায়স্থগণ উক্ত মূল শাখার নামে পরিচিত হইলেও বঙ্গাগত তাঁহাদেরই দায়াদগণ স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষের সম্মানবর্দ্ধক এখানকার রাজপ্রদত্ত উপাধি অথবা রাজপ্রদত্ত কুলস্থানানুসারেই সুপরিচিত। এখানে তাঁহাদের আদি পরিচয় দিবার বিশেষ প্রয়োজন না হওয়ায় কালক্রমে অনেকেই আপন পূর্ব্ব পরিচয় বিস্মৃত হইয়াছেন। তাই পশ্চিমাঞ্চলবাসী হিন্দুস্থানী কায়স্থগণ এতদিন আমাদিগকে পর ভাবিয়া আসিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা দাবী করিবার যথেষ্ট উপকরণ আমাদের সুপ্রাচীন কুলপঞ্জীসমূহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কেবল চৈত্রগুপ্ত কায়স্থ বলিয়া নহে, মহারাষ্ট্রের চান্দ্রসেনীয় কায়স্থবংশধরগণও বহুপূর্ব্বকাল হইতেই এ দেশে আসিয়া এখানকার কায়স্থসমাজে সম্মিলিত হইয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজে কাশ্যপ গোত্রজ 'গুপ্ত' এবং দেবল-গোত্রীয় 'রাজ'-পদবীযুক্ত সামাজিক কায়স্থ বিদ্যমান। কুলগ্রন্থে ইঁহারা মহারাষ্ট্র-দেশাগত বলিয়া পরিচিত। পশ্চিম ও উত্তর ভারতে এরূপ গোত্র ও উপাধিযুক্ত চিত্রগুপ্ত কায়স্থ নাই। বোম্বাই প্রদেশে চান্দ্রসেনীয় প্রভু কায়স্থগণের মধ্যেই ঠিক ঐরূপ গোত্র ও উপাধি এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। এ অবস্থায় প্রভুকায়স্থগণের সহিত যে দক্ষিণ-

রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণরাঢ়ীয় বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থগণের মধ্যে, সামাজিক দ্বিসপ্ততিঘর কায়স্থের বিভিন্ন গোত্র ও পদ্ধতি এবং তাঁহাদের কুলপরিচায়ক সুপ্রাচীন ঢাকুরগুলির আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইবে যে, চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় বহু ক্ষত্রিয়-পরিবার বঙ্গীয় কায়স্থের সহিত মিশিয়া কায়স্থ বলিয়াই সুপরিচিত হইয়াছেন।

কেবল যে গৌড় বঙ্গেই কায়স্থের উপনিবেশ ঘটিয়াছে, তাহা নহে। অতি পূর্ব্বকালে যে সকল কায়স্থ এখানে উপনিবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যেও কেহ কেহ পরবর্ত্তিকালে রাজকীয় কর্ম্মোপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে গিয়া উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, সম্মানিত ও পরে তাঁহাদের অনন্তরবংশ তত্তৎস্থানের কায়স্থসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের হিন্দুস্থানী কায়স্থমাত্রই জানেন ও স্বীকার করেন যে, তথায় দ্বাদশ শ্রেণীর মূল কায়স্থের মধ্যে যে সকল গৌড় কায়স্থ বিদ্যমান, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের গৌড়মণ্ডল হইতে গিয়া তথায় বাস করিতেছেন। হিন্দুস্থানী কায়স্থের বিশ্বাস যে, গৌড় সেনরাজবংশ এই গৌড় কায়স্থ হইতেছেন; এবং সেন বংশের সময়ে ও তৎপরেও গৌড় কায়স্থগণ উত্তর ও পশ্চিম ভারতে গিয়া তত্তৎ কায়স্থসমাজভুক্ত হইয়াছেন। আমি প্রাচীন শিলালিপি হইতেও পাইয়াছি যে, সেনবংশেরও বহুপূর্ব্বে গৌড় কায়স্থগণ সুদূর মধ্যপ্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশস্থ রতনপুর হইতে আবিষ্কৃত ৮৬৬ সংবতে (৮০৯ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হৈহয়বংশীয় চেদিরাজ জার্জ্জল্যদেবের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, চেদিরাজের 'মন্ত্রণা বিষয়ে অগ্রণী ও অসম শাস্ত্রপারদর্শী' এক জন গৌড় কায়স্থ মন্ত্রী ছিলেন। উক্ত চেদিরাজের সভায় নানাশাস্ত্রবিশারদ বহুসংখ্যক শ্রীবাস্তব কায়স্থ বিদ্যমান ছিলেন, তাহাও আমরা উক্ত চেদিপতি ও তৎপুত্র পৃথ্বীদেবের শিলা-প্রশস্তি হইতে পাইয়াছি। (৩) তথায় সেই প্রাচীনকালে গৌড়কায়স্থ ও শ্রীবাস্তব কায়স্থ

(১) Crooke's Tribes and castes of the N. W. P. Vol. U P 192.

(২) Epigraphica India Vol I p 36.

(৩) " " 39 p 42.

আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় যে, বঙ্গের দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর বসুবংশের বীজপুরুষ দশরথ উক্ত চৈত্য শ্রীবাস্তব বংশ-সম্ভূত ছিলেন।

কেবল উক্ত গৌড় কায়স্থ বলিয়া কেন? পাট্‌না ও শোণপুর রাজ্য এবং সম্বলপুর জেলা হইতে নবাবিষ্কৃত অনেকগুলি তাম্রশাসন হইতে সন্ধান পাইয়াছি যে, বঙ্গের ঘোষ, নাগ, দত্ত, আদিত্য, অর্ণব প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থগণ খৃষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতাব্দীতে জনমেজয় মহাভবগুপ্ত, যযাতি মহাশিবগুপ্ত এবং তৎপুত্র ভীমরথ প্রভৃতি ত্রিকলিঙ্গাধিপতির সভায় সান্ধিবিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক প্রভৃতি উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহাভবগুপ্তের তাম্রশাসনে "রাঢ়ায় বল্লিকন্দরবিনির্গতায়" ইত্যাদি প্রয়োগ থাকায় সন্ধান পাইতেছি যে, রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণও রাঢ়ীয় কায়স্থের সহিত ঐ সময়ে ত্রিকলিঙ্গবাসী হইয়াছিলেন। অল্প দিন হইল, ঐ সকল তাম্রশাসন ভারত গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত Epigraphica Indica নামক পত্রিকার ৯ম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রাচীন লেখমালার প্রকাশক মহাশয় তাম্রশাসন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

King Janamejaya and his successors had many Bengali Kayasthas for their Court officers. We get the names of Kailasa Ghosha, father of Vallabha Ghosha, Malla Datta, son of Dhara Datta in the Employment of Janamejaya, the names Charu Datta, Uchhaba Naga and Vallabha Naga under King Jayati and the names Sinha Datta and Mangala Datta under Bhimaratha. None but Bengali Kayasthas bear Datta, Ghosh, Naga &s. as surnames, The Uriya Karana never used such surnames. The words Datta, Ghosha, & as inseperable parts of the names of men were in use in other parts of Northern India, and such names would be borne by persons of any aud every caste. but as these words are surnames here of Kayasthas. there can be no doubt that the Kings had Bengali officers under them when they acquired territories in the forest tract of Sambalpur."

বাস্তবিক, খ্রীষ্টীয় ১০ম হইতে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যে উৎকল, কলিঙ্গ, ও দক্ষিণ কোশল হইতে যত শিলালেখ—ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গাক্ষরের পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান, ইহাও বঙ্গীয় কায়স্থ-প্রভাবের অন্যতম নিদর্শন। এইরূপ বঙ্গীয় কায়স্থের সর্ব্বত্র গতিবিধি

ও বসবাসের পরিচয় পাইয়াছি। প্রয়োজন হইলে প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে বঙ্গীয় কায়স্থগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তির যথেষ্ট পরিচয় উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।*

শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু।

---

# অমরতা।

[ Maurice Maeterlinckএর ফরাসী হইতে। ]

( ১ )

আমরা এক্ষণে যে নব শতাব্দীতে প্রবেশ করিয়াছি—যে শতাব্দীতে প্রচলিত ধর্ম্মগুলি বিশ্বমানব-সংক্রান্ত বড় বড় প্রশ্নের উত্তর-প্রদানে বিরত—সেই শতাব্দীতে একটি সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের অন্তরে একটা আকুল জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, সেটি—পারলৌকিক জীবনের সমস্যা। মৃত্যুতে কি সব শেষ হইয়া যায়? আমরা মৃত্যুর পরেও কি থাকিব—এ সম্বন্ধে কি কোন প্রকার কল্পনা করা যাইতে পারে? আমরা কোথায় যাইব, আমাদের দশা কি হইবে? যে ক্ষণভঙ্গুর বিভ্রমকে আমরা জীবন বলি, তাহার পর-পারে কোন্ অবস্থা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে? যে মুহূর্ত্তটিতে আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া যায়, সেই সময়ে জড়-শক্তি, না চিৎশক্তি জয় লাভ করে? সেই সময় নিত্য জ্যোতির, না অসীম অন্ধকারের আরম্ভ হয়?

অন্যান্য সমস্ত সত্তার ন্যায়, আমরাও অবিনশ্বর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোনও পদার্থ একেবারে বিলুপ্ত হয়—ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। অনন্তের পার্শ্বে,—একটি 'নাস্তি' রহিয়াছে, অথবা একটি জড়-পরমাণুরও পতন হইতে পারে, বিনাশ হইতে পারে, ইহা কল্পনা করা অসম্ভব। যাহা কিছু আছে, তাহা নিত্যকাল থাকিবে, সকলই আছে, নাই বলিয়া কোন জিনিস নাই। নচেৎ আমাদের বিশ্বাস করিতে হয়—বিশ্ব-সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করিতে বাধ্য হই, সেই ধারণার সহিত আমাদের মস্তিষ্কের তিলমাত্র ঐক্য নাই। এমন কি, এ কথাও বলা যাইতে পারে, আমাদের

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থকাণ্ড ( যন্ত্রস্থ ) ১ম ভাগে—এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাব আলোচনা করিয়াছি।

মস্তিষ্কক্রিয়া বিশ্বের উল্টা দিকে চলিতেছে ; কিন্তু তাহা সম্ভব নহে ; কেন, না আমাদের মস্তিষ্কের ধারণাগুলি বিশ্বেরই প্রতিবিম্বমাত্র।

যাহা বিনাশ পাইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অন্ততঃ অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আমরা দেখিতে পাই, উহা অবিনশ্বর জড়-পদার্থের রূপান্তরমাত্র, প্রকারান্তরমাত্র। কিন্তু এই সকল অবভাসের মূলে বাস্তব সত্য কি আছে, তাহা আমরা জানি না। যে বস্ত্রখণ্ডে আমাদের চোখ্ বাঁধা রহিয়াছে, যাহার চাপে আমরা অন্ধ হইয়া রহিয়াছি, ঐগুলি সেই বস্ত্রখণ্ডের অন্তর্গত বয়ন-সূত্র, আমাদের জীবনের প্রতিবিম্বসমূহ। এই বন্ধনটি খুলিয়া লইলে কি অবশিষ্ট থাকে? তাহার ও দিকে একটা বাস্তব সত্য নিশ্চয়ই আছে ; এস আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করি : অথবা ঐ অবভাসগুলিও কি আমাদের নিকট নাস্তির সামিল হইয়া যাইবে?

( ২ )

বিনাশ অসম্ভব, মৃত্যুর পরে সমস্তই থাকিবে, কিছুই ধ্বংস হইবে না ;—এই কথায় আমাদের বিশেষ কিছু ঔৎসুক্য হয় না। আমাদের জীবন ইহলোকে বাহ্য ঘটনা সকল উপলব্ধি করে, আমাদের সেই ক্ষুদ্র জীবনটির দশা কি হইবে, মৃত্যুর পরে উহা স্থায়িত্ব লাভ করিবে কি না, ইহাই আমাদের ঔৎসুক্যের বিষয়। উহাকেই আমরা আমাদের চৈতন্য বলি, "আমি" বলি। এই "আমি"র বিনাশের পর, "আমি"র পরিণাম চিন্তা করিয়া, "আমি" সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা হয়, সেই "আমি" আমাদের মনও নহে, আমাদের শরীরও নহে, কেন না, আমরা জানি, এই শরীর মন উভয়ই তরঙ্গের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে, অবিরাম নবীকৃত হইতেছে।

তবে কি ইহা একটি অপরিবর্ত্তনীয় বিন্দুবিশেষ, যাহা চিরপরিণামশীল আকার হইতে পারে না, বস্তু হইতে পারে না, জীবনও হইতে পারে না, প্রত্যুত যাহা আকার ও বস্তুর কার্য্য ও কারণ? বস্তুতঃ উহাকে আমরা ধরিতে ছুঁইতে পারি না, উহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না ;—বলিতে পারি না, কোথায় উহা অবস্থিতি করে। উহার চরম সূত্রস্থানে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলে আমরা কতকগুলি স্মৃতিপরম্পরা, কতকগুলি অস্পষ্ট ও পরিবর্ত্তনশীল ধারণা ভিন্ন আর বড় কিছু উপলব্ধি করিতে পারি না—আর সেই স্মৃতি ও ধারণাগুলি আমাদের জীবনতৃষার সহিত সংযুক্ত। উহা আমাদের ইন্দ্রিয়চেতনার কতকগুলি অভ্যাস-পরম্পরা,

পারিপার্শ্বিক ঘটনাসমূহের বিরুদ্ধে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কতকগুলি প্রতিক্রিয়া-মাত্র। মোট কথা, এই নীহারিকার মধ্যে যে বিন্দুটি সর্ব্বাপেক্ষা ধ্রুব,—সেটি আমাদের স্মৃতি। আবার এই বৃত্তিটি অনেকটা বাহিরের জিনিস বলিয়া মনে হয়, অন্যান্য বৃত্তির অনেকটা সহকারী বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ উহা আমাদের মস্তিষ্কের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষণভঙ্গুর অংশ;—এমন একটি অংশ, যাহা আমাদের স্বাস্থ্যের একটু ব্যাঘাত ঘটিলেই তখনই অন্তর্হিত হয়। এক জন ইংরাজ কবি ঠিক্‌ই বলিয়াছেনঃ—"উহা নিত্যতার দোহাই দিয়া খুব চীৎকার করে বটে, কিন্তু উহা আমার মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।"

(৩)

তাহাতে কিছু যায়-আসে না; এই "আমি," এমন যে অনিশ্চিত, এমন-যে ধরা ছোঁয়ার বাহির, এমন-যে 'উড়ো-উড়ো', এমন-যে ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তবু আমাদের সত্তার এরূপ কেন্দ্রস্থানীয়, উহার প্রতি আমাদের এরূপ বিষম মনের টান যে, এই ছায়ামূর্ত্তির সম্মুখে, আমাদের জীবনের সমস্ত বাস্তব সত্তা মুছিয়া যায়। সমস্ত অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের শরীর বা শরীরের বস্তু, সমস্ত সুখ ভোগ করিবে, সমস্ত গৌরবের অধিকারী হইবে, অতীব বিরাটভাবে বা সুসূক্ষ্মভাবে রূপান্তর প্রাপ্ত হইবে; ফুল, সুগন্ধ, সৌন্দর্য্য, আলোক, ঈথার, নক্ষত্র—এই সমস্তে পরিণত হইবে—ইহা আমাদের নিকট একান্তই উপেক্ষণীয়। আমাদের জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া ক্রমে বিশ্বজীবনের সহিত মিশ্রিত হইবে, বিশ্বজীবনকে বুঝিতে পারিবে, বিশ্বজীবনের উপর আধি-পত্য করিতে পারিবে—ইহাও আমাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষার বিষয়। আমা-দের সহজ সংস্কার আমাদিগকে বলে যে, ঐ কথার উপর আমাদের কোন দরদ নাই, উহাতে আমাদের কোন সুখ নাই, উহা আমাদিগকে আমা-দের "আপনাতে" পৌঁছাইয়া দেয় না; কতকগুলি ক্ষুদ্র ঘটনার স্মৃতি আমাদের সহগামী না হইলে, এই সকল অকল্পনীয় সুখসমূহের সাক্ষিরূপে না থাকিলে, আমরা "আপনাকে" চিনিতে পারি না। আমার মনের উচ্চতম মুক্ততম সুন্দরতম অংশগুলি পরমানন্দের সম্ভোগে নিত্যকাল সজীব ও ভাস্বর হউক বা না হউক—উহা আমার পক্ষে সমান। আর ত উহারা আমার নহে, আর ত উহাদিগকে আমি চিনি না। যাহাকে আমি "আমি" বলিয়া উপলব্ধি করি, সেই বিন্দুটি কোন্ কেন্দ্রে আছে, তাহা আমি

জাল ও যে স্মৃতিজাল আবদ্ধ ছিল, মৃত্যু সেই জালের বন্ধন কাটিয়া দিয়াছে। এই বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন এবং আকাশ ও কালের মধ্যে ভাসমান হওয়ায়,—অতীব দূরতম নক্ষত্রের দশা আমার নিকট যেরূপ অপরিচিত, উহাদেরও দশা আমার নিকট তেমনি অপরিচিত।

যে সত্তাটি কোথায় আছে জানি না, এবং যাহা কোথাও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে অবস্থান করে না—সেই রহস্যময় সত্তার মধ্যে যতক্ষণ না ঐ সকল স্মৃতির ক্ষুদ্র অংশগুলিকে ফিরাইয়া আনিতে পারি, ততক্ষণ, যাই ঘটুক না কেন—আমার নিকট উহাদের কোন অস্তিত্বই নাই। আমি যেন একটি দর্পণের ন্যায় জগতের পাশ দিয়া বিচরণ করিতেছি—ঐ জগতের ঘটনাবলী উহার উপর যতটা ছায়া ফেলে, ততটা কায়া ধরে না।

( ৪ )

তবেই দেখা যাইতেছে, আমাদের অমরত্বের বাসনাটিকে সূত্র-বচনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আকারে পরিণত করিবামাত্রই উহা বিনষ্ট হইয়া যায়,—যেহেতু আমাদের উত্তর-জীবনের সমস্ত আশা ভরসাকে এমন একটি অংশের উপর আমরা স্থাপন করিয়া থাকি, যাহা একান্তই গৌণভাবাপন্ন ও যার-পর-নাই ক্ষণস্থায়ী। আমাদের মনে হয়, আমাদের সত্তার যাহা বিশেষ লক্ষণ—সেই সকল দুঃখ, সেই সকল ক্ষুদ্রতা, সেই সকল ত্রুটী প্রভৃতি যদি মৃত্যুর পরেও আমাদের সঙ্গে থাকিয়া না যায়, তাহা হইলে অন্য সত্তার সহিত আমাদের কোন পার্থক্য থাকে না; তাহা হইলে আমাদের সত্তাটি সমস্ত অজ্ঞাত সত্তা সাগরের মধ্যে একটি অজ্ঞান-বিন্দু হইয়া অবস্থিতি করে মাত্র; এবং তখন হইতে পর-পর যাহা কিছু তাহার পরিণতি হয়, তাহার সহিত আমাদের আর কোন সংশ্রব থাকে না।

অমরত্বসম্বন্ধে যাহারা এইরূপ ধারণা করিতে বাধ্য হয় তাহাদিগকে অমরত্বসম্বন্ধে কিরূপ আশ্বাস দেওয়া যাইতে পারে? উপায় কি? —আমাদের সহজ সংস্কারই যে আমাদিগকে এই অমরত্বের আশা দিতেছে। সেই সহজ সংস্কার "ছেলে-মানসি" হইলেও অতি গভীর। ইহ জীবনে আমরা যে কয়েদীর বেড়ী পরিয়াছিলাম, অমরত্ব ঐ বেড়ী-সমেত আমাদিগকে যদি অনন্তকালের পথ দিয়া টানিয়া লইয়া না যায়, ইহজীবনে কিয়ৎবৎসর ধরিয়া যে উদ্ভট চৈতন্য আমরা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, আমাদের তাদাত্ম্যতার অকাট্য চিহ্নস্বরূপ সেই চৈতন্য যদি ঐ অমরত্বের মধ্যে না থাকে

তবে সে অমরত্ব আমাদের পক্ষে না থাকারই সামিল। অধিকাংশ ধর্ম্মগুলি এই কথা বুঝে; তাহারা জানে, যে সহজ প্রবৃত্তি অমরত্বলাভের ইচ্ছা করে, সেই সহজ প্রবৃত্তিই আবার এই অমরত্বকে বিনষ্ট করে। এই জন্যই, ক্যাথলিক ধর্ম্মসম্প্রদায়, সর্ব্বাদিম আশা ভরসার সূত্রস্থানে ফিরিয়া গিয়া, শুধু যে আমাদের পার্থিব "আমি" সমগ্রভাবে বজায় থাকিবে বলিয়া আমাদিগকে আশ্বাস দেয়, তাহা নহে, আরও এই আশ্বাস দেয় যে, আমরা আমাদের রক্ত-মাংস লইয়া পুনর্ব্বার উত্থান করিব।

ইহাই এই সমস্যার কেন্দ্রস্থল। এই ক্ষুদ্র চৈতন্য, এই বিশেষ আমিত্বের অনুভূতি, যাহা প্রায় শিশুবৎ অপুষ্ট, অন্ততঃ যাহা অতীব সীমাবদ্ধ,—যাহা আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের দৌর্ব্বল্যমাত্র, সেই চৈতন্যকে বুঝিবার জন্য, উপভোগ করিবার জন্য, সেই চৈতন্য অনন্তকাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে এইরূপ দাবী করার অর্থটি কি ইহা নহে যে, আমরা এমন একটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এমন একটা পদার্থ দেখিতে চাহিতেছি, যাহা দেখিবার জন্য সেই ইন্দ্রিয় গঠিত হয় নাই? আমরা হস্তের দ্বারা আলোক উপলব্ধি করিব, চক্ষুর দ্বারা গন্ধ উপভোগ করিব—ইহা কি সেই রকম দাবী নহে? তা ছাড়া, কোন রোগী যদি মনে করে, আপনাকে আবার ঠিক্ চিনিতে হইলে, তাহার সুস্থাবস্থাতেও, চিরদিনের জন্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই রোগটি থাকা চাই—ইহা কি কতকটা সেই রকমের কথা নহে? সচরাচর তুলনা যেরূপ হইয়া থাকে, সেই হিসাবে এই তুলনাটিও খুব ঠিক্। মনে কর, এক জন অন্ধ শুধু অন্ধ নহে, তা ছাড়া সে পঙ্গু ও বধির। মনে কর, জন্মাবধি তার এইরূপ অবস্থা; তার পর, এখন সে ত্রিশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। সাদা বস্ত্রের পাড়টির ন্যায় বেচারীর প্রতিবিম্বহীন ফাঁকা জীবনের প্রান্তদেশে তাহার সেই সামান্য অনুভূতিগুলি কি? তাহার স্মৃতি-পটের সুদূর পশ্চাতে, তাহার স্মৃতির মধ্যে আছে শুধু অতি তুচ্ছ তাপশৈত্যের অনুভূতি, শ্রান্তি ও বিশ্রামের অনুভূতি, অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী দৈহিক বেদনার অনুভূতি, ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুভূতি। কোন দৈহিক কষ্টের উপশমে সে যে-সুখ অনুভব করিয়াছে—খুব সম্ভব, সমস্ত মানব-সুখ, সমস্ত আশা ভরসা, সমস্ত উচ্চতর কল্পনার স্বপ্ন, সমস্ত স্বর্গের ধারণা, তাহার নিকট সেই অস্পষ্ট পূর্ব্বানুভূত সুখের অনুভূতিতে পরিণত হইবে। অতএব তাহার এই চৈতন্যের ভাণ্ডারে, তাহার

এই আমিত্বের ভাণ্ডারে, এইটুকুমাত্র সম্বল থাকাই সম্ভব। উহার বুদ্ধিবৃত্তি, বাহির হইতে কখনও কোন আহ্বান পায় নাই বলিয়া, উহা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইবে, আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিতে পারিবে না। তথাপি এই দুর্ভাগ্য ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের বন্ধন, সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরই ন্যায় অমনি তীব্র, অমনি জলন্ত আগ্রহপূর্ণ হইবে। সে মৃত্যুকে ভয় করিবে; নিজে হৃদয়ানুভূতিগুলিকে সঙ্গে না লইয়া, তাহার তমোরাশিকে, তাহার দারিদ্র্য শয্যার স্মৃতিগুলিকে সঙ্গে না লইয়া, তাহার নিস্তব্ধতাকে সঙ্গে না লইয়া, অসীম অনন্তের পথে তাহাকে প্রবেশ করিতে হইবে,—এই কথা মনে করিলে সে নিরাশা-সাগরে নিমগ্ন হইবে। আমরাও ঐরূপ জীবনের গৌরব, আলোক ও প্রেমের বদলে সমাধিস্থানের চির-শৈত্য ও অন্ধকারে প্রবেশ করিতে হইবে মনে করিলে নৈরাশ্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকি।

( ৫ )

মনে কর, কোন এক অলৌকিক ঘটনার প্রভাবে হঠাৎ তাহার চোখ, তাহার কাণ সজীব হইয়া উঠিল; তাহার শয্যার শিয়রের দিকের খোলা জান্‌লা দিয়া, ময়দানে উদ্ভাসিত অরুণ-কিরণ, গাছপালার মধ্যে মুখরিত বিহঙ্গ-সঙ্গীত, তরুপল্লবের মধ্যে অনিলের সরসর-শব্দ, নদীতটে জলের কুলুকুলু ধ্বনি, পাহাড়ের মধ্য হইতে মানব-কণ্ঠের স্বচ্ছ আহ্বান-রব তাহার নিকট প্রকাশিত হইল। আরও মনে কর, ঐ অলৌকিক ঘটনার প্রভাবে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার করিতে সে সমর্থ হইল। সে উঠিল; এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের উদ্দেশে সে হাত বাড়াইয়া দিল, সে এই ব্যাপারের সদৃশ অন্য কিছু পূর্ব্বে উপলব্ধি করে নাই, উহার নাম পর্য্যন্ত সে জানে না :— উহা কি? না, আলোক! সে দ্বার খুলিল, এই অত্যুজ্জ্বল আলোক-রাশির মধ্যে তাহার পা টলিতে লাগিল, এই সমস্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে তাহার সমস্ত শরীর যেন দ্রবীভূত হইল। সে এক অনির্ব্বচনীয় জীবনের মধ্যে এক স্বপ্নাতীত আকাশের মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং এইরূপ হঠাৎ আরোগ্য-লাভের ফলে—এক অভাবনীয় ও দুর্ব্বোধ্য অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়া—যাহা একান্ত অসম্ভব নহে—সে তাহার অতীত জীবনের স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে হারাইল।

এই যে "আমি", এই যে কেন্দ্রগত অভ্যন্তর, এই যে আমাদের সমস্ত অনুভূতির আধারভূমি, এই যে বিন্দুটি যাহার অভিমুখে আমাদের জীবনের যাহা কিছু নিজস্ব—সমস্তই ধাবিত হইতেছে—ইহার অবস্থা কিরূপ হইবে? স্মৃতি লগ্ন

হইলে—সে পূর্ব্ববর্ত্তী মানুষটির কি কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পাইবে? একটি অভিনব শক্তি, অভিনব জ্ঞান, হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া, অশ্রুত-পূর্ব্ব কর্ম্মচেষ্টা প্রকাশ করিতে লাগিল;—যে তমোময় জড়-বীজ হইতে এই জ্ঞান সমুত্থিত হইল, তাহার সহিত এই জ্ঞানের সম্বন্ধ কিরূপ ভাবে রক্ষিত হইবে? তাহার অতীতের কোন্ অংশের সহিত যোগ স্থাপন করিয়া তাহার জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবে?

যাই হোক্, স্মৃতি-নিরপেক্ষ আর কোন সহজ-সংস্কার, কোন বুদ্ধিবৃত্তি, কিংবা আর কোন কিছু, তাহার মধ্যে থাকিবে কি না—যাহার দ্বারা সে বুঝিতে পারিবে, এই নবোদ্ভাসিত জীবনটা তাহারই জীবন,—তাহার প্রতিবেশীর জীবন নহে—রূপান্তরিত ও দুরভিজ্ঞেয় হইলেও বস্তুতঃ একই জিনিস, উহার তাদাত্ম্য অক্ষুণ্ণ—এবং তমোরাশি ও নিস্তব্ধতা হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক ও ঐকতানের মধ্যে উহা আরও কিছুকাল অবস্থিতি করিবে। এই উন্মদ চৈতন্যের বিশৃঙ্খলতা, উহার জোয়ার ভাঁটা কি আমরা কল্পনা করিতে পারি? কল্যকার "আমি"র সহিত আজিকার "আমি" কি রকম করিয়া মিলিত হইবে, এবং এই অহং-বিন্দুটি—এই ব্যক্তিত্বের চেতন-বিন্দুটি যাহা অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি—এইরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে, এইরূপ বিকার-অবস্থায়, সেই বিন্দুটি কি ভাবে অবস্থিতি করিবে, তাহা কি আমরা জানি?

প্রথমে সেই প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দিবার চেষ্টা করা যাক্—কেন না ইহা আমাদের বর্ত্তমান জীবনের ও প্রত্যক্ষ জীবনের অধিকারভুক্ত; এবং যদি আমরা তাহা না পারি, তাহা হইলে মৃত্যুকালে যে সমস্যা প্রত্যেক মনুষ্যের নিকট স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়, আমরা কি করিয়া সে সমস্যার সমাধানের আশা করিব?

(৬)

এই সচেতন বিন্দুটি—যাহার মধ্যে অমরত্বের সমস্ত সমস্যাটি নিহিত—এই রহস্যময় বিন্দুটি,—মৃত্যুর সম্মুখে আমরা যাহার এতটা মূল্য অবধারণ করি,—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই বিন্দুটিকে আমরা আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে হারাইয়া থাকি, অথচ তাহার জন্য একটুও উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা অনুভব করি না। কেবল প্রতিরাত্রি আমাদের নিদ্রাকালেই যে উহা বিলুপ্ত হয়, তাহা নহে, পরন্তু জাগ্রতাবস্থাতেও অসংখ্য ঘটনার উপর উহার অস্তিত্ব নির্ভর করে।

একটা আঘাত, একটু অসুস্থতা, কয়েক পাত্র সুরা, একটু আফিম, একটু ধোঁয়াই যথেষ্ট। এমন কি, যখন কোন পদার্থের দ্বারা উহার পরিবর্ত্তনও ঘটে নাই, তখনও উহা সচেতন থাকে না। অমুক অমুক ঘটনা ঘটিয়াছে ইহা জানিবার জন্য, অনেক সময় একটা প্রবল চেষ্টার দ্বারা, আমাদের সেই চেতন-বিন্দুটিকে আবার ধরিতে পারি,—আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসি। একটু চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হইলেই, আমাদের পাশ দিয়া একটা সুখ চলিয়া যায়, আমাদিগকে একটুও স্পর্শ করে না, সেই সুখ আমরা আদৌ অনুভব করি না। আমরা এই মনে করিয়া আশ্বস্ত হই যে, কোন আঘাতের পর, কোন ধাক্কার পর, কোন চিত্তবিক্ষেপের পর, আবার আমরা ঐ চেতন-কেন্দ্রটিকে নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইব, কিন্তু পক্ষান্তরে, আপনাকে এতই দুর্ব্বল বলিয়া আমরা অনুভব করি যে, আমাদের মনে হয় যে, মৃত্যুর ভীষণ আঘাতে ঐ চেতন বিন্দুটি হয় ত চিরকালের মত অন্তর্হিত হইবে।

ক্রমশঃ।—

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# আলোচনা।

## ১। সন্ধ্যাকর নন্দী।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অন্যতম প্রবর্ত্তয়িতা বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গত চৈত্র মাসের "সাহিত্যে" "রামচরিত"-প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতি সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের ন্যায় পক্ককেশ বহুদর্শী ব্যক্তির সহিত বিচার করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির শোভা পায় না, তবে ঘটনাক্রমে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজ সম্বন্ধে দুই একটি কথা জানিতে পারিয়া তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" প্রকাশকালে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি, আই, ই, মহাশয় উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন "The author belonged to a very respectable family of Varendra Brahmans, who derived their name from their residence in the Varendra country, i. e. North Bengal, the scene of the struggles of Ramapala, for empire. The residential village from which Sandhyakara's family derived their cognomen is Nanda, perhaps a contraction of Nandana. The family is still well known." ( Memoirs A. S. B. Introduction, page 1. ) মৈত্রেয় মহাশয় বলিতেছেন, "সন্ধ্যাকর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইলে বহুগৌরবান্বিত ব্রাহ্মণসমাজও গৌরব লাভ করিত। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় বহুদর্শী প্রবীণ পণ্ডিতের দীর্ঘকালের গবেষণা

প্রসূত হইলেও, এই সিদ্ধান্ত বরেন্দ্রের অধিবাসিগণের নিকট সংশয়শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে না।"

"আত্মপরিচয়জ্ঞাপক প্রথম শ্লোকে সন্ধ্যাকর একবার "বৃহদ্বটু" শব্দের প্রয়োগ করায়, তাহাই হয় ত শাস্ত্রী মহাশয়কে ব্রাহ্মণত্ব-প্রতিপাদনে প্রণোদিত করিয়া থাকিবে। কিন্তু "বৃহদ্বটু" শব্দের সহিত 'নন্দিকুলে'র সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না; নন্দিকুলের 'কুলস্থানে'রই 'সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার মাহাত্ম্য-ঘোষণার্থ কবি বলিয়াছেন, তাহা পুণ্যভূমি, তাহাকে 'বৃহদ্বটু' বলিত। সন্ধ্যাকরের বংশ যে কখনও কোনও 'গ্রাম' হইতে 'কুলোপাধি' গ্রহণ করিয়াছিল, গ্রন্থমধ্যে সেরূপ প্রমাণ উল্লিখিত নাই। 'নন্দিরত্নসন্তানে' বরং ইহাই অনুমিত হইতে পারিত যে,—সন্ধ্যাকরের কুলোপাধির মূল ভৌগোলিক নহে, ব্যক্তিগত। সন্ধ্যাকর 'নন্দ' নামক কোনও 'গ্রামের' উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং তাহা 'নন্দন' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ কি না, সে চিন্তা আদৌ উদিত হইতে পারে না। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের 'নন্দনাবাসী গ্রামীন' ভট্ট দিবাকরের পুত্র কল্লূক ভট্ট বিশ্ববিখ্যাত। তাঁহারও কুলস্থানের নাম 'নন্দন' নহে; 'নন্দনাবাসী'। তাহাকে বারেন্দ্রভূমির লোকে 'নন্দনাবাসী' ই বলিত, ইদানীং সংক্ষিপ্তাকারে 'নান্সী' বলে,—'নন্দন' বা 'নন্দ' বা 'নন্দী' বলে না। 'নন্দিকুল' নামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে কোনও কুল নাই; পক্ষান্তরে, 'নন্দিকুল' বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের একটা সম্ভ্রান্ত কুল; তাহা অদ্যাপি সুপরিচিত। এই সকল কারণে সন্ধ্যাকর নন্দীকে কায়স্থ বলিয়া স্থির করাই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত।" ( সাহিত্য, ২৩শ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, পৃঃ ৯৪৫—৪৬ )।

শাস্ত্রী মহাশয় অবশ্য "নন্দী" ও "নন্দনাবাসী" এক মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, এবং তিনি বোধ হয় এখনও অবগত নহেন যে, "নন্দনাবাসী" এখন "নান্সী"তে পরিণত হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, মৈত্রেয় মহাশয় মুখ্য কুলীনবংশসম্ভূত, তিনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বারেন্দ্রসমাজে শাণ্ডিল্য-গোত্রে "নন্দনাবাসী" যেমন একটা গাঁই, তেমনই ভরদ্বাজগোত্রে "নন্দিগ্রামী" আর একটি গাঁই আছে। এই সংবাদটি আমি অবগত ছিলাম না, অতি অল্পদিন পূর্ব্বে এক বন্ধুর গৃহে মহিমচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থে বিষয়টি দেখিয়াছিলাম।

নন্দীগ্রামী গোগ্রামী চ নীপটী চ সমুদ্রকঃ।

—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, পৃঃ ৯১।

সুতরাং সন্ধ্যাকর নন্দী ব্রাহ্মণ হইলেও হইতে পারেন। "করণ" শব্দে মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে কায়স্থ বুঝায়, কিন্তু "কায়স্থ" শব্দে তখন লেখক বুঝাইত কি জাতি বুঝাইত, তাহা অদ্যাপি স্থির নির্ণয় হয় নাই। "করণানামগ্রণীঃ" বলিতে সাধারণতঃ রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে প্রধান বুঝায়। মৈত্রেয় মহাশয়ের ন্যায় বহুদর্শী পণ্ডিতের সহিত তর্ক করা আমার ন্যায় অজ্ঞের পক্ষে অসম্ভব; আমার নিবেদন এইমাত্র যে "রামচরিত"-প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দী ব্রাহ্মণ হইলেও হইতে পারেন। তিনি যে নিশ্চয়ই কায়স্থ ছিলেন, তাহা বলা উচিত নহে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

## ২। কৈফিয়ৎ।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন সাহিত্য-সম্পাদকের পক্ষে আমার "কৈফিয়ৎ তলব" করা অনিবার্য্য। "অতি অল্পদিন পূর্ব্বে" তিনি "এক বন্ধুর গৃহে মহিমচন্দ্র মজুমদার * প্রণীত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থে দেখিয়াছেন,—"বারেন্দ্র-সমাজে শাণ্ডিল্য গোত্রে নন্দনাবাসী যেমন একটা গাঁই, তেমনই ভরদ্বাজ-গোত্রে নন্দিগ্রামী আর একটি গাঁই আছে।" এই তথ্যাবিষ্কারের উপর নির্ভর করিয়া রাখালবাবু লিখিয়াছেন,—"সন্ধ্যাকর নন্দী ব্রাহ্মণ হইলেও হইতে পারেন।" কথাটা এমন সাজাইয়া গুছাইয়া রহিয়া সহিয়া বলা হইয়াছে, যেন তাঁহার এই সিদ্ধান্তই চরম সিদ্ধান্ত।

আমার কৈফিয়ৎ অতি যৎসামান্য। সন্ধ্যাকর যে ভাবে আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমার কৈফিয়ৎ। তাহা আবার উদ্ধৃত করিতে হইল। † তাহাতে "নন্দী গ্রামের" প্রসঙ্গ নাই। তাহাতে কুল-পরিচয় দিবার সময়ে "নন্দিকুল" এবং কুলোপাধির পরিচয় দিবার সময়ে "নন্দী" আছে। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজে এইরূপ কুল এবং কুলোপাধি নাই, আছে বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজে। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজে "নন্দীগ্রামী" নামক গাঞী আছে বলিয়া, "নন্দীকুল" এবং "নন্দী" উপাধিও আছে, এতখানি অনুমান করিবার উপায় নাই। সন্ধ্যাকর "নন্দীগ্রামে"র উল্লেখ করিলেও না হয় একটা তর্ক উত্থাপিত হইতে পারিত। তিনি তাহা করেন নাই। বরং "নন্দিরত্নসন্তানে"র এবং "নন্দিকুলে" এবং "নন্দী" উপাধির উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। তাহার সহিত "নন্দিগ্রামী"কে" খাপ্ খাওয়াইতে না পারায়, এখন দেখিতেছি, সেই অপরাধে, আমার "পক্ককেশের কথাও উঠিয়াছে।

সত্যনির্ণয়ই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই ঐতিহাসিক বিচারে, তর্কের জন্য তর্ক, শোভা পায় না। কুল এবং গাঞী যে এক নয়, একই কুলে যে একাধিক গাঞী থাকিতে পারে ও আছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া, "নন্দিগ্রামী" দেখিবামাত্র "পাইয়াছি—

---

* "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-রচয়িতা পরলোকগত। তাঁহার নাম মহিমচন্দ্র নয়, মহিমা-চন্দ্র। গ্রন্থেও সেই নামই ছাপা আছে। তাঁহার এবং তাঁহার গ্রন্থের সহিত পরিচয় ছিল; "সাহিত্যের" পুরাতন "ফাইলে" তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণও আছে।

† বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূর্ব্বৃহদ্বটুঃ ;
তত্র বিদিতে বিস্তোতিনি নন্দিরত্ন-সন্তানে।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীব নিধি র্গুণৌঘস্য॥
তস্য তনয়ো মতনয়ঃ করণানামগ্রণী রনর্ঘগুণঃ।
সান্ধি শ্রীপদাসম্ভাবিতাভিধানতঃ প্রজাপতি র্জাতঃ॥
নন্দিকুল-কুমুদ-কানন-পূর্ণেন্দু র্নন্দনোঽভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকর নন্দী পিশুনাস্কন্দী সদানন্দী॥

পাইয়াছি” বলিয়া, তাহাকেই নন্দিকুলের প্রমাণরূপে খাড়া করিয়া তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইলে “কুম্ভকর্ণে ভকারোঽস্তি” যে শ্রেণীর তর্কপ্রণালী, সেই শ্রেণীর তর্কপ্রণালীর প্রশ্রয় দান করিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থে ও প্রবন্ধে তাহার ছড়াছড়ি হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত, এবং অনেকের শিক্ষক হইয়াছেন। তাঁহার নিকট আমরা অন্যরূপ বিচারপ্রণালীর আশা করি।

রাখালবাবু অবলীলাক্রমে লিখিয়াছেন,—“করণানামগ্রণীঃ” বলিতে সাধারণতঃ রাজ-কর্ম্মচারিগণের মধ্যে প্রধান বুঝায়।” কেন বুঝায়, তাহা বুঝাইয়া দেন নাই। সন্ধ্যাকরের কাব্যেই “করণা”-শব্দ দেখিয়াছি;—আর কোনও গ্রন্থে দেখি নাই। রাখালবাবু যেরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে “অসার্থ” লিখিয়াছেন, তাহাতে স্বতই মনে হইতে পারে, তিনি যেন এরূপ প্রয়োগ অনেক স্থলেই দেখিয়াছেন। দুটি একটি দেখাইয়া দিলে প্রীত হইতাম।

আমি দুইটি কথা বিশেষভাবে লিখিয়াছি। (১) সন্ধ্যাকর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, শাস্ত্রী-মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত বরেন্দ্রের অধিবাসিগণের নিকট সংশয়শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে না। (২) “সন্ধ্যাকর নন্দীকে কায়স্থ বলিয়া ঠিক করাই সহজ, এবং যুক্তিসঙ্গত।” আমার কথা দুইটির অনুকূলে যাহা বলিবার ছিল, বলিয়াছি। সিদ্ধান্ত যদি ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, আমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিব। আমার মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে শাস্ত্রী-মহাশয়ের সঙ্গে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তিনি জীবিত আছেন, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রধান পরিচালকের আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন। আমার ভুল হইয়া থাকিলে, তিনি নিজেই তাহার সংশোধন করিয়া দিবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

## ৩। ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন।

গত পৌষ মাসে শ্রীহট্টজেলায় নিধনপুর গ্রামে কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মার যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান বৎসরের আষাঢ় মাসের দুইখানি বাঙ্গালা মাসিকপত্রে তাহার উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, ঢাকা বিভাগের স্কুল-ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত এচ্ ই, ষ্টেপলটনের নিকট ফটোগ্রাফ পাইয়া “ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন” সম্পাদকের অনুরোধে উক্ত পত্রিকায় তাম্রশাসন সম্বন্ধে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ ও তৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ বর্ত্তমান বর্ষের আষাঢ় মাসের “বিজয়া” পত্রিকায় এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ ও তৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। তাম্রশাসনখানি চারি সপ্তাহ কাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট ছিল, এবং সেই সময়ে ইহার “পাঠোদ্ধার কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছে।” তাম্রশাসনখানির বর্ত্তমান মালিক কে, তাহা দুই প্রবন্ধের

কোনটিতেই স্পষ্ট কথিত নাই। মালিকের অনুমতি অনুসারে প্রবন্ধ দুইটি লিখিত হইয়াছিল কি না, তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে না। মালিকের অনুমতি ব্যতীত বা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও তাম্রশাসন সম্বন্ধে কোনও কথা প্রকাশিত হওয়া উচিত নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যদি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের Treasur Trove আইন অনুসারে প্রণীত নূতন নিয়মাবলীর মধ্যে ইহা পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে আসাম গবর্মেণ্ট ইহার মালিক, এবং আসাম গবর্মেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারিবর্গের অনুমতি ব্যতীত অপর কেহ ইহা প্রকাশ করিতে পারেন না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ও পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ আসাম গবর্মেণ্টের Civil List এর পৃষ্ঠায় উক্ত প্রদেশের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারিগণের নাম দেখিতে পাইবেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের সহিত কয়েকখানি চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে মুদ্রণের দোষে অক্ষরগুলি স্পষ্ট হয় নাই। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠের সহিত অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠ মিলাইয়া দেখিলাম যে, স্থানে স্থানে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু মূল তাম্রশাসন বা তাহার প্রতিলিপির অভাবে পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে কোনও কথা বলা অসম্ভব।

অধ্যাপক বসাক ও ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠ অবলম্বন করিয়া কামরূপ ও বঙ্গের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতেছি। তাম্রশাসনখানি অসম্পূর্ণ, ইহার তৃতীয় ফলকখানি হারাইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহাতে কোনও তারিখ নাই। ইহাতে কথিত আছে যে, ভাস্কর বর্ম্মা কর্ণসুবর্ণ বাসক হইতে তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, এবং ইহাতে তাঁহার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষের নাম আছে। ইহার শেষ শ্লোকে কথিত আছে যে, অগ্নিদাহে মূল তাম্রশাসন নষ্ট হইলে নূতন তাম্রশাসন লিখিত হইয়াছিল, এবং ইহা কূটশাসন অর্থাৎ কৃত্রিম নহে। নূতন তাম্রশাসনে ভগদত্তবংশীয় ভাস্কর বর্ম্মার নিম্নলিখিত বংশপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে :—

চক্রভৃৎ
|
নরক
|
ভগদত্ত
|
বজ্রদত্ত
⋮ (তিন সহস্র বৎসর পরে)
পুষ্যবর্ম্মা
|
সমুদ্রবর্ম্মা
(দত্তদেবী)
|
বলবর্ম্মা
(রত্নবতী)
|



আমিন।

চিত্রকর—উইলিয়ম্ ওণ্টনর।

Block and Printed by the Mohila Press, Calcutta.

কল্যাণ বর্ম্মা
( গন্ধর্ব্ববতী )
|
গণপতিবর্ম্মা
( যজ্ঞবতী )
|
মহেন্দ্রবর্ম্মা
( সুব্রতা )
|
নারায়ণবর্ম্মা
( দেববতী )
|
মহাভূতবর্ম্মা
( বিজ্ঞানবতী )
|
চন্দ্রমুখবর্ম্মা
( ভোগবতী )
|
স্থিতবর্ম্মা
( নয়নদেবী )
|
সুস্থিতবর্ম্মা ( নামান্তর মৃগাঙ্ক )
( শ্যামাদেবী )
|
সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মা — ভাস্করবর্ম্মা

অদ্যাবধি কামরূপরাজগণের যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সকল-গুলিতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা ভগদত্তের বংশজাত, কিন্তু নূতন তাম্রশাসনে যে কয় পুরুষের নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিই পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। নূতন তাম্রশাসনে যতগুলি নাম আছে, তাহার মধ্যে দুইটি মাত্র ইতিহাসে সুপরিচিত। গৌহাটীতে আবিষ্কৃত ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে এবং তেজপুর ও সুয়ালকুঁচিতে আবিষ্কৃত রত্নপালের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে ভগদত্তবংশীয় কামরূপরাজগণের আর এক শাখার নিম্ন-লিখিত বংশ-পরিচয় পাওয়া যায় :—

হরি
|
নরক
|
ভগদত্ত
|
বজ্রদত্ত
|
|
ব্রহ্মপাল
|
রত্নপাল
|
পুরন্দরপাল
|
ইন্দ্রপাল

তেজপুরে আবিষ্কৃত বনমালের তাম্রশাসন ও নওগাঁয়ে আবিষ্কৃত বলবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে ভগদত্তবংশীয় কামরূপ রাজগণের তৃতীয় শাখার নিম্নলিখিত বংশ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে :—

হরি<br>
|<br>
নরক<br>
|<br>
ভগদত্ত<br>
|<br>
বজ্রদত্ত<br>
|<br>
প্রলম্ভ<br>
|<br>
হর্জ্জর<br>
|<br>
বনমাল<br>
|<br>
জয়মাল<br>
|<br>
বীরবাহু<br>
|<br>
বলবর্ম্মা

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী ধর্ম্মপালদেব নামক এক জন নূতন কামরূপ-রাজের একখানি নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বংশ-পরিচয় তিনটি ভগদত্ত বংশের একই শাখার কি ভিন্ন ভিন্ন তিনটি শাখার, তাহা স্থির করিবার কোনও উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই।

কর্ণসুবর্ণ শ্রীযুত বেভারিজ সাহেবের মতে মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটী গ্রাম। চীন-দেশীয় পরিব্রাজক হিওয়েন থসং বা য়ুয়ন চুয়াং কর্ণসুবর্ণকে বঙ্গদেশের চারিটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম বলিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কর্ণসুবর্ণ সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক তাঁহার ইংরেজী প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "আমরা গঞ্জামে আবিষ্কৃত কলিঙ্গরাজ মাধববর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে, শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণের রাজা ছিলেন।" We know from the Ganjam copper plate inscription of the Kalinga King Madhava Varman ( Gupta era 300, i. e. 619 A. D.) that the ruler of Karnasuvarna was Sasanka."—Dacca Review, June, 1913 P. 5. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ বসাকের ন্যায় দেশবিখ্যাত বহুদর্শী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কিরূপে এ কথা বলিলেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। গঞ্জামে আবিষ্কৃত মাধববর্ম্মার তাম্রশাসনে কর্ণসুবর্ণের নাম পর্য্যন্ত নাই।

ভাস্কর বর্ম্মার পিতা সুস্থিত বর্ম্মা ভারতের ইতিহাসে একেবারে অপরিচিত নহেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক বা পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ কেহই সুস্থিতবর্ম্মার পূর্ব্বপরিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। মগধরাজ আদিত্যসেনের

পিতামহ মহাসেন গুপ্ত সুস্থিতবর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। সে সুস্থিতবর্ম্মা যে ভাস্কর বর্ম্মার পিতা সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মহাসেনগুপ্তের পুত্র মাধবগুপ্ত সুস্থিতবর্ম্মার পুত্র ভাস্কর বর্ম্মার ন্যায় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। ইহাই প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আপসড্ শিলালিপির যে শ্লোকে মহাসেনগুপ্তের সহিত সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরের শ্লোকেই কথিত আছে যে, মহাসেনগুপ্তের যশ লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র তটে গীত হইত :—

শ্রীমহাসেনগুপ্তোঽভূৎ তস্মাদ্বীরাগ্রণীঃ সুতঃ।
সর্ব্বধীরসমাজেষু লেভে যো ধুরি বীরতাং॥
শ্রীমৎসুস্থিতবর্ম্মযুদ্ধবিজয়শ্লাঘাপদাঙ্কং
মুহুর্যাস্যাদ্যাপি বিবুদ্ধ কুন্দ কমুদশুভ্রাচ্ছ হার্ তং
লৌহিত্যস্য তটেষু শীতলতলেষুৎফুল্লনাগদ্রুমচ্ছায়া
সুপ্ত বিবুদ্ধ সিদ্ধমিথুনৈঃ স্ফীতং যশোগীয়তে॥

—Fleet's Gupta Inscription, p. 203.

• কর্ণসুবর্ণ বাসকের উল্লেখ দেখিয়া অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মনে করিয়াছেন যে, তাম্রশাসন দ্বারা প্রদত্ত গ্রামখানি কর্ণসুবর্ণ প্রদেশে অবস্থিত ছিল। যে স্থান হইতে তাম্রশাসন প্রদান করা হইয়াছে, প্রদত্ত ভূমিও যে সেই স্থানের নিকটে অবস্থিত হইবে, তাহার কোনই কারণ নাই। গাহড়বাল বংশীয় গোবিন্দচন্দ্র দেব মুদ্গগিরিসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহা মগধ বিষয়ে অবস্থিত ছিল না। হর্ষচরিতে ও যুয়ান্ চুয়াংয়ের বিবরণে ভাস্কর বর্ম্মার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নূতন তাম্রশাসন হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম স্থির হইল মাত্র। ভাস্কর বর্ম্মা বোধ হয় হর্ষবর্দ্ধনের সাহায্যার্থ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য হর্ষবর্দ্ধন গৌড়াধিপ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, ভাস্কর বর্ম্মা বোধ হয় তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কামরূপ রাজগণের সহিত মগধ ও বঙ্গের গুপ্তরাজগণের পুরুষানুক্রমে বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। মহাসেনগুপ্তের সহিত সুস্থিত বর্ম্মার ও শশাঙ্কের সহিত ভাস্কর বর্ম্মার বিবাদের ইঙ্গিত দেখিয়া ইহাই মনে হয়: শশাঙ্কের অপর নাম বোধ হয় নরেন্দ্রগুপ্ত। সম্ভবতঃ তিনি মগধের গুপ্ত-রাজবংশজাত, এবং মহাসেনগুপ্তের নিকট আত্মীয় ছিলেন।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

# মৃত্যু তোরে মাগে।

১

ওহে দেব! কেন পুনঃ শান্তি ল'বে কেড়ে?
কেন পূজা পুনরায় আঁধার মন্দিরে?
আবার দেখালে কা'রে? হের, প্রভু, হের—
স্ফটিক ললাট তার, রক্ত ওষ্ঠাধর;
অপরূপ রূপরাশি, কি দিব তুলনা;
হে সুন্দরী! তুমি শুধু তোমারই উপমা!
কেশে বেশে বক্ষোদেশে পুষ্পের আঘ্রাণ,
কণ্ঠে তব মহাবাণী—মহা প্রাণ-গান!
বেণু বীণা ফেলে দিয়ে তুলেছ দুন্দুভি,
ঝঞ্ঝাবায়ু বহি' আনে তোমার সুরভি।

নিদাঘ-সন্ধ্যায় আজ ক্ষণে ফিরে চাও,
আমায় কেড়েছ যদি, আরও কেড়ে নাও;
তুমি বা হাসিলে শুধু আধেক অধরে—
ঐ হাসিটুকু আলো আমার আঁধারে!

২

হায় নিদ্রা, হায় শান্তি, হায় রে জীবন!
হা আমার মূঢ়, মূক, মলিন যৌবন!
আবার উঠিল ঝড়—আঁধার করিয়া,
সকল বন্ধন বাধা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া;
একবার খুঁজেছিলি আলো আলেয়ার—
এবার কোথায় যাবি হৃদি রে আমার!
রে পথিক প্রাণ! কার মুগ্ধ করি গান
নিশির ডাকের মত ডাকে তোর নাম।
উঠিলি আসন ছাড়ি' ফেলিয়া সাধনা—
বক্ষে আঁকড়িয়া ধরি' অসীম বেদনা।

তারে যদি দিবি পূজা, চল্, তবে চল্,
ছিঁড়ে লয়ে হৃদয়ের রক্ত জবাদল।
ওরে মূর্খ, নহে প্রিয়া,—মৃত্যু তোরে মাগে,
বংশী সম—মধু-কণ্ঠে—মধু অনুরাগে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়।

# উলা বা বীরনগর।

কাগজে ছাপাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—

প্রশ্ন—"এতকাল পরে আবার উলার কথা কেন ?"

উত্তর—"ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি !"

সে কালের সমাজের রীতি নীতি ও সে কালের ভদ্রলোকদিগের ধরণ ধারণের কথা উলা উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছি।

উলার পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর,
আর হালিসহরের—তেঁদড়া।

উলা পাগলের জন্য প্রসিদ্ধ।

পোল পাগল পুলো,
তিন নিয়ে উলো।

উলার বামনদাস বাবু অতি প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ক্রিয়াবান্ ও নিষ্ঠাবান্, এবং বিলক্ষণ গম্ভীর প্রকৃতির। বাড়ীতে বৃত্তিভোগী এক জন কবিরাজ মহাশয় থাকিতেন। মুখ হাত ধুয়ে বামনদাস বাবু বাহিরে বসিলে, এবং তিনি বলিলে, কবিরাজ মহাশয় হাত দেখিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতেন। এক দিন হাত দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এমন কিছু নহে, তবে যৎকিঞ্চিৎ বায়ুর প্রকোপ বটে।" বামনদাস বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ওটুকু ত গ্রামের, আমার কি বলুন।" সুতরাং গ্রামের দুর্নাম গ্রামের লোকই স্বীকার করিতেন।

এক জন পাগলের কথা বলি ;—গ্রামের প্রসন্ন বাঁড়ুয্যে কুলীনসন্তান, একটু দুষ্টবুদ্ধিও বটে, একটু ভালমানুষও বটে, পেসা পাগলা, এই উপাধি পাইয়াই পাগল বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার একটা অনুমান-খণ্ডের কথা বলি। প্রসন্ন বাঁড়ুয্যে বলিয়াছিল, "যখন রাণাঘাটের শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী বাবুর পাগল হাতীটার মাথা গরম হইয়াছে, তখন আমাদের বামনদাস বাবু আর রক্ষা পান না।" একবার প্রসন্ন গোরুর গাড়ীতে চড়িয়া শান্তিপুর যাইতেছিল। তখন প্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল শান্তিপুরের ডেপুটী। তিনিও সেই পথে পাল্‌কী করিয়া আসিতেছিলেন ; গোযানে শয়ান প্রসন্নকে দেখিয়া বলিলেন, "কি রে! পাগল, বামুন হয়ে গোরুর গাড়ীতে চড়েছিস্ যে ?" প্রসন্ন উত্তর করিল, "বলি—খাওয়ার চেয়ে চড়া ভাল নয় কি ?"

এই প্রসন্নর একটু গান-শক্তি ছিল, সেই জন্য লোক আরও চিনিত।

উলার সেই সময়ের আর এক জন প্রসিদ্ধ লোক শ্রীমোহন মুখুয্যে। তাঁকে সকলেই 'ছিরে খ্যাপা' বলিত। তিনি এক জন হরবোলা ও ভাঁড়। এখন যেমন কলিকাতায় গোপাল সিং ও গোস্বামী, তখন মফস্বলে ঐ রকম অনেক লোক ছিল। তাহারা নানাপ্রকার পশু পক্ষীর বুলি বলিতে পারিত, এবং কবি, কীর্ত্তন, জজের বিচার প্রভৃতি হাস্যকর পদার্থ অবিকল নকল করিত। শ্রীমোহন হাতীর ডাক পর্য্যন্ত উত্তম ডাকিতে পারিতেন, সেই জন্য তাঁহার নাম ছিল "হাতী পঞ্চানন"। রাণাঘাটে এক জন ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল "বলদ পঞ্চানন"। নিজে বেশ স্থূলকায় ও লম্বা চৌড়া শরীর; তার উপর হাতী ডাকিতে পারিতেন বলিয়া, উলার দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারী পূজার মহিষ-বলিদানের সময়, হাড়ীকাট-সংলগ্ন মহিষের উপর দাঁড়াইয়া ঘোর গম্ভীর চীৎকারে বৃংহিত ধ্বনি করিতেন। মহিষ বেচারা একে হাড়িকাষ্ঠে আড়ষ্টবদ্ধ, তাহার পর পৃষ্ঠে হস্তী চড়িয়াছে মনে করিয়া, একেবারে নিশ্চল হইত। তখন সহজেই তাহার মুণ্ডচ্ছেদ হইত।

শ্রীমোহন একবার দিনাজপুরের রাজবাটীতে ভাঁড়ামী করিতে যান। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই রাজা রাজড়ার বাটীতে তাঁহার গতিবিধি ও বাৎসরিক বৃত্তি ছিল। দিনাজপুরে অনেক ভাল ভাল হিন্দুস্থানী ভাঁড় উপস্থিত ছিল। তাহারা এ বিষয়ে খুব দক্ষ লোক। অনুকরণ-নাট্যে বিশেষ পটু। সেবারে মহারাজ পর্য্যন্ত শ্রীমোহনের কৌতুক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শুনিলেন, দেখিলেন। তাহাতে হিন্দুস্থানী ভাঁড়েরা মনে মনে একটু চটিল। শ্রীমোহনের সুদীর্ঘ পালা শেষ হইলে পর, শ্রীমোহন মজলিসের এক পার্শ্বে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্থানী ভাঁড়েদের এক জন সহিস্‌বেশে মজলিসের রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিল। হাতে এক গাছি মোটা দড়ী, যেন ঘোড়া পালাইয়াছে, খুঁজিতেছে—"মেরি ঘোড়ী কাঁহা গয়ী রে, মেরি ঘোড়া কাঁহা গয়ী রে!" বলিয়া শ্রীমোহনের কাছে গিয়া, "এহি মেরি ঘোড়ী" বলিয়া শ্রীমোহনের কাঁধে হাত দিল। শ্রীমোহন ঘোড়ার মত চতুষ্পদ হইয়া সেই নকল সহিসের বক্ষে এক উল্টা চাট্‌ মারিলেন। সে বিষম আঘাতে দশ হাত তফাতে ধরাশায়ী হইল। মহা গোল হইতে লাগিল, মহারাজ মিটাইয়া দিলেন।

শ্রীমোহন আপনিই কবির চোতা ধরিতেন, (অর্থাৎ Promter হইতেন) গান গায়িতেন, ঢোলে কখন কেবল সাথ করিতেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে ঢুক্কা বাজাইতেন, আবার হঠাৎ মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দৌড়িয়া এক কোণে গিয়া বাহবা দিতেন। শ্রীমোহন একলাই এক শ। রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ নীলকমল পাল চৌধুরীর কৃষ্ণনগরের জজের কাছে বিচার শ্রীমোহন অভিনয় করিতেন—অবশ্য একাই জজ এবং আসামী ইত্যাদি। সকলে নীলকমল বাবুকে বলিয়া দিয়াছে, "আপনি ত কোনও পাপে নাই, আপনি জজের সকল কথায় সায় দিবেন, আপনার ভয় কি ?" জজ অতি বিকট স্বরে রূক্ষ ভাবে বলিলেন, "নীলকমল পাল চৌধুরী, তৌম বড়া বদ্মায়েস্ হ্যায়।" নীলকমল বাবু কাঁপিতে কাঁপিতে অতি-ভগ্নকণ্ঠে বলিতেছেন, "হাঁ হুজুর, হাঁ, হাম্ বড় বদ্মায়েস্ হ্যায়।" আসামী খাম্কা স্বীকার করে, জজ্ সাহেবের ইচ্ছা নহে; তিনি কাজেই একটু নরম হইয়া বলিলেন—"টৌম্ বড়া সাচা!" নীলকমল পূর্ব্ববৎ কাঁপিতে কাঁপিতে ভগ্নকণ্ঠে হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "হাঁ হুজুর্! হাম্ বড়া সাচা।" জজ্ নীলকমল বাবুকে নামাইয়া দিয়া মোকদ্দমার সাক্ষী ডাকিতে বলিলেন।

শ্রীমোহন পশু পক্ষীর স্বর উত্তম অনুকরণ করিতে পারিতেন; ভাল ছায়াবাজী দেখাইতেন। রাত্রিকালে কেবলমাত্র হস্তের সাহায্যে অল্প-ভিজা চাদরের উপর, কত পশু পক্ষী নর নারীর অবয়ব দেখাইতেন। এখন সায়েন্স-বলে আমরা বলীয়ান হইয়া বায়োস্কোপ দেখি—দেখ দেখি, কত উন্নতি ও কিরূপ উন্নতি!

সেই সময়কার উলার আর এক জন 'কেষ্ট বিষ্ণু'—রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য বা "মুনকে রঘুনাথ"। এমন প্রসিদ্ধি ছিল যে, তিনি 'জলে স্থলে' সর্ব্ব-প্রকারে এক মণ জিনিস আহার করিতে পারিতেন। তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, দরিদ্র নহেন, কেবল আহার করিবার পারিতোষিক রূপে তাঁহার নানা স্থানে বৃত্তি ছিল, তবু একবার দেনার দায়ে তাঁর কয়েদ হয়। দুই তিন দিন জেলে অনাহারে আছেন। /০এক আনা খোরাকীতে তাঁর কি হইবে! তৃতীয় দিনে জেলর বিচারপতিকে জানাইল—রঘুনাথকে তলব হইয়া জিজ্ঞাসায় রঘুনাথ বলিলেন, এক আনা পয়সায় তাঁহার খোরাকী হইতে পারে না।" জজ বলিলেন, "কত হইলে হয়?" রঘুনাথ বলিলেন,

"অন্ততঃ এক টাকা চাই।" ডিক্রীদারের নিকট হইতে তাই দেওয়ান হইল। রঘুনাথ রক্ষীদের সঙ্গে গিয়া নিজে বাজার করিয়া আনিলেন— /৫ সের চাউল, /২ সের দাইল, একটা /৫ সের রুই মাছ—ইত্যাদি। স্বহস্তে রন্ধন করিলেন, রুয়ের মুড়াটা আস্তই রাখিয়াছেন, চিরিয়া দেন নাই। আহারের সময় জজ সাহেব দূরে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন। পঞ্চগণ্ডূষ করার পর দাইল দিয়া ২।৪ থাবা ভাত খাইয়া ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া, /৫ সের রুয়ের মুড়িতে কামড় দিয়া কড়মড় করিয়া মুড়ি ভাঙ্গিতে লাগিলেন! জজ সাহেব সেই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া বলিলেন, "হামকো মৎ খাও বেটা, ডোসরা মুদ্দই হাজির, উস্‌কো খাও।" বলিয়া বগী হাঁকাইয়া কাছারীতে চলিয়া গিয়া বাদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে প্রত্যহ ১৲ করিয়া খোরাকী দিতে পারিবে কি না? সে পারিবে না বলাতে আসামীকে খালাস দিলেন। মুক্ত হইয়া রঘুনাথ উলায় চলিয়া আসিলেন।

এরূপ কত গল্প প্রচলিত ছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজ রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন, "ভট্টাচার্য্য! ঐ কাঁটালটি সেবা করুন।" ভট্টাচার্য্য রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, সমস্ত কাঁটাল খোসা ভূতুড়ি সমেত উদরস্থ করিলেন। অদ্ভুত আহারের জন্য বর্দ্ধমান হইতে তিনি বিশেষ বৃত্তি পান।

আমি যখন রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়াছি, তখন তিনি প্রৌঢ়বয়স্ক। বয়স যাইটের কাছাকাছি। তখন ঐ সকল গল্প, গল্পের মতই শোনা যাইত। তখন তিনি সাধারণ জনগণ হইতে কিছু বেশী খাইতেন মাত্র। আমাদের চুঁচুড়ার বাড়ীতে একবার আহার করেন। পিতৃদেব আহার দেখিয়া বলিলেন, "কৈ, আপনার আহারের যে এত গল্প শুনিয়াছি, তার ত কিছুই দেখিলাম না।" উত্তরে ভট্টাচার্য্য বলেন, "গঙ্গাচরণ বাবু, আমি যে অন্ন লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা যদি রয়ে বসে খেতাম, ত বোধ হয়, ৫০ বৎসর জীবিত থাকিতাম—তখন তা ত বুঝি নাই, এখন একটু বুঝিয়াছি, তাই আর বাড়াবাড়ি করি না।"

রঘুনাথের সে সময়ে ভূষণ ভট্টাচার্য্য বলিয়া একটি পালয়ান পুত্র ছিলেন, আরও পুত্র কন্যা ছিল। ভূষণ বীরপুরুষ, তাই তার কথা বলিয়াছি।

তখন দেশে ব্যায়ামচর্চ্চা ছিল। এখনকার মত ব্যায়াম নহে। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে ঠিক দুপুর রৌদ্রে যুবকেরা ব্যায়াম করিত। ব্যায়াম ফুরাইল—অমনি ট্রামে উঠিয়া বৌবাজারে চলিয়া গেল ব্যায়াম করে, অথচ এক পোয়া পথ চলিতে পারে না, তখন এমন বিড়ম্বনা ছিল না। তখন যাহারা ব্যায়াম করিত, তাহারা দুই দশ ক্রোশ চলিতে গাড়ী পাল্কী ভাড়া দিত না। উলাতেও বেশ ব্যায়ামচর্চ্চা ছিল। ভূষণ ভট্টাচার্য্য এক জন পালয়ান ছিলেন। পালয়ানীর পরীক্ষা হইত জন্মোৎসবের সকাল বেলা, আমাদের কাছারীর বাড়ীর সম্মুখের মাঠে।—মাঠের পূর্ব্বে আমাদের ভাড়াটিয়া দোতালা বাড়ী, সেইখানে আমাদের বাড়ীর মেয়েরা দেখিতেন। উত্তরে মাঠে কাছারীর আটচালা, সেইখানে ভদ্রলোকেরা বসিতেন; পশ্চিম দিকে সদর রাস্তা, এবং তাহার পশ্চিমে অনেকটা খোলা জমী, এই রাস্তায় ও জমীতে লোকে লোকারণ্য। দক্ষিণ দিকে শিবের ভাঙ্গা মন্দির ও মন্দিরের আচ্ছাদনস্বরূপ সুবৃহৎ নিম্ববৃক্ষ, সেই গাছের উপর পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা।

পালয়ানেরা জাঙ্গিয়া আঁটিয়া, এবং সঙ্গের ছেলের দল, গায়ে কাদা মাখিয়া

জয় নন্দলালকি!

বলিয়া, মহা গান করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। কতকটা জল ঢালিয়া দেওয়া হইল, ছেলেরা নাচিতে ও লাফাইতে লাগিল। তাহার পর লাঠীখেলা হইল। শেষে কুস্তি।

তখনও ভূষণ প্রভৃতি লম্বা কোঁচা কাপড় পরিয়া দণ্ডায়মান। পিতৃদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এইবার ভূষণ এসো হে।" ভূষণের প্রতিদ্বন্দ্বী বীর বকো মাল। ভূষণ জাঙ্গিয়া পরিয়া, বাহুতে মাটী লাগাইয়া মল্লবেশে উপস্থিত। বকোও সেইরূপ বেশে অন্য দিক দিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিল। সেলাম, কুর্নিস, বাউকসাকসি, বাহ্বাস্ফোট, উরুস্ফোট, কত কি হইতে লাগিল; তাহার পর মাটীতে পড়িয়া কস্তাকস্তি, কেহই অপরকে চীৎ করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না। একবার আমার মনে পড়ে, ভূষণ ভট্টাচার্য্য বকো মালের মাথায় এমন ঢু মারিল যে, মাথা ঝাঁ করিয়া উঠিল, বকো বসিয়া পড়িল, মাথায় গামোছা বাঁধিল; একটু ম্রিয়মাণ হইল, আমিও হইলাম। খেলা সেবারে ভাঙ্গিয়া গেল—আমি ম্রিয়মাণই

রহিলাম। কতক্ষণ পরে খবর আসিল, বকো বাজারে গিয়া মদ খাই-তেছে। সকলে হাসিতে লাগিল, আমি কিন্তু ম্রিয়মাণই রহিলাম।

এই সকল মাল, ভাঁড়, খাইয়ে, বা পাগলের কথা বলিলাম বলিয়া এমন কেহ মনে করিবেন না যে, উলায় সম্ভ্রান্ত বা পণ্ডিত লোকের অসদ্ভাব ছিল। উলার বামনদাস বাবু বা শম্ভুনাথ বাবু বড়মানুষ বলিয়া যে 'অবুতবু গিরিস্থতো' গোছ অকর্ম্মণ্য ছিলেন, তাহা নহে। বিশেষ কর্ম্মঠ এবং চৌকোশ লোক ছিলেন। বৃহৎ পরিবার, ছোট ছোট ছেলে মেয়েই ছিল বিশ ত্রিশটি। বামনদাস স্নানের পূর্ব্বে ইহাদের প্রত্যেকটিকেই একবার কোলে লইতেন, নাম ধরিয়া সোহাগ করিতেন, সম্পর্ক ধরিয়া বিদ্রূপ করিতেন। এখনকার কালে কয় জন বড়লোকে তা পারেন? শম্ভুনাথ যাত্রা মহোৎ-সবাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, সেই বৃহৎ গুম্ফজোড়া খাড়া হইয়া উঠিত। শান্তি-পুরে একবার পাল্কী করিয়া শম্ভুনাথ বাবু যান; সেখানকার এক জন দুষ্ট মেয়ে বলিয়াছিল, "দিদি, দেখে যা, পাল্কীর মধ্যে একজোড়া গোঁপ যাইতেছে।" শান্তিপুরের মেয়েরা এবং উলার পুরুষেরা বড় রসিক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

উলার এক জন রসিক পুরুষের পরিচয় দিতেছি। মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এক জন সভাসদ্ ছিলেন। সকল রূপ বিদ্রূপ চলিতে পারে বলিয়া, মহারাজ মুক্তিরামের সহিত 'বেহাই' সম্বন্ধ পাতাইয়াছিলেন। সর্ব্বদাই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেন। উলায় বহুতর কুলীনের বাস, এই জন্য নানা বিদ্রূপ চলিত। হরুঠাকুরের কবির দলে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাতেই ঠাকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী দল গায়িয়াছিল,

"এরা সব কুলীনের, সব কুলীনের ছেলে.
এদের গাল দিব কি বলে?"

এরূপ কথা কুলীনদের বিরুদ্ধে সে সময়ে সর্ব্বদাই চলিত। মহারাজও করিতেন। একদিন কৃষ্ণচন্দ্র একটি গালি স্থির করিয়া, মুক্তিরাম সভায় প্রবেশ করিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ হে! বেহাই, তোমাদের উলায় নাকি বৌ বিক্রয় হয়?" মুক্তিরাম অমনই হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, নিয়ে যাওয়া মাত্রই।" সকলেই হাসিয়া উঠিল, মহারাজ নীরব।

একদিন মুক্তিরাম মুখুয্যে ভাল মাগুর মাছ পাইয়া মহারাজকে পাঠাইয়া দেন। মহারাজ সামান্য জিনিসও আহ্লাদ করিয়া লইতেন। মহারাজ মাগুর মাছ পাইয়া বড় সন্তুষ্ট, ততোধিক সন্তুষ্ট একটি গালি দিবার পন্থা বাহির করিয়া।

এখন মাগুরের শেষের র বাদ দিলেই মাগু হয়, স্ত্রীকে বুঝায়। তাই মুখুয্যে আসিবামাত্রই মহারাজ বলিলেন, "ওহে বেহাই, ও বেলা কি পাঠাইয়াছিলে, আমি তাহার অন্ত পাই নাই।" মুক্তিরাম বুঝিলেন, ব্যাপার কি! বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের পাগলের দেওয়া জিনিস, উহার আদি অন্ত দুই-ই ছিল না।" রাজা মুখের মত হওয়াতে বলিলেন, "বটে বটে।" 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—এই সকল হাসি মস্করার এই পর্য্যন্ত থাকাই ভাল।

বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে উলা বিশেষ দ্রব্যসম্ভার দিয়াছে, এবং বিশেষ ছাপ পাইয়াছে। সেই দুর্গাপ্রসাদ হইতে এই চন্দ্রশেখর বসু পর্য্যন্ত সকলেই উলার অঙ্কনন্দন। যদি বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন দশ জন লেখকের নাম করিতে হয়, তবে গঙ্গভক্তিতরঙ্গিণী-কার দুর্গাপ্রসাদের নাম তাঁহাদের মধ্যে দিতেই হইবে। গ্রন্থখানি নিরেট, অচ্ছিদ্র, ভাবে ভোরপুর, রসে ডগমগ; ইহার ভাষা সরস, সরল, প্রাঞ্জল, ভক্তিরসে পূর্ণ, ভক্তিতরঙ্গিণীতে তরঙ্গিণী। এমন গ্রন্থ আজি কালি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু একবার ছাপাইয়াছিলেন; সে সংস্করণও বোধ হয় ফুরাইয়াছে। আবার মুদ্রিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

আমরা বালককালে, ৮।১০ বৎসর বয়সে উলায় ছিলাম। তখন হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় গ্রন্থ লিখিতেছেন, আর তাহার পর পাঁচ যুগ—ষাটি বৎসর গিয়াছে, এখনও তাঁহার লেখনীর বিরাম নাই। তাঁহার প্রথম পুস্তক "বাখরগঞ্জের বিবরণ" পিতৃদেবকে পড়িয়া শুনাইতেন, আমার বেশ মনে আছে। বাখরগঞ্জের লোকেরা, 'ধনভাই বলে না, বলে, দনবাই'—এই সকল কথা তখন একমনে শুনিয়াছিলাম। তাহার পর কত বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র হইতে সংকলন করিয়া চন্দ্রশেখর বাবু সাহিত্য-ভাণ্ডারে উপঢৌকন দিলেন, সে সকলই আমাদের শিক্ষা সুকর করিবার আয়োজন। তাঁহাকে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি, উলাও ধন্য হইয়াছে।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

# বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

অনেক দিন আগেকার কথা বলিতেছি। তখন সিপাহী-বিদ্রোহ সবে শেষ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সে সময় নাগোয়ার মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট। এখন আর নাগোয়ায় মহকুমা নাই—কাঁথিতে উঠিয়া আসিয়াছে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন নাগোয়ার হাকিম, তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ তখন তমলুকের হাকিম। উভয় স্থানের মধ্যে বিশ ক্রোশ ব্যবধান। পাল্কীতে বা পদব্রজে এ পথ এক দিবসেই সচরাচর লোকে অতিক্রম করিয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে একদা অতি প্রত্যূষে শিবিকারোহণে তমলুক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তমলুকে আসিতে হইলে একটা নদী পার হইতে হয়। নদীর নাম হল্‌দি। ইহা সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। ইহাকে ক্ষুদ্র নদী বলিতে সাহস হয় না,—বিশেষ আজিকার এই প্লাবনের দিনে। তবে ইহা নির্ভয়ে বলিতে পারি, কলিকাতার সম্মুখস্থ গঙ্গার চেয়ে হল্‌দি অনেক ছোট। যে ঘাটে খেয়া নৌকায় হল্‌দি পার হইতে হয়, সে ঘাটের নাম নরঘাট, অথবা নরের ঘাট। গ্রামের নামও তাই। কেন এমন নাম হইল, তাহার কোনও ইতিহাস দেখিতে পাই না।

যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র যখন নরঘাটে আসিয়া পঁহুছিলেন, তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। তীরে খেয়া নৌকাখানি বাঁধা আছে, কিন্তু মাঝি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ত রাগিয়া অস্থির। মাঝির অনুসন্ধানে চাপরাশী ছুটিল। ঘাটের উপরে একখানি কুঁড়ে ঘর ছিল, তাহাতেই মাঝি ঝড় বৃষ্টি বা রৌদ্রের সময় আশ্রয় লইত। সে ঘরে মাঝি নাই। তখন মাঝির বাড়ী কোথায়, তাহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। পাল্কী দেখিয়া গ্রামের দুই চারি জন নিষ্কর্ম্মা লোক আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন মাঝির বাড়ী দেখাইয়া দিতে অনেক পীড়াপীড়ির পর স্বীকৃত হইল। চাপরাশী মহাবেগে তাহার সহিত ধাবিত হইল। কিন্তু তাহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না; মধ্য পথেই মাঝির সহিত সাক্ষাৎ। মাঝির পরিচয় পাইয়াই চাপরাশী তাহাকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং যাহাতে শিক্ষাটা সহজে অঙ্গ হইতে মুছিয়া না যায়, তাহারও

ব্যবস্থা করিল। মাঝি কাঁপিতে কাঁপিতে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত। হাকিম দুই চারি ধমক্ দেওয়াতে মাঝি কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হুজুর! আমার ছোট মেয়েটির ওলাউঠা হয়েছে; বদ্যিতে জবাব দিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্তম্ভিত। তাঁহার ক্রোধ মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল। তিনি মাঝিকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার কুটীরের দিকে ধাবিত হইলেন, এবং তাহার কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিদিগকে ডাকাইলেন। গ্রামে যে দুই এক জন চিকিৎসক ছিল, তাহারাও আসিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছোট মেয়েটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মাঝির হাতে দুই একটা টাকা দিলেন। চিকিৎসক প্রভৃতিকে তিনি বলিয়া গেলেন, "আমি ফিরিবার সময় সংবাদ লইব, তোমরা রোগীর কিরূপ যত্ন লইয়াছ।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সহসা এতটা দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল কেন, ঠিক বলিতে পারি না। ইংরাজিতে যাহাকে revulsion of feelings বলে, বঙ্কিমচন্দ্রের সেটা প্রায়ই হইত। তবে ক্রোধের মাত্রা যদি ধৈবত নিখাদে উঠিত, সেটা সহসা নামিয়া সহজ স্বর বা রেখাবে মুহূর্ত্তকালমধ্যে নামিত না। এ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ অনুতাপ হইয়া থাকিবে। অনুতাপের বিশেষ কোনও কারণ দেখা যায় না। তবে এক এক জন এমন কোমলহৃদয় আছেন যে, তাঁহারা অপরাধ না করিয়াও আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাহিরে একটা গর্ব্ব, একটা ক্রোধের আবরণ ছিল; কিন্তু ভিতরটা বড় প্রেমময়। যে তাঁহাকে ভাল করিয়া না বুঝিয়াছে, সে তাঁহাকে ক্রোধী, গর্ব্বিত মনে করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন তমলুকে পঁহুছিলেন, তখন অপরাহ্ন। জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট আরও দুই চারি জন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট অপরিচিত। তন্মধ্যে এক জনকে দেখাইয়া পূজ্যপাদ শ্যামাচরণ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বঙ্কিম, বলিতে পার, এই ভদ্রলোকটি কে?"

বঙ্কিমচন্দ্র ভদ্রলোকটির পানে একবার একটু তীক্ষ্ণনয়নে চাহিলেন, ক্ষণকাল কি ভাবিলেন; তার পর উত্তর করিলেন, "বাবু জগদীশনাথ রায়।"

সত্যই ইনি বাবু জগদীশনাথ রায়। ইনি তখন তমলুকে সহকারী পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-রূপে অবস্থান করিতেছিলেন

একটু চমৎকৃত হইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিলেন; এবং আজীবন তাহা হস্তমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

# সহযোগী সাহিত্য।

## সাহিত্য ও সমাজ।

ফরাসী সাহিত্যসেবী মসিয়ে ফাগ্যে (M. Faguet) বালজাকের সমালোচনা শেষ করিয়া সাহিত্যের সহিত সমাজের কি সম্বন্ধ, ইহারই আলোচনা করিয়া একটী সুদীর্ঘ সন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। সন্দর্ভটি এতই সুন্দর হইয়াছে যে, উহা একই সময়ে ফ্রান্সে, জর্ম্ম-নীতে, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সন্দর্ভগত সিদ্ধান্ত সকল লইয়া বেশ একটু আলোচনাও হইতেছে; এমন কি, লণ্ডনে যে সভ্যজগতের চিকিৎসগকগণের মহা-সভা বসিয়াছিল, সেখানেও এ কথা উঠিয়াছিল। এই সন্দর্ভের সারাংশ ভাষান্তরিত করিয়া বাঙ্গালী পাঠকগণকে উপঢৌকন দিতেছি।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইঙ্গরসোলের (Ingersoll) সহিত রেভারেণ্ড ওয়ার্ড বীচরের (Rev. Ward Beecher) বাইবেলের ধর্ম্ম-মত লইয়া বিষম বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। ইঙ্গরসোল নাস্তিক (Agnostic) মতবাদ সমর্থন করিয়া বাইবেলের—খৃষ্টান ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত সকল খণ্ডন করিয়াছিলেন। পাদ্রী বীচার খৃষ্টানদিগের পক্ষ সমর্থন করেন। বিতণ্ডাটা আমেরিকার যুক্তরাজ্যে হয়, এবং সেই সময়ে এই বিচার লইয়া সভ্য-জগতে খুব একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। বাদ-বিবাদের মধ্যে পাদ্রী বীচর একটা বড় সিদ্ধান্তের কথা বলেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক ভাষার ও সাহিত্যের একটা ধর্ম্ম আছে। খ্রীষ্টান ইউরোপের সকল সভ্য দেশের ভাষার ধর্ম্ম খ্রীষ্টানী, তবে প্রত্যেক দেশের ও জাতির বিশিষ্টতার সহিত সে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অনেকটা পরিবর্ত্তিত ও আকারান্তরিত হইয়াছে। ইংরেজি ভাষার ও সাহিত্যের প্রত্যেক স্তরে খ্রীষ্টান ধর্ম্মমত পরিব্যাপ্ত রহি-য়াছে। বিশেষতঃ আধুনিক ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমতের দ্বারা যেন স্নিগ্ধ হইয়া আছে। তুমি ইঙ্গরসোল, যে ইংরেজি ভাষার সাহায্যে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের খণ্ডন করিতেছ, সেই ইংরেজি ভাষায় খ্রীষ্টানী মত ওতঃ-প্রোতঃ ভাবে বিরাজ করিতেছে। অতএব তোমার বিতণ্ডা ব্যর্থ হইতেছে।

যে সময়ে পাদ্রী বীচর এই কথা বলেন, সেই সময়ে সভ্য ইউরোপ খণ্ডে ডারবিন-তত্ত্ব (Darwinism) লইয়া বিষম আন্দোলন চলিতেছিল। তখন ইউরোপ প্রতিবেশ-প্রভাব (Theory of Environments) এবং অবস্থার আনুগত্য (Natural selection) এই দুইটা সিদ্ধান্ত ধরিয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিল। ফলে, পাদ্রী বীচরের কথা ... জর্ম্মানীর বড় পণ্ডিতে বিজ্ঞানের

ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া আছে যে, যে জাতির যে ধর্ম্ম, সেই জাতির ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতা সেই ধর্ম্মের অনুকূল হইবেই। এমন কি, ভাষার প্রত্যেক শব্দ, রচনা-ভঙ্গী, অলঙ্কার-সমাবেশ ও রসের বিকাশ, সেই ধর্ম্মের ধ্বনি করিয়া থাকে। ইংরেজি ভাষার প্রত্যেক শব্দটিতে খৃষ্টানী মাখান আছে। ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যেক গ্রন্থে খৃষ্টান মত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সাহিত্যকে ধর্ম্ম হইতে চ্যুত করা যায় না। যে কালের যে সাহিত্য, সেই কালের সমাজ-ধর্ম্ম ও সাধন-ধর্ম্ম সেই সাহিত্যে জড়ান মাখান থাকিবেই। সাহিত্য জাতিবিশেষের এক একটা যুগের ইতিহাস, ধর্ম্মমতের আলেখ্য-স্বরূপ। যিনি যে জাতির যে যুগের সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিবেন, তাঁহাকে সেই জাতির সেই যুগের ধর্ম্ম-মতের দ্বারা আচ্ছন্ন হইতেই হইবে।

মসিয়ে ফাজী এই ভাবে সাহিত্যগত ধর্ম্মের বিশ্লেষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতে এমীল জোলার যুগ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ কালের ফরাসী জাতির সাহিত্যের কোন ধর্ম্ম? ফরাসী-বিপ্লবের পূর্ব্বে রোমান কাথলিক খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রভাব ফরাসী সমাজে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। তাই ফরাসী-বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ফরাসী সাহিত্য বিলাসের সাহিত্য ছিল। সে সাহিত্য সমাজ-মত-দ্যোতক ছিল না; সে সাহিত্যের প্রভাব ফরাসী সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই। তাহার পর বিপ্লবের সূচক যে সাহিত্যসৃষ্টি ফরাসী দেশে হইয়াছিল, তাহা খৃষ্টান সাহিত্য নহে। ভল্‌টেয়ার, রুসো, ডিডেরো প্রভৃতি মনীষী লেখকগণকে কোনও ক্রমে খৃষ্টান বলা যায় না। বরং তাঁহাদের লেখার প্রভাবে খৃষ্টান ধর্ম্মের খণ্ডন হইয়াছিল; খৃষ্টান সমাজের উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছিল। তথাপি কিন্তু বলিতে হয় যে, যে ফরাসী সাহিত্য প্রায় পাঁচ শত বৎসরের খৃষ্টান সভ্যতার ফল, সহস্র বৎসরকালের খৃষ্টান ধর্ম্মমত-সাধনের পরিণতির স্বরূপ, সে ফরাসী ভাষার মজ্জাগত খৃষ্টান-ভাব ভল্‌টেয়ার রুসোর লেখাতেও একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। এক-দিনে ভাষার সৃষ্টি হয় না; যুগযুগান্তরের চেষ্টায় একটা ভাষা পূর্ণাঙ্গ হইয়া ফুটিয়া বাহির হয়; যুগযুগান্তরের মতবাদ, ভাব, ধ্যান, ধারণা ভাষার স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে; সে সকল স্তর-বিন্যস্ত ভাবরাশিকে একটা বিপ্লবের ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ফরাসী-বিপ্লব ধ্বংসের বিপ্লব হইলেও, ভল্‌টেয়ার রুসোর মতন অমানুষপ্রতিভাশালী ধ্বংসাবতার অবতীর্ণ হইলেও, ফরাসী সাহিত্যকে উহার ধর্ম্মের বেদী হইতে তাঁহারা কেহই নামাইতে পারেন নাই। তাই নেপোলিয়ন সম্রাট পদবী পাইলে আবার রোমান কাথলিক খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই নেপোলিয়নের অধঃ-পতনের পর ফরাসী রাষ্ট্রপতিগণ রোমান কাথলিক ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। বিপ্লবের এই প্রতিক্রিয়ার ফলে বালজাক, ভিক্টর হিউগো, এমীল জোলার উদ্ভব হইয়া-ছিল। একটা বড় দাঁড়া আর্শীর উপরে কোন দুষ্ট ছেলে একটা ঢেলা ছুড়িয়া মারিলে মুকুরটি ফাটিয়া শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়, অথচ ফ্রেমের বন্ধনীর প্রভাবে কাচখণ্ডগুলি করিয়া পড়ে না—সেই ভগ্ন মুকুরের সম্মুখে দাঁড়াইলে কিম্ভূতকিমাকার প্রতিচ্ছবি দেখিতে

গিয়াছিল। সেই ভগ্ন জাতীয় মুকুরে ফরাসী সমাজের যে প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বালজাক্ তাহারই আলেখ্য অপূর্ব্ব ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। সে আলেখ্যে ধর্ম্ম আছে, অধর্ম্ম আছে, পাপ আছে, পুণ্য আছে—উৎকট উদ্ভট সবই আছে। কিন্তু সে সকলই জাতির অতীত গৌরবের অতীত ইতিহাসের ফ্রেমে আঁটা—ফরাসী ভাষার ও সাহিত্যের বন্ধনী-সংলগ্ন। বালজাক্ পরম্পরার কথা বিস্মৃত হন নাই। বালজাক্ অতীতকে বর্ত্তমানের সম্পর্ক-শূন্য করিয়া দেখান নাই। বালজাক্‌ই বলিয়াছেন,—To look back is to look beyond পশ্চাতে দেখিলেই সম্মুখে দেখিতে হইবে—যে অতীতের চিন্তা করে, তাহাকে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতেই হইবে। বালজাক্ অতীতের আলেখ্য লিখিয়াছেন, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করিতে ভুলেন নাই। অতএব বালজাক্ ধর্ম্মহীন নহেন। তিনি যে ফরাসী!

বালজাক্ বলিয়াছেন,—যেমন সূত্রের সাহায্যে মালা গাঁথা যায়, তেমনই ভাষার সাহায্যে যুগ-যুগের সাহিত্যকে গাঁথিয়া রাখা যায়। ভাষা সূত্র, সাহিত্য ফুল, এ সূত্র ছিন্ন হয় না, এ ফুল শুকায় না। তিনিই বলিয়াছিলেন যে, ফরাসী-বিপ্লব ফরাসী জাতির পারম্পর্য্যের ছেদ নহে—গতির বিরাম নহে; মালায় জোট্ ধরিয়াছিল, সেই জোট খুলিবার চেষ্টামাত্র। তিনিই বলিয়া গিয়াছেন,—'বিস্মৃতি! আরে ছিঃ ছিঃ! বিস্মৃতি ত জারজের আশ্রয়। আমি বাপের বেটা, জাতিতে ফরাসী, আমি বিস্মৃতির আশ্রয় লইব কেন? যখন ফরাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন ভুলিতে ত আসি নাই, ভুলিবও না, বরং অহরহঃ জাহাজী গোরাদের মতন অতীতকে তামাকের গুঁড়ির হিসাবে কেবল চিবাইব; বালক যেমন চকোলেট চাটে, তেমনই করিয়া অতীত স্মৃতিকে চাটিব—ধীরে ধীরে, রসাইয়া মজাইয়া লেহন করিব। কেবলই কি দর্পদম্ভের, শ্লাঘাস্পর্দ্ধার বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে হয়? লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষোভ, সঙ্কোচের বিষয় লইয়া নাড়া-চাড়া করিলে ক্ষতি কি? ঢাকিলেই পাপ, লুকাইলেই শয়তান দেখা দেয়, যেখানে প্রচ্ছন্নতা, সেইখানেই শয়তানের রাজ্য বিস্তৃত রহিয়াছে। আমি ভুলিব কেন?' যে কবি এমন কথা কহিতে পারেন, তিনি ত সমাজ-ধর্ম্ম-হীন নহেন। তিনি ভাষার ধর্ম্ম নষ্ট করেন নাই, তিনি জাতির ধাতু ভুলেন নাই।

এমীল জোলা বালজাকের এই উপদেশটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। জোলাও সমাজকে আবরণহীন করিয়া দেখাইয়াছিলেন। উলঙ্গতার লাম্পট্যে বিভোর হইয়া তিনি এমন কর্ম্ম করেন নাই। সমাজকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া জানিয়া, সভ্যতার আবরণে সে সমাজের সর্ব্বাঙ্গে কেমন ভাবে শয়তান অধিকার বিস্তার করিয়াছে, তাহাই সকলকে বুঝাইবার জন্য জোলা ভদ্রতার ও শিষ্টাচারের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়াছিলেন। জোলা ভাষার ধর্ম্মের এবং সাহিত্যের ধর্ম্মের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। ইউরোপ দেখিয়াছে যে, বাস্তবতার বিকটতার মধ্যেও ধর্ম্ম আছে। সে ধর্ম্ম crystalised French manhood পাষাণীকৃত ফরাসী মানবতা। সে পাষাণীকরণে অতীতের ইতিহাস স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রহিয়াছে; সহস্র বৎসরের ফরাসী সভ্যতা "দারুভূতো মুরারির" ন্যায় হইয়া

আছে। তাই জোলা বলিয়াছেন,—মানুষের লেখা আর বিধাতার লিপি একই, দুইটার কোনটাই মুছিয়া ফেলা যায় না। বংশের পর বংশ আসিয়াছে, বংশে-বংশে যুগে যুগে কত লেখাই লিখিয়া গিয়াছে, বংশানুক্রমের প্রভাবে সে লেখা অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় যেন গাঁথিয়া জাঁতিয়া বসিয়া আছে। সে প্রকৃতির লেখা মুছা যায় না। জোলা তাই প্রকৃতির—সংস্কারের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার লজ্জা নাই, ক্ষোভ নাই, কেন না, তিনি যেন শয়তানকে আলোর মাঝারে টানিয়া আনিতে চাহিয়াছেন। কাজেই বলিতে হয় যে, এমীল জোলা ধর্ম্মের অপহ্নব ঘটান নাই, ভাষা ও সাহিত্যের ধর্ম্মপারম্পর্য্য বিস্মৃত হন নাই।

ভিকটর হিউগোর পক্ষে এতটা কৈফিয়ৎ প্রয়োজন হইবে না। ভিকটর হিউগো ইউরোপের পুরাণকার। তিনি নভেল বা উপন্যাস লেখেন নাই, অর্থবাদের হিসাবে সমাজের উপাখ্যান রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাস গ্রন্থ সকল কেবল চিত্তবিনোদনের জন্য লিখিত নহে, প্রধানতঃ ভাবোন্মেষের জন্য লিখিত। সে ভাবোন্মেষে অতীতের সহিত পরম্পরা-রাহিত্য ঘটায় না, সে ভাবোন্মেষ পাঠককে আত্মহারা করিয়া দেয় না,—অতীতকে মুছিয়া ফেলিয়া বর্ত্তমানে প্রমত্ত করিয়া রাখে না। হিউগো সমাজের সকল স্তরের বর্ণনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, হিউগো ইতরতা ও হীনতা, পশুত্ব ও পিশাচত্ব অঙ্কিত করিতে লজ্জিত হন নাই; হিউগো দারিদ্র্যের বিকটতা দেখাইয়াছেন, ঐশ্বর্য্যের পৈশাচ ভাবও দেখাইয়াছেন। কিন্তু পুরাণকারের মতন, অর্থবাদের হিসাবে ইতিহাসের সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এমন লেখকের হস্তে ধর্ম্ম ও মানবতা শতদল পদ্মের মতন ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিউগো সমাজের ভাল মুকুরে ছবি দেখান নাই, দর্শকের দর্শন-সৌকর্য্যার্থ হিউগোকে কখনই করস্থিত মুকুরের আকার-পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। হিউগো বলিতেছেন—'দেখ সোজা-খাড়া হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে দেখ! এ দিকেও দেখ, ঐ দিকেও দেখ। সব দেখিয়া নিজের দিকে দেখ। যদি আমার আলেখ্য-পরম্পরায় তোমার মতন কাহাকেও চিনিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে আমার কথা শুন। নহিলে তোমার লাভ চিত্তবিনোদন, আমার লাভ ফিরিওয়ালার ছবি দেখানর সুখ।' ইহা ধর্ম্মযাজকের কথা—পুরাণনার ঋষির কথা। ইউরোপের সাহিত্যে ইতঃপূর্ব্বে এমন কথা আর কেহ বলে নাই।

মসিয়ে ফাজি(M. Faguet) এই ভাবে তিন জন যুগপ্রবর্ত্তক ফরাসী লেখকের বিশ্লেষণ করিয়া শেষে তিনটি সিদ্ধান্তের কথা কহিয়াছেন :—

(১) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির মেদমজ্জার সহিত জড়িত ;—তাহা জাতির সকল স্তরে সঞ্চারিত,—উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্য্যন্ত সকল লোকেই পরিব্যাপ্ত।

(২) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির অতীত পারম্পর্য্যের সহিত সংবদ্ধ—মালাগ্রথিত পুষ্প শ্রেণীতুলা।

(৩) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির সমাজধর্ম্মবর্জ্জিত হইতে পারে না ; তাহা

তিনি ইহাও বলেন যে, ধর্ম্মবিপ্লব না ঘটিলে ভাষার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না। এমন কি, ধর্ম্মবিপ্লব সত্ত্বেও এক একটি শব্দে, ভাষার এক একটি বচন ভঙ্গীতে অতীত যুগের বিস্মৃত অনেক ইতিহাস-কথা প্রচ্ছন্ন থাকে। খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রায় দেড় হাজার বৎসর ইউরোপে প্রবল থাকিলেও, এখনও ইউরোপের সকল সভ্যপ্রদেশের ভাষায় গ্রীস ও রোমের কঙ্কাল খুঁজিলেই পাওয়া যায়। পারম্পর্য্যের চিহ্ন একেবারে মুছিয়া ফেলিবার নহে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ভাষা কেবল সাহিত্যের উপদান নহে, উহার সর্ব্বাঙ্গ জাতির পদচিহ্নে অঙ্কিত। ভাষা সমাজের অভিব্যঞ্জনা; এই অভিব্যক্তি বিহঙ্গ-কলরবের ন্যায় ব্যোমপথে মিশাইয়া যায় না, সাহিত্যের মর্ম্মর-গাত্রে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত থাকে। ভাষা সাহিত্যের সৃষ্টি করে, আবার সাহিত্যের আশ্রয়ে ভাষা আত্মরক্ষা করে। মানুষের ভাষা আছে, সে ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, সে সাহিত্য সনাতন হইয়া থাকে। তাই মানুষ—মানুষ, নিভাঁজ পশু নহে। পশুর স্মৃতি নাই, স্মৃতির অক্ষয় মঞ্জুষা নাই; তাই পশুর উন্নতি নাই, স্থিতি নাই, বিকাশ নাই। মানুষের স্মৃতি আছে স্মৃতি-রক্ষার অক্ষয় মঞ্জুষা সাহিত্য আছে; তাই মানুষ নরদেবতা হইয়াছে, পরে আবার হইতেও পারিবে। সাহিত্যের সৃষ্টি ধর্ম্মের উপাদানে হইয়া থাকে। সে ধর্ম্ম প্রথম স্তরে, বিভীষিকার উপাসনা, সৌন্দর্য্যের আরাধনামাত্র। ইহার পর স্তরে স্তরে মানুষ যেমন উন্নীত হয়, তদনুসারে মানুষের সাহিত্যও আকারান্তরিত হয়। এই অসংখ্যান্তরবিন্যস্ত সাহিত্য বিশ্বমানবতার ইতিহাস—দেবত্বের উন্মেষকাহিনী। এই সাহিত্যে যিনি একটা নূতন স্তর বসাইয়া গিয়াছেন, জাতির বিশিষ্টতার চীনা-প্রাচীরে যিনি দুই চারিখানা ইষ্টক গাঁথিয়া গিয়াছেন, তিনি সাহিত্য-গত-ধর্ম্মহীন হইতে পারেন না।

---

# নষ্ট-রত্ন।

রাণী সুব্রতা স্থির করিয়াছিলেন, কোনও পবিত্র বংশের সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যার সহিত তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিবেন। অনেক অনুসন্ধানের পর কোনও দরিদ্রের গৃহে তাঁহার মনের মত এক পাত্রী জুটিল। পাত্রীর নাম গৌরী। গৌরী সদ্বংশজাতা,—রূপে গুণে ঠিক গৌরীরই মত। শুভদিনে রাজপুত্রের সহিত গৌরীর মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরদিবস বধূ ঘরে আসিল। রাণী সুব্রতা একছড়া বহুমূল্য মুক্তার মালা দিয়া পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বিবাহ-রাত্রির পররাত্রি—'কালরাত্রি'। প্রচলিত প্রথা অনুসারে সে রাত্রে রাজপুত্র স্বতন্ত্র কক্ষে শয়ন করিলেন। রাণী সুব্রতা পুত্রবধূর হাত ধরিয়া আপন শয়ন-কক্ষে আসিলেন। পার্শ্বে বধূকে সযত্নে শয়ন করাইয়া রাণী কহিতে লাগিলেন,—"মা, তুমি আজ যে মুক্তার মালা

কণ্ঠে ধারণ করিয়াছ, তাহার ইতিহাস তোমাকে এখন বলিব। একটু মনোযোগপূর্ব্বক শুনিও, এবং মনে রাখিও, বংশ পরম্পরায় সকলকে প্রত্যেকের পুত্রবধূকে এই ইতিহাস শুনাইয়া যাইতে হইবে।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার শ্বশ্রূমাতা এই মালা দিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন,—শুনিয়াছি। আমাদের বংশের প্রথম রাজার সময় হইতে এই মালা ছড়াটি নববধূর আশীর্ব্বাদীস্বরূপ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে এই মালার মাঝখানের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উজ্জ্বল মুক্তাটির স্থান একেবারে শূন্য ছিল। কেন শূন্য ছিল, তাহা তখন জানিতাম না। আমার বিবাহের পরদিবস স্বতন্ত্র কক্ষে আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল। আমার পিত্রালয় হইতে যে দাসী আসিয়াছিল, একমাত্র সেই আমার নিকট রহিল। শয়নের পূর্ব্বে শ্বশ্রূমাতা কহিলেন, "বউ মা! যদি ভয় পাও, তা হ'লে আমার নিকট উঠিয়া আসিও।" তখন এ কথার অর্থ কিছুই বুঝি নাই; পরে বুঝিলাম, কেন তিনি আমাকে সতর্ক করিয়াছিলেন। আমি শৈশবাবধি বড় দুঃসাহসী ছিলাম, সুতরাং ভয়ের কথা মনে স্থান পাইল না। বিশেষতঃ, সেদিন পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন, সকলকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া মনটা এতই কাতর ছিল যে, অন্য কোনও চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। দাসীর অবিশ্রান্ত নাসিকাধ্বনি শুনিতে শুনিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, জানি না। ঘুমন্ত অবস্থায় মনে হইল, কে যেন আমার গলার মালা ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। চাহিয়া দেখিলাম, এক স্ত্রীমূর্ত্তি। মুখখানি চিন্তাক্লিষ্ট, শীর্ণ ও মলিন, নিবিষ্টদৃষ্টিতে আমার মুক্তার মালায় কি যেন অন্বেষণ করিতেছে। প্রথমে মনে করিলাম, কোনও পুরমহিলা সময় মত আসিতে পারে নাই—তাই আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিতে আসিয়াছে; সেই ছায়ামূর্ত্তি অগ্রসর হইয়া আমার শরীরে হস্তস্থাপন করিল, কিন্তু আমি কোনও স্পর্শ অনুভব করিলাম না! তখন বুঝিলাম, সে ছায়ামূর্ত্তি তখন শ্বশ্রূ মাতার কথা মনে পড়িল। ব্যাপার কি, জানিবার জন্য কেমন একটা কৌতূহল জন্মিল। কিছুমাত্র ভীত না হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি চান?"

আমার কথা শুনিয়া সেই শীর্ণ ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "এই মালায় যে মুক্তাটি হারাইয়াছিল, সেটি পাওয়া

কহিলাম, "এ মালা সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? আপনি কে?" রমণী-মূর্ত্তি তখন বিষণ্ণভাবে একটু হাসিয়া সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। কহিল, "এ মালা সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহাই বলিবার জন্য কত বৎসর ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছি; আজ পর্য্যন্ত যাহাকে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি, সেই ভয়ে পলাইয়াছে; তোমার মত কেহ কথা কহিতে সাহস পায় নাই। আজ তোমার কাছে এই মালার কাহিনী বলিয়া আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তাহা না হইলে আমার মুক্তি নাই। আমি রাণী নর্ম্মা, এই বংশের প্রথম রাজার স্ত্রী। আমিই এই মালা সর্ব্বপ্রথম পাই—সে আজ শতাধিক বৎসরের কথা। এই মালার মাঝখানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে মুক্তাটি ছিল, সেটি আমিই হারাইয়াছিলাম। কি কারণে কেমন করিয়া হারাইলাম, অদ্যাপি কেহ জানে না। তাই এ বংশে নববধূ এ মালা অঙ্গে ধারণ করিলেই আমাকে সে কাহিনী শুনাইতে আসিতে হয়। তোমাকে আজ-সেই কাহিনী শুনাইতে চাই। ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শুনিবে ত?"

আমি তখন উঠিয়া বসিলাম। রাণী নর্ম্মার জন্য করুণায় মন ভরিয়া গেল। কহিলাম, "মা! তুমি আমার পূজ্যা, প্রণাম গ্রহণ কর; আমি শপথ করিতেছি, তোমার কাহিনী অদ্যোপান্ত শুনিব, এবং বংশপরম্পরায় যাহাতে এ কাহিনী শুনিতে পায়, তাহার ব্যবস্থাও করিব। তোমার আর আসিবার প্রয়োজন হইবে না, তুমি মুক্তি লাভ কর।" তখন সেই বিষণ্ণ ছায়ামূর্ত্তি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কহিল, "কল্যাণী! তুমিই এই মালার শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে পারিবে, এই আমার আশীর্ব্বাদ রহিল। এখন আমার জীবনের কাহিনী শোন। বংশপরম্পরাক্রমে যে নববধূ এই মুক্তার মালা কণ্ঠে ধারণ করিবে, শুধু তাহারই এ কাহিনী শুনিবার অধিকার, যেন কর্ণান্তরে না যায়।"

রাণী নর্ম্মা কহিতে লাগিলেন,—আমাদের দেশস্থ রাজেন্দ্রনারায়ণ বহু কষ্টে অর্থসঞ্চয় করিয়া যখন প্রথম জমীদারী ক্রয় করেন, তখন আমার পিতাকে বাল্যবন্ধু বলিয়া এবং সচ্চরিত্র ও সত্যনিষ্ঠ জানিয়া তাঁহাকে তিনি প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। আমি তখন তিন বৎসরের শিশু। পরে মাতার নিকট শুনিয়াছি, জমীদার মহাশয় আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের সঙ্গে

ছিল নায়েব-পুত্র রমানাথ। আমার দশ বৎসর বয়সে সহসা জমীদার মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে সপ্তদশবর্ষীয় জমীদার-পুত্রের ভার আমার পিতা মাতার উপর ন্যস্ত হয়। আমাদিগকে তখন আপন গৃহত্যাগ করিয়া, জমীদার-বাটীতে বাস করিতে যাইতে হইল। সেই সূত্রে, একত্র বসবাসে জমীদার-পুত্রের সহিত আমাদিগের ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হয়। পিতা মাতা জমীদার-পুত্রকে যেরূপ সম্মান করিতেন, তেমনই স্নেহও করিতেন; আমার শিশু-হৃদয়ে তিনি চিরদিনই রূপে গুণে আদর্শ-স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়েও যে ক্রমে আমার প্রতি গভীর ভালবাসার সঞ্চার হইতেছিল, আমরা কেহই তাহা ভাবি নাই। আমার দ্বাদশ বৎসর বয়সে, তাঁহার খেলার সঙ্গিনীকে তিনি যখন জীবনের সঙ্গিনী করিয়া লইতে চাহিলেন, তখন পিতা মাতার আনন্দের সীমা রহিল না। আমি এত সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইব, তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। নায়েব-পুত্র রমানাথের সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব হইতেছিল। সমকক্ষ সমপদস্থ কোনও রাজকন্যার সহিত জমীদার-পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। বাস্তবিক আমার মত ভাগ্যবতী জগতে দুর্লভ। কিন্তু জন্মান্তরের দুষ্কৃতির ফলে যাহা ঘটিল, বলিতেছি, শোন।

আমার বিবাহের কয়েক বৎসর পরে, আমার স্বামী যে দিন রাজা উপাধি পাইলেন, সেই দিন ঐ মুক্তার মালাটি লইয়া আসিয়া স্বহস্তে আমার গলায় পরাইয়া দিয়া কহিলেন, "নর্ম্মা! তোমাকে জীবনের সঙ্গিনী পাইয়া যে সম্মান লাভ করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই নয়—তবু আজ লোকসমাজে তুচ্ছ সম্মান লাভ করিয়া তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ এই মুক্তার মালা তোমার জন্য আনিয়াছি। মাঝখানে যে উজ্জ্বল ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মুক্তাটি দেখিতেছ, ইহা অতি দুর্লভ, তোমারই মত শুভ্র ও পবিত্র। জহরী বলিয়াছে, 'বস্তুটি পবিত্রতার নিদর্শন, উহাকে অপবিত্রতা স্পর্শ করিতে পারে না।' এই বলিয়া আমাকে বক্ষে লইয়া বারংবার মুখচুম্বন করিলেন। আনন্দে আমার মন প্রাণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিলাম, তোমার মত স্বামী যাহার, তাহাকে কি অপবিত্রতা কখনও স্পর্শ করিতে পারে?

প্রবেশ করে, তাহা মানব-বুদ্ধির অতীত। স্বামীর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও কেমন করিয়া যে মন অপবিত্রতা আহরণ করিল, আজিও তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

আমাদিগের আশৈশবের খেলার সঙ্গী নায়েব-পুত্র রমানাথ, স্বামীর সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু; চিরকাল একত্র প্রতিপালিত হওয়ায় আমাদের গৃহে তাহার অবারিত গতিবিধি ছিল। স্বামী আমাকে রমণীর শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলিয়া জানিতেন। আমারও আত্মাভিমান ও আত্মসম্মানজ্ঞান খুবই প্রবল ছিল। সুতরাং রমানাথের সহিত আলাপে পরিচয়ে কাহারও মনে কোনও দিন দ্বিধামাত্র হয় নাই।

রমানাথ যে আমার বিবাহকাল পর্য্যন্ত আমারই আশায় বসিয়াছিল, এবং আমার বিবাহের পর হিংসাপরবশচিত্তে, স্বামীর সহিত সখ্যের ছলনা করিয়া, আমাদেরই সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিল, তাহার আভাসমাত্র কখনও বুঝিতে পারি নাই।

তাহার স্নেহে—শুধু আমরা কেন,—আমাদের শিশুপুত্র শচীন্দ্রও একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। শচীন্দ্র যেমন শয়নে স্বপনে "কাকা" দেখিত, রমানাথও তেমনই মুহূর্ত্তকাল শচীন্দ্রকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। এইরূপে সময়ে অসময়ে রমানাথ সতত অন্দর মহলে অবাধে যাতায়াত করিত। রমানাথ না হইলে কিছুই চলে না, সে না থাকিলে শচীন্দ্র ও তাহার জননীর কিছুই ভাল লাগে না। স্বামী তাহা লইয়া সময় সময় রঙ্গ রহস্য করিতেন, কিন্তু আমরা সকলেই জানিতাম, রমানাথ সর্ব্বত্যাগী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, সুতরাং সে সকল রহস্য কাহারও মনে স্থান পাইত না। তখন পর্য্যন্ত রমানাথকে স্নেহ করিতাম। পুত্র শচীন্দ্রের খাতিরে তাহার সেবা করিয়া আনন্দ পাইতাম। ক্রমে বুঝিলাম, আমার মনের ভাব যেমনই হউক, রমানাথের মন ঠিক নির্ব্বিকার ছিল না। সে সুযোগমত অনেক কথা আমাকে বলিত। আমিও অবোধের ন্যায় সে সকল কথা শুনিতে আপত্তি করিতাম না।

একদিন দ্বিপ্রহরে—কার্য্যোপলক্ষে স্বামী বহির্বাটীতে ছিলেন, পালঙ্কোপরি শচীন্দ্র নিদ্রিত, আমি একখানি আসন বুনিতে ব্যস্ত। রমানাথ নিঃশব্দে আসিয়া নিকটে উপবেশন করিল। অসময়ে, অকারণে আসিবার

লেন, "সত্য বল, সে মুক্তাটি কোথায় ?" আমি অনেক চেষ্টার পর শুষ্ক-কণ্ঠে কহিলাম, "হারাইয়া গিয়াছে।" স্বামী কহিলেন, "আমার বিশ্বাস, সেই সঙ্গে তোমার পবিত্রতাও হারাইয়াছ, তাহা না হইলে এ কথা বলিতে আমার নিকট দ্বিধা করিতে না ; আমার সকল গর্ব্ব, সকল আনন্দ, সকল সুখ ও শান্তি আমার সমস্ত জীবনের গৌরব তোমাতে নিহিত ছিল, তুমি সব নষ্ট করিয়াছ।" স্বামীকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া কহিলাম, "ওগো শোনো, কি করিয়া হারাই-লাম, সকল কথা খুলিয়া বলিলে তুমি বুঝিবে, আমি অবিশ্বাসিনী নই, তুমি নিশ্চয় ক্ষমা করিবে।" স্বামী পূর্ব্ববৎ কঠিন স্বরে কহিলেন, "আমি ক্ষমা করিতে পারি—করিব—কিন্তু প্রথম গোপন করিয়া যে অবিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছ, এখন তাহার ক্ষালন হইবে কিসে ? যত দিন মুক্তা পুন-রুদ্ধার করিতে না পার, ততদিন তুমি আমার ত্যজ্যা।"

স্বামী চলিয়া গেলেন। তাঁহার কথাগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া শতবৃশ্চিকের ন্যায় আমাকে দংশন করিতে লাগিল। তাঁহার অন্তরের গভীর বেদনা অনুভব করিয়া হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল। আমি বুঝিলাম, স্বামীর মনে আমার কি স্থান ছিল, তিনি আমাকে কি স্বর্গরাজ্যের অধিকারিণী করিয়া-ছিলেন! হায়! হতভাগিনী কিসের জন্য সব হারাইলাম। সেই দিন হইতে নানা স্থানে লোক পাঠাইলাম—যেখানে যত জহুরী ছিল, সকলের নিকট অনুসন্ধান করিলাম—দেশ বিদেশে কতই খুঁজিলাম, সেরূপ নিষ্ক-লঙ্ক শুভ্র মতি কেহ আনিয়া দিতে পারিল না। অদৃষ্টের এমনই বিড়-ম্বনা, কোনও মতি সে শূন্য স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল না। আশায় আশায় বহুদিন কাটিল। ভাবিলাম, জীবন পণ রাখিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বসিয়াছি, যদি দেবতা করুণা করেন, যদি সহসা মুক্তাটি খুঁজিয়া পাই—কিন্তু বুঝিলাম, আপনার কর্ম্মফল খণ্ডন করিবার অধিকার দেবতারও নাই। স্বামী আর আমাকে গ্রহণ করিলেন না ; তাঁহার প্রাসাদে,—প্রকাশ্যে তাঁহার সকল সম্পত্তির অধিকারিণী থাকিয়া, শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হইয়া—আমি নরকবাস করিতে লাগিলাম। দেবতার এই এক অনুগ্রহ দেখিলাম, অধিকদিন সে দুর্ব্বহ জীবন বহন করিতে হইল না। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বামীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলাম। স্বামী আসিলেন ; দেখিলাম, সে দেহকান্তি, সে জ্যোতিঃ, সে আনন্দোৎফুল্ল মুখ বিবর্ণ হইয়াছে। আমার

দিকে চাহিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় সজল হইল। আমি কাতরে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কহিলাম, "আশীর্ব্বাদ কর, জন্মজন্মান্তরে যেন তোমাকেই স্বামী পাই।" স্বামী অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "ক্ষমা তোমাকে বহুপূর্ব্বে করিয়াছি; তুমি ইহলোকেই প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়াছ—যে দিন প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে, সে দিন আবার আমাকে পাইবে, আমি তোমার অপেক্ষায় থাকিব। কিন্তু মুক্তা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট না হইলে তোমার মুক্তি নাই।"

বুঝিলাম, ত্যাগ করিলেও, আমার প্রতি যে গভীর ভালবাসা স্বামীর অন্তরে ছিল, তাহার এক কণাও লোপ পায় নাই। সেই গৌরব লইয়া মরিয়া ধন্য হইলাম, কিন্তু মৃত্যুর পর পারেও শান্তি পাইলাম না। বুঝিলাম আত্মপাপ নিজের মুখে প্রকাশ না করিলে প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে না। তাই যে দিনই এ বংশের নববধূ সেই মুক্তার মালা কণ্ঠে ধারণ করে, আমার আত্মকাহিনী শুনাইতে এবং সেই নষ্ট মুক্তাটির সন্ধান করিতে আসিতে হয়। তোমার নিকট সব স্বীকার করিলাম। এখন আশায় থাকিব, মুক্তা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে আবার স্বামী সহ মিলিত হইব। সেই মিলনের তৃষ্ণায় নিশিদিন অস্থির হইয়া ফিরিতেছি—না জানি আরও কতকাল এই ভাবে কাটিবে।"

আমি কহিলাম, "মা! তোমার আশীর্ব্বাদে যেমন করিয়া পারি, মুক্তা সংগ্রহ করিব—তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ পূর্ণ হইয়াছে, এখন স্বামী সহ মিলিত হইয়া ধন্য হও—এ বংশে তোমার কাহিনী ব্যর্থ না হইয়া কল্যাণের উৎসস্বরূপ হউক।" দেখিতে দেখিতে রাণী নর্ম্মার ছায়ামূর্ত্তি মিলাইয়া গেল—তাঁহার মুখের প্রসন্ন ভাব ও আনন্দের জ্যোতিটুকু দেখিয়া বুঝিলাম, আত্মদোষ স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের শেষ হইয়াছে। সেই দিন হইতে সংকল্প করিয়া, অনেক দিনের চেষ্টায়, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, এই নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মুক্তাটি সংগ্রহ করিয়া শূন্য পূর্ণ করিয়াছি।

নববধূ গৌরী দীপালোকে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মুক্তাটি ভাল করিয়া দেখিয়া, শ্বশ্রূমাতাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "আশীর্ব্বাদ কর মা! এ রত্ন যেন না হারাই।"

শ্রীঅমলা দেবী।

ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয় স্তথৈব বড়য়া কৃতঃ।
বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃপঞ্চদশস্মৃতাঃ।

মহামতি শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার তাঁহার "দায়ক্রম-সংগ্রহে" উল্লিখিত স্মৃতির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—

"গৃহজাতো দাস্যামুৎপন্নঃ, দারাদুপাগতঃ ক্রমাগতঃ অন্নকালভৃতঃ দুর্ভিক্ষপোষিতঃ স্বামিনা-আহিতো বন্ধকীকৃতঃ, মোক্ষিতঃ,—ঋণমোচনেনাত্মনীকৃতদাস্তঃ তবাহামিত্যুপাগতঃ কন্যাপাদাসঃ-সন্ স্বয়ং দাসত্বেন সত্বরূপঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ সন্ন্যাসভ্রষ্টঃ কৃতঃ কেন চিন্নিমিত্তেন এতাবৎকালপর্য্যন্তং তাহংদাসঃ ইতি কৃতসময়ঃ ভক্তদাসঃ সুভিক্ষেঽপি ভক্তার্থমঙ্গীকৃতদাস্তঃ, বড়বাকৃতঃ বড়বা দাসী তল্লোভাদঙ্গীকৃতদাস্তঃ।"

দাসত্ব প্রথা যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, সে বিষয় আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্বেতকায় আর্য্যগণ যে কৃষ্ণকায় অনার্য্যদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া অনেক সময় দাসে পরিণত করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় ; শূদ্রের এ[illegible] আভিধানিক অর্থই দাস।

সম্প্রতি আমাদের শাখা-পরিষদের অন্যতম [illegible] শ্রীযুক্ত রাইচরণ গুহ বি, এল্, তাঁহার গৃহে রক্ষিত কয়েকখানি প্রাচীন দলিল [illegible]ষদে উপস্থিত করিয়াছেন। সেই দলীল কয়েকখানি পাঠ করিলে শত কি প[illegible]কে শত-বর্ষ পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশের—বিশেষ বাখরগঞ্জের সামাজিক অবস্থার দু' একটি চিত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয়। নিম্নোদ্ধৃত দলীলখানি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, দাসত্ব-প্রথা বৈদিককাল হইতে প্রায় পেনালকোডের সময় পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, অথবা প্রচ্ছন্নভাবে জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

আলোচ্য দলীলখানি ১১৯৫ সনের ১৪ই অগ্রহায়ণের লিখিত। দলীলখানি এই :—

ইয়াদি আত্মবিক্রয় পত্রমিদং—

শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ ওলদে গদাধর সিদ্ধান্ত সাকিম চান্দশী পরগণে বাঙ্গরোড়া সুচরিতেষু :—শ্রীমতী কুঞ্জমালা ওমর ২৭ সাতাইষ বরিষ রঙ্গস্যাম জওজে রাম রুদ্রতে সাকিন পিঙ্গলাকাঠী পরগণে আজীমপুর অস্য লিখনং আগে আমী মহাকষ্ট পালিত খোরাক পোষাক আজিজ হইয়া মারা জাই এবং আমার কন্যা শ্রীমতী মহামায়া ওমর সাত বরিষ রঙ্গস্যাম এহার ও অন্নবস্ত্র দিয়া পরিপোষণ করিতে না পারি এবং কেহ আমার ঘর অন্নবস্ত্র দিয়া পর বিষ করে এমত না য়াছে অতএব আপন য়াজিরকবতে সচ্ছেন্দ আক্রেবহাল তবিয়তে সেইচ্ছা পুর্ব্বক আমি ও আমার কন্যা বহায় আপনার স্থানে মবলগ ৩ তিন রূপাইয়া পুরোওজন দহমাসী চলন সহী

দস্তবদস্ত পাইয়া আত্মবিক্রয় হইলাম আপনে লওয়াজিমা খোরাক পোষাক দিয়া মুদত ৭০ সত্রী বরিষ দাসী অর্থ কর্ম্ম দানবিক্রীরধিকারী হইয়া করাইতে রহ জদি এই মুদ্দত মৈদ্ধে আচাদ হইতে চাহি তবে ১।০ সোয়ামণ হলধি সিধা দিয়া আচাদ হইব এই করারে আত্মবিক্রয় হইলাম ইতি সন ১১৯৫ এগার শত পাচানবৈ শাল তেরিখ ১৪ চৌদ্দহী মাহে অগ্রহায়ণ।

ইহা পাঠ করিলে, তৎকালিক ভাষা, লিখন-প্রণালী, দেশের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়।

স্মৃতিকথিত পঞ্চদশ প্রকারের দাসের মধ্যে আত্ম ও সন্তান-বিক্রয় দ্বারা দাসত্ব-অঙ্গীকারের প্রথা প্রতিপন্ন হইতেছে।

কুঞ্জমালা, সধবা কি বিধবা, তাহা প্রক[illegible] নাই, সম্ভবতঃ বিধবা। যদিও দলীলে জওজে মৃত লেখা হয় নাই [illegible]থাপি লিখনভঙ্গীতে বিধবা বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। সংসারে তাহা[illegible] অন্ন-বস্ত্র দিয়া রক্ষা করে, কি ভরণ-পোষণ করে এমন কেহ নাই. [illegible]রিদ্র্যনিবন্ধন তিনটি টাকা পাইয়া, সপ্তম-বর্ষীয়া কন্যাসহ আত্মবিক্রী[illegible] হইল, সত্তর বৎসরের জন্য আত্মবিক্রয়, তখন তাহার বয়স ২৭ সাতাই[illegible] [illegible]ৎসর, সুতরাং এই আত্মবিক্রয় চিরকালের তরেই বুঝিতে হইবে। "সো[illegible]ন হল্‌ধি সিধা" দিয়া মোচন হওয়ার যে ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা যে কখনও [illegible]র্য্যে পরিণত হইতে পারিবে এরূপ মনে করা যায় না। আব "সোয়ামণ হলুদের" ব্যবস্থাই বা কেন? হলুদ কি তখন দুর্মূল্য বা [illegible]ছিল? না—বর্ণের সাম্যবশতঃ যেমন স্বর্ণের স্থানে অনেক ব্যাপারে [illegible]র প্রতিনিধিত্বই পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইত, তজ্জন্যই হলুদের ব্যবস্থা? কুঞ্জমালা ও তাহার কন্যা মহামায়া যে কখনও স্বাধীনতালাভ করিয়াছিল বা পরিণামে তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।

বলিতে ভুলিয়াছি যে, সঙ্গীয় অপর একখানা দলীল-পাঠে দেখা যায়,—কুঞ্জমালার এক "ভাসুর" রামরামতৈ জীবিত ছিল, এবং এই আত্মবিক্রয়ে তাহার সম্মতি ছিল।